শতাব্দীর সেরা
গোয়েন্দা গল্প

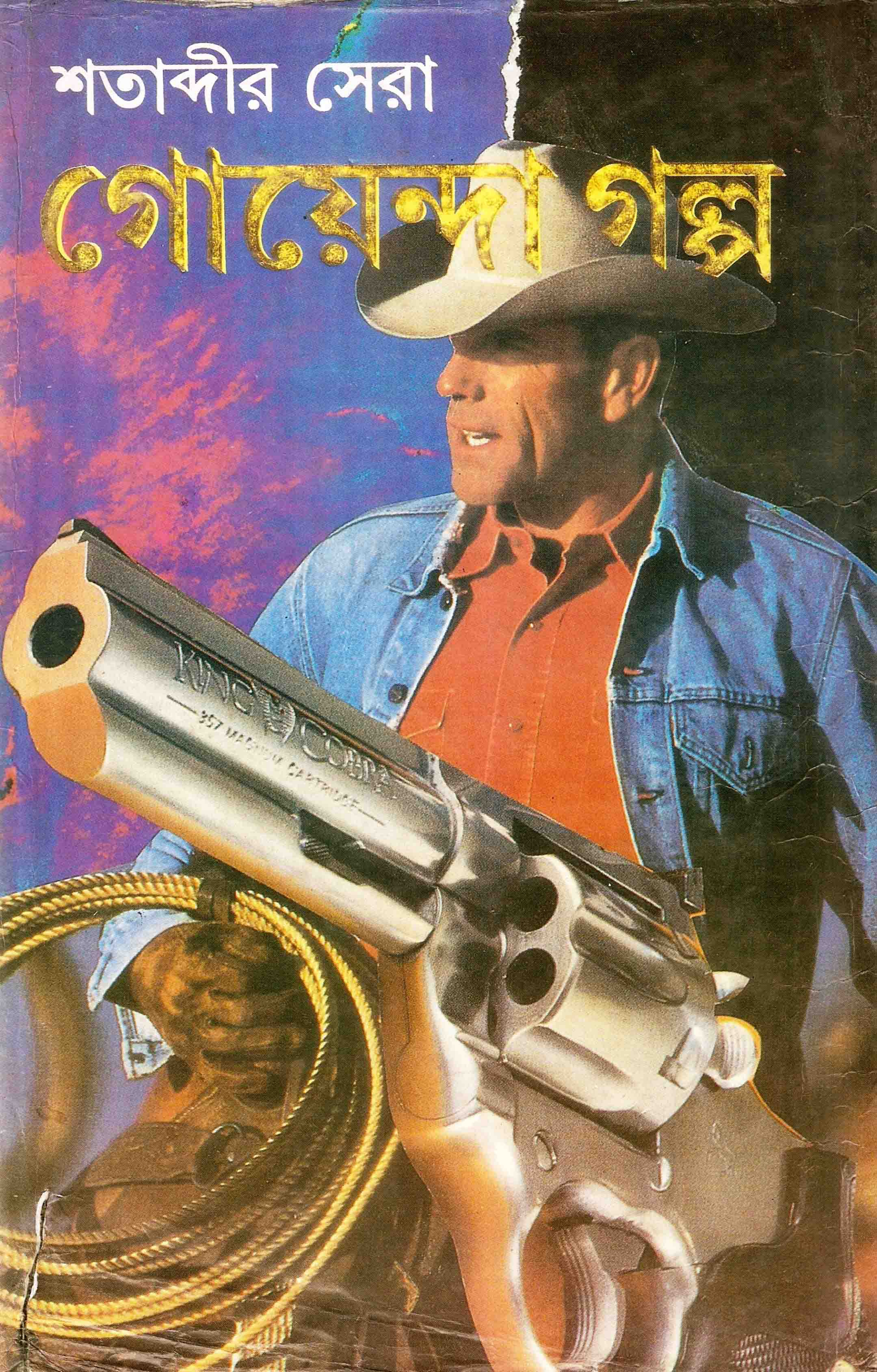

WWW.PATHAGAR.NET...

শতাব্দীর সেরা গোয়েন্দা গল্প

সম্পাদনায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কামিনী প্রকাশালয় ॥ কলিকাতা-৯

papai

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
কামিনী প্রকাশালয়
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রাবণ ১৪০৬

প্রচ্ছদ ঃ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

অলংকরণ ঃ
দিলীপ দাস

লেজার সেটিং
ওয়ার্ড ওয়ার্কস
কলিকাতা - ৯

মুদ্রক ঃ
পারিজাত প্রিন্টার্স
৭, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা-৬৭

মূল্য ঃ একশত টাকা

pathagar.net

সুজিত নাগকে
চিরন্তন সখ্যতার বিনম্র নিবেদন

pathagar.net

প্রকাশকের নিবেদন

আজকাল প্রায়শই একটা কথা শোনা যাচ্ছে, বিজ্ঞান ও অর্থনীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে অপরাধের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাহায্যে অপরাধের রীতি-কৌশলেরও নিত্যনতুন সংস্কার সাধিত হয়ে চলেছে। প্রচার হলেও অভিযোগটি যে অনেকাংশেই সত্যি তা দৈনিক কাগজগুলির পাতা ওল্টালেই আমাদের নজরে পড়ে। সেই সঙ্গে এই সংবাদও কারো অজানা নয় যে অপরাধী সনাক্তকরণ ও অপরাধতদন্তের পুলিশী কায়দা-কৌশলও অপরাধ জগতের প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমানে পাল্লা দিচ্ছে। উভয় পক্ষেই চলেছে এভাবে বুদ্ধির ও কর্মকুশলতার সমান্তরাল প্রতিযোগিতা।

বাস্তব ক্ষেত্রের এই বিবর্তন অনিবার্যভাবেই ছায়াপাত ঘটিয়ে চলেছে সাম্প্রতিক কালের গোয়েন্দা গল্পগুলিতে। সেকারণে গোয়েন্দা গল্পের পাঠকদের মধ্যেও আগ্রহ ও কৌতূহল ক্রমবর্ধমান। পাঠকদের এই চাহিদা পরিপূরণের উদ্দেশ্যেই আমরা বিগত একশ বছরের গল্পধারার একটি বিবর্তন-পরম্পরা পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। এই গল্পগুলিতে অপরাধ সংঘটন ও অপরাধ তদন্তধারার বৈচিত্র্যের একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যাবে। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান সংকলন গ্রন্থের প্রতিটি রচনাই পাঠকদের কাছে উপাদেয় বিবেচিত হবে।

সংকলন কার্যে দক্ষ ও বিশিষ্ট লেখকদের রচনা নির্বাচনের প্রতি বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হয়েছে। আনন্দের বিষয় যে এ কাজে আমরা শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সানুগ্রহ সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অশেষ।

গল্পের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ছবি সংযোজনেও আমরা কার্পণ্য করিনি। আমাদের চেষ্টা ও শ্রম কতটা সার্থক হয়েছে সহৃদয় পাঠক সাধারণই তা বিবেচনা করবেন।

সনমস্কার
নিবেদক
শ্যামাপদ সরকার

সূচীপত্র

■ সবুজ রাক্ষস	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৯
■ ভয়ঙ্কর ভাড়াটে ও পরাশর বর্মা	প্রেমেন্দ্র মিত্র	২৪
■ নবার ডাইরি	লীলা মজুমদার	৩২
■ হরবিলাসের মৃত্যু রহস্য	বনফুল	৩৯
■ কল্কে-কাশির কাণ্ড	শিবরাম চক্রবর্তী	৪৫
■ রহস্যের সন্ধানে	আশাপূর্ণা দেবী	৫৭
■ গোবিন্দদার গোয়েন্দাগিরি	সুনির্মল বসু	৬৩
■ খুনি কে	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৬৬
■ বিন্দিপিসীর গোয়েন্দাগিরি	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৭২
■ জাল ডিটেকটিভ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	৮১
■ সোনার বিগ্রহ	মঞ্জিল সেন	৮৮
■ যন্ত্র	হুমায়ূন আহমেদ	১০৩
■ চিতা-রহস্য	ইমদাদুল হক মিলন	১১০
■ অন্ধকারে গোলাপ বাগানে	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১১৯
■ আজব গোয়েন্দার দেশে	আবুল বাশার	১২৮
■ রাতের আগন্তুক	আল কামাল আবদুল ওহাব	১৩৮
■ একটি গোয়েন্দা কুকুরের কাহিনী	মোহাম্মদ নাসির আলী	১৪৫
■ গোগোদার গোয়েন্দাগিরি	বেলাল চৌধুরী	১৫২
■ গার্জেনভিলার রহস্য	জ্যোতির্ময় ঘোষ	১৫৬
■ তরুণগুপ্তের বিচিত্র কীর্তিকথা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	১৬৫
■ অর্জুন হতভম্ব	সমরেশ মজুমদার	১৭১
■ পটলবাবুর বিপদ	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৭৮
■ কিস্তিমাত	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	১৮৩
■ ঘড়ি-রহস্য	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	১৯১

pathagar.net

■ হারানো বুদ্ধমূর্তি উদ্ধার	সমরেশ বসু	১৯৯
■ দুই বন্ধুর কীর্তি	প্রফুল্ল রায়	২০৬
■ বেসরকারী গোয়েন্দা	ধীরেন্দ্রলাল ধর	২১৯
■ মীন রহস্য	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৬
■ বার্লো সাহেবের বাংলো	নলিনী দাস	২৩৫
■ সমাদ্দারের চাবি	সত্যজিৎ রায়	২৪৯
■ কোন হত্যাই নিখুঁত নয়	চিরঞ্জীব সেন	২৭২
■ রহস্য রজনীগন্ধার	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	২৭৭
■ তিন খুনে	বিশু মুখোপাধ্যায়	২৮৯
■ রহস্যের হোমটাস্ক	আনন্দ বাগচী	২৯৬
■ কিট্টুর রোমহর্ষক কীর্তি	হিমানীশ গোস্বামী	৩০৪
■ খানিকটা তামার তার	হেমেন্দ্রকুমার রায়	৩১৪
■ টর্চ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩২২
■ দুর্দান্ত গোয়েন্দা কাহিনী	আশা দেবী	৩২৫
■ গোয়েন্দার চোখ	শেখর বসু	৩৩৫
■ খুনী কে	দুলেন্দ্র ভৌমিক	৩৪০
■ মাকড়সা	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৩৪৬
■ সত্যান্বেষী	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫১
■ অ্যাকসিডেন্ট্	জরাসন্ধ	৩৭৪
■ কৃষ্ণধাম কথা	বিমল কর	৩৮০
■ ডিটেকটিভ	মনোজ বসু	৩৯৯
■ হীরের আংটি	প্রতিভা বসু	৪০৫
■ হত্যার পরের ঘটনা	বিমল মিত্র	৪১৩
■ কফিন রহস্য	দেবল দেববর্মা	৪২০
■ হত্যাকারী কে?	পাঁচকড়ি দে	৪৩২

pathagar.net

■ আকাশে মৃত্যুর ফাঁদ	স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪১
■ ঝারোয়ার জঙ্গলে	মহাশ্বেতা দেবী	৪৫১
■ একটি নারী হত্যাকাণ্ডের কিনারা	পঞ্চানন ঘোষাল	৪৫৯
■ গোয়েন্দা কে?	ফতেমা আখতার	৪৭১
■ কে যেন	তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী	৪৭৩
■ মুখার্জী ভিলায় খুন	বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	৪৮৩
■ হীরের মুকুট উদ্ধার	তপতী চক্রবর্তী	৪৯০
■ রায় ভিলার অভিশপ্ত নীলা	উজ্জ্বল মল্লিক	৪৯৫
■ গিরিধারী-রহস্য	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	৫০৮
■ মরণের মুখে	অজেয় রায়	৫১৬
■ রুবাইয়ের রূপকথা	নবনীতা দেব সেন	৫৩০
■ চোর	সমরজিৎ কর	৫৩৬
■ বিগ্রহ প্রহেলিকা	অদ্রীশ বর্ধন	৫৫০
■ জলের তলায়	অনীশ দেব	৫৫৮
■ নীলার আংটি	সঙ্কর্ষণ রায়	৫৬৫
■ সাধু দেবকুমারের আজব কাহিনী	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	৫৬৯
■ বুবাই	আশিস সান্যাল	৫৭৩
■ একটি টিকিটের সূত্রে	শিবায়ন ঘোষ	৫৮০
■ আমার প্রথম মক্কেল	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৫৮৯
■ ফুন্টসোলিং-এর মূর্তিচোর	সুভাষ ধর	৫৯৯
■ অদৃশ্য দরজা	তপন সেন	৬১০
■ অংকপুরীর গুপ্তধন	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৬২৩
■ অপারেশন এক্স	ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	৬৩৩
■ চায়ের পেয়ালায়	ভবানী মুখোপাধ্যায়	৬৫১
■ শয়তানের চোখ	অরুণ বাগচী	৬৫৫

pathagar.net

■ সাদা প্যাকেট কালো টাকা	সঞ্জীব সিংহ	৬৫৮
■ ছোটমামার গোয়েন্দাগিরি	উজ্জ্বল কুমার	৬৭৯
■ ছবি চুরির রহস্যভেদ	কমলেন্দু সরকার	৬৮৯
■ বাঘের চামড়া গেলো কোথায়	মৃদুলকান্তি দে	৬৯৩
■ প্রেতের টেলিফোন	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০১
■ নিখোঁজ নটরাজ	অজিত পূততুণ্ড	৭০৮
■ প্ল্যানচেট, ফেলুদা ও গোয়েন্দা আর্য সেন	চণ্ডী ভট্টাচার্য	৭১৬
■ ট্রেনের মধ্যে গোয়েন্দাগিরি	কালীপদ দাস	৭২০
■ নীলমণি দারোগা	যদুনাথ ভট্টাচার্য	৭২৪
■ ছায়া রহস্য	আলী ইমাম	৭৩০
■ দুই ডিটেক্‌টিভ, দুই রহস্য	পরিমল গোস্বামী	৭৩৬
■ সাজানো রহস্য	মঞ্জুষ দাশগুপ্ত	৭৪৩
■ পোড়োবাড়ির আলো	শমীক মুখোপাধ্যায়	৭৪৮
■ ব্যাঙ্ক ডাকাতি	হাপিজুল হক্‌	৭৫২
■ বাবুলের গোয়েন্দাগিরি	পুণ্ডরীক চক্রবর্তী	৭৫৫
■ ডিটেকটিভ কেবলরাম	বিজন কুমার ঘোষ	৭৬১
■ সেই হীরের হার	সেকেন্দার আলি সেখ	৭৬৫
■ কমলের গোয়েন্দাগিরি	মীর মমতাজ	৭৭৪
■ মিথ্যে খুন	নাসির সাহেব	৭৭৮
■ ক্ষুদে গোয়েন্দা	কণা বসু মিশ্র	৭৮১
■ রহস্যময় সেই রিভলবার	সুজিতকুমার সেনগুপ্ত	৭৮৬
■ গোয়েন্দা ভোম্বলদা	অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী	৭৯৪

pathagar.net

WWW.PATHAGAR.NET

সবুজ রাক্ষস

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

একদিন রাত্রিকালে আমি শয়ন করিয়া আছি। অঘোর নিদ্রায় আমি অভিভূত আছি! বাহির-বাটিতে আমার ঘর, আর ভিতরবাটিতে পাল মহাশয়ের ঘর,—এই দুই ঘরের মাঝখানে যে দেয়াল, সেই দেয়ালের ঠিক গায়ে আমার বিছানা ছিল। সহসা পাল মহাশয়ের দিক হইতে সেই দেয়ালের গায়ে গুপ-গুপ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। শুইয়া শুইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে শব্দ করে?'

তাঁহার ঘর হইতে পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে এস। বিশেষ প্রয়োজন আছে। গোল করিও না।'

আমি উঠিয়া প্রথমে ঘড়িতে দেখিলাম যে রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। দ্বার খুলিয়া আমি বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। পাল মহাশয়ও সেই সময় আপনার ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দ্বারের খিল খুলিলেন। আমার দিকে সেই দ্বার শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ ছিল। পাল মহাশয় আমাকে সেই শৃঙ্খল খুলিতে বলিলেন।

papai

আমি শৃঙ্খল খুলিলাম। ভিতর বাটি এক হইয়া গেল। এই সময় আমি দেখিতে পাইলাম যে, লাঠি ধরিয়া কে একজন অতি ধীরে ধীরে পাল মহাশয়ের সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিবার উপক্রম করিতেছে, আর প্রদীপ হাতে লইয়া পাল মহাশয়ের গৃহিণী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। ভালরূপে দেখিয়া আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সে নিয়োগীর পীড়িত পুত্র। শয্যাশায়ী মরণাপন্ন রোগী এত রাত্রিতে কেন যে আসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম।

পাল মহাশয় চুপি-চুপি আমাকে বলিলেন, 'আস্তে কথা কহিও। বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার ঘরের ভিতর এস। তাহার পর সকল কথা তোমাকে বলিব।'

পাল মহাশয়ের আজ্ঞায় বারান্দার দ্বারে খিল দিয়া নিঃশব্দে আমি তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিলাম। পাঁচ ছয় পা গিয়াই পাল মহাশয়ের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। পাল মহাশয় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়—সর্বনাশ! চাহিয়া দেখি, তাঁহার ঘরের ভিতর এক রাক্ষস! ঘরের মাঝখানে মাদুরের উপর আসন-পিঁড়ি হইয়া রাক্ষস মহাশয় গট্ হইয়া বসিয়া আছেন। আরও আশ্চর্য কথা, লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া পাল মহাশয়ের কন্যা সেই মাদুরের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে!

ভয়ে আমার পা থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম যে, আর কিছু নয়, পাল মহাশয় এই রাক্ষসকে আপনার জামাতা করিয়াছেন। জল-খাবার স্বরূপ আমার দেহটি তাহাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত এই ঘোর রাত্রিতে তিনি আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন।

যাহা হউক, আমি তাঁহার ঘরের ভিতর আর প্রবেশ করিলাম না। প্রাণ লইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পালাইবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু পাল মহাশয় খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। আমার হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন, 'কোথা যাও?'

আমি তাঁহার পায়ে পড়িলাম। তাঁহার পা দুইটি জড়াইয়া আমি বলিলাম, আমি একেলা মায়ের একেলা ছেলে! দোহাই আপনার।

পাল মহাশয় বলিলেন, 'সে আবার কী?'

আমি বলিলাম, 'দোহাই আপনার! আপনার উনি জামাতা, উনি বোধহয় বিভীষণের প্রপৌত্র! উনি দেবতা! আমাকে খাইয়া উনি সুখ পাইবেন না। উনি বরং আসিয়া টিপিয়া দেখুন, আমার গায়ে মাংস নাই, আমার গায়ে সব হাড়।'

পাল মহাশয় বলিলেন, 'এ বলে কী!'

আমি বলিলাম, 'আমাকে ছাড়িয়া দিন। রাক্ষস মহাশয়ের নিমিত্ত আমি ভাল মোটা তাজা মানুষ ডাকিয়া আনিতেছি। তাহার কোমল মাংস ভক্ষণ করিয়া রাক্ষস মহাশয় পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন। জামাতার আদর করিয়া আপনিও সন্তোষ লাভ করিবেন ;— আমাকে খাইয়া তাঁহার সুখ হইবে না। এ চাষার মাংস। স্বহস্তে আমরা চাষ করি। আমাদের মাংস শুষ্ক ও কঠিন,—ঠিক দড়ির মত। দোহাই আপনার।'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'তোমাকে আর কী বলিব! তুমি মানুষ না কী তাহাই আমি বুঝতে পারি না। রাক্ষস আবার কোথায়? আমার এত বয়স হইয়াছে, কিন্তু রাক্ষস

আমি কখনও দেখি নাই। ইনি আমার পুত্র। বিপদে পড়িয়া আমার পুত্রকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে। এই যে পরচুলের দাড়ি গোঁফ আর এই যে মুখোস,—যাহা দেখিয়া তুমি এত ভয় পাইয়াছ।'

নিজের বড়াই করিতে নাই ; কিন্তু স্বভাবত আমি যে একজন সাহসী পুরুষ, সে পরিচয় বোধহয় আর আপনাদিগকে দিতে হইবে না। প্রকৃত রাক্ষস না হউক, রাক্ষসের মত তো বটে? সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের হাতে পড়িয়াও আমি ধৈর্য ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহাই আমার সাহসের যথেষ্ট পরিচয়। আপনারা হইলে ভয়ে হয়ত কত কি করিয়া ফেলিতেন। তাহার পর বলিলে হয়ত আপনারা বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু সত্য বলিতেছি কিছুমাত্র ভয় না করিয়া রাক্ষসের মুখোস আমি টিপিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় হইল না। এখন আপনারা বুঝিয়া দেখুন, আমার কত সাহস!

যখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে সে বস্তুটা মুখোস বটে, রাক্ষসের মুণ্ড বা অন্য কোন ভয়াবহ পদার্থ নহে, তখন আমি উঠিয়া বসিলাম। বসিয়া আমি পাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী জন্য আপনার পুত্রকে এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে।'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'সে অনেক কথা। বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিবার সময় নাই। আপাতত আমরা ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। শীঘ্র তাহার প্রতিকার না করিতে পারিলে আমাদের সর্বনাশ হইবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিপদ কোথা হইতে আসিবে?'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'আমার পুত্রের নাম মিহির। মিহির এক খুনী মোকদ্দমায় পড়িয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে সে ঘটনা ঘটিয়াছে। মিহির সে লোককে খুন করে নাই ; কিন্তু সমুদয় দোষটি তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। সেজন্য এই দুই বৎসর নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে পথে-পথে ফিরিতেছে। দুঃখের কথা বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়, বাবা আমার কতই না কষ্ট ভোগ করিতেছে। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে অতি গোপনে সে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করে। আমাদের নিকট আসিতে তাহাকে আমি বার-বার মানা করিয়াছি ; কিন্তু আমাকে, তাহার গর্ভধারিণীকে ও তাহার ভগিনীকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না। মিহির যদি আজ ধরা পড়ে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার ফাঁসি হইবে। কারণ সে যে খুন করে নাই, সে যে সম্পূর্ণরূপে নিরাপরাধ তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে যদি তুমি কোনওরূপে সহায়তা করিতে পার সেইজন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।'

আমি বলিলাম, 'ঘরে তলোয়ার আছে? থাকে তো দিন, আমি লড়াই করিব।'

পাল মহাশয় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, 'তুমি পাগল নাকি? কাহার সহিত তুমি লড়াই করিবে? পুলিশের সহিত লড়াই করিবে?'

আমার ভয় হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পুলিশ এ স্থানে কী করিয়া আসিবে? পুলিশ কী করিয়া জানিবে যে আপনার পুত্র মিহির এ বাটিতে আসিয়াছে?'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'তাহাই তো ভয়! সেই বিপদেই তো এখন আমি পড়িয়াছি ; আর সেইজন্যই তো তোমাকে আমি ডাকিয়াছি। কী করিব, কিছুই আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। পুলিশের লোক এখনি হয়ত আসিয়া উপস্থিত হইবে। নিয়োগী

থানায় খবর দিতে গিয়াছে।'

বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম, 'নিয়োগী!'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'হ্যাঁ নিয়োগী। তাহার পুত্র বেচুর সহিত আমার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বেচুর এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে বিবাহ আমি কিছুতেই দিতে পারি না। সেই কথা শুনিয়া আমার উপর নিয়োগীর অতিশয় রাগ হইয়াছে। সে দেখিয়াছে আমার পুত্র মিহির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমার বাটিতে আসিয়াছে। নিয়োগী সেই খুনের কথা সমুদয় অবগত আছে। তাহার পুত্র ও আমার পুত্র হুগলিতে এক বাসায় থাকিয়া লেখা-পড়া করিত, সেই বাসাতেই এই খুন হয়। নিয়োগী-পুত্রের পরামর্শে ও সহায়তায় আমার পুত্র পলায়ন করে। আজ রাত্রিতে মিহিরকে আসিতে দেখিয়া সে থানায় সংবাদ দিতে গিয়াছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কী করিয়া জানিলেন যে সে থানায় খবর দিতে গিয়াছে?'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'নিয়োগীর পুত্র বেচু আসিয়া আমাকে এইমাত্র বলিয়া গেল। বেচু এখন আর বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। তথাপি লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে সে এইমাত্র আসিয়াছিল। তাহার পিতা যে ঘোর অন্যায় কাজ করিতেছে, তাহা বোধহয় সে বুঝিতে পারিয়াছে। সেজন্য আমাকে সে সকল কথা বলিয়া গেল।'

আমি বলিলাম, 'মিহির এইবেলা অশ্বত্থ গাছ দিয়া পলায়ন করুক না কেন?'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'তাহার জো নাই। বেচু বলিয়া গেল যে সদর দরজায় একজন কনস্টেবল দাঁড়াইয়া আছে। সেদিক দিয়া পলায়ন করিবার উপায় নাই। পশ্চিমে গলির রাস্তায় এই জানালার পার্শ্বে যেদিকে অশ্বত্থ গাছ রহিয়াছে, সে স্থানে নিয়োগীর বন্ধু দালাল দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। দুই পথে দুইজনকে পাহারা রাখিয়া নিয়োগী থানায় গিয়াছে।'

আমি বাটির উত্তর ও পূর্বদিক পানে চাহিয়া দেখিলাম। সেই দুইদিক একেবারে ভগ্ন; সে-দুইদিক দিয়া পলায়ন করিবার কোন উপায় নাই। তাহার পর আমি ছাদে উঠিবার সিঁড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সিঁড়িও একেবারে ভগ্ন ; ছাদে উঠিবার উপায় নাই। পলায়ন করিবার কোন উপায় আমি দেখিতে পাইলাম না।

মিহির এতক্ষণ মাতার নিকট বসিয়া ছিল। যাইবার নিমিত্ত মাতা তাহাকে কিছু মিষ্টান্ন দিয়াছিলেন, মিহির খাইতে অস্বীকার করিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে খাইবার নিমিত্ত মাতা তাহাকে জেদ করিতেছিলেন। মাতার অনুরোধে মিহির সন্দেশ ভাঙিয়া একটু মুখে দিয়া জল পান করিল। তাহার পর সে মাতাকে বুঝাইতে লাগিল।

মিহির বলিল, 'মা! তুমি জননী! আমার দেবতা! তোমার সাক্ষাতে আমি সত্য বলিতেছি যে আমি সে ছোকরাকে খুন করি নাই। দুইজনে আমরা এক ঘরে থাকিতাম। চিরকাল তাহাতে আমাতে বড় ভাব ছিল। বাবার সহিত তাহার বাপের মোকদ্দমা আরম্ভ হইলেও তাহাতে আমাতে ভাব যায় নাই। তবে, যে রাত্রিতে সে খুন হয়, সেইদিন সন্ধ্যাবেলা তাহাতে আমাতে একটু বচসা হইয়াছিল। কিন্তু সে অন্য কথা লইয়া,

মোকদ্দমার কথা নয়। যাহা হউক, সে ঝগড়া কোন কাজের নয়, কথার তর্ক-বিতর্ক মাত্র। তাহার পর আমরা একসঙ্গে কত কথা কহিলাম, একসঙ্গে আহার করিলাম, এক ঘরে শয়ন করিলাম। রাত্রি দুইটা কি তিনটার সময় আমাকে একবার বাহিরে যাইতে হইল। বাহির হইতে আসিয়া পুনরায় ঘরের ভিতর যেই প্রবেশ করিয়াছি, আর সেই সময় বেণীর বিছানার নিকট হইতে কিরূপ একটা ঘড়-ঘড় শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। যে ছোকরা খুন হইয়াছে, তাহার নাম বেণী ছিল। আমি ভাবিলাম, বেণী বুঝি কিরূপ কুভাবে শয়ন করিয়াছে, তাই সে এইরূপ শব্দ করিতেছে। তাহাকে ঠেলিয়া পা ফিরিয়া শুইতে বলিব, এইজন্য আমি সেই অন্ধকার ঘরে তাহার বিছানার দিকে যাইতে লাগিলাম। সহসা আমার পায়ে মানুষের পা ঠেকিয়া গেল। তখনও আমি কোন বিপদের আশঙ্কা করি নাই। তখন আমি ভাবিলাম যে, বেণী ঘুমের ঘোরে তক্তাপোষ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। বেণী, বেণী বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে আমি তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমি দেখিলাম যে তাহার সর্বশরীর অবশ হইয়া গিয়াছে, আর তাহার গলা দিয়া সেই ঘড়-ঘড় শব্দ হইতেছে ; আর সেই সময় আমার পায়ে জল অপেক্ষা ঘন কি-সব লাগিয়া গেল। আমি চিৎকার করিয়া উঠিলাম। পাশের ঘরে নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বেচু ও আর আর ছোকরা ছিল। কিন্তু আমার চীৎকার শুনিয়া কেবল বেচু একেলা দৌড়িয়া আসিল। সঙ্গে সে দিয়াশলাই আনিয়াছিল। সে দিয়াশলাই জ্বালিল। সেই আলোতে বেণীকে আমি তাহার তক্তাপোষে শয়ন করাইলাম। আর সেই সময় দেখিলাম যে, তাহার বুকে কে ছুরি মারিয়াছে ; বুক হইতে ছলকে ছলকে রক্ত বাহির হইতেছে, তাহাতে আমার জামা কাপড় রক্তে-রক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘরের মেঝেতে যে স্থানে বেণী পড়িয়াছিল সে স্থানে অনেক রক্ত জমা হইয়াছিল। সেই রক্ত আমার পায়ে লাগিয়া গিয়াছিল। নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বেচু ঘরের ভিতর আসিয়া দিয়াশলাই জ্বালিয়া সমুদয় ব্যাপার দেখিয়া বেচু মনে করিল যে আমি বেণীকে খুন করিয়াছি। সেইজন্য বেচু আমাকে বলিল, চুপ্। গোল করিও না। কিন্তু মিহির, এ কী তুমি করিয়াছ? বেণীকে তুমি খুন করিয়াছ? সন্ধ্যাবেলা তাহার সহিত তোমার ঝগড়া হইয়াছিল, সেইজন্য ইহাকে খুন করিয়াছ? না, ইহার বাপের কাছ হইতে যে একশত টাকার নোট আসিয়াছে তাহার জন্য তুমি ইহাকে খুন করিয়াছ? আমি বলিলাম, ও কী কথা বেচু! আমি ইহাকে খুন করিয়াছি? আমি যদি খুন করিব, তবে চিৎকার করিয়া লোক ডাকিতে যাইব কেন?—বেচু বলিল, দেখ মিহির, তোমার সেকথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। তোমরা দুইজনে এক ঘরে থাক। তোমার সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল,—তোমার গায়ে রক্ত,—আর একি! এই বলিয়া ঘরের মেঝে হইতে বড় একখানি ছুরি সে তুলিয়া লইল। ছুরিখানি রক্তমাখা ছিল। সে ছুরি আমার। ঘরের একপার্শ্বে ছোট টেবিল ছিল। তাহার উপর কাগজ, কলম, পুস্তক প্রভৃতির সহিত আমার সেই ছুরিখানাও থাকিত। ছুরিখানি হাতে লইয়া বেচু বলিল, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না! শীঘ্র তুমি পলায়ন কর! আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তখন বেচু বলিল, ও কী কর! ওরূপ রক্তমাখা কাপড়ে বাহিরে যাইও না। এখনি তোমাকে চৌকিদারে ধরিবে। এই কথা বলিয়া সে দৌড়িয়া আপনার ঘরে গেল। তাহার একখানি কাপড় আনিয়া আমাকে দিল। সেই কাপড় পরিয়া আমি পলায়ন করিলাম। সে রাত্রিতে

বেচু আমার অনেক উপকার করিয়াছে। আজও দেখ, সে আমাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মা! এখন বোধ হইতেছে যে পলায়ন করিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। যখন আমি অপরাধ করি নাই, তখন কী জন্য যে আমি পলায়ন করিলাম তাহা বুঝিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় আর কতদিন কাল কাটাইব! ইহা অপেক্ষা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া মরাই আমার পক্ষে ভাল। তোমাদিগকে না দেখিয়া আর পথে পথে ফিরিতে পারি না! আর কষ্ট ভোগ করিতে পারি না, মা!'

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। পাল মহাশয়ের কন্যা কাঁদিতে লাগিল। পাল মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল, আমারও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মিহির পুনরায় বলিল, 'আজ আর পালাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তাহার জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। পথে-পথে আর বেড়াইতে পারি না!'

এরূপ বলিতে বলিতে মিহির দেখিল যে তাহার পিতা মাতা ও ভগিনী সকলেই অতিশয় কাঁদিতেছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া সে পুনরায় বলিল, 'মা, কাঁদিও না। তুমি ভয় করিও না। ভগবান মাথার উপর আছেন। বিনা দোষে তিনি আমাকে ফাঁসি যাইতে দেবেন না।'

আমার নিজের সম্বন্ধে এই সময় একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। মিহিরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমার বুকের ভিতর গুর্-গুর্ করিয়া উঠিল। কেন বলিতে পারি না, কিন্তু এই সময় হইতে আমার স্বভাব পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল।

পাল মহাশয় বলিলেন, 'প্রাণ থাকিতে তোমাকে আমি ধরা দিতে দিব না। পালাইবার কোন উপায় কি নাই?'

এই সময় বাটির নিম্নে অন্দর মহলের দরজায় সবলে কে আঘাত করিতে লাগিল। দরজা যেন ভাঙিয়া ফেলিতে লাগিল।

শশব্যস্ত হইয়া আমরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। পাল মহাশয় বলিলেন, 'ঐ পুলিশ আসিয়াছে!'

পাল মহাশয়ের কন্যা ও গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। মিহির পুনরায় তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। মিহির বলিল, 'ভয় নাই মা! কাঁদিও না। অন্তর্যামী ভগবান জানেন যে আমি দোষী নই। তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন।'

দরজায় অতি সবলে আঘাত হইতে লাগিল। দরজা যেন ভাঙিয়া ফেলিতে লাগিল।

পাল মহাশয় বারান্দায় গিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ও? দরজা ভাঙে কে?'

বাহির দিকে নিচে হইতে কে উত্তর দিল, 'আমরা পুলিশের লোক। দরজা খুলিয়া দাও।'

পাল মহাশয় বলিলেন, 'রাত্রি প্রায় একটা বাজে। এ ঘোর রাত্রিতে আমি দরজা খুলিয়া দিতে পারি না। যদি তোমাদের কোন প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে প্রাতঃকালে আসিও, তখন দ্বার খুলিয়া দিব। রাত্রিকালে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবার আইন নাই।'

পুলিশের লোক উত্তর করিল, 'দ্বার খুলিয়া দাও। যদি না খুলিয়া দাও তাহা হইলে দ্বার আমরা ভাঙিয়া ফেলিব। তোমার ঘরে খুনী আসামী আছে।'

পাল মহাশয় বলিলেন, 'আমার ঘরে খুনী আসামী কোথা হইতে আসিবে? এ ঘোর রাত্রিতে আমি দ্বার খুলিয়া দিব না ;—তোমরা পুলিশের লোক হও আর যেই হও।'

তাহারা দ্বার যেন ভাঙিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। পাল মহাশয় ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন, 'কী সর্বনাশ হইল! আর কোন উপায় নাই! মিহির এইবার ধরা পড়িল। সর্বনাশ হইল।'

মিহিরের এক হাত মা ধরিয়াছিলেন ও অপর হাত ভগিনী ধরিয়াছিল। মিহিরকে মাঝখানে রাখিয়া দুইজনে পার্শ্বে বসিয়া ক্রমাগত কাঁদিতেছিলেন। পাল মহাশয়ের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া ভগিনী সহসা মিহিরের হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতাকে সে বলিল, 'বাবা! নিচে গিয়ে পুলিশের লোককে তুমি দরজা খুলিয়া দাও। আমি মনে মনে এক উপায় স্থির করিয়াছি। ভগবানের কৃপায় আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে।'

কন্যার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক হইয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলাম।

কন্যা ধীর-গম্ভীর স্বরে ভ্রাতাকে বলিল, 'দাদা, উঠ। মদনবাবুর ঘরে গিয়া তাঁহার বিছানায় তুমি শয়ন কর। বারান্দার দ্বারে ওদিক হইতে তুমি শিকল দিয়া দাও, এদিক হইতে সেই দ্বারে আমি খিল দিতেছি।'

পাল মহাশয়ের কন্যা তাহার পর মাদুরের উপর হইতে সেই রাক্ষসের মুখোস ও পরচুল তুলিয়া লইল। স্বহস্তে সেই মুখোস ও সেই পরচুলের দাড়ি গোঁপ সে আমার মুখে পরাইয়া দিল।

সকলে তাহার অভিসন্ধি তখন বুঝিতে পারিল। পাল মহাশয় বলিলেন, 'রাধারানী মা! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার বুদ্ধি! তোমার বুদ্ধিবলে ও ভগবানের কৃপায় মিহির বোধহয় এবার নিষ্কৃতি পাইবে। মিহির! উঠ বাবা! শীঘ্র মদনবাবুর ঘরে তুমি গমন কর!'

পাল মহাশয়ের কন্যার নাম রাধারানী।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাধারানী মিহিরকে আমার ঘর দেখাইয়া দিল। ভিতরবাটি হইতে বাহির-বাটিতে গমন করিয়া মিহির প্রথম বারান্দার দ্বারে শিকল দিল। তাহার পর আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া সে ঘরেরও দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। অবশেষে সে আমার বিছানায় শয়ন করিল।

দ্বার খুলিয়া দিবার নিমিত্ত পাল মহাশয় এখনও নিচে গমন করেন নাই। রাধারানী সে জন্য পুনরায় তাঁহাকে বলিল, 'বাবা! তুমি নিচে গিয়া পুলিশের লোককে দ্বার খুলিয়া দাও। দ্বার খুলিতে কিন্তু একটু নলপাত করিও। উপরে কেবল তোমার ঘরের দ্বার খোলা থাকুক। প্রদীপ নিভাইয়া মা ও আমি অন্য ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করি।'

পাল মহাশয় প্রথম বারান্দায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুলিশের লোককে বলিলেন, 'আপনাদের আর কষ্ট করিতে হইবে না। এখনি নিচে গিয়া আমি দ্বার খুলিয়া দিতেছি।'

এই বলিয়া সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে তিনি নিচে নামিতে লাগিলেন।

এখন আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম, 'এ মন্দ কথা নয়! রাক্ষসের হাত হইতে কত কষ্টে পরিত্রাণ পাইলাম, এখন দেখিতেছি আমার ফাঁসির জোগাড় হইতেছে! নিয়োগী মহাশয় পুলিশকে নিশ্চয় বলিয়াছেন যে রাক্ষসের সাজে সাজিয়া খুনি আসামী

বাটিতে আগমন করে। সুতরাং পুলিশ আসিয়াই আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। তাহার পর আমাকে থানায় লইয়া যাইবে। তাহার পর আমার নামে মোকদ্দমা করিবে। তাহার পর আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া দিবে। আমাকে দিয়া রাধারানী ভ্রাতার প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে। মেয়েটি সামান্য মেয়ে নয়!

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় মিহিরের সেই দুঃখের কাহিনী আমার স্মরণ হইল। আপনাকে ধিক্কার দিয়া আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম,—'ছি, মদন! তুমি না এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে আজ হইতে আর পাগলামি করিবে না—আর কখনও কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিবে না? আজ হইতে তুমি তোমার স্বভাব পরিবর্তন করিবে? ছি মদন! তোমার কি লজ্জা নাই?'

ভ্রাতাকে আমার ঘর দেখাইয়া দিয়া বারান্দার দ্বারে ভিতরে হইতে খিল দিয়া রাধারানী পুনরায় আমার নিকট আসিয়া বলিল, 'ভয় করিবেন না। আপনি যে দাদা নহেন, তাহা জানিতে পারিলেই পুলিশ আপনাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আপনি শীঘ্র পরিচয় দিবেন না। যত বিলম্ব করিতে পারেন ততই ভাল। কারণ, বিলম্ব হইলে দাদাকে সরাইতে আমরা সময় পাইব।'

রাধারানীর বচনে আমার মন আশ্বাসিত হইল। আমিও তখন মনে-মনে বুঝিয়া দেখিলাম যে, সত্য বটে, আমাকে কেন তাহারা ফাঁসি দিবে? আমি যে মিহির নই, জানিতে পারিলেই তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিবে। আমার নাম-ধাম প্রকাশ করিতে আমি যত পারি তত বিলম্ব করিব।

রাধারানী পুনরায় বলিল, 'আপনার এ ঘরে থাকা উচিত নহে। আপনাকে অন্যস্থানে যাইতে হইবে। আসুন।'

রাধারানীর সহিত সে ঘর হইতে আমি বাহির হইলাম। চক্ষুর উপরে মুখোসে দুইটি গোল ছিদ্র ছিল। তাহা পূর্বে রাক্ষসের ভয়াবহ, চক্ষুকোটর বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছিল। সেই ছিদ্র দিয়া আমি দেখিতে পাইতেছিলাম। তেতলায় উঠিবার নিমিত্ত পূর্বে যে স্থানে সিঁড়ি ছিল ; তাহার পার্শ্বে সামান্য একটু নিভৃত অন্ধকারময় স্থান ছিল। সে স্থানে যে ভগ্ন প্রাচীর আছে তাহার কোণে বসিলাম। ঘর হইতে রাধারানী মাদুরটি তুলিয়া আনিয়াছিল। সেই মাদুর দিয়ে সে আড়াল করিয়া দিল। মাদুরের অন্তরালে চুপ করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। নানারূপ আশ্বাস-বাক্যে আমাকে প্রবোধ দিয়া রাধারানী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

প্রাচীরের কোণে মাদুরের আড়ালে বসিয়া শব্দ শুনিয়া সমুদয় ঘটনা আমি বুঝিতে পারিলাম। পাল মহাশয় দ্বার খুলিয়া দিলেন। সে শব্দ আমি পাইলাম। অনেকগুলি লোক বাটির ভিতর প্রবেশ করিল ; সে শব্দ আমি পাইলাম। সাত-আট জন লোক তর-তর করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। সে পাল মহাশয়ের তিনটি ঘর পাঁতি-পাঁতি করিয়া তাহারা খুঁজিতে লাগিল ; সে শব্দও আমি পাইলাম। তাহাদের অনুসন্ধান যে বৃথা হইল, তাহাদের কথাবার্তায় তাহাও বুঝিতে পারিলাম। অবশেষে দুইজন লোক আমার দিকে আসিতেছে, পদশব্দে তাহাও আমি বুঝিলাম।

যে স্থানে আমি লুক্কায়িত ছিলাম, দুইজন লোক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গোল লণ্ঠনের প্রখর আলোক তাহারা মাদুরের উপর ধরিল। তাহার পর একজন অগ্রসর হইয়া মাদুরটি সরাইয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ সেই দুইজন লোক একসঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'আসামী পাইয়াছি। আসামী পাইয়াছি!'

সেই কথা শুনিয়া পুলিশের অন্যান্য লোক সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল তাহাদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ আমার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। ঘরের ভিতর পাল মহাশয়ের কন্যা ও গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একজন পুলিশের লোক আমার মুখ হইতে রাক্ষসের মুখোস খুলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহাদের যিনি কর্তা তিনি তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'উহুঁ! মুখোস খুলিও না। এই অবস্থাতেই ইহাকে সাহেবের নিকট লইয়া যাইব।'

আমি থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সাহেবের সম্মুখে আমার মুখোস খোলা হইল কিন্তু পরচুলের দাড়ি গোঁফ যেমন তেমনি রহিল। থানার সাহেব আমাকে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমি কোন উত্তর করিলাম না। আমাকে গারদে কয়েদ করিয়া রাখা হইল!

গারদে আমি বসিয়া আছি এমন সময়ে বাহিরে নিয়োগীর গলার শব্দ পাইলাম। নিয়োগীর সহিত পুলিশের যে কথাবার্তা হইল তাহাতে আমি বুঝিলাম যে মিহিরকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিবার ঘোষণা ছিল। নিয়োগী সেই পুরস্কারের প্রার্থনা করিলেন। পুলিসের লোক বলিল, 'রও! আগে ইহার মোকদ্দমা হউক, তাহার পর তুমি সে পুরস্কার পাইবে।' সেই কথা শুনিয়া নিয়োগী মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

পুলিশের লোক পরদিন আমাকে আর-একজন সাহেবের নিকট লইয়া গেল। সাহেবও আমাকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কিন্তু একটি কথাও মুখ দিয়া বাহির করিলাম না।

হুগলীতে সেই খুন হইয়াছিল। আমাকে হুগলীতে লইয়া গিয়া সে স্থানের পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত সাহেব আজ্ঞা করিলেন। দুইজন পুলিশের লোক আমাকে হুগলীতে লইয়া চলিল। আমরা তিনজনে রেলগাড়ীতে গিয়া বসিলাম। আমার হাতে হাত কড়ি ছিল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে কৌশল করিয়া আমি সেই পরচুলের দাড়ি গোঁফ খুলিয়া চুপি-চুপি গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। পরক্ষণেই পুলিশের লোক আমার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে যে পরচুল, তাহা বোধ হয় তাহারা জানিত না। তাহারা বলিল, 'তুই একজন পাকা বদমায়েস!'

যথাসময়ে আমরা হুগলীর থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। কলকাতা পুলিশের লোক হুগলী পুলিশের হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। হুগলী থানার একজন কর্মচারী মিহিরকে জানিত। সে তখন থানায় উপস্থিত ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে আসিয়া আমাকে দেখিয়া বলিল, 'মিহির পাল! এ কেন মিহির পাল হইবে?'

এই কথা শুনিয়া থানার দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে তুমি কে?'

এইবার আমার মুখ দিয়া কথা ফুটিল। আমি বলিলাম, 'আমি মদন ঘোষ।'

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মদন ঘোষ আবার কে?'

নাম ধাম প্রভৃতি বলিয়া আমি আমার সমুদয় পরিচয় প্রদান করিলাম। তাহা শুনিয়া উপস্থিত সকল লোকই ঘোরতর বিস্মিত হইল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কলিকাতা পুলিশ তোমাকে ধরিয়া আনিল কেন? আর মিহির বলিয়া তোমাকে এ স্থানে দিয়া গেল কেন?'

আমি উত্তর করিলাম,'পাল মহাশয় ও আমি এক বাটিতে বাস করি। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব আছে। তামাসা-ছলে রাক্ষসের মত মুখোস পরিয়া পরিবারবর্গকে আমি ভয় দেখাইতে গিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় কলিকাতা পুলিশের লোক আমাকে মিহির মনে করিয়া ধৃত করিল।'

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কলিকাতার থানায় তুমি আপনার পরিচয় প্রদান কর নাই কেন?'

আমি বলিলাম, 'ভয়ে আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম।'

যাহা হউক, হুগলীর পুলিশের লোক আমাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল না। সে স্থানের সাহেবের নিকট আমাকে লইয়া গেল। আরও দুই দিন ধরিয়া ভালরূপে তদন্ত করিল। হুগলীর যে সমুদয় লোক মিহিরকে জানিত তাহাদিগকে আনিয়া আমাকে দেখাইল। পাল মহাশয়ের গ্রামের কয়েকজন লোককে আনিয়া আমাকে দেখাইল যখন সকলেই বলিল যে আমি মিহির নই, তখন আমাকে ছাড়িয়া দিল।

তিন দিন পরে অপরাহ্নে আমি আমার কলিকাতার বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পাল মহাশয় এখানে নেই। যে রাত্রিতে তাঁহার পুত্র ধরা পড়িল, সেই রাত্রিতেই সপরিবারে তিনি এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পুত্রের মোকদ্দমার তদ্বির করিবার নিমিত্ত তিনি বোধ হয় হুগলী গিয়াছেন।

পাল মহাশয় কোথায় গিয়াছেন, বিছানায় শুইয়া সেই কথা ভাবিতে লাগিলাম।

কয়দিন অনুপস্থিতির পর আমি অফিস যাইলাম। অফিস হইতে আসিয়া বাসার সকলকে আমি পাল মহাশয়ের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম ; কিন্তু কেহই আমাকে বলিতে পারিল না। রবিবার দিন আমি পুনরায় হুগলীতে গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম। সে অনুসন্ধান নিস্ফল হইল। তাহার পর আর একদিন রবিবার তাঁহার গ্রামে গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান লইলাম। কিন্তু সে গ্রামেও কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে বহুদিন ধরিয়া ক্রমাগত আমি তাঁহার অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে হতাশ হইয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

একদিন বেলা নয়টার সময় আমি অফিস যাইতেছি, এমন সময় বেচু আমাকে তাহার নিকট ডাকিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না।

বেচু আমাকে বলিল, 'মদনবাবু। আপনাকে আমি একটি বড় গোপন কথা বলিব। সেই কথা বলিবার নিমিত্ত আজ কয়দিন ধরিয়া আমি সুযোগ খুঁজিতেছি ; কিন্তু পিতার ভয়ে আমি বলিতে পারি নাই। আজ পিতা আমাদের গ্রামে গিয়াছেন। সেইজন্য আপনাকে ডাকিলাম।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী কথা?'

বেচু বলিল, 'যে কথা বলিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে ডাকিয়াছি, বড় বিষম সে কথা। কী করিয়া আপনাকে বলিব, তাই ভাবিতেছি। আজ এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ঘোর অনুতাপিত হৃদয়ে আমি ঈশ্বরকে ডাকিতেছি। যখন সেদিন মিহিরের আগমন-সংবাদ পিতা পুলিশকে দিতে গেলেন, সেদিন মরিতে মরিতে অতি কষ্টে আমি পাল মহাশয়কে গিয়া সাবধান করিলাম। মিহিরের আমি সর্বনাশ করিয়াছি। আমি ভাবিলাম যে, নিরপরাধ মিহিরকে যে আমার সাক্ষাতে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, তাহা আমি দেখিতে পারিব না।'

বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মিহিরের আপনি সর্বনাশ করিয়াছেন? মিহিরের আপনি কী করিয়াছেন?'

নিয়োগী-পুত্র বলিল, 'যে খুনের জন্য মিহির পথে পথে ফিরিতেছে, যে খুনের জন্য তাহার ফাঁসি হইবার সম্ভাবনা, খুন সে করে নাই, সে খুন আমি করিয়াছি।'

আমি বলিলাম, 'কী!!! সত্য?'

নিয়োগী-পুত্র উত্তর করিল, 'সম্পূর্ণ সত্য। মিহির, আমি আর সেই ছোকরা,—তাঁহার নাম বেণী,—আরও তিন চার জন, হুগলীতে এক বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িতাম। সকলেই আমরা এক জাতি। আমরা সকলে পরস্পরের কুটুম্ব ও পরিচিত। মিহির ও বেণী এক ঘরে থাকিত। পাল মহাশয়ের সহিত বেণীর পিতার ভূমি সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়। কিন্তু তাহাতে মিহির ও বেণীতে যে সদ্ভাব ছিল, তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পরীক্ষায় টাকা ও অন্যান্য খরচের নিমিত্ত বেণীর পিতা একশত টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমার সাক্ষাতে বেণী সেই টাকাগুলি বিছানায় আপনার শিয়রদেশে বালিশের নিম্নে রাখিয়া দিল। আমার পিতা ধনবান ব্যক্তি নহেন। খরচের টানাটানি আমার সর্বদাই থাকিত। সেই টাকাগুলি দেখিয়া আমার লোভ হইল। দৈবের লিখন কেহ খণ্ডাইতে পারে না। সেইদিন রাত্রি দুইটা কি তিনটার সময় সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইয়া আমি বিছানায় শুইয়া আছি, এমন সময় মিহির ও বেণী যে ঘরে থাকে সে ঘরের দ্বার খুলিবার শব্দ হইল। বিছানা হইতে উঠিয়া আমিও আস্তে আস্তে আমার ঘরের দ্বার খুলিলাম। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, গাড়ু হাতে লইয়া মিহির বাহিরে গেল। আমি ভাবিলাম, উত্তম সুবিধা হইয়াছে। দেখি, বেণীর বালিশের নিচে হইতে নোটগুলি লইতে পারি কি না। এই মনে করিয়া আমি আস্তে আস্তে তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। যাহা হউক, নিঃশব্দে বেণীর বিছানার নিকট গিয়া আমি নোটগুলি লইতে পারিলাম। নোট লইয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছি, আর বেণী সেই সময় জাগিয়া উঠিল।—চোর! চোর!! এই কথা বলিয়া আমাকে সে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিল।'

এতদূর বলিয়া বেচু আর বলিতে পারিল না। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া অতি দ্রুতভাবে সম্পন্ন হইতে লাগিল। 'জল!' এই কথা বলিয়া সে আমাকে গেলাস দেখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি জলের গেলাস লইয়া আমি তাহার মুখে ধরিলাম।

জলপান করিয়া বেচু কিছু সুস্থ হইল। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সে বলিতে আরম্ভ করিল—

'আমাকে ধরিয়া চোর বলিয়া বেণী পুনরায় চিৎকার করিতে উদ্যত হইল। আমি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম ও সেখান হইতে পলায়ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বেণী আমাকে সহজে ছাড়িল না। সেই ঘরের দেওয়ালের নিকট সামান্য একটি মেঝে ছিল। তাহার উপর বেণী ও মিহিরের পুস্তক, কাগজ-কলম ইত্যাদি থাকিত। মিহিরের বড় একখানি ছুরি ছিল। ছুরিখানি সর্বদাই এই মেঝের উপর পড়িয়া থাকিত। অন্ধকারে বেণীর সহিত জড়াজড়ি করিতে করিতে ক্রমে আমি সেই মেঝের উপর গিয়া পড়িলাম। দৈবের ঘটনা! আমার দক্ষিণ হাতটি মেঝস্থিত ঠিক সেই ছুরির উপর পড়িল। তখনও বেণী আমাকে সবলে ধরিয়া ছিল। তাহাকে যে খুন করিব সে ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু কোনরূপে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া আমি সেই ছুরি তাহার বুকে মারিয়া বসিলাম।—বাপ! বলিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। আমি পলায়ন করিয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিলাম। হায় হায়! এক মিনিট পূর্বে আমি একজন সাধু, সচ্চরিত্রবান যুবক ছিলাম, এক মিনিটের মধ্যে আমি চোর, খুনে, নরপিশাচ হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে মিহির ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলাম যে বেণী মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহাতে তুলিতে গিয়া মিহিরের শরীর ও কাপড় রক্তে আরক্ত হইয়া গিয়াছে ও সেই স্থানে মিহিরের ছুরি পড়িয়া আছে। ইহা ব্যতীত সেইদিন বৈকালবেলা বেণী ও মিহিরের কিছু বচসা হইয়াছিল আমি মনে করিলাম, ভাল হইয়াছে। এ দোষ সম্পূর্ণরূপে মিহিরের উপর আরোপিত হইতে পারিবে, আর তাহা হইলে আমাকে কেহ সন্দেহ করিবে না। এইরূপ ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবার নিমিত্ত মিহিরকে আমি পরামর্শ দিলাম। মিহির সে সময় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে আমার কথা-মত কার্য করিল। আমার একখানা কাপড় পরিধান করিয়া সে পলায়ন করিল। তাহার পলায়ন, তাহার পরিত্যক্ত রক্তাক্ত কাপড়, তাহার রক্তাক্ত ছুরি, পূর্বদিন বেণীর সহিত তাহার বিবাদ, এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া পুলিশ তাহাকেই দোষী বলিয়া স্থির করিল, অন্য কাহাকেও সন্দেহ করিল না। সে খুনের প্রকৃত বিবরণ এই আমি আপনাকে বলিলাম।'

আমার অফিস-গমন ঘুরিয়া গেল। বেচুকে আমি বলিলাম, 'এ রোগে আপনার মৃত্যু নিশ্চয়, তাহার অধিক বিলম্বও নাই। আজ হউক, কাল হউক, পরশু হউক, শীঘ্রই আপনাকে ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইতে হইবে। নিজের এরূপ গুরুতর অপরাধ অন্যের ঘাড়ে দিয়া কোন্ মুখে আপনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এ সকল কথা কেবল আমাকে বলিলে হইবে না।'

বেচু জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে আর কী করিতে বলেন?'

আমি উত্তর করিলাম, 'এ সকল কথা আপনাকে পুলিশের নিকট বলিতে হইবে।'

বেচু বলিল, 'তবে শীঘ্র পুলিশের লোককে আপনি ডাকিয়া আনুন। আমার পিতা প্রত্যাগমন করিতে না করিতে আপনি এ কাজ করুন। আমি যে বেণীকে খুন করিয়াছি, তাহা তিনি জানেন না ; এ কথা শুনিলে তিনি আমাকে কিছুতেই বলিতে দিবেন না।'

আমি তৎক্ষণাৎ থানায় দৌড়িয়া যাইলাম। থানার লোক আসিয়া নিয়োগী পুত্রের সমুদয় বিবরণ লিখিয়া লইল। তাহার পর পুলিসের কর্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

'বেণীর নিকট হইতে যে নোট তুমি লইয়াছিলে, তাহা কি তুমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছ?'

নিয়োগী-পুত্র উত্তর করিল, 'একখানি পঞ্চাশ টাকার ও পাঁচখানি দশ টাকার নোট ছিল। দশ টাকার পাঁচখানি ভাঙাইয়া আমি খরচ করিয়াছি ; কিন্তু পঞ্চাশ টাকার নোটখানি নম্বরী বলিয়া তাহা ভাঙাইতে আমি সাহস করি নাই। সে নোট এখনও আমার নিকট আছে।'

এই বলিয়া বেচু তাহার তোরঙ্গের চাবি আমাকে দিল ও যে কোণে নোটখানি ছিল তাহা আমাকে বলিয়া দিল। নোটখানি বাহির করিয়া আমি পুলিশের হাতে দিলাম। ইহার কিছুদিন পরে নম্বর দেখিয়া প্রমাণ হইল যে, ইহা বেণীর পিতার প্রেরিত সেই নোট বটে।

পুলিশ বেচুকে থানায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। আমি ও বেচু দুইজনেই আপত্তি করিলাম। কিন্তু পুলিশ সে কথা শুনিল না। পাল্‌কি করিয়া বেচুকে তাহারা লইয়া চলিল। দুধ, জল, ঔষধ প্রভৃতি লইয়া আমিও সঙ্গে চলিলাম। থানা হইতে পুলিশ তাহাকে আদালতে লইয়া গেল। সাহেবের নিকট পুনরায় তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রদান করিতে হইল। সাহেব তাহাকে জেলখানার হাসপাতালে পাঠাইতে আদেশ করিলেন। নিজের খরচে আমি উকিল দিয়া জামিনের প্রার্থনা করিলাম ; কিন্তু সে খুনী আসামী, জামিন হইল না।

এক স্থান হইতে অন্যস্থানে নাড়া-চাড়া, তাহার উপর ঘোরতর মনের আবেগ, এই সমুদয় কারণে আমি দেখিলাম যে, বেচুর অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইয়া আসিতেছে। অপরাহ্নে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বৈলক্ষণ্য ঘটিল। এ অবস্থায় জেলখানায় তাহাকে গাড়ি করিয়া লইয়া যাইতে পুলিশ সাহস করিল না। পাল্‌কিতে আস্তে আস্তে তাহাকে লইয়া চলিল। দুইজন পুলিশ-কর্মচারী সঙ্গে চলিল। পাল্‌কির উপর হাত রাখিয়া, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, রোগীর মুখের দিকে সতত দৃষ্টি রাখিয়া আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। গড়ের মাঠে গিয়া রোগীর চক্ষুর ভাব দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। এক নিভৃত বৃক্ষতলে আমি পাল্‌কি নামাইতে বলিলাম। তাহার পর ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে বেচুর আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহার মুখে বিন্দু-বিন্দু জল দিয়া ধীরে ধীরে ভগবানের নাম করিতে লাগিলাম।

এবার আমার পানে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বেচু এই কয়টি কথা বলিল, 'মদনবাবু! আমি চলিলাম। রাধারানীকে আপনি বিবাহ করিবেন। আপনি সংসারী হইবেন।'

তাহার প্রাণবায়ু অন্তর্হিত হইল। আমি কাঁদিতে লাগিলাম।

বেহারাগণ তাহার মৃতদেহ জেলখানায় লইয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইলাম। আমি মনে করিলাম যে মৃতদেহ দিবার অনুমতি হইলে আমি লোক ডাকিয়া আনিব। এইরূপ মনে করিয়া আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে নিয়োগী মহাশয় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসায় পৌঁছিয়া তিনি সমুদয় ঘটনা শুনিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি থানায় ও থানা হইতে আদালতে গিয়াছিলেন। আদালত হইতে এইস্থানে উপস্থিত হইলেন।

পাল মহাশয়ের ও তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধানে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার সহিত

যাহাদের আলাপ পরিচয় ছিল, একে-একে সকলকে তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান আমাকে বলিয়া দিতে পারিল না। মিহির নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, আর লুক্কায়িত থাকিবার আবশ্যক নাই, এই মর্মে দুইখানি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম। তাহাতেও কোন ফল হইল না। কিন্তু তাঁহাদের সহিত পুনরায় যে আমার দেখা হইবে ; সে বিষয়ে আমি হতাশ হইলাম না ; কারণ পাল মহাশয় সম্পত্তিশালী লোক, একদিন না একদিন তাঁহাকে দেশে আসিতেই হইবে। তাহা ব্যতীত, কলিকাতার বাসা তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। কলিকাতার সেই তিনটি ঘরে তাঁহার জিনিস পত্র আছে। তাহাতে চাবি দিয়া গিয়াছেন। একদিন না একদিন কেহ সে দ্রব্যাদি লইতে আসিবে। এই প্রত্যাশায় আমি দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম।

এইরূপে আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। ভাদ্র মাস পড়িল। সে বৎসর দারুণ বর্ষা হইয়াছিল। পথঘাট জলে জলময় ও কাদায় কর্দমময় হইয়াছিল। একদিন অপরাহ্ন চারিটার সময় অফিসে বসিয়া কাজ করিতেছি, এমন সময় এক উৎকলবাসী আমাকে একখানি চিঠি আনিয়া দিল। সে পত্রে কেবল এই কয়টি কথা লেখা ছিল, 'অনুগ্রহ করিয়া অতি গোপনে এই লোকের সহিত শীঘ্র আসিবেন। আসিলে আসল কথা জানিতে পারিবেন।'

পাল মহাশয় ও মিহিরের জন্য সর্বদাই আমার মন উদ্বিগ্ন ছিল। চিঠিখানি পাইবামাত্র আমার মনে হইল যে এইবার বোধহয় তাঁহাদের সন্ধান পাইলাম। কালবিলম্ব না করিয়া আমি সেই লোকের সহিত চলিলাম। কলিকাতার যে অংশে অতি ঘন বসতি, উড়িয়া আমাকে সেই স্থানে লইয়া গেল। সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর সঙ্কীর্ণতর গলি, তাহার ভিতর একখানি খোলার বাড়িতে আমি প্রবেশ করিলাম। অতি কুৎসিত স্থান, দুর্গন্ধে নাড়ি উঠিয়া যায়। চারিদিক কাদায় ময়লায় পরিপূর্ণ। সেই বাটিতে অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র একখানি ঘর উড়িয়া আমাকে দেখাইয়া দিল। ঘরের মেঝে নিতান্ত আর্দ্র, যেন জল সপ-সপ করিতেছিল। আমি দেখিলাম যে সেই ভিজা মেঝেতে সামান্য একটি মাদুরের উপর গেরুয়া পরিচ্ছদ পরিহিত এক যুবক পড়িয়া আছে। 'কে ও, মিহির?' এই কথা বলিয়া আমি তাহার নিকট গিয়া বসিলাম।

মিহির আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। চিনতে পারিলাম বটে, কিন্তু সে মিহির আর নাই ; তাহার দেহ অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে ; তাহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম যে শরীর হইতে অগ্নির ন্যায় উত্তাপ বাহির হইতেছে মাঝে মাঝে অতি কষ্টের সহিত সে কাশিতেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সাধন করিতেও যেন তাহার বড় ক্লেশ হইতেছে। আমি পুনরায় বলিলাম, 'মিহির!'

মিহির মৃদুস্বরে বলিল, 'চুপ চুপ! আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, কেহ শুনিতে পাইলে এখনি আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে!'

আমি বলিলাম, 'তবে তুমি এখনও সে কথা জান না? মিহির। সে ভয় আর কিছুমাত্র নাই! তুমি যে নিরপরাধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বেণীকে নিয়োগীপুত্র খুন করিয়াছিল, পুলিশের কাছে ও আদালতে সাহেবের কাছে সে তাহা স্বীকার করিয়াছে। তোমার আর কোন ভয় নাই।'

এই কথা শুনিয়া মিহির বলিল, 'আমাকে তুলিয়া বসাও। আমি উঠিতে পারি না।'

আমি মিহিরকে তুলিয়া বসাইলাম। আমার স্কন্ধে মাথা ও বক্ষস্থলে আপনার শরীর রাখিয়া সে বসিয়া রহিল। তাহার পর বেচুর আদ্যোপান্ত বিবরণ বার-বার সে আমার মুখ হইতে শুনিল। সেই বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহার রোগ ও যাতনার যেন অনেকটা উপশম হইল, আর তাহার শরীরে যেন একটু বল হইল।

তাহার পর আমি তাহাকে বলিলাম, 'মিহির! ভাই! তোমাকে আর ক্ষণকালের জন্য আমি এ স্থানে রাখিতে পারি না। এ স্থানে সহজে মানুষ মরিয়া যায়। তুমি ভয়ানক জ্বর ভোগ করিতেছ। বুকেও বোধহয় কিছু রোগ হইয়া থাকিবে। অতএব তোমাকে আমি আমার বাসায় লইয়া যাইব।'

মিহির উত্তর করিল, 'কী করিয়া তাহা হইবে! আমার হাতে একটিও পয়সা নাই। এই সন্ন্যাসীবেশে বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া, আজ দশ দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই আমি শ্যামবাজারে গদাধর মোড়লের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার পরদিন হইতে এই বিষম জ্বর দ্বারা আমি আক্রান্ত হইয়াছি। সেই অবধি বিছানায় পড়িয়া আছি ;—না ঔষধ, না পথ্য। গাড়িতে যাইতে পারিব না, পাল্‌কি করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু গাড়ি কি পাল্‌কি ভাড়া কোথায় পাইব যে তোমার সহিত তোমার বাসায় যাইব? তবে, তুমি যদি গদাধর মোড়লের নিকট একবার যাইতে পার, তাহা হইলে হয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গদাধর মোড়ল কে?'

মিহির উত্তর করিল, 'তিনি বাবার বন্ধু, আমাদের স্বজাতি। কলিকাতায় তিনি ব্যবসা করেন। শ্যামবাজারে তাঁহার বাসা। তোমার সহায়তায় যে রাত্রে আমি পুলিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই, সেইদিন বাবার নিকট যাহা কিছু নগদ টাকা ছিল তাহা তিনি আমাকে প্রদান করিয়া বলিলেন,—এ টাকা ফুরাইয়া গেলে তুমি গদাধর মোড়লের নিকট যাইবে, যখন যাহা আবশ্যক হইবে গদাধর তোমাকে দিবে। আমাকে কদাচ তুমি পত্র লিখিবে না। কারণ সেই পত্রের অনুসরণে পুলিশ তোমার সন্ধান পাইতে পারে।'

আমি বলিলাম, 'গদাধর মোড়ল বোধহয় তোমার পিতার ঠিকানা জানেন?'

মিহির উত্তর করিল, 'বোধহয় কেন? পিতার ঠিকানা তিনি নিশ্চয় জানেন।'

মিহিরকে আমি আমার বাসায় লইয়া যাইলাম! পরিষ্কৃত শুভ্র বসন পরাইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত বিছানায় শয়ন করাইলাম। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিয়া তাহাকে দেখাইলাম। ডাক্তার বলিলেন যে, 'মিহিরের পীড়া বড় কঠিন হইয়াছে। তাহার বক্ষস্থলের দুইদিকেই প্রদাহ হইয়াছে।' যাহা হউক, তাহার ঔষধ ও পথ্যের আয়োজন করিয়া আমি সেই রাত্রিতেই গদাধর মোড়লের অনুসন্ধানে গমন করিলাম।

ভয়ঙ্কর ভাড়াটে ও পরাশর বর্মা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাড়ি খুঁজে বের করে ভিতরে গিয়ে বসতে না বসতেই প্রথম কবিতার খাতার চাপে দম বন্ধ হবার জোগাড়। একটি দুটি নয়, পাঁচ-পাঁচটি মোটা বাঁধানো খাতা, আর প্রত্যেকটি খাতা আগাগোড়া কবিতায় ঠাসা।

প্রথম খাতা খুলে প্রথম কবিতা পড়েই চক্ষুস্থির!

কবিতাটির নমুনা ঃ

যদি বল, মাঝরাতে ঘুম যেই ভেঙে যায়
ছটফট কর শুধু বিছানায়
আমি বলি ভাব্ না কী?
ঘুম যদি নাহি আসে–
ছাদে গিয়ে দাঁড়াও না খাড়া পায়।
দেখবে শহর ঘুমে মগ্ন।
দূরে কোথা গাড়ি চলে যাচ্ছে

ঠিক যেন মাঝে মাঝে
চিত হয়ে শুতে গিয়ে ঘড়-ঘড় নাক তার ডাকছে।
বিছানায় নিঃসাড়ে ছারপোকা মশারা
যেভাবে কামড় দিতে ব্যস্ত
চোর, বাটপাড় আর বদমাশ যেথা যত--
কোথা নেই কেউ অলস তো।
আহা কিবা মনোহর
তারাদের ঝিকমিক
মনে হয় আকাশেতে কারা করে পিকনিক।
আমি তাই বলি মিছে
যেয়ো নাকো ঘাবড়িয়া
মাঝে মাঝে মন্দ কী?
হলে ইনসোমনিয়া!

কবিতাটি শেষ করে খাতা থেকে মুখে তোলার আগেই লেখকের সলজ্জ মন্তব্য শোনা গেল, 'আমি একটু আধুনিক ধরনের শিখি, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

যাঁরা এ লেখা পড়ছেন, তাঁরাও এতক্ষণে বোধহয় বুঝেছেন যে, এ কবিতার লেখক পরাশর বর্মা ছাড়া আর কেউ নয়। নিজের গরজে তাঁরই বাড়ি খুঁজে আজ সকালে এসে পৌঁছবামাত্র তিনি আনন্দে এমন গদগদ যে আসল কথাটা বলবার এখনও সময় পাই নি।

খিদিরপুরের একটি গলির ভিতর বাড়ি। দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তেই হঠাৎ একেবারে কানের কাছে ভারি গলায়—'কাকে চান?' শুনে চমকিয়ে উঠেছি।

কাছে-পিঠে তো কেউ নেই!

এই অশরীরী ধাক্কাতেই মুখ থেকে আপনা হতে বেরিয়ে গেছে, 'আজ্ঞে পরাশর বর্মাকে!'

'নাম বলুন আপনার।' আবার সেই ভুতুড়ে আওয়াজ।

নামটা বলার পরই দরজাটা যেন মন্ত্রবলে খুলে গেছে। কিন্তু ওধারেও তো কেউ নেই।

সত্যিই ঢুকব, না এইখান থেকে সরে পড়ব ভাবছি, এমন সময় ভিতরের ঘর থেকে স্বয়ং পরাশর বর্মাই বেরিয়ে এসেছেন।

'আরে, আসুন, আসুন। আমার কী সৌভাগ্য।' পরাশর বর্মার কণ্ঠে সাদর অভ্যর্থনা।

ভুতুড়ে আওয়াজের অস্বস্তিটা তখনও কাটাতে পারি নি। সন্দিগ্ধভাবে পেছনে একবার তাকিয়ে তাঁর পিছু পিছু ভিতরের ঘরে গিয়ে ঢোকবার পথে জিজ্ঞাসা করেছি, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো? এসব ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার মানে কী?'

'ভুতুড়ে!' প্রথমে একটু অবাক হয়ে পরাশর বর্মা হেসে উঠছেন। 'আরে না ভুতুড়ে হবে কেন? চাকর-বাকর পাওয়া আজকাল কিরকম শক্ত জানেন তো, তাই একটু—' বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার পরিচয় তাঁর বাড়িতে তারপর আরও অনেক পেয়েছি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আজ থাক।

সেখানে তারপর ঢুকেছি, সাদাসিধেভাবে সাজানো সেটি সাধারণ বসবার ঘর। শুধু চেয়ার টেবিলের বদলে দেশী ধরনের নিচু গদি দেওয়া বসবার আসন।

তার একটিতে বসতে-না-বসতেই আক্রমণ শুরু হয়েছে। পরাশর বর্মা এই ঘরে বসেই বোধহয় কাব্য-চর্চা করছিলেন। ঘরটার চারদিকে আমার চোখ বোলানো শেষ হতে না হতেই দেখি, সামনে বাঁধানো খাতাগুলি উপস্থিত।

পরাশর প্রথম খাতাটি তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনি নিজে থেকে আমার খোঁজ করতে আসবেন ভাবতেই পারি নি। কিন্তু এসেছেন যখন, তখন আপনাকে সব না পড়িয়ে ছাড়ছি না। কী খাবেন বলুন, চা, না কফি?'

বিমূঢ়ভাবে খাতাগুলির দিকে চেয়ে চা, না কফি সায় দিয়েছি মনে নেই।

ভদ্রতার খাতিরে প্রথম খাতাটা হাতেও তুলে নিতে হয়েছে। তারপর নামাবার অবসর আর পাইনি।

একেবারে কবিতার শিলাবৃষ্টি সমানে চলেছে।

প্রথমটির নমুনা আগেই দিয়েছি। আরও একটি না তুলে দিয়ে পারছি না। পরাশর বর্মার এটি নাকি অত্যন্ত প্রিয় কবিতা। কবিতার নাম 'পকৌড়ি'। পকৌড়ি নিয়ে কোন সাহিত্যে আধ্যাত্মিক কবিতা অন্তত কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।

পকৌড়ি তুমি অতি তুচ্ছ,
আশা তব নয় মোটে উচ্চ।
কী তেলে যা ভাজা হও নাহি তব পরোয়া,
তবু তব স্বাদ কভু পায় নাকো ঘরোয়া।
তেলেভাজা বেসন কি ডালবাটা যাই হোক,
তুমিই সুলভতম রসনার সম্ভোগ।
ও স্বাদের রহস্য কি কোন মশলায়,
জানলে এ দুনিয়ার সব গোল মিটে যায়।
রাস্তার ধুলো সেকি, সকলের মাড়ানো?
ভেজাল তেলের গুণ, বার-বার পোড়ানো?
শুধু তাই নয়, আছে আরো বিশেষত্ব
জনগণ-মন দিয়ে খুঁজে সেই তত্ত্ব।

কবিতার স্রোতে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি, এমন সময় কফি এল। এবার আর ভৌতিক কায়দায় নয়, রক্তমাংসের চাকরের হাতে কাঠের ট্রের উপরে।

কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে একটু ফাঁক পেয়ে আসল কথাটা পাড়লাম, 'আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম পরাশরবাবু।'

'ঠিক আছে। তার জন্যে কিছু ভাববেন না। যে-কটা কবিতা আপনার পছন্দ হয়, সব আপনি নিয়ে যেতে পারেন।' বলে পরাশর বর্মা আবার কবিতা পড়বার উপক্রম করলেন।

সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, 'আজ্ঞে কবিতা, সে তো নেবই, কিন্তু তার আগে আমার কথাটা যদি একটু শোনেন। একটা রহস্যের কিনারা করতে আপনার সাহায্য চাই।'

'বেশ তো, বেশ তো! কী রহস্যটা বলেই ফেলুন না।' বলে পরাশর বর্মা ভরসা দিলেন।

কিন্তু ঐ ভরসা পর্যন্তই। তাঁর আর-একটি কবিতা তখন পড়া শুরু হয়ে গেছে।

উপায় নেই তাই ঐ কবিতার ফাঁকে-ফাঁকেই কোনরকমে ঘটনাগুলো তাঁকে জানালাম। তাঁর কানে কথাগুলো গেল কি না তাই সন্দেহ।

ফল যে কিছু হবে সে আশা তখন আর নেই। মনে মনে এই কাব্য-পাগলা মানুষটার কাছে রহস্যের মীমাংসা করতে আসাটাই আহম্মকি হয়েছে বলে নিজেকে এখন দোষ দিচ্ছি। কবে কি সামান্য একটা রহস্যের কিনারা করেছিল বলে তার বুদ্ধিশুদ্ধি সম্বন্ধে অত উঁচু ধারণা করাই অন্যায় হয়েছে মনে হচ্ছিল।

রহস্যের মীমাংসার আর দরকার নেই। এ লোকের হাত থেকে ছাড়া পেলেই এখন বাঁচি!

নিজের বক্তব্য শেষ হবার পর ভদ্রতার খাতিরে আরও ঘণ্টাখানেক কবিতা শুনে মাথা যখন ঝিম-ঝিম করছে, তখন একটু ফাঁক পেয়ে বললাম, 'আজ আবার একটু কাজ আছে পরাশরবাবু। তাই এখন না উঠলে নয়।'

বেশ একটু হতাশ হয়ে পরাশর বর্মা বললেন, 'এখুনি উঠবেন? কিন্তু সবে তো একটি খাতাই মোটে শেষ হয়েছে।'

সভয়ে অন্য খাতাগুলোর দিকে চেয়ে বললাম, 'একটা খাতাতেই যা পেলাম তাই আগে সামলাই দাঁড়ান। এত ভাল জিনিস সব একসঙ্গে হজম করতে পারব না যে।'

কথাটার মধ্যে বিদ্রুপের সুরটা খুব প্রচ্ছন্ন ছিল না। পরাশর বর্মা খুশি হয়েই বললেন, 'তা ঠিক বলেছেন, আবার একদিন শোনানো যাবে, কী বলেন?'

আমার উৎসাহের অভাবটা লক্ষ্য না করেই পরাশর বর্মা আবার বললেন, 'কিন্তু আপনার রহস্যের কিনারাটা তো করে ফেলতে হয়।'

এবার অসন্তোষটা গোপন না করেই বললাম, 'না থাক, তার আর দরকার নেই।'

পরাশর বর্মা এবারও উল্টো বুঝলেন। যেন প্রসন্ন হয়েই বললেন, 'ও নিজেই এর মধ্যে মীমাংসা করে ফেলাই অবশ্য উচিত। রহস্যটা এমন কিছু নয়।'

'এমন কিছু নয়!' রাগব না অবাক হব বুঝতে না পেরে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বললাম, 'রহস্যটা কী, না জেনেই বলছেন—এমন কিছু সেটা নয়?'

'বাঃ'—পরাশরই এবার যেন অবাক। 'রহস্যটা না জেনে কীরকম? আপনি এতক্ষণ ধরে বললেন কী তাহলে?'

'আমি তো বলেছি, কিন্তু আপনি তো নিজের কবিতা পড়তেই মত্ত। শুনেছেন আমার কথা কিছু?'

'শুনিনি মানে?' এবার পরাশর হাসলেন, 'আচ্ছা, আমিই তাহলে ব্যাপারটা বলি, আপনি মিলিয়ে নিন ঠিক হচ্ছে কি না! ব্যাপারটা সংক্ষেপে হল এই আপনাদের পাড়ায় একটি বাড়ি আছে। পুরানো ভাঙা বাড়ি, কিন্তু বছর দু-এক আগে এক অবাঙালী ভদ্রলোক সেটা কিনে মেরামত করিয়ে প্রায় নতুন করে তোলেন। ভদ্রলোকের নাম এস্ কাউল। তাঁর কোন কুলে কেউ আছে বলে আপনারা জানতে পারেন নি। ভদ্রলোক একাই বাড়িতে থাকতেন সঙ্গী শুধু একটি কুকুর। কাউল সাহেব খুব মিশুক লোক নয়।

পাড়ায় কারুর সঙ্গে বিশেষ আলাপ পরিচয় তাই তিনি করতেন না। তবে মাঝে মাঝে বাড়িতে জাঁকজমক করে উৎসব খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার হত। হোমরাচোমরা বড়লোক, ব্যবসাদার, কারখানার মালিকরাই সাধারণত আসতেন। বড়-বড় গাড়িতে রাস্তা ভর্তি হয়ে যেত। নাচ-গানের ব্যবস্থাও থাকত। আপনারাও কেউ-কেউ এইসব উৎসবের দু-একটিতে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। অত লোকের ভিড়ের মধ্যে কাউল সাহেবের সঙ্গে বিশেষ আলাপের সুযোগ হয় নি। কিন্তু তাঁর নিজের সাজগোজ থেকে তাঁর বাড়ির সবকিছু ব্যবস্থার মধ্যে তাঁর রুচির পরিচয়। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, বিশেষ করে রেশমি পাকা চুল দাড়ির ভিতর দিয়ে তাঁর মুখের সৌম্য প্রসন্নতা আপনাদের ভাল লেগেছে। কথা তাঁর মুখে কমই শুনেছেন। শুধু বাংলা বলতে পারতেন না বলে নয়, ভদ্রলোক কথাই বলতেন কম।

বাড়িটা তখনই আপনাদের অদ্ভুত লাগত।

উৎসব হয়ে যাবার পরদিন সকালেই আবার নিঝুম। মাঝে-মাঝে কুকুরের ডাক ছাড়া বহুকাল আর তারপর সেখানে কোন সাড়াশব্দই পাওয়া যেত না। মনে হত উৎসবটাই যেন শেষ স্বপ্ন। ওই ভুতুড়ে গোছের নির্জন বাড়ি যে একরাত্রে আলোয় ঝলমল মানুষ জনে গমগম করে উঠেছে, তখন বিশ্বাসই হতে চাইত না।

মাঝে মাঝে কাউল সাহেবকে বাড়ি থেকে বেরুতে কি ঢুকতে অবশ্য দেখা যেত। বাড়ির দরজার সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দরজায় তালা দিয়ে তিনি শুধু একটা ছড়ি হাতে ট্যাক্সিতে উঠে কোথায় যে যেতেন আপনারা জানেন না।'

পরাশর বর্মা একটু থামতেই সবিস্ময়ে বললাম, 'আশ্চর্য!'

পরাশর একটু হেসে বললেন, 'আশ্চর্যটা কী? সব কথাই আপনার শুনেছি, এই তো? দাঁড়ান আগে বাকি সবটা মেলে কি না দেখুন!'

পরাশর বলতে শুরু করলেন আমাকে থ বানিয়ে, 'শেয়ার মার্কেট বা ঐরকম কোনও জায়গায় যে তিনি যেতেন এইটে আপনারা অনুমান করতেন মাত্র। এ নিয়ে বিশেষ মাথা কেউ ঘামায়নি। দরকারও হয়নি। একদিন শুধু পাড়ার ছেলেরা ঐ বাইরের দরজাতেই সরস্বতী পূজোর চাঁদার জন্যে তাঁকে ধরেছিল। তিনি কড়কড়ে একটি একশো টাকার নোট এতটুকু দ্বিধা না করে চাঁদা হিসেবে দিয়ে যথারীতি দরজায় তালা দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু একদিন হঠাৎ সেই যে দরজায় তালা দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেছেন আর ফেরেন নি। তাঁকে বাড়ি থেকে বেরুতে অবশ্য কেউ দেখেননি। কিন্তু পরপর কয়েকদিন দরজার সামনে তালা ঝুলতে দেখে আপনাদের কেমন আশ্চর্য লেগেছে।

কাউল সাহেব গেলেন কোথায়?

দিনের বেলায় যে যার নিজের ধান্দায় থাকেন, অত খেয়াল থাকে না। কিন্তু রাত্রে সেই বাড়ির থেকে কুকুরের ডাক শুনে হঠাৎ মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে। কাউল সাহেবের হল কী?

দিন-কয়েক এমনি কাটাবার পর পাড়ার অনেকেই একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু করবার তো কিছু নেই। তালা ভেঙে পরের বাড়িতে তো ঢোকা যায় না। যা রাগী কুকুর, সেটা নিরাপদও হবে না। আর পুলিশ খবর দিবার মত কিছু হয়েছে কি না তখন

তাও বুঝতে পারছেন না।

একটা কিছু করা দরকার আপনাদের মনে হল। আপনাদের ছাড়া আরও অনেকের যে তা হয়েছে, পরের দিন বুঝতে পারলেন। ছুটির দিন। পরের পর বড়-বড় মোটর আসে আর দরজায় তালা দেখে হতাশ হয়ে চলে যায়। কেউ-কেউ আপনাদের কাছে খোঁজ খবরও নিলে। আপনারা কী আর জানেন যে বলবেন। আপনারাই বরং শুনে অবাক হলেন যে যারা এসেছে তাদের অধিকাংশই পাওনাদার। শুনলেন অনেকেই নাকি কাউল সাহেবের কাছে অনেক টাকা পায়। ফাটকা বাজারে কাউল সাহেব নাকি বড় দাঁও মারতে গিয়েই কাত হয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। পাওনাদাররা নাকি একজোট হয়ে তাঁর বাড়িটা নিলামে তোলবার ব্যবস্থা করছেন। এও কদিন বাদে শুনলেন।

কিন্তু বাড়ি নিলামে আর উঠল না। কাউল সাহেব উধাও হবার হপ্তাখানেক বাদেই একদিন দেখেন, বাড়ির বাইরের দরজার তালা খোলা। ভিতরে মিস্ত্রি লেগেছে, আবার বাড়ির মেরামত আর চুনকাম করতে।

ব্যাপার কী? কে এলেন আবার এ বাড়িতে?

আপনাদের কৌতূহলী হয়ে বেশিক্ষণ থাকতে হল না। বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে না যেতে বাড়ির নতুন মালিক নিজেই গায়ে পড়া হয়ে এসে আলাপ করলেন আপনাদের সঙ্গে। মনে হল বেশ মিশুক। খালি গায়ে ধবধবে পৈতের সঙ্গে কাঁধে গামছা ফেলা। পরনে আটহাতি খাটো ধুতি, পায়ে খড়ম। বেলের মত চাঁছাছোলা মাথা ভর্তি টাক, কামানো গোল মুখের সঙ্গে যেন মানানসই করে তৈরি। কথায় একটু রাঢ় দেশের টান। ভদ্রলোক নিজে থেকেই আলাপ পরিচয় করেছেন ও সারাক্ষণ নিজের কথাই বলেছেন। এসেছিলেন কিছু জানা যায় কি না চেষ্টা করে দেখতে। ভদ্রলোকের অনর্গল কথার তোড়ে দিশেহারা হয়ে মনে হয়েছে, ছাড়া পেলে বাঁচেন।

ভদ্রলোকের নাম বিশ্বম্ভর রায়। তাঁর সব কথাই শুনেছেন। কাউল সাহেবের তার সব পাওনাদারের মত তিনিও কেমন করে ফাঁকে পড়তে বসেছিলেন, নেহাত বরাতজোরে কী করে কাউল সাহেবের অন্তর্ধানের আগে তাঁর কাছ থেকে বাড়িটা নিজের নামে কিনে নিতে পেরেছেন, বাড়িটা পেয়েও এখনও কী গণ্ডগোল তাঁকে পোহাতে হচ্ছে, অন্য পাওনাদাররা সারাদিন কিভাবে এসে জ্বালাতন করছে, কেউ কেউ বাড়ি বিক্রি নাকচ করবার চেষ্টাও নাকি করছে—এইসব কাহিনীই তিনি বলে গেছেন।

কাউল সাহেবের উধাও হওয়া যত অদ্ভুতই হোক, দু চার দিন বাদে আপনারাও ব্যাপারটা প্রায় ভুলতে বসেছিলেন। এমন সময় আপনাদের পাড়ারই যে মিউনিসিপ্যাল পুকুরটায় ছেলেরা সাঁতার শেখে, তার তলা থেকে একটা ছড়ি একটি ছেলে ডুব দিতে গিয়ে তুলে এনেছে। সে ছড়িটা এমন কিছু আশ্চর্য জিনিস নয়, তবু আপনাদের দু একজনের মনে হয়েছে, ঠিক এইরকমই ছড়ি যেন কাউল সাহেবের হাতে আপনারা দেখেছেন। ব্যাপারটা এত সামান্য এ নিয়ে পুলিশে যাওয়া যায় না, অথচ মনের সন্দেহ দূর হয় না।

ক-জনে মিলে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রহস্যটা যেন গভীর হয়ে উঠেছে। আপনাদের মনে পড়েছে যে বিশ্বম্ভরবাবু কখন কবে যে তালা খুলে ও-বাড়িতে ঢুকেছেন আপনারা কেউই দেখেননি। সেটাও না হয় অগ্রাহ্য করা গেল, কিন্তু

বিশ্বম্ভরবাবুর চাল-চলনও কেমন অদ্ভুত মনে হয়েছে এবার। সেই প্রথম ক-দিন সকলের সঙ্গে মেলামেশার পর তিনি যেন ডুব মেরেছেন একেবারে। মিস্ত্রি মজুর বাড়িতে আর খাটছে না। তালা দেওয়া না হলেও দরজা বন্ধই থাকে বেশির ভাগ। রাত্রে মাঝে-মাঝে কুকুরের ডাক ছাড়া বাড়ি আগেকার মতই যেন নিস্তব্ধ।

এর মধ্যে পাড়ার একটি রাস্তায় এক রাত্রে কাউল সাহেবের সেই কুকুরটাকে একটি ছেলে নটার শো-র বায়োস্কোপ ভাঙবার পর বাড়ি ফেরবার পথে দেখতে পায়। বিশ্বম্ভরবাবুকেও নাকি গভীর রাত্রে কেউ-কেউ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নির্জন রাস্তায় হাঁটতে দেখেছে। তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে কিন্তু ফল হয়নি কিছু। তিনি যেন বুঝতে পেরে এদিক-ওদিক ঘুরে বাড়িতেই ফিরে এসেছেন।

সমস্ত ব্যাপারটা জড়িয়ে আপনাদের মনে একটা দারুণ সন্দেহ জট পাকিয়ে উঠেছে। কাউল সাহেব সত্যিই দেনার দায়ে পালিয়েছেন, না তাঁর অন্তর্ধান হওয়ার ব্যাপারে অন্য কোন রহস্য আছে? কাউল সাহেবের সঙ্গে বিশ্বম্ভরবাবুর সম্পর্কটা কী ও কতটা তা নিয়েও আপনাদের মনে সন্দেহ জেগেছে। শুধু নিজেদের মনের এই সন্দেহ নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়া এখুনি সঙ্গত হবে কি? ঠিক করতে না পেরে আমার কাছে এসেছেন। কেমন?'

উত্তর দেবার আগে বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে পরাশর বর্মার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন সমস্ত ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।'

'সাঙঘাতিক কিছু এর ভিতর থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে, তাই না?'

বাধ্য হয়ে স্বীকার করলাম যে আমাদের আশঙ্কা সেইরকম।

পরাশর বর্মা গম্ভীর হয়ে খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'যেমন কাউল সাহেব পালিয়ে যায় নি, তাকেই কেউ হয়ত সরিয়ে ফেলেছে—পুকুর থেকে ছড়িটা পেয়ে এইরকম অনুমানই হয়।'

উৎসাহিত হয়ে উঠে বললাম, 'আমরা ঠিক তাই ভেবেছি। শুধু ছড়িটা পাওয়া গেলেও লাসটা কেন পাওয়া যায় নি তাই বুঝতে পারছি না।'

'লাসটা তো বাড়ির ভিতরেই থাকতে পারে?' পরাশরের গলা অত্যন্ত গম্ভীর।

অবাক হয়ে বললাম, 'বাড়ির ভিতর? তাহলে?'

'তাহলে লাশ আর খুনে দুইই যাতে ধরা পড়ে তার ব্যবস্থা এখুনি করা দরকার।' বলে পরাশর পাশের ফোনটা তুলে নিলেন।

'ওকি ফোন করছেন কোথায়?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

ততক্ষণে ফোনের নম্বর ঘোরানো হয়ে গেছে।

'হ্যালো।' বলে পরাশর যাঁর নাম করলেন, তিনি যে পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের মস্ত বড় কর্মচারী তা জানি বলে আমি আরও অবাক।

বিমূঢ়ভাবে পরাশরের ফোনের আলাপ শুনতে লাগলাম।

'হ্যাঁ, আমি পরাশর। না না গদাধর না, পরাশর—হ্যাঁ, পরাশর বর্মা, কবি পরাশর বর্মা। না না, কবিতা শোনাতে ডাকছি না। ডাকছি তোমাদেরই একটু উপকার করতে। নিতাই মুস্তোফি স্ট্রীটের এস. কাউল সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল আছে কি? আছে? বেশ! তার

অন্তর্ধান-রহস্যের কিনারা করতে চাও? কাউল সাহেবকে কেউ সরিয়েছে সন্দেহ করছ? ভাল ভাল। আমাদের কৃত্তিবাসবাবুরও সেই মত। কৃত্তিবাসবাবু কে? চিনবে না ঠিক। সাহিত্যের খবর তো রাখ না, তিনি মস্তবড় এক কাগজের সম্পাদক। কবিতা শুনতে এসেছেন আমার বাড়িতে। যাক, এখন ওসব কথার সময় নেই। কাউল সাহেবের লাস পাচ্ছ না? পাবে লাস আর খুনী একসঙ্গেই। এখুনি চলে যাও মুস্তোফি স্ট্রীটে। বিশ্বম্ভরবাবুকে এখনও পেতে পার। ওয়ারেন্ট নিয়ে যাও সঙ্গে। একেবারে দেখামাত্র গ্রেফতার। হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রেফতার। প্রমাণ? প্রমাণ তিনি নিজেই। তাঁর অনেক কীর্তি ঘাঁটলে বেরুবে। হ্যাঁ, তিনিই লাস, তিনিই খুনী।'

ওধারে গোয়েন্দা-বিভাগের উচ্চ কর্মচারী, আর এধারে আমাকে সমানভাবে বিমূঢ় করে পরাশর বর্মা ফোনটা তৎক্ষণাৎ নামিয়ে রেখে দিলেন। বিস্ময়ের ধাক্কাটা একটু সামলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন নাকি? না, আপনাদের মধ্যে এরকম ঠাট্টা ইয়ার্কি চলে?'

'ঠাট্টা ইয়ার্কি!' পরাশর হাসলেন। 'পুলিশের লোকের সঙ্গে এমনি যত বন্ধুত্বই থাক, সকল ব্যাপারে ঠাট্টা ইয়ার্কি চলে না।'

'তার মানে? বিশ্বম্ভরবাবু কাউলের লাস আর খুনে—এ কথার মানে কী?'

'মানে যা বলেছি তাই। কাউল বলে কেউ নেই। বিশ্বম্ভর রায়ই কাউল সেজে দুনিয়াসুদ্ধ সকলকে ঠকিয়েছেন, এখন বিশ্বম্ভর হয়ে জাল গুটিয়ে আবার অন্য মৃগয়ায় যাবার তালে আছেন। তখন বাংলা বলতেন না, সাদা দাড়ি গোঁফ দিয়ে সৌম্য বিদেশী সেজে থাকতেন ; এখন আবার বাংলা চেহারাটা বের করেছেন। সকলকে ফাঁকি দেবেন বলেই যেখানে যা পেয়েছেন হাতিয়ে নিয়ে বাড়িটি নিজেকেই অন্য নামে বিক্রি করে গেছেন।'

'কিন্তু চোখে কিছু না দেখে শুধু আমার কাছে গল্প শুনে আপনি এ রহস্য বুঝলেন কী করে?'

'বুঝলাম কুকুরের ডাকে।'

'কুকুরের ডাকে।'

'হ্যাঁ, কুকুরের ডাকে। যুধিষ্ঠিরের বেলায় যম কুকুর সেজেছিলেন, আর বিশ্বম্ভরবাবুর বেলায় কুকুরই যম হল। কাউল সাহেব উধাও হবার পরও আপনারা বাড়িতে কুকুরের ডাক শুনেছেন। আপনিই বলেছেন, কুকুরটা হিংস্র। হিংস্র কুকুর হলে মনিব ছাড়া আর কারুর সঙ্গে এক বাড়িতে কিছুতেই থাকত না। সে যে বন্ধ থাকে কোনও ঘরে তাও নয়, কারণ একদিন তাকে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে একজন দেখেছেন। সেদিন কোনরকমে দরজা খোলা পেয়ে কুকুরটা বেরিয়েছিল, আর বিশ্বম্ভরবাবুও তাকে খুঁজতে নির্জন রাস্তায় রাত্রে বেরিয়েছিলেন। বিশ্বম্ভরবাবু সব ভোল পালটেছিলেন, শুধু কুকুরটার প্রতি মায়ায় তাকে কোথাও সরিয়ে দিতে কি মেরে ফেলতে পারেন নি। আশা করি এতক্ষণে পুলিশের গাড়ি রওনা হয়ে পড়েছে তাঁকে ধরতে।'

মুখ থেকে আপনা থেকে বেরিয়ে গেল, 'সত্যি কী বলে যে আপনার প্রশংসা করব ভেবে পাচ্ছি না।'

পরাশর বর্মা সলজ্জে একটু হেসে বললেন, 'তাহলে কোন কবিতাগুলো নেবেন?'

নবার ডাইরি

লীলা মজুমদার

তোমরা নিশ্চয় জান যে পৃথিবীর অধিকাংশ অদ্ভুত ঘটনা উত্তর কলকাতার একটা বিশেষ এলাকায় ঘটে থাকে। আমি কাউকে চটাতে চাই না বলে সাল তারিখ নাম নিবাসের বিষয়ে ধোঁয়া ধোঁয়া ভাসা ভাসা ভাবে ছাড়া বলছি না। তাও খানিকটা বদলে-সদলে। ঐ অঞ্চলে অজস্র পুরানো বাড়ি আর অস্বাভাবিক লোকজন আছে, যাদের নিয়ে এসব ঘটনা ঘটতে পারে। নিশ্চিত ঘটেছে, তাও বলছি না।

মোট কথা, এক রবিবার সকালে ঐ রকম একটা বাড়ির লাগোয়া ছোট মতো সাজানো সারানো নতুন বাড়ির একটা তলায়, বুড়ো ডাক্তার নীলু ভট্টাচার্য্যের খুদে বসবার ঘরে হুড়মুড় করে একটা আধাবয়সী ভদ্রলোক ঢুকে পড়ে, তাঁর হাঁটুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সব্বনাশ হয়েছে, ডাক্তারবাবু, আমি বোধ হয় ভুলে আমার নিজের মাস্তুতো ঠাকুমাকে বিয়ে করে ফেলেছি!'

ডাক্তারবাবু আঁৎকে উঠলেন, 'এ্যাঁ! এই বয়সে আবার একটা বিয়ে করলে কোন্ আক্কেলে, বদ্যিনাথ? তাও আবার মাস্তুতো ঠাকুমাকে! তোমার কি কোন বিবেচনা নেই?

কাজটা বেআইনী হয়েছে।'

বদ্যিনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'না, না আবার করিনি। পুরনো গিন্নিই বোধহয় আমার মাস্তুতো ঠাকুমা। একটা ওষুধ-পত্র দিন, ডাক্তারবাবু। লোকে বলে আপনি মরা মানুষ জিন্দা করে দিতে পারেন, আপনার কাছে এ সমস্যা কিচ্ছুই নয়। একটা পুরিয়া দিন। গিন্নিই বলেন, হোমিওপ্যাথিকে সব হয়।'

ডাক্তারবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'আহা, অত বাড়িও না, বদ্যিনাথ। এই পুরিয়াটা খালি পেটে খাও। তাছাড়া মাস্তুতো ঠাকুমাকে বিয়ে করলে কোন দোষ হয় না। তবু শুনি ব্যাপারটা, শুনে দরকার হলে আরেক পুরিয়া দেব। চা খাবে?'

বদ্যিনাথ বলল, 'ওষুধ খাওয়ার কথা ভাবলেও গা শিউরে উঠছে ডাক্তারবাবু! সব খুলে বলছি তা হলেই বুঝবেন। জানেন তো পার্কের পাশের ঐ পুরানো বাড়িটা গিন্নির পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। বিয়ের পর এই ত্রিশ বছর ধরে প্রায়ই ভেবেছি চিলে কোঠায় ওঁদের পাঁচ পুরুষের রাবিশ, ওটা একবার আগাগোড়া তাড়ু হাঁকড়াতে হবে। তা বদলির চাকরি, এত দিন সময় পাইনি। তার ওপর ধুলো ঘাঁটলে গিন্নি চটে যান। ওতেই নাকি হাঁপানি হয়। সে যাই হক, গিন্নি সইয়ের সঙ্গে পরশু কাশী গেছেন, সেই ফাঁকে কাল সারাদিন আমি ঐ চিলে কোঠার ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত সরু চিরুণী দিয়ে আঁচড়েছি। না আঁচড়ালেই হত।

দু তিন ঝুড়ি ইঁদুর আরশুলোর নাদি। পর্বতপ্রমাণ ভাঙা কাচের গাদা, পুরনো বই কাগজের আর ন্যাকড়ার স্তূপ। তাই বেচেই বামুনদিদি আজ বলছে সে-ও কাশী যাবে! এক টাঁই কাঁসা পেতলের বাসন। কালই সে সমস্ত পশুপতির দোকানে পাচার করেছি। নিকট ভবিষ্যতে আমারি হয়তো কিছু দরকার পড়তে পারে। আর পেয়েছি খেরো দিয়ে বাঁধানো মোটা একটা বিকট হিসাব খাতা। তার প্রথম পাতার ওপরে লেখা-টু দীনেশদা। তার তলায় লেখা, 'নবার ডাইরি'। খাতা খানাতে আগাগোড়া সবুজ কালিতে খুদে খুদে অক্ষরে যা লেখা আছে, সারা রাত ধরে—লোডশেডিং-এর সময়টুকু ছাড়া—তাই পড়ে আমি নিশি কাবার এবং মনের শান্তি নষ্ট করেছি।'

এই অবধি বলে বদ্যিনাথ পকেট থেকে মোটামতো একটা হিসাব খাতা বের করল। ঘরটা অমনি কেমন একটা ধুলো ধুলো ধুনো ধুনো গন্ধে ভরে গেল। হয়তো পোকার প্রকোপ থেকে বই বাঁচাবার জন্য কোনো ওষুধপত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকবে। খাতা দেখে নীলু ডাক্তার হঠাৎ সটাং হয়ে উঠে বসলেন। আশী পেরিয়ে অবধি তাঁর একটু ঠেস দিয়ে বসার এবং কথা বলার অভ্যাস হয়েছিল। কিন্তু খাতা হাতে নিয়ে, নেড়ে চেড়ে, আলোর কাছে ধরেও যখন সবুজ রঙের পিঁপড়ে অক্ষরের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলেন না, তখন ফোঁশ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বদ্যিনাথকে খাতা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'পঞ্চুটা একটা অপদার্থ! এ চশমা দিয়ে যদি কিছু পড়া যায়! তুমি বরং মমার্থটা সংক্ষেপে বল।'

বদ্যিনাথও তাই চাইছিল। একবার পড়েই ডাইরির বীভৎস কাহিনী তার মনে গেঁথে গেছিল। সে বলল, 'বুঝলেন ডাক্তারবাবু 'ডাইরি' পড়ে যদ্দুর বুঝলাম ঐ নবা ভশ্চায্যি ছিলেন গিন্নির বাপের বাড়ির পেটোয়া ডাক্তার। সব অসুখ-বিসুখে, বিপদে ও সমস্যার

সময়ের পরামর্শদাতা। তা নিজে যতই গুণবান হন না কেন, ওঁর ঠাকুরদা ছিলেন স্রেফ একটি ধনুর্ধর। লেখাপড়া বেশী না শিখেও নানা উপায়ে দেদার পয়সা করেছিলেন। ডাইরিতে নবা সে বিষয়ে দুঃখ করে লিখেছে যে গ্রামের বাড়িতে স্ত্রী পুত্র খেতে পাক, বা না পাক তিনি তাঁর সাহেব সঙ্গীদের সঙ্গে চীন সীমান্তে যাতায়াত করতেন। আফিং পাচারের ব্যবসা ছিল তাঁদের। ঠাকুরদার কাজ ছিল চীনের লোকেদের আফিং-এর নেশা ধরিয়ে সীমান্তের কাছে সাহেবদের আফিং খেতের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা এবং খদ্দের বাড়ানো। এদিকে চীনে কোনোকালেও আফিং-এর চল ছিল না। চীনের সম্রাট এই সর্বনেশে নেশার কুফল লক্ষ্য করে সে দেশে আফিং খাওয়া বা বিক্রী করা বে-আইনী করে দিলেন। আইন ভাঙার কড়া সাজার ব্যবস্থাও করলেন। সাহেবদের ফলাও ব্যবসা প্রায় রাতারাতি পড়ে গেল। তাঁরা রেগেমেগে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সেই যুদ্ধেরি নাম বক্সার ওয়ার।

বুঝলেন ডাক্তারবাবু, যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে কথা নয়, তবে নবার ঠাকুরদা সেই সময় চীনদেশে কার্যগতিকে গিয়ে যুদ্ধের জোয়ার ভাঁটার প্রকোপে পড়লেন। পালাবার পথ পান না, বনে বনে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সান-পো নদী যে-সব সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে পাহাড় ভেদ করে নেমে এসেছে, ঠাকুরদার ইচ্ছে, সেই পথে দেশে ফেরেন। প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থা ; কিছু শুকনো ফলমূল আর একটা কম্বল মাত্র সম্বল। পাহাড়ের উঁচু ঢালে হাড়-কাঁপানো শীত।

সেইখানে এক নিরাশায় ভরা সন্ধ্যায়, একটা গিরিগুহায় আশ্রয় নিয়ে দেখেন, গুহার মধ্যে যুদ্ধে ভীষণ ভাবে আহত মরণাপন্ন এক চীনে বদ্যি। নিজে কষ্ট পেয়ে পেয়ে ঠাকুরদার মন তখন অন্যরকম হয়ে গেছিল। জলতেষ্টায় বদ্যির ছাতি ফাটছিল। কাছেই বরফের মতো ঠাণ্ডা পাহাড়ি ঝরণা। ঠাকুরদা সেখান থেকে লাউয়ের খোলায় করে জল এনে, তাঁকে পান করালেন, মুখ মাথা মুছিয়ে যতটা পারেন আরাম দিলেন।

কিন্তু তাঁর যাবার সময় হয়ে এসেছিল। তাঁর বড় ভয় মৃত্যুর পর বুনো জানোয়ারে তাঁর শরীর অপবিত্র করবে। ঠাকুরদা স্থানীয় ভাষা জানতেন, তিনি আশ্বাস দিলেন যে নিজের হাতে তাঁকে সমাধি না দিয়ে সেখান থেকে যাবেন না। মারা যাবার আগে বদ্যি তাঁকে দুটি জিনিস দিয়েছিলেন। একটি মহামূল্য সবুজ মণি আর আধ বিঘৎ লম্বা সুন্দর সবুজ শিশিতে কি এক দুষ্প্রাপ্য ওষুধ। তার বিষয়ে চ্যাং যা বললেন মুখ্যু ঠাকুরদা তার এক বর্ণ বুঝলেন না। হাতে তৈরি কাগজে ওষুধের নিয়ম ইত্যাদি চীনে ভাষায় লেখা ছিল। সেটুকু পড়বারো বিদ্যে ঠাকুরদার ছিল না। একটা পেতলের কৌটো করে জিনিস দুটি তিনি দেশে নিয়ে এলেন।

দেশে তাঁর চেনা জহুরীর কাছে মণি বিক্রি করে তিনি যা পেয়েছিলেন, তাই দিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখেই তাঁর জীবন কেটেছিল। ছেলেও বেশিদূর লেখাপড়া শেখেননি বটে, কিন্তু তাঁর ছেলে নবরতন একটি রত্ন বিশেষ। এই নবরতনই হল নবা। ডাক্তারি পাশ করে তার নাম-ডাক হয়েছিল। ঐ শিশির ওষুধের গল্প ঠাকুরদার কাছে শুনে অবধি, একটু একটু করে চীনে ভাষাও সে আয়ত্ত করে ফেলেছিল। শুনেছি সেকালে চীনে হরপ চিনতেই নাকি সাত বছর লাগত।

এর পর নবার ডাইরির গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলো পড়ে বদ্যিনাথ তাজ্জব বনে গিয়েছিল। ওষুধের নিয়ম প্রাচীন চীন ভাষার পুরনো হরপে লেখা। রাত জেগে নবা তার তর্জমা করে যা বুঝেছিল তাতে তার চুল দাড়ি খাড়া। ঐ ওষুধ নাকি প্রাণ নবীকরণের জন্য ব্যবহার্য এবং অব্যর্থ। মাসে একবার এক চামচ জলে ১ ফোঁটা সেব্য। তাতেই নাকি ভাবনাতীত ফল পাওয়া যায়। ঐ শিশিতে দু-জনের সারা জীবনের ব্যবহারের পরিমাণে ওষুধ ছিল। কুড়ি বছর সেবন করলে প্রায় চির যৌবনের শক্তি আসে দেহে। তখন আর ওষুধ না খেলেও চলে। সেবনকারীদের অপঘাত ছাড়া বড় একটা মৃত্যুও হয় না। অবিশ্যি যদি তারা পবিত্র জীবনযাপন করে। এ ওষুধ নির্দোষ হরিণের পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড থেকে নির্যাস বানিয়ে তৈরি। এতে অলৌকিক কিছু নেই। এই রকম সব লেখা ছিল ঐ কাগজটাতে।

যতই পড়ে নবা, ততই শিউরে শিউরে ওঠে। চিরযৌবনে তার নিজের লোভ ছিল না। পুরনো ইংরেজি বইতে সে কয়লা থেকে হীরে করার কথাও পড়েছিল। ভাবত ঐ নিয়মটি শিখতে পারলেই বড়লোক হওয়া যায়। তার বড়লোক হওয়ার বড় ইচ্ছে। এখন মনে হল এতো আরো ভালো। এই তো সোনা তৈরির স্পর্শমণি। বড়লোক বুড়োবুড়ি পাকড়ে মাসে ১ ফোঁটা ওষুধ দেব, ব্যস ওদের বয়স কমে যাবে আমিও লক্ষ লক্ষ টাকা কামাব। ঐ শিশি ফুরোতে জীবন কেটে যাবে। এক জোড়া ধনী বুড়োবুড়িকে একমাত্র মূলধন করে, সুখে শান্তিতে থাকব।

বদ্যিনাথের শ্বশুর বাড়িতে সে সময় নবার মামা ছিলেন কুলগুরু। সঙ্গে সঙ্গে দরকার হলে একটু আধটু কবরেজি ওষুধও দিতেন। পণ্ডিত মানুষ। নবা তাঁর কাছে গিয়ে উঠল আর অল্প দিনেই বুড়ো কর্তা কেশব চৌধুরীর ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান হয়ে পড়ল। খুব ভালো চিকিৎসা করত নবা, এ কথা সে নিজেই লিখেছে। বাড়িতে শুধু কর্তা গিন্নি। তাঁদের একমাত্র সন্তান দীনেশ চৌধুরী আবার নবার সঙ্গে এক টীমে ফুটবল খেলত। কেশব টাকার পাহাড়ের ওপর বসে থাকতেন। এদিকে বেশ হিসাবী ছিলেন।'

সংক্ষেপে এই অবধি বলে, বদ্যিনাথ ডাইরিটা খুলে মাঝে মাঝে দেখে নিতে লাগল। নবা লিখেছে, টাকার স্তূপে বসে থাকে বুড়ো, অথচ একমাত্র ছেলে দীনেশকে আলাদা করে দিয়েছে। দুশো টাকা মাসোহারা আর বাগানের কোণে খুদে অতিথিশালায় বাস। বলে নাকি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখতে হবে। ঐ টাকার গাদা থেকে বুড়োকে আলাদা করবার জন্য আমার হাত নিশপিশ করে। টনিক, কাশির ওষুধ, ঘুমের ওষুধ, জোলাপ, এই সব দিই আর বুড়ো দীনেশের বৌ সম্বন্ধে ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ করে। ভীষণ নাকি খরচে, ওর কথায় দীনু ওঠে-বসে, বদ-মেজাজী ইত্যাদি। বয়স হয়েছে, কোনদিন না পটল তুলতে হয়, তখন টাকাগুলো সব বৌয়ের হাতে উঠবে, এই ভেবে বুড়োর রাতে ঘুম হয় না।

'একদিন বলে বসল, "আমাদের বয়সটা ১৫/২০ বছর কমিয়ে দিতে পার না, ডাক্তার? আজকাল শুনেছি তোমরা টিকে দাও আর বসন্ত হয় না। তা এই সামান্য জিনিসটার ওষুধ নেই?"

বুঝলাম মা-লক্ষ্মী আমার হাতে সুযোগ গুঁজে দিচ্ছেন। সেটি ফেললে মহাপাতকী

হব। তাই বললাম—তা আছে বৈ-কি। মাসে এক ফোঁটা খেলে পাঁচ বছর করে বয়স কমে যাবে। তবে অনেক দাম। অনেক দিন খেতেও হবে। দীনেশদার পৈতৃক সম্পত্তি অনেকটা কমে যাবে। ভেবে দেখুন।'

'শুনে বুড়ো চিড়বিড় করে উঠল, "দীনু? দীনু এক কানাকড়িও পাবে না। সব ঐ তাড়কা সুন্দরী (বৌয়ের নাম ছিল তারকাসুন্দরী) সিন্দুকে তুলবে। যত কম বাকি থাকে, আমি তত খুশি। তাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাচ্ছি। আয়ুটা ৪০/৫০ বছর বাড়িয়ে দিতে পারবে না?"

নবা হেসেছিল, 'প্রায় অমর করে দিতে পারি, স্যার। তবে দু'জনেই খাবেন। মা-ঠাকরুণ সঙ্গে না থাকলে আপনার কষ্ট হবে। আর কাউকে একটা কথা নয়। জানাজানি হলে ওষুধ নিয়ে আমি নিখোঁজ হব।'

বুড়ো বলেছিলেন, 'পাগল নাকি! আমার মুখে কুলুপ। গিন্নিকে কিছু বলে কাজ নেই। ছেলে-বৌয়ের ওদিকে তর সইছে না। পথ চেয়ে আছে, কবে আমরা সগ্‌গে যাব আর ওরা এ বাড়িতে উঠবে! সে গুড়ে বালি! আমরা সহজে মরছি না। ওষুধটা দিয়ে দাও, বাপ।'

তাই দিল নবা, একেকজনকে বড় এক চামচ জলে ড্রপারে করে ১ ফোঁটা। খাওবামাত্র মনে হল ওঁদের চোখগুলো অস্বাভাবিক রকম চকচক করতে লাগল। কাজটা ভালো হল কি না কে জানে।

পরের মাসের ডোজ দেবার সময় দেখা গেল দু'জনার বাঁকা শিরদাঁড়া তক্তার মতো সোজা। তার পরের মাসে মুখের বলীরেখা অদৃশ্য। তার পরের তিন মাসের মধ্যে কুচকুচে কালো চুলে টাক ঢাকল, নড়া দাঁত শক্ত হল, পড়া দাঁত আবার গজাল।

তার পরের মাসে ওষুধ দিতে এসে নবা বলল, 'খবরদার যদি ওষুধের কথা কাউকে বলেছেন!' বুড়ো—আর তাকে বুড়ো বলা কেন?—খিল-খিল করে হেসে বললেন, 'পাগল না গন্ধ গোকুল? তাই বলি আর সবাই মিলে কেঁচে যাক আর কি! আমি বাপু মাম্! স্পিকটি নট্।' আজকাল কেশব কথায় কথায় ইংরিজি বোলচাল ঝাড়েন। মন ভালো করবার জন্য কলেজ জীবনের পোকায়-কাটা বই থেকে হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের জটিল অংক কষেন।

এই সব দেখে নবা একটু চিন্তিত না হয়ে পারল না। ব্যাপারটা অন্য লোকেরও চোখে পড়তে বাধ্য। দীনেশ তো চটে কাঁই। বৌয়ের শেখানো কথা চার দিকে বলে বেড়াতে লাগল। 'টনিক খেয়েছেন না আরো কিছু! এই ভাবে ক্রমে বয়স কমার কি মানে হতে পারে? এটা অস্বাভাবিক। কেউ ওদের বিষ খাওয়াচ্ছে। আমি বড় ডাক্তার আনাচ্ছি—

এই অবধি শুনে খিক্ খিক্ করে হেসে তার মা চঞ্চলা হরিণীর মতো—তা ছাড়া আর কি? সিঁড়ির দুটো করে ধাপ এক লাফে পেরিয়ে ওপরে পালালেন। আর বাপ বজ্রমুষ্টিতে টেবিল চাপড়ে গর্জে উঠলেন, 'গেট আউট'! স্কাউণ্ড্রেল! তোর দেখছি বড্ড বাড় বেড়েছে। ফের ডাক্তারের কথা মুখে আনবি তো আমি তোকে দেন্ অ্যাণ্ড দেয়ার ত্যাজ্যপুত্র করে দেব। সমস্ত টাকাকড়ি দুঃস্থ বেড়াল নিকেতনে দিয়ে যাবো! গো।' মাথা নিচু করে ছেলের প্রস্থান।

এবার নবা বেশ নার্ভাস বোধ করছিল। সত্যি কথা বলতে কি ওষুধের গুণ দেখে সে নিজেও তাজ্জব বনে গিয়েছিল। কেশব আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখছিলেন। ততক্ষণে গিন্নিও ফিরে এসে পাশে দাঁড়িয়ে নিজের এক গোছা কোঁকড়া চুল চুষছিলেন। নবা বলল, 'ওষুধটা বরং কিছুদিন বন্ধ থাকুক, বড়বাবু।' গিন্নি রেগে গেলেন 'তা তো বটেই! তা আর বলবি নে। কর্তা যে রূপেগুণে তোকেও ছাড়িয়ে গেছেন! হিংসেয় গা জ্বলে যাচ্ছে না? এই দ্যাখ, সবটা খেয়ে ফেলছি। তুই কি করতে পারিস।'

এই বলেই আ সর্বনাশ!! সামনের টেবিল থেকে ওষুধের খুদে সবুজ শিশিটা তুলে সোনালি ছিপি খুলে কাঁচা কাঁচা বেশ খানিকটা গলায় ঢালতে না ঢালতে, কেশব সেটি ছিনিয়ে নিয়ে বাকিটুকু নিজের গলায় ঢেলে দিয়ে একা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেয়ার'।

নবা শিশি বাঁচাবার মোক্ষম একটা চেষ্টা নিয়েছিলেন। কিন্তু টানা-হ্যাঁচড়ার ফলে সেই অমূল্য জিনিসটা ছিটকে শ্বেতপাথরের মেঝেতে পড়ে চক্ষের নিমেষে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। একটু ধোঁয়া মতো উঠল। ধোঁয়া কাটলে দেখা গেল এক চিমটে ছাই পর্যন্ত বাকি নেই।

দীনেশের মা বাবা হাই তুলতে তুলতে শয্যা নিলেন। নবা দীনেশকে একটা চিঠি লিখে অসুস্থতার দোহাই দিয়ে এক মাসের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। হয়তো কোনো দূরবাসিনী মাসিপিসিকে দেখতে গিয়ে থাকবে। ভারি কর্তব্যপরায়ণ ছিল ছেলেটা।

মাসের শেষে বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে শুনল দীনেশ দুবেলা উদ্ভ্রান্তের মতো আসা–যাওয়া করছে। শুনে নবার হাত-পা হিম। আবার কি সর্বনাশ হল কে জানে! সেই ভর সন্ধ্যায়, নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল ছুটে বড়কর্তার বাড়ি। দীনেশ দোতলার বারান্দায় পাইচারি করছিল।

'কি হয়েছেটো কি, দীনেশদা? ওষুধটা তো ভালোই।'

দীনেশ কাষ্ঠ হাসল, 'দেখে যাও, তোমার ভালো ওষুধের গুণ।'

তারপর নবাকে তার মা বাবার বড় শোবার ঘরের দরজার কাছে নিয়ে গেল। সে ঘরে দুটি দামী দোলনায় দুটি পরীদের মতো সুন্দর খোকাখুকুকে হাসিমুখে দোল দিচ্ছে দীনেশের বৌ। তাকে এত খুশি নবা কখনো দেখেনি। ছেলেপুলে নেই বলে তার বড় দুঃখ ছিল!

নবা কপালের ঘাম মুছে বলল, 'খারাপটা কি হল, দীনেশদা? বৌদির দুঃখ ঘুচল। ওঁরা নিজেদের নবীকরণ করতে চেয়েছিলেন, এখন একেবারে নবীন হয়েছেন। তুমি সম্পত্তি চেয়েছিল, এখন তুমি ছাড়া সম্পত্তি দেখার কেউ নেই।'

দীনেশ একটু ভীতু প্যাটার্নের। সে বলল, 'আত্মীয়স্বজন কেউ যদি মামলা ঠুসে দেয়?'

'দূর! তুমি একমাত্র ওয়ারিশ!'

'যদি কেউ ওঁদের খোঁজ করে? ওষুধের কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি তোমাকে দায়ী করব।'

অসম্ভব বুদ্ধি ছিল নবার। শেষ পর্যন্ত তার পরামর্শে এক চিঠি লেখা হল। ইদানীং

চোখে ছানি পড়াতে লেখাপড়ার কাজ দীনেশই করত। কেশব খালি সই দিতেন। একটা চিঠি লেখা হল, তাতে বলা হল মা-বাবা অনির্দিষ্টকালের জন্য হিমালয়ে গুরুর আশ্রমে যাচ্ছেন। দীনেশ যেন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং পত্রপাঠ দুটি অনাথ ছেলেমেয়েকে পুষ্যি নেয়। নিচে কেশবের কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং সইও কপি করা হল।

নবা বলল তাতে কোনো দোষ হয়নি, কারণ ওঁদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যেই এই সমস্ত ঘোরা পথ ধরতে হয়েছিল! নবাই স্বাক্ষরের সাক্ষী হল।

এ ব্যবস্থায় সব দিক দিয়ে মঙ্গল হল। ছেলেমেয়েকে দীনেশের বৌ বুকে করে মানুষ করল। ভালো স্কুলে লেখাপড়া শেখানো হল। একেবারে সত্যিকার খোকা খুকুর মতো। ওঁদের আগের কথা একটুও মনে ছিল না। নবা লিখেছে-ক্রমে দীনেশদা আর বৌদিও বোধ হয় আগের কথা ভুলে গেলেন।

ছেলেমেয়ে বড় হল। তাদের রূপগুণের প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ। ছেলে বড় এঞ্জিনীয়ার হল, মেয়ের ভালো বিয়ে হল। দীনেশদারা শেষ বয়সে কাশীতে চমৎকার বাড়ি কিনে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। সব ভালো যার শেষ ভালো। ইতি। নবার ডাইরি।'

বদ্যিনাথ খাতা বন্ধ করে বলল,

'কিন্তু সব ভালো নয়, ডাক্তারবাবু। আমি-আমি-ঐ মেয়ের (অর্থাৎ আগে যে কেশবের গিন্নি ছিল, তার) মেয়েকে বিয়ে করেছি। এদিকে দীনেশ চৌধুরীর মা আমার ঠাকুরদার নিজের পিসি ছিলেন। তাহলে গিন্নিও আমার সাক্ষাৎ ঠাকুমা। এমনিতেই সারা দিন এটা কর! ওটা কর! তার ওপর যদি ঠাকুমা হয়, তাহলে আমি কোথায় যাব?' এই বলে বদ্যিনাথ নিজের কপাল চাপড়াতে লাগল।

বুড়ো ডাক্তার বললেন, 'ওকি হচ্ছে? নবা আমার নিজের বাবা। উনি রোমাঞ্চকর উপন্যাস লিখে দীনেশ জ্যাঠাকে পড়তে দিতেন। কেউ ছাপত না। 'নবার ডাইরিও তাই। ডাক্তাররা রোমাঞ্চকর গল্প লিখতে ভালোবাসে। আমিও বাসি। সেগুলো বেনামায় ছাপা হয়। দীনেশ জ্যাঠা 'নবার ডাইরি' পড়ে মনে মনে খুব চটে, পাঁচশো টাকা দিয়ে পাণ্ডুলিপিটা কিনে নিয়েছিলেন। পাছে ছেপে বেরুলে, লোকে ভাবে ও সব বুঝি সত্যি ঘটেছিল। বাবাও খুব খুশি ; প্রকাশকরা যাই বলুক, একজন সমঝদার লোক তো পাঁচশো টাকা দিয়ে পাণ্ডুলিপি কিনেছেন। পরে বাবার কাছে শুনে আমি ওটার অনেক খোঁজ করেছিলাম। বরং আমাকেই দিয়ে যাও, আমি নামধাম বদলে বই করি। বেড়ে গল্প।'

খাতাটা হাতছাড়া করে বদ্যিনাথ যেন বাঁচল। সত্যি মিথ্যা কে জানে!

pathagar.net

হরবিলাসের মৃত্যু রহস্য

বনফুল

হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে।

এ মৃত্যু সুখের অথবা দুঃখের, তাহার বিচার নীতিবিদেরা করিবেন। আইনত যিনি ললিতার স্বামী ছিলেন, তিনি ছিলেন একটি মনুষ্যরূপী দানব, ইঁহার কবল হইতে ললিতাকে উদ্ধার করিয়া হরবিলাস সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। আজীবন তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে একঘরে হইয়া বাস করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কর্মটি যে একটি অসাধারণ রকম সৎকর্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজ সংস্কারের জন্য হরবিলাসের মত সাহসী লোকেরই তো প্রয়োজন। এরূপ লোকের তিরোভাব নিতান্তই দুঃখের।

হরবিলাসের একমাত্র বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কিন্তু এসব লইয়া মাথা ঘামাইতেছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল, হরবিলাসের মৃত্যুর কারণ কী। লোকটা কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত সুস্থ ছিল, খোসমেজাজে কতরকম গল্প করিল, সহসা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কী হইল! মৃত্যুর কোন লক্ষণই তো তাহার মধ্যে সে লক্ষ্য করে নাই! ব্যাপারটা বেশ একটু রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। বিশেষত হরবিলাসের একটি কথা মনে হওয়াতে সিদ্ধেশ্বরের ধারণা

হইল যে এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হরবিলাস কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'ললিতাকে নিয়ে যখন এখানে চলে আসি তার কিছুদিন পরে বঙ্কেশ্বরবাবু আমাকে একটা চিঠি লেখেন। কী লিখেছিলেন জান? লিখেছিলেন—এর প্রতিশোধ আমি নেবই! জীবন দিয়ে আপনাকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দূরে পালিয়ে গিয়ে নিস্তার পাবেন না। আদালতে নালিশ করে ললিতাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, কিন্তু ওর মুখদর্শন করবার ইচ্ছে নেই। ওকেও আমি শাস্তি দেব, দেখে নেবেন।'

হরবিলাসের ম্লান হাসিটা সিদ্ধেশ্বরের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। ভীত, ম্লান হাসি। সহসা তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যুটাও ঠিক স্বাভাবিকভাবে হয় নাই। কে একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া কি একটা প্রসাদ তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সেইদিনই কলেরায় তাহার মৃত্যু হয়। সত্যই কি তাহার কলেরা হইয়াছিল? সেই সন্ন্যাসী যে বঙ্কেশ্বরের চর নয়, তাহাও তো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হয়ত প্রসাদের সহিত বিষ ছিল...।

বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে সিদ্ধেশ্বর শোকাকুল হইয়াছিল, এইসব কথা চিন্তা করিয়া একটু উত্তেজিত হইল। তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও তদন্ত করিবার কথা কাহারও মনে হয় নাই। কিন্তু হরবিলাসের এই রহস্যময় মৃত্যুতে যখন তাহার মনে খটকা লাগিয়াছে, তখন তদন্ত না করিয়া সে ছাড়িবে না। হরবিলাসের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, তাহাকেই সব করিতে হইবে। উত্তেজনাভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। যে ভৃত্যটি হরবিলাসের মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিল ঃ 'তুই যা, আমি আসছি এখনি। বাড়িতে আর কোন লোক যেন না ঢোকে। বুঝলি?'

ভৃত্য সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। একটু পরে সিদ্ধেশ্বরও বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই গেল থানায়।

।। দুই ।।

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই। হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়া হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই ডাক্তারের অভিমত। হরবিলাসের হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল ছিল, তাহা আরেকজন ডাক্তারও বলিয়াছিল। ইহা লইয়া হরবিলাসের খুঁতখুঁতানিরও অন্ত ছিল না, সামান্য একটু কিছু হইলেই তাঁহার বুক ধড়ফড় করিত। কিন্তু এতদিন তো ওই হৃদযন্ত্র লইয়াই তিনি বেশ বাঁচিয়া ছিলেন। সহসা এমন কী হইল? থানার দারোগা হরবিলাসের মৃত্যুতে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, সিদ্ধেশ্বর কিন্তু নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। সে বাড়ির চাকরটাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

'তুই প্রথমে কী করে টের পেলি যে বাবু মারা গেছেন?'

'বাবু রোজ ভোরে ওঠেন, কিন্তু সেদিন যখন বেলা দশটা পর্যন্ত উঠলেন না, ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলাম না, তখন জানলার সেই ফোকরটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম'—

'ও!'

ছোকরাটার ইতিহাস সিদ্ধেশ্বরের মনে পড়িয়া গেল। হরবিলাসের দেশ হইতে একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসিয়াছিলেন। হরবিলাস তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যখন আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন তাহাকে বাড়িতে স্থান দিতে হইল, ভদ্রলোক নাকি ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, হরবিলাসের বাড়িতে দিনসাতেক ছিলেন। সেই সময়ে তিনি নাকি লক্ষ্য করেন যে, ঘুমের ঘোরে হরবিলাস প্রত্যহ গোঁ-গোঁ করিয়া শব্দ করেন, মনে হয় যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হরবিলাস ব্যাপারটা তত গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই, ভদ্রলোক কিন্তু ইহাতে খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন ডাক্তারই ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের এখনো মনে আছে। একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওখানে। ইনি পশ্চিমে প্রাকটিস করেন, এখানে একজন মাড়োয়ারী রোগীর কল পেয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল, তাই একে ডেকে নিয়ে এলাম। তুমি একবার বুকটা দেখাও তো এঁকে! রাতে ঘুমের ঘোরে যেরকম কর, ভয় হয়!'—

ডাক্তার ঘোষ হরবিলাসের বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন : 'আপনার হার্ট খারাপ, তাই শ্বাস কষ্ট হয়।'

হরবিলাস বলিল, 'আমি তো তেমন টের পাই না।'

'আর কিছুদিন পরে টের পাবেন।'

'কী করব তাহলে?'

'মাথার কাছের জানালাটা খুলে শোবেন। সাফ হাওয়া দরকার।'

'ও বাবা, আমি ভীতু মানুষ তা পারব না মশাই।'

'জানালা সবটা খুলতে না পারেন, ছোট একটা ফোকর করিয়ে নিন জানলায়। বাইরের অক্সিজেন ঘরে খানিকটা ঢুকলেই হল।'

হরবিলাস চুপ করিয়া ছিল।

আত্মীয়টি বললেন, 'আচ্ছা, সে আমি করিয়ে দিয়ে তবে যাব।'

হরবিলাসের মাথায় শিয়রের গোল ছিদ্রটি তিনিই করাইয়া দিয়াছিলেন। পরদিন নিজে গিয়া মিস্ত্রি ডাকিয়া ছিদ্রটি করাইয়া তবে অন্য কাজ করেন। তাহার পর তিনি বেশিদিন ছিলেনও না।

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। ওই ছিদ্রপথেই মৃত্যু আসে নাই তো! কিন্তু কিরূপে?

'আচ্ছা, হরবিলাসের সেই আত্মীয়টি চলে যাবার পর কেউ কি এসেছিল?'

'আজ্ঞে না, তবে সেদিন একটি পাঞ্জাবী জ্যোতিষী এসেছিল।'

'পাঞ্জাবী জ্যোতিষী? কবে?'

'দিন পনের আগে।'

'কী বললে সে?'

'তা তো জানিনে বাবু, তবে অনেকক্ষণ ছিল।'

pathagar.net

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাসের মৃত্যুরহস্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

।। তিন ।।

মৃত্যুর ছয়মাস পূর্বে হরবিলাস একটি উইল করিয়াছিলেন। উইলে ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইবে। 'ললিতা বৃত্তি' নাম দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য উক্ত টাকার সুদ হইতে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবে। তাহার মৃত্যুর পর সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত থাকেন তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরই তাহার বিষয় প্রভৃতির বিক্রয়ের ভার লইবে। সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত না থাকে গভর্নমেন্টের উপর এই ভার অর্পিত হইবে।

বিষয় সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের খাতাপত্র দেখিতেছিল। সহসা কতকগুলি ডায়েরি তাঁহার হাতে পড়িল। হরবিলাস যে এমন নিয়মিতভাবে ডায়েরি লিখিতেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের জানা ছিল না! মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত হরবিলাস ডায়েরি লিখিয়া গিয়াছেন।

ডায়েরির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক স্থানে সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। একস্থানে লেখা ঃ আজ একজন পাঞ্জাবী জ্যোতিষী আসিয়াছিল। সে আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। খানিকক্ষণ আমার হাতের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল, 'আপনাকে যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিবেন না তো?'

বলিলাম, 'না রাগ করিব কেন, কী জানিতে চান বলুন।'

সে বলিল, 'আপনি কি কখনো পরস্ত্রী হরণ করিয়াছিলেন?'

আমি প্রথমটা অবাক হইয়া গেলাম, তাহার পর মনে হইল এ খবর কাহারও নিকট সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। বলিলাম, 'ধরুন যদি করিয়াই থাকি।'

জ্যোতিষী বলিল, 'তাহা হইলে একটি বিষয়ে আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। সর্পাঘাতে আপনার মৃত্যু হইবে। এমন স্থানে কখনও যাইবেন না, যেখানে সাপ থাকিতে পারে।' এই কথাগুলি বলিয়া জ্যোতিষী চলিয়া গেল।

জ্যোতিষীর কথাটা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ললিতার ব্যাপারটা সে আমার হস্তরেখা হইতেই নির্ণয় করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় ভবিষ্যৎবাণীটি তুচ্ছ করিবার মত নয়, সাবধানে থাকা উচিত। সাবধানেই আছি, বাড়ি হইতে পারতপক্ষে কখনও বাহির হই না। নিজের ঘরটিতেই বসিয়া থাকি। কাল কিছু কার্বলিক অ্যাসিড আনাইব। শুনিয়াছি ঘরের চারিদিকে কার্বলিক লোশন ছিটাইলে সাপ আসে না।

সিদ্ধেশ্বর ডায়েরির পাতাটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাস যে কিছুদিন পূর্বে কার্বলিক অ্যাসিড আনাইয়া ঘরের চর্তুদিকে ছিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বর জানিত। সহসা তাঁহার এ খেয়াল হইল কেন জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল কিন্তু কোন উত্তর আসে নাই। হরবিলাস একটু হাসিয়াছিল মাত্র। সিদ্ধেশ্বর ভাবিতে লাগিল,

জানলার ঐ ছিদ্রপথে সত্যই কি সাপ ঢুকিয়াছিল? সর্পাঘাতে যদি তাঁহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে শবব্যবচ্ছেদের সময় কি তাহা ধরা পড়িত না? সিদ্ধেশ্বর ডায়েরি বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। যিনি শবব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সোজা তাঁহার কাছে চলিয়া গেল।

'আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, হরবিলাসের যদি সর্পাঘাতে মৃত্যু হত, আগে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন আপনি, না?'

'তা পারতাম বৈকি। হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন এতদিন পরে?'

'না, এমনি।'

সিদ্ধেশ্বর ব্যাপারটা ডাক্তারবাবুর কাছে ভাঙিল না।

'হার্টফেল করে মারা গেছেন ভদ্রলোক, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর ও নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কী?'

'তা বটে।'

একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনে একটা খটকা লাগিয়াই রহিল।

।। চার ।।

মাসখানেক পরে।

হরবিলাসের বসতবাটীটি বিক্রয় করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বর তাহার চৌহদ্দিটি মাপিতেছিল। সেই সময়ে একটি জিনিস তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জিনিসটি কিছুই নয়, একটি বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স। হরবিলাস যে ঘরে শুইত, সেই ঘরের পাশেই একটি ঝোপের ভিতর বাক্সটি পড়িয়া ছিল। খালি বাক্স, ভিতরে কিছুই নাই। তবে, বাক্সের উপর একটা নম্বর এবং দোকানের ঠিকানা লেখা রহিয়াছে। রোদে জলে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পড়া যায়। কী মনে করিয়া সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি তুলিয়া লইল।

কী ছিল এ বাক্সে? নানারূপ আন্দাজ করিতে করিতে অবশেষে তাহার মনে হইল, বাক্সের গায়ে যে ঠিকানাটা লেখা আছে, বাক্সটি সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া যদি লেখা যায় যে, এই বাক্সে যাহা ছিল ঠিক এমনি একটি জিনিস ভি. পি. করিয়া আমার নামে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে কী হয়? হয়ত কিছুই হইবে না। কিংবা হয়ত একটা গেঞ্জি বা কয়েকজোড়া মোজা বা ঐ ধরনের কিছু একটা আসিয়া পড়িতেও পারে। দেখাই যাক না কী হয়।

সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি প্যাক করিয়া এবং উপরোক্ত মর্মে একটি পত্রও তাহার ভিতর দিয়া সেটি পাঠাইয়া দিল। কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই যে সে এ কার্য করিল তাহা নহে, কেমন যেন নিগূঢ়ভাবে মনে হইতেছিল যে, এই বাক্সটির সহিত হয়ত হরবিলাসের মৃত্যুর কোনও সংস্রব আছে।

।। পাঁচ ।।

দিনদশেক পরে সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের বাড়িতে বসিয়া জিনিসপত্রের একটা ফর্দ করিতেছিল। সম্মুখের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ললিতার একখানি ছবি। পিওন আসিয়া

প্রবেশ করিল।

'আপনার নামে একটা ভি. পি. আছে বাবু।'

'ভি. পি? ক-টাকার?'

'দশ টাকা পনের আনা।'

সিদ্ধেশ্বর সবিস্ময়ে দেখিল, সেই দোকান হইতেই ভি. পি. আসিয়াছে। ভি. পি. ছাড়াইয়া লইল। পিওন চলিয়া যাইবার পর সহাস্যে স্বগতোক্তি করিল ঃ 'দেখা যাক কী এসেছে।'

...অবিকল সেইরকম কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাক্স খুলিয়া কিন্তু সিদ্ধেশ্বর লাফাইয়া উঠিল। বাক্সের ভিতর একটা সাপ রহিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ঘরের কোণে যে লাঠিটা ছিল সেই লাঠিটা আনিয়া দূর হইতে স্পর্শ করিল। সাপ নড়িল না। তখন সাহস করিয়া খোঁচা দিল একটা। খোঁচা দিতেই সাপটা আঁকিয়া বাঁকিয়া বাক্স হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সাপটা যে রবারের এবং স্প্রিং-এর একটা কারসাজি তাহা বুঝিতে সিদ্ধেশ্বরের দেরি হয় নাই। তবু সে সাপটার দিকে সভয়ে চাহিয়া রহিল। অবিকল একটা গোক্ষুর।

নিমেষের মধ্যে হরবিলাসের মৃত্যু-রহস্যটা তাহার কাছে যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। হরবিলাসের সেই আত্মীয়, সেই ডাক্তার, সেই জ্যোতিষী সকলেই বক্কেশ্বর বক্সীর লোক।

সহসা একটি শব্দে সিদ্ধেশ্বর চমকাইয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ললিতার ছবিখানা মেঝেতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

কল্কে-কাশির কাণ্ড

pathagar.net

শিবরাম চক্রবর্তী

প্রফুল্ল গোড়া থেকেই বিষণ্ণ মেরে আছে। হ্যাঁ, ভারি তো কাজ! তার জন্যে আবার কল্কে-কাশিকে তার ল্যাজে বেঁধে দেওয়া! হোন না গে তিনি একজন নামজাদা ডিটেকটিভ, (প্রফুল্ল শুনেছিল কোরিয়া অঞ্চলে কল্কে-কাশির মত অত বড় গোয়েন্দা নাকি আর নেই!) তবু এই সামান্য একটা মশা-মারার ব্যাপারে অমন ভারি কামান কাঁধে বয়ে আনতে প্রফুল্লর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সত্যি, কামস্কাটকা থেকে উনি না এলেও কিছু কাজ আটকাত না।

বোম্বের একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁর এক কোণের টেবিলে কল্কে-কাশির মুখোমুখি বসে গুম হয়ে এইসব কথাই প্রফুল্ল ভাবছিল। সামনে চপ-কাট্‌লেট-ডেভিল-ডিম-কেক-পুডিং-এর সমারোহ সত্ত্বেও তার জিভ সরছিল না। বাস্তবিক, এত বড় অপমান হজম করবার পর খেতে কারু রুচি থাকে?

কিন্তু মিঃ কল্কে-কাশি বেপরোয়া। ডিশের পর ডিশ তিনি সাবড়ে চলেছেন—কাঁটা-চামচের তাঁর কামাই নেই। এর ফাঁকে সামনের ভদ্রলোকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। একি!

কঙ্কে-কাশি একটু অবাকই হন। একজন খুনে একটার পর একটা দশটা খুন করেছে, নিজের চোখেই এরকম দৃশ্য তাঁর জীবনে একাধিক বার তিনি দেখেছেন কিন্তু বিস্মিত হতে পারেননি। কিন্তু এক ভদ্রলোক দশ দশটা প্লেটের সামনে একেবারে নির্বিকার! একদম জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন, একটাকেও কাবু করতে পারছেন না! তাঁর সুদীর্ঘ জীবনস্মৃতির মধ্যে এবম্বিধ কাণ্ড স্মরণে পড়ে না।

বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে! কঙ্কে-কাশির বিরাট বপু-পরিধির তুমুল আন্দোলন (অবশ্য খাবার সময়েই যেটা সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ হয়) অকস্মাৎ থেমে যায় ; মাছের চোখের মত ড্যাবডেবে চোখ ঈষৎ প্রসারিত হয়। 'প্রফুল্লবাবুর প্রফুল্লতর হবার পক্ষে কী বাধা হচ্ছে, জানতে পারি কি?' তিনি প্রশ্ন করেন।

বাংলাতেই প্রশ্ন করেন। সোজা পরিষ্কার বাংলাতেই। কামস্কাটকার লোক হলে কী হবে! বাংলা, হিন্দি, উড়ে (এবং কোন-কোন জানোয়ারের ভাষাও) কঙ্কে-কাশির ভালভাবেই আয়ত্ত। তবে কামস্কাটকার ভাষায় তাঁর দখল আছে কি না বলা যায় না। এ বিষয়ে প্রফুল্লর সন্দেহ থাকলেও পরীক্ষক হবার তার সাহস নেই। কেননা সে নিজেও কামস্কাশিয়ানে অজ্ঞ, দারুণ অজ্ঞ।

প্রফুল্ল আরও বেশি গম্ভীর হয়ে যায় ; মাথা চুলকোতে চুলকোতে উত্তর দেয়, 'ভাবনায়, মশাই ভাবনায়! কীরকম গুরু দায়িত্ব মাথার উপরে, বুঝতেই তো পারছেন।'

'বুঝতে পারছি বইকি।' কঙ্কে-কাশি ঘাড় নাড়েন, 'মিস্টার ব্যানার্জির কবে এসে ভারতবর্ষে পৌঁছবার কথা! অথচ তিনি কি-এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিলেতে আটকে গেছেন। তিনি আসতে পারলেন না, তাঁর সই-করা নমিনেশন পেপার এয়ার মেলে কাল বিকেলে বোম্বে পৌঁচেছে ; তাঁর অ্যাটর্নি গলস্টোন কোম্পানির আপিসের জিম্মায় আছে। সেই নমিনেশন পেপার আজই সঙ্গে নিয়ে আমাদের কলকাতাতে ছুটতে হবে। তবেই আঠারো তারিখের আগে সেই নমিনেশন পেপার ফাইল হতে পারবে। আঠারোই হচ্ছে ফাইলিং-এর শেষ দিন। তা না হলে মিস্টার ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হবে না।'

'বিলেতে মিস্টার ব্যানার্জির আকস্মিক দুর্ঘটনার মূলে কি কোনও রহস্যজনক কারণ আছে আপনি আশঙ্কা করেন?' প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করে।

কঙ্কে-কাশি এর জবাব দেন না। 'এই নমিনেশন পেপার ডাকে পাঠানো নিরাপদ নয়। কোন কারণে একদিন কিংবা কয়েক ঘণ্টা লেট হলেই সমস্ত পণ্ড তার চেয়েও বড় আশঙ্কা হচ্ছে নমিনেশন পেপার মারা যাবার।'

'মারা যাবার?' প্রফুল্লর চোখ প্রকাণ্ড হয়, 'কেন' নমিনেশন পেপার মেরে কার কী লাভ? ওকি মাতব্য জিনিস?'

'হ্যাঁ, ডাকে পাঠালে, এমনকি রেজেস্ট্রি করে ইনসিওর করে পাঠালেও যথাস্থানে জিনিসটা পৌঁছবে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কার কী লাভ আপনি জিজ্ঞাসা করছেন? বাংলা দেশে দুটি দল আছে আপনি জানেন?'

'উঁহু', প্রফুল্ল বলে, 'জানি না তো!'

'এই দুটি দলই কাউন্সিলে ঢুকতে চায়। দু-দলে ভয়ানক রেষারেষি। কাউন্সিলে যে-দল ভারি হতে পারবে তাদেরই সারা বাংলায় আধিপত্য হবে কিনা! একটি দলের নাম

হচ্ছে ফ্লু-ফ্লস্ক্ স্-ফ্যান, যারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে, রেস খেলে, আর ফ্যানের তলায় হাওয়া খায় তারাই মিলে এই দল গড়েছে ঃ আমেরিকার বিখ্যাত কু-ক্লু ক্ স্-ক্ল্যানের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই, একমাত্র নামের কতকটা সমিল ছাড়া।'

'বটে?' প্রফুল্লর নিশ্বাস পড়ে-কি-পড়ে না! 'আরেকটা দল কারা?'

'মিস্টার ব্যানার্জি হচ্ছেন এই 'ফ্লু-ফ্লুক্ স্-ফ্যানের পাণ্ডা। অন্য দলের নাম হচ্ছে 'বাই হুক অর ক্রুক'। এই বাই হুক অর ক্রুক-পার্টির নেতা হচ্ছেন মিস্টার সরকার। যেমন করেই হোক নিজের মতলব সিদ্ধ করতে এঁরা সিদ্ধহস্ত!'

'আপনি কি তাহলে বলতে চান যে সরকারি চালে মিস্টার ব্যানার্জি বিলেতে আটকা পড়েছেন?'

'আপাতত আমি ঐ কোণের লোকটার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।' কল্কে-কাশি চোখ টিপে ইশারা করেন।

এতক্ষণে কল্কে-কাশির ওপরে প্রফুল্লর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল। সত্যি, অনেক খবর রাখেন ভদ্রলোক! এইজন্যে অপর দিক থেকে সহসা 'তুমি' সম্বোধনেও সে অপ্রসন্ন হতে পারে না। কল্কে-কাশির ইঙ্গিতের অনুসরণ করে সে।

'ঐ সে কাটখোট্টা গোছের চেহারা, মাথার চুল ক্রপ-করা, চোখে কুটিল ভঙ্গি, ঐ কোণের ছোট্ট টেবিলে বসে অমলেটের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, ওকে লক্ষ্য কর। সহজেই বুঝতে পারে, এরকম ফ্যাশানেবল রেস্তোরাঁয় গতিবিধি ওর স্বভাবসিদ্ধ নয়, কাঁটা চামচের কসরতে এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। খাদ্যের সঙ্গে কাটাকাটি নয়, হাতাহাতিতেই ও পরিপক্ক। উনি এখানে এসেছেন তোমার অনুসরণ করে।'

'আমার?' প্রফুল্লর বিশ্বাস হয় না, 'তার মানে?'

'একটু কায়দা করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, চোখ অমলেটের দিকে থাকলেও মনোযোগ ওর আমাদের দিকেই। কলকাতার একটি বিখ্যাত চীজ উনি—ওর মত কৌশলী এবং ভয়লেশহীন ভদ্র-গুণ্ডা আর দুটি আছে কি না সন্দেহ। ওই শ্রেণীর ক্রিমিনাল ব্রেনের আমেরিকায় জোড়া মিলতে পারে, কিন্তু এদেশে দুর্লভ। মিস্টার ব্যানার্জির পার্টি আমাকে যে তোমার সঙ্গে দিয়েছেন, উনিই হচ্ছেন তার একমাত্র কারণ।'

প্রফুল্লর সহজে বাক্যস্ফূর্তি হয় না, সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে বলে, 'ওর নাম?'

'ওর নাম হচ্ছে, সমাদ্দার, ওরফে সমরেশ ঠাকুর, ওরফে গোপাল হাজরা, ওরফে নটেশ্বর রায়, ওরফে আরো এক ডজন। প্রেসিডেন্সি জেল আর হরিণবাড়ির ফেরতা। আমার সঙ্গে ওর অনেকদিনের পরিচয়,—অনেকটা হৃদ্যতার সম্বন্ধই বলতে পার। এই কারণে আমাকে তোমার সঙ্গে দেখে ও একটু সঙ্কোচ বোধ করছে, নইলে এতক্ষণ তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে দ্বিধা করত না।'

প্রফুল্ল চমকে ওঠে, 'বলেন কী মশাই?'

'ওই রকমই।' কল্কে-কাশি যৎসামান্যই হাসেন। 'সরকারের দল ওকে লাগিয়েছে তোমার পেছনে, ব্যানার্জির নমিনেশন পেপার নিয়ে তুমি যথাসময়ের আগে যাতে না পৌঁছতে পার সেইজন্যেই। এজন্যে তোমাকে খুন করতেও ও পেছপা হবে না। তবে

কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেই ও ভালবাসে—খুনোখুনি করার তেমন পক্ষপাতী নয়। এ বিষয়ে একটু সুরুচিই আছে লোকটার।'

প্রফুল্ল আশ্বস্ত হতে পারে না, 'আপনি কেন ওকে অ্যারেস্ট করছেন না তাহলে? গ্রেপ্তার করে ফেলুন! এক্ষুনি!'

'এখন পর্যন্ত ও কোন অপরাধ করেনি, কেবল মনে মনে এঁকেছে মাত্র এবং মনে-আঁকার জন্যই যদি গ্রেপ্তার করা শুরু করতে হয় তাহলে অ্যাতো লোককে ধরতে হয় যে জেলে তার জায়গা কুলোবে কি না সন্দেহ। কেবল মনের মধ্যেকার প্ল্যানের জন্যে কাউকে তো জেলে পোরা যায় না!'

'তাহলে, তাহলে তো ভারি মুস্কিল!' প্রফুল্ল ভীতই হয় ; বলে 'আমাকে খুন করে ফেলবে তবে?'

'যদি করেই ফেলে, তখন—হ্যাঁ তখন ওকে ধরে ফেলতে আমার বিলম্ব হবে না, যদি নিতান্তই পালিয়ে না যায়। তবে, সমাদ্দারের সঙ্গে আমার হৃদ্যতারই সম্বন্ধ। আমাকে দেখে অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তোমাকে একেবারে খতম করবে না। ভয় কী তোমার?'

বিশেষ ভরসাও পায় না প্রফুল্ল।

'এই জন্যেই বলছিলাম ভয়ানক গুরু দায়িত্ব তোমার মাথায়। যদি নমিনেশন পেপার নিয়ে আঠারোই এগারোটার মধ্যে কলকাতায় না পৌঁছতে পারো তাহলে ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হল না—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দফাও রফা। মিঃ সরকারের দলেরই একচ্ছত্র আধিপত্য হবে কাউন্সিলে, মন্ত্রিসভা ইত্যাদিও দখল করে বসবেন তাঁরাই। সামান্য একটা সই-করা কাগজের উপর একটা পার্টির কতখানি নির্ভর করছে ভেবে দ্যাখো। সে যে-সে পার্টি নয়, ফ্লু-ফ্লু-ক্স্ফ্যান!'

'অর্থাৎ আপনার ভাষায় যারা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে, রেস খ্যালে—ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো এদের দলের কেউ নই, বিন্দুবিসর্গও জানি না, আমাকে এই মারাত্মক কাজে পাঠাবার মানে?' প্রফুল্ল বিরক্তিই প্রকাশ করে।

'তার মানে তুমি যে-অফিসের কেরানি তার বড়কর্তা ঐ দলের একজন হোমরা-চোমরা। তিনি তো ফ্যানের হাওয়া খান, তাহলেই হল। এসব কাজে অজ্ঞ এবং আনাড়িকে পাঠানোই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত। নাড়িজ্ঞানওয়ালা লোক অনায়াসেই অন্য দলের ঘুস খেয়ে—বুঝতেই পারছ! তাছাড়া, ওদের বিশ্বাস আছে। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ তোমার ওপর দেওয়ায় সেটা প্রমাণ হয় না কি?'

'আমার গায়েও জোর যথেষ্ট!' প্রফুল্ল কোটের হাতা তুলে মাসল কণ্ট্রোল করে কল্কে-কাশিকে দেখায়, 'সহজে যে কেউ আমার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারবে তা প্রাণ থাকতে নয়!'

'এস সমাদ্দারের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই'—কল্কে-কাশি প্রফুল্লকে আহ্বান করেন, 'কী ছুতোয় যে গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে ভাব জমাবে ভেবে কাহিল হয়ে উঠছে বেচারা!'

'ওর সঙ্গে আলাপ?' দারুণ বিস্মিত হয় প্রফুল্ল, 'বলেন কী?'

'ক্ষতি কী তাতে? গিলে ফেলবে না তোমায়।' কঙ্কে-কাশি প্রফুল্লকে টেনে নিয়েই চলেন, 'এই যে সমাদ্দার! অনেক দিন পরে দেখা, কেমন, ভাল আছ তো?'

সমাদ্দার চমকে ওঠে, 'মিস্টার কঙ্কে-কাশি যে! এখানে এখন এইভাবে আপনাকে দেখতে পাব আশা করিনি।'

'আমি কিন্তু আশা করেছিলুম, পরশু সন্ধ্যায় আমাদের বোম্বে মেলে যখন তোমাকে উঠতে দেখলাম।'

'বটে?' সমাদ্দার যেন একটু অপ্রস্তুত হয়, 'আপনারাও তাহলে আজ সকালেই বোম্বে পৌঁচেছেন? উনি আপনার বন্ধু বুঝি?'

'হ্যাঁ, এই একটু আগেই। নেমেই এই রেস্তোরাঁতেই প্রাতরাশের চেষ্টা করছিলাম। এমন সময়ে।—হ্যাঁ, কী জিজ্ঞাসা করছিলে? ইনি? ইনি হচ্ছেন বাবু প্রফুল্লকুমার রায়, কেন যে এঁর বোম্বে আগমন তা তো তোমার ভালমতই জানা আছে।'

'আমার?' সমাদ্দার থতমত খায়, 'না তো! তবে, ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলে বিশেষ আপ্যায়িত হব।'

'তা তো হবেই। হবার কথাই। বেশ, তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার বন্ধু প্রফুল্লবাবু, আর ইনি হচ্ছেন সমাদ্দার, আমার বন্ধু। অন্তত আমার শত্রু নন। এর পরিচয় তো টেবিলে বসেই তোমাকে দিয়েছি। প্রফুল্ল তুমি সমাদ্দারকে নমস্কার করলে না? প্রথম পরিচয়ে নমস্কার করাই তো ভদ্র রীতি।

প্রফুল্ল এবং সমাদ্দার বোকার মত পরস্পরকে প্রতিনমস্কার করে। 'সুখী হলাম, প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে আলাপিত হয়ে।' সমাদ্দার বলে।

'হবেই তো।' কঙ্কে-কাশি যোগ করেন, 'নিশ্চয়! এইজন্যেই কি কলিকাতা থেকে এতটা পথ তোমাকে আসতে হয় নি? বল। ভাগ্যিস আমি ছিলাম এখানে! বন্ধু-বান্ধবের উপকার করতে কখনই আমি পেছপা নই বলেই তোমাদের আলাপ করিয়ে দিলাম।'

'সেজন্যে অসংখ্য ধন্যাবাদ মিঃ কঙ্কে-কাশি!' সমাদ্দার বিস্ময়ের ভান করে, 'কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সত্যি বলছ?' কঙ্কে-কাশি আকাশ থেকে পড়েন, 'আমার সঙ্গে তুমি জোচ্চুরি করবে বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

'সত্যি, আপনার কথায় কিছু বুঝতে পারছি না। এখানকার একটা ফিল্‌ম্‌ স্টুডিয়োয় চাকরির চেষ্টাতেই আমার বোম্বে আসা।'

'তাই নাকি? তবু তোমাকে বলে রাখছি, যদি তোমার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমার কথাগুলো কাজে লাগবে। এখান থেকে প্রফুল্লবাবু যাবেন গলস্টোন কোম্পানির অফিসে, সেখানে তাঁর কি কাজ আছে। আমি অবশ্য ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি না। আরেকটা জরুরি খবর, আমরা উঠেছি তাজমহল হোটেলে। তারপর আজ রাত্রের গাড়িতেই আমরা ফিরছি কলকাতায়। আচ্ছা এখন আসা যাক, হোটেলেই আমাদের আবার সাক্ষাৎ হচ্ছে আশা করি।

হতভম্ব সমাদ্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দু-জনে বেরিয়ে আসে। প্রফুল্ল অসন্তোষ প্রকাশ করে—'মিস্টার কঙ্কে-কাশি। আপনি একজন বড় গোয়েন্দা হতে পারেন—'

'উঁহু উঁহু! আদৌ না। এই বরাতের জোরেই যা করে খাচ্ছি!'

'কিন্তু আপনি কি অনেক গুপ্ত সংবাদ ওকে দিলেন না?'

'কাকে? সমাদ্দারকে?' কঙ্কে-কাশি অবাক হন, 'কী রকম?'

'এই—অফিসে গলস্টোন অফিসে যাবার খবর? এবং তাজমহল হোটেলে ওঠার কথা। তারপর আজ রাত্রেই কলকাতা-মেলে ফেরা—'

কেন, কী হয়েছে তাতে? ওর কত কষ্ট, কাজ পাকা হয়ে গেল! বেচারাকে এসব খুঁজে বের করতে আর হাঙ্গামা পোহাতে হবে না।'

'সেটা কি ভাল হল?' প্রফুল্ল বিরক্তি চাপতে পারে না।

'আহা, বুঝতে পারছ না? যতই ওকে কম হাঙ্গামা পোহাতে হবে, ততই বেশি ও ভাববার সময় পাবে। আর যতই ও ভাবতে পারবে ততই নিজের কাজ মাটি করবে তা জান?'

অতঃপর প্রফুল্ল কঙ্কে-কাশির কাছে বিদায় নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসে। একটু পরেই আরেকখানা ট্যাক্সি প্রফুল্লর গাড়ির পিছু নেয়—এই ট্যাক্সি সমাদ্দারের। পরমুহূর্তেই আরো একখানা গাড়ি দূর থেকে দু-জনের অনুসরণ করে চলে—এ গাড়িতে আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীযুক্ত কঙ্কে-কাশি মহাশয়।

তিনখানি গাড়িই অনেক ঘুরে-ফিরে শহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয় চারধারে বাগান ঘেরা প্রকাণ্ড এক বাড়ির ফটকে। গলস্টোন কোম্পানির বড়সাহেবের রেসিডেন্স। প্রফুল্লর গাড়ি ফটকের ভিতরে ঢোকে। একটু দূরে সমাদ্দারের গাড়ি থামে—কঙ্কে-কাশির গাড়ি দ্বিতীয় গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ যেন থেমে যায়।

'সমাদ্দার মশাইকে এখানে এ অবস্থায় দেখব আশা করতে পারিনি!' কঙ্কে-কাশি বলেন। তাঁর মুচকি হাসিটিও লক্ষ্য করবার।

'এই একটু শহর দেখতে বেরিয়েছি।' সমাদ্দার থতমত খায়, 'হাওয়া খেতেও বটে?'

'শহর দেখতে বাইরে? মন্দ নয়! ফিল্ম্ আর্টিস্টের কাজটা তোমার পাকা তাহলে?' কঙ্কে-কাশি গলা পরিষ্কার করেন, 'আমি তাই আন্দাজ করছিলাম, যাচাই করে নিতেই এতদূর আসা। যাক, আমার কাজ আছে। শহরেই আমি ফিরলাম।' তারপর একটু থামেন, 'হ্যাঁ, হয়ত তোমার জানাই আছে, তবু খবরটা তোমাকে দিয়ে রাখাই ভাল! ঐ বাড়িটাই মিঃ গলস্টোনের—ব্যানার্জির নমিনেশনের কাগজপত্র আনতে প্রফুল্লবাবু ওখানেই গেছেন। দ্যাখো চেষ্টা করে যদি তোমার বরাত খুলে যায়! বন্ধু-বান্ধবের শুভাকাঙ্খা করাই আমার দস্তুর, জানই তো!'

কঙ্কেকাশি গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নেন। যেপথে এসেছিলেন সেই দিকেই ফিরে চলে। সমাদ্দার কোন জবাব দিতে পারে না।

তারপরে আরেক ঘণ্টা সমাদ্দারকে অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে প্রফুল্লর গাড়ি বাইরে বেরোয়। সমাদ্দারের আবার অনুসরণ। প্রফুল্লর ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় তাজমহল হোটেলের সামনে। সমাদ্দারেরও। প্রফুল্ল নেমেই ট্যাক্সিওয়ালার পাওনা চুকিয়ে সটান তেরো নম্বর ঘরে ঢুকেই খিল আঁটে। সমাদ্দার গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত করে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কল্কে-কাশির অভ্যুদয় হতেই প্রফুল্ল রুদ্ধনিশ্বাসে ছুটে যায়—'সর্বনাশ হয়েছে, মিঃ কল্কে-কাশি!'

কল্কে-কাশি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না—'কী সর্বনাশ?'

'সমাদ্দার এসে উঠেছে এখানে! আমাদের পাশের বারো নম্বর ঘরে!'

'তাই নাকি? তাহলে তো ওকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করতে হচ্ছে! আমিও ওর শুভাগমন আশা করছিলাম।'

কল্কে-কাশি রসিকতা করছেন প্রথমটা প্রফুল্ল তাই ভেবেছিল, কিন্তু সত্যিই ডিনারের টেবিলে সমাদ্দারের পাশে বসে নিজের চক্ষুকর্ণকে ওর বিশ্বাস করতে হল। ওর চিরকালের ধারণা, গোয়েন্দায় আর বদমাইসে মুখোমুখি হলেই ঝটাপটি বেধে যায়। শেষোক্তরা স্বভাবতই পলায়ন-তৎপর এবং প্রথমোক্তরা সর্বদাই ওদের পশ্চাদ্ধাবনে ব্যতিব্যস্ত। মাসিক পত্রের পাতায় আর গোয়েন্দা-গ্রন্থমালার বইয়ে পড়ে এইরকমের একটা বিশ্বাস ওর বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু এখন ওদের পরস্পরকে অন্তরঙ্গের মত কথাবার্তা কইতে দেখে তার ধারণা দস্তুর মত টলে গেল।

মধ্যাহ্নভোজ প্রফুল্লর মাথায় উঠে গেল, সে মাঝে মাঝে তার কোটের বুকপকেটে হাত দিয়ে গুরুতর বস্তুটির অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগল। যে-কাগজের টুকরোটির উপর একটা পার্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাকে সে যত্নের সহিত কোটের লাইনিঙের মধ্যে সেলাই করে রেখেছে। জিনিসটার সেখান থেকে অকস্মাৎ উবে যাবার কথা নয় কিছুতেই, তবু সে বারবার পরীক্ষার দ্বারা আপনাকেই যেন ভরসা দিতে চাচ্ছিল।

ওর হস্তচালনা কল্কে-কাশির নজরে পড়ে একবার। তিনি হাসতে থাকেন, 'ভয় নেই প্রফুল্লবাবু। ও নিরাপদেই আছে এবং থাকবেও, যদি না তোমার কোট তুমি খোয়াও।'

কল্কে-কাশির কথায় প্রফুল্লর ভারি রাগ হয়, তার মুখ লাল হয়ে উঠে। কল্কে-কাশি বুঝতে পারেন।

'আমি কি কোন গুপ্তকথা ফাঁস করে দিলাম নাকি? মোটেই না, প্রফুল্লবাবু! সমাদ্দার জানত যে কোথায় তুমি নমিনেশন পেপার রেখেছ। কিহে সমাদ্দার, জানতে না?'

সমাদ্দার ঘাড় নাড়ে—'নিশ্চয়! কোটের লাইনিং, ঐখানেই তো রাখবার জায়গা! সকলেই রাখে এবং সকলেই জানে।'

গোয়েন্দা এবং বদমাইস দু-জনে মিলে অকপটে হাসতে থাকে। প্রফুল্ল ভারি মুষড়ে যায়। হতে পারে কোটের লাইনিংই মূল্যবান কাগজ-পত্র রাখার একমাত্র জায়গা এবং সকলেই তা জানে, তবু কী দরকার ছিল মিস্টার কল্কে-কাশির সমাদ্দারকে এই খবর দেবার? বরং যাতে সমাদ্দারের মনে এরকম সন্দেহ না জাগে বা জেগে থাকলেও তা দূর হয় সে চেষ্টা করাই কি তাঁর উচিত ছিল না? কল্কে-কাশির গোয়েন্দাপনায় সে ঘাবড়ে যায় সত্যিই।

যাক, প্রফুল্লর আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। যতক্ষণ সে জেগে আছে ততক্ষণ তার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়া কারো ক্ষমতার বাইরে—এবং রাত্রে, রেলগাড়িতে, হয় সে গা থেকে কোট খুলবেই না, আর খোলেও যদি, তাহলে বালিশের মতই সেটাকে ব্যবহার করবে, সে ঠিক করে রাখল। তার ভারি সজাগ ঘুম, তার মাথার তলা থেকে

কোট নেয় কার সাধ্য?

খাওয়া শেষ হলে কল্কে-কাশি বলেন—'এস সমাদ্দার, একটু দাবা খেলা যাক। প্রফুল্ল, জানো নাকি দাবা খেলা?'

'জানি সামান্যই।' প্রফুল্ল মুখ গোঁজ করে বলে।

'আমার আপত্তি নেই।' সমাদ্দার উত্তর দেয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলা বেশ জমে ওঠে। কল্কে-কাশি ও সমাদ্দারের তো ভালই জানা আছে, প্রফুল্লও নেহাত কম যায় না। ক্রমশ ওর উৎসাহ বাড়তে থাকে, সমাদ্দারের চাল কেড়ে নিয়ে নিজে চাল দেয়। প্রফুল্ল উত্তেজিত হয়ে উঠে, ওর গরম বোধ হয় ; সে কোট খুলে ফেলে, সমাদ্দারের উপস্থিতি সম্বন্ধে ওর হুঁশই নেই তখন। সমাদ্দারও নিজের কোট খোলে এবং প্রফুল্লর কোটের পাশেই রাখে। খেলা চলতে থাকে।

খানিক বাদে সমাদ্দার উঠে পড়ে—'প্রফুল্লবাবু, আপনি ততক্ষণ মিস্টার কল্কে-কাশির সঙ্গে খেলুন। আমি আসছি এক্ষুনি।'

একটু পরেই সমাদ্দার ফিরে আসে—'প্রফুল্লবাবু, ভুল করে নিজের কোট ফেলে আপনার কোট নিয়ে গেছি, কিছু মনে করবেন না!' কোট খুলতে খুলতে সে বলে।

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে, নিজের কোট কেড়ে নেয়। যেখানে নমিনেশন পেপার ছিল সেখানটা অনুভব করে। পরমুহূর্তেই সে সমাদ্দারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়। কল্কে-কাশির মাঝে পড়ে বাধা না দিলে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে বদমাইশটাকে হয়ত এইদণ্ডেই সে টুঁটি টিপে খুন করেই বসত!

'প্রফুল্লবাবু, করছেন কী? কী ব্যাপার?'

'ওই চোর—'

'আহা, গালাগালি কেন? কী হয়েছে?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না। এই লোকটা এইমাত্র আমার কোট থেকে নমিনেশন পেপার চুরি করেছে!'

কল্কে-কাশি তেমনই অবিচলিত থাকেন, 'তাই নাকি হে সমাদ্দার? তাই নাকি?'

'প্রফুল্লবাবু তো সেইরকমই ভাবছেন!' সমাদ্দার বলে, 'কিন্তু আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কখন করলুম!'

সমাদ্দার উচ্চহাস্য করে, কল্কে-কাশিও হাসতে থাকেন। প্রফুল্ল রেগে আগুন হয়ে উঠে, কিন্তু একা সে কী করবে? আপন মনেই জ্বলতে থাকে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তার কেমন-কেমন ঠ্যাকে। সমাদ্দার ও কল্কে-কাশির মধ্যে যেরকম অন্তরঙ্গতা তাতে ওর নিদারুণ সন্দেহ হতে থাকে। ওরা দু-জনে মাসতুতো ভাই নয় তো?

'তুমি, যদি এখুনি আমার কাগজ না ফিরিয়ে দাও, তোমার হাড় ভেঙে আমি ছাতু করব!' প্রফুল্ল ঘুসি বাগিয়ে প্রস্তুত হয়।

'আহা, হচ্ছে কী এসব! মারামারি কি ভদ্রলোকের কাজ? কল্কে-কাশি ওকে সামলাতে যান।

'আপনি থামুন মশায়! আপনারা দু-জনেই এক গোত্র! আমি বেশ বুঝেছি? গোড়াতেই ধরতে পেরেছিলাম, কিন্তু—সে যাক। আপনার কোন কথা আমি শুনছি না

আর।' প্রফুল্ল মরিয়া হয়ে ওঠে।

এবার সমাদ্দার কথা বলে—'আপনি যদি আমার গায়ে হাত দ্যান প্রফুল্লবাবু তাহলে আমি এক্ষুনি হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে আপনাকে পুলিশে দেব। আপনার কাগজ যে আমি নিয়েছি তার প্রমাণ কী?'

'বেশ, আমি তোমাকে সার্চ করব! তোমার কামরাও?'

'স্বচ্ছন্দে! এক্ষুনি!' সমাদ্দার কঙ্কে-কাশির দিকে ফেরে, 'আপনিও কি সার্চ করতে চান? আসুন আমার সঙ্গে, কোন আপত্তি নেই আমার!'

'বাজে কাজে সময় নষ্ট করি না আমি,'—কঙ্কে-কাশি একটা সিগারেট ধরান। 'তুমি যদি সত্যিই ও-কাগজ নিয়ে থাকো সমাদ্দার, তাহলে প্রথম তোমাকে সার্চ করে কোনই লাভ নেই। কোথায় তুমি তা রেখেছ তাই যদি আমি ভেবে বার করতে পারি, তাহলে তা পেতে আমার বিলম্ব হবে না।'

'আপনি কি তাহলে সার্চ করতে প্রস্তুত নন?' প্রফুল্ল এবার ক্ষেপে ওঠে।

'উহুঁ!' কঙ্কে-কাশির সংক্ষিপ্ত জবাব। 'আপাতত না।'

'বেশ, আমি নিজেই করব তাহলে।'

প্রফুল্ল সমাদ্দারের ঘরে যায়, তার পর আপাদমস্তক অনুসন্ধান করে, সবগুলো জামার ভেতরের-বাইরের সমস্ত পকেট হাতড়ায়, কোটের যাবতীয় লাইনিং পরীক্ষা করে ; ঘরের আঁতিপাঁতি সমস্ত জায়গায় ওর তল্লাস শেষ হয়। অবশেষে মুহ্যমানের মত যখন নিজের কামরায় ফেরে তখন কঙ্কে-কাশি জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। মুখ না ফিরিয়েই তিনি বলেন, তখনই বললাম, প্রফুল্লবাবু, এখন ওকে সার্চ করে কোনই ফল নেই। কোথায় ও জিনিসটা সরিয়েছে যতক্ষণ তাই না আন্দাজ করতে পারছি—'

সমাদ্দার ফিরতেই কঙ্কে-কাশির কথায় বাধা পড়ে। প্রফুল্ল কোন জবাব দেয় না। নিজের মধ্যে নিজেই সে নেই তখন ; এতই সে দমে গেছে।

'তবে, সত্যি বলতে কী, দোষ তোমার নিজেরই প্রফুল্লবাবু। তুমিই বল, তোমার আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল না কি?' কঙ্কে-কাশি কথাটা শেষ করেন।

কিন্তু এ-কথায় প্রফুল্লর এখন আর সান্ত্বনা কোথায়? সে গুম হয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কঙ্কে-কাশি সমাদ্দারকে বলেন, 'ভারি দমিয়ে দিয়েছ তুমি বেচারাকে! ওর মুখ দেখলে মায়া হয়!'

সমাদ্দার ঘাড় নাড়ে। স্বভাবতই সে কোমল-হৃদয়, সত্যি-সত্যিই দুঃখ হয় ওর। 'বিজনেস, মিস্টার কঙ্কে-কাশি!' সে বলে।

'সে কথা হাজার বার। কিন্তু ভেবে দেখ দিকি কী সর্বনাশ হল ওর, হয়ত চাকরিই থাকবে না আর। ও তো ভেঙে পড়ছেই, আমিও খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না।' কঙ্কে-কাশি সমাদ্দারের চোখের উপর চোখ রাখেন—'কাগজখানা রাখলে কোথায় হে সমাদ্দার?'

সমাদ্দার হাসে, 'আমি যে রেখেছি আমি তো স্বীকারই করিনি।'

'না। এবং তোমাকে স্বীকার করতে বলছিও না। কিন্তু একথাও ঠিক, ও-কাগজ নিয়ে সটকাতে পারছ না তুমি, হাওড়ায় নেমেই আমি তোমাকে আটকাব এবং খানাতল্লাসি করব—যাকে বলে পুলিসের খানাতল্লাসি।'

সমাদ্দার আতঙ্কিত হয়। 'সেটা সঙ্গত হবে মিঃ কঙ্কে-কাশি? কাগজখানা যে আমার কাছে আছে তার বিন্দু প্রমাণও আপনি পাননি।'

'না পাই। কিন্তু কাগজখানা আমি পেতে চাই।'

কঙ্কে-কাশির সঙ্কল্প শুনে সমাদ্দারের শঙ্কা হয়। সে তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে যায়, গিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। অনেক ভেবে সে একটা উপায় আবিষ্কার করে। দরজার খিল আঁটে। তারপর নিজের সুটকেস বার করে এক কোণের একটা গুপ্ত বোতাম টেপে, তার পরে ডালার দিকে একটা লুকানো খুপরি খুলে যায়। তার ভিতর থেকে সদ্য অপহৃত নমিনেশন পেপার বেরিয়ে পড়ে।

সমাদ্দার কাগজটা পরীক্ষা করে। সেইসঙ্গে আরেকখানা অনুরূপ নমিনেশন পেপারও। দ্বিতীয় কাগজখানা ফাঁকা, এখানা তাকে দেওয়া হয়েছে আসল কাগজ চেনার সুবিধের জন্যে। সমাদ্দার দ্বিতীয় কাগজের যথাস্থানে প্রথম কাগজের দেখাদেখি ব্যানার্জির সই নকল করে বসিয়ে দেয়। হঠাৎ দেখলে মনে হবে একই কাগজ, হুবহু একই সই ; কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেই এ-সই যে জাল করা তা স্পষ্টই ধরা পড়ে যাবে।

অবশেষে জাল কাগজখানা গুপ্ত ডালার মধ্যে এঁটে রেখে, আসল কাগজটা একখানা লেফাফায় ভরে। খামের উপরে লেখে মিস্টার সরকারের নাম আর ঠিকানা। কাগজটা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় দেখে রেজেষ্ট্রি করে পাঠানোই সে সমীচীন মনে করে। ডাকে গেলেও তার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় পৌঁছবে এবং একেবারে তার নিয়োগকর্তার হাতেই, সুতরাং তার অসুবিধা কিছু নেই। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে, কাছাকাছি পোষ্ট-অফিসের উদ্দেশ্যে সে রওনা হয়।

প্রফুল্ল ঘরে ঢোকে। আপন মনেই যেন বলে, 'দরজায় তালা লাগিয়ে সমাদ্দারকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।'

'তাই নাকি?' কঙ্কে-কাশি সিগারেটের সামান্য অবশেষটা ফেলে দেন, 'তাহলে তো ওর ঘরটা আর একবার তল্লাস করতে হয়! এই তো সেরা সুযোগ।'

সব-খোল চাবির সাহায্যে সহজেই তালা খুলে যায়। প্রফুল্লকে নিয়ে তিনি ঢোকেন।

'কোথায় তুমি খুঁজেছিলে?'

তদুত্তরে প্রফুল্ল তার অনুসন্ধান বৃত্তান্ত প্রকাশ করে।

'এই সুটকেশটা দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ। ওর ভিতরেও দেখেছি। ওতে নেই।'

'দেখেছ ঠিকই। কিন্তু আরেকবার দেখা যাক।'

কঙ্কে-কাশি সুটকেসটাকে উন্মুক্ত করেন, ভিতরের যা কিছু জিনিসপত্র সব তাঁর পায়ের কাছে উজাড় হয়।

'দেখলেন তো? বললাম ওতে নেই।' প্রফুল্ল বলে।

কঙ্কে-কাশি ওর কথায় কান দেন না ; খুঁজতে খুঁজতে সেই গুপ্ত বোতাম আবিষ্কৃত

হয়। 'পেয়েছি প্রফুল্লবাবু, এতক্ষণে পেয়েছি।'

'কী?'

'এই দেখ।' চাবি টিপতেই সেই লুকানো ডালা ব্যক্ত হয়। তার মধ্যে একটা লম্বা লেফাফা। লেফাফাটা না খুলেই তিনি প্রফুল্লর হাতে দেন। 'এই নাও, কিন্তু সাবধান আর যেন খোয়া না যায়।'

প্রফুল্ল কম্পিত হাতে লেফাফা খোলে। কাগজখানা দেখেই সে লাফিয়ে ওঠে। তারপর দু-হাতে কঙ্কে-কাশির একখানা হাত চেপে ধরে—'আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম, আমাকে মাফ করুন—'

উত্তরে কঙ্কে-কাশির শুধু একটু মৃদু হাসি দেখা যায়। সমস্ত জিনিস যথাযথ রেখে তেমনি তালা এঁটে তাঁরা বেরিয়ে আসেন।

সমাদ্দার হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকেই তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে কঙ্কে-কাশির কাছে। 'এটা কি ভাল কাজ আপনার মশাই? আমার অবর্তমানে আমার ঘরে ঢুকে, সুটকেশ খুলে—'

কঙ্কে-কাশি বাধা দেন—'আমরাই যে তোমার সুটকেশ খুলেছি তার কী প্রমাণ তুমি পেয়েছ? প্রমাণ ছাড়া তুমি তো চল না সমাদ্দার।'

প্রফুল্ল এতক্ষণে মন খুলে হাসতে পারে।

সমাদ্দার গজরাতে থাকে, ভয়ানক রাগের ভান করে ; কিন্তু সেও মনে মনে হাসে।

আর মিস্টার কঙ্কে-কাশি? তাঁর মুখে হাসি দেখা যায় না।

সমাদ্দার চলে গেলে প্রফুল্ল মুখ খোলে—'একবার বাগাতে পেরেছে, আর পারবে না এ কোট আর আমি গা থেকে খুলছি না। রাত্রেও না।'

'ঠেকে শেখা ভয়ানক শেখা প্রফুল্লবাবু!' কঙ্কে-কাশি ঘাড় নাড়েন, 'এবং একবারই একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।'

'আচ্ছা, মিস্টার কঙ্কে-কাশি, সুটকেশটার যে একটা গোপন খুপরি আছে কী করে আপনি বুঝলেন?'

'তোমার কোটের লাইনিং আছে যেমন করে সমাদ্দার বুঝেছিল।' কঙ্কে-কাশি ব্যাখ্যা করে দেন—'ও থাকতেই হবে। তোমার কি ডিটেকটিভ উপন্যাস একেবারেই পড়া নেই প্রফুল্লবাবু?'

প্রফুল্ল নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করতে লজ্জা পায়। একেবারেই যে এক-আধখানা ওর পড়া নেই তা নয়, তবু সে সসঙ্কোচেই বলে, 'এবার থেকে পড়ব কিন্তু।'

কলকাতায় ফেরার পরদিনই কঙ্কে-কাশি সমাদ্দারের আড্ডায় গিয়ে আবির্ভূত হন, 'আসতে পারি ভেতরে?'

'আসুন, আসুন। আমার কী সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন।' সমাদ্দার শশব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'সরকারদের কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে গেছ তো?' কঙ্কে-কাশি জিজ্ঞাসা করেন।

'হ্যাঁ, কালই দিয়ে দিয়েছে। নগদ পাঁচটি হাজার।' সমাদ্দার উত্তর দেয়, কেন, কী হয়েছে তার?

pathagar.net

'না, এমন কিছু না। কঙ্কে-কাশি তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকান। এখন দশটা, আর এক ঘণ্টা পরেই প্রেসিডেন্সি কোর্টে নমিনেশন পেপার সব দাখিল হয়েছে কিনা! তোমাকে আমি কেটে পড়তে বলতে এসেছি। বন্ধুভাবেই বলতে এসেছি অবশ্য!'

'কেটে পড়ব! আমি? কেন?' সমাদ্দার সচকিত হয়।

'সরকারদের পার্টির কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছ এইজন্যে। ওদের হাতে খুনে গুণ্ডা তো কম নেই, যাদের তুলনায় তুমি আস্ত দেবদূত!'

'ফাঁকি দিয়ে নিয়েছি কী রকম?' সমাদ্দার এবার হাসে, 'আপনি কি এখনো বুঝতে পারেন নি, মিস্টার কঙ্কে-কাশি, আমার সুটকেশ থেকে যে কাগজ আপনি বের করে নিয়েছিলেন তা আসলে জাল-সই করা?

'আগাগোড়াই তা আমি জানতাম।' কঙ্কে-কাশির গলার স্বর গম্ভীর।

'তবে—?'

'আসলে একটা কথা তুমি নিজেই এখনো বুঝতে পারনি, সমাদ্দার। প্রফুল্লর পকেট থেকে যে কাগজ তুমি বাগিয়েছিলে তাও জাল ছাড়া কিছু না।'

'অ্যাঁ?' এবার সত্যিই চমকে ওঠে সমাদ্দার। 'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়! যে সময়ে তুমি বাগানবাড়ির গেটে প্রফুল্লর জন্যে অপেক্ষা করছিলে সেই সময়ে আমি শহরে ফিরে গলস্টোন কোম্পানির অফিস থেকে আসল কাগজখানা হস্তগত করি। স্টেশনে নেমেই গলস্টোন সাহেবকে ফোন করে আমি ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম যাতে সাহেবের বাড়ি থেকে প্রফুল্লকে একখানা নকল নমিনেশন পেপার দেওয়া হয়— এখন সব বুঝতে পারছ তো? যাতে তোমার নজর একেবারেই আমার দিকে না পড়ে সেইজন্যেই আমার এত কাণ্ড করা। প্রফুল্লকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং সব কিছু। অমন মূল্যবান কাগজ আমি নিতান্ত অবহেলাভরে আমার এই কোটের পকেটে করে নিয়ে এসেছি, ইচ্ছেমত জামা খুলেছি ; রেখেছি তুমি তা ঘূণাক্ষরেও জানতে পার নি। প্রফুল্লও তা জানে না ; কোনদিন জানবেও না। যাক, বেচারা আনন্দেই আছে, ওর বেতন বেড়ে গেছে খবর পেলাম।—'

রহস্যের সন্ধানে

আশাপূর্ণা দেবী

বাবার নতুন কেনা এই পুরনো বাড়ীটায় এসে বাসুর ভারী স্ফূর্তি। এটা মোটেই তাদের রেলকোয়ার্টারের বাড়ীর মতো ঝাড়াঝাপটা হালকা-পাতলা নয়। বেশ কেমন ভারীভুরি, আর আলো-অন্ধকারে মেশানো। জায়গায় জায়গায় কেমন লুকোচুরি খেলার মত হঠাৎ একটা সরু প্যাসেজ, হঠাৎ তার গা দিয়ে ছোট্ট একটা কোনাচে ঘর, সিঁড়ির চাতাল দিয়ে বেরিয়ে পড়ে আচমকা একটা বারান্দা, আর সব থেকে মজা-ঘরে দালান এখানে—সেখানে এক একটা দেওয়াল আলমারি। ছোট বড় নানান মাপের।

পুরনো পুরনো সেই আলমারিগুলো খুললেই কেমন একটা চাপা চাপা ভ্যাপসা ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, বাসুর দারুণ ভালো লাগে। যেন এর মধ্যে কি একটা রহস্য লুকিয়ে ছিল, আগের মালিকরা সেটা নিয়ে চলে গেছে। ভিতরের দেওয়ালগুলো তাই বোবা মুখ করে ক্ষুণ্ণ হয়ে বসে আছে।

একটা আলমারির তাকের মধ্যে খানিকটা কালির ছিটে, কেমন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ। তার মানে এটায় ওরা সব কিছু রাখতো। দালানের তাকগুলোয় যে বই রাখতো

সেটা তার মেঝের দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ভাঁড়ার ঘরের দেয়ালের কুলুঙ্গিতে নির্ঘাৎ কোনো ঠাকুরের মূর্তি থাকতো। তা নইলে কুলুঙ্গির মাথায় ধূপের ধোঁয়ার দাগ কেন?

বাসু এই সব ঘুরে ঘুরে দেখে আর বলে, বাসুর দিদি হাসে। আর কিনা মাকে ডেকে ডেকে বলে, 'মা, তোমার পুত্তুরটি ভবিষ্যতে ডিটেকটিভ হবে যা অবজারভেশান? আর যা অনুমানশক্তি।'

বাসু অবশ্য তাতে দমে না, চিরদিনই তো বাসুকে 'ডাউন' করাই দিদির জীবনের মূল লক্ষ্য। তাই দিদির কথায় কান না দিয়ে বাসু অভিযান চালিয়ে যায়। সেকেলে পুরনো বাড়ি, দু'দিকে দেয়াল দেওয়া চাপা সিঁড়ি, তাই সিঁড়ির তলাটা অন্ধকার ঘুটঘুটে। মা বলেন, 'আগের দিনে লোকে এই ঘরটাকে চোরা-কুঠুরি বলত।'

বাসু বলল, 'আগের দিনে যদি বলতো......তা'হলে এখন বললেই বা দোষ কি? মা হেসে ফেলে বললেন, 'চোরা-কুঠুরি, চিলেকোঠা, কথাগুলো যেন বড্ড সেকেলে। আমার ঠাকুমা-দিদিমারা বলতেন।'

বাসু গম্ভীরভাবে বলল, 'তোমার ঠাকুমার ঠাকুমা তাঁর ঠাকুমা তাঁরও ঠাকুমা তো ভাতকে ভাত বলতেন, তুমিও তাই বল কেন?'

কিছুই হাসির কথা বলেনি বাসু, তবু বাসুর কথা নিয়ে বাড়ি সুদ্ধ সকলের সে কী হাসির ধুম। 'ওরে বাবা ছেলের কি লজিকের জ্ঞান।...ওঃ বাসু কালে উকিল হবে।' এই সব বাজে বাজে কথা থাক, কথাকে বাসু কেয়ার করে না। তার বাংলার মাস্টার মশাই বলেন, 'কারো সমালোচনায় লজ্জা পেয়ে কোনো কাজে পিছিয়ে যাওয়া ভীরুর লক্ষণ। লোকের কথায় ভয় পেলে মহৎ কাজ হয় না।'

কাজেই বাসু ওই সব ঠাট্টা ফাট্টায় লজ্জা না পেয়ে এই বাড়িটার রহস্য আবিষ্কারের মহৎ ব্রত নিয়ে খেটে যাচ্ছে। বাসু 'ছোটদের গোয়েন্দা গোকুল সেন' বইটা পড়েছে। একটা ভীষণ পুরনো জমিদার বাড়ী ভাঙা হতে দেখা গেল তার কড়িকাঠের খাঁজে খাঁজে চোরা কুলুঙ্গি, আর তার মধ্যে রাশি রাশি সোনা।

এই বাড়িটার কড়িকাঠগুলোও ভারী ভারী আর যেন ঝুলে পড়া ঝুলে পড়া। কে বলতে পারে ওর অন্তরালে তেমন চোরা কুলুঙ্গি আছে কি না। ঘাড় উঁচু করে হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বাসু কোনোখানে সন্দেহজনক কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা।--- কিন্তু দেখা গেলেই বা কি? বাসু নিজে তো আর মইয়ে উঠে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে না। আর বড়দের বললে? তারা তো হাসির তোড়েই বাসুকে উড়িয়ে দেবেন।....

কিন্তু এখন?

এখন কি হলো?

এখন সকলের মুখ হাঁ, চোখ ছানাবড়া, আর নাক রসপুলির মত হয়ে গেল কি না?

সিঁড়ির তলার ওই চোরা-কুঠুরির দেওয়ালে একটা চোরা আলমারি আবিষ্কার করে ফেলেনি বাসু?

এখানে যে আগের লোকেরা ডাঁই করে কয়লা ঢেলে রাখতো তার স্মৃতিচিহ্ন এখনো জ্বলজ্বলাট, এমন কি কয়লার চাঁইও কিছু কিছু ছিল। কিন্তু বাসুর মত অবজারভেশন শক্তি না থাকলে কি কেউ ধরতে পারত ওই কয়লা-মাখা ময়লা দেয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট

কাটা খাঁজ আছে। আর তার মধ্যে একটা ক্যাশবাক্স বসানো আছে। কয়লা ঢালা জায়গায় এমনিতে কারোর চোখই পড়ত না, বাসু কয়লার চাঁইগুলো সরিয়ে দেখেছিল বলেই না— হঠাৎ বাক্স দেখেই বাসুর হাত-পা ঠাণ্ডা।

অথচ উল্লাসও আছে।

তাই কাঁপা-কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে সেই দিদিকেই ডেকে ওঠে-যে দিদির জীবনের লক্ষ্য বাসুকে ডাউন করা।....কিন্তু উপায় কি? দিদি ছাড়া বাসুর সুখ-দুঃখের ভাগীদার হতে আসছে কে?

বাসুর 'দিদি' ডাক শুনেই দিদি দুদ্দাড়িয়ে নেমে আসতে-আসতে বললো, 'হলোটা কি? বিছে কামড়েছে নিশ্চয়। কামড়াবেই তো। খেলবার আর জায়গা পায়নি।'

কিন্তু দিদি এসে থমকে দাঁড়ালো। বাসু দিব্যি জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে, তবে বাসুর চোখ দুটো গোল আলুর মত। আর মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতো।

দিদি আসতেই বাসু নীরবে শুধু আঙুল বাড়িয়ে দেখালো।

'কি ও?'

'দেখ্ না।'

'বাক্স!'

'হুঁ!'

'কিসের বাক্স?'

'ভগবান জানেন।'

'এই জায়গায় বাক্স কেন?'

দিদি ভয় ভয় গলায় বলে, 'টাকাকড়ি লুকানো নেই তো? যারা ছিল, যাবার সময় হয়তো ভুলে গেছে।'

pathagar.net

বাসু গম্ভীর ভাবে বলে, 'টাকাকড়ি কেউ ভুলে যায়? হয়তো বাড়িতে আগুন লেগেছিল, তাই তাড়াতাড়ি—'

'দূর, আগুন লাগলে তো পরে আবার ফিরে আসবে। তাছাড়া কই, কোথায় আগুন লেগেছিল, বাড়িতে তো দাগ নেই।'

'দিদি, তাহলে বোধ হয় ভূমিকম্প!'

'মোটেই না, তাতেও পরে চলে আসবে লোকে।'

'তবে বোধ হয় ডাকাত পড়েছিল দিদি। ওরা ভয়ে পালিয়ে গেছে। আর কখনো আসেনি।'

দিদি বলে, 'তা হতে পারে। কিন্তু ডাকাতরা কি তন্ন তন্ন করে না দেখে ছাড়তো? ওরা তো শুনেছি বালিশ ছিঁড়ে তুলো বার করে দেখে—'

'দিদি ঠিক হয়েছে। যে রেখেছিল, সে বোধ হয় হঠাৎ মরে গেছে কাউকে বলে যেতে পারেনি।'

দিদি মহোল্লাসে বলে, 'ঠিক, ঠিক বলেছিস। তোর বুদ্ধি হ্যাজ।'

এই প্রথম দিদি বাসুর বুদ্ধির তারিফ করলো।

কিন্তু বাক্সটা টানা যায় কি করে?

খাঁজের মধ্যে যা আঁটা। বাসুর অসাধ্য।

'দিদি, তুই পারবি?' 'উহুঁ আমার বাবা ভয় করছে যদি পিছনে সাপ টাপ থাকে'। 'তবে? তবে কি বৃন্দাবনকে ডেকে আনবো? ওর গায়ে তো খুব জোর।'

দিদি আস্তে বলে-'এই, চুপ। চেচাঁস না। যদি অনেক সোনা টোনা থাকে, বৃন্দাবন সবাইকে বলে বেড়াবে–'

'তাহলে মাকে ডাকি?' বললো বাসু। দিদি হেসে ওঠে, 'আহা রে মার গায়ে কী জোর।'

'তাহলে ছোটকা ছাড়া কোন গতি নেই।'

'ছোটকা।'

ছোটকা মানেই তো সব চাঁটি খাওয়া, তবু উপায় কি?

বাক্সটাকে তো টেনে বার করতে হবে।

ছুটির দুপুরে বাবা নিদ্রা মগ্ন, কাকা বইমগ্ন, বাসু গিয়ে বলে,

'ছোটকা, আবিষ্কার।'

'আবিষ্কার তো–'

ছোটকা হেসে উঠে বলে, 'কি? ব্যাঙাচির মধ্যে বৃহৎ বিশ্বের, ছায়াল,'

'আঃ কেবল বাজে কথা, দেখাব চলো চোরা কুঠুরিতে বাক্স।'

'বাক্স? কার বাক্স?'

'বাড়িটা যাদের ছিল তাদের নিশ্চয়ই।'

'কিসের বাক্স?'

'আঃ! তুমি চলোই না–' কাকার হাত ধরে টান মারে বাসু।

অগত্যাই যেতে হয় কাকাকে।

গিয়েই কাকার মুখ গম্ভীর। 'খবরদার কেউ হাত দিও না। বাবাকে ডাকো।' দিদি ভয় পেয়ে ছুটে চলে যায় বাবাকে ডাকতে। কিরে বাবা, ভৌতিক বাক্স? না কি সাপ খোপ আছে?

বাবা আসেন, মা আসেন এবং তারা বিজবিজ করে যা বলাবলি করতে থাকেন, তার থেকে এইটুকু বুঝতে পারেন বাসু এই বাক্সয় কারো হাত দেওয়া হবে না। পুলিসকে খবর দিতে হবে। তারা নিয়ে গিয়ে থানায় জমা দেবে।

শুনে বাসু প্রায় ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেলে। এত কষ্টের আবিষ্কার বাসুর, পুলিশ এসে নিয়ে গিয়ে থানায় জমা দেবে? বাসুরা নিজে মজা করে খুলে দেখতে পাবে না? 'কেন?' আমরা কি চোর?

কাকা বলল, 'এখন চোর নই, কিন্তু ওই পরের বাক্সর মালটি নিতে গেলেই চোর হয়ে যাবো, আইন হচ্ছে এ রকম–গুপ্তধন পেলে তা পুলিশের হাতে তুলে দিতে হয়।'

আর কী করা।

বাবা থানায় ফোন করেন। পুলিশ আসে জনা তিনেক। তারা অন্ধকারে হেঁট হয়ে টর্চ জ্বেলে ব্যাপারটা দেখে নেয়, তারপর জেরা করতে থাকে। কবে কেনা হয়েছে এ বাড়ী? কার কাছ থেকে? তারা কোথায় থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

Pathagar.net

তবে বহু পুরানো বাড়ীওয়ালা মাদ্রাজে চলে গেছে শুনে নাক কুঁচকে হ্যাঁচ করে এক টান মেরে বাক্সটাকে বার করে আলোয় নিয়ে এল। টানের চোটে দেয়ালের বালি চাপড়া খসে পড়ল খানিকটা। দিদি ফিসফিস করে বললে, 'এই বাসু, বাবাকে বলনা—ওরা নিয়ে যাবার আগে একবার অন্ততঃ আমাদের দেখিয়ে যাক।'

বাসু বেজার মুখ করে বললে, 'দেখিয়ে আর কি হবে! যা আছে তা তো নিয়েই চলে যাবে। আশ্চর্য! ছোটকার এই নিষ্ঠুরতার কোনো মানে হয়?'

তা' বাসুকে আর বলতে হয় না, দেখা যায় এরা খোলবারই চেষ্টা করছে।.....এমনি খুলতে না পেরে বলে, 'চাবি আছে?'

'চাবি? আমরা চাবি কোথায় পাবো?'

ছোটকা বেশ রাগের গলায় বলে, 'বাক্সের হিষ্ট্রি জানায়নি আপনাদের?' 'হুঁ, তা একটা ইঁয়ে টিয়ে কিছু দিন, চাড় দিয়ে খুলে ফেলার মতো—'

শুনে সকলেই উত্তেজিত। এতক্ষণে যেন একটা ঘোরালো রহস্যের সূচনা দেখা দিয়েছে। সকলেই চঞ্চল হয়ে ইঁটে-টিয়ে' খুঁজতে ছোটে।

.....মা নিয়ে আসেন একখান লম্বা খুন্তি, ছোটকা একখানা ক্ষুদে বাটালি, দিদি একটা পেন্সিল কাটা ছুরি আর বাসু একখানা পুরোনো ব্লেড।

পুলিশ ইন্সপেক্টর ওগুলোর দিকে একটু অবহেলার দৃষ্টিতে তাকিয়ে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করে নিজেই সংগ্রহ করে নেন একখানা কয়লা ভাঙা হাতুড়ি, ঠাঁই করে বসিয়ে দেন ডালার ওপরে। চমকে ওঠে সবাই।

মা বলেন, 'ঠিক জানি বাবা, ভেতরে ঠাকুর টাকুর নেই তো!' বাবা বললেন, 'মাথা খারাপ, ওইখানে লোকে ঠাকুর রাখতে আসে? চোরাই মাল বলেই মনে হচ্ছে। বোধ হয় বাড়ির কোনো চাকর-টাকর নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল, তারপর আর সরাতে সুবিধে পায় নি।' দিদি বলে, 'আমার মনে হচ্ছে কোনো গুপ্তধনের ব্যাপারে ম্যাপট্যাপ আছে। সেই যে গল্পটা মা একদিন বলেছিল, মনে আছে? একটা ছোট্ট ছড়ার মধ্যে গুপ্তধনের ঠিকানা। এমা মনে নেই? সেই যে—

পায়ে ধরে সাধা
রা নাহি দেয় রাধা
শেষে দিল রা
পাগোল ছাড় পা।

তার মানে ওর মধ্যে রয়েছে। 'ধারাগোল! এও হয়তো তেমনি কোনো-'

আর বলতে হলো না, আবার হাতুড়ির প্রচণ্ড ঘা পড়লো ঠাঁই ঠাঁই...সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের ডালা ছিটকে উঠে পড়লো।

আর তারপর?

তারপর পুলিশ সাহেব নিজেই লাফিয়ে ছিটকে উঠলেন।...

অতঃপরে আর সবাই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছিটকে একেবারে কে কার ঘাড়ে পড়ে?

সকলের মুখে একই কথা 'এই এই এইরে বাবা! আরে আরে কি সর্বনাশ' লম্ফঝম্পর ব্যাপার শুরু হয়ে যায়।

বাক্স খোলামাত্র ডজন ডজন নেংটি ইঁদুর বেরিয়ে পড়ে ঝুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছে এর পায়ের ওপর দিয়ে ওর পায়ের ওপর দিয়ে।

কে জানে কতকাল ধরে পুত্রপৌত্রাদি সমেত রাজ্য বিস্তার করে ভোগ দখল করে আসছে।

কিন্তু খাচ্ছিল কি? না খেয়ে তো বাঁচতে পারে না। আর বংশের এতো বাড়বাড়ন্ত হতে পারে না। তাছাড়া হাওয়া বাতাসেরও দরকার।...তা দেখা গেল সে ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করে নিয়েছে। ইঁদুর হলেও ওরা মানুষের থেকে কম বুদ্ধিমান নয়। ওদের মধ্যেও ছুতোর আছে মিস্ত্রী আছে, ইঞ্জিনীয়ার আছে, বাক্সের দেওয়ালে দিব্যি দোর, জানালা বানিয়ে নিয়েছে।

আর খাওয়া? দেখা গেল বাক্সের মালিক এদের সাতপুরুষের 'বসে খাওয়ার' ব্যবস্থা করে গেছেন।...এতকাল ধরে খেয়ে দেয়েও এখনো যা রয়েছে তা কম নয়,...কে জানে ওই কুচি কাগজের রাশি কোনো উইলের অথবা দলিলের না কি কোনো গুপ্তধন আবিষ্কারের নকশা,...পুলিশ যদি নিয়ে গিয়ে ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতে দিয়ে দিতো, তা হলে, রহস্য উদঘাটন হতো...কিন্তু পুলিশ প্রভুরা সে দিক দিয়ে গেলেন না। বেজায় বিরক্ত মুখে সকলের দিকে একটু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেলেন।

গোবিন্দদার গোয়েন্দাগিরি

সুনির্মল বসু

সেদিন ভোরবেলা শহরের সমস্ত দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে এই সংবাদটি বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল।

পাঁচশত টাকা পুরস্কার

বাগবাজারের গলিতে কে বা কাহারা একটি অজ্ঞাত বাঙালি যুবককে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারীর সন্ধান যে দিতে পারিবে, তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এই ঘোষণাটি পড়ে আমাদের গোবিন্দদা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। গোবিন্দদাকে তোমরা চেন না? ওই যে যিনি ঘুঁটের ব্যবসা করে এক সময়ে বিস্তর টাকা উপার্জন করেছেন, যাঁর অব্যর্থ ছারপোকা-বিধ্বংসী পাচন এক সময় সারা বাংলায় হুলুস্থূল লাগিয়ে দিয়েছিল!

ছারপোকা-বিধ্বংসী পাচন! তোমরা যে অবাক হয়ে যাচ্ছ! তোমাদের অবাক হয়ে যাবার কথাই তো! তখন তোমরা নেহাত ছেলেমানুষ, জানবেই বা কেমন করে?

ছোট্ট ছোট্ট লাল শিশিতে নীল রঙের তরল ওষুধ, তার সঙ্গে ব্যবস্থাপত্র থাকত। ব্যবস্থাপত্রে ছাপার অক্ষরে লেখা থাকত—অতি সাবধানে ছারপোকা ধরিয়া, তাহাকে হাঁ করাইয়া এই অব্যর্থ পাচন এক ফোঁটা মুখে দিয়া দিবেন! খুব সাবধান, দেখিবেন পাচন খাওয়াইবার আগে যেন ছারপোকা মরিয়া না যায়! এই পাচন কার্যকরী না হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দিব।

এই পাচন এখন আর পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে অবশ্যই তোমরা এক-এক শিশি নিয়ে পরীক্ষা করতে পারতে!

তারপর গোবিন্দদার ভুঁড়ি-সংহারী মালিশ এক অদ্ভুত আবিষ্কার। যত বিপুল ভুঁড়িই হোক না কেন—এই মালিশের গুণে একদম আমসত্ত্বের মতো চুপসে যেত! ভুঁড়িতে মালিশ লাগাবার পর পনেরো দিন মাত্র উপোসের ব্যবস্থা—তারপরেই ব্যস, হাতে হাতে ফল! সে ওষুধও আজকাল আর বাজারে নাই।

যাক্—গোবিন্দদা এখন ওসব আবিষ্কারের পথ ছেড়ে দিয়ে সখের গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করেছেন। এমন উর্বর মস্তিষ্ক—তিনি আর ছোটখাটো কাজে নষ্ট করতে রাজি নন। এই তো সেদিন তিনি একটা ডাকাতের দল প্রায় ধরে ফেলেছিলেন আর কি! অবশ্য জানা গেল, সেটা ডাকাতের দল নয়, সেটা—কংসহারী যাত্রা-পার্টি।

এরকম ভুল অনেক বড় বড় গোয়েন্দারও হতে পারে। গভীর রাতে একদল লোক মুখে রং-চং মেখে ঢাল-তলোয়ার ছোরা-ছুরি নিয়ে যদি কোথাও যায়, কে-না তাদের ডাকাতের দল বলে মনে করে? গোবিন্দদারও তাই ভুল হয়েছিল। কিন্তু ভুল তো নাও হতে পারত। কংসহারী যাত্রাপার্টি না হয়ে, হয়তো ধ্বংসকারী ডাকাতের দলও হতে পারত!

আর একবার একটা টুকরো চিঠির অংশ কুড়িয়ে পেয়ে গোবিন্দদা একটা হত্যার ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছিলেন আর কি! চিঠির টুকরোতে লেখা ছিল—

আজ রাত্রেই সাবাড় করতে হবে। না হলে...

তারপর অবিশ্যি চিঠির অপর অংশও পাওয়া গেল—সে দুটো অংশ জুড়লে দাঁড়ায় ঃ

প্রিয়নাথ,

বরিশাল থেকে যে রসগোল্লা এসেছে সেগুলো আজ রাত্রেই সাবাড় করতে হবে। নাহলে পচে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা। তুমি নিশ্চয়ই এসো। ইতি,

সুধীন।

গোবিন্দদা সেদিন ষড়যন্ত্র ধরতে গিয়ে খুব একচোট রসগোল্লা খেয়ে এসেছেন,—এতে তাঁর লাভ-বই লোকসান কিছু হয় নাই।

যাক্, এইবার তোমাদের আসল গল্পটা বলি।

সেদিনকার খবরের কাগজে হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে গোবিন্দদা মনে মনে ঠিক করলেন, তিনি গোপনে এই ব্যাপারের তদন্ত করে পুলিশকে সাহায্য করবেন। ফাঁকতালে যদি পাঁচশো টাকা লাভ করা যায়, তা এই মাগ্গির বাজারে মন্দ কি! আর টাকা না পেলেই বা কি, খবরের কাগজে যখন বড় বড় করে গোবিন্দদার বাহাদুরীর খবর বেরুবে--তখন...গোবিন্দদাকে আর পায় কে?

সেদিন রাত্রি বারোটায় গোবিন্দদা বাসে চড়ে কালীঘাট থেকে শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। অত রাত্রে বাসে বেশি কেউ ছিল না। ঠিক সামনের আসনে দু'জন ভদ্রলোক আর ঠিক তার পিছনে বসে গোবিন্দদা।

বাঙালি দু'জনের মধ্যে একজনের খুব রোগা ছিপছিপে চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, চোখে কালো চশমা, আর একজনের বেশ বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা!

ফাঁকা রাস্তায় বাস হু-হু করে ছুটে চলেছে। গোবিন্দদা অন্যমনস্ক—সেই হত্যা-রহস্যের এখন পর্যন্ত কোনও কূলকিনারা পান নাই।

হঠাৎ তাঁর মনে হলো সেই রোগা লোকটি তার সঙ্গীকে বলছে,—গোবর্ধনকে মেরে ফেললাম।

সঙ্গী প্রশ্ন করল, কি করে?

বিষ খাইয়ে।

এই পর্যন্ত, ব্যস্!—গোবিন্দদার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল, আগুনের মতো গরম নিশ্বাস পড়তে লাগল,—ওঃ একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়েছে! পাছে কোনও রকমে সন্দেহ করে—তাই গোবিন্দদা মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন রেখে লোক দুটোর উপর কড়া নজর রাখতে লাগলেন। আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই কিছুতেই।

বাগবাজারের মোড়ে লোক দুটো নামল।—হ্যাঁ—এই বাগবাজারের কোনও গলিতেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি? তোমরা ঘোরো ডালে ডালে, গোবিন্দদা ঘোরেন পাতায় পাতায়!

গোবিন্দদা বামদিকে নেমে চুপে চুপে খুনি লোকটিকে অনুসরণ করে চললেন। বাড়িটা জেনে এক্ষুণি পুলিশে খবর দিতে হবে।

ওই যে বাড়ি, গ্যাসের আলোতে বাড়ির নম্বরটা বেশ পড়া যাচ্ছে—১৫ নম্বর। আচ্ছা দাঁড়াও।

গোবিন্দদা পুলিশে ফোন করলেন—হ্যালো, শিগ্‌গির আসুন, হত্যাকারীকে ধরেছি, ঠিকানা ১৫ নং—স্ট্রিট, আমি বাড়ির সামনেই অপেক্ষা করছি।

পুলিশ এল, গোবিন্দদা সেই রোগা লোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই আসামি।

তারপরের দিনের ঘটনা। গোবিন্দদা মুখ চুন করে বাড়ি এলেন। তিনি আমাদের কিছু বললেন না বটে, তবে আমরা খবর পেলাম গোবিন্দদা হত্যাকারী সন্দেহ করে একজন উদীয়মান সাহিত্যিককে ধরেছিলেন।

সাহিত্যিক বেচারীর একটি উপন্যাস সাময়িক একটা কাগজে প্রতি সপ্তাহে বের হচ্ছিল। সেই উপন্যাসের নায়ক হচ্ছেন গোবর্ধন। সেই গোবর্ধন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে—পরের সংখ্যায় এই বিষয়টি বেরুবে—তাই সাহিত্যিক বায়োস্কোপ দেখে ফিরবার পথে সেই কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে এই সম্বন্ধেই আলোচনা করছিলেন। গোবিন্দদা অতটা বুঝতে পারেননি।

তা গোবিন্দদার আর কি দোষ? ভুল তো সকলেরই হয়।

pathagar.net

খুনি কে

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

অমল ও সুরেশ দুই বন্ধু। সুরেশ থাকতো পেশোয়ারে। এসেছে কলকাতায় বেড়াতে। উঠেছে অমলের বাড়ি।

বাড়িতে অমল থাকে একা। দোতলা বাড়ি। অমল অনেক টাকার মালিক। পৈতৃক সম্পত্তি তো পেয়েইছে ; মাতৃক অর্থাৎ দাদামশায়ের খানদুই বাড়িও মাস-কতক হলো তার হাতে এসেছে। এক মামা। সেও আবার পাতানো। টাকা-পয়সা পেলেও অমলের মাথা ঠিক আছে। সে বাবুগিরি করে না। সখের মধ্যে যা দেখা যায়, তা হচ্ছে বই কেনা ; কেবল কেনা নয়, সেই সঙ্গে পড়াও।

সে উত্তর-ভারতে বেড়াতে গিয়ে সেবার পেশোয়ারে সুরেশের বাড়িতে অতিথি হয়েছিল। সুরেশ সেখানে রেলে চাকরি করে। মাইনে যা পায়, তা বেশ। সেখানে খাতিরও খুব। অনেকদিন বাঙলাদেশ ছাড়া। তাই কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে।

সে-রাতে একটা বিশ্রী শব্দে সুরেশের ঘুম ভেঙে গেল, কিন্তু ঘুমের ঘোরটা গেল না। সে প্রথমে বুঝতে পারলে না কোথায় আছে। পরক্ষণেই তার মনের জড়তা কেটে গেল।

বুঝতে পারলে, সে আছে অমলেরই বাড়িতে। কিন্তু শব্দটা কিসের? সম্ভবত ঝড়ের। ঝড়েই যেন জানলা-দরজার পাল্লা দড়াম্ করে বন্ধ করলে! কিন্তু তারপরও সেই রকম শব্দ হতে লাগলো।

শীতকাল ; তাই সুরেশের দরজা-জানলা বন্ধই ছিল। কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম সব সময়েই অমলের জানলা খুলে শোবার অভ্যাস ; সে বলতো, জানলা বন্ধ করে শুলে আমার দম আটকে যায়! শব্দটা যেন সুরেশেরই ঘরখানার নিচে হচ্ছে! তার ঘরের নিচে আছে অমলের পড়বার ঘর। হয় সে এখনও পড়ছে অথবা জানলা খুলে রেখেই শুতে গেছে! পড়বার ঘরের পাশেই তার শোবার ঘর।

এই সব ভেবে সুরেশ আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ঘুম আর এলো না, থেকে থেকে শুধু শব্দই হতে লাগলো!

সে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। ঘড়ি দেখলে—রাত দুটো!

আবার দড়াম্ করে শব্দ হলো। এরকম শব্দ হতে থাকলে ঘুমোনোই দায়! সুরেশ বিছানা ছেড়ে উঠলো। মোটা আলোয়ানখানা গায়ে, চটিজোড়া পায়ে দিয়ে, ধীরে ধীরে সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

দরজার পাশে সুইচ ছিল। সুইচটা টিপতেই বারান্দাটি আলোকিত হলো। সামনে নিচের সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় আলো ছিল। সে বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ির আলো জ্বেলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই, পরিষ্কার বুঝতে পারলে শব্দটা কোথা থেকে আসছে!

সুরেশ ঘরখানার দরজাটা টানতেই খুলে গেল। ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। অমল কি এখনও পড়ছে? না,—সামনের দিকে তাকিয়েই তার হাত-পা অসাড় হয়ে গেল, আর এক পাও নড়বার শক্তি রইলো না! সে দেখলে, অমল কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে হাত দু'খানা ছড়িয়ে পড়ে আছে। তার কপালে একটি ক্ষত। সেই ক্ষত থেকে রক্ত বার করে একটি লাল ধারায় কার্পেটে পড়ছে।

ক্ষতটি দেখে সুরেশের মনে পড়লো, এরকম ক্ষত হয় রিভলভারের গুলিতে। সে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো, তাহলে সেই অস্ত্রটি কোথায়? কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে কিছুই দেখতে পেল না। এটা খুন, না আত্মহত্যা? আত্মহত্যা হলে অস্ত্রটা কাছেই থাকবে, খুন হলে খুনিই সেটা নিয়ে গেছে। কিন্তু—সুরেশ সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে অমলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো। সেই সময় অমল একবার চোখ মেলে তাকালো এবং তার ঠোঁট দু'খানি কেঁপে উঠলো। সে যেন কি ফিস্ ফিস্ করে বললে!

সুরেশ তার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলে, অমল, এ কি? কে করলে এ কাজ?

অমল অতি কষ্টে ফিস্ ফিস্ করে বললে, সুরেশ, সে আমাকে খুন করেছে। পুলিশকে বলো যে—

ঠিক সেই সময় জানলায় এত জোরে শব্দ হলো যে, অমলের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।

সুরেশ আরও ঝুঁকে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, আমি শুনতে পাচ্ছি না অমল, কে?

কিন্তু অমলের কণ্ঠস্বর চিরদিনের মতো থেমে গেল!

সুরেশের হাত-পা আর চললো না। সে অসাড়ের মতো তার দিকে তাকিয়ে হাঁটু

গেড়ে বসে রইলো। কিন্তু একটু পরেই স্বপ্নের মতো মনে হলো, সেখানে আরও কে এসে দাঁড়িয়েছে!

সুরেশ তাকিয়ে দেখে, দরজায় অমলের এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় দাঁড়িয়ে। সে-ও এসেছে দিন-দুই হলো, শিলং থেকে কলকাতায়। নাম তার শরৎ।

শরৎ বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় পুরুষ ; সে জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে সুরেশবাবু!

—অমলকে কেউ খুন করেছে। আপনি নিচে ওর সরকারকেও জানান। আমি ততক্ষণ এইখানেই থাকবো।

শরৎ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। সে শুয়েছিল সুরেশের পাশের ঘরে।

শরৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সুরেশ জানলাটা বন্ধ করে দিলে। টেবিলের ওপর টেলিফোন ছিল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে পুলিশকে আসবার জন্যে থানায় ফোন করলে। একজন ডাক্তারকেও সঙ্গে আনতে বললে।

পুলিশ যখন এল, তখন হল্-ঘরে বাড়িরই কয়েকজন জমা হয়েছে। সব ঘরেই আলো জ্বলছে। এমন কি, বাড়ির চারধারে যে বাগানখানি ছিল, সেখানেও আলো জ্বলছিল।

ডাক্তারকে নিয়ে পুলিশ তাড়াতাড়ি অমলের পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ডাক্তার অমলকে পরীক্ষা করে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন ; বললেন, বারুদের দাগ নেই, পিস্তলটাকেও দেখা যাচ্ছে না। এ তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে খুন। তবে বেশিক্ষণ আগে হয়নি। মিনিট কুড়ি কি বড় জোর আধঘণ্টা আগে হবে।

দরজার কাছে যারা ঘোরাঘুরি করছিল, দারোগাবাবু তাদের লক্ষ্য করে বললেন, সকলের আগে কে দেখেছেন?

সুরেশ সভয়ে গলা পরিষ্কার করে বললে, আমি যখন আসি, তখনও ওর নিশ্বাস পড়ছিল। কে খুন করেছে ও আমাকে বলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

—তার আগে কি হয়েছিল?

—জানি না। কেবল ঝড়ে ঐ জানলাটা জোরে জোরে বন্ধ হচ্ছিল। সেই শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তারপরও শব্দের জন্যে আর ঘুমোতে পারিনি। তাই নিচে নেমে এসেছিলাম।

—কাউকে তখন দেখেছিলেন?

—কাউকে দেখিওনি, ঝড়ের শব্দ ছাড়া কিছু শুনতেও পাইনি। তবে আমার পর এসেছিলেন শরৎবাবু। উনিও শব্দে ঘুমোতে পারছিলেন না।

দারোগা সরকারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, এ বাড়িতে আর কে কে আছে?

—দু'জন চাকর আর একটা ঠাকুর। মোটর-ড্রাইভারটার বাড়ি কাছেই ; সে সকালে আসে, রাতে চলে যায়।

—কোথায় খাওয়া-দাওয়া করে?

—এখানেই।

—বলতে পারেন, আপনার বাবু এত রাত অবধি কি করছিলেন?

—তা জানি না। তবে মাস-কয়েক থেকে উনি রাতে ভাল ঘুমোতে পারতেন না। প্রায়ই রাত জেগে পড়াশুনা করতেন।

—আচ্ছা, উনি এ রকম বিপদের কথা কখনো বলেছিলেন?

—আমার কাছে তো বলেননি ; আমি সরকার। আমার কাছে মনের কথা বলবেন কেন?

—তবে কার কাছে বলতেন, বলতে পারেন? বলে দারোগাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

—বন্ধু-বান্ধবের কাছে।

—ওঁর বন্ধু কে?

—অনেকে। অনেকেই বাবুর সঙ্গে গল্প করতে আসতেন। বড়লোক—অনেকের সঙ্গেই আলাপ ছিল।

—এঁরা কে?

—ইনি সুরেশবাবু ; আমাদের বাবুর বন্ধু। পেশোয়ারে থাকেন। দিন-কয়েক হলো বেড়াতে এসেছেন। উনি বাবুর আত্মীয়। শিলংয়ে থাকেন।

—আজ সন্ধ্যে থেকে ওঁর মনের অবস্থা কেমন ছিল, জানেন?

—আমি ভাড়া আদায়ে বেরিয়েছিলাম, রাত দশটায় ফিরেছি।

দারোগাবাবু সুরেশের দিকে ফিরে বললেন, আপনার সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়?

—রাত ন'টায়। রাত আটটায় আমরা একসঙ্গে খাই। তারপর একঘণ্টা গল্প করেছিলাম।

—তখন কি ওঁর উদ্বেগের ভাব দেখেছিলেন?

—সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে পারিনি। তবে কেমন উন্মনা মনে হচ্ছিল! আগে আমি ওঁকে কখনো এ রকম দেখিনি।

দারোগাবাবু তারপর শরতের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে কখন ওঁর শেষ দেখা হয়েছিল?

—রাত সাড়ে দশটায়।

—আপনার কি অনুমান হয়েছিল, অথবা ওঁর সঙ্গে কথায়-বার্তায় কি বুঝতে পেরেছিলেন যে, উনি জানেন ওঁর জীবননাশ হতে পারে?

—তখন যে রকম দেখেছিলাম, তাতে সে-ধারণা করতে পারিনি বটে, তবে এখনকার অবস্থা দেখে বলা যেতে পারে, উনি এই রকমই আশঙ্কা করেছিলেন।

—হুঁ। দারোগাবাবু একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর আবার বললেন, বলুন তো শরৎবাবু, ওঁর সঙ্গে আপনার কতদিন অন্তর দেখা হয়?

—ঠিক নেই, মাসে, দু'-একবার তো বটেই! কারবারের কাজে আমাকে প্রায়ই আসতে হয়।

—উনি কি বরাবরই এই রকম অস্থির ছিলেন?

—না। সুরেশবাবু যা বলেছেন, তা ঠিক। উনি আগে এরকম ছিলেন না।

—আচ্ছা, কবে থেকে আপনি তাঁকে এরকম দেখছিলেন?

—তা মাস-দুই হবে। মধ্য-প্রদেশের এক শহরে একটা খুন হবার পরেই ওঁকে কেমন একটু বিচলিত দেখছি।

—কি রকম? সে আবার কি? দারোগাবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

—সেখানে উনি গিয়েছিলেন বেড়াতে। তখন ওঁর এক বন্ধুকে একজন খুন করে। বন্ধুটির নাম ছিল হরিশ সমাদ্দার। সমাদ্দার যে হোটেলে ছিল, সেই হোটেলে উনিও গিয়ে উঠেছিলেন।

—তারপর?

—সমাদ্দারকে একজন সাহেববেশী বাঙালি গুলি করে। যে লোকটা তাকে গুলি করে, তার নাম উপেন চন্দ্র। তার সঙ্গেও ওঁর পরিচয় ছিল। উপেন ধরা পড়ে, কিন্তু কি করে যেন হাজত থেকে পালিয়ে যায়! এ খবর কি আপনি জানেন না?

—বলে যান।

—উপেন তো আর ধরা পড়েনি! বলে শরৎবাবু চুপ করলেন।

দারোগাবাবু তাঁর দিকে আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ওঁর কোনও শত্রু ছিল, এমন কথা কোনও দিন বলেছেন?

—না। মনে পড়ে না।

—আচ্ছা, উনি বিয়ে করেননি কেন?

—জানি না।

দারোগাবাবু তারপর সুরেশকে বললেন, আপনি কি প্রায়ই ওঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন?

—না, সে সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। কেননা, আমি থাকি ভারতের এক প্রান্তে ; ছুটি বড় একটা পাই-ই না। আর ও নিজেই আমার ওখানে যেত, হয়তো বছরে একবার।

দারোগাবাবু চুপ করলেন। তার একটু পরেই বললেন, আপাতত আপনাদের আর দরকার নেই। তবে চাকর-বাকররা কেউ যেন কোথাও যায় না, পরে সকলকে আবার দরকার হতে পারে। আপনারা এখন বাইরে যান। আমি ঘরখানা ভাল করে পরীক্ষা করবো।

সকলে বার হয়ে গেল। দারোগাবাবু পরীক্ষা করতে লাগলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো কনস্টেবল।

দারোগাবাবু দেখতে লাগলেন। আরাম-চেয়ারের পাশে একখানি ছোট টেবিলের ওপর একখানি বই খোলা পড়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে, অমল বইখানি পড়ছিল। খোলা জানলাটার দিকে সে পেছন ফিরে বসেছিল। খুনিটা হয়তো সোজা ঘরে ঢুকেছে। সে ঢুকতেই অমল বইটি নামিয়ে রেখে খুনিটার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কপাল লক্ষ্য করে গুলি করেছে। গুলি লাগতেই কার্পেটের ওপর ওইভাবে, যেমন করে আছে—সেই রকম করে পড়ে গেছে। পিস্তলের আওয়াজ হয়ত বাজপড়ার শব্দে গেছে ডুবে। ঘটনাটা খুব সহজ নয়। এর ভেতর কিছু একটা আছে। খুনিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে একটা কনস্টেবলকে ডেকে বললেন, আচ্ছা, দেখ তো এঁর পকেটে কি আছে?

কনস্টেবলটা এগিয়ে এসে অমলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার পোশাক তল্লাস করতে লাগলো।

জামার পকেট হাতড়ে প্রথমেই পেল একখানি রুমাল, দুটো চুরুট ও এক বাক্স দেয়াশলাই। তারপর আর এক পকেটে পেল এক গোছা চাবি ও খান-কয়েক নোট,

আধুলি, সিকি, আনি।

পরক্ষণেই আবার প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে একটা জিনিস টেনে বার করেই বলে উঠলো, ই ক্যায়া?

দারোগাবাবুও দেখলেন একটি রিভলবার। তিনি সেটা কনস্টেবলটার হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার ছ'টি খোপেই ছটি গুলি ভরা।

—হুঁ। দেখা যাচ্ছে, এরকম একটা কিছু হবে তা উনি বুঝতে পেরেছিলেন। তবে রিভলবারটা ব্যবহার করবার সময় পাননি। আচ্ছা, আর কি আছে?

আর এক পকেটে ছিল কতকগুলো চিঠি। দারোগাবাবু চিঠিগুলো কনস্টেবলের হাত থেকে নিয়ে আলোয় পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপরই বলে উঠলেন, আরে! পাওয়া গেছে! এই যে একখানা টাইপ-করা চিঠি। এতেই খুনি কে, কেন খুন করেছে, তা পাওয়া যাবে। আমাদের গোয়েন্দা-বিভাগের খোরাক। খাসা!

তিনি কাগজখানি পড়ে সাবধানে ভাঁজ করে চিঠিগুলো একখানি খামে পুরে পকেটে রাখলেন, এবং ঘরখানি আরও কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বেরিয়ে গেলেন।

বেশ কিছু দিন পর।

ভোরের দিকে তারা তখন মোটরে ফিরছে, মুখার্জি জিজ্ঞেস করলেন, শরৎই যে খুনী, এটা কি করে ধরতে পেরেছিলেন মিঃ গুপ্ত?

—আপনার কথার উত্তর দেবার আগে একটা কাজের ফয়সালা করা যাক। চন্দ্রের কি হবে? আপনি নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে আর মামলা চালাবেন না?

—না। শরৎ রায়ই সে-পথ বন্ধ করে দিল। মিঃ শুক্লও বোধহয় আর এগোবেন না?

—এগোবার উপায় নেই।

গুপ্ত বললে, মিঃ মুখার্জি, এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর দি। যখন খবর পাই, শরৎ রায়কে কে গুলি করেছে, তখনই আমার সন্দেহ হয়, এটা ওর সাজানো। ওর জামার হাতায় যে-লোকটা গুলি করেছিল, সে ওর ঐ ওলি মহম্মদ। আপনি জানেন না, কিন্তু আমি ওর ঘর থেকে রায়ের পিস্তলটা সরিয়েছি। তাতে গুলি চালাবার চিহ্ন আছে।

—কি বলছেন?

—আজই আপনাকে দেখাবো। আর ওর সেই ড্রাইভারটাও সরে পড়েছে আপনার সহকারীর চোখে ধুলো দিয়ে। শরৎ রায়ই যে মাকড়শা, এটা আমি আবিষ্কার করি তখনই। ওর ওপর আমার কড়া নজর ছিল। ও থানায় খবর দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল সত্যি ; কিন্তু যেখানে এসেছিল, সেখান থেকে আমারই লোক টেলিফোন করেছিল। সে ছিল ওর পিছু-পিছু। লোকটা ছিল ভারী চালাক। কতবার আমার চোখে ধুলো দিয়েছে!

—যাক্, আজ একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারবো।

—এখনও নয়। আগে বড়কর্তার কাছ থেকে চন্দ্র-সম্বন্ধে অভয় নিতে হবে, তারপর।

শুক্ল বললে, আমার মনে শান্তি এসেছে। এবার হাল্কা মনে দেশে ফিরে যেতে পারি।

—আমার রবিবারে পার্টিতে যোগ দেবার পর যাবেন—তার আগে নয়।

শুক্ল হাসতে-হাসতে বললে, আচ্ছা।

বিন্দিপিসীর গোয়েন্দাগিরি

pathagar.net

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিকেল বেলা দল বেঁধে সবাই বেড়াতে বেরিয়েছিল। ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল।

চওড়া দরদালানে পেট্রোম্যাক্স জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, তারই আলোয় বসে শৌখিন কাঁথায় পদ্মফুল তুলছেন বিন্দিপিসী। এ তাঁর একটা শখ। জীবনের একমাত্র শখই বলা চলে। এক বছর দু'বছর ধরে একখানা কাঁথা সেলাই করেন, তারপর সেখানা দিয়ে দেন কোনও আপনার জনকে। যে পায়, সে ভাগ্য বলে মানে। কাঁথা তো কাঁথা, কাশ্মীরী শাল হার মেনে যায়।

আপনার জনের ভিতর এই ভাইপো-ভাইঝি ক'টি! ওঁর তিনটি ভাই—ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের শহরে বাস। বিন্দিপিসীরও ছেলেবেলা শহরে কেটেছে। লেখাপড়া সেখানেই শিখেছিলেন, তারপর বয়স একটু বাড়তেই, কী যে তাঁর হলো, শহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ের এই পৈতৃক বাড়িতে এসে আস্তানা গাড়লেন।

বে'থা' আর করেননি বিন্দিপিসী। গাঁয়ের লোকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে খুব সহজভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য বয়স তাঁর পঞ্চাশ পেরোয়নি,

জীবনের হয়তো অনেকটা বাকি এখনো। স্বাস্থ্য তাঁর অটুট, সহসা মরার সম্ভাবনা কম।

এ-বাড়িতে বিন্দিপিসী বাস করেন দুটো চাকর আর দুটো ঝি নিয়ে। একটা ঝিকে ঝি বলা ঠিক হবে না হয়তো। ভদ্রঘরের মেয়ে। দু'বেলা রান্না করা ছাড়া আর একটি মাত্র কাজ তাকে করতে হয় ; সেটি হচ্ছে—রোজ সন্ধ্যেবেলায় সারা গাঁয়ের নতুন খবরগুলো বিন্দিপিসীকে সবিস্তারে শোনানো।

খবর শোনবার জন্য অসীম আগ্রহ বিন্দিপিসীর। খাবার সময় তরকারি এক ভাগ কম হলে তিনি তেমন ক্ষুণ্ণ হন না, কিন্তু কোনওদিন সুহাস যদি এসে বলে—আজ তো আর তেমন কিছু শুনতে পেলুম না পিসীমা—তা হলে তাঁর মন-মেজাজ সব বিগড়ে যায়, খেতে শুতে কিছুতেই আর সোয়াস্তি পান না।

কাঁথা সেলাই যেমন তাঁর একমাত্র শখ, খবর শোনা তেমনি তাঁর একমাত্র কাজ।

আর এক মজা—যা শোনেন তা তিনি কখনো ভোলেন না।

এবারকার এই পুজোর মরশুমে ভাইপো-ভাইঝিরা সবাই এসে জুটতে পারেনি। অনীশ কানাডা গেছে, নীলা জাপানে। দেশে থাকলে পিসীমার বাড়িতে পুজোর সময়টা দু'দিনের জন্যও আসবে না, এমন ভাইপো-ভাইঝি বিন্দিপিসীর একটিও নেই। সবাই ওরা দারুণ ভালবাসে ওঁকে।

বেড়িয়ে এসেই একে একে ধপাস করে বসে পড়লো ওরা—বিন্দিপিসীর সামনে। সুহাস তৈরি ছিল, এক-এক পেয়ালা গরম চা আর এক-এক প্লেট নিমকি কচুরি তখনি ধরে দিল প্রত্যেকের সামনে।

এ তো হলো! কিন্তু রাত দশটা পর্যন্ত এখন সময় কাটে কি করে?—অজয় জিজ্ঞাসা করে রেবাকে।

আমি কিন্তু আজ আর গান গাইতে পারবো না—আগে থাকতেই সাবধান হয় রেবা—গলা আমার ধরে আছে।

দু'-একটা গল্প-টল্প হোক না!—প্রস্তাব করে সমীর। সে লেখক মানুষ ; যে-কেউ যে-কোনও গল্প করুক, ও তা থেকে প্লট পেয়ে যাবে একটা।

তা বলে ভূতের গল্প নয়—আগে থাকতে আপত্তি জানায় রেবা। সে নাম-করা অধ্যাপিকা। কিন্তু রাত্তিরে ভূতের নামে এখনো তার গা ছমছম করে।

এতক্ষণে বিন্দিপিসী কথা বলেন—আমার বাড়িতে যখন তোরা এয়েছিস, তোদের সময় যাতে আনন্দে কাটে, আমারই তা দেখা দরকার। আমি বলি ভূতের গল্প বাদ দিয়ে অন্য গল্প হোক। সবাই তোরা দেশবিদেশে বেড়িয়েছিস, অনেক-কিছু তো দেখেছিস তোরা! নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এমন কিছু বল্ কেউ—যার ভিতর চমক আছে, যা থেকে চিন্তার খোরাকও কিছু পাওয়া যায়।

প্রস্তাবটা মনে ধরে সকলেরই।

তবে কেউই ঘাড় পাত্‌তে চায় না। অজয় বলে, শান্ত শুরু করুক, প্রশান্ত ইশারা করে রঞ্জনাকে। শেষ পর্যন্ত সবাই এককাট্টা হয়ে রাঘবকেই ধরে পড়লো—ওহে ডাক্তার, তুমিই এ-সংকটে উদ্ধার করো ভাই আমাদের।

রাঘব একটুখানি ভেবে নিলে, তার পর বললে—আমি রাজি আছি, কিন্তু একশর্তে।

pathagar.net

গল্প শেষ করার আগে আমি একটা প্রশ্ন করবো সবাইকে। নিজের নিজের জ্ঞানবুদ্ধিতে প্রত্যেককেই তার উত্তর দিতে হবে। সেই সব উত্তর শোনবার পর গল্পটি শেষ করবো আমি।

অধ্যাপিকা রেবা যেন ভয়ানক বিপন্ন হয়ে পড়লো—জ্ঞানবুদ্ধিমতো উত্তর দিতে হবে? যার জ্ঞানবুদ্ধি কিচ্ছু নেই? যেমন আমি? সে কী করবে?

রঞ্জনা সম্প্রতি পুলিশের ইনস্পেক্ট্রেস হয়েছে, এক ধমক লাগিয়ে দেয় রেবাকে—জ্ঞানবুদ্ধি নেই, মানে কী? জ্ঞান যার নেই, তার অজ্ঞানতারই পরিচয় দিক সে। বুদ্ধি যার নেই, সে নির্বোধের মতোই জবাব দিক। ওগুলোও দরকার। ওতে প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া যাক, মজা পাওয়া যাবে খানিকটা! রাঘবদা, শুরু করো তুমি।

রাঘব শুরু করে—

আমি সেবার ইন্দোনেশিয়া সরকারের চাকরি নিয়েছিলুম এক বছরের জন্য—জানিস তো সবাই। আমায় দিলে মায়মানুতে। একেবারে সমুদ্রের উপরে। মহাযুদ্ধের সময় একেবারে ধ্বংস ও চুর হয়ে গিয়েছিল জাপানী বোমায়। এখন নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

ছোট্ট একখানা বাড়িতে ডাক্তারখানা। ডাক্তারের থাকার জায়গা তার ভিতরে হয় না। যাই কোথায়?

একটা ভাল হোটেল গড়েছে ওখানে এক চীনে কোম্পানি। আমি সেখানেই ঘর নিলুম একখানা। হোটেল অবশ্য স্থানীয় লোকদের জন্য নয়। তাদের হোটেলে থাকার দরকার নেই, পয়সাও নেই। হোটেলটা হয়েছে যারা বেড়াতে যায় তাদের জন্য। মায়মানুর সমুদ্রতীরটি স্নানের পক্ষে আদর্শ জায়গা। মালয়, জাভা, সুমাত্রা থেকেও শৌখিন লোকেরা সমুদ্রস্নানের জন্য মায়মানুতে আসে। একজন দু'মাস চার মাসও থাকে। হোটেল চলবে না কেন?

স্থায়ী বাসিন্দা আমি একাই।

বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা। খাওয়ার জিনিসও বেশ মেলে। বেশ আনন্দেই আছি বলতে গেলে।

একদিন ডাক্তারখানার কাজ সেরে সবে হোটেলে আসছি। নিচের বড় হলটার এক পাশে ম্যানেজারের অফিস, আর এক পাশে উপরে ওঠবার সিঁড়ি।

আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, হঠাৎ কানে এলো—ইয়েস, উই আর ফ্রম ক্যাল্‌কাটা।

ক্যালকাটা? দাঁড়িয়ে পড়লুম সিঁড়িতে। স্নানার্থী যারা এখানে আসে—তারা কাছাকাছি দেশগুলোরই লোক। কলকাতা থেকে কেউ এসেছে—এমন তো এই ক' মাসে দেখিনি। স্নানের জন্যও নয়, নিছক বেড়ানোর জন্যও নয়। কলকাতার লোক তো নয়ই, আমার অত বড় ভারতবর্ষটার কোনও জায়গার কোনও লোককেই এখানে দেখিনি এ যাবৎ।

আমার নাম ভবতোষ রায়—ইংরেজীতে বলছে—ওদের একজন ; চীনে ম্যানেজার ইংরেজী বোঝে এবং বলতে পারে। না পারলে আমিও থাকতে পারতুম না এ-হোটেলে।

আর আমার নাম রামতনু সেন—বলছে আর একজন।

তাকিয়ে দেখলুম বই কি! বাঙালি। কলকাতার লোক। থাকবে হয়তো কিছু দিন।

বাংলা কথা বলতে পারবো অনেক দিন পরে। আনন্দের কথা বই কি!

দু'জনেই যুবক। মাথায় প্রায় সমান, রংও প্রায় একরকম শ্যামলা। সিঁড়ি থেকে মুখ একজনেরও ভাল করে দেখতে পেলুম না।

যাক—দেখবো পরে। ওরা তো রইল এখন! আমার কাজ আছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরুতে হবে। গাড়ি আসবে নিতে। ছ'মাইল দূরের মিলিটারি ছাউনিতে একটা কঠিন কেস আছে। ছাউনির ডাক্তার আমার পরামর্শ চান।

ছাউনি থেকে ফিরে আবার ডাক্তারখানায় বসতে হলো, হোটেলে এলুম রাত্রে। নবাগত বাঙালিদের সঙ্গে আর তখন দেখা হলো না। তবে ম্যানেজারের মুখ থেকে ওদের কিছু খবর পেলুম বটে। ভবতোষ রায়ই পয়সা-দেনেওয়ালা। রামতনু সেন তার সঙ্গী বা কর্মচারী বা বেতনভুক বন্ধু বা ঐরকম অন্য কিছু। পাশাপাশি দুটো ঘরই ওরা নিয়েছে বটে। কিন্তু একটা এ ক্লাস ঘর, অন্যটা সি ক্লাস।

হুঁ। আমারও মনে পড়লো—সিঁড়ি থেকে দেখবার সময় ওদের পোশাকেরও মূল্যগত তফাত আমার চোখে পড়েছিল।

রাত্রেও আলাপ হলো না। যাক, কাল হবে।

সকালে আমার সময় হয় না, কোনওরকমে প্রাতরাশ সেরেই ডাক্তারখানায় ছুটতে হয়। ছুটি হয় লাঞ্চের মুখোমুখি, বারোটা নাগাদ।

কিন্তু সময় করে নিলুম সেদিন। বেলা দশটায় কাজের ভিড় একটু কম দেখে উঠে পড়লুম চট্ করে—এক ঘণ্টা পরে ঘুরে আসছি বলে হোটেলের দিকে পা বাড়ালুম, দেখি, লোক দুটোর সঙ্গে আলাপ করতে পারি কি না! মনটা টানছে ওদের দিকে।

হোটেলে ঢুকতে যাবো, এমন সময় চোখ পড়লো সমুদ্রের দিকে। অনেক লোকের ভিড়। কী হচ্ছে ওখানে? পায়ে পায়ে সেদিকেই এগুলুম।

ভিড়ের লোক আমায় দেখে ব্যস্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিলে। দেশী ভাষায় বলাবলি করলে—ডাক্তার এসে গেছে! ডাক্তার এসে গেছে! ডাক্তারকে দেখতে দাও।

আমি দেখতে পেয়েছি। জলের ধারেই বালির উপরে দুটো দেহ পড়ে আছে। জলে ডোবার ব্যাপার বোধ হয়।

ছুটেই কাছে এলুম। কী সর্বনাশ! সেই বাঙালি দুটি। দু'জনেরই সাঁতারের পোশাক পরা। একজন সটান পড়ে আছে, আর একজন ওঠবার চেষ্টা করছে।

যে সটান হয়ে পড়ে আছে, তাকে পরীক্ষা করে দেখলুম। নাড়ি নেই, বুকের ধুকধুকুনি নেই। শ্বাস-প্রশ্বাস যদি ফিরিয়ে আনা যায় চেষ্টা করে, তবেই বাঁচবে। তবে তার আশা...

আমি চেষ্টা শুরু করলুম।

অন্য লোকটি উঠে বসে আমার দিকে একবার চায়, অজ্ঞান দেহটার দিকে একবার চায়। আমি একজন লোককে ডেকে বললুম—ভদ্রলোককে ধরাধরি করে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাও। ছোট ডাক্তারকে আমার নাম করে বলো—যাতে এঁকে বলকারক ইনজেকশন একটা দেওয়া হয়। আর গরম দুধ। কম্বল চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখতে বলো।

আমার কাপড়—বলে ভদ্রলোক।

যেখানটায় কাপড় ছেড়ে ওরা সমুদ্রে নেমেছিল—সে অনেকটা দূরে। কাপড় নিয়ে আসছে লোকেরা।

আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করছি—নির্জীব মানুষটার জীবন ফিরিয়ে আনবার জন্য। আর তার সঙ্গী বিবর্ণ মুখে একবার তাকাচ্ছে আমার দিকে, আর একবার ওর দিকে।

শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেললো ইংরেজীতে—বাঁচবে কী?

আমার কানে কট্ করে বাজলো প্রশ্নের সুরটা।

লোকটা বাঁচলেই প্রশ্নকর্তার বিপদ যেন!

আপনার নাম?—বাংলাতে জিজ্ঞাসা করলুম।

সে চমকে উঠলো—যেন ভূত দেখেছে! আপনি—আপনি—বাঙালি?

হ্যাঁ—বাঙালি আমি। আপনারাও বাঙালি—সেটা শুনেছি আমি। আপনি ভবতোষবাবু? না, রামতনুবাবু?

উত্তর দিতে গিয়ে কি ঢোঁক গিলল লোকটা?—আমার নাম ভবতোষ রায়—আর এর—এর—রামতনু সেন। আমার—কর্মচারী ও।

ওদের কাপড়-জামা এলো। বাঙালি পোশাকেই স্নান করতে এসেছিল, দেখছি। আশ্চর্য! ভবতোষ কম দামের জামাটাই নিচ্ছে না?

সামলে নিল। মাথার ঠিক নেই—বিড় বিড় করে বলে দামী সিল্কের শার্টটাই গায়ে দিলে। তারপর অন্য সব কাপড় বগলদাবা করে বললে—ডাক্তারখানায় আর আমায় যেতে হবে না বোধ হয়। আমি ভালই বোধ করছি। ওর—রামতনুর কী হয়— না দেখে—

আর দেখবার কিছু নেই—বলে আমি নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। শত চেষ্টাতেও ওর শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরে এলো না আর।

অ্যাঁ? অ্যাঁ? বলেন কী?—ককিয়ে উঠলো ভবতোষ। কিন্তু আমার খামোকাই যেন মনে হলো—রামতনু মরে যাওয়াতে দুঃখ তো ওর হয়নি, বরং যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

ব্যাপারটা শুনলাম—খানিকটা ভবতোষের মুখে, খানিকটা একজন জেলের মুখে। জেলেটা ডিঙ্গি নিয়ে মাছ ধরছিল ঐ দিকটাতেই। সেই জেলেই শেষ পর্যন্ত ওদের ডিঙ্গিতে তুলে নেয়।

সাঁতার দিচ্ছিল ভবতোষ, রামতনু দু'জনেই। ভবতোষ যাচ্ছিল আগে, রামতনু পিছনে। দূরে—আরও দূরে চলে যাচ্ছিল তারা—কূল থেকে বেশ খানিকটা দূরে।

ভবতোষ বলে—রামতনু পিছন থেকে ডাকতে লাগলো ফিরে আসবার জন্য। ভবতোষের আরও এগিয়ে যেতে সাধ হচ্ছিল। রামতনুকে সে ফিরে যেতে বলেছিল—তুমি যদি হাঁফিয়ে গিয়ে থাকো, ফিরে যাও। আমি পরে আসছি। এক্ষুণি ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।

রামতনু কিন্তু সে-কথা শোনেনি। এগিয়ে গিয়েছিল ভবতোষের দিকে।

ও কাছাকাছি আসতেই ভবতোষ কিন্তু দেখলে—ও হাঁফাচ্ছে। ভবতোষ এসে ধরল ওকে। ও কিন্তু এমনভাবে জড়িয়ে ধরল ভবতোষকে যে দু'জনেই ডুবে যাবার দাখিল। অনেক কষ্টে ভবতোষ ওর হাত ছাড়ালো, তারপর ওকে নিয়ে সাঁতার দিতে লাগলো কূলের দিকে। কিন্তু ওর তখন শেষ হয়ে গিয়েছে বোধ হয়, হাত-পা আর নড়ছিলো না।

জেলে ডিঙ্গিটা এসে ওদের তুলে নিলে এই সময়। রামতনু তখন নিশ্চল, নিষ্প্রাণ।

জেলে লোকটাও মোটামুটি ঐরকমই বলেছিল। তবে গোপনে সে আমায় একসময় বললে—ডাক্তার সাহেব! জলের ভিতর দু'জনের জড়াজড়ি আমিও দেখেছিলুম। দূর থেকে দেখা, ঠিক বুঝতে পারিনি হয়তো, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল—রামতনুকে চেপে ধরেছিল জলের ভিতর, রামতনু ভবতোষকে জড়িয়ে ধরেনি।

তার কথা আমি উড়িয়েই দিলুম। সে দূরে ছিল। জলের ভিতর কে কাকে জড়িয়ে ধরছে, কে কাকে চেপে ধরছে, তার ঠিক ঠিক দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? তার ভুল নিশ্চয়।

তারপর আর কি, পুলিশ এলো। দেখে শুনে রিপোর্ট দিলে দুর্ঘটনা বলে। সমুদ্রে স্নান করতে এসে এমন তো কতই ডোবে।

ভবতোষের জবানবন্দী ছিল এই রকম—

সংসারে কেউ নেই, দেদার টাকা। দেশভ্রমণের ইচ্ছে হলো।

একেবারে একা যাবে না। আধা-ভৃত্য, আধা-বন্ধু গোছের অল্প লেখাপড়াজানা কোনও ভদ্রসন্তানকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে ঐ রামতনু এলো।

বাংলাদেশের ফরিদপুরে বাড়ি। বাংলাদেশের লোকের উপর একটু ওর পক্ষপাত আছে, কারণ তিন পুরুষ কলকাতার বাসিন্দা হলেও আদি বাস ছিল ওদের ময়মনসিংহে। কথায় একটু টান তাই এখনো আছে, যদিও ওদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আজ পঞ্চাশ বছর থেকে নেই।

তা রামতনুকেই নেওয়া হলো। লোক ভাল বলেই মনে হয়েছিল—কারণ ওদেশে আগে দু'-এক জায়গায় চাকরিবাকরি করেছে—সুপারিশ চিঠিপত্র ছিল।

ওকে বহাল করার মাসখানেক পরেই এই দিক পানে বেরিয়ে পড়ে। রেঙ্গুনে এসে মায়মানু জায়গাটির সুনাম শোনে। সাঁতারের ঝোঁক বরাবর আছে, সেই সাঁতারের নাকি খুব সুবিধে মায়মানুতে।

এখানে আসতেই প্রথম দিনেই এই বিপদ।

ভবতোষ বড়ই যেন মুষড়ে পড়লো এই দুর্ঘটনায়! প্রায়ই আমার কাছে ওষুধ চায়—ঘুম হয় না বলে।

সত্য কথা বলতে কি—আমার মনে একটুখানি সন্দেহই ছিল। এই বলে সন্দেহ ছিল যে জেলের কথাটা মিথ্যে না-ও হতে পারে। অর্থাৎ ভবতোষ জলের ভিতর চেপেই মেরেছে রামতনুকে। আমি যখন রামতনুর দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলুম সেদিন, তখন ভবতোষের ভাব-ভঙ্গি ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। বিশেষ করে সে বাঁচবে কী প্রশ্নটার সুর ছিল একান্ত বেসুরো।

জেলেটার সুমুখে তার কথা আমি উড়িয়ে দিয়েছিলুম বটে। কিন্তু মনে মনে তা নিয়ে আমি তোলপাড় করেছি অনেক।

তাই, ভবতোষ যখন ঘুম হয় না বলে ওষুধ চাইলো, আমি তার চোখের দিকে

তাকিয়ে বললুম—ঘুম না-হওয়ার কারণ হতে পারে বিবেকের দংশন।

ভবতোষের মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গেল—আমার বিবেকের দংশন হতে যাবে কিসের জন্য? কী করেছি আমি?—এই বলে সে পিছন ফিরে চলে গেল—ওষুধ আর নিলে না।

কয়েকদিন পরেই সে কলকাতায় ফিরলো।

আমার কেবলই মনে হতে লাগলো—একটা খুনী পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু করবার ছিল না। প্রমাণ নেই। কিছুমাত্র প্রমাণ নেই যে ও রামতনুকে খুন করেছে।

দিন যায়। প্রায় ভুলেই গেছি ও কথা। এমন সময় কলকাতার খবরের কাগজের এক কোণে একটা ছোট্ট খবর দেখলুম একদিন। তোমরা কি কেউ দেখেছিলে সে খবর? ভবতোষ রায়ের আত্মহত্যার খবর?

নিশ্চুপ হয়ে এতক্ষণ সবাই গল্প শুনছিল—এইবার এক একজন করে মাথা নাড়তে শুরু করলো—না তো! মনে পড়ছে না তো! ইত্যাদি।

রাঘব বলতে লাগলো আবার—

গঙ্গায় সেদিন সাঁড়াসাঁড়ির বান। সেই বানের সময় দেখা গেল একপ্রস্থ দামী জামা-জুতো-কাপড় গঙ্গার ঘাটে পড়ে আছে। জামার পকেটে একখানা চিঠি—

অনুতাপের জ্বালায় জ্বলে মরে যাচ্ছি আমি। মায়মানুর সমুদ্রে রামতনু সেনকে ডুবিয়ে মেরেছিলুম, সেই পাপে আমি জ্যান্তই নরকের আগুনে পুড়ছি। প্রাণ না দিলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না, বোধ হয়। হত্যার বদলে আত্মহত্যা। তাই আমি গঙ্গার জলে ডুবে মরছি আজ।—

—ভবতোষ রায়

pathagar.net

উঃ!—একসঙ্গে ছ'টা কণ্ঠ থেকে রব উঠলো।

রেবা, রঞ্জনা, অজয়, প্রশান্ত, সমীর, অভিজিৎ একসঙ্গে সবাই উঃ! বলে উঠলো।

বিন্দিপিসী একবার চোখ তুললেন কাঁথার সেলাই থেকে। সে-চোখে দুঃখের বা আফসোসের লেশমাত্র নেই! বরং আছে একটুখানি চাপা কৌতুক।

—বাবা রাঘব! ভবতোষের দেহটা কি পাওয়া গেল? না, বানে ভেসে মায়মানুর সমুদ্রে গিয়ে পড়লো ওটা? জিজ্ঞাসাটা বিন্দিপিসীরই।

সবাই হতবাক।

হতবাক হওয়ার কারণ তিনটে। প্রথমত, বিন্দিপিসী যে গল্পটাতে কান রেখেছেন, এ কথাই কেউ ভাবেনি। সকলেরই ধারণা--তিনি একমনে কাঁথাই সেলাই করে চলেছেন। দ্বিতীয়ত, এরকম একটা সংগত প্রশ্ন একমাত্র তাঁর মাথাতেই এলো, এবং অন্য কারও মাথাতে এলো না। তৃতীয়ত, ওঁর প্রশ্নের ধরনটাই যেন বিদ্রূপে ভরা। গোটা জিনিসটাই যেন তাঁর কাছে একেবারে একটা নিছক ধাপ্পা!

যাই হোক, উত্তর দিলে রাঘব, না, দেহটা পাওয়া যায়নি।

যাবে না জানতুম। বেশ, বলো গল্প—বলে আবার সেলাইয়ে মন দিলেন বিন্দিপিসী।

রাঘব বলে যায়—

আর বেশি কিছু নেই গল্পের। পুলিস তদন্ত হলো। মায়মানু থেকে ফিরে ভবতোষ কোন এক হোটেলে থাকতো। আত্মীয় তার কেউ ছিল না, বন্ধুদেরও বর্জন করেছিল। মোটা মোটা টাকা প্রায়ই ব্যাঙ্ক থেকে তুলতো। ব্যাঙ্কের টাকা শেষ করে দিয়েছিল প্রায়।

কে রামতনু সেন, এদেশের লোকের মাথাব্যথা নেই তার জন্যে। সে পাকিস্তানী—মরেছে ইন্দোনেশিয়ায়। তার জন্যে ভারতীয় পুলিসের কী করবার আছে? আর ভবতোষ তো মরেই গেছে, তার যদি অপরাধ থেকেই থাকে—মরেই তো প্রায়শ্চিত্ত করেছে তার!

এই পর্যন্ত বলে রাঘব থামলো।

কী হলো? থামলে যে? প্রশ্ন ছ'জনের কণ্ঠ থেকে।

এইবার আমার প্রশ্ন। প্রত্যেককেই উত্তর দিতে হবে নিজের নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো।

এই সেরেছে!—বলে ওঠে রেবা ভয়ে ভয়ে।

বলো প্রশ্ন, শুনি!—রঞ্জনা বলে ওঠে নির্ভয়ে।

প্রশ্ন এই—ভবতোষ কেন হত্যা করেছিল রামতনুকে?

রামতনু টাকা চুরি করতো নিশ্চয় ভবতোষের পকেট থেকে—এ উত্তর রেবার।

রামতনু ছিল বাংলাদেশের স্পাই, আর ভবতোষ দেশপ্রেমিক ভারতীয়, কাজেই স্পাইয়ের প্রাণদণ্ড দিতেই পারে!—এ উত্তর রঞ্জনার।

অজয়, প্রশান্ত, অভিজিৎ, সমীর—প্রত্যেকেই এক একটা মত প্রকাশ করলো। প্রত্যেকটাই প্রত্যেকটার চাইতে উদ্ভট।

অবশেষে রাঘব বিন্দিপিসীকে বললে—এবার তুমি বলো পিসিমা!

বিন্দিপিসী চোখ তুলে চাইলেন, সে চোখ যেন হাসছে।

কী বলবো বাবা? তোমার প্রশ্নই যে ভুল! ভবতোষ কেন রামতনুকে হত্যা করবে? আগাগোড়া ভুল। খুন করেছিল রামতনু ভবতোষকে, ভবতোষ রামতনুকে মারেনি।

সবাই বসেছিল, এক লাফে উঠে দাঁড়ালো সবাই, শুধু রাঘব বাদে। কী? অদ্ভুত! আজগুবি! পাগল! ইত্যাদি মন্তব্য।

তাদের থামালো রাঘব।

পিসীমাই ঠিক বলেছেন! রামতনু মরেনি মায়মানুতে, মরে ছিল ভবতোষ। এবং গঙ্গায় বানে কেউ ঝাঁপ দেয়নি, পোশাকটা গঙ্গার ঘাটে ফেলে অল্প একটু সাঁতরে গিয়ে আগে থেকে বন্দোবস্ত করা নৌকোয় চড়ে বসেছিল ভবতোষবেশী রামতনু। সে-রামতনু এখন বাংলাদেশের ফরিদপুর শহরে বহাল তবিয়তে বড়মানুষি করছে। আমি দেখে এসেছি তাকে।

কী করে দেখলে? ছ'জনের প্রশ্ন এক সঙ্গে।

দৈবাৎ ঢাকা যেতে হয়েছিল সরকারী কাজে। রামতনুর বাড়ি ফরিদপুর, এটা মনে ছিল। কী করতে যাচ্ছি, সে সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণা না নিয়েই চলে গেলুম ঢাকা থেকে ফরিদপুর। সেখানে আমার সহপাঠী আজিম সিভিল সার্জন। আমার গল্পটা শুনে সে বললে—রামতনু নয়, তবে ইয়াকুব সেখ কলকাতায় গিয়েছিল লেংটি পরে, ফিরে এসেছে লক্ষপতি হয়ে, বছর তিনেকের ভিতর। তাকে তুমি দেখতে পারো।

pathagar.net

আজিমই দেখবার সুযোগ করে দিলে। ইয়াকুবকে নেমন্তন্ন করলো চায়ে। আমি আড়াল থেকে দেখলুম। যাকে ভবতোষ বলে জানতুম মায়মানুতে, সেই বটে!

আজিমই পরামর্শ দিলে—এ নিয়ে হৈ-চৈ করে লাভ হবে না কিছু। রামতনু যে ভবতোষকে খুন করেছে, কিংবা ইয়াকুবই যে রামতনু—এর কোনওটাই প্রমাণ করা সোজা হবে না। কারণ দেশ আলাদা, পুলিশ আলাদা। কাজেই আমি ফিরে এলুম কলকাতায়।

তখন সবাই ধরে পড়লো বিন্দিপিসীকে—তুমি বুড়োমানুষ, জম্মো কাটালে এই অজ পাড়াগাঁয়ে, এত সহজে এই কঠিন সমস্যার সমাধান তুমি কী করে করলে?

মুচকি হেসে জবাব দেন বিন্দিপিসী—এ তো সাধারণ কথা! ভবতোষ মনিব, বড়লোক। রামতনু চাকর, গরীব। রামতনুকে মেরে ভবতোষের লাভ কিছু নেই। ভবতোষকে মেরে রামতনুর লাভ হতেও পারে, যদি সে ভবতোষ বলে চালিয়ে দিতে পারে নিজেকে।

পিসীমা একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেন—মানুষের চরিত্র সব জায়গাতেই এক। আমার এই রাধিকেপুর গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ কখন কী করছে—খবর রাখি আমি। হাতে তো কাঁথা সেলাই ছাড়া কোনও কাজ নেই। তাই ওই খবরাখবর নিয়েই থাকি। সুহাস সারা বিকেলটা বাড়ি বাড়ি ঘোরে, আমায় খবর এনে দেবার জন্য। ওর ঐটেই বড় কাজ। কাজেই লোকচরিত্র আমি খানিকটা জানি।

সবাই কান খাড়া করে শুনছে পিসীমার কথা।

এখন এই রাধিকেপুর গ্রামেই বছর পাঁচেক আগে ঘটনা ঘটেছিল একটা। হরিলাল ঘোষ হঠাৎ মরে গেল। কথা উঠলো—বিষ খাওয়ানো হয়েছে। পুলিশ এলো। মড়া কাটলো। বিষ সত্যিই পাওয়া গেল। এখন কে বিষ দিলে? শত্তুর তো তার দুনিয়ায় কেউ ছিল না!

তবে?—প্রশ্ন করে রঞ্জনা, পুলিশ ইনস্পেক্‌ট্রেস।

সারা গ্রাম ওলটপালট। শেষকালে বেরুলো খবর। দোয়ারি মণ্ডল নতুন গাইয়ের দুধ পাঠিয়েছিল—মুনিবের পায়েস খাওয়ার জন্য। একটুখানি দুধ, একজনের বেশি দু'জনের তাতে পায়েস খাওয়া চলে না। তাই একা হরি ঘোষই মরলো, আর কেউ মরেনি।

কিন্তু কেন? দোয়ারির স্বার্থ কী?

হরি ঘোষের বিস্তর জমি বর্গা চাষ করতো দোয়ারি। ছেলেটা নাবালক, বৌটা বোকা। হরি মরলে জমির ধানগুলো পোনেরো আনাই নিজের ঘরে তুলতে পারে, এই আর কি! চাইকি, জমিদারের ঘরে ঘুষঘাষ দিয়ে মালিকানা স্বত্বও পেয়ে যেতে পারে।

একটু থেমে আবার বললেন—এই যে লোভ, এ-লোভ রামতনুর থাকা সম্ভব ছিল, ভবতোষের নয়! কাজেই—

ইনস্পেক্‌ট্রেস রঞ্জনা গড় হয়ে প্রণাম করলে পিসীমাকে।

জাল ডিটেকটিভ

দীনেন্দ্রকুমার রায়

চাকরির উপর আজীবনকাল আমার ঘৃণা। বাবা বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া আমায় কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন ; অনেক টাকা মূল্যে কয়েকখানা মূল্যহীন সার্টিফিকেট ক্রয় করা গিয়াছিল ; আমি বি. এ.। বাবার ইচ্ছা আমি ডেপুটি ম্যাজিস্টরি পরীক্ষা দিয়া মফস্বলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া বসি। ডেপুটিগিরির সুখ আমার জানা ছিল ; এক দিকে জেলার ম্যাজিস্টর, অন্যদিকে সেসন জজ, এই দুই নৌকায় পা দিয়া অনেক ডেপুটির প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে ; শ্যাম ও কুল এ উভয়ই মধ্যে মধ্যে অরক্ষণীয় হয়। বি. এল. পাশ করিয়া মুনসেফি লাভ হইতে পারে, কিন্তু আমার ততদূর উৎসাহ ও অধ্যবসায় ছিল না।...ওকালতির ঝঞ্ঝাট অনেক। আমি স্থির করিলাম, যাহাতে স্বাধীনতা আছে, সেই রকম কোনও কাজে লিপ্ত হইব ; 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ—' আমি লক্ষ্মীলাভের আশায় বাবার ব্যবসায়ে যোগ দিলাম।

বাবা তখন খাণ্ডোয়ায় তুলার কারবার করিতেন। কারবারে বেশ লাভ ছিল। আমি খাণ্ডোয়া হইতে বোম্বে যাইতেছিলাম ; বোম্বের প্রসিদ্ধ গুজরাটি বণিক মানিকচাঁদ

রতনচাঁদের সঙ্গে ভাগে সেখানে একটা 'এজেন্সি' খুলিবার সংকল্প ছিল।

ফাল্গুন মাসের রাত্রি। রাত্রি ন'টার পর মেলট্রেনে আমি একটা সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেন ধূম্র উদ্‌গীরণ করিতে করিতে শত দীপ দীপ্ত বক্ষে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে ছুটিয়া চলিল। একটু শ্রান্তি দূর হইলে আমি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটায় ঠেস দিয়া সেই প্রভাতের একখানি প্রয়াগী সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলাম ; এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান মহাশয়েরা আমাদের নেটিভদের প্রতি যে একটু ঘৃণামিশ্রিত ব্যঙ্গোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহা উপেক্ষণীয় হইলেও, তাহার সহিত পরিচয় রাখা অকর্তব্য নহে।

দেখিলাম, গাড়িতে আর দুইজন আরোহী রহিয়াছেন, দুইজনই মারাঠা যুবক ; একজনের পাগড়িটা গদির উপর পড়িয়া আছে ; মাথার চারিদিকে সমান করিয়া কামানো, টিকিটা গোছা করা মস্ত লম্বা, চীনেদের মতো বেণী পাকানো নয় ; বৃহৎ চন্দন চিহ্ন তখনও কপাল হইতে বিলুপ্ত হয় নাই ; গায়ে একটা লম্বা কোট। যুবক একবার মুখ তুলিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমার মুখের দিকে চাহিলেন ; নীল চশমার সোনার ফ্রেম উজ্জ্বল গ্যাসালোকে ঝকমক করিয়া উঠিল। তাহার পর তিনি পূর্ববৎ বাহিরের 'চন্দ্রমাশালিনী যা মধু যামিনীর' দিকে চাহিয়া রহিলেন। আর একজন যুবক সাহেবি পোশাক পরা ; তিনি নিবিষ্টচিত্তে একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন ; বাঁশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মতো মোটা একটা বিকটাকার চুরুট জ্বলিয়া জ্বলিয়া কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্‌গীরণপূর্বক সাহেবের সংবাদপত্রে মনঃসংযোগের পরিচয় প্রদান করিতেছিল।

লোক দুইজন আমার সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইল। আমি বাঙালি মানুষ ; গাড়িতে নতুন লোক দেখিলেই ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলি, মশায়ের কোথায় যাওয়া হইবে? নিবাস এবং বাপের নাম জিজ্ঞাসা করা অনেক দিন 'আউট অব ফ্যাশন' হইয়া গিয়াছে ; 'এটিকেট্' আইন জারি হইয়া নিবাস ও বাপের নাম প্রভৃতি অনেক শ্লীল জিনিস অশ্লীলের মতো পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইউরোপে, যাহাদের গৃহ এবং পিতার নাম উভয়েরই অভাব আছে, তাহাদের কাছে এরূপ প্রশ্ন অত্যন্ত অশ্লীল কৌতূহল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা এখন সাহেব হইয়াছি!

সুতরাং আমি চুপ করিয়া কাগজই পড়িতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে, যে যুবকটি কাগজ পড়িতেছিল, তিনি তাঁহার কাগজখানা হাতে লইয়া উঠিয়া আসিলেন ; ইংরাজিতে বলিলেন, মশায় আমায় এস্‌কিউজ করিবেন ; আপনার কাগজখানা বোধ করি পড়া হইয়াছে ; আমরা পরস্পর কাগজ বদলাইতে পারি কি?

আমি হাসিয়া বলিলাম, অনায়াসে—মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার Bombay Herald নামক সংবাদপত্র আমার হাতে আসিল, আমার প্রয়াগী কাগজ লইয়া তিনি স্বস্থানে গিয়া বসিলেন।

কাগজখানা হাতে লইয়াই দেখিলাম এক কোণে একটা নীল পেনসিল দিয়া ইংরাজিতে লেখা আছে, আমি বোম্বের একজন ডিটেকটিভ ; আমাদের অন্য সহযাত্রীটি বিট্টলরাও খারে। আপনি জানেন খারে কে? তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বোম্বে ওয়ারেন্ট রহিয়াছে ; কিন্তু সেখানে পঁহুছিবার পূর্বেই ইহাকে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক।

pathagar.net

আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে ; বরহাউপুরের 'রিফ্রেশ্‌মেন্ট রুমে' এ সকল কথা হইবে।

বিট্টলরাও খারে। বোম্বের প্রসিদ্ধ জহরত ব্যবসায়ী সাপুরজি জাহাঙ্গীরজির দোকান হইতে বিশ হাজার টাকা দামের একখানি হীরক যে চুরি করিয়াছে? চুরি, বাটপাড়িতে বোম্বে অঞ্চলে সে সময় কেহই বিট্টলরাওর সমকক্ষ ছিল না। আমার সঙ্গেও কিছু টাকাকড়ি ছিল ; ভাবিলাম আচ্ছা বদমাইশের সঙ্গে এক গাড়িতে উঠা গিয়াছে। মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হইল, কাগজে মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম না।

দুই-একবার বক্রদৃষ্টিতে বিট্টলরাওর দিকে চাহিলাম। প্রায় একমাস হইতে সে সতর্ক পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে ; তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে ডিকেটটিভ ঘুরিতেছে, হয়তো সে তাহার কিছুই জানে না ; কিন্তু তাহার চক্ষে চশমা, মুখে একটুও উদ্বেগের চিহ্ন ধরিতে পারিলাম না। সংবাদপত্রে তাহার কথা লইয়া হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল ; এমন কি আমি যেদিনের কথা বলিতেছি, সেদিনও Bombay Herald-এ তাহার সম্বন্ধে একটা প্যারা দেখিলাম ; পুলিশের কর্তব্য কার্যে শিথিলতা দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ট্রেন স্টেশনে পঁহুছিল ; পাঁচ মিনিট এখানে গাড়ি থামিবে। এখানে রিফ্রেশ্‌মেন্ট রুমে না জানি কি দায়িত্বভার ঘাড়ে পড়িবে! আমি ভারি চঞ্চল হইলাম। গাড়ি প্লাটফর্মে দাঁড়াইতেই সেই Bombay Herald-খানা পকেটে ফেলিয়া আমি ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলাম ; অনতিবিলম্বে ডিটেকটিভ মহাশয় আমার সঙ্গে যোগদান করিলেন।

ডিটেকটিভ যুবক অতি নিম্নস্বরে বলিলেন, খুব সাবধান। যাহাতে আসামির সন্দেহ হয়, এমন কোনও ব্যবহার করিবেন না। এখন পলাইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হইবে। ভুসাওয়াল স্টেশনে বোধ হয় তাহার কোনও বন্ধু আসিয়া জুটিবে ; সে জব্বলপুর হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছে খবর পাইয়াছি।

তাহা হইলে এখন কি করা কর্তব্য? আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

বদমাইশের দল বৃদ্ধি হইবার আগেই তাহাকে আটক করা দরকার ; ট্রেনে উঠিয়াই ইহাকে বাঁধিয়া বেঞ্চির নিচে ফেলিয়া রাখা যাইবে। তাহার পর ভুসাওয়ালে যদি তাহার কোনও বন্ধু আসে, তাহার গতিবিধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আবশ্যক হইলে তাহাকেও 'এরেস্ট' করিবার ব্যবস্থা করিব। আমি জানি না, বামাল কাহার কাছে আছে। এই বামালের জন্যই আমাদের অধিক চেষ্টা।

আমি বলিলাম, যদি এ গাড়িতে অন্য প্যাসেঞ্জার উঠে, তাহা হইলে তো আমাদের কাজের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।

ডিটেকটিভ উত্তর দিলেন, এ গাড়িতে অন্য লোক উঠিবে না, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছি। আর সময় নাই, আমি চামড়ার একটা স্ট্র্যাপ কিনিয়া লই, বাঁধিতে দরকার হইবে ; লোকটা ভারি জওয়ান। দরকার হইলে সাহায্য করিবেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম, অবশ্য। ব্যাপারটা ক্রমে রোমান্টিক হইয়া উঠিতেছিল ; এ যে আস্ত একখানা উপন্যাস!

ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। আমরা প্লাটফর্মে বাহির হইয়া আসিলাম ; গার্ডকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ট্রেন ভুসাওয়ালে ক'টার সময় পৌঁছিবে?

গার্ড বলিল, বারোটা পাঁচ মিনিট। বুঝিলাম নিশীথ রাত্রে, এই দ্রুতগামী মেল ট্রেনের মধ্যে উপন্যাসের আর এক পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে।

বিট্টলরাও প্লাটফর্মে পদচারণা করিতেছিল। ট্রেন ছাড়িবার সময় গাড়িতে লাফাইয়া উঠিল। ডিটেকটিভ ও আমি উভয়ে তাড়াতাড়ি একবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। আমার বুকের মধ্যে ধপ্ ধপ্ করিতে লাগিল ; এখনি একটা ছোটখাটো যুদ্ধ ব্যাপার উপস্থিত হইবে। আমি ভাল করিয়া বিট্টলরাওর সর্বাঙ্গ দেখিয়া লইলাম ; জোয়ানটি বড় কম নয়। ডিটেকটিভ লোকটা ক্ষীণকায়, আমিও তথৈবচ, দু'জনে তাহাকে পারিয়া উঠা দুষ্কর।

ট্রেন ছোট ছোট গোটা দুই-তিন স্টেশন পার হইয়া গেল। ডিটেকটিভ একমনে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন ; সহসা তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; পকেট হইতে একখানা রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিলেন ; তাহার পর জানালার কাছে আসিয়া এক লাফে বিট্টলরাওর উপর পড়িলেন ; তাঁহার দুই হস্ত বিট্টলরাওর উভয় স্কন্ধে এবং তাঁহার জানুদ্বয় বিট্টলরাওর বক্ষের উপর চাপাইয়া দিলেন। বিট্টলরাও তাড়াতাড়ি তাহার দক্ষিণ হস্ত পকেটে ফেলিবে, এমন সময় ডিটেকটিভ আমাকে বলিলেন—

শিগ্‌গির আসুন, রাসকেলের হাত দু'খানা আটকাইয়া ফেলুন।

আমি মুহূর্ত মধ্যে দৃঢ়বলে তাহার উভয় হস্তের মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিলাম। দেখিতে দেখিতে ডিটেকটিভ মহাশয় পকেট হইতে আর একখানা রুমাল বাহির করিয়া বিট্টলরাওর মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন; রুমালে অত্যন্ত উগ্র ক্লোরোফর্মের গন্ধ। বিট্টলরাও প্রায় এক মিনিট কাল আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল ; তাহার পর ক্লোরোফর্মে অভিভূত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ডিটেকটিভ বলিলেন, নির্বিঘ্নে কার্যোদ্ধার হইয়াছে। আপনি ঠিক সময়ে আমাকে সাহায্য না করিলে নিশ্চয়ই ও পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইত। জানালা খুলুন, শীঘ্র খুলুন, নতুবা ক্লোরোফর্মের গন্ধে আমরা আবার এখনই অজ্ঞান হইয়া পড়িব।

তাই তো ; আমার মাথাটাও ঘুরিয়া উঠিয়াছিল ; উৎসাহ ও উত্তেজনায় এতক্ষণ এ কথা মনেই ছিল না। আমি এক লাফে গাড়ির জানালা দরজা-খুলিয়া দিলাম। গাড়ির মধ্যে নৈশ বায়ুর অবাধ প্রবাহ আরম্ভ হইল।

ডিটেকটিভ বলিলেন, আপনি আজ আমার যে উপকার করিলেন, চিরদিন তাহা মনে থাকিবে ; আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট আপনার এই সহায়তার উল্লেখ করিতে পারি।

আমি আমার নাম বলিয়া বলিলাম, যদি আপনার কিছু কাজ করিয়া থাকি, সে কথা লইয়া আন্দোলন না করাই আমার কাছে ভাল বোধ হয়।

ডিটেকটিভ অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন ; বলিলেন, আমাদের তস্কর বন্ধুকে আর এ ভাবে এখানে ফেলিয়া রাখা সম্ভব নয় ; আসুন ধরাধরি করিয়া ইহাকে বেঞ্চির পাশে নামাইয়া রাখা যাক।

বিট্টলরাও তখনও অজ্ঞান ; তাহাকে নিচে নামাইয়া ফেলিলাম ; ডিটেকটিভ তাঁহার

কালো ব্যাগটা তাহার মাথার নিচে বালিশের মতো স্থাপন করিলেন। গাড়ির বাহির হইতে যাহাতে সহসা কাহারও তাহার প্রতি নজর না পড়ে, এজন্য একখানা কম্বল টাঙ্গাইয়া তাহাকে আমরা আড়াল করিয়া রাখিলাম।

আমি বলিলাম, চেতনা পাইলেই রাসকেল চেঁচাইতে আরম্ভ করিবে। ডিটেকটিভ হাসিয়া বলিলেন, তাহারও ব্যবস্থা হইবে, আমি উহার মুখ বাঁধিয়া দিতেছি। আপনার কোনও ভয় নাই।

রাত্রি বারোটার পর ট্রেন ভুসাওয়াল স্টেশনে পৌঁছিল। দেখিলাম প্লাটফর্মে সকলের আগে একজন মধ্যবয়স্ক মারাঠা পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে ; ভারি জোয়ান, গালপাট্টা, চোখ দুটো গোলাকার, দুটি ভাঁটার মতো, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, সোনালি আঁচলটা স্টেশনের তীব্র আলোকে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে।

চক্ষুর নিমেষে আমার দিকে চাহিয়া ডিটেকটিভ মহাশয় বলিলেন, এ সেই, বিট্টলরাও যাহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। আপনি গাড়ির মধ্যে কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি এ কামরা গার্ডকে বলিয়া রিজার্ভ করিয়া লইতেছি ; এ লোকটা ইহার মধ্যে প্রবেশ করে এরূপ আমার ইচ্ছা নয়।

ডিটেকটিভ নামিয়া গেলেন। চোরের সঙ্গে একাকী গাড়িতে বসিয়া রহিলাম। তাহার মুখটি বাঁধা বটে, কিন্তু যে রকম টানিয়া টানিয়া সে নিশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহাতে তাহার শীঘ্রই চৈতন্যোদয় হইবে বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। মনটা ভারি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

প্রথম ঘণ্টা পড়িল ; আমি ডিটেকটিভকে দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পড়িলাম ; গার্ডের গাড়ির কাছে গিয়া তাঁহাকে পাইলাম না ; এদিক ওদিক চারিদিক খুঁজিলাম, লোকটার কোনও খোঁজ পাইলাম না। ঠং ঠং করিয়া গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, গার্ড বাঁশিতে ফুঁ দিল ; আমি দ্রুতবেগে আসিয়া গাড়িতে উঠিলাম।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণ দেখি নাই, সেই জমকালো পাগড়িওয়ালা জোয়ান লোকটা এই গাড়িতেই উঠিয়াছিল। কি সর্বনাশ! সে এক লাফে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; আমার মুখের উপর একটা পাঁচনলা পিস্তল উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, স্থিরভাবে বসিয়া থাক, নড়িয়াছ কি মরিয়াছ।

আমার ডিটেকটিভ বন্ধু গাড়িতে নাই ; আমি নিরস্ত্র একা, সম্মুখে এই দুর্জয় জোয়ান সশস্ত্র, পাশে অর্ধচেতন বিট্টলরাও। মেলট্রেন নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। বুঝিলাম আর রক্ষা নাই ; সমস্ত গাড়িখানা আমার চক্ষুর উপর ঘুরিতে লাগিল ; নত মস্তকে মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মুক্তিলাভ অসম্ভব। তুলার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া কেহ এ পর্যন্ত বোধ করি এমন বিপদে পড়ে নাই। বিধাতার বিড়ম্বনা।

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া আগন্তুক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, বৃথা চিন্তা ; নিজে যে ফাঁদ পাতিয়াছ, তাহারই মধ্যে পা পড়িয়াছে। এখন আমি যাহা বলি শুন, অন্যথা করিলে মাথার খুলি এক গুলিতে উড়াইয়া দিব। আমার বন্ধুর মাথার দিকটা ধর, তাহাকে উপরে তুলিতে হইবে। পলায়নের চেষ্টা করিও না।

আমি জড়ের ন্যায় তাহার আদেশ পালন করিলাম। বিট্টলরাওর চৈতন্যোদয় হইল ; সে শুইয়া শুইয়া দুই হাতে চক্ষু মুছিতে লাগিল। আগন্তুক বলিল, কেমন আপাজি, বেশ

সুস্থ হইয়াছ তো?

আপাজি কি বিট্টলরাওর আর এক নাম? আপাজি উত্তর করিল, কে ভাস্কর? তুমি আসিয়াছ, বদমায়েসেরা কি ভাগিয়াছে?

না, একজন জালে পড়িয়াছে, আর একজন সরিয়াছে।

আপাজি উঠিয়া বসিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে পলাইল? পলাইবে ভাবিয়াই আমি তোমাকে অনেক আগে লোকজন সঙ্গে লইয়া স্টেশনে উপস্থিত থাকিতে বলিয়াছিলাম।

ভাস্কর বলিল, আমি প্রথমে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া কিছু আশ্চর্য হইয়াছিলাম ; সহজেই বুঝিয়াছিলাম, বদমাশ বিট্টলরাও তোমার উপর কোনও রকম কৌশল খাটাইয়াছে! শেষে আমি যখন এই গাড়িতে তোমার অবস্থা দেখিলাম, তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে আসামি কিরূপে সরিয়া পড়িল বুঝিলাম না ; তাহার সঙ্গী গাড়ি ছাড়িবার সময় আসিয়া আপনি ধরা দিয়াছে।

আমার কপালে ঘর্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। আপাজি কি বিট্টলরাও নহে? ইহাদের কথার কোন মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া আমি হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলাম ; বুঝিলাম ভিতরে একটা ভয়ানক রহস্য লুকানো রহিয়াছে।

কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকা চলে না। আমি আমার সহযাত্রীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, মহাশয়, আমি বুঝিতেছি, আমি কি একটা বিষম ভুল করিয়া বসিয়াছি। আপনারা কে?

ভাস্কর বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল, আমরা যে হই, সে খোঁজে আবশ্যক? তোমার ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিবে। তোমার নাম কি?

অন্য সময় হইলে হয় তো এরূপ অভদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতাম না। কিন্তু তখন এ অপমানও পকেটস্থ করাই সঙ্গত বোধ হইল। আমি নাম ও নিজের ব্যবসায়ের পরিচয় দিলাম।

ভাস্কর বলিল, ও তো গেল নকল পরিচয়, আসল পরিচয় দাও। দেখিতেছি তো বাঙালি, বিট্টলরাওর সঙ্গে কতদিন জুটিয়াছ? অনেক বাঙালি আমাদের এ অঞ্চলে আসিয়া কেবল নিজের মুখে কালি লেপিয়া বেড়ায়, তুমিও তাহাদের একজন। চোরা মাল কোথায়?

এবার আমার বড় রাগ হইল ; বলিলাম, তোমাদের এই রকম অভদ্র আচরণের প্রতিশোধ দিতে হইলে জুতা মারিয়া গাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দেওয়াই উচিত। ভদ্রলোকের কাছে চোরা মালের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই লজ্জা হইয়া থাকে।

আপাজি বলিল, ভদ্রলোককে হঠাৎ ক্লোরোফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া ফেলিতে ভদ্রলোকের লজ্জা হয় না?—আপাজির স্বর গম্ভীর।

আমি বলিলাম, সে ক্লোরোফর্ম আমি দিই নাই, ডিটেকটিভ দিয়াছিল। বদমাশকে বাঁধিবার জন্য আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম মাত্র ; আমার বিশ্বাস ভদ্রলোকেই এরূপ কাজ করিতেন।

ডিটেকটিভ? কোন ডিটেকটিভ?

আমার সহযাত্রী বন্ধু, যিনি জব্বলপুর হইতে আসিতেছিলেন।

আমি বললাম, হাঁ, তুমি যাহাকে আপাজি বলিতেছ, ডিটেকটিভ আমাকে বলিয়াছে সে স্বয়ং বিট্টলরাও ; তাহাকে বাঁধিবার জন্য ডিটেকটিভ আমার সাহায্য লইয়াছিল ; এখন তাহাকে পলাইতে দেখিয়া আমার মনে নানা সন্দেহ হইতেছে।

আপাজি বলিল, জাল ডিটেকটিভ! সে নিজেই বিট্টলরাও। আমি তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য তাহার সঙ্গ লইয়াছি ; চোরা মাল তাহার সঙ্গে আছে জানি। পথের মধ্যে একা গোলযোগ করিলে তাহা হাতছাড়া হইতে পারে বলিয়া আমি ভাস্করকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। পথিমধ্যে তোমার প্রিয় বন্ধু বোধকরি তাহা বুঝিয়া এই রকম করিয়া আমাদের চোখে ধুলা দিয়া পলাইয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে এখন প্রমাণ করিতে হইবে তুমি প্রকৃত ব্যবসায়ী, জাল ডিটেকটিভ সহচর নও।

জাল ডিটেকটিভের স্বহস্তে নোট করা সেই Bombay Herald তখনও আমার পকেটে ছিল ; আমি তাহা বাহির করিয়া আমার সহযাত্রীদ্বয়কে সেই নোট দেখাইলাম।

আপাজি বলিল, এ যথেষ্ট প্রমাণ নহে ; তোমার নির্দোষিতার সন্তোষজনক প্রমাণ না দেখাইলে অব্যাহতি লাভের আশা নাই। তোমার ব্যাগ খোল।

আমি তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলিতে গেলাম। উঠিয়া ব্যাগটা হাতে করিয়া তুলিয়াই তাহা নিচে ফেলিয়া দিলাম—আমি বসিয়া পড়িলাম।

আমার সর্বনাশ হইয়াছে! আমার ব্যাগটা জাল ডিটেকটিভ হাতে করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে, তাহার ভিতর যে পাঁচ হাজার টাকার নোট ছিল!

আপাজি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিল, একবার প্রতারণা করিয়াছ, দ্বিতীয়বার আমাদের চোখে ধূলি দেওয়া অসম্ভব।

আমি বলিলাম, এ ব্যাগ আমার নহে, জাল ডিটেকটিভের। আমার ব্যাগটা সে কখন লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে দেখি নাই ; আমার পাঁচ হাজার টাকা গিয়াছে।

আপাজি বলিল, এ বিট্টলরাওর ব্যাগ!—দেখি—সে তৎক্ষণাৎ একটা রিং সন্নিবদ্ধ এক তাড়া চাবি বাহির করিয়া তাহার একটা দিয়া ব্যাগ খুলিয়া ফেলিল। কতকগুলি কাগজপত্র উলটাইতেই সেই চোরা হীরকখণ্ড বাহির হইয়া পড়ি । তাহাতে গ্যাসালোকরশ্মি নিপতিত হইয়া আমার ভীতিবিস্ময়সমাকুল চক্ষে প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

আমি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম।

ব্যাগ বদলানোটা বিট্টলরাওর জ্ঞাতসারে, কি অজ্ঞাতসারে হইয়াছে আমি বুঝিতে পারিলাম না। বোম্বে আসিলে আমাকে লইয়া পুলিশে একবার টানাটানি করিয়াছিল। সহজেই আমার নির্দোষিতা প্রমাণ হইল ; বিচারক আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অশেষ দোষারোপ করিয়া আমায় মুক্তি দান করিলেন।

তাহার পর বিট্টলরাওর আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যথাসময়ে সাপুরজি জাহাঙ্গীরজি তাঁহার হীরক ফিরিয়া পাইলেন। পাঁচ হাজার টাকা খোয়াইয়া আমার কেবল কাদা মাখাই সার হইল।

সোনার বিগ্রহ

মঞ্জিল সেন

সঙ্কর্ষণের ইন্টারকাম টেলিফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার কানে তুলে ও বলল, ইয়েস।

ইনস্যুরেন্স কোম্পানি থেকে মিঃ তরফদার এসেছেন, মহিলা রিসেপশানিস্ট-কাম-টেলিফোন অপারেটরের সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এল, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিন।

স্যুইং ডোর ঠেলে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁর গায়ের রঙ বেশ কালো, পরনে ছাই রঙের ফুল শার্ট, আর ওই রঙেরই প্যান্ট। পায়ে বাদামী রঙের বুট জুতো। চীনে দোকান থেকে কেনা, এক নজরে দেখে সঙ্কর্ষণ মনে মনে ভাবল।

বসুন। ও আপ্যায়নের গলায় বলল।

চেয়ারে বসতে বসতে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলোলেন মিঃ তরফদার, বোধহয় যার সাহায্য নিতে এসেছেন তার অবস্থা আর পরিবেশ যাচাই করে নিলেন।

সঙ্কর্ষণ ডানহিল সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, বলুন, আপনার জন্য কি

করতে পারি?

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে তরফদার ধন্যবাদ দিলেন, তারপর ওটা ধরিয়ে বললেন, একটা চুরির কেসে আমাদের কোম্পানি আপনার সাহায্য চায়।

ও,—সঙ্কর্ষণ ভুরু কোঁচকালো, তারপর বলল, ইনসিওরড করা কোনও দামী জিনিস?

ভদ্রলোক মাথা দোলালেন।

কিন্তু পুলিশের সাহায্য নিচ্ছেন না কেন?

পুলিশকে জানানো হয়েছে, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাও ইনভেসটিগেট করে থাকি। আমাদের মনে হচ্ছে চুরিটা ভেতরের...মানে জানাশোনা কারও কাজ। তাই পুলিশের পাশাপাশি বাইরের কাউকে দিয়ে আমরা বেসরকারী তদন্ত করতে চাই। তাছাড়া—ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, পুলিশের ওপর আজকাল মানুষের আর আস্থা নেই।

হুম! সঙ্কর্ষণ স্বগতোক্তি করল, কি চুরি গেছে, আর কত টাকারই বা ইনসিওরড করা ছিল?

একটা রাধাগোবিন্দর যুগল মূর্তি, প্রায় বিঘতখানেক লম্বা, নিটোল সোনার। গোবিন্দর দু'চোখে আবার হীরে বসানো। পাঁচ লাখ টাকার ইনসিওরড করা ছিল।

সঙ্কর্ষণ শিস দিয়ে উঠল, পাঁচ লাখ টাকার প্রিমিয়াম তো কম নয়?—ও বলল, কত দিন আগে ইনসিওর করা হয়েছিল?

সেখানেই তো সমস্যা, মাত্র এক বছর...কোয়ার্টারলি প্রিমিয়াম তিনটে দিয়েছেন, চতুর্থটা আসছে মাসে দেবার কথা, তার আগেই ব্যাপারটা ঘটল।

সঙ্কর্ষণ আবার ভুরু কোঁচকালো, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, গোড়া থেকে বলুন।

আমাদের ক্লায়েন্ট হচ্ছেন অরিন্দম শীল। আহিরিটোলার শীলদের নাম শুনে থাকবেন। খুব বনেদী বংশ। ইংরেজ আমলে এঁদের পূর্বপুরুষরা শুধু খেতাবই পাননি, অনেক সুযোগ-সুবিধেও পেয়েছিলেন। লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা ছিল। কলকাতার অন্যতম ধনী এবং অভিজাত পরিবার বলে খ্যাতি আছে। স্বাধীনতার পর থেকেই অবস্থা পড়তে থাকে। গত তিরিশ বছরে অনেক ওলোটপালোট হয়ে গেছে। রেস আর ফাটকাবাজিতে জলের মতো টাকা বেরিয়ে গেছে। তবে বনেদী চাল-চলন এখনও যায়নি। দু'-চারটে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার অরিন্দম শীল, একটার ডিরেক্টর বোর্ডেও আছেন। পড়তি অবস্থা হলেও এখনও যা আছে তাই আমাদের অনেকেরই নেই। মস্ত জমি নিয়ে যে বাড়ি তার দামই এখন কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। পুরনো আমলের বাড়ি হলেও খাঁটি মাল-মশলায় তৈরি, এখনও মজবুত আছে।

যা হোক, ওই রাধাগোবিন্দ মূর্তি বানিয়েছিলেন অরিন্দম শীলের পিতামহ, জয়কৃষ্ণ শীল। তিনি ইংরেজদের কাছ থেকে খেতাব পেয়েছিলেন। তিনিই শীলবংশের প্রথম উদ্যমী পুরুষ, ব্যবসার পত্তন তিনিই করেছিলেন। খুব সমারোহ করে ওই যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জয়কৃষ্ণ শীল। অনেক খোঁজখবর করে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটী থেকে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারকে এনে তিনি জায়গা-জমি দিয়ে বসতি

pathagar.net

করিয়েছিলেন। পুরুষানুক্রমে তাঁরাই এই বিগ্রহের পূজা করেন। এখন যিনি পূজারী তাঁর নাম জনার্দন ভট্‌চায, বয়স ষাটের কাছাকাছি। গত তিরিশ বছর ধরে তিনি পূজা আরতি করছেন।

গত পনের তারিখে সন্ধ্যেবেলা আরতির সময় অরিন্দম শীল, তাঁর স্ত্রী আর দুই পুত্রবধূ ঠাকুরঘরে ছিলেন। জনার্দন ভট্‌চায যথারীতি আরতি করছিলেন। অরিন্দম শীলের হঠাৎ কেমন যেন খটকা লাগল। তিনি ঠাকুরমশায়কে বিগ্রহ ভাল করে দেখতে বললেন। তাঁর সন্দেহই ঠিক। ওটা আসল বিগ্রহ নয়, ঠিক অমন দেখতে সস্তা ধাতুর এক যুগল মূর্তি, সোনার জলে এমনভাবে পালিশ করা যে খুব অভিজ্ঞ চোখ ছাড়া ধরা কঠিন। গোবিন্দর চোখে নকল ঝকমকে সাদা পাথর...

সঙ্কর্ষণ বাধা দিয়ে বলল, এটাও হতে পারে যে, পনের তারিখে ধরা পড়লেও এই অদল-বদল ব্যাপারটা কয়েকদিন আগে ঘটেছে, কেউ খেয়াল করেননি।

তা হতে পারে, তরফদার স্বীকার করলেন।

পুরোহিত যখন পুজো বা আরতি করেন তখন বাড়ির লোক...মানে কেউ না কেউ কি সেখানে থাকেন?

তাই তো শুনেছি।

পনের তারিখে আরতির সময় অরিন্দম শীল, তাঁর স্ত্রী আর দুই পুত্রবধূ ঘরে ছিলেন বললেন, রোজই কি তাঁরা থাকেন?

না, সেদিন রাসপূর্ণিমার উৎসব ছিল।

pathagar.net

তবে অন্যদিন কে থাকেন পুজো বা আরতির সময়?

সাধারণত অরিন্দম শীলের স্ত্রীই থাকেন, পুত্রবধূরা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন। তবে তিনি কিছুদিন ধরে অসুস্থ, বাতের ব্যথায় ভুগছেন, বেশি হাঁটা-চলা করতে পারেন না, তাই রোজ থাকতে পারেন না। পুত্রবধূদের কেউ একজন থেকে পূজার যোগান দেন। অরিন্দম শীলও মাঝে মাঝে পূজার সময় থাকেন। শুনেছি সন্ধ্যেবেলা আরতির সময় খুব জরুরি দরকার না থাকলে তিনি ঠাকুরঘর থেকে নড়েন না।

ঠাকুরমশায়ের পুজো বা আরতির সময় কেউ কি ওঁকে একা রেখে দু'-পাঁচ মিনিটের জন্য বাইরে যান? ধরুন কিছু আনতে?

তা ঠিক বলতে পারব না, তরফদার বললেন, আমার মনে হয় আপনি তদন্তের ভার নিলে সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন। পুলিশ ঠাকুরমশাইকেই সন্দেহ করছে, তাঁর বাড়িতেও সার্চ হয়েছে। তিনি এখন জামিনে আছেন। অরিন্দম শীল অবিশ্যি বলেছেন, ঠাকুরমশাই দীর্ঘকাল পূজা-আর্চা করছেন, ধার্মিক এবং সৎ। তাঁকে তিনি সন্দেহ করেন না। কিন্তু মানুষ অবস্থার বিপাকে কখন কি করে বসে তা কেউ বলতে পারে না।

অবস্থার বিপাকে বলছেন কেন? সঙ্কর্ষণ আবার ভুরু কোঁচকালো।

ঠাকুরমশায়ের একমাত্র ছেলে একটা সওদাগরি আপিসে কাজ করত। আজ এক বছর হলো সেখানে লক-আউট চলছে। ঠাকুরমশাই ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। দুটি নাতনিও আছে। খুব টানাটানিতে পড়েছেন। শীলবাড়িতে পূজা করে যা পান তাতে তো আর গোটা সংসারের সারা বছর চলে না।

আই সী, সঙ্কর্ষণ বলল।

ভাল কথা, তরফদার বললেন, আপনি যদি আসল মূর্তি উদ্ধার করতে পারেন তবে কোম্পানি থেকে আপনাকে দশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। এই নিন কোম্পানির লিখিত চুক্তি।

পোর্টফোলিও থেকে টাইপ করা একটা কাগজ বার করে তিনি সঙ্কর্ষণের হাতে দিলেন।

কাগজটায় চোখ বুলিয়ে সঙ্কর্ষণ বলল, কিন্তু এ ব্যাপারে শীলবাড়ির পূর্ণ সহযোগিতা আমার চাই, অরিন্দম শীল আমার তদন্তে বাধা দেবেন না তো?

না, তাঁকে বলা হয়েছে তাঁর ক্লেম অ্যাডমিট করার আগে আমরা ভাল করে তদন্ত করে দেখব। পাঁচ লাখ টাকা চাট্টিখানি কথা নয়। ভদ্রলোক সব রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ঠিক আছে, কেসটা আমি গ্রহণ করলাম, সঙ্কর্ষণ বলল।

।। দুই ।।

আহিরিটোলার শীলদের বাড়ি সত্যিই দেখবার মতো। আগেকার দিনের ধনী পুরুষদের চকমিলান প্রকাণ্ড দালানবাড়ি। নাট-মন্দির, আস্তাবল সবই আছে, তবে সেই জৌলুস নেই। আস্তাবল ফাঁকা। অরিন্দম শীলের আমলেই সব বিক্রি হয়ে গেছে। বিরাট বিরাট খিলান, মার্বেল পাথরের মেঝে, চওড়া দেওয়ালের গাঁথুনি। অনেক ঘর। কিন্তু এই প্রকাণ্ড বাড়িই এখন মস্ত বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সঙ্কর্ষণ সকালের দিকেই গিয়েছিল। অরিন্দম শীল ততক্ষণে স্নান সেরে ফেলেছেন। গৌরবর্ণ চেহারা, বয়স ষাট পেরিয়েছে। পরনে পট্টবস্ত্র, গায়ে সাদা শাল। তিনি ঠাকুরঘরে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। ঠাকুরমশাই এসে গেছেন। সঙ্কর্ষণের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন জনার্দন ভট্চাযই পূজা করছেন।

সেদিন হঠাৎ কেন আপনার সন্দেহ হলো বিগ্রহ বদল হয়েছে? সঙ্কর্ষণ জিগ্যেস করল।

ওটা জন্ম থেকে দেখে আসছি, তাই সেদিন কেমন যেন খটকা লেগেছিল, অরিন্দম শীল জবাব দিলেন।

কিন্তু ওটা যে সেদিনই বদল হয়েছে এমন নাও হতে পারে, সঙ্কর্ষণ বলল, কয়েক দিন আগেও ব্যাপারটা ঘটতে পারে।

তা হতে পারে, অরিন্দম শীল কেশবিরল মাথায় হাত বুলোলেন।

সে কথাই তো আমি জানতে চাইছি, সঙ্কর্ষণ বলল, ওই দিনই আপনার খটকা লাগল? আগে চোখে পড়েনি কেন?

অরিন্দম শীল এক মুহূর্ত সঙ্কর্ষণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, হয়ত খেয়াল করিনি। তবে সেদিন রাসপূর্ণিমা ছিল, সন্ধেবেলা আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল বিগ্রহ, তাই চোখে পড়েছিল বোধহয়। তাছাড়া আগেই যে ওটা বদল হয়েছিল সেটা তো আপনার অনুমান, ওই দিন সকালেও তো ঘটতে পারে।

তা ঠিক, সঙ্কর্ষণ বলল। ওই দিন সকালবেলা পুজোর সময় ঠাকুরঘরে কে ছিলেন?

আমার ছোট পুত্রবধূ, আমাকে সেদিন সকালেই বেরোতে হয়েছিল।

আপনার ছোট পুত্রবধূর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। হ্যাঁ, শুধু ওঁর সঙ্গে নয়, আপনার বাড়ির সবার সঙ্গেই আমি কথা বলব। দয়া করে একটু ব্যবস্থা করে দিন।

ঠিক আছে, অরিন্দম শীল আশ্বাস দিলেন।

তাঁর ছোট পুত্রবধূর নাম ঈপ্সিতা। অরিন্দম শীলরা বনেদী পরিবার, এবং সেই সূত্রে রক্ষণশীল বলে পরিচিতি আছে। কিন্তু ঈপ্সিতা তার ব্যতিক্রম। চুল ছোট করে কাটা, ভুরু প্লাক করা, বেশভূষায় আধুনিকতার ছাপ। মুখে প্রসাধনের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

বসবার ঘরে কথা হচ্ছিল।

সঙ্কর্ষণ বলল, পনের তারিখে সন্ধ্যেবেলা আপনাদের বিগ্রহ বদলের ব্যাপারটা ধরা পড়ল, সেদিন সকালবেলা আপনি পুজোর ঘরে ছিলেন। ঠাকুরমশায়ের পুজোর যোগান দিচ্ছিলেন, কেমন?

হ্যাঁ, ঈপ্সিতা মৃদু ঘাড় দোলালো।

আপনি কি সব সময় ঘরে ছিলেন...মানে একবারও ঘরের বাইরে যাননি?

মিনিট পাঁচেকের জন্য একবার আমার শোবার ঘরে গিয়েছিলাম, ঈপ্সিতা জবাব দিল, চন্দন ঘষতে ঘষতে মনে পড়েছিল আলমারিটা খুলেছিলাম, বন্ধ করা হয়নি।

ও,—সঙ্কর্ষণ বলল, এর আগে কোনওদিন এমন ঘটনা ঘটেনি? আলমারি না হোক, অন্য কোনও কারণে ঠাকুরঘর ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন।

তা হতে পারে, আমরা তো আর আগে কখনও ঠাকুরমশাইকে সন্দেহ করিনি।

এখন করেন?

করব না! ঈপ্সিতার কণ্ঠে বিস্ময়, উনি ছাড়া আর কে সরাতে পারে ওটা?

উনি অনেক বছর ধরে পুজো করছেন, আগে কখনও অবিশ্বাসের কাজ তো করেননি।

মানুষের স্বভাব বদলাতে কতক্ষণ! ঈপ্সিতা বলল, লোভ মুনি-ঋষিদেরও মতিভ্রম ঘটায়।

হুঁ! আপনার বড় জাকে একবার পাঠিয়ে দিন।

অরিন্দম শীলের বড় পুত্রবধূ কিন্তু রক্ষণশীল ঘরের বধূ হবার উপযুক্ত। হাতির দাঁতের মতো গায়ের রঙ, পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ, ঘন কালো চুল কোমর ছাড়িয়েছে, মাথায় ঘোমটা। কপালে সুন্দর একটা সিঁদুরের টিপ আর দু'পায়ে আলতা। নামও সাবেকী আমলের, মৃণালিনী। তিনি একা ঘরে এলেন না, একজন দাসীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন।

সঙ্কর্ষণের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন পুজোর আয়োজনের সময় তিনিও দু'-একবার দরকারে বাইরে গেছেন। বিগ্রহ বদলের ব্যাপারটা পনের তারিখের আগেও ঘটতে পারে বলে তিনি স্বীকার করলেন। ঠাকুরমশাই সম্বন্ধে তিনি বললেন তাঁকে ধার্মিক এবং সৎ বলেই এতদিন তাঁর ধারণা ছিল।

অরিন্দম শীলের স্ত্রীর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। বয়সকালে তিনি যে পরমাসুন্দরী

ছিলেন তা এক নজরেই বোঝা যায়। সঙ্কর্ষণ যেদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলল, সেদিন তিনি বাতের ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কিন্তু পনের তারিখের আগে বিগ্রহ বদল হবার সম্ভাবনা মানতে পারলেন না। অর্থাৎ ঘুরেফিরে সন্দেহটা ঠাকুরমশায়ের ঘাড়েই এসে পড়ছে।

বড় ছেলে আনন্দ, অরিন্দম শীল যে কোম্পানির ডিরেক্টর সেখানে অ্যাকাউন্টস অফিসার, আর ছোট ছেলে সুনন্দ এক বেসরকারী সংস্থার ইঞ্জিনীয়ার। তারা কেউ পারতপক্ষে পূজার ঘরে পা দেয় না, ধর্মে তেমন মতি নেই।

সবশেষে জনার্দন ভট্চাযের সঙ্গে দেখা করল সঙ্কর্ষণ। উজ্জ্বল গায়ের রঙ, মাথার চুল প্রায় সাদা, চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছাপ পড়েছে।

তিনি ওর পরিচয় আর উদ্দেশ্য জানতে পেরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, বললেন, আমাকে বাঁচান বাবু, আমি নির্দোষ, বিগ্রহ পালটাপালটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আজ তিরিশ বছর ধরে ও বাড়িতে আমি পুজো করছি, আমার পিতামহকে এখানে এনে বসিয়েছিলেন কর্তাবাবুর পিতামহ, জায়গা-জমি দিয়েছিলেন, আমি এমন নিমকহারামের কাজ করিনি।

আপনি শান্ত হয়ে আমার কথার জবাব দিন, সঙ্কর্ষণ বলল, আপনি নিরপরাধ হলে নিশ্চয়ই তা প্রমাণ করা যাবে।

ভট্চাযমশাই চোখ মুছে আত্মসংযমের চেষ্টা করলেন। সঙ্কর্ষণ তাঁকে সহজ হবার জন্য কয়েক মুহূর্ত সময় দিল, তারপর বলল, ঠাকুরঘর কি পুজো আরতি ছাড়া অন্য সময় বন্ধ থাকে?

হ্যাঁ, ভট্চাযমশাই জবাব দিলেন, বাইরে থেকে তালা দেওয়া থাকে।

চাবি কার কাছে থাকে?

গিন্নিমার কাছে।

উনিই কি রোজ দরজা খুলে দেন?

সুস্থ থাকলে উনিই দেন।

আর সুস্থ না থাকলে?

কর্তাবাবু, নয়তো বড় বউমা। খুব ধর্মে মতি বড় বউমার।

তবে উনি পুজো বা আরতির সময় রোজ ঠাকুরঘরে থাকেন না কেন?

ওঁর ঘাড়েই তো সব সংসার এখন। গিন্নিমা প্রায়ই বাতের ব্যামোয় শয্যাশায়ী থাকেন, তাই বড় বউমাকেই সংসারের সব দেখাশোনা করতে হয়।

আর ছোট বউমা?

তিনি একটু নিজের খেয়ালে চলেন। ভট্চাযমশাই সামান্য ইতস্তত করে বললেন, এই পরিবারে যেন বেমানান। আসলে উনি ছোটদাদাবাবুর আপিসেই কাজ করতেন, সেখানেই ভাব আর বিয়ে। কর্তাবাবু আর গিন্নিমার একটুও মত ছিল না বিয়েতে, কিন্তু ছোটদাদাবাবু তাঁদের কথা শোনেননি। ছোট বউমাকে তেমন সুনজরে দেখেন না কর্তাবাবু আর গিন্নিমা, তাই বোধহয় সংসারের কোনও ব্যাপারে ছোট বউমার আগ্রহ একটু কম।

কিন্তু আপনার পুজো বা আরতির সময় দরকার হলে উনি তো থাকেন, আপনাকে

যোগাড়যন্ত্র করে দেন।

তা কেন দেবেন না, হিঁদুর মেয়ে, দেব-দেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা থাকতে পারে কখন! তবে উনি খুব ঠেকায় না পড়লে আসেন না। কর্তাবাবুই বেশিরভাগ সকাল-সন্ধ্যায় হাজির থাকেন। তিনি আবার বড় খুঁতখুঁতে। পুজো-আরতিতে এতটুকু ত্রুটি বরদাস্ত করেন না। অবিশ্যি গিন্নিমা সুস্থ থাকলে তিনিই থাকেন।

বুঝেছি, সঙ্কর্ষণ বলল, ওঁদের কেউ না থাকতে পারলে বড় বউমাই পুজোর কাজকর্ম করেন, কেমন?

হ্যাঁ।

বড় ছেলে মানে আনন্দবাবু আপনার কর্তাবাবু যে কোম্পানির ডিরেক্টর সেখানেই কাজ করেন। তাঁর আবার কিছু বদখেয়ালও আছে শুনেছি।

মানে...বড়ঘরের ছেলে, একটু-আধটু খেয়াল তো থাকবেই। তবে নেশা-ভাঙ করেন না।

আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বাজারে ওঁর ধার-দেনা কম নয়, সঙ্কর্ষণ যেন চিন্তা করতে করতে বলল, এদিকে আবার কোম্পানির অ্যাকাউন্টস অফিসার, টাকা-পয়সা নিয়ে কারবার...

কি বলছেন আপনি! ভট্‌চাযমশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

না, আমি সব সম্ভাবনাই ভেবে দেখছি, সঙ্কর্ষণ বলল, শুনলাম আপনার ছেলেও নাকি এক বছর ধরে বাড়ি বসে আছে?

pathagar.net

হ্যাঁ, ভট্‌চাযমশায়ের মুখে আবার ফুটে উঠল দুশ্চিন্তার ছাপ।

শীলবাড়ি থেকে যা পান তাতে কি সারা মাস চলে? সঙ্কর্ষণ জিগ্যেস করল।

তাই কি চলে! ভট্‌চাযমশাই ম্লান হাসি হাসলেন, আগে বরাদ্দ ছিল মাসে এক মণ চাল, এখন তা দাঁড়িয়েছে দশ কিলোয়। মাসোহারা অবিশ্যি দেড়শো টাকা থেকে বেড়ে আড়াইশো টাকা হয়েছে। কিন্তু দশ বছর আগেও দেড়শো টাকার যা মূল্য ছিল, আজ পাঁচশো টাকার মূল্যও তার চাইতে কম।

তা একশোবার, সঙ্কর্ষণ সায় দিয়ে বলল, তবে চলে কি করে আপনার?

বাঁধা কয়েক ঘর যজমান আছে, ভট্‌চাযমশাই মলিন মুখে বললেন, একটু-আধটু জ্যোতিষশাস্ত্রও জানি, তা থেকেও কিছু আসে। মাঝে মাঝে উপোস দিই, অভ্যেস হয়ে গেছে, এইভাবেই চলে। ছেলের চাকরিটা থাকলে চিন্তা ছিল না।

ছেলেকে নিজের পেশায় ঢোকালেন না কেন? সঙ্কর্ষণ জিগ্যেস করল, একদম বসে না থেকে কিছু অন্তত ঘরে আনতে পারতো।

আজকালকার ছেলে, ইস্কুল-কলেজে পড়েছে, নামাবলী গায়ে দিতে রাজি হয়নি, মানে বেধেছিল। এখন বুঝছে। নতুন চাকরির আশাও নেই। স্ট্রাইক আর লক-আউটে একটার পর একটা কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে এক একটা পরিবারকে ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের মুখে।

শুনেছি আপনার স্ত্রী কঠিন অসুখে ভুগছেন, তাঁর ঠিকমতো চিকিৎসার জন্য নাকি অনেক টাকার দরকার?

ভট্‌চাযমশাই কোনও জবাব দিলেন না, বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

ছোট ছেলে সুনন্দর সঙ্গেও কথা বলল সঙ্কর্ষণ। সে কিন্তু সঙ্কর্ষণকে বেশি পাত্তা দিতে চাইল না। সে একজন ইঞ্জিনীয়ার, নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন।

আপনি তো ন্যাশনাল মাল্টিপারপাস ইন্ডাসট্রিজ কোম্পানিতে কাজ করেন? সঙ্কর্ষণ বলল।

হ্যাঁ, ওখানকার ইঞ্জিনীয়ার, সুনন্দ জবাব দিল।

পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা চেক নিয়ে কি যেন গোলমাল হয়েছে, আপনার নামও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে!

মিথ্যে কথা, সুনন্দ বলে উঠল, আমাকে মিথ্যে করে ওই ব্যাপারে জড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপরই গলা নিচু করে প্রায় অনুনয়ের সুরে সে বলল, বাবার কানে এ কথা তুলবেন না, প্লিজ, উনি খুব শক্‌ড হবেন।

পথে এসো বাছা, সঙ্কর্ষণ মনে মনে বলল।

।। তিন ।।

কয়েকদিন কেটে গেছে। সঙ্কর্ষণ ইতিমধ্যে নানান জায়গায় খোঁজখবর করেছে।

মিঃ তরফদার সেদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, কাজ কতদূর এগিয়েছে জানতে চাইলেন।

ব্যাপারটা কি জানেন, সঙ্কর্ষণ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, বিগ্রহ বদল কার কীর্তি সেটা অনুমান করা খুব কঠিন নয়, কিন্তু প্রমাণ করাটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেন? তরফদার জিগ্যেস করলেন।

যে এই কাজ করেছে সে বাইরের কেউ নয়, ঠাকুরমশাইকেও আমি ঘরের লোক বলেই ধরছি। দোতলার তালাবন্ধ ঘর থেকে বাইরের কেউ এসে বিগ্রহ বদল করে যাবে, যাবার সময় আবার দরজায় তালাটাও লাগাতে ভুলবে না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে আমার বিশ্বাস এত তাড়াতাড়ি ওই সোনার বিগ্রহ বিক্রি করার চেষ্টা চোর করবে না, সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। অমন একটি মূল্যবান বিগ্রহ যে কোনও বনেদী বা বিখ্যাত পরিবারের সম্পত্তি কিংবা কোনও দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহশালা থেকে সরানো হয়েছে, এই প্রশ্নটাই প্রথমে জাগবে ক্রেতার মনে। কাগজেও এই ঘটনা নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। মোটামুটি সবাই, মানে সোনা-রূপার কারবারীরা ব্যাপারটা জেনে গেছেন। সুতরাং চোরকে সাবধানী হতে হবে। কিছুদিন গেলে, ঘটনা যখন মানুষের মন থেকে মুছে যাবে, তখনই সে তৎপর হবে—অবিশ্যি এটা আমার ধারণা। তাই আমার মনে হয় বিগ্রহ এখনও বাড়িতেই আছে, বাইরে পাচার হয়নি। কিন্তু অত বড় বাড়িতে ওটা খুঁজে বার করা অসাধ্য ব্যাপার।

তা বটে, তরফদার স্বীকার করলেন, তবে কি উপায়?

উপায় একটা করতেই হবে, সঙ্কর্ষণ বলল, আমি একটা মতলব ঠাওরেছি। আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা আপনি সবাইকে বসবার ঘরে হাজির থাকতে বলবেন। ঠাকুরমশাইকেও থাকতে হবে। অরিন্দম শীলকে বলবেন জরুরি দরকার, সবার উপস্থিত

থাকার প্রয়োজন। আপনার কথা উনি ঠেলতে পারবেন না, আপনার নোটের ওপরেই নির্ভর করছে ওঁর পাঁচ লাখ টাকা। ও, একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করব ভেবেছিলাম। অরিন্দম শীল এত বড় বাড়ি রেখেছেন কেন? ওটার মেনটেনেন্স খরচা, ট্যাক্স, এসব কম নয়। ভাড়া দিলেও তো অনেক টাকা পেতে পারেন। এমনিতেই ওঁর অবস্থা এখন পড়তি অথচ দেখছি বড়মানুষি ঠাটটি বজায় রেখেছেন। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বাজারে ধার-দেনা কম নয়। উনি এই বাড়ির একটা অংশ কিংবা জমি বিক্রি করলেও অনেক টাকা পেতে পারেন। আজকাল মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরির জন্য প্রোমোটাররা তো মুখিয়েই আছেন।

ও বাব্বা! তরফদার ঠোঁট উল্টোলেন, সে বুঝি জানেন না! ভদ্রলোকের অবস্থা পড়ে গেছে, চারদিকে ধার-দেনা, কিন্তু বংশমর্যাদা সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান। বড়লোকি চাল-চলন ছাড়তে তিনি রাজি নন। কথায় কথায় বলেই ফেলেন তাঁর শরীরে নীল রক্ত বইছে। এ বাড়ি হলো তাঁর বংশের ঐতিহ্য, কলকাতার একটি ঐতিহাসিক বাড়ি, বেঁচে থাকতে তিনি এ বাড়িতে বাইরের কাউকে অধিকার দেবেন না। তবে, তরফদার টিপ্পনি কাটলেন, ওই বুড়ো যতদিন বেঁচে আছেন ততদিনই, ছেলেরা ওসব ঐতিহ্য-টৈতিহ্য বোঝে না। বাপ চোখ বুজলেই বাড়ি বেচে দেবে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

সে যাকগে, সঙ্কর্ষণ বলল, তবে ওই কথাই রইল, আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা শীলবাড়িতে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে।

pathagar.net

তরফদার কথা রেখেছিলেন। অরিন্দম শীলকে বুঝিয়েছিলেন মিটিংটা জরুরি এবং সবাইকে থাকতে হবে।

বসবার ঘরটা প্রকাণ্ড। দেওয়ালে নামী শিল্পীদের আঁকা অয়েল-পেইন্টিং, অযত্নে বিবর্ণ হয়ে গেছে। মেঝেতে খুব দামী কার্পেট বিছানো, অসংখ্য ফুটো চোখে পড়ে। মেহগিনি কাঠের সাবেকি আমলের সব চেয়ার, রঙ বার্নিশ উঠে গেলেও কৌলিনত্ব হারায়নি।

সঙ্কর্ষণ শুরু করল, এ বাড়ির ঠাকুরঘর থেকে আসল রাধাগোবিন্দ মূর্তি খোয়া যাবার ব্যাপারে মিঃ তরফদার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। মূর্তিটি প্রাচীন, এবং নিরেট সোনার। গোবিন্দর দু'চোখে আবার হীরে বসানো। অরিন্দমবাবু ওটা পাঁচ লাখ টাকায় বীমা করেছিলেন। মূর্তি খোয়া গেছে টের পেয়ে তিনি থানায় অভিযোগ করেন, সেই সঙ্গে বীমা কোম্পানির কাছেও পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেছেন। বীমা কোম্পানি মিঃ শীলের এই ক্লেম মেনে নেবার আগে নিয়ম অনুযায়ী একটা তদন্ত করতে চেয়েছিল, এবং সেই সূত্রেই কোম্পানি থেকে এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের ভার আমাকে দেওয়া হয়েছে।

সঙ্কর্ষণ একটু থামল। উপস্থিত সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর আবার শুরু করল, এই ঘটনায় আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে, সেগুলো আপনাদের সামনে আমি রাখছি।

পনের তারিখ সন্ধ্যেবেলা মিঃ শীল আবিষ্কার করেছিলেন যে, ওটা আসল বিগ্রহ নয়,

নকল। সকালবেলা তাঁর মনে সন্দেহ হয়নি, কারণ সেদিন সকালবেলা তিনি ঠাকুরঘরে যাননি। তবে তিনি স্বীকার করেছেন বিগ্রহ আগেও বদল হতে পারে।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা মনে আসে তা হলো এই কাজ বাইরের কারও দ্বারা হয়নি। ঠাকুরঘরে যাদের অবাধ স্বাধীনতা তাদের পক্ষেই বিগ্রহ বদল করা সম্ভব। প্রথমে জনার্দন ভট্চাযের কথায় আসা যাক। তিনি বিগ্রহের পূজারী, অনেক বছর ধরে পুজো আর আরতি করছেন। পুজোর বা আরতির সময় বাড়ির কেউ না কেউ ঘরে থাকেন, তবে অল্প সময়ের জন্য তাঁরা যে বাইরে যান না এমন নয়। ভট্চাযমশাই গায়ে চাদর জড়িয়ে আসেন, ঘরে যখন কেউ নেই তখন মূর্তি বদল করে আসল বিগ্রহ চাদরের আড়ালে লুকোতে অসুবিধে নেই। আরও একটা কথা, বাইরের কেউ ওঁকে টাকা দিয়ে হাত করে বিগ্রহ হাতিয়েছেন এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

না, না, আমি অমন কাজ করিনি। জনার্দন ভট্চায প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

ডান হাত তুলে তাঁকে নিরস্ত করে সঙ্কর্ষণ বলতে লাগল, জনার্দন ভট্চাযের সুযোগ এবং সুবিধে দুই-ই ছিল। প্রশ্ন হতে পারে, গত তিরিশ বছর ধরে তিনি পুজো-আর্চা করছেন, তাঁর বাপ-ঠাকুর্দাও এই বাড়ির পূজারী ছিলেন, এমন অবিশ্বাসের কাজ তিনি কেন করবেন! পরিবেশে মানুষ বদলায়। ভট্চাযমশায়ের ছেলের এক বছর ধরে চাকরি নেই। ঘরে পুত্রবধূ আর দুটি নাতনি, স্ত্রীর কঠিন অসুখ। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার দরকার। শীলবাড়ি থেকে যা তিনি মাসোহারা পান তা সামান্যই, তা দিয়ে সংসার চলে না। সুতরাং অভাবে পড়ে সোনার বিগ্রহ সরাবার চিন্তা তাঁর মাথায় আসা মোটেই আশ্চর্য নয়।

কিন্তু তাঁর অনুকূলেও দু'একটা যুক্তি আছে যা উপেক্ষা করা যায় না। যেমন, এই ঘটনায় পুলিশ প্রথমে তাঁকেই সন্দেহ করবে, তাঁর সুযোগ-সুবিধে আছে এবং তাঁর বর্তমান অবস্থার কথা কারও অজানা নয়। এটা জেনেও কেন ভট্চাযমশাই এমন কাঁচা কাজ করবেন! ওই মূর্তি বিক্রি করাও তাঁর পক্ষে খুব সহজ হবে না, বরং তাঁকেই সবাই সন্দেহ করবে এটা জেনেই অন্য কারও পক্ষে মূর্তি বদল করা খুব চতুরের মতো কাজ হবে। আসল অপরাধীকে কেউ সন্দেহ করবে না।

দ্বিতীয়, ঠাকুরঘরে পুজো বা আরতির সময় ছাড়া ভট্চাযমশাই ঢোকেন না, দরজায় তালা থাকে। কিন্তু বাড়ির আর কেউ যে কোনও সময় ও ঘরে ঢুকতে পারেন, এমনকি তালার একটা ডুপ্লিকেট চাবি যে কেউ করিয়ে নিতে পারেন, এটাও ঠাকুরমশায়ের পক্ষে একটা যুক্তি। তাঁর সুযোগ বাড়ির অন্যদের তুলনায় সীমিত।

সঙ্কর্ষণ আবার থামল। জনার্দন ভট্চাযের মুখে ফুটল কৃতজ্ঞতার চিহ্ন।

এবার অরিন্দম শীলের বড় ছেলে আনন্দবাবুর কথায় আসা যাক। তাঁর বাবা যে কোম্পানির ডিরেক্টর সেখানকার তিনি অ্যাকাউন্টস অফিসার। অর্থাৎ টাকা-পয়সা লেনদেন বা হিসেবপত্রের ভার তাঁর ওপর। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি ওই কোম্পানির অবস্থা ভাল নয়, কর্মচারীরা ঠিকমতো মাইনে পাচ্ছে না। আনন্দবাবুর আবার ঘোড়ার রোগ আছে। ধার-দেনাও কম নয়। সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ওই সোনার বিগ্রহ সরিয়ে ওখানে একটা মেকী মূর্তি বসাবার মতলব তাঁর মাথায় যদি আসে তবে আশ্চর্য

হবার কিছু নেই।

মিথ্যে কথা, গর্জন করে উঠল আনন্দ, ইটজ এ লাই।

সঙ্কর্ষণ আবার ডান হাত তুলে তাকে নিরস্ত করে বলল, আনন্দবাবুর স্ত্রীকে কখনও-সখনও ঠাকুরঘরের দরজা খুলতে হয়, বিশেষ করে শাশুড়ি অসুস্থ থাকলে কিংবা শ্বশুরমশাই ব্যস্ত থাকলে তিনি চাবি দিয়ে তালা খোলেন। স্বামীকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য পতিব্রতা স্ত্রীরা করতে পারেন না এমন কাজ নেই। শুনেছি তাঁর ধর্মে খুব মতি, কিন্তু স্বামীর মঙ্গল তাঁর কাছে জগৎসংসারে সব থেকে বড়।

সঙ্কর্ষণ লক্ষ্য করল ঘোমটার আড়ালে আনন্দবাবুর স্ত্রীর দু'চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছে।

এবার ছোট ছেলে সুনন্দবাবুর কথায় আসি। তিনি একটা বেসরকারী কোম্পানির ইঞ্জিনীয়ার। ইচ্ছেই হোক কি অনিচ্ছেই হোক একটা বড় অঙ্কের টাকার গোলমালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁকে হয়তো মোটা টাকা খেসারত দিতে হতে পারে। ব্যাপারটা অবিশ্যি মিটেও যেতে পারে। কিন্তু তা যদি না হয় তবে অত টাকা কোথা থেকে তিনি যোগাড় করবেন! তাঁর স্ত্রীরও ঠাকুরঘরে অবাধ যাতায়াত, বড় জাকে সাহায্য করার নাম করে তিনিও ঠাকুরঘরের দরজা খুলতে পারেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে তিনি একজন প্র্যাকটিক্যাল ওম্যান, স্বামীকে সাহায্য করার জন্য ওই বিগ্রহ সরাতে অনুশোচনা হবে এমন সেন্টিমেন্টাল তিনি নন।

ইডিয়ট, তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠে উচ্চারিত কথাটা যেন চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল।

সঙ্কর্ষণ সেটা গায়ে না মেখে বলে চলল, আমি আগেই বলেছি, বিগ্রহ পনের তারিখের আগে, ধরা যাক বারো-তের কিংবা চোদ্দ তারিখে বদল হয়েছে। কেন তা বলছি। আসল বিগ্রহের একটা রেপ্লিকা বা অবিকল প্রতিমূর্তি দরকার ছিল অপরাধীর। যেহেতু আসল মূর্তি কারিগরকে দেওয়া সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই ওটার একটা ছবি কিংবা ফোটো থেকে নকল মূর্তিটা বানানো হয়েছে। বাড়ির কারও সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব নয়। নকল মূর্তির ওপর সোনার জল পালিশ করা হয়েছে, আর গোবিন্দর দু'চোখে বসানো হয়েছে দুটো ঝুটো পাথর, হঠাৎ হীরে বলে ভুল হয়। এ দুটো কাজই বোধহয় কোনও জহুরীকে দিয়ে করানো হয়েছে, সোনার জলের পালিশটা তো নিশ্চয়ই।

মূর্তি বদল করা হয়েছে হয়তো চোদ্দ কিংবা তের তারিখে। আনন্দবাবুর স্ত্রী স্বীকার করেছেন পুজোর সময় তিনিও দরকারে দু'-একবার বাইরে যেতেন কিংবা গেছেন। কিন্তু আমি যদি বলি পুজো বা আরতির সময় মোটেই বিগ্রহ বদল হয়নি, হয়েছে অন্য কোনও সময়, যখন কেউ ও ঘরে যায় না! ঘুরেফিরে সেই একই প্রশ্ন আসছে, ঠাকুরঘরে যেতে বাধা নেই, এমন কেউ ওটা সরিয়েছেন। দু'-একদিন তিনি অপেক্ষা করেছেন। আর কারও চোখে এই পালটাপালটি ধরা পড়ে কিনা এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। আসলে বিগ্রহ যে নকল, তা চট করে ধরা পড়ুক এটা তিনি চাননি।

সঙ্কর্ষণ চুপ করল, ঘরের মধ্যে অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

অবিশ্যি আমার এই অনুমান ভুলও হতে পারে, সঙ্কর্ষণই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, অর্থাৎ বিগ্রহ বদল আগে না হয়ে পনের তারিখেও হতে পারে এবং তা সকালে পুজোর

সময়। সেক্ষেত্রে ভট্‌চাযমশাই সন্দেহমুক্ত নন। আবার দুপুরের দিকে সবাই যখন একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন, তখনও হতে পারে। অবিশ্যি বিগ্রহ কবে বা কখন বদল হয়েছে সেটা এখানে গৌণ ব্যাপার, তা কারও পক্ষ সমর্থন কিংবা বিপক্ষে কাজ করছে না। তা যদি হতো তবে সঠিক দিন-ক্ষণ মস্ত একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াতো। একমাত্র পুজো বা আরতির সময় ছাড়া অন্য কোনও সময় বিগ্রহ বদল হয়ে থাকলে ভট্‌চাযমশাই নির্দোষ।

সবার মুখের ওপর আবার চোখ বুলিয়ে সঙ্কর্ষণ বলল, আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা কেউ সন্দেহের বাইরে নন। আরও একটা কথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সোনার বিগ্রহ এখনও বাড়িতেই আছে, ওটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত বাড়িতে তল্লাশি চালালে ওটা পাওয়া যাবে।

একজনের দু'চোখের পাতা যে ঘন ঘন নড়ে উঠল সেটা সঙ্কর্ষণের দৃষ্টি এড়ালো না, শেষের কথাটা তাঁকে উদ্দেশ করেই ওর বলা। মনে মনে ও হাসল, ওর অনুমান মিথ্যে নয়।

আপনারা এবার যে যার ঘরে যান, আমি বাড়ির কর্তার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।

আস্তে আস্তে সবাই বেরিয়ে গেল। সবার চোখে-মুখেই বিদ্বেষের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। শুধু ভট্‌চাযমশাই ব্যতিক্রম, তাঁর মুখ ভাবলেশহীন।

ঘরে এখন অরিন্দম শীল, মিঃ তরফদার আর সঙ্কর্ষণ।

ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারছেন মিঃ শীল! সঙ্কর্ষণ বলল, বিগ্রহ বদল বাইরের কারও দ্বারা হয়নি। আমি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছিলাম কেউ সন্দেহমুক্ত নন। এমনকি আপনার স্ত্রীও নন।

কি বলছেন আপনি! অরিন্দম শীল রাগত কণ্ঠে বললেন।

অনুসন্ধানে নেমে আমাকে অনেক খোঁজখবর করতে হয়েছে মিঃ শীল, সঙ্কর্ষণ বলল, অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে, অনেকের সঙ্গে কথাও বলেছি। আপনার স্ত্রীর ছোট ভাই একজন শিল্পী, নানারকম ধাতুর মূর্তি গড়েন, বাজারে তাঁর যথেষ্ট চাহিদা, ঠিক কিনা?

মিঃ শীল কোনও জবাব দিলেন না।

।। চার ।।

মিঃ তরফদার যখন আমার কাছে এই বিগ্রহের ব্যাপারে তদন্তের প্রস্তাব নিয়ে আসেন তখন তাঁর মুখে মোটামুটি ঘটনা শুনে প্রথমে একটাই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল,—সঙ্কর্ষণ অরিন্দম শীলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, যে বিগ্রহ এই বাড়িতে তিন পুরুষ ধরে আছে, কখনও চুরির চেষ্টা হয়নি, হঠাৎ সেটা বীমা করার দরকার পড়ল কেন? পাঁচ লাখ টাকা বীমার প্রিমিয়াম কম নয়, বছরে অনেক টাকা। তাছাড়া আপনার আর্থিক অবস্থাও আগের মতো নেই। তারপর ঠিক এক বছরের মাথায় বিগ্রহ খোয়া গেল আর আপনি টাকাটা দাবি করে বসলেন, এটা কি কাকতালীয় ঘটনা! আপনাকেই আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল।

আমাকে! অরিন্দম শীল যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

ভেবে দেখুন, সঙ্কর্ষণ মৃদু হেসে বলল, ঠাকুরঘরে আপনার অবাধ গতি, বিগ্রহ অদল-বদল করা আপনার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

এসব আপনি কি বলছেন! অরিন্দম শীলের গলা চড়ল।

আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি আপনি যে সব কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত তাদের কোনওটারই অবস্থা ভাল নয়। এদিকে আপনার খরচের বহর কম নয়। আগে আপনাদের রেসের ঘোড়া ছিল, এখন সে সব পাট চুকলেও মাঠের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ঘোচেনি।

আপনি সীমা লঙ্ঘন করছেন, মিঃ সমাদ্দার, অরিন্দম শীলের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

সে কথায় কর্ণপাত না করে সঙ্কর্ষণ বলে চলল, আমার মনে হলো যেন পাঁচ লাখ টাকা আদায়ের মতলবেই বিগ্রহ বীমা করা হয়েছে। কষ্ট করে তিনটে কোয়ার্টারের প্রিমিয়াম দিয়ে ওটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বীমা কোম্পানির কাছ থেকে টাকাও আদায় করা হবে, আবার সোনার বিগ্রহ ঘরেই থাকবে এই ছিল পরিকল্পনা।

শাট আপ, অরিন্দম শীল গর্জন করে উঠলেন।

চিৎকার করে লাভ হবে না মিঃ শীল, সঙ্কর্ষণ শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনাকে সবার সামনে অপদস্থ করতে চাইনি বলেই আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলছি। আমার মনে ওই সন্দেহ জেগেছিল বলে আমি গোটা উত্তর আর মধ্য কলকাতার সমস্ত সোনার দোকান চষে বেড়িয়েছি। আমি একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি সোনার জলে পালিশ করতে চাই, এ ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা আছে কিনা, হালে এমন কাজ তারা করেছে কিনা, কত খরচ পড়বে, এই ছিল আমার প্রশ্ন। একটা দোকানে জানতে পারি এ মাসের গোড়ার দিকে একটা রাধাগোবিন্দর মূর্তি তারা সোনার জলে পালিশ করেছে। যিনি কাজটা দিয়েছিলেন তাঁর চেহারার বর্ণনাও তাদের কাছ থেকে পেয়েছি। আপনার ডান চিবুকের কাছে কাটা দাগটা পর্যন্ত তারা বলতে ভোলেনি। এর পরেও কি আপনি অস্বীকার করবেন, মিঃ শীল? বলেন তো সেই কারিগরকে এখানে নিয়ে আসব।

অরিন্দম শীলের মুখ ব্লটিং পেপারের মতো সাদা, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

আপনাদের বনেদী বংশ, সঙ্কর্ষণ বলল, এ কথা জানাজানি হলে খবরের কাগজগুলো লুফে নেবে, টি-টি পড়ে যাবে, পুলিশও আপনাকে ছেড়ে কথা কইবে না। তার চেয়ে বরং আমি একটা প্রস্তাব দিই, আমার মনে হয় সব দিক রক্ষা করার সেটাই একমাত্র পথ।

অরিন্দম শীল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে মায়াই হলো সঙ্কর্ষণের।

আপনি বীমা কোম্পানীর কাছে করা ক্লেমটা উইথড্র করে নিন, ওদের জানিয়ে দিন বিগ্রহ পাওয়া গেছে। মিঃ তরফদারকেও আমি অনুরোধ করব তাঁর কোম্পানির বড়কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ নিয়ে আর যাতে শোরগোল না হয় তা তিনি দেখবেন। কি বলেন মিঃ তরফদার, আপনি রাজি?

তরফদার সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, এখানে আপনিই বস, আপনার আদেশ শিরোধার্য।

আপনার অমত নেই তো? অরিন্দম শীলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল

সঙ্কর্ষণ।

তিনি নীরবে দু'পাশে ঘাড় নাড়লেন।

আরও একটা অনুরোধ আছে আমার, সঙ্কর্ষণ বলল, ঠিক একটা নয়, দুটো। আপনি যদি এখনও লাগাম টানেন, আমার মনে হয় অবস্থা সামাল দিতে পারবেন। তাই অনুরোধ করব বদখেয়ালগুলো ছেড়ে দিন, আখেরে আপনারই মঙ্গল হবে। এই বিরাট বাড়ি আজকাল মস্ত বোঝা। আপনি যদি মেকী আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কিছু অংশ ব্যাঙ্ক কিংবা নামী কোম্পানিদের ভাড়া দেন, মোটা টাকাই হাতে পাবেন।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ, ভট্চাযমশাই মিথ্যে চোরের অপবাদে হয়রানি হয়েছেন, তাঁর মাসোহারা বাড়িয়ে অন্তত পাঁচশো টাকা করে দিন। আজকালকার মাগ্যিগণ্ডার দিনে অতগুলো মুখের অন্ন যোগান দিতে ওই টাকাটাও যথেষ্ট নয়। ভদ্রলোক সৎ এবং বড় ভাল মানুষ।

সঙ্কর্ষণের আপিসে বসে কথা হচ্ছিল। দশ হাজার টাকার চেকটা বাড়িয়ে ধরে তরফদার খুশি মুখে বললেন, আপনি কোম্পানির অনেক টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছেন, ম্যানেজমেন্ট আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনার অনুরোধ তাঁরা মেনে নিয়েছেন, ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে।

বলুন। সঙ্কর্ষণ সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল।

আপনি কি সত্যিই মিঃ শীলকে গোড়া থেকে সন্দেহ করেছিলেন?

নিশ্চয়ই, সঙ্কর্ষণ জবাব দিল, হঠাৎ তাঁর বিগ্রহ বীমা করার দরকার পড়ল কেন? বীমা করার এক বছরের মধ্যেই ওটা খোয়া গেল আর মিঃ শীল পাঁচ লাখ টাকা ক্লেম করে বসলেন, এটা আমার কাছে খুবই সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। যেন ছকে বাঁধা পরিকল্পনা। কিন্তু অনুমান দিয়ে তো আর কেসের কিনারা হয় না, তার জন্য চাই প্রমাণ, সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কেন? প্রমাণ তো আপনি যোগাড় করেই ছিলেন! তরফদার বললেন।

সে তো আমি বলেছি, সঙ্কর্ষণ হাসল।

মানে! তরফদার অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন।

আরে উত্তর আর মধ্য কলকাতা মিলে সোনার দোকান কি কম নাকি, অত দোকানে ঢুঁ মারা কি সহজ কথা?

আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, তরফদার যেন বোকা বনে গেছেন।

নকল মূর্তিটা যে সোনার জলে পালিশ করা সে কথা আপনার মুখেই শুনেছিলাম। ও কাজ নিখুঁতভাবে সোনার দোকানেই করা হয়, তাই আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলাম। উনি ভাবলেন সত্যিই আমি সেই দোকানের খোঁজ পেয়েছি, সেই সঙ্গে ডান চিবুকের কাছে কাটা দাগটা উল্লেখ করায় উনি ভাবলেন ধরা পড়ে গেছেন।

মাই গড, তরফদার বললেন, আপনি তো সাঙ্ঘাতিক মানুষ। ধাপ্পা দিয়ে কাজ হাসিল করে ফেললেন!

আর কি উপায় ছিল, সঙ্কর্ষণ বলল, উনি কি নিজে থেকে নিজের অপকর্মের কথা স্বীকার করতেন?

কিন্তু ওঁকে যদি গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলেন, তবে সেদিন ওই মিটিংয়ের কি দরকার ছিল? সবাই যে ও-কাজ করে থাকতে পারেন অমন বিশ্লেষণেরই বা কি দরকার ছিল?

ছিল,—সঙ্কর্ষণ বলল, ওটা হলো মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। মিঃ শীলের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করার জন্যই ওই বৈঠকের দরকার ছিল। শুধু ভট্চাযমশাই নন, বাড়ির অন্যদের ওপরেও সন্দেহ সৃষ্টি করে ওঁকে বেসামাল করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। স্বাভাবিকভাবেই নিজের পরিবারের লোকদের ওপর তাঁর দুর্বলতা থাকবে, তাঁদের অনিষ্ট নিশ্চয়ই তিনি কামনা করবেন না। ফলে তাঁর মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। আপনি লক্ষ্য করেননি, আমার বক্তৃতার মাঝে মাঝেই ওঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল শঙ্কার ছাপ। তারপরই সোজাসুজি ওঁর দিকে বাণ ছুঁড়লাম, ব্যস, কুপোকাৎ।

আপনাকে তবে মনস্তত্ত্ব নিয়েও পড়াশোনা করতে হয়েছে? তরফদার পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললেন।

নিশ্চয়ই, সঙ্কর্ষণ জবাব দিল, ভাল গোয়েন্দা হতে হলে, একজন ভাল মনস্তত্ত্ববিদও হওয়া দরকার।

যন্ত্র

হুমায়ূন আহমেদ

[গল্পটি এই শতকের নয়। আগামী শতকের শেষের দিকের। এই জাতীয় রচনার একটি বিশেষ নাম হচ্ছে—বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনী। সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকে মোটেই গুরুত্ব দেন না। কেন যে দেন না তা সাহিত্যের ছাত্র নই বলেই হয়তো বুঝি না। আমি নিজে এই জাতীয় রচনা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ি। লেখার সময়ও আগ্রহ নিয়ে লিখি পাঠকের এই তথ্যটি খুব বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে গল্প শুরু করছি।]

তিনি নরম গলায় বললেন, 'ভাই এর কোন সাইড এফেক্ট নেই তো?'

সেলসম্যান জবাব দিলো না, বিরক্ত চোখে তাকালো। তিনি আবার বললেন, 'ভাই যন্ত্রটার কোন সাইড এফেক্ট নেই তো?' সেলসম্যানের বিরক্তি চোখ থেকে সারামুখে ছড়িয়ে পড়লো। ভ্রূ কুঁচকে গেলো, নিচের ঠোঁট টান টান হয়ে গেলো। সে শুকনো গলায় বললো, 'সাইড এফেক্ট বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন'?

'মানে নেশা ধরে যায় কি-না। শুনেছি একবার ব্যবহার শুরু করলে নেশা ধরে যায়। রাত দিন যন্ত্র লাগিয়ে বসে থাকে—।'

'আপনার যদি সন্দেহ থাকে তাহলে কিনবেন না। আপনাকে কিনতেই হবে এমনতো কোনো কথা নেই।'

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এতোগুলি টাকা দিয়ে যন্ত্রটা কিনবেন অথচ লোকটা তার প্রশ্নের জবাব পর্যন্ত দিতে চাচ্ছে না। এমনভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে যেন তিনি—

'আপনি কি যন্ত্রটা কিনবেন? না দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

তিনি পকেট থেকে চেক বই বের করলেন। খস খস করে টাকার অংক বসালেন। হাতের লেখাটা ভালো হলো না। কারণ এতো বড় অংকের চেক তিনি এর আগে কাটেননি। মাত্র আটশ' গ্রাম ওজনের কালো চৌকোণো একটা বাক্স অথচ কি অসম্ভব দাম। টাকার অংক লিখতে গিয়ে হাত কেঁপে যাচ্ছে।

সেলসম্যান বললো, 'আপনার কোনো ক্রেডিট কার্ড নেই?'

'জ্বি না।'

'আপনাকে তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমরা আপনার ব্যাংক একাউন্ট চেক করবো। কম্প্যুটারটা ট্রাবল দিচ্ছে—একটু সময় লাগবে। আপনি ইচ্ছা করলে পাশের রুমে বসতে পারেন।'

'আমি বরং এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। অবিশ্যি আপনার যদি কোনো অসুবিধা না হয়।'

সেলসম্যান জবাব দিলো না। তার কাছে মনে হলো সেলসম্যানের মুখের বিরক্ত ভাব একটু যেন কমেছে। কমাই উচিত—তিনি তো শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটা কিনেছেন। তার পঞ্চাশ বছরের জীবনের সঞ্চিত অর্থের সবটাই চলে গেছে। এর পরেও কি লোকটা তার সঙ্গে সহজভাবে দু'একটা কথা বলবে না? তিনি বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত আবার বললেন, 'ভাই এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই তো'?

এবার জবাব পাওয়া গেলো। সেলসম্যান রোবটদের মতো ধাতব গলায় বললো, 'না নেই।'

'নেশা হয় না?'

'না- হয় না তবে আপনি ইচ্ছা করে যদি নেশা ধরান তাহলে তো করার কিছু নেই। যন্ত্রটির সঙ্গে ইনস্ট্রাকশান ম্যানুয়েল আছে। ম্যানুয়েল মেনে যদি ব্যবহার করেন তাহলে কোন অসুবিধা হবে না। প্রতিদিন এক ঘণ্টার বেশি ব্যবহার করবেন না সপ্তাহে অন্তত একদিন যন্ত্রটায় হাত দেবেন না।

তিনি এবার আনন্দের একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। লোকটি শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলেছে। এবং বেশ সহজ ভঙ্গিতেই কথা বলেছে। তিনি হাসি মুখে বললেন, 'যন্ত্রটা নিয়ে নানান কথাবার্তা হয় তো, তাই—'

'আমাদের স্বভাবই হচ্ছে নতুন আবিষ্কার নিয়ে কথা বলা। পি থার্টি টু হচ্ছে এই শতাব্দীর সবচে' বড় আবিষ্কার এই বিষয়ে কি আপনার কোনো সন্দেহ আছে?'

'জ্বি না।'

'তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'ভয় পাচ্ছি নাতো।'

'পাশের ঘরে গিয়ে বসুন আরো আধ ঘণ্টার মতো লাগবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'একটা জিনিস শুধু মনে রাখবেন এই শতাব্দীর সবচে' বড় আবিষ্কার পি থার্টি টু। বিংশ শতাব্দীর সবচে' বড় আবিষ্কার যেমন টেলিভিশন। আপনি কি আমার সঙ্গে একমত?'

'জ্বি একমত।'

তিনি মোটেই একমত না। বিংশ শতাব্দীতে টেলিভিশন ছাড়াও আরো অনেক বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে। এই শতাব্দীতেও দশটি বড় বড় আবিষ্কার হয়ে গেছে। এর মধ্যে সবচে' বড় আবিষ্কার হচ্ছে ডেথ হরমোন'। ডাক্তার পিটার স্লীম্যান প্রমাণ করেছেন একটা নির্দিষ্ট বয়সে পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড থেকে 'ডেথ হরমোন' শরীরে চলে আসে। শরীর তখন মৃত্যুর জন্যে নিজেকে তৈরি করে। শুরু হয় বার্ধক্য প্রক্রিয়া। যে হারে জীব কোষ মরে যায় সেই হারে তৈরি হয় না। জরা শরীরকে গ্রাস করে। ডাক্তার পিটার স্লীম্যান দেখালেন সালফার এবং অক্সিজেন ঘটিত একটি আপাতদৃষ্টিতে সহজ যৌগ অণু এই কাজটি করে। তিনি যৌগটি শরীর থেকে বের করে দেবার প্রক্রিয়াও বের করলেন। এই অসম্ভব ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া ব্যবহার করে পৃথিবীর কিছু ভাগ্যবান মানুষ তাদের শরীর থেকে 'ডেথ হরমোন' বের করে দিয়েছে। জরা আর তাদের স্পর্শ করতে পারছে না।

তিনি পাশের ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। এই ঘরে একটি কফি ডিসপেনসিং রোবট আছে। সে তাকে এক পেয়ালা কফি দিয়ে হাসি মুখে বলেছে—আশা করি এক পেয়ালা কফি আপনার হৃদয়ের শৈত্য দূর করে দেবে।

তিনি রোবটের কথার কোনো জবাব দিলেন না। এদের তৈরিই করা হয় বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলে মানুষকে চমৎকৃত করার জন্যে। এদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললেই মানুষ হিসেবে নিজেকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে হয়। তিনি সামনের গোল টেবিলের উপর রাখা চকচকে কিছু ম্যাগাজিন থেকে একটি তুলে নিলেন। পাতা উল্টিয়ে তাঁর মুখ বিকৃত হলো ভুল ম্যাগাজিন বেছে নিয়েছে—'জেনো-কোড নিউজ' জেনেটিক ইনজিনীয়ারিং বিষয়ে রগরগে সব খবরে ভর্তি। এই সব খবরের কোনোটির প্রতিই তার কোনো আগ্রহ নেই। প্রাণীর জিনের সঙ্গে উদ্ভিদের জিন লাগিয়ে কতো সব অদ্ভুত জিনিস তৈরি হচ্ছে তার রগরগে বর্ণনা পড়তে তাঁর ভাল লাগে না। টমেটো জিনের সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের জিন লাগিয়ে তারা নতুন প্রজাতির জিন তৈরি করেছে। মানুষের জিনের সঙ্গে গোলাপ গাছের জিন লাগানো হচ্ছে—সাফল্য দোরগোড়ায়। এর শেষ কোথায় কে জানে? মানুষ এবং উদ্ভিদের এক সংকর প্রজাতি তৈরি হবে? আগামী পৃথিবীতে কারা বাস করবে? মানবউদ্ভিদ?

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির মিলনে তৈরি হলো নতুন প্রজাতি। তারা মানুষ না আবার শিম্পাঞ্জিও না। গাধা ও ঘোড়ার সংকর যেমন খচ্চর এও তেমনি। তবে সেই পরীক্ষা হয়েছিলো গোপনে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশও করা হয়নি। নতুন প্রজাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন—নতুন প্রজাতি গ্রহণযোগ্য নয়। সেদিন এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞানীদের সাজা দেওয়া হয়েছিলো। আজ আর সেই দিন নেই। জেনেটিক ইনজিনীয়াররা আজকের পৃথিবীর

সবচে' সম্মানিত মানুষ। তাঁদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষার সব রকম সুযোগ এবং অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ এই পৃথিবীকে তাঁরা ক্ষুধামুক্ত করেছেন। জেনেটিক ইনজিনীয়ারদের কারণে আজকের পৃথিবীতে কোনো খাদ্যাভাব নেই। সমুদ্রের শৈবালকে তাঁরা সুস্বাদু স্টার্চে রূপান্তরিত করেছেন। উদ্ভিদের সঙ্গে জীবের সংযোগে তৈরি করেছেন সুস্বাদু প্রোটিন সর্বস্ব উদ্ভিদ। জেনেটিক ইনজিনীয়াররা আজকের পৃথিবীর দেবতা।

'আপনার চেক ওকে হয়েছে। আপনি যন্ত্রটি নিতে পারেন।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আশা করি এই যন্ত্রের কল্যাণে আপনার সময় আনন্দময় হবে।'

'শুভ কামনার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

তিনি কালো বাক্সটি বুকের কাছে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। রাত বেশি হয়নি তবু পথঘাট নির্জন। টাউন সার্ভিসের হলুদ বাসগুলি প্রায় ফাঁকা যাচ্ছে—তার যে কোনো একটিতে উঠে গেলেই হয়। উঠতে ইচ্ছে করছে না হাঁটতে ভালো লাগছে না। আবহাওয়া চমৎকার তবে একটু শীত ভাব আছে।

বেশ কিছু সময় হাঁটার পর তিনি একটা ফাঁকা বাসে উঠে পড়লেন। বাসের ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'আপনার নৈশ ভ্রমণ আনন্দময় হোক।' তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। রোবট ড্রাইভার। পৃথিবী রোবটে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এইসব রোবট চমৎকার কথা বলে। এদের প্রোগ্রামিং অসাধারণ।

রোবট ড্রাইভার বললো, 'আপনি কতো দূর যাবেন?'

তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'কাছেই'।

'আপনি মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী নন।'

'না।'

'কেন বলুনতো?'

তিনি চুপ করে রইলেন। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। এই সব রোবটদের সঙ্গে কথা বলা মানে হচ্ছে নিজেকে ছোট করা। রোবট গাড়ির গতি বাড়াতে বাড়াতে বললো, 'আমি রোবট বলেই কি আপনি কথা বলতে চাচ্ছেন না?'

'জানি না।'

'আমি লক্ষ্য করেছি বেশিরভাগ মানুষ রোবটদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। সারাক্ষণ বিষণ্ন হয়ে থাকে যেনো তার সমস্যার কোন অন্ত নেই। আমি কি ঠিক বলছি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনারা কি নিয়ে এতো চিন্তা করেন?'

তিনি জবাব দিলেন না। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। গাড়ি রেসিডেনসিয়েল এলাকায় ঢুকেছে। রাস্তার দু'পাশে আকাশ ছোঁয়া বাড়ি। কতো লক্ষ মানুষই না এইসব বাড়িতে বাস করে তবু কেন জানি বাড়িগুলিকে প্রাণহীন মনে হয়।

রোবট ড্রাইভার গাড়ির বেগ অনেকখানি কমিয়ে এনেছে। রেসিডেনসিয়েল এলাকায় গাড়ির গতি অনেক কম রাখতে হয়, ফাঁকা রাস্তায় ইচ্ছা করলেই ঝড়ের গতিতে

pathagar.net

চালানো যায়। রোবট ড্রাইভার কখনো তা করবে না। লালবাতিতে গাড়ি থামালো, রোবট বললো, 'এই শতকে আপনারা মানুষেরা এতো অসুখী হয়ে গেলেন কিভাবে?

'জানি না।'

'আপনাদের তো অসুখী হবার কোনো কারণ নেই। মানুষ ক্ষুধা জয় করেছে, রোগ ব্যাধি জয় করেছে। অমরত্ব তার হাতের মুঠোয় তবু এতো দুঃখ কেন?'

তিনি বললেন, 'সামনের ব্লকে আমি নামবো।'

'অবশ্যই। আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনারা মানুষেরা এই শতকে সবই পেয়েছেন। হাইড্রোজেন ফুয়েল আসায় শক্তির সমস্যা মিটেছে। আপনার নিশ্চয়ই নিজস্ব একটি এ্যাপার্টমেন্ট আছে। আছে না?'

'হুঁ'।

'আপনি নিশ্চয়ই একা থাকেন না? আপনার স্ত্রী আছে।'

'হুঁ'।

'তারপরেও পি থার্টি টু কিনে এনেছেন। অনেক টাকা গেলো তাই না।'

'হুঁ'।

'আপনি কি হুঁ ছাড়া আর কিছুই বলবেন না?'

'আমি এইখানে নামবো।'

স্টপেজের মাঝখানে গাড়ি থামানোর নিয়ম নেই। রোবট ড্রাইভার নিয়ম ভঙ্গ করে গাড়ি থামালো। জানালা দিয়ে মুখ বের করে উঁচু গলায় বললো, 'আপনার পি থার্টি টু আনন্দময় হোক।'

তিনি রোবটদের মতো গলায় বললেন—'ধন্যবাদ।'

তার স্ত্রী হাসপাতালে কাজ করেন। আজ তাঁর নাইট ডিউটি, কাজেই তিনি এ্যাপার্টমেন্টে নেই। টেলিফোনের কাছে ছোট্ট চিরকুট লিখে রেখে গেছেন—খাবার তৈরি করা আছে। খেয়ে নিও।

তিনি খেয়ে নিলেন। অত্যন্ত স্বাদু খাবার, খাবারের সঙ্গে চমৎকার পানীয়। এই পানীয়টি এই শতকের মাঝামাঝি তৈরি করা হয়েছে—ঝাঁঝালো টক ধরনের স্বাদ। কিছুক্ষণের জন্যে ইন্দ্রিয় ভোঁতা করে দেয়—বড় ভালো লাগে। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তিনি ঘরের চারদিক তাকালেন—আনন্দের কতো উপকরণ চারদিকে ছড়ানো—ত্রিমাত্রিক ছবি দেখার জন্যে একটি হলোরামা, যা চালু করা মাত্র অনুষ্ঠানের পাত্রপাত্রিরা মনে হবে স্বশরীরে ঘরের ঠিক মাঝখানে চলে এসেছে। যেন হাত বাড়ালেই তাদের ছোঁয়া যাবে।

মস্তিষ্কের আনন্দ কেন্দ্র উত্তেজিত করবার জন্যে আছে নানান ব্যবস্থা। সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণের আনন্দ থেকে শুরু করে নারীসঙ্গের আনন্দের মতো তীব্র আনন্দ মস্তিষ্ক উত্তেজিত করেই পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা, মানুষ কেন আনন্দ পায়, কোত্থেকে আনন্দ পায় তা জেনেছেন। তাঁরা জানেন বাগানের একটি ফুল দেখার আনন্দের সঙ্গে পিট চুলকানোর আনন্দের বেশ কিছু মিল আছে আবার অমিলও আছে। ফুল না দেখে, এবং পিঠ না চুলকিয়েও অবিকল সেই আনন্দ মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ উত্তেজিত করে পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে সেই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মানুষ তা থেকে আর আনন্দ পাচ্ছে

না। মানুষ ঝুঁকছে 'পি থার্টি টু'র দিকে। কে জানে এক সময় হয়তো এই যন্ত্রটিও তাঁর ভালো লাগবে না।

তিনি, তাঁর স্ত্রীকে 'পি থার্টি টু' কেনার খবর দেবার জন্যে ফোন করলেন। রোবটদের মতো ভাবলেশহীন গলায় বললেন, 'আমি আজ একটি 'পি থার্টি টু' কিনেছি।'

'সে কি সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'বিরাট ভুল করেছো।'

'কেন?'

'আমাদের মতো দম্পতিদের সরকার থেকে একটি করে এই যন্ত্র দেয়া হবে বলে কথা হচ্ছে। তুমি কি জানতে না?'

'জানতাম।'

'তাহলে?'

'কবে না কবে দেয়—আগেভাগেই কিনে ফেললাম। তুমি কি রাগ করেছো?'

'না যন্ত্রটা কি ব্যবহার করেছো?'

'এখনো করিনি। এখন করবো।'

'আচ্ছা। তোমার যন্ত্র, তোমার জীবনকে আনন্দময় করে তুলুক। আমাদের মতো দম্পতিদের যন্ত্রের আনন্দের প্রয়োজন আছে।'

'তোমাকে ধন্যবাদ।'

তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন। কাগজের মোড়ক খুলে কালো বাক্সটি বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে মনে মনে বললেন, 'আমাদের মতো দম্পতি' এই বাক্যটি আমার ভালো লাগে না।

ভালো না লাগলেও তাঁর স্ত্রী এই বাক্যটি তাঁকে দিনের মধ্যে কয়েকবার বলেন হয়তো এই নিয়ে তাঁর মনে গোপন ক্ষোভ আছে। ক্ষোভ থাকার কোনোই কারণ নেই। তাদের মতো দম্পতি পৃথিবীতে অসংখ্য আছে যারা সন্তান জন্ম দেবার অধিকার পাননি। মানব জাতির স্বার্থেই তা করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমিয়ে আনার একটি শর্তই হচ্ছে একদল সন্তানহীন দম্পতি।

মানুষ মৃত্যুকে যদি সত্যি সত্যি জয় করে ফেলে তাহলে জনসংখ্যা আরো কমাতে হবে। তাদের মতো দম্পতির সংখ্যা আরো বাড়বে।

তিনি যন্ত্র হাতে নিয়ে সোফায় এসে বসলেন। ইনস্ট্রাকশান ম্যানুয়েল মন দিয়ে পড়লেন। যন্ত্রটি ব্যবহার করা খুব সহজ— যন্ত্র থেকে বের হওয়া ঋণাত্মক ইলেকট্রোড ঘাড়ের ঠিক মাঝামাঝি লাগাতে হয়। ধনাত্মক ইলেকট্রোড থাকবে বাঁ কপালে। স্ট্যাণ্ড বাই বোতাম টিপে কারেন্ট ফ্লো এ্যাডজাস্ট করতে হবে যাতে এক মাইক্রো এ্যাম্পায়ারেরও কম বিদ্যুৎ প্রবাহ স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে প্রবাহিত হয়। কারেন্ট এ্যাডজাস্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীল আলো জ্বলে উঠবে তখন চোখ বন্ধ করে স্টার্ট বাটন টিপতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছুই হবে না। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হবে।

পি থার্টি টু যন্ত্রটি বেশ কিছু শ্বাপদ জন্তুর মস্তিষ্কের স্মৃতি ধরে রেখেছে। এই স্মৃতি

pathagar.net

বায়োকারেন্টের মাধ্যমে মাথায় সঞ্চারিত করা হয়।

তিনি যন্ত্র চালু করে বসে আছেন। মাথায় ভোঁতা ধরনের যন্ত্রণা হচ্ছে—অল্প অল্প পিপাসাও বোধ হচ্ছে। হঠাৎ সেই পিপাসা হাজারো গুণে বেড়ে গেলো। তিনি এখন সব কিছুর ঘ্রাণ পাচ্ছেন। মাটির ঘ্রাণ, ফুলের ঘ্রাণ, যে গাছে ফুল ফুটে আছে সেই গাছের ঘ্রাণ, গাছের শেকড়ের ঘ্রাণ। তাঁর জগতটি ঘ্রাণময় হয়ে গেছে এবং তিনি বুঝতে পারছেন তিনি শহরের সাতানব্বই তলার সাজানো গোছানো কোনো এ্যাপার্টমেন্টে বাস করেন না। তিনি বাস করেন বনে। গহীন বনে। তিনি কি—

বোঝা যাচ্ছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তিনি একটি চিতাবাঘ। বাঘ নয়, বাঘিনী। তাঁর তিনটি শিশু-শাবক আছে। গত দু'দিন এদের আগলে রেখেছেন। আজ প্রবল তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে এদের ছেড়ে পানির সন্ধানে বের হচ্ছেন। পানি কোথায় আছে তিনি জানেন--পানিরও গন্ধ আছে, সেই গন্ধ, মাটির গন্ধের মতোই তীব্র। পানি আছে, কাছেই আছে। এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি পানির কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারেন কিন্তু যেতে পারছেন না। কাছেই কোথায় যেন পুরুষ বাঘটা ঘুর ঘুর করছে। এর মতলব ভালো না। বাচ্চাটাকে এ হয়তো মেরে ফেলবে। এদের একা রেখে কোথাও যাওয়া যাবে না। অথচ তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

আকাশে বিরাট চাঁদ। তার আলোয় বনভূমি ঝলমল করছে। কন কন করে বইছে শীতের বাতাস। বাতাসে কি অদ্ভুত শব্দেই না গাছের পাতা নড়ছে। যে সব পাতা নড়ছে তার থেকে এক ধরনের গন্ধ আসছে আবার স্থির পাতা থেকে অন্য ধরনের গন্ধ। কি বিচিত্র ; কি বিচিত্র চারপাশের জগৎ। কোন্ স্তরেই না পৌঁছে গেছে অনুভূতির তীব্রতা।

তাঁর শরীর থর থর করে কাঁপছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে—অথচ কি আনন্দই না তিনি রক্তের ভেতর অনুভব করছেন। তিনি জলের সন্ধানে এগুচ্ছেন অথচ তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁর শাবকদের দিকে।

তারো অনেক পরের কথা।

ডেথ হরমোন রক্তের ভেতরই ভেঙে ফেলার অতি সহজ পদ্ধতি বের হয়েছে। মানুষ জরা রোধ করেছে। মানুষকে এখন অমর বলা যেতে পারে। বার্ধক্যজনিত কারণে তার আর মৃত্যু হবে না। জীবাণু এবং ভাইরাস ঘটিত কোন অসুখও পৃথিবীতে নেই। মানুষকে এখন কি তাহলে অমর বলা যাবে? হয়তোবা।

অমর মানুষেরা এখন দিনরাত ঘরেই বসে থাকে। তাদের কাজ করার প্রয়োজন নেই। কাজের জন্যে আছে রোবট শ্রেণী। চিন্তা-ভাবনারও কিছু নেই। অমরত্বের বেশি আর কিছুতো মানুষের চাইবারও নেই। এখনকার মানুষ দিনের পর দিন একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসে থাকে। পি থার্টি টু যন্ত্র লাগিয়ে পশুদের জীবনের অংশ বিশেষ যাপন করতে তাদের বড় ভালো লাগে। এই তাদের একমাত্র আনন্দ।

চিতা-রহস্য

pathagar.net

ইমদাদুল হক্ মিলন

আমাদের তিনজনেরই ঘুম ভাঙে খুব সকাল সকাল। তখন ছ'টার বেশি হবে না। এ বাড়ির লোকজনের ঘুম অবশ্য আরো আগে ভাঙে। নানী তো সেই ভোর রাতেই উঠে বসে থাকে। ঝি-চাকররা কাজ শুরু করে দেয় রাত থাকতে। ঘুম ভাঙতেই আমি শুনতে পাই ঢেঁকি ঘরে ধান ভানার শব্দ। শব্দটা বড় ভাল লাগে।

আমাকে এত সকালে উঠতে দেখে নানী তো অবাক। হেসে বলল, দাদু যে আজ খুব সকাল সকাল উঠেছো।

আমি বলতে চাই, নানী, আমরা আজ বিলের বাড়ি যাবো। কথাটা প্রায় ঠোঁটে এসে গিয়েছিল। কায়দা করে চেপে যাই। নানীকে বললে আর রক্ষে নেই। যাওয়াই বন্ধ। জন্তুটা যদি আমাকে কামড়ে বসে!

একথাটা ভেবে আমারও একটু ভয় হয়। কাল তো হুজুগে হুজুগে বললাম। সত্যি যদি ওটা বাঘ হয়! আমি আর বারেক তো খুব ছোট। ডালুদাই যা একটা বড় মানুষ। আমাদের কাউকে যদি জন্তুটা আক্রমণ করে বসে! ইস্, একটা রিভলবার কিংবা বন্দুক

যদি থাকতো।

কিন্তু এখন আর কথা ফেরানো যায় না। ডালুদা তাহলে আমাকে খুব ভীতু ভাববে। যা হয় হবে! যাবোই! ভয় পেলে কি আর গোয়েন্দা হওয়া যায়!...

নাস্তা-টাস্তা খেয়ে বেরুতে আটটা বেজে যায়। গ্রামদেশে আটটা বাজলে অনেক বেলা মনে হয়। চারদিক খোলা বলে রোদের তেজও বেশি। মনে হয় দশটা-এগারোটা বেজে গেছে।

নানী বলল, তোরা যাচ্ছিস কোথায়?

আমি কিছু বলার আগেই ডালুদা চালাকি করে বলল, বাজারের দিকটা ঘুরে আসি। খোকন তো কখনো পদ্মা নদী দেখেনি। মাওয়ার বাজারে গেলেই তো নদী দেখা যাবে।

নানী বলল, সাবধানে যাস। তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস।

আমরা সবাই একত্রে মাথা নাড়ি, আচ্ছা।

পথে বেরুতেই ডালুদা কোমরের কাছ থেকে গরু জবাই করার একটা ছুরি বের করলো। দেখে তো আমি থ। এত বড় ছুরি কোমরে গুঁজে আনলে কেমন করে?

শুনে ডালুদা হাসে। অনেক কায়দা করে আনতে হয়েছে। নানী দেখলে বুঝে যেতো আমরা বদ মতলবে যাচ্ছি কোথাও।

কিন্তু তুমি ছুরিটা পেলে কোথায়?

নানীর আলমারিতে ছিল। কাল রাতেই সরিয়ে রেখেছিলাম।

তারপর একটু হেসে বলে, খালি হাতে ওরকম জঙ্গল বাড়িতে কি যাওয়া যায়!

এতক্ষণে আমি বেশ একটা সাহস পাই। যাক। জিমি আছে, ডালুদার হাতে ছুরি আছে, ভয় কি!

বারেক আর জিমি হাঁটছিল আমাদের পিছু পিছু। রোদ খুব চড়া বলে সবাই একটু-আধটু ঘামছিলাম। আমি পকেট থেকে ছোট্ট রুমাল বের করে মুখ-টুখ মুছে নিই। সেই ফাঁকে অন্য পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিই আমার পেন্সিল টর্চ আর ছোট্ট ছুরিটা ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ ঠিকঠাকই আছে সব। আমি খুশিতে একটা শ্বাস ফেলি।

ধানী বিলের মাঝ দিয়ে সরু আলপথ সোজা চলে গেছে বাড়িটার দিকে। পথটা এত সরু যে পাশাপাশি দু'জন হাঁটা যায় না। প্রথম ডালুদা, তারপর আমি। আমার পিছে জিমি তারপর বারেক।

বিলে অনেক লোকজন কাজ করছিল। সবাই চাষী। আমাদের দেখে ক্ষেতের কাজ ফেলে অবাক হয়ে তাকায়। তাকাবে না কেন? আমাদের সাজগোজ দেখেই বুঝা যায় আমরা শহুরে। ডালুদা ফুলপ্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরা। আমি আর বারেক হাফ প্যান্ট। আমার গায়ে শার্ট নেই। হাফহাতা নাইনলের গেঞ্জির মধ্যে মুহম্মদ আলীর মুখ। তার ওপর সঙ্গে একটা সাহেবী কুত্তা।

লোকজনকে ওভাবে তাকাতে দেখে জিমি একটু বিরক্ত হয়। একটা লোক ছিল খুব কাছাকাছি। জিমি তার উদ্দেশ্যে পেল্লায় এক ঘেউ দিয়ে বসে। লোকটা পড়িমরি করে দৌড়। তাই দেখে আমরা তিনজন হেসে বাঁচিনে।

বিলের বাড়ির কাছাকাছি আসতে দেখি দূর থেকে যে গাছটা আমরা দেখতে

পেয়েছিলাম সেটা একটা দেবদারু গাছ। বিরাট উঁচু। বিশেষ ঝাপড়ানো নয়। পাতাগুলো গাঢ় সবুজ বলে দূর থেকে কালো দেখায়।

আমরা যে সরু রাস্তাটা দিয়ে আসছিলাম সেটা আসলে বিলের বাড়ির রাস্তাই। কাছাকাছি এসে বুঝতে পারি রাস্তাটা বেঁকেচুরে বিলের বাড়ির ভেতর ঢুকে গেছে।

আমরা তিনজন আস্তে-ধীরে বাড়ির ভেতর ঢুকি। ঢোকার আগে আমি ফেলুদার মতো সাবধানী চোখে চারদিকটা দেখে নিই। বিরাট বড় বাড়ি। দেবদারু গাছটা ঠিক মাঝামাঝি। একপাশে ঘন বাঁশঝাড়। তারপর ভাঙা দরদালান। আর চারদিকে ছোটবড় অসংখ্য ঝোপঝাড়। একটা ঝোপে সাদা সাদা কি ফুল, আমি চিনি না, ফুটে আছে। দেখে বারেক কতোগুলি ছিঁড়ে নিয়ে প্যান্টের পকেটে ভরে।

ডালুদা হাঁটছিল সবার আগে আগে। হাতের লম্বা ছুরিটা দিয়ে ঝোপঝাড়ে মৃদু শব্দ করছিল। সেই শব্দে একটা ঝোপ থেকে দুটো টুনটুনি পাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়। দেখে আমি বলি, তুমি অমন করছো কেন ডালুদা?

ডালুদা বলল, সাপটাপ থাকলে শব্দে পালিয়ে যাবে।

এসময় সাপ থাকবে নাকি?

বলিস কি! এসময়ই তো সাপ বাইরে থাকে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে ঠাণ্ডায় শুয়ে থাকে।

শুনে আমার একটু ভয় করে। পকেট থেকে পেনসিল টর্চটা বার করে হাতে নিই। ঝোপঝাড়ের ভেতরকার অন্ধকারে ফোকাস ফেলে দেখে নিই।

ডালুদা বলল, চল প্রথমে একটু রেস্ট নিই। তারপর সব ঘুরে ঘুরে দেখবো।

আমিও খুব ক্লান্তি বোধ করছিলাম। বললাম, চলো।

দেবদারু গাছটার নিচে বেশ অনেকটা জায়গা খোলা মতন। ঝোপজঙ্গল নেই। ঘাস। মাথার ওপর দেবদারু গাছ থাকায় তলায় সুন্দর ছায়া। একটু বাতাসও আছে।

আমরা গাছতলায় গিয়ে বসি।

গাছতলা থেকে পুরো বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়। কোথায় কি আছে মুহূর্তে স্পষ্ট হয়। ভাঙা দরদালান আর ঝোপঝাড় চারদিকেই। কিন্তু আমার চোখ দুটো ঘুরে-ফিরে কেবল বাঁশঝাড়টার ওদিকেই চলে যায়। ঘন বাঁশঝাড়ের আড়ালেও আছে দরদালানের চিহ্ন। ওদিকটা বড় অন্ধকার। অন্ধকারেই তো সব রহস্য লুকানো থাকে।

আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বাঁশঝাড়টা দেখি। ওপাশের ভাঙা দরদালান দেখি।

হঠাৎ বারেক চেঁচিয়ে ওঠে, সাপ সাপ।

মুহূর্তে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি আমি আর ডালুদা। জিমি ছিল ঝোপের আড়ালে। দৌড়ে আসে। কিন্তু জিমির দিকে আমাদের চোখ নেই। আমাদের চোখ বারেকের দিকে। বারেক বসে ছিল আমাদের থেকে একটু দূরে। ওর ঠিক পায়ের কাছে ফণা তুলে আছে বিরাট একটা সাপ। স্থির হয়ে আছে। কালো সুতোর মতো জিভটা লকলকিয়ে বেরিয়ে আসছে বারবার। হুবহু সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়েই থাকি। কি করবো বুঝতে পারি না। হাত-পা একটু একটু কাঁপছে আমার। এখন কি হবে? বারেককে যদি কামড়ায় সাপটা!

ডালুদা আমাকে বলল, তুই সরে যা খোকন। বারেককে বলল, তুই নড়বিনে বারেক। তারপর সে অদ্ভুত একটা কাজ করলো। চোখের পলকে ছুটে গিয়ে সাপটার পেট বরাবর কোপ বসিয়ে দিলো। দু'ভাগ। দু'ভাগ হলে কি হবে! সাপটা তখনো ফুঁসছে। ডালুদার পায়ে হকি সু ছিল। তাই দিয়ে আচ্ছাসে ফণাটা মাড়িয়ে দিলো। শেষ। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। বারেকও হেসে বলে, আমি কিন্তু ডরাই নাই মামা।

শুনে ডালুদা হাসে। খেয়েছিল তোকে আজ। জিমি তখন মহা উল্লাসে কাটা সাপটার চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। দেখে আমি জিমিকে ডাকি। কাম অন জিমি।

জিমি আমার পায়ের কাছে দৌড়ে আসে।

ছুরিটায় রক্ত লেগেছিল। ঘাসে মুছতে-মুছতে ডালুদা বলল, কোন দিকটা আগে দেখবি?

আমি বললাম, চলো বাঁশঝাড়টার ওদিকে যাই।

চল।

আমরা হাঁটতে শুরু করি। আমার বুকের ভেতর এখন অদ্ভুত একটা অনুভূতি। সাপটা দেখার পর থেকে এ রকম হচ্ছে। সাপটা মারা পড়াতে এখন অকারণেই মনে হচ্ছে সেই জন্তুটাও আমরা মারতে পারবো। খুব একটা সাহস পাচ্ছি।

বাঁশঝাড়টার কাছাকাছি যেতে কিছু ছড়ানো-ছিটানো পালক পড়ে আছে দেখতে পাই। সারাটা বাঁশঝাড় জুড়েই পালক। হাওয়ায় হালকা তুলোর মতো উড়ছে। এক জায়গায় একটা কবুতরের কঙ্কাল। নীল পালক দেখে বোঝা যায় জালালী।

ডালুদা বলল, দেখছিস শেয়াল পায়রা ধরে খেয়েছে।

আমি কথা বলি না। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। নানাবাড়ির গোলাঘরেও ঠিক এই রকম জালালীর কঙ্কাল দেখেছি গতকাল। দুটো ব্যাপারের মধ্যে অদ্ভুত মিল।

বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করি। ছোটবড় অসংখ্য বাঁশের কঞ্চিতে দুর্ভেদ্য হয়ে আছে জায়গাটা। মাথা নিচু করে গা বাঁচিয়ে চলতে হয়। গায়ে খোঁচা লাগে। তবুও এ চলার ভেতর ভীষণ এক উত্তেজনা। গায়ের খোঁচা গ্রাহ্য করি না।

হঠাৎ মাথার কাছে ডানা ঝাপটানোর শব্দে আমরা তিনজনেই থেমে পড়ি। ওপরে তাকিয়ে দেখি অসংখ্য বাদুড় ঝুলে আছে। বাদুড়রা দিনের বেলা চোখে দেখে না। তবুও ডানা ঝাপটাচ্ছে। শব্দ-টব্দ পেয়ে আঁচ করেছে রাজ্যে শত্রু ঢুকেছে। কথাটা ভেবে আমার হাসি পায়।

বাঁশঝাড় পেরিয়ে ভাঙা দরদালানটার কাছে এসে দেখি আরো দু'-তিনটে পাখির কঙ্কাল। ঘুঘু আর জালালীর। এবার খুব একটা অবাক লাগে না। আমি যেন জানতামই একটা দৃশ্য এখানটায় থাকবে। তবুও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখি। চিন্তা হয়, এটা কি সত্যি-সত্যি শেয়ালের কাজ? তারপর ভাঙা দালানটা দেখি। এক কাঁড়ি ভাঙা-চুরো ইট ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। বাতাসে সোঁদা গন্ধ। গন্ধটা যে পুরনো চুন-সুরকির বুঝতে আমার কষ্ট হয় না। শহুরে ছেলেরা এসব বোঝে।

ইটের পাঁজার ভেতর সরু একটা খোঁদল। অনেকটা গভীর। ভেতরে চোখ চলে না। নিরেট অন্ধকার। অন্ধকার দেখলেই আমার মনে হয় কোনও রহস্য আছে। আমি

খোঁদলটার কাছাকাছি গিয়ে টর্চ মারতে যাবো, তখন জিমি হঠাৎ করে পেল্লায় একটা ঘেউ দিয়ে ওঠে। এত জোরে যে আমি চমকে যাই। এবং চমক কাটতে-না-কাটতেই দেখি কি একটা জন্তু খোঁদলটা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে মুহূর্তে ওপাশের জঙ্গলের দিকে মিলিয়ে গেলো। জিমিও ঘেউ দিতে-দিতে ছুটলো তার পিছু পিছু। জন্তুটা আমি মাত্র এক পলক দেখি। তাতেই বুঝি ওটার গায়ে হলুদ ডোরা কাটা।

ডালুদা আর বারেকও দেখেছে দৃশ্যটা। সবাই থ। আমরা যা খুঁজছিলাম তা যে এত কাছে কে জানতো।

মিনিট দুয়েক পর ওপাশের জঙ্গলে জিমির ঘেউ-ঘেউ শোনা যায়। এটা জিমির কান্নার শব্দ। বুঝতে আমার কষ্ট হয় না। বারেক চেঁচিয়ে বলে, মামা, জিমিরে বুঝি মাইরা ফালাইলো!

আমি কোনও কথা বলি না। হঠাৎ ওপাশের জঙ্গলটার দিকে ছুটতে শুরু করি। আমার পিছু পিছু ডালুদা, বারেক।

ঝোপটার কাছে আসতেই দেখি জিমি ফিরে আসছে। শিশুর মতন টালমাটাল পা জিমির। গলার কাছে রক্তের দাগ। আমি ছুটে গিয়ে জিমিকে জড়িয়ে ধরি।

জিমিকেও গলার কাছে কামড়েছে জন্তুটা। কামড়ে একেবারে ছিঁড়ে ফেলেছে। ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত ঝরছে ক্ষত থেকে। হায় আল্লা, জিমিও যদি ঐ রাখাল ছেলেটার মতো মারা যায়!

ভাবতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এখন জিমিকে কেমন করে বাঁচাবো আমি? রাগে দুঃখে কান্না পেতে থাকে আমার। নিজেকে নিজে গালাগাল করি, কি দরকার ছিল তোমার ফেলুদা হতে!

জিমিকে নিয়ে বহু কষ্টে বাড়ি ফিরতে হয়। ফিরতে-ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যায়।

pathagar.net

দুই

রাতের বেলা আমাদের কারোই ভাল ঘুম হয়নি। শুয়েছিও বেশ অনেকটা রাত করে। জিমির বড় কাহিল অবস্থা। ক্ষত জায়গায় ডালুদা কি কি সব গাছপালার রস লাগিয়ে দিয়েছে। তবুও জিমি খুব ঝিমিয়ে পড়েছে। কাল থেকে কিছু খায়নি। বাড়ি ফিরে উঠোনের একটা ছায়াময় জায়গায় নিঝুম হয়ে পড়ে থেকেছে। মাঝেমধ্যে যন্ত্রণায় কুঁই কুঁই শব্দ করেছে। বিকেলে চুপি-চুপি নানাবাড়ির বুড়ো চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে বারোটা কোডোপাইরিন ট্যাবলেট আনিয়েছি। সন্ধ্যের মুখে গরম জলে গুলে চারটে খাইয়ে দিয়েছি। এতসব কাণ্ড ঘটেছে, কিন্তু নানীকে জানতে দেইনি কিচ্ছু। বারেককে খুব সাবধান করে দিয়েছি যেন নানীকে কিচ্ছু না বলে দেয়।

কিন্তু জিমির অবস্থা নানীর চোখে পড়েছে। আমরা ফিরতেই জিজ্ঞেস করেছিল, কিরে, কুকুরটার হয়েছে কি?

ডালুদা বানিয়ে বলল : বাজারের নেড়ি কুত্তাগুলো সব একসাথে জিমিকে আক্রমণ করেছিল। জিমি পেরে ওঠেনি।

শুনে আমি হাঁফ ছাড়ি। যাক, ডালুদা আমাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু জিমির জন্যে আমার

চিন্তাটা কমে না। জিমির যদি কিছু হয়ে যায়! তাহলে ঢাকা ফিরে আমি কি বলবো!

কাল বিকেলে আমরা আজকের প্রোগ্রামটা ঠিক করে রেখেছিলাম। সন্ধ্যের পর গোলাঘরে ঢুকে ছোট্ট পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে ডালুদা আর আমি তিনটে পায়রা ধরেছি। পায়রাগুলো রাতের বেলা চোখে দেখে না। ধরা খুব সোজা। আমি নিচে থেকে টর্চ মারি আর ডালুদা অবলীলায় একটা গোলার ওপর চড়ে টপাটপ ধরে ফেলে। সারারাত পলোতে আটকে রেখেছিলাম পায়রা তিনটে।

সকালবেলা উঠে প্রথমে আমরা জিমিকে ট্যাবলেট গুলে খাওয়াই তারপর কাঁচি দিয়ে পায়রা তিনটের পাখার সব পালক কেটে দিই যাতে বাছাধনদের উড়াল দেবার শক্তি না থাকে। তারপর আটটার দিকে বারেককে জিমির তদারকিতে রেখে আমি আর ডালুদা পায়রা তিনটে হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

নানী জিজ্ঞেস করে, তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

ডালুদা এবারও একটা গুল ছাড়লো। পূব পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে পিকনিক করবো।

নানী হাসে, পায়রা দিয়ে কি হবে?

পায়রার মাংস নাকি খুব ভাল।

কি যে বলিস তোরা!

তারপর একটু থেমে বলে, যেখানেই যাস সাবধানে চলাফেরা করিস। খোকনকে দেখে-শুনে রাখিস। জন্তুটা যে কখন আবার কি ঘটাবে!

ডালুদা বলল, জন্তুটার মজা কি জানো, কখনো বেশি লোকজনের সামনে আসে না, বেশি বয়সের লোকজনের সামনে আসে না। শুধু বাচ্চা ছেলেদের একা পেলে!

তবুও সাবধানের মার নেই।

আমরা আর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে পড়ি।

আমার কাঁধে আজ একটা কাপড়ের ব্যাগ। তাতে আমার গোয়েন্দাগিরির সব জিনিসপত্র। ডালুদা গরু জবাই করার ছুরিটাও সঙ্গে নিয়েছে। আজ আমরা রেডি হয়েই বেরিয়েছি, জন্তুটার দেখা যখন পেয়েছি ওকে না মারা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। আজ একটা কিছু ঘটাবোই।

কাল বাড়ি ফিরেই আমি আর ডালুদা প্ল্যানটা করে ফেলি। জন্তুটার পায়রা জাতীয় পাখির প্রতি খুব লোভ। পায়রা দিয়েই ঘায়েল করতে হবে ব্যাটাকে। তাছাড়া ওর আস্তানাটাও তো খুঁজে পেয়েছি আমরা। ভাঙা দরদালানের খোঁদলের ভেতর থাকে।

বিলের বাড়ি এসে আজ আর কালকের মতন ভয় করে না। আজ ডালুদা আর আমি দু'জনেই মরিয়া হয়ে গেছি। ব্যাটা জিমিকে কামড়িয়েছে, জান যাক আর থাক, ওকে আমরা ছাড়ছি না!

বিলের বাড়ি ঢুকেই, ডালুদা হাতে ছুরিটা নিয়েছে। বলল সামনে পেলে আজ এটা দিয়ে জবাই করবো।

আমি কথা বলি না। আমরা দু'জনেই জানি জন্তুটা খুব ছোট সাইজের। ছুরিটুরি দেখলে ভয়ে পালাবে। কিন্তু আমাদের আসল প্ল্যানটা অন্য রকম।

পা টিপে-টিপে, চারদিকে সাবধানী চোখ রেখে আমরা বাঁশঝাড় পেরিয়ে ভাঙা

দরদালানটার সামনে আসি। ডালুদা চালাকি করে দু'-তিনটে আধলা ইট ছুঁড়ে মারে গর্তটার দিকে। জন্তুটা থাকলে নিশ্চয় ছুটে পালাবে। কিন্তু তার কোনও সাড়া-শব্দ পাই না। তখন সাহস পাই। আমার ভেতর যে ভয়টা ছিল সেটা কেটে যায়।

আমি ঝোলা খুলে জিনিসপত্রগুলো সব বের করি। ডালুদা মুহূর্তে তিনটে পায়রার পায়ে লম্বা সুতলি বেঁধে গর্তটার কাছে ছেড়ে দেয়। সুতলির মাথাগুলো একটা হেলানো বাঁশের সঙ্গে বাঁধে। পায়রাগুলোর ডানার পালক কাটা। উড়তে পারে না বেচারারা। ছেড়ে দিলে পর খোঁদলটার মুখের সামনে জবুথবু বসে থাকে। দেখে আমার একটু মায়া হয়।

আমার কাজও ততক্ষণে শেষ। নাইলন কর্ড দিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করেছি। ডালুদা বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে সরু বাঁশের সাত-আটটা ডগা কেটে কায়দা করে খোঁদলটার চারপাশে পুঁতে দেয়। আমি ফাঁসটা খুব সাবধানে খোঁদলটার মুখে বসাই। পোঁতা বাঁশ ডগাগুলোর সঙ্গে চারপাশ থেকে ফাঁসটা এমন করে জড়ানো যে এর ভেতর দিয়ে যদি ছোট্ট একটা বেড়াল-ছানাও গলে যায় তাহলে ফাঁসে না আটকে উপায় নেই।

কাজটা শেষ করে আমার খুব ভাল লাগে। জালালীগুলো একেবারে খোঁদলটার মুখে। জন্তুটা যদি জালালী দেখেই লাফিয়ে পড়ে তাহলে আর রক্ষে নেই। বাঁশের খোঁটাগুলো শক্ত করে পোঁতা। খুব বড় জন্তু হলেও সহজে নিজেকে ছাড়াতে পারবে না।

ডালুদা আর আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা দেখি। দেখে আমার নিজের খুব ভাল লাগে। এই প্রথম ফেলুদার মতো একটা কাজ করলাম।

ডালুদা বলল, খোকন, সত্যি সত্যি তোর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।

আমি কথা বলি না। মৃদু হাসি।

বাড়ি ফিরতেই বারেক আমাকে দেখে কেঁদে ফেললো। মামা, জিমি মইরা গেছে।

বলিস কি? আমি পাগলের মতো ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকি। ডালুদাও। উঠোনের সেই ছায়াময় জায়গাটায় দেখি বাড়ির সব ঝি-চাকর জটলা করে দাঁড়িয়ে। নানীও আছে। আমাকে দেখে নানী দুঃখ করে বলল, আহা, কুকুরটা তোর মরেই গেলো খোকন। পোষা জীব নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে নেই।

এসব কথার কিছুই আমার কানে ঢোকে না। ঝি-চাকরদের জটলা ঠেলে আমি জিমির কাছে আসি। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জিমি। হাত-পা সব টান-টান শক্ত। মুখের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে খানিকটা লালা। আমি জিমির মাথাটা কোলে জড়িয়ে ধরি। তারপর হু হু করে কেঁদে ফেলি। নানী আর ডালুদা আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। আমাকে জিমির কাছ থেকে সরিয়ে আনে। তখনো আমি কাঁদছি।

বিকেলের দিকে নানাবাড়ির আমবাগানে বিরাট একটা গর্ত খুঁড়ে জিমিকে কবর দি আমরা। যখন কবর দেওয়া শেষ হয়েছে তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমবাগানের গাছপালায় অন্ধকার জমে উঠছে। আমরা সবাই বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছি কবরের পাশে। ডালুদা আর নানাবাড়ির বুড়ো চাকর এ দু'জনেই করেছে সব। আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখেছি মাত্র। আমার কেবল কান্না পাচ্ছিলো বারবার।

বারেক একটা বেলিফুলের চারা এনে পুঁতে দিয়েছে জিমির কবরের ওপর। এখন

একঘটি জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। বেলির চারাটা বেঁচে যাবে। একদিন বেলির ঝাড় হবে এখানটায়। থোকা-থোকা ফুলে ছেয়ে যাবে জিমির কবর। জিমি কি এসব দেখতে পাবে?

কথাটা ভেবে আমার আবার কান্না পায়। যতবার নানাবাড়ি বেড়াতে আসবো ততবারই এই বেলিঝোপটার দিকে তাকিয়ে জিমির কথা মনে পড়বে। কিন্তু জীবনে আর কখনো জিমির সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

তিন

আমার আর ডালুদার একসঙ্গে চোখে পড়ে দৃশ্যটা। বড়সড় একটা বেড়াল সাইজের জন্তু ফাঁসে ঝুলছে। জিভটা দুর থেকেও চোখে পড়ে। আমার হাতের এক বিঘত হবে, বেরিয়ে আছে। দেখেই ডালুদা হুররে বলে চেঁচিয়ে ওঠে। আমাকে প্রায় মাথার ওপর তুলে ধেই-ধেই করে খানিকটা নাচে। সাবাস খোকন মিয়া, সাবাস!

বারেকও খুশিতে বাঁচে না। সে প্রথম বুঝতে পারে না কাণ্ডটা কি ঘটেছে। পরে জন্তুটা দেখতে পেয়ে সে-ই প্রথম ছুটে যায়। এই ব্যাটাই জিমিরে মারছিল।

কাছাকাছি এসে আমরা সবাই অবাক। জন্তুটা আসলে বাঘ। এক্কেবারে ছোট্ট বাঘ। একটা বড়সড় বেড়ালের মতো। নাইলন কর্ডের ফাঁসটায় দারুণ ফাঁসা ফেঁসেছে। বাঁশের খোঁটাগুলোর একটা উঠে গেছে। তবুও ব্যাটা মারা পড়েছে!

বাঘটার কাছাকাছি গিয়ে আমার ভারি একটা খুশি লাগে। জীবনে এই প্রথম সত্যিকার ফেলুদার মতো একটা কাজ করে ফেললাম। নিজেকে নিজে একটা ধন্যবাদ না দিয়ে পারিনে আমি। থ্যাংক ইউ মিস্টার খোকন।

ফাঁসটা গলায় আটকে-থাকা অবস্থায়ই জন্তুটাকে ডালুদা নামায়। আমি তখন হাঁটু গেড়ে বাঘটার সামনে বসি। চিতাবাঘ হবে। গাটা হাত দিয়ে দেখি শক্ত হয়ে গেছে। বুঝতে পারি কাল বিকেলের দিকে মরেছে। আমার হঠাৎ করে তখন পায়রা তিনটের কথা মনে পড়ে। বাঘটা পায়রাগুলো কি খেতে পেরেছিল?

না। তিনটে পায়রাই বেঁচে আছে। খোঁদলের কাছেই আছে। বাঘ মারা পড়েছে দেখে পায়রার দিকে চোখ যায়নি আমাদের। তাহলে ব্যাপারটা হলো কি!

আমি মনে মনে ডিটেকটিভ কায়দায় ব্যাপারটা সাজাই। বাঘটা বাইরে কোথাও ছিল। ফিরে এসে দেখে ঘরের কাছে প্রিয় খাবার। চারদিক না তাকিয়েই পায়রা ধরার জন্যে দিয়েছে লাফ। সঙ্গে সঙ্গে নাইলন কর্ডের ফাঁস আটকে গেছে গলায়। আঃ তখন একটা দৃশ্য হয়েছে বটে! যদি চোখে দেখা যেতো। নাইলন কর্ডের এক প্রান্ত ধরে বাঘটাকে হিঁচড়ে টানতে শুরু করে বারেক। সে-ই এখন আমাদের আগে। আমি আর ডালুদা পেছনে। কিন্তু আমার মাথার ভেতর ছোট্ট একটা প্রশ্ন আঁকুপাঁকু করে, জন্তুটা যখন বাঘই তখন কোনও মানুষকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খায়নি কেন? বাকি দু'জনের কথা জানি না, আমার চোখে রাখাল ছেলেটিকে মরতে দেখেছি। তার গলার কাছে শুধু ছোট্ট তিনটে দাঁতের দাগ পাওয়া গিয়েছিল। ব্যাপারটা আসলে কি? তাছাড়া বাঘই যখন, ছোট হোক আর বড় হোক, কাছে যাকে পাবে তাকেই তো আক্রমণ করার কথা। কিন্তু এ যে শুধু বেছে বেছে বাচ্চা ছেলেদের আক্রমণ করতো। তাছাড়া বাঘের নখের আঁচড় খুব তীক্ষ্ণ হয়, এর তো

নখ তেমন নয়। আমি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি।

আমার মাথায় তালগোল পাকিয়ে যায়।

গ্রামের কাছাকাছি আসতেই হৈ-চৈ পড়ে গেলো। জন্তুটা মারা পড়েছে। গ্রামের লোকজন ভেঙে পড়লো দেখতে। নানাবাড়ির বিশাল উঠোনের মধ্যিখানে বাঘটা ফেলে রাখা হয়েছে। চারপাশের গ্রাম থেকে লোকজন আসছে দেখতে। আর আমার মতো ছোট্ট ছেলে এটা মেরেছে শুনে বাঘ ফেলে অবাক হয়ে সবাই আমাকেই দেখে। সাবাস দেয়। আমার কিচ্ছু ভাল্লাগে না! কেবল জিমির কথা মনে হয়। জিমি থাকলে এখন ঘেউ-ঘেউ করে সারা বাড়ি মাথায় তুলতো।

ডালুদার মুখে সব শুনে নানী ভয়ে চোখ বড় করে ফেলে। করেছিস কি তোরা? যদি তোদের কাউকে কামড়াতো?

ডালুদা হাসতে-হাসতে বলে, আমাদের কামড়ানো অতো সোজা নয়।

আমি তখন চুপি-চুপি আমবাগানে জিমির কবরের কাছে যাই। বেলির চারাটা তাজাই আছে। বেঁচে যাবে।

আমি এক পলক বেলির চারাটা দেখে জিমির কবরের পাশে বসি। কবরের ওপর হাত রাখতেই মনে হয় জিমির গায়ে হাত রেখেছি। অজান্তে চোখে জল চলে আসে। সামলে নিয়ে বলি, জিমি, তোকে যে মেরেছে, আমি তাকে মেরেছি। তুই আমাকে মাফ করিস জিমি।

জিমির কবরের ওপর হাত রেখে আমি ঝর-ঝর করে কাঁদতে থাকি।

pathagar.net

অন্ধকারে গোলাপ বাগানে

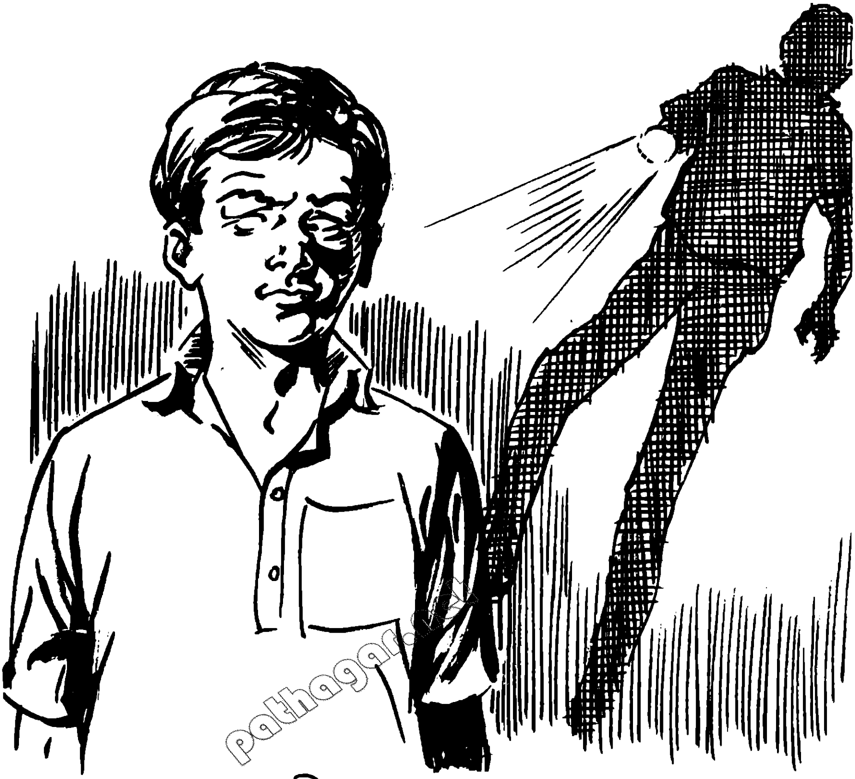

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাড়ে সাতটার সময় মাস্টারমশাই আসবেন, ঠিক সাতটা বেজে কুড়ি মিনিটে আলো নিভে গেল। এখন লণ্ঠন জ্বালতে হবে। তিনতলার ঘরে ঠিক জানালার ধারেই সুজয়ের পড়ার টেবিল। সে সেখানেই বসে রইলো চুপ করে। জানালার বাইরে গোটা কলকাতাটাই অন্ধকার।

দোতালায় মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে। মা শিবুকে বললো হারিকেন জ্বালতে। শিবু বললে, দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না। রোজই এই রকম হয়। আলো নিভে গেলে তখন আর দেশলাই কিংবা টর্চ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুজয়দের বাড়িতে একটা চার ব্যাটারির বড় টর্চ আছে। খুব জোর আলো হয়। সেই টর্চটা কোথায়?

সুজয় চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করলেন। চোখ বুজলে সে অনেক কিছু দেখতে পায়।

কিন্তু চোখ বুজে সুজয় একটা অন্য দৃশ্য দেখলো। ঠিক যেন সিনেমার ছবির মতন...

...

...অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে টর্চ হাতে হেঁটে আসছে একজন লোক...লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, টর্চের আলোয় মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে শুধু লোকটির পায়ে সাদা কেড্স জুতো, তার প্যান্টের রং হল্‌দে...লোকটি হাঁটছে খুব তাড়াতাড়ি, টর্চের আলো পড়ছে এদিক ওদিক...

—মাঠতো নয়, ওটা একটা বাগান। টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো নানারকম ফুল গাছ, লোকটি এক একটি গাছের ওপরে আলো ফেলে দেখছে, তারপর আলোটা একটি গোলাপ গাছের ওপর থেমে গেল। তিনটে বেশ বড় গোলাপ ফুল ফুটে আছে সেই গাছে...

এবার লোকটি হাঁটু গেড়ে বসলো সেই গাছটির কাছে। এখনো লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, গায়ে একটা ডোরাকাটা হাওয়াই শার্ট...হাঁটু গেড়ে বসে লোকটির প্যান্টের পকেটে ডান হাতটা ঢোকানো তারপর কী যেন একটা জিনিস বার করে আনলো...

সুজয়ের বুকটা ধক্ করে উঠলো...লোকটার হাতে ওটা কী? টর্চটা মাটিতে রাখলো, তারপর দু'হাত দিয়ে সেই জিনিসটা আলোর সামনে আসতেই দেখা গেল সেটা একটা গোটানো ছুরি, সেটার ফলাটা টেনে খুলে ফেলতেই ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো আলোয়...দূরে একটা কুকুর ডাকছে...ডাকতে ডাকতে কুকুরটা যেন এগিয়ে আসছে কাছে...

—এই যে হারিকেন এনেছি।

সুজয় চমকে উঠতেই ঘোর কেটে গেল তার। শিবু হারিকেন নিয়ে এসেছে। সুজয়ের একটু রাগ হলো। ঈস্ নষ্ট হয়ে গেল ছবিটা।

একতলায় একটা কুকুর ডাকছে। এতো চেনা ডাক। সুজয়ের নিজের কুকুর ডুংগা হঠাৎ ডেকে উঠছে। ডুংগা জাতে অ্যালসেসিয়ান, খুব শান্ত কুকুর, তবু লোকে দেখলে ভয় পায়। ডুংগা সহজে ডাকে না। এখন হঠাৎ ডাকছে কেন?

—আর একটু পরে আলোটা আনতে পারলে না?

শিবু বললো, ওমা, তুমি অন্ধকারে বসে থাকবে, মা বললেন, শিগ্‌গির হারিকেনটা দিয়ে আয়। খোকাবাবু অন্ধকারে ভয় পাবে।

সুজয় বললো, হুঁ, আমি অন্ধকারে ভয় পাবো, এই ডুংগা ডাকছে কেন রে?

—নিশ্চয়ই কোনো ছাতাওয়ালা বাবু এসেছে।

তা ঠিক। ডুংগা একদম ছাতা পছন্দ করে না। কারুর হাতে ছাতা দেখলেই বিরক্তি প্রকাশ করে।

—যা তো নিচে গিয়ে দেখে আয়।

শিবু চলে যেতেই সুজয় ভুরু কুঁচকে বসে রইলো। হঠাৎ চোখ বুজে সে ঐ দৃশ্যটা দেখলে কেন? কোনো সিনেমায় কি শিগ্‌গিরই এ রকম কোনো দৃশ্য দেখেছে? না তো! কোনো গল্পের বইতে পড়েছে? তাও না! অন্ধকারের মধ্যে বাগানে একটা লোক, একটা গোলাপ গাছের সামনে ছুরি হাতে নিয়ে বসা—লোকটার মুখ দেখা যায় নি......লোকটা কি ছুরি দিয়ে গোলাপ গাছটা কেটে ফেলবে? কেন?

সুজয় আবার চোখ বুজলো। যদি বাকি অংশটা দেখা যায়। কিন্তু এবার কিছুই দেখা গেল না। এমনি চোখ বুজলে যে-রকম হয় সেই রকম।

হারিকেনের আলোটা খুব কমিয়ে টেবিলের তলায় নামিয়ে রেখে আবার চোখ বুজে দেখার চেষ্টা করলো সুজয়। এবারও দেখা গেল না কিছুই।

দরজার কাছে আওয়াজ হতেই সুজয় চোখ খুলে তাকালেন। মাস্টারমশাই এসেছেন। হাতে একটা ছাতা।

—কী সুজয়, হারিকেনটা নামিয়ে রেখেছো কেন?

সুজয় উঠে দাঁড়িয়ে হারিকেনটা তুলে বললো, আসুন, তপনদা, আপনি আজ আবার ছাতা নিয়ে এসেছেন?

সুজয় পড়ে ক্লাস নাইনে। তার মাস্টারমশাই সবে মাত্র এম. এ. পাশ করেছেন। প্যান্ট-শার্ট পরেন আর খুব লবঙ্গ খেতে ভালোবাসেন। সব সময় মুখে লবঙ্গ।

মাস্টারমশাই বসলেন, বাঃ, বৃষ্টি হলেও ছাতা আনতে পারবো না? তোমার কুকুর একেবারে ঘেউ ঘেউ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমায় চেনে এতদিন ধরে দেখছে...

এই ডুংগা যে সুজয়ের কতবড় বন্ধু তা তো মাস্টারমশাই জানেন না। ডুংগার মনে কোনো কষ্ট হলে সুজয় সহ্য করতে পারে না।

—বৃষ্টি হচ্ছে বুঝি?

—আমাদের পাড়ায় তো তুমুল বৃষ্টি। তোমাদের এখানেও টিপি টিপি করে সুরু হয়েছে।

সুজয় জানলা দিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখলে, সত্যিই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

অমনি সুজয়ের মনে পড়লো, অন্ধকারে বাগানে যে লোকটা সাদা কেড্‌স পরে হাঁটছিল, তার জুতোয় কোনো কাদা ছিল না।

চেয়ার টেনে বসে মাস্টারমশাই বললেন, যে অঙ্কগুলো দিয়েছিলাম, করেছো?

সুজয় খাতা বার করলো। কিন্তু পড়াশুনোয় আজ তার মন বসছে না। যদিও সামনেই পরীক্ষা।

এক সময় মাস্টারমশাই বললেন, এ কি, সুজয়, মন দিচ্ছো না কেন? কতবার বলছি লিখতে, তুমি পেন্সিল হাতে বসে আছো!

সুজয় লজ্জা পেয়ে বললে, ও! এই যে লিখছি! কী যেন বলছিলেন তপনদা?

মাস্টারমশাই বললেন, তোমার দোষ কী ; এই হারিকেনের আলোতে কি পড়া যায়। পাখা বন্ধ, যা গরম পর্শুতো রবিবার, সেদিন আমি দুপুরে আসবো...

এক ঘন্টার মধ্যেই মাস্টারমশাই চলে গেলেন। ঠিক এর পরেই সুজয়ের খাবারের ডাক পড়ে।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে রোজ সুজয় খানিকক্ষণ ডুংগাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শহরের এ দিকটা এখনও অন্ধকার। বৃষ্টি এখনও টিপি টিপি পড়ছে। ডুংগা জলে ভিজতে চায় না। গায়ে একটু জল লাগলেই দু' কান লট্ পট্ করে গা ঝাড়া দেয় খুব জোরে। সুতরাং আজ আর ছাদে ঘোরা যাবে না।

সুতরাং ডুংগাকে নিয়ে সুজয় চিলেকোঠায় বসে রইলো। ডুংগা একবার করে বাইরে মুখ বাড়ায়, আর নাকে বৃষ্টি লাগলেই ফিরে আসে।

সুজয়ের আবার মনে পড়লো সেই দৃশ্যটা।

সুজয় মাঝে মাঝেই চোখ বুজে এরকম সব জিনিস দেখতে পায়। কখন যে দেখবে তা ঠিক নেই। এক একদিন কিছুই দেখে না।

দৃশ্যগুলো নানা রকম হয়। পাহাড়ের পাশের সরু রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে তিনজন ছেলে...জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছ ভেঙে পড়লো মড় মড়িয়ে...। একটা ফুলের পাপড়ি দুলছে আস্তে আস্তে আর একটা মৌমাছি বোঁ বোঁ করে ঘুরছে তার পাশে...। সোনারপুরে ওর ছোটমামার বাড়ির গোয়ালঘরে একটা শেয়াল ঢুকে বসে আছে, দুটো গরু ডাকছে হাম্বা হাম্বা...।

চোখ বুজে সুজয় যে দৃশ্যগুলি দেখে, তা সে কিন্তু আগে সত্যি সত্যি দেখে নি কখনো। চোখ বুজলে দৃশ্যগুলি কোথা থেকে এসে যায় কে জানে। একবার সে দেখেছিল, সম্রাট, আওরঙ্গজেবের সভায় দাঁড়িয়ে কথা বললেন শিবাজী। একেবারে সিনেমার মতন স্পষ্ট।

এসব কথা অন্য কারুকে বললে তারা বিশ্বাস করে না। ইস্কুলের বন্ধুদের দু' একবার বলতে গেছে, তারা অমনি বলেছে, যা, যা, খুব গাঁজা দিচ্ছিস!

অনেকগুলো ঘটনা মিলেও যায়। সোনারপুর থেকে ছোটমামা এসে সুজয়ের মাকে বলেছিলেন। জানো, মেজদি, পর্শুদিন কী কাণ্ড। কোথা থেকে একটা শেয়াল এসে আমাদের গোয়াল ঘরটায় ঢুকে পড়ে...।

সুজয় উত্তেজিত ভাবে বসেছিল, জানি, আমি জানি, দুটো গরু ভয় পেয়ে খুব ডাকছিল...।

ছোটমামা ভুরু কুঁচকে বসেছিলেন, তুই জানিস, মানে? পর্শু রাত্তিরের ব্যাপার, এর মধ্যে তো কেউ আসে নি সোনারপুর থেকে।

সুজয় তবু বলেছিল, হ্যাঁ, আমি জানি, তোমরা সবাই মিলে তাড়া করলে...শেয়ালটা দৌড়ে পালাবার সময় একজন কে যেন লাঠি ছুঁড়ে মারলো, কিন্তু-ওর গায়ে লাগে নি...।

ছোটমামা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, মেজদি তোমার ছেলেটা কিন্তু খুব গল্প বলতে পারে। আমি যেই শেয়ালের কথা বলছি...।

বিশ্বাস করে না, কেউ বিশ্বাস করে না। গল্প নয় সুজয় যে ঐ দৃশ্যটা সত্যিই দেখেছিল পর্শুদিন, তা কারুকে বিশ্বাস করানো যাবে না।

তা হলে, অন্ধকার বাগানে টর্চ হাতে লোকটি যে একটা গোলাপ ফুলের গাছের সামনে বসলো, সে দৃশ্যটাও সত্যি?

ওরকম গোলাপ বাগান কোথায় আছে? কলকাতায় কি থাকতে পারে? তা পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ কলকাতায় বৃষ্টি পড়বে, ওখানে বৃষ্টি নেই...। তা হলে কি দূরে কোন জায়গায়? সোনারপুরে ছোটমামার বাড়িতে কি বাগান আছে? দু'মাস আগে সুজয় যখন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিল, তখন দেখেছিল, ছোটমামাদের বাড়ির সামনে বেগুন গাছের ক্ষেত। এত তাড়াতাড়ি কি সেখানকার বেগুন গাছ তুলে গোলাপ ফুলের গাছ হতে পারে? নাঃ!

নিচে নেমে এসে সুজয় মাকে জিজ্ঞেস করলো, মা, আমাদের চেনাশুনো কারুর বাড়িতে ফুলবাগান আছে? এ্যাত্ত বড় বড় গোলাপ ফুল ফোটে?

মা অবাক হয়ে বললেন, ফুলবাগান? কাদের ফুলবাগান আছে? হঠাৎ এই কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

সুজয় বললেন, না, এমনি...।

তিনতলার ঘরে সুজয় একলা শোয়। ঘুমোবার আগে সুজয় চোখ বুজে অনেক চেষ্টা করলো সেই দৃশ্যটা আর একবার দেখবার। কিন্তু একবার স্বপ্ন ভেঙে গেলে আর যেমন জোড়া লাগে না, সেইরকম সেই দৃশ্যটাও আর ফিরে এলো না।

সকালবেলা মা সুজয়কে ডাকতে এসে দেখলেন, সুজয়ের ঘুমন্ত মুখে কি রকম যেন একটা অস্বস্তির ভাব। ভুরু দুটো কোঁচকানো, যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে কিছু চিন্তা করছে।

একটু কিছু অন্য রকম দেখলেই মায়েরা প্রথমেই ভাবেন, ছেলের জ্বর হয়েছে কি না।

মা সুজয়ের কপালে হাত রাখলেন। না, জ্বর নেই তো।

—এই সুজয়, ওঠ্।

দু'বার ডাকতেই সুজয় চোখ মেললো।

—হ্যাঁ রে, তুই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী ভাবছিলি?

—কই, কিছু না তো?

ঘুমের মধ্যে ভুরু কুঁচকেছিলি কেন? কোনো বাজে স্বপ্ন দেখেছিস বুঝি?

সুজয়ের কিছু মনে নেই। অনেক স্বপ্ন পরদিন সকালে উঠে আর মনে পড়ে না। কিন্তু সুজয় জেগে জেগে চোখ বুজে যে দৃশ্যগুলো দেখে, সেগুলো তার ঠিক মনে থাকে।

সুজয়ের স্কুল সাড়ে দশটায়। বাবা অফিস যাবার সময় সুজয়কে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যান বলে সুজয়কে বাবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে ন'টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হয়। সেইজন্য সকালের জলখাবার খেয়ে নেওয়ার পর একঘণ্টা পড়তে না পড়তেই তাকে যেতে হয় স্নান করতে।

পুরোনো আমলের বাড়ি তো, তাই সুজয়ের ঘরটা বিরাট। এই স্নানের ঘরটা সুজয়ের খুব ভালো লাগে। দরজাটা বন্ধ করলে তখন একা একা, নিরিবিলি লাগে। এখানে অনেক কিছু চিন্তা করা যায়।

অবশ্য বাথরুমে বেশীক্ষণ কাটাবার উপায় নেই সকালে। বাবার অফিসের দেরি হয়ে যাবে। তিনি তাড়া দেবেন।

শাওয়ারটা খুলে দিয়ে সুজয় তার তলায় দাঁড়ালো। শাওয়ারের জল খুব তোড়ে পড়বার সময় আপনা থেকেই চোখ বুজে আসে। চোখ বুজতেই সুজয় আর একটা দৃশ্য দেখতে পেল।

...একটা খুব বড় বাড়ি, দোতালায় টানা বারান্দা। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন বুড়ো মতন লোক খুব রাগারাগি করলেন। দূরে দুতিনজন লোক কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়িয়ে...বুড়ো লোকটির বুকের লোম পাকা, শুধু একটা ধুতি পরা, বেশ বড় গোঁফ, হেঁড়ে গলায় তিনি চিৎকার করে বললেন, আমার চাবি কোথায়? আমার চাবির গোছা কোথায় গেল? মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে...।

সুজয় চোখ খুলে ফেললো। আর কিছু দেখা গেল না। ঐ বুড়োলোকটি কে? ঐ বাড়িটা কোথায়? সে কিছুই জানে না। তবু সে কেন দেখলো ঐ দৃশ্যটা? কোথায় কার

চাবির গোছা হারিয়ে গেছে, তা নিয়ে সুজয়ের মাথা ঘামাবার কি দরকার?

কিন্তু ভুলতে চাইলেও সুজয় ভুলতে পারে না। খেতে বসেও সুজয়ের কানে বাজে সেই বুড়ো লোকটির চিৎকার, আমার চাবির গোছা কোথায় গেল? আমার মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে...।

স্কুল ছুটি হয়ে গেল এক পিরিয়ড পরেই। ডিবেট কমপিটিশানে ক্লাশ টেনের একটি ছেলে ফার্স্ট হয়েছে। বাড়ি চলে এসে সুজয় শুয়ে রইল নিজের ঘরে। এরকম দুপুর বেলা সুজয় কোন দিন শুয়ে থাকে না, বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যায় কিংবা গল্প করে। বৃষ্টি বাদলা হলেও ঘরে বসে গল্পের বই পড়ে।

কিন্তু সুজয়ের শরীর ভালো লাগছে না। মনটা একটু যে ব্যথা ব্যথা করছে। সুজয় শুয়ে রইলো চোখ বুজে। এখন আর যে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আজ সকালে দেখা দৃশ্যটা মনে পড়ছে বারবার। কে ওই বুড়ো লোকটা? সুজয় কোন দিন ঐ রকম লোককে দেখে নি, খুব জোর দিয়ে বলতে পারে।

একটু পরেই তার বন্ধু অভিজিৎ এসে হাজির। অভিজিৎ অবশ্য অন্য স্কুলে পড়ে, আশ্চর্য তাদের স্কুলও আজ ছুটি। ওদের স্কুলের একজন টিচার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন।

অভিজিৎ উত্তেজিত ভাবে বললে, এই, দমদম যাবি?

সুজয় বললো, দমদম হঠাৎ? দমদম যাবো কেন?

—দমদমে আমার মামার বাড়ী। বেশ আজ ওখানে থাকবো কাল চলে আসবো।

—কাল ইস্কুলে যাবো না?—ধুৎ কাল তো রবিবার।

—রবিবার দুপুরে আমার মাস্টার মশাই আসবেন বলেছেন যে।

—কাল সকাল দশটা এগারোটার মধ্যে ফিরে আসবো। বাবা অফিসের কাজে বহরমপুর যাচ্ছেন। আজ সন্ধ্যাবেলা অফিসের গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের দমদমে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। সকালে আমরা ফিরে আসবো বাসে করে। ঐ বাসে করে ফিরে আসার ব্যাপারটা শুনেই সুজয় বেশি উৎসাহ বোধ করছে। অনেকক্ষণ বাসে চাপতে সুজয়ের খুব ভালো লাগে। কত রকম মানুষ দেখা যায়।

মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে আগে।

অভিজিৎকে বসিয়ে রেখে সুজয় গেল মায়ের ঘরে। মা এই সময় উপন্যাস পড়েন। মায়ের পাশে বসে সুজয় খুব নরম ভাবে বললো, মা একটা কথা বলবো?

মা বললেন, পয়সা চাই বুঝি? পর্শুদিন তোকে একটা টাকা দিয়েছিলুম না?

—না, মা, পয়সা না। অভিজিৎ এসেছে, ও বলছিল...।

একটু পরেই মা রাজি হয়ে গেলেন। ওরা বেরিয়ে পড়লো বিকেল পাঁচটার মধ্যে। অভিজিৎদের মামার বাড়ি নাগেরবাজার ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। পৌঁছোতে বেজে গেল সাড়ে ছ'টা। তখন সন্ধ্যে নেমেছে।

সুজয়ের বাবা গাড়ি থেকে নামলেন না, গেটের কাছে ওদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন গাড়ি ঘুরিয়ে।

মস্ত বড় লোহার গেট, সামনে খানিকটা লন, সামনের দিকে শুর্কি বিছানো রাস্তা।

গেটটা খুলতেই ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো, অমনি দোতলা থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে?

অভিজিৎ বললো, আমি। —আমি কে?

—আমি অভিজিৎ...খোকন। দাদু, আমি খোকন, বালিগঞ্জ থেকে এসেছি!

—ও খোকন? আয়! কার সঙ্গে এলি? কারুকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, শুধু কথা শোনা যাচ্ছে।

দু'জনে চলে এলো বৈঠকখানায়। খুব বড় বাড়ি, কিন্তু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। একজন বয়স্কা মহিলা একতলায় একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আরে, খোকাবাবু যে! এসো এসো। সঙ্গে এটি কে?

অভিজিৎ বললো, আমার বন্ধু সুজয়। বড় মাসীমা, কেমন আছো তুমি?

অভিজিৎ সেই মাসিমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সুজয়ও প্রণাম করলো।

যদিও এটা অভিজিতের মামার বাড়ি, কিন্তু মামারা এখানে কেউ নেই। এক মামা বিলেতে, আর এক মামা দিল্লীতে। এখানে থাকেন অভিজিতের দাদু আর দিদিমা। আর এই মহিলাটি দূর সম্পর্কের মাসী।

—অভিজিৎকে সেই মাসী তাঁর ঘরে নিয়ে বসাতে চাইছিলেন, অভিজিৎ বললো, দাঁড়াও বড় মাসী, আগে দাদুকে প্রণাম করে আসি। মাসীমা বললেন, দেখিস, সাবধান। কর্তার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে আছে।

সুজয়কে নিয়ে অভিজিৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো ওপরে। লম্বা টানা বারান্দায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই বারান্দার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন বুড়ো লোক। তাঁকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুজয়। তার বুকের মধ্যে ছম্ ছম্ শব্দ হচ্ছে। জীবনে এমন অবাক সে কখনো হয় না।

এই তো সেই লম্বা বড় বারান্দা। আর এই বুড়ো লোকটিকেই তো সে কাল দেখতে পেয়েছিল বাথরুমে চোখ বুজে। ইনিই তো চাবি হারিয়ে গেছে বলে চ্যাঁচাচ্ছিলেন। অভিজিৎ বললো, কী হলো দাঁড়ালি কেন? উনি আমার দাদু।

সুজয় আর অভিজিৎ গিয়ে প্রণাম করলো তাঁকে। অভিজিৎ বললো, দাদু, এ আমার বন্ধু সুজয়।

দাদু বললেন, তোর মা কেমন আছে? সে এলো না কেন? আজ আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে! আমার চাবির গোছা হারিয়ে গেছে, সিন্দুকের চাবি, ট্রাঙ্কের চাবি, ব্যাঙ্কের লকারের চাবি, সব এক সঙ্গে ছিল।

সুজয়ের বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে এখনো। সে জানতো, ঠিক মিলে যাবে, চাবির কথা মিলে যাবেই। অভিজিতের দাদুর বুকের সব চুল পাকা।

অভিজিৎ বললো, কখন হারালো দাদু?

এই তো, সকালবেলা। কী কাণ্ড দ্যাখ্ না। নিশ্চয়ই কেউ বদ মতলবে লুকিয়ে রেখেছে। আমি বাড়ি ছেড়ে দু'দিন কোথাও যাই নি, চাবি কি করে হারাবে?

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অভিজিতের দিদিমা। তিনি বললেন, খোকন এসেছিস! দ্যাখ না কী কাণ্ড! চাবি হারিয়ে ফেলে তোর দাদুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

দাদু বললো, হবে না? কেউ যদি ঐ চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলে? সারাদিন ধরে আমি পাহারা দিচ্ছি, ঘর থেকে একেবারে বেরুই না। কিন্তু এরকম ভাবে ক'দিন যাবে?

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো, নতুন চাবি করানো যায় না?

দাদু বললেন, কতকাল আগেকার চাবি, ও কি এখন পাওয়া যায়? ব্যাঙ্কে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সিন্দুকের মধ্যে অনেক দামী জিনিসপত্র রয়েছে...।

দিদিমা বললেন, ওরা ছেলেমানুষ, ওরা আর কী করে তার। আয় তোরা ঘরে আয়। এই ছেলেটি কে? তোমার নাম কী?

সুজয় কথা বলতে গেল, কিন্তু তার গলা দিয়ে যেন আওয়াজই বেরুচ্ছে না। অতিকষ্টে সে নিজের নামটা বলল।

দিদিমা ডাকলেন, রজত, রজত!

কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের একটি ফিটফাট চেহারার ছেলে এলো সেই ডাক শুনে।

দিদিমা বললেন, রজত, এদের জন্য মিষ্টি এনে দাও। ঠাকুরকে বলো মাংস রাঁধতে। ওরা আজ রাত্রে এখানে খাবে।

ছেলেটি চলে গেলে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো, দিদিমা, ও কে? ওকে তো আগে দেখি নি?

দিদিমা বললেন, সেই যে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ওকে এনেছি। ও সম্পর্কে আমার এক কাকার ছেলে। লেখাপড়া বেশী শেখেনি, ও সবে একটা হোটেলে কাজ করছিল। তাই ওকে নিয়ে এসেছি। আমাদের বাড়িতে থাকবে।

মিষ্টি আর জলটল খাবার পর সুজয়কে নিয়ে অভিজিৎ গেল ছাদে। মস্ত বড় ছাদ। বাড়ির চারপাশটা ফাঁকা। আকাশে একটু একটু জ্যোৎস্না। নারকোল গাছের পাতায় হাওয়ার সর সর শব্দ হচ্ছে।—কী রে তুই কোনো কথা বলছিস না কেন?

কী বলবো?

—একেবারে গুম মেরে আছিস যে? তোর ভালো লাগছে না?

—হ্যাঁ।

সুজয় তখনও ভাবছে, সে যে আজ এখানে আসবে, তার তো কোন ঠিক ছিল না আগে থেকে। তবু সে এই বাড়িতে তার বন্ধুর দাদুর চাবি হারানোর দৃশ্যটা দেখলো কেন আগে থেকে? দেখেই বা কী লাভ হলো?

অভিজিৎ বললো, এই বাড়ির পেছন দিকটায় একটা বেশ বড় বাগান আছে। দেখতে যাবি?

সুজয় চমকে উঠে বললো, বাগান?

—হ্যাঁ। খুব চমৎকার বাগান। দাদুর খুব ফুলগাছের সখ। যাবি?

—এক্ষুনি।

অভিজিৎ একটা টর্চ চেয়ে নিল দিদিমার কাছ থেকে। সুজয়ের আর ধৈর্য থাকছে না, সে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে বাগানটা দেখতে চায়।

ঠিক সেই বাগানটাই কিনা তা বুঝতে পারলে না সুজয়। তারই অন্ধকারের মধ্যে সুজয় শুধু টর্চের আলোয় কয়েকটা গাছ দেখেছিল। সেটা যে-কোন বাগান হতে পারে।

তাছাড়া, সেই বাগানে ছুরি হাতে একট[illegible]র সঙ্গে অভিজিৎ-এর দাদুর সিন্দুকের চাবি হারাবার সম্পর্ক কি?

অভিজিৎ-এর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সুজয় প্রত্যেকটা ফুল গাছের ওপর আলো ফেলতে লাগলো। বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না। সুজয় দেখতে পেল, একটা গোলাপ গাছে ফুটে আছে তিনটে গোলাপ ফুল।

সাদা গোলাপ। কোন সন্দেহ নেই, কাল এই গোলাপ গাছটাকেই দেখেছিল সুজয়।

অভিজিৎ-এর হাতে টর্চটা দিয়ে সে বললো, তুই একটু এগো, আমি জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিচ্ছি।

অভিজিৎ বললো, সামনেই একটা সুন্দর বেঞ্চ আছে, চল, এখানে বসে বেঁধে নিবি।

—তুই বেঞ্চে গিয়ে বোস, আমি আসছি।

অভিজিৎ এক পা এগোতেই সুজয় বসে পড়লো গোলাপ গাছটার পাশে।

গোলাপ গাছ ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই সেটা সব সুদ্ধ উঠে এলো মাটি থেকে।

সুজয় কখনো গাছের একটা পাতা পর্যন্ত ছেঁড়ে না। গাছকে কষ্ট দিতে তারও কষ্ট হয়। কিন্তু এই গোলাপ গাছটার শেকড় কাটা।

গাছটা তুলে ফেলে তার শেকড়ের কাছটার গর্তে হাত ঢোকালো সুজয়। সে যা ভেবেছিল তাই। সেখানে রয়েছে সুজয়ের দাদুর চাবির গোছা।

সঙ্গে সঙ্গে পেছনে একটা পায়ের শব্দ পেয়েই সুজয় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে। সে দেখতে পেল একটা সাদা কেড্‌স জুতো। তারপর খাকি প্যান্ট। এই সেই রজত।

রজত সুজয়কে মারবার জন্য একটা হাত তুলেছিল, তার আগেই সুজয় চেঁচিয়ে উঠলো, অভিজিৎ, অভিজিৎ! আমি চাবি খুঁজে পেয়েছি! রজত থমকে দাঁড়ালো। তারপরই পেছন ফিরে লাগালো দৌড়। এরপর রজতকে আর দেখতেই পাওয়া যায় নি।

অভিজিৎ কাছে এসে বললো, চাবি? দেখি, দেখি! সত্যিই তো! তুই কী করে পেলি?

সুজয় বললো, এমনি, আমার পায়ে হঠাৎ হোঁচট লাগলো। আমি দেখলাম, একটা চাবির গোছা—।

তারপর সুজয় মন দিয়ে সেই গোলাপ গাছটাকে আবার পুঁতে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। সত্যি কথা তো বলে লাভ নেই, কেউ বিশ্বাস করবে না।

boighar.net

আজব গোয়েন্দার দেশে

আবুল বাশার

pathagar.net

আবিরমামার মুখে ভূতের গল্প শোনা আমাদের চিরকেলে অভ্যেস। মামা মুখ বদলাবার জন্য আজ একটি নতুন প্রস্তাব দিলেন। চুনোর মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ অদ্ভুতভাবে চেয়ে থেকে বললেন, "গোয়েন্দাগিরির চমৎকার গল্প বইয়ে পড়েছিস বিস্তর, কিন্তু চুনো, ম্যাজিক দেখিয়ে আততায়ী বা চোর ধরার গল্প তোদের জানা নেই। তাও ফের পি. সি. সরকারের ম্যাজিক নয়, সেটি হচ্ছে, যাকে বলে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'।"

ব্ল্যাক ম্যাজিক? ইংরেজিতে একটা নতুন শব্দ শুনলাম এমন বলব না, তবে কথাটার আবছা মানে মনে নিয়ে মামার গল্প শোনা ঠিক নয়। মামাই বললেন, "পি. সি. সরকারের ম্যাজিক অনেকটাই বিজ্ঞানভিত্তিক, অলৌকিক কিছু নয়, তাতে কোনও অতিপ্রাকৃত ঘটনা থাকে না। একজন আধুনিক জাদুকর, তুকতাকে বিশ্বাস করেন না। মন্ত্র মানেন না। বাণমারা, তুক করা, আত্মার কারসাজি, ভূতপ্রেত কোনও কিছুই মডার্ন ম্যাজিকে আসে না। এমনকী 'ভোজবাজি' কথাটা আমরা ব্যবহার করি, কোনও কিছুকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করার জন্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ মন্ত্রতন্ত্র মানে,

অলৌকিক ঘটনার দিকে তাদের ভয়ানক টান। 'সম্মোহন' শব্দটা নিশ্চয় শুনেছিস চুনো!"

আমাদের বোন কিরণ বলল, "আচ্ছা মামা, নজরবন্দি কাকে বলে?"

মামা নিঃশব্দে মিঠে হেসে বললেন, "সেটাই তো সম্মোহন রে! সাদা বাংলায় একটা কথা আছে 'গুণ করা'। গুণ মানে জাদু। এটাই ব্ল্যাক ম্যাজিক। ইংরেজিতে Magus বলে একটা শব্দ আছে। প্রাচীন পার্শি পুরুতকে বলা হত মেইগ্যাস। Magus বলতে একজন জাদুকর জ্ঞানী ব্যক্তিকে বোঝাত, এই শব্দটা থেকেই Magi এবং তা থেকে Magian এবং শেষে Magician শব্দ এসেছে। সম্মোহনসংক্রান্ত বিদ্যাই আসলে কালো জাদু। একজন অগ্নি উপাসক পুরোহিতের জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যই ছিল অলৌকিকত্ব এবং তিনি সম্মোহন বিদ্যাবলে মানুষকে অভিভূত করতে পারতেন। এই পুরুতরা ছিলেন স্বপ্নবিদ, এঁরা মানুষের স্বপ্নের নানারকম ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। এঁদের সম্বন্ধে বিশদ কিছু আর বলছি নে, পরে একদিন বলা যাবে। আজ আমি একজন বেঙ্গলি মেইগ্যাসের গোয়েন্দাগিরির একটা অকাট্য গল্প শোনাতে চাই।" বলে একটুখানি দম নেওয়ার জন্য থামলেন আবিরমামা।

মামা এবার রুপোর বুড়ো আঙুল প্রমাণ কৌটো থেকে আঙুলের চিমটি করে খানিকটা নস্য নাসিকার ছিদ্রে গুঁজে সাদা ধবধবে রুমাল নাকের ডগা রগড়ে মুছে সিধে হয়ে বসবেন। তাঁর চোখের ডিমে হালকা অশ্রু চিকচিক করে উঠবে। অতঃপর তিনি গল্পটা পাড়বেন, সব গল্পই মামার অভিজ্ঞতার গল্প। সংসারে যা ঘটেনি, মামা তা বলেন না।

মামা বললেন, "বেঙ্গলি মেইগ্যাস বলতে বাংলার এই জাদুকর-গোয়েন্দা ছিল পেশায় খেয়াদার পাটনি। ভৈরবের যে ত্রিমোহনী ঘাট, সেই ঘাটে খুঁটোবাঁধা একখানা ডিঙি ছিল গুণিলালের সম্বল। চরের জমি থেকে পাকা ধান আঁটি বেঁধে ওই ডিঙি করে পারে নিয়ে যেত গেরস্তরা, তা ছাড়া মানুষ-ছাগল-মুরগি সব ওই ডিঙি করেই পারাপার হত। গুণীর খেয়ায় চড়লে পয়সা দিতে হত না, দিতে হত যান্মাসিক পাঁজা।

"পাঁজা কী মামা?" প্রশ্ন করলাম।

মামা রুমালে নাকের ডগা রগড়ে পকেটে রুমাল ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, "কথাটা হচ্ছে পাঞ্জা। হাতের পাঞ্জা যাকে বলে, এখানে ধরতে হবে মুঠোয় করে যতটা ধরা যায়, তাই হচ্ছে পাঞ্জা বা পাঁজা। মুঠোয় যতটা সামগ্রী উঠল, ধান-গম-ছোলা-পাট তাই দিয়ে দাও গুণিলালকে। আসলে একমুঠো না দশ-বিশ মুঠো, সেটাই ধর্তব্য। ধান-পাটের সময় ধান-পাট, রবিখন্দের সময় ছোলা-গম—ছ'মাস অন্তর। মানুষ গুণীকে সাধ্যমতো দেবে, মুঠোভরে দেবে। তাই বলে, গুণীকে ভিক্ষে দিচ্ছ ভেবো না, সে তোমার ফসল পার করেছে, তোমাকে খেয়া দিয়েছে। তুমি তার ডিঙি করে ফসলের মাঠে গেছ, হাটে গেছ, মকদ্দমা করতে শহরে যাবে, ত্রিমোহনী পার হয়ে গঞ্জের সদরে বাস ধরবে, তার আগে ঘাটপারে যাবে, গুণীই তোমার পাটনি। দশ হাতা পাট, পাঁচসেরি হেটোর ভর্তি ধান তুমি অন্তত দেবে, চৈতালি ফসলও দেবে হেটো মেপে।"

"হেটো কী মামা?"

"তা-ও জানো না! বেতের বোনা এক ধরনের পাত্র।"

pathagar.net

'ও, আচ্ছা।”

“সবাই তো আর পাঁজা দেওয়ার ক্ষ্যামতা রাখে না। যারা দেবে না, তারা কি ঘাট পারে যাবে না? যাবে। তারা হল ফ্রি-সার্ভিসের প্যাসেঞ্জার। গুণীর হিসেব ছিল, সে সকলের কাছে পাঁজা চাইত না।” বলতে বলতে মামা আবার একদণ্ড চুপ করলেন।

আবিরমামা তারপর হঠাৎ বললেন, “গুণীর পেশা সম্বন্ধে, না, একে বলে উপজীবিকা, সে সম্বন্ধে সাত কাহন বলা যায়। এই মানুষটাই ছিল আমার ছেলেবেলার গ্রাম্য গোয়েন্দা, থানার দারোগা যা পারত না, গুণী সেই রহস্য ভেদ করতে পারত। খেয়া পারে যায় না, এমন মানুষ গ্রামে নেই। সবারই নাড়িনক্ষত্র জানত গুণী। তা ছাড়া সে ছিল স্বপ্নবিদ। শতডিহার পড়তি জমিদার অম্বরপ্রসাদ ওরফে মধুবাবু পর্যন্ত তার কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইতেন। একবার মধু মজুমদার তাঁর বালাখানায় গুণীকে ডেকে পাঠালেন।”

এতক্ষণে বুঝলাম, গল্প শুরু হয়ে গেছে। মামা বললেন, “মধুবাবু গুণীকে ডেকে কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, শোন গুণিলাল, আমার মনে হচ্ছে, তোকে একটিবার বাটি চালান করতে হবে বাবা। চোর লেগেছে। আমার হরিণ-ঘর থেকে শিং চুরি যাচ্ছে। বাঘের চামড়া পর্যন্ত চোট হয়েছে। স্বপ্ন দেখলাম, আমি মরে গেছি। মরে গিয়েও নিস্তার নেই, মরে গিয়েও আমার দৃষ্টি বেঁচে রইল, দেখলাম, গুপ্তঘরের দেওয়াল থেকে পয়জন টেস্টিং ডিশ কে একজন পেড়ে নামাচ্ছে। পি.টি. ডিশ চলে গেলে ডোরা বাঁচবে কী করে? তুই দয়া করে পারসি বাটি চালিয়ে দে গুণী! আমি তোকে এই এত পাঁজা দেব, উপরি পাবি।”

“বাটি চালান কী জিনিস? পি.টি. ডিশ?” চুনোর কান বিস্ময়ে খাড়া হয়ে উঠেছে।

চুনোর কানের দিকে চেয়ে মামা বললেন, “দাঁড়া সব বলছি। আগে মধু মজুমদারের কথা শুনে গুণী কি ডায়ালগ দিলে, বলে রাখি। বললে, বাটি চালিয়ে অর্থ-সামগ্রী নিতে পারব না বাবু। গুরুর মানা আছে। মন্ত্রসিদ্ধি করে বাঁটি হাঁকে, মাগনা তো চলে না, ধাক্কা দিয়ে চালানো পাপ, বাটি চলে বশীকরণে, মন্ত্রে। ওই যে গাছের শিকড়, ওই হচ্ছে ড্রাইভার। আপনি বুঝবেন বাবু, খাবারে বিষ পড়লে ডিশ ফেটে যায়, বাটির পেটে শিকড় রাখলে বাটি মাটির ওপর দিয়ে চলতে শুরু করে। একে বলে আজ্ঞে দ্রব্যগুণ।”

চুনো বোধ হয় বাটি চালানের ম্যাজিক খানিকটা অনুধাবনের চেষ্টা করছিল। সে কল্পনা করছিল, একটি অদ্ভুত ধরনের দুধ-কাঁসার বাটি মাটির ওপর দিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর পাঁচ আঙুলে ভর দিয়ে একটি হাত। গুণীর হাত। বাটির পেটে কিসের একটা শিকড়।

মামা বললেন, “গল্পটা এবার আমি গুণীর হাতে ছেড়ে দেব। সে যেমন করে পারবে চালাবে।

“অম্বরপ্রসাদের কাছে পৌঁছতে অনেক ঘর এবং সরু বারান্দা পার হয়ে আসতে হয়। ঘরের ভেতরে ঘর, ঘরের এক মস্ত গোলকধাঁধা। ডাকাত পড়লে, তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। প্রাসাদটা যেন একটা দুর্গ। মেয়েরাই ডাকাতদের আড়াল থেকে অতর্কিতে বঁটিকাটা করতে পারে। ফলে জমিদার বাড়িতে ডাকাত পড়ার ঘটনা নেই।

কিন্তু হরিণ-ঘর থেকে বাঘ-হরিণের চামড়া এবং হরিণের প্রশাখাময় শিং চুরি গেল কী করে! হরিণ-ঘরটা কোথায়?

"গুণী বলল, আপনি স্বপ্নে মারা গেলেন বাবু! আপনার দৃষ্টি মরল না। হরিণ-ঘরের দেওয়াল থেকে পি.টি. ডিশ পেড়ে নামানো হচ্ছে, দেখতে পেলেন! তা হলে চলুন, হরিণ-ঘরে গিয়ে দেখি ক'টা জিনিস চোট হয়েছে।"

"আমি কি তা হলে বাঁচব না গুণিলাল?" ককিয়ে জানতে চাইলেন মধুবাবু।

"কেন বাঁচবেন না বাবু! স্বপ্নের মধ্যে মরতে পারলে আয়ু বৃদ্ধি। তবে স্বপ্নে মৃতাবস্থায় দৃষ্টি সজাগ থাকলে অঘটন ঘটে, লাশ যা দেখে তার অনেক কিছুই ফলে যায়। আপনি ডিশ নামাতে দেখেছেন, ডিশ তা হলে নেমে গেছে।"

"গুণিলাল এক দফা কথা শেষ করেই ভয়ঙ্কর কুকুর ডোরার মুখের দিকে বাঁকা-তেরছা দৃষ্টিতে চেয়ে একটা ঢোক গিলল। বুকের ভেতরটা তার গুড়গুড় করে উঠল।

"গুণিলাল বুঝতে পারছিল বাবুর খাটের বিছানায় পড়ে থাকা লম্বা ত্যানার মতো ডোরা আসলে ত্যানা নয়, খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালে পিলে চমকে যাবে। বাঘের মতো ঘ্রাউ করে গা মোচড়ায়, চোখ দু'টো ধকধক করে জ্বলছে।

"ঘরের দরজায় ঝুলছে ভারী পরদা। জানলা-কপাট বন্ধ। কোথা থেকে ক্ষীণ রেখার আলো এসে মেঝেয় পড়ে দিনের বেলাতেও ঘরের অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে তুলেছে। এই আঁধারে এসে দাঁড়ালে গা কেমন ছমছম করতে থাকে। মেঝেয় চোখ পড়ল গুণিলালের। সে বেশ অবাক হয়ে দেখল, একখানা ডিশ দু'ভাগ হয়ে ভেঙে পড়ে রয়েছে, সেখানে খাবার ছড়ানো। গুণী বুঝতে পারল, ডিশের খাবারে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

"মধুবাবু বললেন, 'ডোরা ঘাড় নামিয়ে খেতে যাবে, এমন সময় ফট করে ফেটে গেল।'

"গুণী গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, 'খেতে কে দেয়?'

"লবঙ্গ। প্রায় এক যুগ আমার সংসারে আছে। খুবই করিৎকর্মা। ভারী বিশ্বাসী মেয়ে। ডোরা ওর হাতে ছাড়া খায় না। আমার নির্দেশ আছে, লবঙ্গ ছাড়া কেউ যেন ডোরার খাবার বেড়ে না দেয়। বাড়ির বউদের পর্যন্ত এক্তিয়ার নেই। কোনও পুরুষ ওকে খেতে দেবে না। এক টুকরো বিস্কুট অবধি না।"

"লবঙ্গই খেতে দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। কাজের মেয়ে লবঙ্গ। বারো বৎসর আমার হেঁসেল ঠেলছে। আমার সৎ ভাই বিষ্টু মজুমদার, যাকে লোকে হাবিলদার বলে জানে, সন্ন্যেসি গোছের মানুষ, পুব পাড়ার ডিহিতে থাকে, ওইই তো এই লবঙ্গকে জোগাড় করে এনেছিল। কথা হচ্ছে, লবঙ্গ বিষ মেশাবে, প্রত্যয় হয় না গুণিলাল।'

"আপনি তা হলে কাকে সন্দেহ করছেন?' গুণিলালের প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে খাটে হেলান দিয়ে বসে রইলেন মধু মজুমদার। তারপর ডোরার গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'সন্দেহ কাকে করব? ডিশ ফেটে গেল দেখে লবঙ্গ ভয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। বেলা গড়িয়ে গেছে, এখনও বেচারি খায়নি, মুখ শুকনো করে বসে আছে। ডোরাকে ভালও তো বাসে। বউগুলি তো রীতিমত স্তম্ভিত। কে কী করল বুঝেই পাচ্ছি

না। তবে সন্দেহ নেই, ডোরাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। ও মরলে, আমিও মরব। চল তোকে হরিণ-ঘরটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।' বলে খাট থেকে গা তুলে উঠে দাঁড়ালেন অম্বরপ্রসাদ।

"প্রসাদ জমিদার উঠে দাঁড়াতেই ডোরাও খাটের ওপর উঠে দাঁড়াল, গা ঝাড়া দিল। গা ভর্তি বড় বড় সোনালি লোম, এত লোমশ কুকুর গুণী কোনও কালেই কোথাও দেখেনি। দেখেই মনে হয় স্বপ্নের কুকুর, যেন কোনও ম্যাজিকগুণে জন্ম নিয়েছে।

"কিন্তু পরদার তলায় মিলিটারি বুটপরা দু'খানি পা দেখে আঁতকে উঠল গুণিলাল। 'ও কে?' বলে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। তখনই পরদা ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল হাবিলদার। তাগড়াই চেহারা। বাড়ি থেকে পালিয়ে মিলিটারিতে যোগ দিয়েছিল। ফিরে এসে আধা-সন্ন্যেসি হয়ে গেছে। মধুবাবুর কাছে পড়তি জমিদারির অংশ দাবি করেনি, বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে উদাসীন। একলা থাকে, বিয়েথা করেনি। এই মানুষটি এখনও গ্রামের পথে একাকী প্যারেড করে বেড়ায়, প্রতিটি ধাপ এত নিখুঁত মাপের যে, চোখে না দেখেও পথ দিয়ে যথাস্থানে চলে যেতে পারে। হাবিলদার আসলে ইদানীং অন্ধ। শোনা যায়, যুদ্ধে গিয়েই নাকি চোখে চোট পেয়েছিল। ধীরে ধীরে চোখের আলো নিভে গেছে। বছর দুই আগেও নাকি ঝাপসা দেখত। লেফ্‌ট-রাইট করতে করতেই ঘরের গোলকধাঁধা পেরিয়ে এই অবধি চলে এল আজ। তাজ্জব মানুষ। সন্ন্যেসিই নয়, আধা পাগলও বটে।

pathagar.net

"ঘরের ভেতরে ঢুকে এসে হাবিলদার বলল, 'লবঙ্গকে কি আমি নিয়ে যাব দাদা? বিষ দিক না দিক, কোনও মানুষই যখন সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়, তখন ওকেও এখানে রাখা ঠিক হবে না। আমিই ওকে কাজ দিয়েছিলাম, আমি না দিলে, তুমি নিতে না। অতএব লবঙ্গ চলে যাক।' বলে অন্ধ মানুষটা চোখ পিটপিট করল বারকতক।

"মধুবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমি তো ওকে কোনও সন্দেহ করিনি বিষ্টু, তুই কেন খামোকা গরম হচ্ছিস।'

"না, এটা আমার প্রেস্টিজ খানিকটা, কারণ আমিই ওকে দিয়েছিলাম। দ্যাখ, আমাদের জমিদারি প্রায় ফৌত হয়ে গেছে, কিন্তু ঠাটবাট তো যায়নি। গণ্ডাগণ্ডা কাজের লোক, উঝি, কে কী সরিয়ে নিয়ে পালাবে বলা যাচ্ছে না। আমি চাইব, লবঙ্গ বিশ্বাসী, সে বিশ্বাস রেখে চলে যাক। কী বল, গুণিলাল?'

"গুণিলাল বুঝল, সে যে মধুবাবুর কাছে এসেছে, তা কিন্তু গোপন নেই। মধুবাবু বললেন, 'তোর প্রেস্টিজ আবার খুব ঠুনকো বিষ্টু। তুই লবঙ্গকে দিয়েছিস তো কী হয়েছে! আমি ওকে অবিশ্বাস করিনি। কেন করব, ওই তো ডোরার আপন।"

"হাবিলদার এবার কিছুটা নরম হয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, লবঙ্গকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে এখান থেকে 'আউট' করতে পারলে কারও হয়তো সুবিধে হয়।"

"ঠিক বলেছিস বিষ্টু। আমারও তাইই মনে হয়েছে।"

"আচ্ছা দাদা, স্কুলের ডোনেশনের ব্যাপারে কী ভাবলে! দ্যাখো, এটাও কিন্তু প্রেস্টিজ। আমি পাগল-সন্ন্যেসি-হাবিলদার যাইই হই, লোকে স্কুলের জন্য চাঁদা

চাইলে...যাকগে, আমিও কিন্তু জমিদার, আমি তোমার ভাই। আমার মর্যাদা গেলে, তোমারও থাকবে না। আমি আমার ভাগ থেকে ডোনেট করব। কখনও তোমার কাছে কিছুই চাইনি।"

"বেশ, বেশ। দেব তো বলেছি।"

"কবে!"

"আগে বাটি চলুক, তারপর।"

"ওহ্, চোর ধরবে! দ্যাখো গুণী ভুল লোকের পায়ে যদি বাটি লাগাও, আমি তা হলে তোমাকে ছাড়ব না। বন্দুক হাতে করে সিধে চলে যাব। তোমাকে ডিঙির ওপর গিয়ে গুলি করে আসব। আমি সব দেখতে পাই, পা, আমি পা দিয়ে দেখি।' বলে বুটের প্যারেড করে শব্দ তুলে হাবিলদার চলে গেল।

'পাগল!' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অম্বরপ্রসাদ।

"তা দেখে গুণী বলল, 'হাবিলদার কিন্তু পাগল নয় বাবু। ওর ভাগ ওকে হিসেব করে দিয়ে দেন। খুব গরম, গুমোর আছে। চলুন, হরিণ-ঘরটা দেখি।'

"হরিণ-ঘরে এসে দেখা গেল, দেওয়ালের দু'টি স্থান ফাঁকা। ডিশ নেই। একখানা ডিশ ফেটে গেছে, দু'খানা চুরি হয়েছে। শিং এবং ছালও কিছু চোট হয়েছে।'

"ডোরা আমার বডিগার্ড গুণী। ওর কাছে আমার সিন্দুকের চাবি আছে!' বলে দরজার দিকে চাইলেন মধুবাবু। মনে হল, পরদার ওপারে কিসের একটা ছায়া সরে চলে যাচ্ছে! ঘর ছেড়ে দ্রুত বাইরে ছুটে এল গুণিলাল। দেখা গেল, ছোটবউ একটা ঝাড়ন হাতে চলে যাচ্ছে, তার সম্মুখে কেউ হয়তো ছিল।

"গুণিলাল ভয় পাচ্ছিল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, এই প্রাসাদে চোর ঢুকেছে। ডোরাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা চলেছে। ডোরার কাছে চাবি আছে, কিন্তু কীভাবে সেটা আছে, কোথায় আছে, ভেবে পাচ্ছিল না জাদুকর।

"দিনসাতেকের মধ্যেই পি.টি. ডিশ সমস্ত চোট হয়ে গেল। একদিন ঘোর সন্ধ্যার মুখে অন্ধ হাবিলদারকে কারা মুখোশ পরে বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটিয়ে কোথায় নিয়ে গেল। প্রাসাদে ডাক পড়ল গুণিলাল পাটনির। সে এসে পৌঁছতেই মধুবাবু বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে গুণী। তুই শিগ্‌গির বাটি চালিয়ে দে বাবা। ডোরার পায়ে লোমের তলায় ডোর দিয়ে বাঁধা সাঙ্কেতিক চাবি ছিনতাই হয়েছে। ক'দিন আমিই ওকে খেতে দিয়েছি। পি.টি. ডিশ নেই। এ ঘরে কে কখন ঢুকল বুঝতে পারছি না। ডাকাতরা বিষ্টুকে সাবাড় করে দিত, কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচেছে। কী হবে গুণিলাল?'

পাটনি শান্ত গলায় বলল, 'আপনি একবার লবঙ্গকে ডাকুন।'

লবঙ্গ এল।

গুণী বলল, 'বউদের ডাকুন।'

বউরা এল। ভাইরা এল। কাজের লোকরা সব এল। হাবিলদার পর্যন্ত এল।

পাটনি হাবিলদারকে প্রশ্ন করল, 'কারা ওরা?'

'কারা?'

'ওই যে আপনাকে বন্দুক উঁচিয়ে নিয়ে গেল।'

'কী করে বলব? চোখে তো দেখি না।'

"কোনও প্রশ্ন করেননি?"

"হাঁ, তারা বলেছে, সরিষাপুরের ডাকাত।"

"বেশ। আপনার কাছে কী চাইল?"

"চাবি। কিন্তু আমি কোথায় পাব বল! মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে ডাকাত পড়বে। দাদা, তুমি আজই লবঙ্গকে বিদায় করো।"

"হঠাৎ গুণী বলে উঠল, 'কাল ভোরে বাটি চালান হবে। গাঁয়ে ঢেঁড়া দিন জমিদারবাবু। আমার মনে হচ্ছে চাবিটা পাওয়া যাবে।"

"কথা শেষ করেই পা বাড়ায় গুণিলাল। প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে বালাখানায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ সে পুনশ্চ উক্তি করে, 'লবঙ্গকে বিদায় করবেন না বাবু। ওকে একবার ফের ডাকুন তো!"

"কথা বলবে?' মধুবাবু জানতে চান।

"গুণী বলল, 'একটা কথা বলে যাই। আচ্ছা বাবু, চাবিটা দেখতে কেমন?'

"অম্বরপ্রসাদ বললেন, 'গোল চাকতি মতন। সরু আর শক্ত লাল আংটা বাঁধা। চাকতির গায়ে সংখ্যা আর সঙ্কেত লেখা আছে। যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে সংখ্যা-সঙ্কেত মিলিয়ে সিন্দুকের তালা ঘোরাতে হবে।'

"'থাক, আর বলতে হবে না। আচ্ছা ডোরাকে চান করাতো কে? আপনি? স্নানের সময় চাকতি ডোরার সোনালি লোমের ভেতর থেকে ডোর খুলে বার করা হত? ডোরাকে খাওয়ানোর সময় গায়ে হাত বুলিয়ে দিত কে? আপনি?'

"'না, লবঙ্গই দিত।'

"'লবঙ্গকে ডাকুন।'

"লবঙ্গ ভিড় ঠেলে সম্মুখে এল। তাকে দেখেই গুণী বলে উঠল, 'তুমি এক সন আগে আমার ডিঙি করে পার হয়েছ লবঙ্গ। তারপর এই সাতদিন আগেও একদিন সরিষাপুর গেলে? যাওনি?'

"মধুরকুল গেলাম। মায়ের কাছে একবেলার জন্যে।"

"সরিষাপুরে কে আছে তোমার?"

"আমি মধুরকুলের মেয়ে।"

"তুমি কিন্তু সরিষাপুরে গিয়েছিলে। যাওনি? ঠিক আছে, কাল তোমার সঙ্গে কথা হবে, তুমি তা হলে লবঙ্গ নও?"

"সে কী গুণিলাল! আমিই আমি নই! তোমার কি মাথা খারাপ হল গুণিলাল! তুমি মানুষকে এতদূর অপদস্থ করতে পারলে! হায়, মানুষকে মানুষ গণ্যি করে না। তুমিই কিনা বাটি চালিয়ে মানুষ ধরবে! দেখুন হাবিলদারবাবু, কী বলে লোকটা! হায় হায় রে! আমি কোথায় যাব কী করব!' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল লবঙ্গ। ছাতা হাতে গুণীকে মারবার জন্য তেড়ে এল বিষ্টু মজুমদার। মধুবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'বিষ্টু, ঘটনা সন্দেহজনক। কথা বার করবার জন্য সত্যমিথ্যা জেরা করে মানুষ। গুণী বললেই লবঙ্গ কিন্তু দারুচিনি হয় না। তুমি সংযত হও, ছাতা নামাও!' দাদার ধমকে বিষ্টু নিরস্ত হল।

pathagar.net

"পরের দিনই হাটে ঢোলশহরত হল। সমস্ত দিগরের মানুষ জেনে গেল, শতডিহার ফৌত জমিদার মধুবাবুর বালাখানায় বাটি চালিয়ে চোর ধরা হবে। চাই কি ডাকাতও ধরা পড়তে পারে।

"তল্লাটের মানুষ ভেঙে পড়ল গুণিলালের বাটি চালান দেখতে। গুণিলাল কেবলই ভাবছিল অন্ধ মানুষ হাবিলদার ওরফে বিষ্টুবাবু কী করে তার মাথায় ছাতার বাঁট তুলে মারতে গেল? বিষ্টু মজুমদার কি দেখতে পায়? এ প্রশ্ন গুণী করেনি। মনে মনে ভেবেছে।

"বালাখানা লোকে লোকারণ্য, বালাখানা উপচে জনস্রোত পথ পর্যন্ত সার বেঁধে দাঁড়িয়ে—গুণী প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার কাঁধের থলেতে পার্শি বাটি রয়েছে। রয়েছে বাটি চালানের শিকড়।

"শিকড় রাখা হল বাটির পেটে। আঙুল দিয়ে বাটির ওপর ভর দিল গুণিলাল। এবার বাটি এগোবে। থানা থেকে দারোগাও তাঁর দলবল নিয়ে এসে মানুষের স্রোত ঠেকিয়ে রেখে গুণীর কাজের সুবিধে করে দিচ্ছেন। এই বাটি মাটির ওপর দিয়ে ঘষে ঘষে এগিয়ে যাবে। অপরাধীর পায়ের কাছে এসে থামবে।

"বাটি চলতে শুরু করল। ডোরা এগোচ্ছে গুণীর পিছু পিছু। যেন সে-ও চোর ধরতে বার হয়েছে। যেন সে বুঝতে পারছে, তার লোমের তলে লুকনো চাবিটা গাপ হয়েছে। তাকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে। সে মরলে, মধুবাবুও আর বাঁচবেন না।

"ডোরা এক সময় গুণীর কানের কাছে মুখ ঠেলে এনে বলল, 'তুমি কী করে বুঝলে লবঙ্গ আসলে লবঙ্গ নয়, অন্য কেউ? আমি তো গন্ধ শুঁকে ধরেছি। বলো তো, লবঙ্গর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেচারিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিই, বলি, তুমি কে গো?'

"গুণী বলল, 'দাঁড়া, ডোরা। গন্ধ শুঁকে ধরলেই তো হবে না, অকাট্য প্রমাণ দিতে হবে। আগে বাটিটা লবঙ্গর পায়ে গিয়ে পৌঁছুক। লোকে দেখুক, কীসে থেকে কী হচ্ছে!'

"সত্যি-সত্যিই লবঙ্গর পায়ের কাছে এসে বাটিটা থেমে গেল। লবঙ্গ তো ভয়ে কাঠ হয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। আজ কিন্তু বিষ্টু মজুমদার অন্ধেরই মতন চুপ করে রইলেন।

'গুণী বলল, 'আমি গুণিলাল পাটনি, খেয়া দিই ত্রিমোহনী ঘাটে। তুমি কি ঘাট পারে যাও?'

"'না।' বলে উঠল লবঙ্গ।

"'আচ্ছা বেশ। তুমি কে?' প্রশ্ন করল গুণী।

"উত্তর এল, 'লবঙ্গ।'

"'তোমার চোখ ক'খানা?'

"'দু'খানা। দুইটা চোখ। তুমি কি কানা নাকি?'

"'বেশ। কান দুটি?'

"'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

"সবাই দুইটা-দুইটা? হাত দু'খানা? জবাব দাও।'

"'কী দিব? আমি কি দুর্গা? আমি লবঙ্গ। দুইটাই হাত, দশখানা পাব কোথা?'

"'পা?'

"তা-ও দুইখানা। সবাই দেখছে।'

"'পিত্যেক হাতে কয়টা আঙুল?'

"'পাঁচ।'

"'পায়ে? ডান পায়ে কয়টা আঙুল?'

"পাঁচ। তুমি মশকরা করছ গুণিলাল!'

"'না। বাঁ পাখানা দেখাও। কয়টা আঙুল? শাড়ির তলা থেকে বার করো পা।'

"হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল গুণিলাল, 'পা দেখাও। বার করো। দেখি কয়টা আঙুল। খেয়াপারে এই পা আমি দেখেছি। তুমি লবঙ্গ নও। এই দেখুন, বড়বাবু। আসুন, বাঁ পায়ে ছয়টা আঙুল। এ লবঙ্গ নয়। এর নাম দারুচিনি। লবঙ্গ-দারুচিনি দুই বোন। যমজ। অবিকল এক দেখতে। পার্থক্য শুধু আঙুলে।'

"থানার বড়বাবু ছুটে এসে বাঁ পা বাড়িয়ে ধরা দারুর আঙুল দেখলেন। বাস্তবিক ছ'টা আঙুলই বটে। মধুবাবুও দেখলেন এবং শিউরে উঠলেন।

"জমিদারবাড়ির বধূরা আঙুল দেখে হতবাক। গুণিলাল বলল, 'এক সন আগে, এই দারুই ঘাট পারে যাওয়ার সময় বলেছিল, তার পায়ে ছ'টা আঙুল। কারণ নৌকায় ওঠার সময় আমি সেই পা দেখে ফেলি। দারু বলেছিল, তার এক বোন মধুরকুলে থাকে। তার পাঁচটাই আঙুল। আমি থাকি সরিষাপুরে। পায়ে তফাত, গায়ে মুখে এক। সাতদিন আগে লবঙ্গ জমিদারি ছেড়েছে। নৌকায় উঠে বসলে, আমি তার বাঁ পায়ে লক্ষ্য করি, পাঁচটাই আঙুল। সকালে গেল লবঙ্গ, বিকেলে এক দারু। আচ্ছা, আপনি কি এ-ঘটনা জানতেন বিষ্টুবাবু!' বলেই বাটির দিকে চাইল গুণিলাল। বাটি নড়ে উঠল।

"বাটি নড়ে উঠে চলতে শুরু করল। দ্রুত বেগে ধেয়ে এসে হাবিলদারের পায়ের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"'চাবিটা আপনার কাছেই আছে হাবিলদারবাবু। দিয়ে দেন। দারু আপনাকে সঙ্কেত-চাবি দিয়েছে। সিন্দুকের আশরফি মোহর আপনি আত্মসাৎ করতে চান।'

"'না। চাবি আমার কাছে নেই গুণী। ডাকাতরা নিয়ে গেছে।'

"'চাবি আপনার কাছে ছিল?'

"চুপ করে রইল বিষ্টু মজুমদার। মধুবাবু এগিয়ে এলেন, 'শেষে তুই ডাকাতি করলি বিষ্টু? চাইলে কি আমি দিতাম না?'

"'না, তুমি কিছুই দিতে না দাদা। আমি বাধ্য হয়ে দারুকে লাগিয়েছিলাম। কিন্তু চাবি আমার কাছে নেই। সরিষাপুরের ডাকাতরা নিয়ে গেছে। চল দেখাচ্ছি, কোথায় ঠেলে নিয়ে গিয়ে চাবি কাড়ল। ধাপ গুনে যাব। আসুন ও.সি সাহেব, ডাকাতদের আস্তানা দেখবেন।'

"হঠাৎ গুণী প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বিষ্টুবাবু! দারুকে আপনি সরিয়ে দেওয়ার জন্য এত পেড়াপিড়ি করছিলেন কেন?'

"'কেন করব না! যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। চোরের ওপর বাটপাড়ি হয়েছে। আমাকে চড় মেরে চাবি কেড়ে নিয়েছে দারুর লোকেরা। কী ভুলই না করেছি দাদা।

তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি অত্যন্ত নীচ, লোভী।' বলে অন্ধ বিষ্টু মধুর পায়ে পড়ল।

অন্ধ হাবিলদার চলেছে ডাকাতদের আস্তানা দেখাতে। ধাপ গুনে তার কাজ। পুবে এত ধাপ, দক্ষিণে এত ধাপ, পশ্চিমে এত এবং উত্তরে এত। এভাবে পৌঁছানো গেল পুরনো জমিদারির বাগানে। ধাপ গুনে একটি মস্ত কোটরঅলা কাঁঠাল গাছের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বিষ্টু।

"বিষ্টু বলল, 'এখানে খুঁজে দেখুন। এখানেই কোথাও পি.টি. ডিশ হয়তো লুকনো আছে। ডাকাতরা আমাকে মেরে চাবি কেড়ে নিল।'

"কোটরে কী আছে! পুলিশ সেখানে উঠে পি.টি. ডিশ পেড়ে নামিয়ে আনল। চাবি সেখানে নেই।

"জনস্রোত বাগান অবধি এসেছিল। একজন পুলিশ দারুকে বাগান পর্যন্ত পাকড়ে টেনে এনেছিল।

"গুণিলাল দারুকে বারবার জেরা করতে লাগল—'বল, কোথায় চাবি?' দারু মড়াকান্না কাঁদতে লাগল, কিছুই বলতে পারল না। কেবলই একটা কথা তার মুখ দিয়ে বার হচ্ছিল, 'লবঙ্গ আমাকে বলেছিল, ডোরাকে খেতে দিয়ে বারবার গায়ে হাত বুলিয়ে দিবি, নইলে বেচারি খেতে চাইবে না। লবঙ্গর দোষ নেই দারোগাবাবু। হাত বুলাতে গিয়ে চাবিটা হাতে ঠেকল গুণিলাল। না হলে পাপ হয় না।'

'মধু মজুমদার চরম আশ্চর্য হয়েছেন। বললেন, 'এই ডিশ তুইই সরিয়ে রেখে কাজ ফতে করলি দারু? কে জানত, লবঙ্গ-দারুচিনি দুই বোন, যমজ। আঙুলের তফাত। দে দারু, চাবি দে।'

"কোথা থেকে দেবে দারুচিনি! বাগান থেকে ফিরে যাচ্ছিল জনস্রোত এবং পুলিশ। হঠাৎ পেছনে দেখা গেল, ডোরা বিষ্টুর ওপর মারাত্মক তেজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিষ্টুর জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন করে দিল। আঁচড়ে দিল নখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে চিবিয়ে দিল। দেখতে দেখতে অর্ধনগ্ন বিষ্টুর কোমরে ডোরে বাঁধা লাল আংটার সাঙ্কেতিক চাবি চোখে পড়ে গেল। হাবিলদার পালাচ্ছিল, তার পালানোর ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল, লোকটা অন্ধ নয়।

"মধুবাবুর পায়ে তখনও ধরে পড়ে আছে দারু। ডুকরাতে ডুকরাতে বলে চলেছে, 'লবঙ্গর কোনও দোষ নাই বাবু! ওকে তাড়িয়ে দিও না, ভালবেসেও মানুষ কুকুরের গায়ে হাত বোলায় জমিদারবাবু। লবঙ্গ কিছু জানে না গুণী!' গুণী বলল, 'বাটির শেকড়েও সে-কথা লেখা আছে দারুচিনি।'"

রাতের আগন্তুক

আল কামাল আবদুল ওহাব

শেষ পর্যন্ত চাকরিটা পেয়ে গেল সায়ীদ। টিকিট কালেক্টরের কাজ। ছোট্ট চাকরি। সায়ীদ কিন্তু এতোটাও আশা করেনি। ইন্টারভিউ কার্ডখানা হাতে পাওয়ার পর ওর মাঝে মাঝে কেন জানি মনে হয়েছিল—হয়তো বা চাকরিটা হয়েও যেতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে হবেই এমন আশা সে কখনো করেনি। তবুও শেষ পর্যন্ত চাকরি হয়ে গেল। টিকিট কালেক্টরের কাজ। এই দুর্দিনের বাজারে সেও কি কিছু কম!

চাকরিটা পেয়েই সায়ীদকে চলে আসতে হয়েছিল বাড়ি থেকে অনেক দূরে উজানতলীর ছোট্ট স্টেশনে। বাড়ির বাইরে উজানতলী স্টেশনে সবাইকে ছেড়ে তাকে একা একা থাকতে হবে—এও যেন একদিন চাকরি পাওয়ার মতোই অবিশ্বাস্য ছিল সায়ীদের কাছে।

উজানতলী স্টেশনের পরেই মাঠ। মাঠের শেষে গাঁয়ের শুরু। সুন্দর সাজানো-গোছানো গ্রাম। দেখলে মনে হয় একদিন এ গাঁয়ের জৌলুস ছিল। একঘর প্রতাপশালী জমিদারও না-কি এ গাঁয়ে অতীতে কোনও এক সময়ে বাস করতেন। স্টেশনের অদূরে

ইট-পাথরে গাথা ভাঙা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। গাঁয়ের পথে ছেয়ে আছে আম, কাঁঠাল আর নারকেল গাছের সারি। মন ভোলানো পরিবেশ। এরই প্রান্তে জনবিরল ছোট্ট স্টেশনে—উজানতলী। যাত্রীরা বড় একটা ভিড় করে না এ স্টেশনে। কেবল নবাবগঞ্জের হাটের দিন যা একটু ভিড় হয় এখানে। সেও মাত্র সপ্তাহে দু'দিন। হাটুরে যাত্রীরা আসে, চলে যায়—আবার তারা ফিরে এসে মাঝরাত বরাবর মেল-ট্রেনটা ধরে। এদের প্রায় সবাই বিনা টিকিটের যাত্রী। সায়ীদ অবাক হয়ে ভাবে—সরকারকে ফাঁকি দিয়ে ট্রেনে চলার একি অশুভ প্রচেষ্টা! সে মাঝে মাঝে বেপরোয়া হয়ে ওঠে ওদের ধরার জন্য। পয়েন্টম্যান নীরু মিয়া বাধা দিয়ে বলে,—এমন দুঃসাহসিক কাজ করবেন না সাহেব। বাইরে থেকে নতুন এসেছেন, কিছুই তো আর জানেন না। কেন ইচ্ছে করে নিজের বিপদ ডেকে আনতে যাবেন।

সব দেখে-শুনে নীরব হয়ে যায় সায়ীদ। ছোট্ট স্টেশনে। তারা মাত্র দু'-তিনটা প্রাণী সেখানে। স্টেশন-মাস্টার, সায়ীদ, পয়েন্টম্যান আর সিগনালার—এই তিন-চারজনকে নিয়েই উজানতলী স্টেশনে। রাতের অন্ধকারে মেল-ট্রেনটা যখন আসে তখন আবার স্টেশনে-মাস্টার ঘুমিয়ে থাকেন। শোবার আগে সায়ীদকে বলে রাখেন,—ইয়ংম্যান তুমি। একটু কষ্ট করো—কেমন?

সায়ীদ প্রত্যেক দিনই কষ্ট করে। ঘুম-কাতুরে স্টেশনে-মাস্টারকে মাঝরাতে জাগাতে তারও যেন ভাল লাগে না। কি লাভ তাকে শুধু শুধু জাগিয়ে। এক হাটবার ছাড়া যাত্রীরা এখানে বড় একটা ওঠে-নামে না। মেল-ট্রেন থামবার মতো স্টেশনও এটা নয়। অতীতে হয়তো বা জমিদার শহীদ চৌধুরীর সম্মানে ছোট্ট উজানতলী স্টেশনে মেল-ট্রেন থামবার একটা রীতি প্রচলিত হয়েছিল। আজও হয়তো সে রেওয়াজটাই চলে আসছে।

সেদিন ছিল নবাবগঞ্জের হাট। অনেক রাতে মেল-ট্রেনে হাটুরে যাত্রীরা ফিরে এলো। প্রত্যেক দিনের অভ্যেস মতো গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো সায়ীদ। যাত্রীদের কাছে টিকিট চাইলো। কেউবা টিকিট দিলো আবার কেউবা দিলো না। কেউবা পিছনের যাত্রীদের দেখিয়ে দিয়ে মনের আনন্দে চলে গেল গাঁয়ের পথ ধরে। বাসায় ফিরতে গিয়ে কেমন যেন ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো সায়ীদ। এতোগুলো যাত্রী বিনা টিকিটে এলো আবার চলেও গেল। তার কি কিছুই করার ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সে কিছুই করতে পারলো না কেন? নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে করে সায়ীদ।

সেদিন বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করলো সায়ীদ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো—এবার কাউকে বিনা টিকিটে পেলে সে নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষের নিকট হ্যাণ্ডওভার করে দেবে। তারপর দেখা যাবে কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। সায়ীদ মনে মনে প্রস্তুতি নিতে থাকে।

দু'-তিন দিন পরের কথা। সেদিন অনেক রাতে ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে স্টেশনের গেটে এসে দাঁড়ালো সায়ীদ। আর একটু বাদেই মেল-ট্রেনটা এসে যাবে। অনেক দূর থেকে ইঞ্জিনের করুণ সুর ভেসে আসছে। ঘরছাড়া পথিকের মতো সে যেন এক অনন্ত পথের যাত্রী।

ততোক্ষণ ট্রেনের হেডলাইটের আলো এসে পড়েছে উজানতলী স্টেশনে। এখন ট্রেনটা এসে থামবে সেখানে।

অল্পক্ষণের মধ্যে মেল-ট্রেনটা স্টেশন টাচ্ করে হুইসিল দিতে দিতে আবার চলতে লাগলো। জোছ্নাধরা রাত। সায়ীদ চলন্ত ট্রেনটার দিকে চেয়ে দেখলো কিছুক্ষণ। তারপর এ-দিক ও-দিক তাকিয়েও দেখলো সে। কিন্তু কেউ স্টেশনে নেমেছে বলে তার মনে হলো না। সিগনালার কাদের মিয়া ঘুমঘুম চোখে দূরে চলে যাচ্ছে। তাকে আর ভাল করে চেনাই যায় না। সায়ীদ আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন মনে করলো না। কি যেন একটু ভাবলো সে, তারপর পিছন ফিরে দরজা বন্ধ করতে গেল, কিন্তু পারলো না। কে যেন তাকে দূর থেকে ডাক দিলো,—এই যে সাহেব শুনছেন?

কে? চমকে উঠলো সায়ীদ। অবাক হলো সে—কে কথা বলে! কণ্ঠস্বরটা কোনদিক থেকে এলো তা যেন সে স্পষ্ট কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না। বিস্ময়ে পিছন ফিরে তাকালো সায়ীদ।

এই যে আমি। আগন্তুক এগিয়ে এলো সায়ীদের কাছে। বলল,—দেখুন, এদিকে আমি আগে কোনও সময় আসিনি। পথ-ঘাট কিছুই চিনি না। আপনি যদি একটু সাহায্য করতেন...।

নিশ্চয়ই। কিন্তু কোথায় যাবেন আপনি? আগে যখন আসেননি তখন রাতের বেলা না আসাই ভাল ছিল। আপন মনে কথাগুলো বলে গেল সায়ীদ।

এসেই যখন পড়েছি তখন আর কি করা যাবে!

তা তো বটেই। কিন্তু কোথায় যাবেন সে কথা তো বললেন না? সায়ীদ আগন্তুকের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চায়।

উজানতলী গাঁয়ের জমিদার বাড়িটার ওদিকে।

জমিদার বাড়ির ওদিকে? সায়ীদ একটু অবাক হলো।

বলল,—জমিদার বাড়ি এখন পোড়োবাড়ির মতোই শুনেছি। ও-দিকে বড় একটা কেউ যায় না। আপনি কি করতে যাবেন সেখানে? তাছাড়া এই রাত বেরাতে সেখানে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

না, আমি ঠিক জমিদার বাড়িতে যাবো না। তবে কি-না, ওর কাছাকাছি, মানে ও-দিকেই যাবো। আপনি দয়া করে পথটা একটু দেখিয়ে দিলে খুশি হতাম। লোকটা অকারণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

উজানতলীতে পরিচিত কেউ আছে না-কি আপনার? কতকটা রুক্ষকণ্ঠে জানতে চায় সায়ীদ।

হ্যাঁ, আমার এক মামাতো বোনের বাড়ি। আগে কোনওদিন আসিনি কি-না, তাই যা একটু অসুবিধার মধ্যে পড়েছি।

তা বেশ। সায়ীদ একটু ইতস্তত করে বলল,—ওই তো সামনেই যে ইট ওঠানো রাস্তাটা দেখছেন, ওটা ধরে মিনিট বিশেক হেঁটে গেলে রাস্তার ধারে একটা বড় বটগাছ দেখতে পাবেন। গাছটার গোড়ায় গিয়ে রাস্তাটা ডান হাতে মোড় নিয়েছে। ওখান থেকে ডান হাতে ঘুরে মিনিট দুই চলার পর শুরু হবে জমিদার বাড়ির সীমানা।

ও আচ্ছা, ধন্যবাদ। লোকটা আর কিছু না বলেই রাস্তাটার দিকে এগিয়ে গেল। সায়ীদ অবাক হয়ে গেল লোকটার ব্যবহারে। টিকিট না দিয়েই সে চলে যেতে চাচ্ছে—আশ্চর্য! সায়ীদ কি যেন একটু ভাবলো, তারপর এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। জোছনালোকে তাকিয়ে দেখলো—ময়লা জামা-কাপড়ের মধ্যে উস্‌কো-খুস্‌কো একটা লোক শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে বারবার এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে। সায়ীদের মনে সন্দেহ হলো—লোকটা নিশ্চয়ই বিনা টিকিটে এসেছে। সে এবার সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো,—আপনার টিকিট?

কিন্তু কি আশ্চর্য, লোকটা কোনও কথা বলল না—বা বলার প্রয়োজনও মনে করলো না। সে আপন মনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সামনের দিকে এগিয়ে চললো। সায়ীদ আর একটু এগিয়ে গেল লোকটার দিকে, তারপর বেশ উঁচু গলায় বলল, টিকিট দিয়ে যান সাহেব।

সায়ীদের কথা লোকটি শুনতে পেয়েছে বলে এবারও মনে হলো না। সে কোনও জবাব না দিয়ে আগের মতোই চলতে লাগলো। সায়ীদ রীতিমতো অবাক হলো লোকটার ব্যবহারে। মনে মনে ভাবলো—আজ আর তোমাকে ছাড়ছি না। সে এবার দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। ওর মনে ততক্ষণে জিদ্‌ চেপে গেছে—লোকটাকে ধরতেই হবে। নিশ্চয়ই ফাঁকিবাজ লোকটা। শয়তানকে শাস্তি না দিলে তার স্পর্ধা দিন দিন বেড়ে যায়। সায়ীদ লোকটাকে ধরার জন্য এক রকম দৌড়েই চললো।

লোকটাও যেন ততক্ষণে সায়ীদের মনোভাব বুঝতে পেরেছে। সে সায়ীদকে এগিয়ে আসতে দেখে বার কয়েক এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে সোজা দৌড় দিলো। সায়ীদও ইতিমধ্যেই মন ঠিক করে ফেলেছে। লোকটাকে দেখে সেও তার পিছু পিছু ছুটতে লাগলো। দৌড়াতে দৌড়াতে সে দু'-একবার সিগনালের কাদের মিয়ার নাম ধরে ডাকও দিলো, কিন্তু সে ডাকে কাদের মিয়া সাড়া দেয়নি। হয়তো বা সে শুনতেই পায়নি।

লোকটা হঠাৎ রাস্তার পাশে একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো। আধো আলোছায়ার মধ্যে ঝোপটার দিকে এগিয়ে যেতেই সায়ীদের গা ছম ছম করে উঠলো।...কিন্তু একি! লোকটা যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল সেখানে পৌঁছে সায়ীদ তাকে দেখতে পেলো না। গেল কোথায় লোকটা? সায়ীদ আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

একটা হাঁচির শব্দে চমকে উঠলো সায়ীদ। যেদিক থেকে শব্দটা এলো সেদিকে তাকাতেই সায়ীদ দেখতে পেলো—প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে একটা লম্বা সুপারি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে লোকটা তাকে হাত ইশারায় ডাকছে।

সায়ীদ আর অপেক্ষা না করে ছুটে গেল সেদিকে।

সায়ীদকে এগিয়ে আসতে দেখে লোকটা এবার সুপারি গাছটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সড় সড় করে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে দিলো। তার ওঠার গতি দেখে মনে হলো—সে যেন কারো সাথে গাছে চড়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে।

সায়ীদ দু'-হাতে গাছটা চেপে ধরলো। তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বলে উঠলো,—নামো, নেমে এসো বলছি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। লোকটা ততক্ষণে গাছের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। হালকা-পাতলা সুপারি গাছ। লোকটার ভারে সে গাছটা বারবার হেলে দুলে পড়তে লাগলো।

সায়ীদ এবার দু' হাতে গাছটা শক্ত করে এঁটে ধরে দু'-একটা ঝাঁকুনি দিলো। বলল,— নামো, না নামলে ফেলে দেবো বলছি।

লোকটার কিন্তু সে দিকে খেয়াল নেই। সে এবার নিজেই গাছটাকে জড়িয়ে ধরে জোরে জোরে দোল খেতে লাগলো। তারপর এক সময় হাত-পা ছেড়ে দিয়ে শূন্যে ভাসতে ভাসতে ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে পড়লো।

লোকটাকে এভাবে শূন্যে ভাসতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সায়ীদ। প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল এ হয়তো তার চোখের ভুল। কিন্তু সে ভুল ভাঙতে বেশি দেরি হয়নি। অবাক বিস্ময়ে সায়ীদ তাকিয়ে দেখলো—মাটিতে পড়েই লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। তারপর কি মনে করে তীরবেগে ছুটে চললো জমিদার বাড়ির দিকে।

সায়ীদ কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলো লোকটাকে। তাকে নাগালের বাইরে চলে যেতে দেখে আরো ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে। যা করে হোক লোকটাকে ধরতেই হবে।

ছুটতে ছুটতে সায়ীদের মনে হলো—এই বুঝি লোকটাকে সে ধরে ফেলে। আর বেশি দূরে নয়—মাত্র হাত কয়েক। এখনি সে ধরে ফেলবে লোকটাকে। ব্যবধানটুকু সরাতে সায়ীদ আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে।

কিন্তু একি! হাতের কাছে পেয়েও সে যেন লোকটাকে ধরতে পারছে না। সামান্য একটু ব্যবধান—এটুকুও যেন আর কিছুতেই যেতে চায় না। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে, সে যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলো সায়ীদ।

কিন্তু কি আশ্চর্য, সায়ীদ যা ভেবেছিল তা হলো না। লোকটা ছুটতে ছুটতে পিছন ফিরে একবার মাত্র সায়ীদকে দেখে নিয়ে দারোয়ানের পাশ কাটিয়ে সোজা চলে গেল জমিদার বাড়ির ভিতরে।

লোকটাকে এ-ভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখে সায়ীদ চমকে গেল। তারপর কি যেন ভেবে নীরবে সেও চলে গেল ভিতরে। যাওয়ার সময় একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো দারোয়ানকে। সে তখনো টুলের ওপর বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তাকে যেন মরণ ঘুমে পেয়েছে!

জমিদার বাড়ির মধ্যে ঢুকে লোকটা যে কোন দিক থেকে কোথায় চলে গেল তা যেন কিছুই বুঝতে পারলো না সায়ীদ। সে এখন কি করবে তাই ভাবতে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একবার তার মনে হলো—এ অবস্থায় তাকে যদি কেউ দেখে ফেলে...দারোয়ানটা যদি এর মধ্যে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে...সে যদি ধরা পড়ে চুরির অপরাধে অথবা তাকে আততায়ী মনে করে যদি পুলিশে দেয়—তখন!

এত সব চিন্তা করতে করতে সায়ীদ আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতে চেয়েছেল কিন্তু পারলো না। তার মনে হলো কে যেন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বাড়ির সবগুলো আলো

একসাথে নিভিয়ে দিলো। অন্ধকার হয়ে গেল চারিধার। চমকে উঠলো সায়ীদ। লোকটা তাহলে ঘরের ভিতরেই ঢুকে পড়েছে। এখন উপায়!

কোনও উপায় উদ্ভাবনের আগে অসম্ভব একটা কিছু ঘটে গেল। সায়ীদ স্পষ্টই শুনতে পেলো--কে যেন অন্ধকারের মধ্যে পাগলের মতোই রিভলবার চালিয়ে যাচ্ছে—দুম্...দুম্...দুম্...। গুলির শব্দের সাথে সাথে একটু গোঙানি শোনা গেল, ভারী একটা কিছু পতনের শব্দ হলো, তারপর আবার নীরবতা।

এতক্ষণ পরে সায়ীদের মনে হলো—তাইতো এ-সব কি দেখছে সে! দারোয়ানটাও এখনো ঘুমোচ্ছে। সে কি এর কিছুটা শুনতে পাচ্ছে না—আশ্চর্য! দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সায়ীদ ছুটে গেল দারোয়ানটার পাশে। তারপর তাকে প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা দিয়ে বলল,—এই, ডাকাত পড়েছে ওঠো।

কিন্তু একি! দারোয়ানকে ধাক্কা দিতেই সে গড়িয়ে পড়লো সেখানে। তবে কি সেও মরেছে! সায়ীদ অবাক হয়ে দেখলো—দারোয়ানের বুকের বাম পাশটায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আহ্! চমকে উঠলো সায়ীদ। অবাক হয়ে ভাবলো—তবে কি লোকটা ভিতরে যাওয়ার পথে ওকেও গুলি করে হত্যা করেছে! ভয়ে বিস্ময়ে হাত-পাগুলো আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগলো সায়ীদের। এ-সব কি দেখছে সে! সদর দরজাটা পার হতে গিয়ে তার মনে হলো—খিলান ঘুরানো জমিদার বাড়ির গেটটা ভেঙে পড়েছে অনেক দিন আগেই। আগাছা আর লতাপাতায় ভরে গেছে এ-দিক ও-দিক। পথঘাট কিছুই যেন চেনা যায় না। তবে...? সায়ীদ এবার সত্যি সত্যিই চমকে গেল। এ কোথায় এসেছে সে? ভয়ে ভয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালো সায়ীদ। সে দেখলো, কোথায় জমিদার বাড়ি আর কোথায় কি—তার বদলে সেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অতীতের সাক্ষীস্বরূপ ইঁট-পাথরের ভগ্নস্তূপ।

pathagar.net

এরপর সায়ীদ আর সেখানে দাঁড়ায়নি। মরি-বাঁচি হয়ে কোন দিক থেকে কোথায় যে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল সে-কথা আজও সায়ীদ ঠিক করে বলতে পারে না—পারার কথাও না। তবে এটুকু সে বলতে পারে—পরদিন ভোর রাতে স্টেশনে আসার পথে পয়েন্টম্যান নীরু মিয়া তাকে না-কি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিল রাস্তার ও-পাশে ওই বুড়ো বটগাছটার কাছ বরাবর।

সব শুনে উজানতলী গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল,—ঘটনা মিথ্যে নয় সাহেব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনিও ওসব অশরীরী আত্মাদের কবলে পড়বেন তা ভাবতে পারিনি।

এতসব ঘটনার পর উজানতলী স্টেশনে পড়ে থাকার কথা আর ভাবতে পারেনি সায়ীদ। সেদিনই কর্তৃপক্ষের নিকট ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আগেই খুলনার ট্রেনটা ধরেছিল সে। যাওয়ার আগে বাকি কাহিনীটুকু বুড়োদের মুখেই শুনেছিল সায়ীদ। চমকে গিয়েছিল ঘটনাটা শুনে...।

উজানতলীর জমিদার শহীদ চৌধুরীর সঙ্গে মণিপুরের জমিদার কাসিম আলী খানের শত্রুতা ছিল বংশপরম্পরায়। শহীদ চৌধুরীর সময় এই শত্রুতা প্রবল আকার ধারণ করে। কাসিম আলী খান ছলে-বলে শহীদ চৌধুরীকে জব্দ করার মতলবে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ভাড়া করা গুণ্ডা পাঠিয়ে দেন উজানতলী গাঁয়ে। আততায়ী একদিন রাতের

অন্ধকারে এলো উজানতলী স্টেশনে। টিকিট কালেক্টর মকিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে কৌশলে জেনে নিলো জমিদার শহীদ চৌধুরীর সব খবর। তারপর এক সময় রাতের অন্ধকারেই অদৃশ্য হয়ে গেল আততায়ী। পরের ঘটনা সবার জানা। বুড়োরা আজও ভুলতে পারেনি সে কাহিনী।

অদৃশ্য আততায়ী কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো। খুনের অপরাধে তার হলো ফাঁসি। সেই থেকে গভীর নিশীথে চারদিক যখন নিস্তব্ধতায় ভরে ওঠে, ঠিক সে সময় মাঝে মাঝে দেখা যায়, কে যেন রিভলবার হাতে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে জমিদার বাড়ির আশেপাশে, এ-দিকে ও-দিকে। ভয়ে আর কেউ সে দিকে পা বাড়ায় না। বসতিশূন্য হয়ে পড়েছে ও-দিকটা। গুল্মলতায় ভরে গেছে জমিদার বাড়ির চত্বর।

একটি গোয়েন্দা কুকুরের কাহিনী

মোহাম্মদ নাসির আলী

অস্ট্রেলিয়ার তৃণাঞ্চলে পশুপালন একটি লাভজনক ব্যবসা। বিশেষ করে মেষপালন তো লাভজনক বটেই। অস্ট্রেলিয়া থেকে মেষের মাংস বিভিন্ন দেশে চালান হয়, তাছাড়া মেষের লোম দিয়ে হয় মূল্যবান উল।

অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে ওয়ারুনা নামক উপত্যকায় বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে এক ধনী ভদ্রলোক বিরাট এক খামার বাড়ি তৈরি করেছিলেন। মেশপালন তাঁর ব্যবসা। পাহাড় বা জঙ্গল থেকে যাতে বাঘ-ভালুক প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী এসে মেষগুলোর কোনও অনিষ্ট করতে না পারে সে জন্যে খামারের চারদিকে ঘেরাও করা ছিল লোহার মোটা জাল দিয়ে।

কিন্তু তবু অঘটন যে না ঘটতো তা নয়। অশ্বারোহী খামাররক্ষীরা সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখাশুনা করতো মেষের পাল কোথাও কোনও অসুবিধায় পড়েছে কিনা। এমনি এক রক্ষী একদিন ভোরবেলা খামারে আসতেই শুনতে পেলো একটা মেষশাবক প্রাণপণে চিৎকার করছে। সাধারণত কোনও বিপদ-আপদ বা হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ ছাড়া এমন

হয় না। কিছুটা কাছে এসে বাইরে থেকেই সে দেখতে পেলো একদল ভেড়া ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু দূরে তার নজরে পড়লো কম করেও বিশটা ভেড়া মাটিতে পড়ে আছে রক্তাক্ত দেহে। তার বেশির ভাগই মরে গেছে, দু'চারটা তখনও ছট্‌ফট্‌ করছে মৃত্যুযন্ত্রণায়।

এ রকম ভয়াবহ দৃশ্য মেষরক্ষী আর কখনো দেখেনি। কালবিলম্ব না করে সে ঘোড়া ছোটালো মালিকের আস্তানার দিকে। খবর পেয়েই মালিক ছুটে এলেন খামারে, সঙ্গে সঙ্গে এলো আরও লোকজন।

মেষের মৃতদেহগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেলো, মাত্র চারটা মেষের বুক ছিন্ন করে কিছুটা অংশ হত্যাকারী ভক্ষণ করেছে। আর বাকি মেষগুলোকে শুধু হত্যা করার আনন্দেই যেন হত্যা করা হয়েছে।

এ ধরনের কুকীর্তি কোনও জন্তুর দ্বারা সম্ভব তা সবাই বুঝে ফেললো। বাঘ ভালুক বা সিংহ এ উপত্যকার ধারে-কাছে নেই তা তারা জানতো। শুধু আছে ডিংগো নামক এক জাতীয় ভয়ানক হিংস্র কুকুর। আসলে ডিংগো কুকুর নয়, যদিও দেখতে কুকুরের মতো কিন্তু শক্তি এবং হিংস্রতায় কুকুরের তুলনায় অনেক বেশি। বিশেষ করে ডিংগোর ভয়েই খামারের চারদিকে মোটা তারের জাল দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়।

কিন্তু ডিংগো তারের শক্ত জাল ফুটো করে ভেতরে ঢুকলো কি করে? তখন মনে পড়লো খামারের ভেতরের একটা ষাঁড় একদিন গুঁতো দিয়ে বেড়ার একটা জায়গা ফুটো করে দিয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেলো সত্যিই ডিংগো সেখান দিয়েই ঢুকেছে। ঢুকে এতগুলো ভেড়ার প্রাণনাশ করেছে। এক সঙ্গে এ ধরনের ক্ষতি এর আগে কোনও খামারে কখনো হয়নি।

খামারের মালিক অগত্যা জালের ছিদ্রটা ভাল করে মেরামত করালেন। তারপর সেই ষাঁড়টাকে খামার থেকে বের করে অন্যত্র নিয়ে রাখলেন। প্রায় মাস দেড়েক নিশ্চিন্তে কাটলো। দেড় মাস পরে একজন রক্ষী আবার একটা ফুটো দেখতে পেলো জালের এক জায়গায়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কোনও শক্তিশালী জন্তু দাঁত দিয়ে জাল কেটে ফুটো করেছে। শক্তিশালী জন্তু আর কেউ নয়, আগের সেই ডিংগোটা ছাড়া। কিন্তু ডিংগোটা যে সাধারণ ডিংগো নয় তা তার কাজেই বোঝা যায়। এমন শক্ত জাল দাঁত দিয়ে কাটা সাধারণ ডিংগোর কাজ নয়।

আগের হত্যাকাণ্ডের জন্য যে এ ডিংগোটাই দায়ী, মালিক ও অন্যান্য সবাই তা স্বীকার করলেন। কারণ ডিংগো যেখানে একবার শিকার সংগ্রহ করে, ছয় সপ্তাহ পরে সে আবার একদিন সেখানে ফিরে আসবেই। এটা ডিংগোর স্বভাব।

মালিক এবার ফুটোটা মেরামত না করে এক ফন্দি আঁটলেন। ফন্দিটা আর কিছুই নয়, ইস্পাতের এক ফাঁদ এনে ফুটোর মুখে পেতে রাখলেন। তাছাড়া জবাই করা ভেড়ার কিছু নাড়িভুঁড়ি এনে ফাঁদের ধারে-কাছে ছড়িয়ে রাখলেন। ছড়িয়ে রাখবার আগে তাতে তীব্র বিষ মাখিয়ে রাখলেন, যাতে একবার খেলেই ডিংগোটার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

কাজটা সেরে এসে মালিক সেদিন বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। শুধু মালিক নয়, সবাই মনে করলো, ভোরে গিয়ে দেখবে ডিংগোটা অক্কা পেয়েছে, নয়তো আটকা পড়ে

আছে ইস্পাতের কঠিন ফাঁদে।

কিন্তু তাদের সে আশা আর পূর্ণ হলো না। ভোরে ফাঁদের কাছে গিয়ে তারা স্তম্ভিত হয়ে রইলো। বিষাক্ত নাড়িভুঁড়িগুলো যেমনভাবে ছিল তেমনি ছড়ানো পড়ে আছে, কেউ একটু স্পর্শও করেনি। কিন্তু ফাঁদে আটকা পড়ে আছে কুকুরের একটা ঠ্যাং। ঠ্যাংটার রং লালচে ধরনের।

ব্যাপার দেখে সবাই অবাক হয়ে ভাবলো, ফাঁদে আটকা পড়ে ডিংগোটা পালালো কি করে? তাও আবার পালিয়েছে একখানা পা ফেলে! অবশেষে বোঝা গেল, ফাঁদে আটকা-পড়া পা ছাড়াতে না-পেরে ডিংগোটা নিজের পা দাঁত দিয়ে নিজেই চিবিয়ে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তিন পা দিয়েই পালিয়েছে।

তিন পা ভরসা করে ডিংগোটা আর এ তল্লাটে আসবে না এটাই তারপর সবাই আশা করেছিল। কিন্তু লালচে রং-এর ডিংগোটা যে সাধারণ ডিংগো নয় আগেই তা বোঝা গিয়েছিল। ফলেও হলো তাই।

একদিন একটা লোক দিনের বেলা তার গাভীটা দোহন করতে গিয়ে দেখলো, তার বাছুরটা মরে পড়ে আছে । গাভীটা রক্তাক্ত দেহে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। ব্যাপার কি?

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখা গেলো, গোয়ালের মধ্যে বেশ ধস্তাধস্তি চলেছে। গাভীটা তার বাছুরটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। আক্রমণকারী জন্তুটা বাছুরের কল্জেটা শুধু খেয়েছে, শরীরের বাকি অংশ অমনি পড়ে আছে। গাভীটার সারা গায়ে ধারালো দাঁতের অসংখ্য কামড়ের দাগ। তাছাড়া গাভীর পিছনের পায়ের শিরা কেটে পাখানা এমন অকর্মণ্য করেছে যে গাভী আর হাঁটতে পারছে না।

খবর পেয়ে লোকজন সবাই ছুটে এলো। ব্যাপার দেখে তারা তো অবাক। জন্তুটা গোয়ালে ঢুকলো কি করে? বোঝা গেল বেড়া ফুটো করে ঢুকেছে। কিন্তু নরম মাটিতে পায়ের দাগ দেখে সবাই বুঝতে পারলো, আক্রমণকারী জন্তুটার পা মোটেই তিনখানা। তখন আর কারও বুঝতে বাকি রইলো না যে, এ কাজও সেই তিনপেয়ে ডিংগোটার।

এ ঘটনার পর স্বাভাবিক কারণেই এ উপত্যকার পশুপালকদের ভেতর একটা ভয়-ভাবনা ও আতঙ্কের ভাব দেখা দিল। এভাবে দিনের পর দিন যদি একটা জানোয়ার মেষপাল ও অন্যান্য পালিত পশুর উপর অবাধে আক্রমণ চালিয়ে ক্ষতি সাধন করে তাহলে তাদের ব্যবসায় চলবে কি করে?

এ সময়ে অস্ট্রেলিয়া সরকারও ডিংগো নিধনে তৎপর হয়ে উঠলো। ভেড়ার লোম বিদেশে রফতানি করে সরকার বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা প্রতি বছর অর্জন করে। কিন্তু এভাবে যদি ডিংগোর আক্রমণে বিনা বাধায় বিপুল সংখ্যক মেষ প্রাণ হারায় তবে বৈদেশিক মুদ্রার আয় স্বভাবতই কমে যাবে। তাই সরকারও ডিংগো হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন। সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হলো। প্রতিটি ডিংগো হত্যার জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে তিন পাউণ্ড।

এ ছাড়া খামার মালিকদের কেউ কেউ পৃথকভাবে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা ঘোষণা করলেন। বিশেষ করে তিনপেয়ে ডিংগোটা হত্যার জন্যে ওয়ারুণা খামারের মালিক পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন বলে শিকারীদের জানিয়ে দিলেন। তারপর থেকে ডিংগো হত্যার

জন্যে শিকারীরা উঠে-পড়ে লাগলো। কারণ অন্যান্য খামারের মালিকরাও পুরস্কার দেবেন বলে স্বীকার করেছেন।

পেশাদার শিকারীরা সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করতে লাগলো তিনপেয়ে শয়তানটাকে কাবু করবার জন্যে। এদিকে শিকারীদের ফাঁকি দিয়ে শয়তান ডিংগো তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। শিকারীদের পাতা ফাঁদে অন্য ডিংগো ধরা পড়ে, ধরা পড়ে কেঙ্গারু আর ওয়ালবি কিন্তু তিনপেয়ে শয়তান ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

কিছুদিন নিরুপদ্রবেই কেটে গেলো। তিনপেয়ে ডিংগোর কথা অনেকে ভুলেই গেলো। পশুপালকরা ভাবলে, এতদিনে তারা খুনী জন্তুটার হাত থেকে বুঝি রেহাই পেল।

কিন্তু বেশ কিছু দিন পরে হঠাৎ আবার একদিন ডিংগোর আবির্ভাব ঘটলো অতি অপ্রত্যাশিতভাবে। একটি লোক তার ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে খামারে গিয়েছিলো আগাছা বাছাই করতে। সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলো তার পোষা টেরিয়ার কুকুরটা।

গাড়ির পেছনে পেছনে দৌড়ে সে তার প্রিয় মনিবকে অনুসরণ করছিলো।

যেতে যেতে হঠাৎ টেরিয়ারটা গর্জন করে উঠতেই মনিব পিছন ফিরে চাইল। দেখল, টেরিয়ারটা একটা ঝোপের দিকে চেয়ে গর্জন করছে। তার গায়ে লোমগুলো অবধি রাগে আর উত্তেজনায় খাড়া হয়ে উঠেছে। লোকটি তখন ঝোপের কাছে গিয়ে কুকুরের এ অস্বাভাবিক আচরণের কারণ খুঁজতে গেলো। কিন্তু সেখানে একটা গিরগিটি ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়ল না। ফিরে এসে সে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিল।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে কাজে মনোযোগ দিতে পারল না। কারণ টেরিয়ার কুকুরটা আবার চিৎকার করে উঠলো। লোকটি কুকুরের দিকে চেয়ে দেখলো, কুকুরটা এবার যেন ভয়ে রীতিমতো কাঁপছে আর চিৎকার করছে। অথচ এইমাত্র ঝোপটার কাছে গিয়ে সে দেখে এসেছে, কুকুরটার এরূপ আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করার কারণই নেই! কাজেই সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে লোকটি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গাড়িটা জমির অন্য প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় আবার তার নজর পড়ল ঝোপের দিকে। সে দেখতে পেল, প্রকাণ্ড একটা ডিংগোকে। লালচে রং-এর ডিংগোটা একদৃষ্টে চেয়ে আছে টেরিয়ার কুকুরটার দিকে।

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে তিন পায়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে এসে আক্রমণ করলো কুকুরটাকে! লোকটির উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অতিকায় জন্তুটা কুকুরের কণ্ঠদেশ কামড়ে ধরলো। ধরেই ঝাঁকুনির পর ঝাঁকুনি দিয়ে কুকুরটার দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেললো।

লোকটি এতক্ষণ একেবারে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তার প্রিয় কুকুরটির এ দুর্দশা দেখে সে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। তার হাতে ছিল স্প্যানার নামক সামান্য একটা লোহার যন্ত্র। সে তাই দিয়েই ডিংগোটার মাথায় ক্রমাগত আঘাত হানতে লাগলো। মাথা পেতে লোহার যন্ত্রের এ আঘাত সহ্য করতে না পেরে ডিংগোটা অবশেষে ছুটে গিয়ে আবার ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হলো।

কথায় বলে, বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা। এ লোকটির অবস্থাও তাই হয়েছিলো। সে

শুধু তার এতদিনের পোষা প্রিয় কুকুরটিকেই হারায়নি, তার নিজের শরীরেরও অনেক জায়গায় অনেক জখম হয়েছে। তবু বেচারা সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেলো।

এ ঘটনার পরে উপত্যকার লোকেরা আবার সচেষ্ট হয়ে উঠল খুনী ডিংগোটাকে খুঁজে বের করতে। বড় বড় সব শিকারীরা বেরিয়ে পড়লো রাইফেল আর সেই সঙ্গে তাদের ক্যাঙারু হাউণ্ড নামক বিরাটকায় কুকুরগুলো নিয়ে। কিন্তু শিকারীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ডিংগোটা কোথায় যে লুকালো তা কেউ খোঁজ করতে পারলো না।

এভাবে কিছুদিন নিশ্চিন্তে কাটবার পরে আবার এক হত্যাকাণ্ড ঘটলো খামারে। মেষদের পানীয় জল সরবরাহের জন্য খামারের ভেতর একটি কূপ খননের কাজ চলছিলো। কাজটা সমাধার ভার পড়েছিল জি. এম. ডাউনী নামক এক ভদ্রলোকের উপর। একদিন ভোরবেলা ঘোড়ায় চড়ে এসে তিনি কাজের তদারক করছিলেন এমন সময় দেখতে পেলেন ভেড়াগুলো যেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটাছুটি আরম্ভ করছে। যে সব ভেড়া ঘাসের উপর শুয়ে বিশ্রাম করছিল তারাও উঠে দিকবিদিক ছুটাছুটি করছে।

মিঃ ডাউনী বুঝতে পারলেন, ভেড়াগুলোর এভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠবার পেছনে নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। তিনি এদিক-ওদিক চেয়ে এ উত্তেজনার কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তারপর দেখতে পেলেন, প্রায় আধ মাইল দূরে জালের বেড়ার বাইরে দুটো ডিংগোকে ঘোরাঘুরি করতে। তারা ভেতরে ঢুকবার পথ খুঁজছে।

মিঃ ডাউনী তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলেন ওয়ারুন্না খামারের মালিকের কাছে। তারপর দু'জন দুটি বন্দুক নিয়ে গাড়ি ছোটালেন ডিংগোদের উদ্দেশ্যে। খামারে এলে তাঁরা দেখলেন, একটা ফুটোর ভেতর দিয়ে ডিংগো দুটো ভেতরে ঢুকে একটা ভেড়াকে আক্রমণ করেছে। মিঃ ডাউনী কালবিলম্ব না করে গুলি ছুঁড়লেন। গুলি লাগা সত্ত্বেও কিন্তু তিনপেয়ে জন্তুটা লাফাতে লাফাতে বেড়ার বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ মড়ার মতো পড়ে রইলো তারপর আবার উঠে তিন পায়ে দৌড়েই দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। বাকি রইলো তিনপেয়ের সঙ্গী অপর ডিংগোটা। মিঃ ডাউনী সেটাকে লক্ষ্য করে বার কয়েক গুলি করে সফলকাম হতে পারলেন না। খামারের মালিক তখন এক বুদ্ধি করলেন। তিনি জন্তুটার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কয়েকবার চেষ্টার পরে একবার তাঁর গাড়ি সত্যিই ডিংগোর উপর দিয়ে চলে গেলো। আহত ডিংগো এবার এলো গাড়ির আরোহীদের আক্রমণ করতে। এদিকে মিঃ ডাউনী এ জন্যে আগে থেকেই তৈরী ছিলেন। তাঁর একটি গুলিতেই ডিংগো সকল যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেলো। প্রাণহীন তার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

আহত তিনপেয়ে ডিংগোটা তখন জঙ্গলের এক ঝোপে ঢুকে বিশ্রাম করছিলো। ঠিক এমনি সময়ে সেখান দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল এক কৃষক। ক্যাঙ্গারু হাউণ্ড জাতীয় ভীষণ একটা কুকুর তার সঙ্গে। ডিংগোটাকে দেখেই হাউণ্ড ঝোপের কাছে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। ডিংগোটাও ভীষণ বেগে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। শুরু হলো মরণপণ যুদ্ধ। কিন্তু আহত অবস্থা সত্ত্বেও ডিংগোটাই অবশেষে জয়ী হলো। কুকুরের কণ্ঠদেশ কামড়ে ধরলেই কুকুর অতি সহজে কাবু হয়ে গেলো। অনন্যোপায় কৃষক তখন গাড়ি থেকে ঘোড়াটা খুলে ডিংগোকে তাড়া করলো ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

কিন্তু জঙ্গলের গাছ-গাছড়ার জন্যে বেশি দূর তাড়া করা আর সম্ভব হলো না। ডিংগোটা প্রাণ নিয়ে পালালো।

এ ঘটনার পর বেশ কিছুদিন অবধি ডিংগোর উৎপাতের কথা আর শোনা গেলো না, সবাই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। তাদের ধারণা হলো ডিংগোটা মিঃ ডাউনীর গুলিতে আহত হয়ে নিশ্চয়ই মারা পড়েছে।

কিন্তু তাদের ধারণা যে ভুল কয়েক মাস পরেই তা বোঝা গেল। হঠাৎ একদিন আবার খামারে ডিংগোর আবির্ভাব ঘটলো। এক রাত্রে সেই তিনপেয়ে ডিংগোটার কবলে পড়ে বেশ কয়েকটা মেষ প্রাণ হারালো।

শিকারীরা তখন আবার তৎপর হয়ে উঠলো। কিন্তু রাতের পর রাত ডিংগোর উৎপাত চলতেই লাগলো। তারপরে ওয়ারুনা খামারের মালিকসহ সবাই হতাশ হয়ে পড়লো। শিকারীদের এতো চেষ্টার ফলেও যদি একটা ডিংগোটাকে জব্দ করা না যায় তবে আর ভরসা কোথায়?

অবশেষে এলো একজন দেশী শিকারী। সে অস্ট্রেলিয়ার একজন আদিম অধিবাসী। ওয়ারুনার মালিক তখন সকল শিকারীর উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। কাজেই প্রথমে তিনি এই স্থানীয় শিকারীটির প্রস্তাবে তেমন আমল দিতে চাননি। কিন্তু পরে তিনি তার কথায় রাজি হয়ে গেলেন।

তখন শিকারী বলল, আমাকে বেশ খানিকটা ঝোলা গুড় জোগাড় করে দিতে হবে। গুড় পাওয়া যাবে কি এখানে?

বিস্মিত মালিক বললেন, সামান্য জিনিস গুড় পাওয়া যাবে না কেন?

তাহলে বেশ খানিকটা গুড় আমার জন্যে আনিয়ে দিন, আর কিছুই আমি চাই না।

শিকারীর কথায় খামারের মালিক মনে মনে অবাক হলেন, কিন্তু গুড়ের বন্দোবস্ত করে দিতে তিনি কসুর করলেন না।

শিকারী সে রাত্রে ভেড়াগুলোকে খোঁয়াড়ে না ঢুকিয়ে দিনের বেলায় যেমন রাখা হয় তেমনিভাবে লোহার জালের বেষ্টনীর ভেতরই রেখে দিল। এ ব্যবস্থাটা মালিকের তেমন পছন্দ হলো না কিন্তু শিকারীর ইচ্ছাটাই তাঁকে মেনে নিতে হলো।

মেনে নিলেও কিন্তু মনে মনে স্বস্তি পেলেন না। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, হয়তো ভোরে উঠেই দেখতে পাবেন অনেকগুলো ভেড়া আজ ডিংগোর কবলে প্রাণ হারিয়েছে। ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম থেকে উঠেই অতি ভোরে তিনি ছুটে গেলেন খামারের দিকে। গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর আনন্দ আর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। দেখলেন, জালের বেষ্টনীর বাইরে এক জায়গায় পড়ে আছে তিনপেয়ে সেই ডিংগোটার প্রাণহীন দেহ। তিনি ভাবলেন, এতদিন শুধু তিনি নন, সারাটা উপত্যকার অধিবাসীরা যেন সেদিন থেকে শাপমুক্ত হলো।

কিন্তু এতো বড় বড় শিকারী প্রাণপণ চেষ্টায় যে কঠিন কাজটা করতে পারেনি, সে কাজ অতি সহজে একদিনের চেষ্টায় এ শিকারী কী করে সমাধা করলো?

কিন্তু একটু লক্ষ্য করে তারা দেখতে পেলো, জালের বেষ্টনীর বাইরে অনেক জায়গা

জুড়ে শিকারী এমনভাবে ঝোলা গুড় ছড়িয়ে রেখেছিলো যাতে তা পায়ে না মাড়িয়ে বেড়ার কাছাকাছি কেউ আসতে না পারে। তিনপেয়ে সেই ভয়াবহ ডিংগো বেড়ার কাছে এসে যখন ভেতরে ঢুকবার জন্য ফুটো খুঁজছিলো তখন তার পায়ে চটচটে সেই ঝোলা গুড় লেগে যায়। গুড় পায়ে লাগতেই সে নিজের জিভ দিয়ে চেটে বিরক্তিকর জিনিসটা পা থেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে। চাটতে গিয়ে দেখে জিনিসটা বেশ মিষ্টি। মিষ্টি পেয়ে সে আরও ভাল করে চেটেপুটে খেতে আরম্ভ করে। খেতে খেতে তার ভেতর বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুযন্ত্রণায় তার মুখ-চোখ বিকৃত হয়ে ওঠে। একটু পরে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

তোমরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছো, শিকারী গুড়ের সঙ্গে এমন এক বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলো যা খেলে কারোরই আর নিস্তার নেই। অবশেষে চতুর শিকারীর পাল্লায় পড়ে সেই বিষ উদরস্থ করেই ডিংগো প্রাণ হারালো।

pathagar.net

গোগোদার গোয়েন্দাগিরি

pathagar.net

বেলাল চৌধুরী

'আলতা নুড়ি গাছের গুঁড়ি জোড় পুতুলের বিয়ে...' সকালে ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই শারির মনে গুনগুনিয়ে ওঠে গানের কলিটা। একটা মিষ্টি সুন্দর স্বপ্নের আবেশে ভরাট চোখ দুটোর নরম পাপড়ি জোড়া তখনো ভাল করে মেলেনি। আজ ওর পুতুলের বিয়ে মনে পড়তেই একরাশ চনমনে খুশিতে, আহ্লাদে গোটা বিছানা জুড়ে পাক খেয়ে নিলো বার কয়েক। না...আর শুয়ে থাকলে চলবে না মোটেই। আজ তার কত শত কাজ। যদিও ইস্কুল-টিস্কুলের বালাই নেই, তবুও আজ তাকে কত যে কাজ করতে হবে। উফ্, ভাবতেই কেমন মাথা ঝিমঝিম করছে। কোন কাজটা না দেখলে হবার যো আছে!

জানলার হালকা সবুজ পর্দা সরিয়ে দেখলো শিউলি ফুলের চাপা গন্ধ জড়ানো শরৎকালের রোদ্দুর কাঁচা সোনার মতো টলটল করছে চারপাশে। কী সুন্দর গাঢ় নীল আকাশ। নীল অপরাজিতার লতানো ডালে দুটো চড়ুই কিচিরমিচির করে কি যেন বলাবলি করছে। ঘাসফড়িং আর প্রজাপতির ঝাঁক উড়ে উড়ে একবার এ-ডালে বসছে আবার ও-ডালে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে শারি।

কোনওমতে সাত তাড়াতাড়ি চোখেমুখে খানিকটা জল ছিটিয়ে নিয়েই সোজা ছুটলো পুতুলের ঘরের দিকে। ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকতেই ভয়ানকভাবে চমকে উঠলো শারি। এ্যাঁ...এ...কী ব্যাপার গোটা ঘরের চেহারাটাই যে বেমালুম বদলে গেছে ; আর এতো রীতিমতো ডাকাতি! আচমকা একটা আকাশফাটা চিৎকারে বাড়ির সমস্ত লোকজন যে যেখানে ছিল ছুটে এসে জড়ো হলো। ঘরের অবস্থা দেখে সবাই হতবাক। কারুর মুখে আর কথা সরে না। সত্যিই তো...

আর শারি...বেচারী, হাপুস নয়নে লুটোপুটি খাচ্ছে ঘরের মেঝেতে। ক্ষুদে মৌরিও এসে দাঁড়িয়েছে একপাশে। আর এসেছে দুই বকুলফুল রাবড়ি আর তুবড়ি পাশের বাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে। কেননা ওদেরই তো আজ বরের ঘরের পিসি আর কনের ঘরের মাসি হবার কথা। তাছাড়া সবারই জমানো ব্যাংকের পয়সা থেকে কেনাকাটা করা হয়েছিল কত কী! ঘরের অবস্থা দেখে ওদের চোখের কোণেও জল চিকচিক করে ওঠে।

সমস্ত ঘরের ওপর দিয়ে যেন এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। আর সেই তাণ্ডবের চিহ্ন ঘরের সর্বত্র ছত্রাখ্যান হয়ে আছে। লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে আছে সবকিছু। কারা যেন ঘরে ঢুকে তছনছ করে দিয়ে গেছে। সকলেরই চোখেমুখে এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঝুলছে। যার কোনও সম্ভাব্য উত্তর কারুরই জানা নেই।

সময় সময় দেখা গেল আমাদের গোগোদা ঘুমমাখা দু'চোখ কলচাতে কচলাতে অকুস্থলে এসে হাজির হয়েছেন। ঘটনার ভয়াবহতা দেখে তিনিও কেমন যেন মুষড়ে পড়েছেন বলেই মনে হলো। ব্যাপারটা কী হতে পারে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এক গভীর রহস্যের আভাস পান। গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনতে লাগলেন সকলের বক্তব্য অবশ্যই দু'কান খাড়া করে। কেননা কিছুই তো বলা যায় না কখন কী ভাবে অপরাধীরা কত ছোটখাটো জিনিসের মধ্যে ভুলভ্রান্তির সূত্র ফেলে রেখে যায় পেছনে। তাই সব কিছুরই গন্ধ, ওপর তীক্ষ্ণ নজর না রাখলে চলে না। রঙ, স্বাদ, সময় এসব ব্যাপারে খুবই সজাগ থাকতে হয়। কোনও কিছুকেই বাদ দিলে চলবে না। অপরাধপ্রবণতা একটি সহজাত সংক্রামক ব্যাধিস্বরূপ। চারপাশের সকলের মধ্যেই, সবকিছুর মধ্যেই তা বিদ্যমান থাকতে পারে। এসব ভাবতে ভাবতে গোগোদা ধাঁ করে ছুটলেন তাঁর একান্ত অনুগত সহকারী ও নিত্য সহচর চোমংলামার খোঁজে।

যে করেই হোক এই দুর্ঘটনার রহস্যভেদ তাকে করতেই হবে। হাতের কাছে এমন সুযোগ হয়তো আর দ্বিতীয়বার আসবে না!

বাড়ির আর সবাই একে একে মুখ টিপে হেসে কেটে পড়তে লাগলো! ঘটনাস্থলে এখন শুধু তিন বন্ধু সাত-পাঁচ চিন্তার অথৈ সমুদ্রে ভাসমান। তিনজনেরই চোখের কোলে চিকচিক করছে মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা। সবগুলো পুতুলই যে ছিল একসঙ্গে। আর ছিল দু'বাক্স রাউন্ট্রির কিটক্যাট চকোলেট, কয়েক পাতা প্যাস্টেল অয়স্টার্স, তিন-চার রোল ফ্রুট গাম্‌স। আর ছিল রঙিন ফিতে, কাপড়ের টুকরো, কাগজ কাটা নকশা, ক্রেরোলস, অরিগামির বই আরো কত কী। আর হ্যাঁ একটা গোটা কাগজের টাকাও ছিল যে সন্দেশ আনাবে বলে। তার আর কিছুই আস্ত নেই এখন। আছে শুধু চকোলেটের একটা খালি বাক্স তাও আবার খোবলানো, থ্যাবড়ানো আর রঙিন রাংতার টুকরোগুলো!

ফিতে, পুতুল, কাপড়, সব কুচি কুচি করে ছড়ানো ঘরময়। ছুটির এমন সুন্দর দিনটাই মাটি হলো। রাঙামাসিকেই বা কী বলা যায়! তিনিই তো টাকাটা দিয়েছিলেন। কত অনুরোধ-উপরোধ করার পর তিনি রাজি হয়েছিলেন বিয়েতে উপস্থিত থাকবেন বলে। আর কথা দিয়েছিলেন তাঁর নতুন টেপরেকর্ডার, মুভি ক্যামেরাটাও সঙ্গে নিয়ে আসবেন এবং বিয়ের আসরে গোটা অনুষ্ঠানটিরই ছবি তুলবেন এবং টেপ করে নেবেন। কত সুন্দর সুন্দর গানের টেপ আছে তাঁর কাছে। সেগুলোও বাজাবেন বলেছিলেন। আহা কী চমৎকার সেই কুঁজঅলা তিমির গান, পাখিদের গান। না, সব রসাতলে গেল। তিন বন্ধুই আবার নতুন করে একবার কান্নার বাজনা বাজাতে লাগলো নিঃশব্দে! বাড়ির লোকগুলোর ব্যবহার দেখছো তো! কারুর কোনও তিলমাত্র সহানুভূতি নেই। হতো ছেলেদের ব্যাপার, দেখতে এতক্ষণে কী তুমুল হৈ-চৈ লেগে যেতো। পৃথিবীটা আসলে সব স্বার্থপর লোকের দ্বারাই ভর্তি।

শেষ পর্যন্ত গোগোদাই সমাধান করে দিলেন সব রহস্যের। যাকে শুধু বিস্ময়কর বললেই সবটা বলা হয় না। রীতিমতো রোমহর্ষক ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা গোগোদের গোয়েন্দা জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের শুরু হলো এখান থেকে। যাকে দিগ্বিজয় বললেও ভুল বলা হয় না। এই ঘোরালো আর জটিল কেসটার সমাধান করতে গোগোদা ও তার সহকারী চোমংলামাকে খাটতে হয়েছে ভূতের মতো পায়ের ঘাম মাথায় তুলে। গলদঘর্ম আর কাকে বলে?

অথচ, এই দ্যাখো না, এত বড় একটা বিয়ের ব্যাপার যে ছিল তাতে তাদের দু'জনের নেমন্তন্ন তো দূরের কথা আজ সকালের আগে তারা তা জানতেন না। সে যাক্‌গে মেয়েরা এরকমই হয়। সে সব ভাবলে তো আর তাদের চলবে না। উপস্থিত উদগ্রীব শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে গোগোদা নিষ্কম্প গলায় ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করলেন। সমস্ত ঘরে তখন সূঁচ পড়ার শব্দও শোনা যাবে না এমন নীরবতা।

গোগোদা বলতে শুরু করেন, আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল,...কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের ওপর নির্ভর করেই তো আর আমাদের চলে না, আমরা গোয়েন্দারা...

মৌরি বাধা দিয়ে বলে ওঠে, গোয়েন্দারা কী করে না করে সে কথা পরে শুনলেও বোধকরি এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না...

মৌরির কথা শেষ হওয়ার আগেই গোয়েন্দা তার দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে ফের বলতে শুরু করেন, কুঁচো কুঁচো করে কাটা কাপড়ের সূত্র ধরেই প্রথমে এগুলাম, কিছুদূর গিয়েই দেখলুম হ্যাঁ, ঠিক তাই, যা ভেবেছিলাম...অর্থাৎ তবে কিনা চকলেটের বাক্সটা অর্থাৎ যা কি না পয়সার জিনিসটা অবশ্য...ওদের হাতে নষ্ট হয়নি খামোকা। এবং এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস...

শারি, মৌরি, রাবড়ি, তুবড়ি ছুঁচো বাজির মতোই লাফিয়ে ওঠে একসঙ্গে, কই কোথায় সেগুলো একসঙ্গে আর্ত কণ্ঠস্বর ছিটকে বেরিয়ে আসে।

তা হ্যাঁ শোনই না আগে...বলতে শুরু করেন গোগোদা।

কাল রাত্তিরে তোমরা তো এ ঘরে সব কিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে যে যার ঘরে চলে গেছে। তারপর...তার কিছু পরেই, আমি হ্যাঁ তখন শুতে যাচ্ছি সবে, ঠিক তখনই,

সময়টা অবশ্য ঠিক মনে নেই, সে যাই হোক হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হলো। আমি উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা শোনার চেষ্টা করলুম। ঠিক কোনখান থেকে শব্দটা হলো...আমরা গোয়েন্দারা আবার...তা যাকগে কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। ঠিক পা বাড়িয়েছি অমনি আবার খুট খুট খুটাং খুট খুটাং শব্দ হতে লাগলো বিষম জোরে। আমার কিন্তু তখনই সন্দেহ হলো...

সন্দেহ তোমার চুলোয় যাক, চকলেটের বাক্সগুলো গেল কোথায়? তিনজনেই সমস্বরে জানতে চায়।

আরে বাপু বলতে তো দাও আগে...আমি না তখন আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে প্রথমেই আমার থ্রি নট থ্রি হাওয়া বন্দুকটা তুলে নিয়ে সঙ্গে নিলুম লামাকে। ওকে দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে আমি চুপি চুপি ঢুকলুম ঘরে। সবে বন্দুকটা বাগিয়েছি কিন্তু ফায়ার করবার আগেই কী করে যেন আমাদের সাড়া পেয়ে ব্যাটারা দুদ্দাড় ভেগে গেল সবাই। গভীর অন্ধকারে ওদের সেই জ্বলন্ত রক্তচক্ষু দেখলে তোমরা তো কোন ছারপোকা সাক্ষাৎ কিরীটীরও চক্ষুজোড়া মার্বেল হয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতো। তারপর ঐ ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দেখি বাক্স মতো কী যেন সব হাতে ঠেকছে ঠিক এইখানটায়—তখন তো আর ঐ অন্ধকারে অতশত বুঝতে পারছি না যে এগুলো কী! যদি বুঝতে পারতুম যে এগুলোই চকলেটের বাক্স তাহলে কি আর খুলে দেখি! ভাবলুম দুর্বৃত্তরা হয়তো কোনও মারাত্মক কোনও সময় বোমা-টোমা সাজিয়ে রেখে গেছে তাই অন্ধকারেই বাক্সগুলো খুলে ফেলি, না খুলে উপায় ছিল কী তোমারই ভেবে দেখো, আর খুলতেই কেমন যেন একটা মিষ্টি গন্ধ এসে ধাক্কা মারলো নাকে, মাথার ভেতরটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগলো আর, আর মুখের ভেতরটা কেমন যেন রসিয়ে ভিজে ভিজে লালা গড়াতে লাগলো অনর্গল, আমি দিশেহারা হয়ে সমস্ত বিপদাপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে চট করে মুখের ভেতর পুরে...

তবে রে পাজি, নচ্ছার, ছুঁচো...ওসব তোমারই মামাদোবাজী...বলতে বলতে শারি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় গোগোদার কান দুটো ধরে ফেললো তড়াক করে। সহকারী চোমংলামা এতক্ষণ গোগোদার পাশে দাঁড়িয়ে গা ঘেঁষে ঘেঁষে একটানা গরগর শব্দে সব ঘটনার সাফাই দিচ্ছিলো।

রাবড়ির পাটা তাকে তাক করে ওপরে উঠতেই মানে মানে সে কেটে পড়লো সুড়ৎ করে অর্থাৎ কেটে পড়াই শ্রেয় মনে করলো আর তাছাড়া তখন কিংকর্তব্য তোমারই বলো না?

ততক্ষণে গোগোদার পরিত্রাহি চিৎকারে ফের বাড়ির সবাই এসে জড়ো হলো একসঙ্গে।

গার্জেনভিলার রহস্য

জ্যোতির্ময় ঘোষ

"খুন না-করে অনিন্দ্যকে তো শয়তানগুলো গুম করেও রাখতে পারে? যেখানেই থাক, আমার বাচ্চু যেন প্রাণে বেঁচে থাকে। আমি যেন আমার মৃত্যুর আগে সত্যর ছেলের হাতে বিষয়সম্পত্তিগুলো বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারি। না হলে মরেও আমার শান্তি হবে না। কী মনে হয় তোমাদের, বাচ্চুটা বেঁচে আছে তো?" প্রায় ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কথাগুলো বলছিলেন গার্জেনবাবু। মনু, তনু, জ্যোতিদের কানে সব কথা ঢুকছিল না ভালভাবে। এসেছিল আনন্দ করতে। কতদিন ধরে ভেবেচিন্তে ভ্রমণসূচি তৈরি করেছিল ওরা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে অনিন্দ্যদের বাড়িতে বেড়াতে আসবে। এই জায়গা কেন্দ্র করে তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, শান্তিনিকেতন যাবে। তুম্বুনি যাবে, সুড়িচুয়া যাবে, সোজা চলে যাবে দুমকা পর্যন্ত। দিন পনেরো বা প্রয়োজনে সপ্তাহতিনেক ঘুরেটুরে ফিরবে কলকাতায়।

জায়গাটার কথা কত শুনেছে অনিন্দ্যর মুখে, ট্রেনে চেপে থেকে হাজারটা প্ল্যান ঘুরছিল ওদের মাথায়। কিন্তু প্রথমেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল, মফস্বলের ছোট স্টেশনের

প্ল্যাটফর্মে গাড়ি ঢুকতেই ওভারব্রিজ পার হয়ে গেটে টিকিট দেখিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেও যখন ওরা অনিন্দ্যকে কোথাও দেখতে পেল না। না অনিন্দ্য, না তাদের বাড়ির কোনও লোকজন বা অন্তত ড্রাইভারসহ তাদের গাড়িটা।

বীরভূম-বিহার হাত ধরাধরি করে মিলেছে, এমন একটি পথ হল দুমকা রোড। সে-পথের মাটি লাল। রাঢ় অঞ্চলের গৈরিক শোভার সঙ্গে সম্মিলিত সাঁওতাল পরগনার শাল-পিয়ালের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল নিয়ে অনিন্দ্যর মুগ্ধতাও বাবার কাছে পাওয়া উত্তরাধিকারের মতো।

ওর বাবা সত্যসুন্দর চৌধুরী কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ফরেস্ট অফিসার হিসেবে। তিনিই একালে প্রথম কাগজপত্রে প্রবন্ধ লিখে তথ্য পরিসংখ্যানযোগে গবেষণা করে নানাভাবে সবুজের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন। গাছগাছালির মূলোচ্ছেদ করার, জঙ্গল কেটে ফেলার অর্থ যে একালের মানুষের পক্ষে আত্মহননের নামান্তর, সোজা কথাটা সব শ্রেণীর মানুষকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টায় কম মেহনত তিনি করেননি।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিদেশেও তিনি জঙ্গলাকীর্ণ বহু জায়গা পরিদর্শন করে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। এই সূত্রেই তিনি অসমে ব্যাপক পরিক্রমা করেন।

কলকাতা-গুয়াহাটি যাওয়া-আসার বিমানভাড়া তখন খুব বেশি ছিল না। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানও তাঁর বনসংরক্ষণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সপক্ষে তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত করত, প্রয়োজন বুঝে তাঁর গবেষণামূলক কাজে আর্থিক সহযোগিতার হাতও বাড়িয়ে দিত।

সত্যসুন্দরের বাবা সুরুচিশোভনবাবু খুব সাধারণ অবস্থার মধ্যে থেকেও আদর্শবাদী ও রবীন্দ্রানুরাগী বাবার ইচ্ছায় শান্তিনিকেতনের গোড়ার যুগের ছাত্রদের মধ্যে একজন হতে পেরেছিলেন, যাঁরা সরাসরি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। বীরভূম-বিহারের সীমান্ত-ঘেঁষা এই শহরেই শেষ পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয় শিক্ষকের সেকালের সামান্য বেতনের বিনিময়ে চলে আসেন এবং থেকে যান। প্রকৃতিকে ভালবেসেই তিনি দুমকা রোডের প্রায় ওপরেই নামমাত্র দামে বিঘা দুই জমি কিনে ফেলেন, একটি বাড়িও ক্রমশ তৈরি করেন, বাড়ির মধ্যে বিচিত্র গাছগাছালি, ফুলফল এবং একটি পুষ্করিণী সমস্তই তাঁর বিচিত্র নিসর্গপ্রীতির ফল।

সত্যসুন্দর গুয়াহাটি অঞ্চলে বারবার যেতে যেতে জনৈক ব্যবসায়ী বন্ধুর উৎসাহ ও প্রেরণায় প্রথমবার গুয়াহাটির কাছে নীলাচল পাহাড়ে দেবী কামাখ্যার মন্দিরে যাত্রা করেন। অম্বুবাচীতে মহামেলা আরম্ভ হয় সেখানে প্রতি বছর। সেই সময়েই কামাখ্যা দর্শন প্রশস্ত বলেও সেবারে প্রথমে মন্দিরে ওঠেন সত্যসুন্দর।

সত্যসুন্দরকে তার ব্যবসায়ী বন্ধু অলোকমোহন বড়ুয়া বলেছিলেন, “এই যে আপনি কামাখ্যাদর্শন করলেন, অন্তত তিনবার আপনাকে আসতে হবে এখানে।” সে-কথা নিয়ে যুক্তিবাদী সত্যসুন্দর মাথা ঘামাননি কিন্তু আত্মীয়স্বজন বন্ধুদের সবাইকে তিনি পীঠস্থান বলে নয়, নিছক নৈসর্গিক সৌন্দর্য দর্শনের জন্যও দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যায় যেতে উদ্বুদ্ধ করতেন। বলতেন, ধর্ম বা পুণ্যের লোভে নয়, যেতে বলছি স্বদেশের ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতিকে জানতে, প্রকৃতির সাহচর্য পেতে। জানো তো, ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে

pathagar.net

কোচরাজ নরনারায়ণ ও চিল্লা রায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কেও জানা উচিত। বাংলার ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে ভালভাবে বুঝতে হলে সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থেকে তা সহজে হবে না, প্রতিবেশী রাজ্য ও প্রদেশগুলি সম্পর্কে ধ্যানধারণা স্বচ্ছ ও পড়াশোনা গভীর থাকা দরকার। অসম, ওড়িশা আর বিহারের প্রধান অংশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের অতুলনীয় নিসর্গ আর ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির অমূল্য ঐশ্বর্য।

সত্যসুন্দর ছেলেবেলায় অসংখ্যবার শুনেছেন তাঁর বাবার মুখে, "গুরুদেব আর ক্ষিতিমোহন আমাদের বলতেন, দেশ-দেখার চোখ চাই। না-হলে দেশের মানুষকে বুঝবে না। বুঝতে যদি চাও, সাধারণ মানুষের জীবনের দিকে তাকাও। গভীরে যাও।"

অনিন্দ্য যা-কিছু শুনেছে ছেলেবেলায় বা সত্যসুন্দর আর মা নীহারনলিনীর মুখে, সেই সবই সে দিনের পর দিন শুনিয়েছে তার সবচেয়ে প্রিয় দুই সহপাঠী বন্ধু মনু আর জ্যোতিকে, আর মনুর দু'বছরের ছোট বোন তনুকে। দু'বছরের ছোট হলে কী হবে, কথাবার্তায় বুদ্ধিতে আর তীক্ষ্ণ কাণ্ডজ্ঞানে তনু ওর দাদা আর দাদার বন্ধু জ্যোতির থেকে কিছুমাত্র কম যায় না।

বাবা-মা দু'জনকেই নিতান্ত অকালে হারিয়েছে অনিন্দ্য। তাই বাবা-মা দু'জনের কাছে যা কিছু শুনেছে, শিখেছে ও সমস্তই অনর্গল বলে তার প্রিয় এই তিন বন্ধুকে।

দূর সম্পর্কের মামা গার্জেনবাবুই তার মা-বাবার শোচনীয় মৃত্যুর পরে একমাত্র অভিভাবক। তিনি সদ্য দুর্ঘটনায় অনিন্দ্যকে হারিয়ে তার এই তিন বন্ধুকে কতকটা আঁকড়ে ধরলেও আসলে মানুষটি রীতিমত রাশভারী।

অনিন্দ্য অর্থাৎ বাচ্চুর বয়স যখন বারো তখনই কামাখ্যা পাহাড় থেকে গাড়িতে নামতে গিয়ে এক বর্ষণমুখরিত সন্ধ্যায় বাবা সত্যসুন্দর আর মা নীহার নলিনী মুখোমুখি একটা ট্রাকের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে ঘটনাস্থলেই একেবারে তালগোল পাকিয়ে বস্তুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যান।

শেষের দিকে কামাখ্যা মন্দিরে প্রায় প্রত্যেক মাসে দু-চারদিনের জন্য যেতে থাকেন সত্যসুন্দর। মাঝেমাঝে সস্ত্রীক। দু-তিনজন সাধক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সত্যসুন্দরের ঘনিষ্ঠতাও গড়ে ওঠে। দু-একজন সন্ন্যাসীকে অনিন্দ্য এই 'প্রান্তিক' নামের বাড়িতেও দেখেছে ছেলেবেলায়। দরজা বন্ধ করে তাদের সঙ্গে বাবা যে কী এতসব কথাবার্তা বলতেন জীবনের শেষদিকে, তার খুঁটিনাটি জানার বয়স ও কৌতূহল কোনওটাই তখনও হয়নি অনিন্দ্যর।

বদলির চাকরিতে অনিন্দ্যর পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছিল বলে সল্ট লেকে কেনা ফ্ল্যাটে নীহারনলিনী ছেলেকে নিয়ে থাকতে লাগলেন। সত্যসুন্দরকে ঘুরেফিরে কলকাতায় আসতেই হত। অনিন্দ্যর বয়স যখন বছর দশেক, তখন থেকেই সে সল্ট লেকের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল। ভর্তি হল এ. ডি. স্কুলে।

কামরূপ কামাখ্যার গল্প শুনে-শুনে নীহারনলিনীও সেখানে স্বামীর যাত্রাসঙ্গিনী হতে শুরু করেন অনিন্দ্য একটু বড় হতেই।

কামাখ্যাতেই নীহারের লতায়পাতায় দাদা অভিরূপের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় একবার

সত্য আর নীহারের। অভিরূপ গুয়াহাটিতে কাঠের ব্যবসা করে যখন বেশ দাঁড়িয়ে গেছেন, তখন তিনি গ্রাম থেকে নিয়ে আসেন গ্রামসম্পর্কিত ভাই অনুপমকে। অনুপম অল্পদিনেই ব্যবসাটা ধরে ফেলায় অভিরূপ নিশ্চিন্তচিত্তে সাধুসঙ্গ করতে থাকেন। জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত অভিরূপ নিজে বিবাহ-সংসার করার সময়ই পাননি। তিনি অনুপমের বিয়ে দিলেন গুয়াহাটিতেই দীর্ঘকালের বাসিন্দা একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী পাত্রী কাঞ্চনমালার সঙ্গে। তাদের একটিমাত্র সন্তান ছেলে কাজল, অনিন্দ্যরই সমবয়সী প্রায়। অভিরূপের সংসারে মন নেই, ব্যবসার ভার অনুপমের হাতে সঁপে তিনি কামাখ্যা পাহাড়েই একটি ছোট ঘরে আস্তানা পাতেন। লম্বা চুলদাঁড়ির মধ্যে চেনা মুখটিতে খুঁজে বের করতে খুব কষ্টই হয়েছিল নীহারের। তবু কথাবার্তা কিছুক্ষণ গড়াতেই জানা যায়, সত্যসুন্দরের অন্তরঙ্গ সাধুদের কেউ-কেউ অভিরূপকে ভালই চেনেন।

কিছুদিনের মধ্যেই অভিরূপের কাছে খবর আসে, তার সাধের কাঠের ব্যবসা অনুপম লাটে তুলে দিয়েছে। দোষ তারও ততটা নয়, যত বেশি স্ত্রী, কাঞ্চন আর ছেলে কাজলের। মা-ছেলে দু'জনেই বড় বেশি আধুনিক আর বিলাস-ব্যসনে রপ্ত। সংসার ছেড়ে এলেও অভিরূপের মনে খুব আঘাত লাগে। হাজার হোক, নিজের হাতে বহু কষ্টে তিল-তিল করে গড়ে-তোলা একটা কর্মকাণ্ড তো। কাজল আর তার মায়ের সন্দেহ, অভিরূপ এমন কী পেলেন সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে, জমজমাট কাঠের ব্যবসা ছেড়েছুড়ে দিয়ে তিনি কামাখ্যা পাহাড়েই বসবাস শুরু করে দিলেন দীনহীনের মতো, একটা ঝুপড়ির মধ্যে। কাজল মায়ের পরামর্শে জেঠুর কাণ্ডকারখানা দেখতে আর বুঝতে কামাখ্যা পাহাড়ে মাঝেমাঝেই অভিযান চালাতে লাগল।

মন ভেঙে গেল অভিরূপের সবকিছু দেখেশুনে। একবার সত্য আর নীহারের কাছে সেই ভাঙা মনের খবর প্রকাশও করে ফেললেন অভিরূপ। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তখন ধরে বসল অভিরূপকে, "দাদা, আপনি আমাদের বীরভূমের বাগানবাড়িতে গিয়ে থাকুন। সবকিছু দেখাশোনা করুন। আমাদের গার্জেনের মতো।"

সেই থেকে অভিরূপ হয়ে গেলেন গার্জেনবাবু। 'প্রান্তিক' লোকের মুখে মুখে গার্জেনভিলা। থাকতে লাগলেন শুধু নয়, ভালবেসে ফেললেন বীরভূম-সাঁওতাল পরগনার এই সীমান্ত অঞ্চলটিকে। এক নিসর্গ থেকে আর-এক নিসর্গে। সেখানে ছিল আত্মীয়দের বঞ্চনা, এখানে দূরাত্মীয়দের শ্রদ্ধা-প্রীতি। গার্জেনবাবু আর কামাখ্যা পাহাড়ে যান না। কলকাতার ধোঁয়া, ধুলো ময়লা। ট্রামবাস জ্যামজমাট পরিবেশও তাঁকে টানে না। মাঝেমাঝে দু'একদিনের জন্য সত্য আসেন। একবার-দু'বার নীহারও ঘুরে গেছেন শিশুপুত্রকে নিয়ে।

এইসব কথা টুকরো টুকরো শোনা যার কাছে, সেই প্রাণের বন্ধু অনিন্দ্য সত্যি গেল কোথায়? গুমখুন হল, নাকি তাকে গুম করে রাখা হয়েছে কোথাও? ভাবছিল আর নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল মৃদু গলায় মনু, তনু আর জ্যোতি।

মনু বলছিল, অনিন্দ্য এসেছিল এখানে গতকাল বিকেলে। দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে। আমরা আজ বিকেলে। মাত্র ঘণ্টা দুই। স্টেশন থেকে রিকশা নিয়ে এখানে পৌঁছলাম। কোথাও কোনও কথা শুনিনি পথে। অনিন্দ্য এখানে খুন হতে পারে না। গার্জেনমামা

খুনের আশঙ্কা করছেন কেন? আবার ওকে গুম করে রাখার আশঙ্কাও উনি প্রকাশ করছেন।

"ধরো, এমনও তো হতে পারে, আশপাশে কোথাও বেড়াতে গেছে।" তনু বলল।

"গার্জেনমামাকে না বলে যাবে কেন?" মনুর প্রশ্ন।

জ্যোতি বলল, "একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ছে? একটা বুড়ো মালী। চোখে দেখতে পায় না ভাল। ওই কোণে টালির ঘরে থাকে। তার চোখ ছলোছলো। মুখটা ভয়ে বিবর্ণ। কথাই বলতে পারছে না ভাল করে। আর ওই হল হাবার মা। মাত্র সপ্তাহ দুই আগে এই মহিলাকে এখানে সারাদিনের যাবতীয় কাজের আর রান্নাবান্নার জন্য রাখা হয়েছে। মহিলাকে দেখেশুনে কি খুব দুস্থ বলে মনে হল? আর, হাবাকে তো এসে থেকে একবারও চোখেই দেখা গেল না।"

মনু বলল, "অনিন্দ্য যে ঘরটা থেকে কাল রাতেই উধাও বলে শুনলাম, সেই ঘরটা একবার ভাল করে দেখবি না জ্যোতি? যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়?"

জ্যোতি মুখটা কঠিন করে বলল, "গার্জেনমামার সঙ্গে গিয়ে এক ঝলক ঘরটা দেখেছি। বলছিস, চল। তবে ও ঘরে তেমন কোনও ক্লু পাবি বলে মনে হচ্ছে না। আর আমি যা দেখতে চাইছি, গার্জেনমামাকে সেটা বলতেও রীতিমত অস্বস্তি লাগছে।"

"কী? কী দেখতে চাইছ তুমি জ্যোতিদা?" জিজ্ঞেস করে তনু।

"যে সুটকেসটা সঙ্গে এনেছে অনিন্দ্য।" ঋজু উত্তর জ্যোতির।

"কেন, কী হবে দেখে? মনটাই শুধু আরও খারাপ হবে তো?"

বোনের কথায় মনুও সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়ল। তবে মুখে বলল, "আমি বলছিলাম, ঘরের মধ্যে খুঁটিয়ে দেখলে কিছু যদি পাওয়া যায়। ধর, যে বা যারা একে ধরে নিয়ে গেছে..."

"ধরেই নিয়ে গেছে এবং জোর করে, তাই বা ধরে নিচ্ছিস কেন? এমনও তো হতে পারে, স্বেচ্ছায় যেতে পারে এমন কোনও জায়গার নাম করা হয়েছিল ওর কাছে। ও নিজেই বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। তারপর অবশ্য জোরজবরদস্তির প্রশ্ন উঠতেই পারে।"

এর পরের কথাগুলো বিড়বিড় করে কোনওভাবে বলল জ্যোতি, "আচ্ছা, অনিন্দ্য আদৌ এখানে কাল এসেছিল তো? মানে, আসার সুযোগই পায়নি, এমন যদি হয়?"

মনু, তনু দু-ভাইবোনের চোখে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ভাবটা বড় আকারেই ফুটে উঠেছিল, এমন সময়ে কার দীর্ঘ ছায়া পড়ল ঘরের মধ্যে। দু'জনেই চুপ হয়ে গেল এবং ভাবলেশহীন মুখে তাকাল দরজার দিকে। গার্জেনবাবু কখন এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার মুখে, কেউ তা খেয়াল করেনি। তিনিই বললেন, "চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলল, কিছুক্ষণ আগেই বাচ্চুর ব্যাপারে পুলিশকে খবর দিলাম। হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে পুলিশ অফিসার। তোমরা তার বন্ধু, তার ওয়েলউইশার, তোমাদেরও জানানো দরকার। তা ছাড়া শাস্ত্রবাক্যই তো আছে না, প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে......ইত্যাদি। তোমরা তো এখন আমার বন্ধুর মতোই।"

"কাল রাতে নিখোঁজ হয়েছে। আজ অন্তত সকালেই তো জানানো দরকার ছিল মামাবাবু। যাই হোক, তবু একটা কথা আছে। কলকাতা থেকে এস. টি. ডি-তে

আপনাকে ওর আর আমাদের এখানে আসার প্ল্যানটা জানিয়েছিল অনিন্দ্য দিনচারেক আগে। আমরা আজ এসেছি। ও বলেছিল, একদিন আগে এসে ও এদিকটা গুছিয়ে রাখবে, স্টেশনে আমাদের রিসিভ করবে ইত্যাদি। কিন্তু ও যে এ-বাড়িতে পৌঁছে উধাও হয়ে গেছে কাল রাতেই, কথাটা আপনি পুলিশকে কীভাবে বিশ্বাস করাবেন? মানে, আমি প্রমাণের কথা বলছিলাম আর কি! পুলিশ তো বিনা প্রমাণে কোনও কথাও শুনবে না?"

জ্যোতির কথা শুনে দু'চোখ কপালে তুলে গার্জেনবাবু, "ওরে বাবা, তুমি তো দেখছি একেবারে টিকটিকিদের মতো কথাবার্তা বলতে শুরু করলে? মানে তোমার নিজেরই মনে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে না কি যে, বাচ্চু এ-বাড়িতে আদৌ পা রাখেনি। মানে, আমার ভাগ্নে, আমিই তাকে চিনি না। বলো কী হে!"

জ্যোতি জিভ কেটে বিনীত গলায় বলল, "না, না, মামাবাবু। আসলে গত কয়েক বছর, মানে ওর মা-বাবার অপঘাত মৃত্যুর পরে আপনার সঙ্গে তো ওর দেখাই হয়নি। মাঝে-মধ্যে ফোনে কথা। ওর অসুস্থ পিসিমা আর ও, কেউ কাউকে ছেড়ে তো থাকতে পারে না। কাজের লোকজন থাকলেও পিসিকে আঁকড়েই তো ও আছে।"

"দ্যাখো জ্যোতি, ছেলেবেলায় আমি ওকে বারকয়েক তো অন্তত দেখেছি। ও-ও আমায় দেখেছে। সত্য আর নীহারের সঙ্গে অনিন্দ্য তো কামাখ্যা পাহাড়ে বেশ ক'বার গেছে। নিজের মামা না-হতে পারি, তাই বলে দু'জন দু'জনকে চিনতে পারব না, এটা কী ধরনের কথা হল?" বেশ একটু রেগে গিয়েই বললেন গার্জেনবাবু।

জ্যোতি লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল। মনু, তনু ও জ্যোতির কথাবার্তার ভঙ্গিতে মনে হল বেশ অপ্রসন্ন। হাজার হলেও বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অনিন্দ্যর গার্জেনমামা তো বটে।

এইরকম কথাবার্তার সময়েই জানা গেল, স্থানীয় থানার ও. সি. বীরেশ্বর বরাট এসে গেছেন। জ্যোতি নামটা শুনেই সচকিত হয়ে নিজেকে সামলে নিল এবং সেই সময়েই হাবার মা একগলা ঘোমটা টেনে দরজার মুখে দাঁড়াতেই ছিটকে বেরিয়ে গেলেন গার্জেনবাবু।

বরাটকে নিয়ে দোতলার বসার ঘরে আপ্যায়ন করলেন গার্জেনবাবু। থালাভর্তি মিষ্টি সাজিয়ে ঘরে ঢুকল হাবার মা। এই সময়ে জ্যোতি মনু, তনুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকতে যেতেই প্রকৃতই চমকে ওঠে। হঠাৎ ঘোমটা কিছুটা ফাঁক হতেই ওর চোখে পড়ে যায় হাবার মা'র নাকের চাবিটা। সোনার মাঝখানে রক্তবিন্দুর মতো বহুমূল্যবান পাথর? ও কি হীরে?

তৎক্ষণাৎ গার্জেনবাবু কী বুঝলেন, তিনি দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে হাবার মা'র দিকে এগিয়ে যান।

চকিতে ও. সি. বীরেশ্বর বরাট জ্যোতির দিকে খুশিভরা অবাক চোখে তাকিয়ে কিছু একটা বলবার উপক্রম করতেই জ্যোতির নিজের বদ্ধ ওষ্ঠে আঙুল চেপে পিতৃবন্ধু বরাটকে নিবৃত্ত করে। প্রথম পরিচয়ের ভঙ্গিতে নমস্কার করে দ্রুত বলে ওঠে, "আপনিই সার এখানকার ও. সি. মিঃ বরাট?"

প্রতি-নমস্কার করে বরাট বললেন, "আপনারা তিনজন হচ্ছেন অনিন্দ্যর বন্ধু, ফোনেই

বলেছেন গার্জেনবাবু।"

জ্যোতি বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। আমাদের আপনি স্বচ্ছন্দে 'তুমি' বলতে পারেন।"

"ও, আপনাদের পরিচয় হয়ে গেছে। যাই হোক, মিঃ বরাট, সমস্তই তো ফোনে বলেছি আপনাকে। একটু কিছু মুখে দিয়ে আমার বাচ্চুসোনাকে উদ্ধার করে এনে দিন। সারা জীবন আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।"

"মিষ্টিটা থাক গার্জেনবাবু। আমার ছেলের বয়সী একটি ছেলে এভাবে আমাদের শহরে পা দিতে-না-দিতেই উধাও, এই অবস্থায় আমার মুখে কিছু রুচবে না। এখন চলুন, অনিন্দ্য যে-ঘরটায় ছিল, আগে সেই ঘরটা, ওর জিনিসপত্র আর আশপাশটা একটু দেখে আসি।"

গোটা বাড়ি আর আশপাশটা দেখে সবাই মিলে অনিন্দ্যর ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে জ্যোতি ঘরের দিকে তাকিয়েই তনুর দিকে তাকাল। চোখে-চোখে কিছু কথা হল, মনু তা লক্ষ করে ঘরের দিকে আরও একবার তাকিয়ে বলেই ফেলল, "এ তো ভৌতিক কাণ্ড দেখছি। অনিন্দ্যর ব্যাগটা তো এই মিনিটদশেক আগেও এখানে ছিল না। এখন এল কোথা থেকে?"

"তোমার চোখে না-পড়লেই তো ব্যাগটা উধাও হয়ে যেতে পারে না মনু।"—একটু কুপিত সুরেই বললেন গার্জেনবাবু।

ততক্ষণে সন্তর্পণে ব্যাগটা তুলে চৌকির পরে রেখেছেন ও. সি. এবং তাঁর ইঙ্গিতে তনু সেটার চেন আলগোছে টেনে খুলে ফেলেছে। লক না-থাকায় কোনওভাবেই কোনও অসুবিধে হল না খুলতে। বড় কিট্স্ ব্যাগ। জামা-প্যান্ট-তোয়ালে বেশ কিছুটা এলোমেলো হয়ে আছে।

ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল আরও দুটি জিনিস। এক বাণ্ডিল বিড়ি আর দেশলাই। এবং একটা পকেট-চিরুনি। তিন বন্ধুই জানে, অনিন্দ্য বিড়ি-সিগারেট খায় না, আর পকেটেও কোনও চিরুনি রাখার অভ্যাস তার নেই। বিশেষ করে চুল আঁচড়ানোর জন্য যে ব্রাশটা ব্যবহার করে, সেটাও যখন পাওয়াই গেল ব্যাগের মধ্যে।

ও. সি. বরাট তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে কিছু একটা বুঝলেন। তিনি এসব জিনিস সহ পুরো ব্যাগটাই কনস্টেবলকে দিয়ে নিজের জিপ গাড়িতে তুলে নিলেন এবং যাওয়ার সময় জ্যোতি, মনু, তনুদের বললেন, "তোমরা দু-তিনদিনের জন্য বেড়াতে এসে সত্যিই খুব ঝামেলায় আর মনোকষ্টে পড়ে গেলে। তবু বলছি, পুলিশের চাকরি করি তো! আইনের বাইরে যেতে পারি না। তোমাদের তিনজনকেই আমার সঙ্গে ঘণ্টা দু-তিনের জন্য একটু থানায় যেতে হবে। নিয়মমাফিক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে তো?"

এতক্ষণ খুব অস্বস্তিতে ছিলেন গার্জেনবাবু। এবার যেন একটু উৎসাহ বোধ করলেন। উদ্বেগের ভাব মুখেচোখে যথাসাধ্য ফোটাতে গিয়েও ঈষৎ জব্দ-করা খুশিতে বলে উঠলেন, "বরাট সাহেব, আমার বাচ্চুর ব্যাপারে শুধু দু-তিন ঘণ্টার জন্য কেন, আপনি যদি মনে করেন, আমাদের সবাইকে লক-আপেও রাখতে পারেন। আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।"

"বিনা কারণে বা তুচ্ছতম কারণে কেন কাউকে লক-আপে রাখতে যাব বলুন গার্জেনবাবু। অনিন্দ্য এখানে বেড়াতে এসে এখান থেকে উধাও হল, তার মানে এই নয় যে, এই জায়গাটা বা বাড়িটা বা এখানকার কোনও লোকই এর জন্য দায়ী, সেইজন্যেই ওর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গেও খুঁটিনাটি কথা বলা দরকার।"

গলাটা একটু নামিয়ে বললেন তারপর, "এখানকার ছেলেমেয়েদের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা। আর এসব আমরা কাউকেই সন্দেহের উর্ধ্বে বলে মনে করি না।"

এসব কথা বলতে-বলতে সবাই যখন নীচে নেমে এসেছেন, তখনই মনে হল, একতলায় রান্নাঘরের পাশের ঘরটা থেকে জ্যোতিদের বয়সী একটা ছেলে দ্রুত বেরিয়ে এসে বাইরে বেরনোর গেটের দিকে প্রায় ছুটে চলে গেল।

বরাট জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে গার্জেনবাবু একটু যেন আমতা-আমতা করেই বললেন, "তবে কি হাবা ফিরে এল?"

বরাট বললেন, "হাবাকেও তো একটু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। ডাকুন না ওকে।"

কিছুক্ষণ ডাকাডাকি, খোঁজাখুঁজির পরেও হাবাকে কিন্তু পাওয়া গেল না। বরাট নিজেই জিপ চালিয়ে থানার দিকে রওনা দিলেন। কিন্তু জিপ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরে জ্যোতি বলল, "বরাটকাকু, গার্জেনবাবুর বাড়ির পেছন দিকটায় যাওয়া দরকার আমাদের। হাবাটাকে পাকড়াও করতে পারলে মনে হয় অনিন্দ্যর কোনও খবর মিলতেও পারে।"

"তোমার কথাই ঠিক মনে হয় জ্যোতি। তবে দু-একটা জরুরি ফোন করা এবং গার্জেনবাড়িটা পুলিশ ফোর্স দিয়ে ঘিরে রাখার ব্যবস্থার জন্য আমাকে একবার থানায় যেতেই হবে।

এইসব কাজ সেরে আধঘণ্টার মধ্যেই মনু-তনুসহ জিপটা গার্জেনভিলার পেছনের দিকের ঝোপঝাড়ের আড়ালে রেখে জ্যোতিকে নিয়ে রিভলভার হাতে বরাট গার্জেনভিলার পরে ঝুঁকে-পড়া একটি বটগাছের ডাল আশ্রয় করে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মশার উপদ্রব চলতেই লাগল।

রাত একটু গভীর হতেই গার্জেনভিলার সব আলো নিভে এল। প্রধান প্রবেশ-পথেরটি ছাড়া। বরাট ও জ্যোতি সন্তর্পণে পাঁচিল পার হয়ে ফুলের বাগানের মধ্যে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ায় মুহূর্তের জন্য দ্বাররক্ষী সচকিত হলেও বিপদের আশঙ্কা ক্রমশ কেটে গেল।

হঠাৎ বরাট ও জ্যোতি তর্কাতর্কি শুনে আওয়াজ লক্ষ্য করে একতলায় একটা ঘরের পেছনে এসে দাঁড়ায়। নিশুতি রাত। ছোট্ট শহরসীমা ছাড়িয়ে এই বাড়ি। তারপর ঝোপঝাড়, জঙ্গল মতো। ঝনঝনিয়া পুল। একটি খরস্রোত লম্বা খাল। তারপর সাঁওতাল পরগনার টিলাভর্তি প্রান্তর। যারা কথা বলছে, তাদের গলায় রাগ আর উত্তেজনা।

"তুই আমাকে না বলে ব্যাগটা ওখানে রাখলি কেন? তোর বিড়ি-দেশলাই ব্যাগে ঢোকাতে গেলি কেন? অনিন্দ্যকে খতম করার কথা ছিল। দায়িত্ব নিয়েছিলি। তাও পারলি না? ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে সন্দেহ ঢুকছে। ও. সি. টাও মনে হয় গোলমাল করতে পারে। তারই মধ্যে তুই এ-ঘর থেকে এমন সময়ে বেরোলি, যখন তোকে ওরা

সবাই দেখে ফেলল। তোর বিষয়সম্পত্তি কী হবে? তুই সব নষ্ট করতেই শিখেছিস।"

আশ্চর্য এই, কথাগুলো বলছেন গার্জেনবাবু। বোঝা যাচ্ছে, বলছেন হাবাকে। কে হাবা? হাবার কথা শুনে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল।

"তুমি তো আসল গার্জেনবাবুকে সরিয়ে গার্জেনবাবু সেজে বসে আছ। গার্জেনবাবুকে যেখানে রেখেছ, সেখানেই আমি অনিন্দ্যটাকেও জমা করে দিয়েছি। আর তো দুটো দিনের মামলা। সাঁইথিয়ার চৌরাশিয়ার কাছ থেকে টাকাটা নিয়েই কেটে পড়া। গার্জেনবাবু আর অনিন্দ্যকে সুরিচুয়ার সিধু মাঝির দল দুটো দিন আটকে রাখতে পারবে না? ডাক্তার আছে, ইনজেক্‌শন আছে। অত ভাবার কী আছে? আজকের রাতটা ঘুমিয়ে নাও।"

"যদি ও. সি. ছোকরাদুটো আর মেয়েটাকে নিয়ে আবার আজ-রাতে হানা দেয়, তখন কী হবে?"

তীক্ষ্ণ ও কর্কশ সুরে একটি নারীকণ্ঠের গর্জন শোনা গেল, "এক হাত ঘোমটা টেনে আমি ক'দিন রাঁধুনি সেজে বসে থাকব এই ফাঁকা মাঠে-জঙ্গলে? বৈদুর্যমণিটিরই বা কী হল? বাপ-ব্যাটা দুটোই হয়েছে বাক্যবাগীশ।"

"ধর্মভীরু বুড়োটা সেটা জমা দিয়ে বসেছে সরকারি হেফাজতে। এখন জমিবাড়ি বেচে টাকাটা নিয়ে কেটে পড়া। আর দু-তিনটে দিন বড়জোর।"

দ্রুতপায়ে জ্যোতিসহ বরাট গার্জেনবাড়ির প্রবেশপথের সামনে এসেই হুইস্‌ল বাজালেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে গার্জেনবাবুর ছদ্মবেশধারী অনুপম, হাবার মা অর্থাৎ তার স্ত্রী কাঞ্চন আর তাদের ছেলে হাবা সেজে থাকা কাজলকে পুলিশ গ্রেফতার করল। থানার গরাদের আড়ালে স্বামী-স্ত্রীকে জমা রেখে হাবাকে মারধোর করে জিপে চাপিয়ে জিপ ছুটল সুরিচুয়ার দিকে। সেখানে সিধু মাঝির ডেরায় গিয়ে তাকে নিয়ে পাতাল-কুঠুরিতে যেতেই চোখের জলে আর হাসিতে একটা সত্যিকারের মিলনদৃশ্য। বন্ধু অনিন্দ্য, জ্যোতি, মনু, তনুকে পেয়ে আনন্দে অধীর। গার্জেনমামা চার বন্ধুকে নিয়ে গার্জেনবাড়িতে ফিরে একটা উৎসবই করে ফেললেন। ও. সি. বরাট বন্ধুপুত্র জ্যোতির পিঠ চাপড়ে বললেন, "তুমি একদিন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা-প্রধান হবেই।"

তরুণগুপ্তের বিচিত্র কীর্তিকথা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

তরুণ গুপ্ত ঢাকুরিয়ায় মামার বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। তা ঐ যে বলে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানিতে বাধ্য হয়, আমাদের তরুণেরও তাহাই হইল। বড় মামা সকালে চা খাইতে খাইতে বলিলেন—কি কাণ্ড হয়েছে শুনেছিস? তরুণ তখন দিস্তা খানেক লুচি লইয়া বড় ব্যস্ত। ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না।

—কাল রাত্রে যে গুড্‌স ট্রেনখানা ডায়মণ্ডহারবার থেকে কলকাতায় গেল তার মধ্যে থেকে একখানা গাড়ী চুরি গেছে।

কথাটা শুনিয়া ভাগিনেয় যতটা আশ্চর্য হইবে মনে করিয়াছিল ততটা আশ্চর্য কিন্তু হইল না। তবুও কহিল, গাড়ী চুরি গেল কি রকম?

—কলকাতায় পৌঁছে দেখা গেল মধ্যের একটা ওয়াগন নেই।

—তাহলে পেছনে ছিল, কি রকম ক'রে খুলে পেছনে রয়ে গেছে।

—না রে বাপু না ; এখানা ঠিক মাঝখানে ছিল ; পিছনের গাড়ি যেমন ছিল তেমনিই আছে, প্রথমের গাড়ীও তাই—মাঝখান থেকে একখানা গাড়ী নেই।

এইবার তরুণ সত্যই আশ্চর্য হইল। এত রকমের চুরির কথা সে শুনিয়াছে কিন্তু ট্রেন চুরি—এ যে বড় অদ্ভুত ব্যাপার। অবাক হইয়া কহিল—মাঝখান থেকে গেল কি রকম? তার পরেরগুলো পৌঁছেছে?

—হ্যাঁ! তাইতেই এত বেশী অবাক হয়ে গেছে সকলে। গাড়ী সোনারপুর থেকে ছেড়ে একেবারে কলকাতায় গেছে, পথে কোথাও থামে নি। সোনারপুর থেকে যখন ছাড়া হয় তখনও সে গাড়ী দেখা হয়েছে এবং সব গাড়ী গুণে ছাড়া হয়েছে।

—যে খানা চুরি গেছে তাতে কি ছিল?

—তা বেশ দামী জিনিসই ছিল। মজিলপুরের চক্রবর্ত্তীরা কংগ্রেস একজিবিসনে খানকতক গালচে পাঠাচ্ছিল। মুঘলদের আমলের গালচে সব, এক এক খানার দাম খুব কম ক'রে আট দশ হাজার টাকা হবে। সব শুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল ছিল ঐ গাড়ীখানায়। রেল কোম্পানীর কাছে Consignment insure করা ছিল। যাদবপুর, বালীগঞ্জের স্টেশন-স্টাফ মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।...চাকরি নিয়ে টানাটানি বটেই—জেল খাটতে না হয়।

তরুণ খাইতে খাইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, চলুন দেখি, ব্যাপারটা দেখা যাক্।

মামা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, খেতে খেতে উঠলে কেন, কি মুস্কিল! খাওয়া শেষ ক'রে গেলেই হ'ত। এলি দু'দিন জিরোতে, তোর ওসব গোলমালে কাজ কি বাপু।

তরুণ হাসিয়া কহিল, আর আমি খাব না। সত্যিই অনেক খেয়েছি।...এই যখন আমার পেশা, তখন কি আমি এমন তাজ্জব কাণ্ড শুনেও চুপ ক'রে থাকতে পারি!

বড় মামা অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠিলেন, কহিলেন, কোন্ দিকে যাবে? চুরি ত বালিগঞ্জের দিকেও হ'তে পারে।

তরুণ কহিল, তা হয়ত পারে, কিন্তু বালিগঞ্জের থেকে যাদবপুরের দিকে চুরি যাবারই সুবিধা বেশী।

কখনও ডায়মণ্ডহারবার লাইনে যাঁহারা যান নাই তাঁহাদের সুবিধার জন্য স্টেশনগুলির অবস্থান একটু বোঝাইবার চেষ্টা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কলিকাতা, বালিগঞ্জ,
ঢাকুরিয়া, যাদবপুর,
গড়িয়া, সোনারপুর।

কলিকাতা হইতে সোজা দক্ষিণদিকে স্টেশনগুলি পরপর চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ঢাকুরিয়া ফ্ল্যাগ স্টেশন। অর্থাৎ ইহার নিজস্ব সিগন্যাল রুম বা সাইডিং কিছুই না।

শুধু প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি যাত্রী লইবার জন্য একবার করিয়া থামে মাত্র। সুতরাং ঢাকুরিয়ায় কিছু করা সম্ভবপর নয়। হয় গড়িয়া, নয় যাদবপুর, নয় বালিগঞ্জের পর কিছু হইয়াছে। যেহেতু বালিগঞ্জের দিকে চুরি করিবার মত নির্জন স্থান অল্প সেহেতু সেখানেও কিছু করা কঠিন। সুতরাং তরুণ যাদবপুরের দিকে যাওয়াই স্থির করিল। কিন্তু বেশীদূর যাইতে হইল না। পথেই ঢাকুরিয়ার স্টেশন মাস্টারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বড় মামাকে দেখিয়াই কহিলেন, মশাই, খালি গাড়ীখানা পাওয়া গেছে যাদবপুরের সাইডিং-এ, কিন্তু গালচে একখানাও নেই। সর্বনাশ হয়ে গেল।...

বড়মামা তরুণের সঙ্গে স্টেশন মাস্টারের পরিচয় করাইয়া দিলেন। এটি আমার ভাগ্নে তরুণ, সখ ক'রে গোয়েন্দাগিরি করে, নাম শুনেছেন বোধ হয়?

স্টেশন মাস্টার কহিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি বৈকি। আমাদের সৌভাগ্য যে এই সময়ে উনি এখানে এসে পড়েছেন। মশাই তরুণবাবু, যদি তাড়াতাড়ি এর একটা কিনারা করতে পারেন তা হলে আমরা এই ক'জন স্টেশন মাস্টার চাঁদা ক'রে আপনি যা চাইবেন তাই দেব।

তরুণ একটু হাসিয়া কহিল, চলুন ত দেখা যাক—তারপর আপনাদের বরাত, আর আমার হাত যশ।

তিনজনে লাইন ধরিয়া যাদবপুরের দিকে রওনা হইলেন। খানিকটা দূর গিয়াই নজরে পড়িল একখানা খালি মালগাড়ী একটা সাইডিং-এ দাঁড়াইয়া—এবং তাহাকে ঘিরিয়া অনেকগুলি লোক জটলা করিতেছে।

ঢাকুরিয়ায় স্টেশন মাস্টার যাদবপুরের স্টেশন মাস্টারের সহিত তরুণের পরিচয় করাইয়া দিলেন। একপালা নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পর তরুণ কাজ আরম্ভ করিল।

যাদবপুর ছাড়াইয়া আসিয়াই আপলাইন হইতে যে সাইডিং বাহির হইয়াছে সেইটিতেই গাড়ীখানা কাটিয়া লওয়া যাওয়া হইয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া...

সাইডিং যেখানে মেন লাইনের সহিত সংযুক্ত হয়, সেইখানটা তরুণ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিল। হাঁটু গড়িয়া লাইনে বসিয়া খালি চোখে এবং লেন্সের সাহায্যে সবরকমেই পরীক্ষা করা হইল। শেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তরুণ কহিল,—এ সাইডিং কি ব্যবহার করা হয়? স্টেশন মাস্টার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, গত তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও ব্যবহার হয়নি বোধহয়—

তরুণ কহিল, হুঁ। তাহলে এর জয়েন্টের মুখে যে তেল দেওয়া হয়েছে সে নিশ্চয়ই আপনাদের কোন লোক দেয় নি?

—নিশ্চয়ই না। বহুকাল ব্যবহার হয় নি, তা ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে ব্যবহারের সম্ভাবনাও নেই। শুধু শুধু কর্তব্যের খাতিরে ওরা জয়েন্টের মুখে তেল দিতে যাবে এত ভাল, মানুষ আমার পোর্টাররা নয়।

তরুণ কহিল, আপনাদের এখানে কাছাকাছি কারুর কাছে ক্যামেরা আছে?

স্টেশন মাস্টারের বড় ছেলেটি লাফাইয়া উঠিল, আমার কাছে আছে, নিয়ে আসছি।

সেই জয়েন্টের মুখে লাইনের উপর একটি তৈলসিক্ত ময়লা আঙ্গুলের ছাপ পড়িয়াছিল, তরুণ সাবধানে ক্যামেরার সাহায্যে তাহারই ছবি তুলিয়া লইল। তারপর রেলওয়ে পুলিশের ইন্সপেক্টরকে কহিল, এই আঙ্গুলের ছাপটা নিয়ে একবার হেড-অফিস খোঁজ ক'রে দেখুন দেখি কোনও পুরানো পাপী কিনা। আমার বিশ্বাস যে এমন কাজ করতে পারে, তার এই প্রথম কেস নয়।

তারপর স্টেশন মাস্টারের দিকে ফিরিয়া কহিল, বহুদিন অব্যবহারের জয়েন্টটা পাছে ঠিকমত কাজ না করে এই ভয়ে তেল দিতে গিয়েছিল। অঙ্গুলের ছাপটা উঠে গেছে—আচ্ছা আসি আমি আজ, যদি কোনও খবর পান—আমায় জানাবেন।

পরের দিন ভোর হইতে না হইতে ইন্সপেক্টর আসিয়া হাজির। আঙ্গুলের ছাপের

প্রতিলিপি হেড অফিসের দপ্তরে মিলিয়াছে, লোকটার নাম সীতানাথ। ইহার আগে ভীষণ ভীষণ চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে এবং বার দুই জেল খাটিয়াছে। বেঁটে, কৃষ্ণবর্ণ, মাথার মধ্যে ঈষৎ একটু টাক আছে। নাকটা খাঁড়ার মত সোজা নামিয়াছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানা গিয়াছিল যে সে যাদবপুর ও ঢাকুরিয়ার মাঝামাঝি বৈষ্ণব-ঘাটায় থাকে।

তরুণ কহিল, চলুন, একবার খোঁজ ক'রে দেখা যাক্!

দুই জনে বাহির হইয়া পড়িল। তরুণ কিছুদূর গিয়া কহিল লোকটাকে শাস্তি দিতে চান, না জিনিসগুলো ফিরে চান?

ইন্সপেক্টর কহিলেন, জিনিসগুলো আগে চাই—নইলে রেল-কোম্পানীকে কত টাকা খেসারৎ দিতে হবে তার ঠিক আছে? ভালয় ভালয় যদি মালগুলো ফেরৎ পাওয়া যায় তা' হলে ওকে ছেড়ে দিতেও রাজি আছি!

বৈষ্ণবঘাটা বেশী দূর নয়। সাতটা বাজবার আগেই দু'জনে পৌঁছিলেন। একজন মুসলমান দাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বাড়ী দেখাইয়া দিল। তরুণ ইন্সপেক্টরকে একটু আড়ালে থাকবার অনুরোধ করিয়া খুব জোরে কড়া নাড়িতে লাগিল। প্রায় মিনিট পাঁচেক কড়া নাড়িবার পর ভিতর হইতে মোটা ভারী স্ত্রীকণ্ঠে জবাব আসিল—কে-রে?

তরুণ কোনও কথা না কহিয়া কড়া নাড়িয়াই চলিল। তখন কপাটটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া এক স্ত্রীলোক উঁকি মারিল। যেমন মোটা তেমনি বেঁটে এবং তেমনি কালো, তাহার উপর নাকটা থ্যাবড়া। কেশ বিরল মাথার গুটিকতক চুল উপর-ঝুঁটি করিয়া বাধা।

সে যেন খিঁচাইয়া মারিতে আসিল। কি রকম লোক তুমি বাছা? খালি কড়া নেড়ে চলেছ। জবাব দাওনা কেন?

তরুণ সে সব কথা গায়ে না মাখিয়া কহিল, সীতানাথ আছে?

স্ত্রী লোকটি যে লাফাইয়া উঠিল। কহিল, আছে, কিন্তু সে কারো সঙ্গে দেখা করে না।

বলিয়াই সহসা কপাট বন্ধ করিয়া দিতে যাইতেছিল কিন্তু তরুণ তাহার পূর্বেই ডান পা-টা দরজার মধ্যে বাড়াইয়া দিয়াছে সুতরাং বন্ধ করা গেল না।

সে চেঁচাইয়া কহিল, একি গো, জোর ক'রে ঢুকবে নাকি?

তরুণ ধীরস্বরে কহিল, সেই রকমই ত ইচ্ছে আছে। আসুন ইন্সপেক্টর।

ইন্সপেক্টর নামটা শুনিবামাত্র স্ত্রীলোকটা একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তরুণ নিমেষে পাশ কাটাইয়া স্ত্রী লোকটার আগে চলিয়া গেল।

সীতানাথ একটা গোলমাল শুনিয়া বাহির হইতেছিল—কিন্তু তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল তরুণ এবং তাহার পিছনে ইন্সপেক্টর হাতে পিস্তল লইয়া।

সে বিবর্ণমুখে পা পা করিয়া পিছাইয়া গেল। তরুণ ভিতরে আসিয়া ইন্সপেক্টরকে ভিতরে টানিয়া লইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর গম্ভীর মুখে কহিল, তারপর সীতানাথ, গালচেগুলো কোথায় বল দেখি?

সীতানাথ বিস্মিত হইবার ভান করিয়া কহিল, কি গাল্‌চে? কোথাকার গাল্‌চে?

ইন্সপেক্টর চটিয়া উঠিলেন, ন্যাকামি ক'রনা আমরা সব টের পেয়েছি, লাইন-জয়েন্টের মুখে তোমার আঙুলের ছাপ ধরা পড়েছে—চালাকি রাখ, কোথায় আছে বলত।

সীতানাথ লোকটা বোকা নয়। সে আর অবাক হইবার চেষ্টা না করিয়া কহিল, আমি বলব না, যা খুশী করুন গে!

তরুণ ইন্সপেক্টরকে চুপ করিবার ইঙ্গিত করিয়া কহিল, বাপু, ধরা ত পড়েইছ, তুমি মনে কর খুঁজে আমরা বে'র করতে পারব না?

সীতানাথ কহিল, না—পারবেন না। সে যেখানে আছে পুলিশের চোদ্দ পুরুষের ক্ষমতা নেই তা বার করে।

ইন্সপেক্টর একটা কটূক্তি করিয়া উঠিলেন, ভদ্রলোকের মত কথা বল্। সীতানাথ কহিল, রাগ হ'লে আপনার কথাই প্রায় ভদ্র-লোকের মত থাকে কিনা! আমিত ছোট লোক বটেই।...

তা যাহোক, সে পাবেন টাবেন না। জেলে টেলে যা দেবেন দিন। জেলেও দেবেন আর মালও আমি ছেড়ে দেবো এত কাঁচা ছেলে আমি নই।

ফিরে এসে তো বাঁচতে হবে, তখন টের পাবোনা আমরা?

সীতানাথ তাহতেও থামিল না। কহিলেন, আমি জেলে গেলে অন্য লোক তার ব্যবস্থা করবে।

ইন্সপেক্টরের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, সেখানে গিয়ে মারের চোটে কথা আদায় ক'রে নেব।

তরুণ সীতানাথকে মনে মনে অজস্র বাহবা দিতে লাগিল। সে নির্বিকার মুখে কহিল, আমি পুলিশের সঙ্গে এ বাড়ীর বাইরে পা দেবামাত্র তার ব্যবস্থা হবে। তখন আমারও আর বলবার উপায় থাকবে না। ইচ্ছে থাকলেও না।

তরুণ ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া কষ্টে হাসি দমন করিল। তাহার পর মোলায়েম কণ্ঠে কহিল, যদি না ধরি, যদি ছেড়ে দিই?

সহসা সীতানাথ সামনে ঝুঁকিয়া আগ্রহ ভরে কহিল, দেবেন, দেবেন ছেড়ে?..জেলে দেবেন না? ...ছেলেটার বড় অসুখ বাবু—আমি জেলে গেলে দেখবার লোক থাকবে না।

তরুণ কহিল, বেশ, আমি কথা দিচ্ছি তুমি গাল্‌চেগুলো ফিরিয়ে দিলে আমি এবার তোমার কেস উঠতে দেব না। কিন্তু একটা মুচলেকা দিতে হবে।

সীতানাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, একটা লোহার চাদরের বাক্সের মধ্যে পুরে ধারগুলো ঝালাই ক'রে পুকুরের মধ্যে ফেলে রেখেছি। জেলে ডেকে জাল ফেলে উঠোতে হবে। কাছেই আছে।

তরুণ কহিল, কিন্তু তুমি চুরি করলে কি ক'রে?

সীতানাথ হাসিয়া কহিল, একলা পারিনি বাবু। আর একজন ছিল, তার নাম করব না। যখন সোনারপুর থেকে গাড়ী ছাড়ে তখন একটা ওয়াগনের ওপর লম্বা দড়ি নিয়ে সে লুকিয়ে থাকে। গাড়ী ছাড়বার পরই কাজ আরম্ভ করে। যে গাড়ীর মধ্যে গাল্‌চে ছিল তার আগের গাড়ীর সঙ্গে তার পরের গাড়ীর আগে অনেকখানি ঢিলে ক'রে বাঁধা হয়। ধরুন চুরির গাড়ীখানা এক নম্বর, আগেরটা দু'নম্বর আর পরেরটা তিন নম্বর। তিন নম্বরে আর দু'নম্বরে বেঁধে এক নম্বর আর তিন নম্বরের জোড়টা খুলে দেওয়া হয়। লম্বা দড়িটায় আট্‌কে রইল বটে কিন্তু অনেকটা মধ্যে ফাঁক রইল। তারপর দু'নম্বর আর

এক নম্বরের বাঁধন হ'ল খোলা, তখন এক নম্বর গাড়ীখানা দু'নম্বর আর তিন নম্বরের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলতে লাগল। এবারে আমি যাদবপুরের ঐ সাইডিংটায় তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। যেমন দু'নম্বর গাড়ীটা চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে সাইডিং-এ লাইন জয়েন ক'রে দিলুম, ফলে এক নম্বরটা গড়াতে গড়াতে সাইডিং-এ চলে এল। আমিও সাইডিং-এর সঙ্গে মেন লাইনের জোড়া খুলে দিলুম। তিন নম্বর আর পিছনের গাড়ীগুলো আবার মেন লাইনে চলে গেল তখন দড়িটা খাটো ক'রে এনে গাড়ীর দুটো ভাগ বেমালুম জুড়ে দেওয়া হ'ল।

তরুণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছিল। ইন্সপেক্টর শুধু একটা 'স্-স্' শব্দ করিয়া উঠিলেন। তাহার পর একটা মুচলেকা লিখাইয়া লইলেন! তরুণ প্রশ্ন করিল, তুমি টের পেলে কি ক'রে গাল্‌চের কথা?

সীতানাথ কহিল, আপনাদের ভদ্দর ঘরের কাণ্ড।...আর একজন জমিদার অনেক টাকা কব্‌লান, চক্রবর্ত্তীদের ঐ গাল্‌চের ওপর বড় লোভ তাঁর।...তা অত পরিশ্রম বৃথা গেল। ছেলেটার বড় অসুখ, টাকার দরকার বলেই অমন অসীম সাহসিক কাজে লেগেছিলুম।

তরুণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া পকেট হইতে একগোছা নোট বাহির করিয়া হাতে দিয়া কহিল, এই পঞ্চাশ টাকা দিলুম। আমার সঙ্গে আবার দেখা ক'র। তোমার ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব এসব কাজ আর ক'র না। এই ঠিকানাটা রেখে দাও।

সীতানাথের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

বাহিরে আসিয়া ইন্সপেক্টর কহিলেন, একে তো এমনি ছেড়ে দিলেন, তার ওপর আবার টাকা?

তরুণ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, যার মাথায় অমন চুরির মতলব আসতে পারে তার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছা করে, টাকা তো তুচ্ছ কথা।

pathagar.net

অর্জুন হতভম্ব

সমরেশ মজুমদার

বারান্দায় চোরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। দরজা খুলে একপলক দেখে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বলুন কী দরকার?"

লোকটি পিটপিট করে তাকাল। তারপর হাতজোড় করে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল,"আপনি আমাকে বাঁচান বাবু। আমি মরে গিয়েছি।"

রোগা এবং বেঁটে লোকটির পরনে শস্তার শার্ট-প্যান্ট। দেখলেই বোঝা যায়, অবস্থা ভাল নয়। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমি যে আপনাদের বাঁচাতে পারি, এ-কথা কে বলল?"

"আপনাদের কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। আমার এক শালা রূপমায়া সিনেমাতে টিকিট ব্ল্যাক করে, ও আপনার খুব প্রশংসা করে। বাবু, আমি বড় বিপদে পড়েছি।" লোকটি তখনও হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে।

"আপনার নাম কী?"

"যজ্ঞেশ্বর মাইতি।"

"কী করেন?"

লোকটি মুখ নামাল, "বলতে সঙ্কোচ হয়, তবু বলি, আমি চুরি করি বাবু।"

"চুরি করেন? চোর!" অর্জুন অবাক।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কাজকর্ম পাইনি, পয়সাও নেই যে দোকান-টোকান দেব, তাই চুরি করে পেট ভরাই। বাড়িতে বউ আর দুই ছেলেমেয়ে! মুখ দেখে তো কেউ খেতে দেবে না!"

"আপনার বিপদটা কী? পুলিশ?"

"না বাবু, চুরির জন্যে পুলিশ আমাকে ধরলে আপনার কাছে আসতাম না।" রাস্তার দিকে চট করে তাকিয়ে নিল যজ্ঞেশ্বর, "এখানে দাঁড়িয়ে বলা কি ঠিক হবে? কেউ যদি শুনে ফেলে!"

অর্জুনদের বাড়ি গলির একটু ভেতরে। গলিটা চওড়া, রিকশা যাচ্ছে, মানুষজন হাঁটছে। একটা চোরকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে বসাতে প্রথমে ইচ্ছে হচ্ছিল না, পরে মত বদলে সে ডাকল, "ভেতরে আসুন।"

যজ্ঞেশ্বর সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকতেই চেয়ার দেখিয়ে দিল অর্জুন, "বসুন।"

"না, না আমি ঠিক আছি, আপনি বসুন বাবু।"

অর্জুন আর অনুরোধ না করে চেয়ার টেনে নিল, "আপনার নাম নিশ্চয়ই পুলিশের খাতায় আছে?"

"তা তো থাকবেই বাবু। এর আগে চারবার জেল খেটেছি। তবে ওই তিন থেকে ন'মাস। বড় কাজ তো কখনও করিনি। এবার করতে গিয়েছিলাম।" যজ্ঞেশ্বর হাতজোড় করেই বলল, "ওই যে কথায় বলে না বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার শখ, তাই হয়েছিল আমার। সেটা করতে গিয়ে ফেঁসে গেছি বাবু।"

"ফেঁসে গেছেন?" অর্জুন মাথা নাড়ল, "তা আমার কাছে কেন এসেছেন?"

"আপনি ছাড়া আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। পুলিশের বড়কর্তারা আপনাকে খুব খাতির করে, আপনি বললে ওরা শুনবে।" ককিয়ে উঠল যজ্ঞেশ্বর।

"যারা অন্যায় কাজ করে আমি তাদের সাহায্য করি না।" অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল।

"বিশ্বাস করুন বাবু, আমার বাচ্চার দিব্যি, গত রাত্রে আমি কোনও অন্যায় করিনি।"

"তা হলে আপনি কিসের ভয় পাচ্ছেন?"

এবার যজ্ঞেশ্বর সব কথা খুলে বলল। গত রাত্রে সে চুরি করতে গিয়েছিল শিল্পসমিতি পাড়ায়। কয়েকদিন থেকে লক্ষ করছিল ওই বাড়িতে প্রচুর গাড়ি আসছে-যাচ্ছে। বাড়িটার সামনে পাঁচিলঘেরা বাগান আছে। বাগানের গেট লোহার। আগে কোনওদিন দরোয়ান ছিল না, গাড়িগুলোর আসা-যাওয়া শুরু হওয়ার পর একটা নেপালি দরোয়ান রাখা হয়েছে। বাড়ির মালিক দীর্ঘকাল জলপাইগুড়িতে ছিলেন না। যজ্ঞেশ্বর খবর পেয়েছে তিনি আমেরিকায় ব্যবসা করেন বলে নিজের শহরে এতকাল আসতে পারেননি। যজ্ঞেশ্বর বুঝতে পারছিল, তার জন্য অনেক সম্পদ ওই বাড়িতে অপেক্ষা করছে। একে আমেরিকার ব্যবসাদার, তার ওপর গেটে দরোয়ান বসানো, এ-সবই ইঙ্গিত করছে ওই বাড়িতে এখন দামি-দামি জিনিসপত্র এসেছে। এই শহরের যে-কোনও বাড়ির

ভেতরের ছক জেনে নিতে যজ্ঞেশ্বরদের বেশি সময় লাগে না। ওই বাড়িটারও জোগাড় হয়ে গেল। দরোয়ান থাকলেও সে পরোয়া করেনি। রাতের অন্ধকারে পাঁচিল টপকে নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছিল বাগানে। দরোয়ান টের পায়নি। তারপর জলের পাইপ বেয়ে সোজা তিনতলায়। সে দোতলায় নামেনি। কারণ সেখানে আলো জ্বলছিল। তিন তলাটা অন্ধকারে পড়ে ছিল। ব্যালকনিতে নেমে সে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ সব জরিপ করে নিল। ব্যালকনি থেকে ভেতরের ঘরে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ। এবং সেটা ভেতর থেকেই। অর্থাৎ ওই পথ যজ্ঞেশ্বর ব্যবহার করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত তাকে দোতলায় নেমে আসতে হল। পাইপ ধরে ঝুলে থেকে যখন নিঃসন্দেহ হল বারান্দার আশপাশে কেউ নেই, তখন সে দোতলায় নামল। ওইভাবে নেমে দাঁড়িয়ে থাকলে বিপদে পড়তে হবেই, যজ্ঞেশ্বর দ্রুত একপাশে সরে এল। ভেতরে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এ-সময় অবশ্য গৃহস্থ জেগে থাকে না, কিন্তু কেউ তো এত আলো জ্বালিয়ে রেখে ঘুমোয় না। একটু অপেক্ষা করে সে উঁকি মারল। ঘরটি খালি। সেটা ডিঙিয়ে সে যে-ঘরে এল, সেখানে অনেক আসবাব। একটি খাটও আছে। কিন্তু কোনও মানুষ নেই। ঘরের আলো জ্বলছে। যজ্ঞেশ্বরের অস্বস্তি হল। অন্ধকার ছাড়া চুরি করতে সে কখনওই পারে না। ঠিক ওই সময় একটা আর্তনাদ তার কানে এল। প্রাণের দায়ে মানুষ এমন আওয়াজ করতে পারে।

কিন্তু চিৎকারটা সম্পূর্ণ হল না। কেউ যেন মুখ চেপে ধরেছিল। যজ্ঞেশ্বর পা টিপে-টিপে পাশের ঘরে দরজায় গিয়ে উঁকি মারল। একটা ষণ্ডামার্কা লোকের হাতের থাবা চেপে রয়েছে শুয়ে-থাকা বৃদ্ধের মুখে। বৃদ্ধটির হাত-পা খাটের সঙ্গে বাঁধা। একটু দূরে ইজিচেয়ারে বসে খিলখিল করে হাসছে গোল আলুর মতো দেখতে একটি লোক। লোকটি বলছে, "কেটে টুকরো-টুকরো করে তিস্তায় ভাসিয়ে দেব। আমার সঙ্গে চালাকি? অষ্টধাতুর ব্রজগোপালের মূর্তিটা কোথায়? এখনও সুযোগ দিচ্ছি, বলে ফেলো। হাত সরাও।"

"আমি জানি না। তুমি তো তোমার মায়ের শ্রাদ্ধের সময় আসোনি, এলে তখনই জানতে পারতে ওঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে থেকেই মূর্তিটা নেই। সেই শোকে সেই সতীলক্ষ্মী হার্টফেল করলেন।" ষণ্ডামার্কা হাত সরাতে ককিয়ে ককিয়ে বললেন বৃদ্ধ। সঙ্গে-সঙ্গে গোল আলু বলল, "নাভিতে পিন ফোটা।"

ষণ্ডামার্কা হুকুম তামিল করতেই আবার চিৎকার, আবার মুখ চেপে ধরা। গোল আলু এবার রেগে গেছে। "ব্রজগোপালের অষ্টধাতু-টাতু সব বাজে, ফালতু। আই-ওয়াশ। ওর পেটের মধ্যে ছিল দামি হীরে। অনেকদিন আগে মুঘলদের কাছ থেকে ডাকাতি করে ওটা পেয়েছিল আমার পূর্বপুরুষ। পেয়ে লুকিয়ে রেখেছিল জিনিসটা, ব্রজগোপালের পেটে। তুমি ছাড়া কেউ এ-বাড়িতে ছিল না। অতএব না বলা পর্যন্ত তোমাকে আমি ছাড়ছি না।"

এসব কাণ্ড দেখে যজ্ঞেশ্বর বুঝল, ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। হাতের কাছে যা পাবে তাই নিয়ে কেটে পড়লেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সে চটপট একটা আলমারি খুলল। জামা-কাপড়ে ঠাসা। হঠাৎ তার মনে হল বড্ড বেশি লোভী হয়ে পড়েছে। ওই

ষণ্ডামার্কা লোকটার হাতে পড়লে তার বারোটা বেজে যাবে। সে দ্রুত ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল। ওই সময় একটা চেয়ারে তার পা ঠুকে যাওয়ার শব্দ হল। সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরে গোল আলু চিৎকার করে উঠল, "কে, কে ওখানে?" আর কোনওদিকে না তাকিয়ে পাইপ বেয়ে নীচে নেমে বাগান পেরিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছে যজ্ঞেশ্বর।

অর্জুনের বেশ লাগছিল একজন চোরের আত্মকাহিনী শুনতে। এবার বলল, "আপনাকে তো কেউ দেখেনি, ধরতেও পারেনি। তা হলে ফেঁসে গেলেন কী করে?"

"ওই তো বিপদ। ওই হাঁক শুনে পালাবার সময় ভয়ের চোটে তাড়াহুড়োতে আমার তালা খোলার যন্ত্রটা ফেলে এসেছি।" ককিয়ে উঠল যজ্ঞেশ্বর।

"ওটা যে আপনার, তা কী করে লোকে জানবে?"

"পুলিশ জানে। এই শহরের সব চোরের হাতিয়ার পুলিশের জানা।"

অর্জুন স্থির করতে পারছিল না সে কী করবে। অন্যের বাড়িতে চুরি করার জন্য গভীর রাত্রে ঢুকে যজ্ঞেশ্বর নিশ্চয়ই অপরাধ করেছে। অপরাধীকে বাঁচানো তার কাজ নয়। কিন্তু একজন বৃদ্ধকে বেঁধে রেখে হীরের জন্য অত্যাচার করা নিশ্চয়ই ন্যায়কর্ম নয়। যজ্ঞেশ্বর যা বলল তা যদি সত্যি হয় তা হলে চুপচাপ বসে থাকার কারণ নেই।

অর্জুন বলল, "আপনি আমার সঙ্গে চলুন।"

"কোথায়?" ভয় পেয়ে গেল যজ্ঞেশ্বর।

"থানায়। পুলিশকে এসব কথা খুলে বলবেন।"

"ওরে ব্বাবা! পুলিশ আমাকে ফাটকে ঢুকিয়ে দেবে।"

"আপনি নিশ্চয়ই অন্যায় করেছেন। পুলিশ তা করতেই পারে। কিন্তু আমি আপনাকে এ ছাড়া অন্য কোনওভাবে সাহায্য করতে পারছি না।"

শোনামাত্র যজ্ঞেশ্বর বারান্দা থেকে নেমে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল। চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল লোকটা।

অর্জুনের এবার অস্বস্তি শুরু হল। মাথার ভেতর কিছু ঢুকে সেটা না বের হলে স্বস্তি নেই তার। মোটরবাইক বের করে থানায় চলে এল সে।

বাইক থামাতেই বড়বাবুর সঙ্গে দেখা। বেজার মুখে তিনি জিপের দিকে এগোচ্ছিলেন। অর্জুনকে দেখে হাসার চেষ্টা করলেন, "কী ব্যাপার! সাতসকালে?"

"আপনার কাছেই এসেছি। চললেন কোথা?"

"আর বলবেন না। আমাকে আজকাল ছোটখাটো অপরাধের তদন্তেও যেতে হচ্ছে। ভদ্রলোক আবদার করেছেন এস. আই. পাঠালে চলবে না, আমাকেই যেতে হবে। শুনছি উনি খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক। তাই।"

"কার কথা বলছেন?"

"এস. পি. সেন। আমেরিকার বড় ব্যবসায়ী। শিল্পসমিতি পাড়ার ওঁর আদি বাড়িতে এসেছেন। কাল রাত্রে নাকি সেই বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।"

অর্জুন খুশি হল, "আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই তা হলে অসুবিধে হবে?"

"অসুবিধে? না, না। কিন্তু এটা চুরিটুরির কেস। খুনটুন তো নয়।"

"তাতে কী?"

বড়বাবু অবাক হয়ে বললেন, "বেশ, চলুন।"

বড়বাবুর জিপটাকে অনুসরণ করে বাইকে চেপে অর্জুন শিল্পসমিতি পাড়ার যে বাড়িটায় পৌঁছল সেটি সদ্য সারানো এবং সাজানো হয়েছে। পুলিশ দেখে দরোয়ান গেট খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে অর্জুন আন্দাজ করে নিল, কাল রাত্রে যজ্ঞেশ্বর কোন পথে ওপরে উঠেছিল।

এস. পি. সেন লোকটিকে গোল আলু বলেছে যজ্ঞেশ্বর। একবর্ণ মিথ্যে কথা বলেনি। বসার ঘরে সোফায় শরীর ডুবিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "হোয়াট ইজ দিস? জলপাইগুড়ি শহরের ল অ্যাণ্ড অর্ডারের অবস্থা এইরকম? আমি সি. এমকে জানাব। এন. আর. আইদের উনি দেশে ফিরতে বলছেন কিন্তু কোন ভরসায় আসব?"

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী-কী চুরি গিয়েছে আপনার?"

"চুরি করতে পারেনি। তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেল। যাওয়ার আগে একটা দিশি যন্ত্র ফেলে গিয়েছে। টমি!" চিৎকার করলেন, এস. পি. সেন।

যজ্ঞেশ্বর যাকে ষণ্ডামার্কা লোক বলেছিল, তাকে দেখতে পেল ওরা। লোকটা দুটো লোহার সরু শিকগোছের জিনিস টেবিলে রাখল। দুটো হলেও মাথাটা একটা তারে বাঁধা। যজ্ঞেশ্বর এই দিয়ে তালা খোলে।

বড়বাবু সেটা তুলে দেখলেন, "একদম পাতিচোর। একে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ক্লু যখন রেখে গিয়েছে, তখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে।"

"তাই? লোকটা কে, জানতে পারলেই আমাকে জানিয়ে দেবেন অফিসার।"

এবার অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ও কোন ঘরে ঢুকেছিল?"

"দোতলায়। পাইপ বেয়ে উঠেছিল।"

"একটু দেখা যেতে পারে?"

"শিওর। টমি, এদের নিয়ে যাও।"

দোতলায় উঠে এল ওরা। যজ্ঞেশ্বরের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বড়বাবু বললেন, "চুরি যখন করতে পারেনি তখন এখানে সময় নষ্ট করে লাভ কী? এটা একদম ছিঁচকে ব্যাপার। পেছনে কোনও ব্রেন নেই।"

"তা ঠিক। আচ্ছা, ওপাশের ঘরে কে থাকে?" অর্জুন টমিকে প্রশ্ন করল।

"কেউ না।"

উত্তরটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুন দরজার পাল্লা টেনে উঁকি মারল। না। ঘরে কেউ নেই। অথচ যজ্ঞেশ্বরের বর্ণনা অনুযায়ী ওই ঘরেই বৃদ্ধের ওপর অত্যাচার হয়েছিল। বৃদ্ধকে কোথায় সরাল ওরা?

সে জিজ্ঞেস করল, "এ-বাড়িতে কে-কে থাকেন?"

টমি বলল, "কয়েকজন কাজের লোক, আমি আর সাহেব।"

"আগে একজন বৃদ্ধ এখানে থাকতেন। তিনি কোথায়?"

"আমি জানি না! বোধ হয় দেশে চলে গিয়েছে।"

"দেশ! দেশ কোথায়?"

"আমি জানি না।"

নীচে নেমে এস. পি. সেন কিছু বলার আগেই অর্জুন বলল, "আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি আপনাদের এই বাড়িতে অষ্টধাতুর তৈরি ব্রজগোপালের মূর্তি আছে। খুব দামি। সেটা ঠিক আছে তো?"

"ব্রজগোপালের মূর্তি!" এস. পি. সেন ভ্রূ কোঁচকালেন।

"আপনি জানেন না? ওহো, আপনি তো সেন। এ-বাড়ির কর্তারা রায় ছিলেন। গেটে তো দেখলাম 'রায়বাড়ি' লেখা আছে।"

"আমার মামা হৃদয়রঞ্জন রায় বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান ছিলেন। মারা যাওয়ার আগে এইসব সম্পত্তি তিনি আমার নামে উইল করে গিয়েছেন। মনে হচ্ছে আমাদের এই বাড়ির ব্যাপারে আমার চেয়ে আপনি বেশ জানেন!" এস. পি. সেন বাঁকাস্বরে কথাগুলো বললেন।

"আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আপনাদের এ-বাড়ির অষ্টধাতুর কথা শহরের সবাই জানে। শুনেছি বাহাদুর শাহ যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একদল মুঘল সৈন্যের ওপর লুটতরাজ করে এই বংশের পূর্বপুরুষ অনেক সম্পদ পেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি বড় হীরে ছিল। সেই হীরে ওই অষ্টধাতুর মূর্তির ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। চোর এসেছিল শুনে আমার মনে হয়েছিল ওই মূর্তির সন্ধানেই সে এসেছিল।" অর্জুন হাসল, "যাক, মূর্তিটি চুরি যায়নি?"

"আমি এমন মূর্তির কথা কখনও শুনিনি অবাক লাগছে।"

"যে বৃদ্ধ এ-বাড়িতে থাকতেন, তিনিও তো রায়। তিনি জানতে পারেন।"

"পারেন। কিন্তু আমি আসামাত্র তিনি ছুটি নিয়ে তীর্থে চলে গিয়েছেন। তা ছাড়া ওসব গল্প বিশ্বাস করার মন আমার নেই।"

"তা হলে অন্য কথা। তবে ওই বৃদ্ধ হাকিমপাড়ায় প্রায়ই যেতেন।"

"হাকিমপাড়া! কেন?"

"ওখানে একজন ব্যাচেলর প্রবীণ মানুষ আছেন। অমল সোম। লোকে ওঁকে খুব বিশ্বাস করে। নির্লোভ মানুষ। এমন হতে পারে বৃদ্ধ আপনাকে নিজের বংশের মানুষ নন মনে করে অমল সোমের কাছে মূর্তিটা গচ্ছিত রেখেছেন।"

বড়বাবু বললেন, "আমরা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে ওঁর সময় নষ্ট করছি। মূর্তি সম্পর্কে ওঁর যখন কোনও ইন্টারেস্ট নেই, তখন ; আচ্ছা চলি। চোরটাকে ধরতে পারলেই আপনাকে জানাব। নমস্কার।"

বাইরে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বড়বাবুর জিপকে অনুসরণ করে শেষপর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে জিপটাকে থামাল অর্জুন। বড়বাবু অবাক। অর্জুন তাঁকে এবার সব কথা খুলে বলল। বড়বাবু হতভম্ব হয়ে বললেন, "তা হলে সেই বুড়ো মানুষটাকে ওরা ওই বাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছে?"

"মনে হয়। ছাদের চিলেকোঠা অথবা মাটির তলার ঘর, যে-কোনও একটা জায়গায় হয়তো এখন সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অমলদা এখন জলপাইগুড়িতে নেই। আজই ওঁর

বাড়িতে হানা দেবে ওরা। হাবু বাড়িতে আছে। ও কথা বলতে পারে না, কিন্তু গায়ে প্রচণ্ড শক্তি আছে। খুনোখুনি হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের উচিত ওঁর বাড়িতে পাহারা দেওয়া।” অর্জুন বলল।

“ফাঁদ পাততে বলছেন কিন্তু এস. পি. সেন আপনার ফাঁদে পা দেবেন?”

“লোভ বড় মারাত্মক জিনিস।”

“ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।”

সেই রাত্রে অমল সোমের বাড়িতে কোনও হামলা হল না। অর্জুন একটু অবাক। তার পাতা ফাঁদে পা দেবেন না এস. পি. সেন, এটা সে ভাবতে পারেনি। সকালে থানায় এল সে। বড়বাবু বললেন, “আপনার যজ্ঞেশ্বর হাওয়া হয়ে গিয়েছে।”

“মানে!”

“তার বউ বলছে সে নাকি কাজকর্মের খোঁজে শিলিগুড়িতে গিয়েছে।”

অর্জুন বলল, “আমি একটু ঘুরে আসছি। যজ্ঞেশ্বরের ঠিকানাটা দিন তো?”

মাসকলাই বাড়িতে যজ্ঞেশ্বরের ভাঙা টিনের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ওর বউ বলল, “কবে ফিরবে বলে যায়নি।”

“টাকাপয়সা কিছু দিয়ে গেছে?”

“হ্যাঁ।”

“ওর তো হাতে টাকা ছিল না। দিল কী করে?”

“একজন বুড়োমানুষ এসেছিলেন ওর কাছে। রায়বাবু নাম। তিনি দিলেন।”

“কবে এসেছিলেন?”

“কাল সকালে।”

“কীরকম দেখতে?”

“খুব রোগা আর বুড়ো।”

বাড়ি ফিরে এসে অর্জুন বড়বাবুকে ফোন করল, “বড্ড বোকা বনে গেছি। এস, পি. সেন কাউকে বেঁধে রেখে অত্যাচার করেননি। সেই বৃদ্ধ বাইরে, আর তার পরামর্শে যজ্ঞেশ্বর ওই বাড়ি থেকে অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি করে একসঙ্গে উধাও হয়ে গিয়েছে। লোকটা আর পাতিচোর নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ও কেন আমার কাছে এল? আমার কাছে আগ বাড়িয়ে মিথ্যে বলে ওর লাভ কী হবে?

বড়বাবু বললেন, “একদিনের জন্যে আমরা ওর দিকে নজর দিতাম না, এটা কি ওর কম লাভ? বুড়োর সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারল! কিন্তু কোথায় পালাবে?”

অর্জুন রিসিভার নামিয়ে রাখল। সে হতভম্ব!

pathagar.net

পটলবাবুর বিপদ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পটলবাবু খুন হয়েছেন, অথচ তাঁর লাশ পাওয়া যাচ্ছে না, এইটেই সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। খুন হওয়া ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই। কারণ তাঁকে খুন করার হুমকি দিয়েছিল ভিমরুল। আর ভিমরুল যদি কাউকে খুন করার হুমকি দেয় তবে সেই লোক নিজেকে নিহত বলে ধরেই নিতে পারে। কারণ, ভিমরুল হল এক সাঙ্ঘাতিক আততায়ী। পুলিশ-টুলিশ তার টিকিরও নাগাল পায় না। অথচ সে বহাল তবিয়তেই তার পছন্দমতো লোককে খুন করে বেড়ায়। তাও আবার আগে থেকে তাকে সতর্ক করে দিয়ে।

পটলবাবু অবশ্য লোক সুবিধের নন। সোনা-রুপোর ব্যবসায় তাঁর লাখো-লাখো টাকা আয়। সুদের কারবারও আছে। তা ছাড়া তাঁর আবার একটি পোষা গুণ্ডাবাহিনীও আছে। পটলবাবুর হয়ে এই গুণ্ডাগুলোই আদায়-উশুল করে। রথতলা এবং আশপাশের অঞ্চল পটলবাবুর ভয়ে তটস্থ। মাসকয়েক আগে শ্রীমন্ত নামে একটা গরিব লোক বউয়ের গয়না বাঁধা রেখে পটলবাবুর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিল। শোধ দিতে না পারায় কয়েক মাসেই পটলবাবুর নিজস্ব সুদের হারে ধার বেড়ে সুদে-আসলে দাঁড়াল পাঁচ

হাজার। শ্রীমন্তর তো মাথায় হাত। যাই হোক, হঠাৎ শ্রীমন্ত একটা লটারিতে পাঁচ লাখ টাকা প্রাইজ পেয়ে গেল। আনন্দে সে তখন আত্মহারা। ঠিক সেই সময়ে পটলবাবুর গুণ্ডারা গিয়ে হাজির। তারা বলল, সুদে-আসলে পটলবাবুর পাওনা ওই পাঁচ লাখই দাঁড়িয়েছে। শ্রীমন্তকে মারধর করে তারা লটারির টিকিটটা কেড়ে নিয়ে এল। পটলবাবু দিব্যি হাসতে-হাসতে প্রাইজের টাকাটা বাগিয়ে নিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ভিমরুলের চিঠি এল। সেই মার্কামারা নীল রঙের খামের ওপর একটা ভিমরুলের ছবি। ভেতরে নীল চিরকুটে পরিষ্কার হাতের লেখায় কয়েকটি কথা, "তোমার পাপের সীমা ছাড়িয়েছে। মরার জন্য প্রস্তুত হও। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীমন্তর পাঁচ লাখ টাকা ও তৎসহ ক্ষমাভিক্ষার মূল্যস্বরূপ আরও দশ হাজার টাকা তাকে প্রত্যর্পণ করতে পারলে ভাল, নইলে আর সাতদিনের মধ্যেই তোমাকে খুন করা হবে।—তোমার যম ভিমরুল।"

ভিমরুলের চিঠি ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। সুতরাং উদ্বিগ্ন পটলবাবু পুলিশের কাছে গেলেন।

দারোগাবাবু চিঠিটা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে হাই তুলে বললেন, "আমাদের কিছু করার নেই মশাই। উড়ো চিঠির পেছনে ছোটা আমাদের কর্ম নয়।"

উত্তেজিত পটলবাবু বললেন, "উড়ো কী মশাই, এ যে ভিমরুলের চিঠি!"

"সে তো জানি মশাই, কিন্তু ঘটনাটা না ঘটলে তো আর কিছু করতে পারি না। আগে ঘটুক তারপর দেখা যাবে।"

আসলে পুলিশও পটলবাবুকে ভাল চোখে দেখে না।

পটলবাবু তখন এসে ধরলেন গোয়েন্দা বরদাচরণকে। "বাবা বরদা, আমি যে মারা পড়তে চলেছি।"

বরদা একটু হেসে বলল, "শুভস্য শীঘ্রম।"

"তার মানে! তুমি কি আমার মৃত্যু চাইছ?"

"ভোট নিলে দেখবেন জনমত তাই চাইছে। তবে আমি গোয়েন্দা। আর্তকে রক্ষা করাই আমার কাজ। দেখি চিঠিটা।"

বরদা চিঠিটা ভাল করে দেখল। নিজের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে আঙুলের ছাপ খুঁজল। পেল না। পোষা কুকুর টমিকে চিঠি শুঁকিয়ে খানিক এদিক-ওদিক খুঁজে এল। তারপর চিঠিটা ফেরত দিয়ে বলল, "সাতদিন একটু সাবধানে থাকবেন।"

"সাবধানে থাকব! তুমি তো বলেই খালাস। সাবধানে থাকলেই কি ভিমরুল রেহাই দেবে? সে যে ভিমরুলের মতোই সাত হাত জলের তলায় গিয়ে হুল দেয়।"

"কেন, আপনার তো একটা গুণ্ডাবাহিনী আছে বলে শুনেছি। তারাই আপনাকে পাহারা দেবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পটলবাবু বললেন, "তা তারা দেবে। কিন্তু তারা বেশি বুদ্ধি ধরে না। গায়ের জোর দিয়ে কি আর সব কাজ হয়? শুনেছি ভিমরুল তুখোড় চালাক, কোথা দিয়ে যে তার মৃত্যুবাণ আসবে কে জানে। বাপু বরদাচরণ, তোমাকে মোটা টাকা দেব, আমাকে পাহারা দেওয়ার ভারটা তুমিই নাও।"

বরদাচরণ পটলবাবুকে পছন্দ করে না। তা বলে পটলবাবু খুন হন সেটাও সে চায়

না। বলল, "পটলবাবু, আমার হাতে এখন অনেক কাজ। চারদিকে অপরাধের সংখ্যা যেমন বাড়ছে গোয়েন্দাদের ব্যস্ততাও তেমনই বাড়ছে। তিনটে দিন কোনওরকমে যদি কাটিয়ে দিতে পারেন তা হলে চতুর্থ দিন থেকে আমি আপনার নিরাপত্তার ভার নেব। আগামী তিনদিন আমি বড়ই ব্যস্ত। তবে আমি বলি কি, ওই বেচারার টাকাগুলো দিয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।"

পটলবাবু খ্যাঁক করে উঠলেন, "হক্কের টাকা দিয়ে দিলে হবে? ধর্ম বলে একটা ব্যাপার আছে না?"

"ওঃ তাই তো! ধর্ম বলেও তো একটা কথা আছে।"

পটলবাবু বরদাচরণের ফি বাবদ পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু বুকের ধুকধুকুনিটা যাচ্ছে না। রাতে ঘুম আসে না, খিদে পায় না, কাজে মন দিতে পারেন না। তাঁর তিনজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর মধ্যে ন্যাপা হল প্রাক্তন ব্যাঁটরাশ্রী। বিশাল চেহারা, যার গায়ে পেশি কিলবিল করছে। দ্বিতীয় দেহরক্ষী হল কুংফু ক্যারাটের ওস্তাদ গুলে। তিন নম্বর দেহরক্ষী স্বর্ণপদকজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা হারু। তারা পটলবাবুর কাছ থেকে মোটা বেতন পায় ষণ্ডা-গুণ্ডার কাজে তারা খুবই দড়। তবে বুদ্ধির ব্যাপারে তাদের খামতি আছে। কিন্তু ভিমরুল অতি বুদ্ধিমান। সে মোটা দাগের কাজ করে না। পটলবাবু খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে রইলেন। স্থির করলেন, তিনদিন আর ঘরের বাইরে যাবেন না।

দ্বিতীয় দিন সকালে মহীতোষ নামে এক মহাজন এল। মোটা সুদে লাখ টাকা ধার নিয়েছিল। সুদে-আসলে দু'লাখ টাকা শোধ দিতে এসেছে। সঙ্গে দু'জন পাইক।

টাকা-পয়সার লেনদেন হয় নীচের বৈঠকখানার পাশের ঘরে। এ-ঘরে সিন্দুক-টিন্দুক আছে। পটলবাবু তাঁর দেহরক্ষীদের কক্ষনো এ-ঘরে ঢুকতে দেন না। লেনদেনের সময় তিনি সবসময়েই একা থাকেন, মক্কেলরাও একাই সে-ঘরে ঢুকতে পায়।

পটলবাবু ঘরে ঢুকে মহীতোষকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু মহীতোষ যখন ঘরে ঢুকল তখন পটলবাবুর একগাল মাছি। লোকটা মোটেই মহীতোষ নয়।

পটলবাবু শুধু আঁ-আঁ করে দু'বার চিৎকার করার অবকাশ পেয়েছিলেন। তারপর যে কী হল, তা কেউ জানে না। ঘণ্টাখানেক পরেও ঘর থেকে কেউ বেরোচ্ছে না দেখে বাড়ির লোকজন জড়ো হল। বিস্তর ডাকাডাকি আর চেঁচামেচির পর দরজা ভেঙে দেখা গেল, মহীতোষ নামে আগন্তুক এবং পটলবাবু, কারও চিহ্ন নেই। গণ্ডগোলের সুযোগে মহীতোষের পাইক দু'জনও পালিয়েছে।

ঘরের মোটা গরাদের একটা জানলা ভাঙা। কিন্তু জানলা দিয়ে পটলবাবুকে নিয়ে যদি আততায়ী বেরিয়েও গিয়ে থাকে তা হলেই বা সে কী করে বাড়ির উঁচু পাঁচিল ডিঙোল কিংবা কী করেই বা দরোয়ানের চোখ এড়িয়ে ফটক দিয়ে বেরোল?

পুলিস এসে সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজে বলল, "এটা গুম কেস। খুনের কেস বলা যাবে না।"

যাই হোক, সবাই ধরে নিল শুধু গুম নয়, গুম করে পটলবাবুকে খুনও করা হয়েছে। কারণ ভিমরুলের যেই কথা সেই কাজ। লাশটা অবশ্যই দু-চারদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে।

কিন্তু একদিন-দু'দিন করে সাতদিন কাটতে চলল। পটলবাবুর লাশের কোনও হদিশ

হল না।

পটলবাবুর চার ছেলে গিয়ে বরদাচরণকে ধরে পড়ল, "বাবা আপনার ওপর খুব ভরসা করেছিলেন, কিন্তু আপনি তো বাবাকে রক্ষা করতে পারলেন না। এখন কী হবে?"

বরদাচরণ নানারকম কেস নিয়ে সর্বদাই ভাবিত। গম্ভীর মুখে শুধু বলল, "হুঁ।"

"বাবার লাশটাও যে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"হুঁ।"

"ভিমরুলকে ধরার ব্যাপারেও তো কিছু হচ্ছে না।"

"হুঁ।"

বিরক্ত হয়ে পটলবাবুর ছেলেরা ফিরে এল।

গভীর রাত। বরদাচরণ তার দোতলার ঘরে একটা কেস হিস্ট্রি লিখছে। গভীর চিন্তামগ্ন।

হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে একটা ঢিল এসে পড়ল। ঢিলে বাঁধা একটা কাগজ।

বরদাচরণ ঢিলটা কুড়িয়ে নিয়ে কাগজটা খুলে দেখল, তাতে লেখা ঃ "কাহারপাড়ায় মজা পুকুরের ধারে পটলের লাশ পড়ে আছে।—ভিমরুল।"

বরদাচরণ কাগজটা মুড়ে পকেটে রাখল। তাড়া নেই। লাশ তো আর উঠে পালাবে না। সকালে গিয়ে দেখলেই হবে।

সকালে দেরিতে ঘুম থেকে উঠে একটু গড়িমসি করে যখন বরদা মজাপুকুরের কাছে পৌঁছল তখন সেখানে লাশটাশ দেখা গেল না। মজাপুকুর খুব নির্জন জায়গা। চারদিকে ঘন কসাড় বন। দিনেদুপুরেও এখানে কেউ বড় একটা আসে না। একসময়ে ডাকাতের আড্ডা ছিল। ডাকাতে-কালীবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। চারদিকটা ঘুরে দেখে বরদা পুকুরের ধারে এসে দেখল একটা রোগামতো ছোটখাটো চেহারার লোক পুকুরের একধারে বসে ছিপ দিয়ে নিবিষ্টমনে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। একটু আগেও লোকটা এখানে ছিল না।

বরদাচরণ লোকটার দিকে অবহেলার চোখে একটু চেয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে খুব আলগা গলায় বলল, "ক'টা মাছ পেলেন?"

লোকটা বরদাচরণের দিকে ফিরেও তাকাল না। কিন্তু একটু চাপা গলায় বলল, "একটা মাছ ধরব বলেই বসে আছি। বড় মাছ। খুব লেজে খেলাচ্ছে।"

বরদাচরণ একটু হেসে বলল, "বড় মাছ ধরতে হলে উপযুক্ত টোপ চাই তো। তা টোপটা কী?"

"সেইটেই বড় মাছটার কাছে জানতে চাইছি।"

বরদাচরণ একটু ভেবে বলল, "বড় মাছটা টোপ গিলবে না। তবে আপস করতে রাজি আছে।"

লোকটা ছিপ গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিতান্তই হেঁটো ধুতি আর কামিজ গায়ে একটা গেঁয়ো লোক। বয়স ত্রিশের আশপাশে। মুখখানা একদম ভাবলেশহীন। বরদাচরণের দিকে না তাকিয়ে মাথাটা নিচু রেখে বলল, "আপসটা কীরকম?"

"পটলবাবুকে মহীতোষ সেজে আমিই সরিয়েছি বটে, তা বলে আমি তার সমর্থক

নই। লোকটা আমার মক্কেল, তাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।"

রোগাভোগা লোকটা নিচু গলাতেই বলল, "ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছেন! আপনার সাহস আছে বটে।"

"আমি ভিমরুলের শত্রু নই।"

"পটলকে না মারলে এলাকায় শান্তি থাকবে না। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন।"

মাথা নেড়ে বরদা বলল, "তা হয় না। তাকে মারলে আমার শর্ত ভঙ্গ হবে।"

"তা হলে তো ভিমরুলের সঙ্গে শত্রুতাই আপনি চান। আমার যে কথা সেই কাজ।"

"না, ভিমরুলের মুখরক্ষার ব্যবস্থাও ভেবে রেখেছি।"

"কী ব্যবস্থা?"

"পটলকে বলেছি, প্রাণ বাঁচাতে গেলে তাকে দেশত্যাগ করতে হবে এবং অন্য জায়গায় অন্য নামে বেঁচে থাকতে হবে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কে রাখা চলবে না। সে যে বেঁচে আছে এ-কথা কেউ জানবে না।"

"সে যদি আর কখনও এ-তল্লাটে আসে—"

"না, সে-ভয় আর নেই। আপনার ভয়ে সে আধমরা।"

"আর শ্রীমন্তর টাকাটা?"

"পটল আমার সঙ্গে পালানোর সময় নগদ পাঁচ লাখ দশ হাজার আলাদা করে শ্রীমন্তর জন্য নিয়ে নিয়েছিল। টাকাটা কাল রাতেই শ্রীমন্ত পেয়ে গেছে!"

ভিমরুল এবার একটু হাসল। বলল, "চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছেন, তবু আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি একজন দক্ষ গোয়েন্দা।"

"ধন্যবাদ।"

pathagar.net

ছোটখাটো লোকটা ছিপটা হাতে নিয়ে কসাড় বনের মধ্যে ঢুকে কোথায় চলে গেল কে জানে!

বরদাচরণ বাড়িতে ফিরে এসে তার দোতলার ঘরের পাশে পুরনো লেপ-তোশকের মস্ত কাঠের বাক্স খুলে পটলবাবুকে বের করল। পটলবাবু তখন চিঁচিঁ করছেন।

"তা পটলবাবু, এবার কী করবেন?"

"প্রাণরক্ষা করো বরদা, তারপর কী করব ভাবা যাবে।"

"প্রাণের ভয় আর নেই। ভিমরুল শর্তাধীনে আপনাকে রেহাই দেবে। কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?"

"হিমালয়ে।"

"সাধু হবেন নাকি?"

"না, না, ব্যবসা আমার রক্তে। হিমালয়ে মেলা সাধু। আমি ঠিক করেছি সাধুদের চাল, ডাল, আটা, লোটা-কম্বল, কৌপীন ইত্যাদি সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবসা করব।"

"সাধুদের সাপ্লাই দেবেন? টাকা দেবে কে?"

"ভক্তরা দেবে বাবা। ওসব আমার ছক করা আছে।"

পটলের ব্যবসাবুদ্ধি দেখে বরদা অবাক হয়ে গেল।

কিস্তিমাত

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

“আপনাকে একটা বিষয় অবশ্যই ভাবতে হবে।”

“কী বিষয়!”

“‘আজ এক মাস হয়ে গেল, ভৈরববাবু নিরুদ্দেশ। তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।”

“ব্যাপারটা দুঃখের এবং উদ্বেগের। ভৈরব আমার বন্ধু ; কিন্তু আমি কী করব বলুন! আমার কী করার আছে!”

“দেখুন, সন্দেহটা কিন্তু আপনার দিকেই যাচ্ছে।”

“আমার দিকে? আমি কী করেছি? জলজ্যান্ত একটা মানুষকে অদৃশ্য করে দিয়েছি?”

“যদি বলি, তাই। নিরুদ্দেশ নয়, তিনি খুন হয়েছেন।”

“এই সিদ্ধান্তে আসা গেল কী করে!”

“ভৈরববাবু রোজ সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন, ঠিক কি না!”

“অবশ্যই ঠিক।”

"সেদিনও এসেছিলেন!"

"এসেছিলেন, এবং আমরা খেলায় বসেছিলুম। ভৈরবের হাত পাকা, কিন্তু সেদিন খুব অন্যমনস্ক ছিল। আজেবাজে চাল দিচ্ছিল। হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, 'আমি যাই, আমার একটা কাজ আছে।' চলে গেল।"

"সে যায়নি। এই বাড়িতেই আছে ; কারণ তার চটিজোড়া এখানেই পড়ে আছে। চলে গেলে চটি দু'পাটি এখানে থাকত না।"

"আমি আপনাদের বারবার বলছি, সে ভুল করে আমার চটি পরে চলে গেছে। সেদিন সে খুব আনমনা ছিল। আপনারা এই কথাটা বিশ্বাস করছেন না কেন?"

"একটু অসুবিধে আছে।"

"কী অসুবিধে?"

"প্রমাণ করতে পারবেন না। এই চটিটা প্রমাণ হিসেবে এখানে পড়ে আছে। দ্বিতীয় চটিটা নেই।"

"সেইটাই তো স্বাভাবিক। পরে চলে গেলে আর থাকবে কী করে!"

"যদি বলি চটিটা আছে এবং আপনার পায়েই আছে।"

"কী মুশকিল! এটা আর-একটা।"

"আজ্ঞে না, এটা ওইটাই। আপনার এক জোড়া চটিই ছিল, আর সেইটাই আছে। একই সঙ্গে দু-তিনজোড়া চটি কেনার মতো বেহিসেবি আপনি নন।"

"খুনের তো একটা উদ্দেশ্য থাকবে! ভৈরবকে খুন করে আমার কী লাভ?"

"অনেক লাভ, ভৈরববাবু আপনার জীবনের এমন একটা গুপ্ত কথা জানেন, যেটা কোনও ক্রমে ফাঁস হয়ে গেলে আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"আমার আবার গুপ্তকথা! আমার তো বিলকুল খোলা, গোপন তো কিছুই নেই!"

"বলে গেলুম, অনুসন্ধান করলেই জানতে পারবেন হয়তো। আচ্ছা, এইবার আর-একটা কথায় আসি, সেদিন আপনাদের দাবার আসরে, আপনি আর ভৈরববাবু ছাড়া তৃতীয় আর-একজন ছিলেন।"

"বোধ হয় অদৃশ্য কেউ, কারণ আমরা কেউ তাকে দেখিনি।"

"আপনারা না দেখলেও সেদিন টেবিলে যে অ্যাশট্রেটা ছিল সেটা দেখেছে। ওতে তিনরকম ব্র্যাণ্ডের সিগারেটের টুকরো পাওয়া গেছে। আপনাদের দু'জনের দু'রকম, তিন নম্বরটা কার? একটু ভেবে দেখবেন। কাজটা একটু কাঁচা হাতে করে ফেলেছেন কমলবাবু। চটি আর অ্যাশট্রেটা যে সাক্ষী হতে পারে, প্রমাণ হতে পারে, খেয়াল করেননি। অবশ্য এ-কথাও ঠিক, খুব পাকা অপরাধীও কোনও না কোনও প্রমাণ রেখে যাবেই যাবে। অনেক কেস তো ঘাঁটলুম। অনেককেই তেপান্তরে পাঠালুম।"

"তেপান্তর নয়, দ্বীপান্তর।"

"ও-ই হল।"

"তা, আমি যদি খুন করেই থাকি, আমাকে অ্যারেস্ট করছেন না কেন?"

"অধৈর্য হবেন না, ঠিক সময়েই হাতবালা পরবেন। আগে ডেডবডি বের করে ফেলি।"

"কোত্থেকে?"

"কেন লজ্জা দিচ্ছেন! সবই তো জানেন আপনি! কাল সকালেই সব আসবে।"

"কী আসবে? ডেডবডি!"

"বডি আসবে কেন? বডি তোলার লোকজন আসবে।"

"কোথা থেকে তুলবে?"

"স্যানেটারি পিট থেকে।"

'অ্যাঁ, সে কী! ভৈরব ওখানে আছে না কি!"

"ও কি আর ইচ্ছে করে আছে, আপনার সুব্যবস্থায় আছে। আচ্ছা, তা হলে এখন যাচ্ছি। কাল সকালে রেডি হয়ে থাকবেন, সোজা থানা, সেখান থেকে লকআপে।"

"যাচ্ছেন যান, কিন্তু ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি কে?"

"ও, আমাকে চেনেন না! তা চিনবেন কী করে, এটা যে আপনার প্রথম খুন! আমার নামে অপরাধীদের মুখ শুকিয়ে যায়। আমিই সেই ফেমাস ত্রিনয়ন। অবশ্যই ছদ্মনাম। এই দেখুন, আপনার মুখ শুকোতে শুরু করেছে। ভয় পাবেন না, আমার হাতে যখন কেস পড়েছে মৃত্যু না হোক, যাবজ্জীবন হবেই।"

কোথা থেকে এল এই ত্রিনয়ন! ভৈরবকে নিয়ে নানা কাণ্ড হচ্ছে ঠিকই, থানা-পুলিশও হচ্ছে ; কিন্তু ডিটেকটিভ আসে কী করে। ভৈরবের বড় ছেলে শঙ্করের কাণ্ড অবশ্যই। সব ব্যাপারে নাটুকেপনা। সে যাই হোক, মুখে যাই বলি, লোকটা মনে বেজায় ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে। একা এতবড় একটা বাড়িতে থাকি। ত্রিভুবনে আমার কেউ নেই। পরামর্শ, উপদেশ, সাহস কে-ই বা দেবে। আমাকে যে দেখাশোনা করে, হরিদা, আগে খুব সাহসী ছিল, এখন যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। সবেতেই ভয় পায়।

নিজের জন্য নিজেই তদন্তে নামলুম।

প্রথম হল চটি। সত্যিই তো, চটিটা ফেলে ভৈরব খালি পায়ে গেল কোথায়! একটা মিথ্যে কথা আমি সবসময় বলছি, সেটা হল, ভৈরব আমার জুতো পরে গেছে। সে তা যায়নি। আমাদের দু'জনের পায়ের মাপ আলাদা। ভৈরবের পা ভৈরবের মতোই, বিশাল। ত্রিনয়ন এটা খেয়াল করেনি, অথবা করেছে, পরে কিস্তিমাতের চাল দেবে।

দ্বিতীয় হল, তৃতীয় ব্যক্তি। কথাটা ভুল নয়। ভৈরব আসার আগে এসেছিল। ঘন-ঘন সিগারেটও খেয়েছিল। একেবারেই একজন অচেনা লোক। খুব চালিয়াত। খুব দামি নতুন একটা গাড়ি চেপে এসেছিল। ভৈরব আসার আগেই হাওয়া। রহস্যময় একটা লোক।

তিন নম্বর কথা হল, পিট। পিটের মধ্যে আছে ভৈরবের ডেডবডি!

এটা খুব সাঙঘাতিক কথা। ওদিকটা ভারী নির্জন। একটু দূরেই বাউণ্ডারি ওয়াল। তারপরেই বহুদিন বন্ধ হয়ে থাকা একটা কারখানা। ভুতুড়ে একটা জায়গা। রাতের দিকে ওখানে এমন সব কাজ হয়, যা ভাল নয়। ওই পিটের মধ্যে গভীর রাতে কেউ কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে যেতেও পারে।

এই কথাটা মনে হওয়ামাত্রই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। গলা শুকিয়ে কাঠ। এখন আমার কী করা উচিত। মনে শুরু হল বাদানুবাদ। ভেঙে দু'টুকরো হলুম। দুটো টুকরোয়

তর্ক হচ্ছে,

"বাঁচতে চাস তো তুইও নিরুদ্দেশ হয়ে যা।"

"কোথায় যাব?"

"যেখানেই হোক, দূরে কোথাও।"

"ভয়ে পালাব?"

"বুঝছ না কেন? তুমি একটা চক্রান্তের শিকার হতে চলেছ। অন্যের অপরাধের সাজা তোমাকে ভোগ করতে হবে। এটা একটা বিরাট প্লট।"

"ভৈরবকে মেরে কার কী লাভ?"

"বোকা! ভৈরবকে মারা নয়, তোমাকে সরানোটাই চক্রান্তকারীদের উদ্দেশ্য।"

জামাটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আমিও একজনের সাহায্য নেব। বদমাশদের বদমাইশি আমি শেষ করে দেব। বাড়ির বাইরে পা রাখতে গিয়ে মনে হল, আমার ওপর নজর রাখা হয়েছে, কোথায় যাচ্ছি, না যাচ্ছি। সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে এসে আমি প্রীতপালকে ফোন করলুম। আমার খুব বন্ধু। আর্মিতে ছিল। ব্রিগেডিয়ার। এখন নিজেই একটা এজেন্সি করেছে। সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনাল। খুব নাম।

প্রীতপাল বলল, "কেসটা একটু গড়বড় মনে হচ্ছে। তুই বাড়িতে গেড়ে বসে থাক। বেরোবি না কোথাও। আমি আসছি।"

প্রীতপালের আসল নাম প্রীতিপাল। আর্মিতে থাকার সময় ছোট হয়ে প্রীতপাল।

চান করে, খাওয়াদাওয়া কোনওরকমে শেষ করলুম। একটা বেজে গেল। কিছুই ভাল লাগছে না। আর কতক্ষণই বা। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ভাগ্যের চাকা ঘুরছে। এরই মাঝে একবার পিটটার কাছে ঘুরে এলুম। ম্যানহোল কভারটা তো ঠিকই রয়েছে। একটা মানুষকে ঢোকাতে হলে চাড় দিয়ে খুলতে হবে। সেই খোলার তো একটা চিহ্ন থাকবে। সেসব কিছুই নেই। কে আমাকে বোকা বানাতে চাইছে? উদ্দেশ্যটাই বা কী! ভাবতে-ভাবতে একসময় মনে হতে লাগল, সত্যিই আমি খুন করিনি তো! হয়তো তখন একটা ঘোরে ছিলুম। গল্পে পড়েছি কখনও-কখনও দুষ্ট আত্মা স্বাভাবিক মানুষের ওপর ভর করে, তারপর তাকে দিয়ে নিজের ইচ্ছা মতো যা খুশি তাই করিয়ে নেয়। সেইরকম কিছু হয়নি তো!

ভাবতে-ভাবতে যখন প্রায় পাগলের মতো অবস্থা, তখন গেটের দিক থেকে ভীষণ একটা গোলমালের শব্দ কানে এল, প্রবল বচসা হচ্ছে হরিদার সঙ্গে। একেবারে সামনে না গিয়ে আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, এক বৃদ্ধ, প্রায় জড়ভরত, তিনি ভেতরে আসতে চাইছেন, হরিদা কিছুতেই ছাড়ছে না। বৃদ্ধ বলছেন, "আমার মেয়ের অসুখ, বাঁচবে না, আমি শুধু একবার তোমার বাবুর সঙ্গে দেখা করব। সাহায্য-টাহায্য কিছুই চাই না, শুধু একটা ঠিকানা চাই। তুমি কেন বাপু এমন করছ! আমি চোর, না গুণ্ডা!"

আমি চেঁচিয়ে বললুম, "হরিদা, আসতে দাও।"

বৃদ্ধ ঠুকঠুক করে বৈঠকখানায় এসে সোফায় বসে পড়লেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "দরজাটা দিয়ে দে।"

আরে! এ যে প্রীতপাল। কী সাঙ্ঘাতিক মেকআপ! গলার স্বরটাও পালটে

ফেলেছিল। মুখে একটা পাতলা রবারের মুখোশ সাঁটা ছিল। সেটা খুলে ফেলে বলল, "একেবারেই ধরতে পারিসনি। একশোতে একশো পেলুম।"

"অবশ্যই। গলার স্বরটাও বদলে ফেলেছিলে।"

"ট্রেনিং, ভাই, ট্রেনিং। এককাপ রেড টি আপাতত।"

"চল, ওপরে গিয়ে বসি। এ-ঘরটা তেমন নিরাপদ নয়।"

"না, দোতলায় যাব না, কারণ সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দূর থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে। ফোনে যেটুকু বলেছিস তাতে মনে হচ্ছে, সবদিক থেকে তোকে নজরে রাখা হয়েছে।"

"কেন? সেইটাই তো বুঝতে পারছি না।"

"আমার প্রশ্নের উত্তর দে ঝটপট। ওই ভৈরবের সঙ্গে তোর কতদিনের আলাপ!"

"আমার বাল্যবন্ধু।"

"এই বিষয়-সম্পত্তি কার নামে আছে?"

"এইটাতেই একটু গোলমাল আছে।"

"কীরকম?"

"ভৈরবের ছোটবোনকে আমার বাবা ভীষণ ভালবাসতেন। খুব ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলে এই পরিবারে আনার। আমি রাজি হইনি। এই নিয়ে আমার সঙ্গে তিক্ততা। বাবার অসুখের সময় সে দু'হাতে সেবা করেছিল। বাবা একটা উইল করে সব প্রপার্টি তাকে দান করে গেলেন। শর্ত রইল, যতদিন আমি আছি ততদিন আমার ভোগদখলে থাকবে। যদি আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিই, বা মারা যাই, তখন সব চলে যাবে ওর হাতে, বা ওর বংশধরদের হাতে।"

"সেই মেয়ের বিয়ে হয়েছে?"

"না।"

"না কেন?"

"বলতে পারব না!"

"ওই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?"

"একজন প্রোমোটার। আমাকে বছরখানেক ধরে উত্ত্যক্ত করছে, এটা ছেড়ে দিন, মোটা টাকা দেব। আমি রাজি হইনি। পরে ভৈরবকে দিয়েও প্রেশার দিচ্ছিল। শেষ যেদিন ভৈরব খেলতে-খেলতে উঠে চলে গেল, ভীষণ অন্যমনস্ক, সেদিন ও যেন কিছু একটা বলতে চাইছিল আমাকে।"

প্রীতপাল 'হুম' বলে একটা শব্দ করল। চুমুকে-চুমুকে লাল চা খেল। একটা প্যাড টেনে নিয়ে ডটপেন দিয়ে কীসব আঁকিবুঁকি করল। এদিকে বেলা পড়ে আসছে। হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "পেয়েছি, প্ল্যান ইজ ক্লিয়ার।"

"পিটটা একবার খুলে দেখলে হয় না!"

"পাগল হয়েছিস। ওখানে কিস্সু নেই। ভৈরব বেঁচে আছে, তবে আজ রাতেই সে খুন হবে। শুধু তাই নয়, আজকের রাতটাও তোর পক্ষে বিপজ্জনক। আমি বলে যাচ্ছি, কী-কী হবে, ভৈরবের ছোটবোন তোর কাছে আসবে, এসে কান্নাকাটি করতে থাকবে

দাদার জন্য। ইতিমধ্যে ভৈরব খুন হয়ে চলে আসছে যথাস্থানে। কাল সকালে সেই ব্যাটা ত্রিনয়ন আসবে তার বাহিনী নিয়ে। ভৈরবকে বাঁচাতে হবে। উই মাস্ট সেভ হিম, আর এই কুচক্রীদের সাজার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"ভৈরব আছে কোথায়?"

"একটু ভাবতে দাও, একটা ওমলেট পাঠাও।"

প্রীতপাল চোখ বুজে বসে আছে। রাত এল বলে! বাইরেটা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। অপরাধ না করেও আমি বসে আছি অপরাধীর মতো। প্রীতপাল হঠাৎ লাফিয়ে উঠল তড়াক করে। আমি আমার মতো করে বলে ফেলেছি, "আচ্ছা, কিছুদিনের জন্যে সরে পড়লে কেমন হয়?"

"ইডিয়েট! তা হলে ভৈরব মরবে এবং তুমিও মরবে। এবং এই সম্পত্তি ওদের দখলে চলে যাবে।"

"তা হলে?"

"পাঁচিল টপকাতে পারবি?"

"পাঁচিল?"

"ইয়েস, পাঁচিল।"

বাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। হরিদা বসে রইল অন্ধকারে ভূতের মতো। প্রীতপাল হরিদাকে বলল, "শোনো, যে-কোনও সময় একজন মহিলা আসবে। তুমি বলবে, বাড়ির আলো চলে গেছে, বাবু মিস্ত্রি ডাকতে গেছে। যদি বসতে চায়, বলবে, পরে আসবেন। তুমি খুব সাবধানে থাকবে, গেটের বাইরে যাবে না, যদি কেউ এসে বলে, তোমার বাবুর বিপদ হয়েছে, তা হলেও না।"

আমাদের পোশাক এখন প্রায় মিলিটারিদের মতো। পায়ে স্নিকার শু। বাগানের পেছনের পাঁচিলের ধারে চলে এসেছি। বড়-বড় গাছ। ওপারে সেই ভুতুড়ে কারখানা। অন্ধকার জনপ্রাণী আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

প্রীতপাল পাঁচিলের মাথায়। তার কাছে সহজ ব্যাপার। আমি কোনওক্রমে উঠলুম। খুব সাবধানে ওপাশে এক লাফ। ঝোপঝাড়ের মধ্যে। সাপ থাকলেও থাকতে পারে। ইঁদুর, ছুঁচো আছেই।

অন্ধকারে হায়েনার মতো এগোচ্ছি সন্তর্পণে। খালি পিপে। ফেলে দেওয়া বয়লার। অকেজো ট্রাক। ভাঙা মোটরগাড়ি। কারখানার শেড। যন্ত্রপাতির ভূত। এগোতে-এগোতে প্রীতপাল হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। ভাঙা একটা ম্যাটাডরের আড়ালে আমরা গুঁড়ি মেরে বসলুম। খুব অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। সামনেই গোডাউন। সেদিক থেকেই আসছে গুঞ্জন। প্রীতপাল রিভলভারটা বের করে হাতে নিল। কানে-কানে বলল, "ক্রাউচ।"

গোডাউনের পেছন দিক। গরাদে বসানো জানলা। পাল্লা নেই। ভেতরে মোমবাতি জ্বলছে কেঁপে-কেঁপে। ক্যাম্পখাটে চাদর-চাপা একজন মানুষ। ষণ্ডামার্কা দুটো লোক মেঝেতে বসে আছে। হিন্দিতে কথা বলছে।

"দশবাজেতক খতম হো যায়েগা।"

"ক্যায়সে?"

"য্যায়সে হোতা হায়!"

ফিসফিস করে বললুম, "অ্যাকশান।"

"নট নাও। ওয়েট।"

প্রীতপাল ম্যাটাডরের তলায় শুয়ে মোবাইল ফোনে কী আদেশ করল বোঝা গেল না। অন্ধকারে আমিও ঘাপটি মেরে আছি। অনেকটা পরে প্রায় মধ্যরাতে মেন গেট দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকল। হেডলাইট, ব্যাকলাইট, ইন্ডিকেটর লাইট সব নেভানো। ভয়ঙ্কর এক দানবের মতো ঢুকছে। এঞ্জিনের চাপা গরগর। গাড়িটা থামল। চারটে লোক নেমে এল। গোডাউনের দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। মোট ছ'জন হল। আমরা মাত্র দু'জন।

প্রীতপাল ঘড়ি দেখল। আমাকে বলল, "তুই ওই জানলায় থাক। ঘাবড়াসনি। তুই এই যন্ত্রটা হাতে রাখ। মাঝে-মাঝে এই বোতামটি টিপবি। এটা সিগন্যাল। আরও একডজন লোক আসছে। সিগন্যালটা তাদের জন্যে।"

সিগারেট কেসের মতো চ্যাপটা একটা যন্ত্র আমার হাতে। টিপের মতো লাল একটা আলো জ্বলছে। প্রীতপাল অন্ধকারে নেকড়ে বাঘের মতো এগিয়ে গেল।

ভেতরে আর-একটা বাতি জ্বলছে। একজন খাটিয়ার চাদরটা সরাতেই চমকে উঠলুম। ভেবেছিলুম ভৈরবকে দেখব। কোথায় ভৈরব। এ তো ভৈরবের বোন। দু'জনের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে একটা ইঞ্জেকশন ফুঁড়ে দিলে। কণিকা উঠে বসল। যে এতক্ষণ নেতিয়ে পড়ে ছিল সে চনমন করে উঠে বসল।

একজন অন্ধকার থেকে এগিয়ে এল, দলিলের মতো একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, "ভালয় ভালয় সইটা করে দাও, তা না হলে ওই যে তোমার দাদা, খতম হো যায়েগা।"

এইবার ভৈরবকে দেখতে পেলুম। স্ট্রেচারে পড়ে আছে। অর্ধমৃত। ছায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেও আর একজনকেও চিনতে পেরেছি, সে হল ওই ত্রিনয়ন।

কণিকা উত্তেজিত গলায় বলল, "সই আমি করব না, মেরে ফেলতে হয় মেরে ফেলো।"

"মারব কেন? তোমাকে সারাজীবন পঙ্গু করে ফেলে রাখব, আর তোমার দাদার ছাল ছাড়াব, একটু-একটু করে মেরে ফেলব, আর যাকে তুই সবচেয়ে ভালবাসিস, তার গলায় পরাব ফাঁসির দড়ি।"

দু'জন স্ট্রেচারটা ধরাধরি করে সামনে নিয়ে এসে ধপাস করে মাটিতে নামাল। কোনও দয়ামায়া নেই। ভৈরবকে দেখে কষ্ট হচ্ছে। সেই সুন্দর চেহারা নেই। একটি কঙ্কাল। এত রাগ হচ্ছে, মনে হচ্ছে ঘরে ঢুকে সবক'টাকে মেরে পাটপাট করে দিই।

দলের পাণ্ডা জিজ্ঞেস করল, "ওদিকের খবর কী?"

"বাড়ি অন্ধকার। পোল থেকে ফিউজ উড়ে গেছে। মেকানিক ডাকতে গেছে।"

"পালায়নি?"

"না, ওস্তাদ।"

"মরবে। মরতে ওকে হবেই। নাও দিদিমণি, সই করো। কেন অশান্তি করছ!" কণিকা কলমটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। ছ'টা লোক রাগে মাটিতে পা ঠুকল। আর ঠিক সেই সময় আমার হাতের যন্ত্র বিপ-বিপ করে উঠল। হঠাৎ একটা কাপড়ের দলার মতো কী ঝপাস করে বাতি দুটোর ওপর এসে পড়ল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। আমার চারপাশ দিয়ে কারা যেন ছুটে চলে গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে।

বন্ধু প্রীতপালের কঠিন মিলিটারি গলা শোন গেল, "যে যেখানে আছ সেইখানে থাক। নড়ার চেষ্টা করলেই মাথার ঘিলু বের করে দেব। তোমরা ঘেরাও।"

লম্বা-লম্বা গোটাকতক টর্চের আলোয় ঘর নীল। সেই আলোয় প্রীতপালের বারোজন লোক যেন বারোটা পাথরে খোঁদা মূর্তি। এতটা হবে, ওই ছ'টা বদমাশ বুঝে উঠতে পারেনি।

প্রীতপালই মোবাইল ফোনে বলছে, "সান্যাল মুভ ইন। ফ্রন্ট গেট। গোডাউন অ্যাট দ্য ব্যাক সাইড।"

পুলিশের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হল সেই ভুতুড়ে পরিবেশ। একটা নয়, দুটো ভ্যান। ফোর্স নামছে। সান্যাল বলছেন, "ওয়েল ডান প্রীত।"

সবক'টাকে ভ্যানে পুরে গাড়ি বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে আকাশের আলোয় আমরা কয়েকজন। কণিকা আমি এতদিন খুব কষ্ট দিয়েছি। আমি একটা অমানুষ বটে! কণিকা কত রোগা হয়ে গেছে!

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে প্রীতপালের কম্যাণ্ড, "অনেক পাকামো করেছ, এইবার পিতার ইচ্ছা পূরণ করে দু'জনে এক হও।"

আগে-আগে স্ট্রেচারে চলেছে ভৈরব। পেছনে আমরা। আমার কাঁধে প্রীতপালের হাত। কণিকার কাঁধে আমার হাত।

চলে যাওয়ার আগে প্রীতপাল হেঁকে বলে গেল, "গাধা! নিমন্ত্রণটা যেন আমরা পাই। আমাদের ফুল টিম! বরযাত্রী এবং বউভাত দুটোই।"

ভৈরব ইতিমধ্যে হরিদার হাতের কফি খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়েছে। সে হাসতে-হাসতে বলল, "দেখলি পাঁঠা। একেই বলে দাবার চাল! কিস্তিমাত।"

pathagar.net

ঘড়ি রহস্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের প্রিয় পরিচালক ষষ্ঠীচরণের দু'দিন থেকে সামান্য সর্দিজ্বর। পাড়ার ডাক্তার তারকবাবু তাকে দেখতে এসেছিলেন। প্রচুর আশ্বাস দিয়ে এবং লম্বা-চওড়া প্রেসক্রিপশন লিখে তিনি আড্ডার মেজাজে বসলেন। দেশের হালচাল নিয়ে কিছুক্ষণ বকবক করে গেলেন। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, "আচ্ছা কর্নেলসাহেব, আপনি তো বিখ্যাত রহস্যভেদী। এ যাবৎ বিস্তর জটিল রহস্য ফাঁস করেছেন শুনেছি। কিন্তু কখনও কি এমন কোনও কেস আপনার হাতে এসেছে, যার রহস্য ফাঁস করতে পারেননি?"

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা দেখছিলেন। বললেন, "প্রশ্নটা আপনাকেও করা যায়।"

ডাক্তারবাবু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, "কেন? কেন?"

"ডাক্তার হিসেবে আপনার সুনাম আছে। আপনি কি সব রোগীর সঠিক রোগ ধরতে পেরেছেন?"

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "কোনও ডাক্তারই এমন দাবি করতে পারেন না।"

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখলেন। তারপর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, "আমার ক্ষেত্রেও তাই। কিছু-কিছু রহস্য ফাঁস করতে শেষাবধি আমি ব্যর্থ হয়েছি।"

তারকবাবু আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "অন্তত তেমন একটা কেসের কথা বলুন। আমার জানতে ইচ্ছে করছে।"

কর্নেল চোখ বুজে চকচকে টাকে হাত বুলোতে শুরু করলেন। এবার আমারও খুব আগ্রহ হল। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ আমি ওর প্রায় ছায়াসঙ্গী। অসংখ্য জটিল রহস্য ওঁকে নিপুণ দক্ষতায় ফাঁস করতে দেখেছি। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, কোনও ক্ষেত্রে উনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাই না বলে পারলাম না, "আশ্চর্য! কখনও তো আপনাকে ব্যর্থ হতে দেখিনি। তা ছাড়া তেমন কোনও কেসের কথা আপনি আমাকে বলেনওনি?"

"জয়ন্ত! তুমি সৈদাবাদ রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস হারানোর ঘটনা ভুলে গেছ।"

মনে পড়ে গেল। বললাম, "কিন্তু নেকলেস হারানোটা যত রহস্যময় হোক, কে ওটা চুরি করেছে, আপনি তো জানতে পেরেছিলেন। এখন চোর যদি নিপাত্তা হয়ে যায়, আপনার কী করার আছে? খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার কাজটা পুলিশের।"

ডাক্তারবাবু অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "একটু ডিটেলস বলুন কর্নেলসায়েব। রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস যখন, তখন নিশ্চয় প্রচুর দামি। কীভাবে ওটা চুরি গিয়েছিল?"

কর্নেল বললেন, "সেটাই একটা জটিল রহস্য। সেই রহস্য আমি ফাঁস করতে পারিনি। নেকলেসটা নাকি রাজপরিবারের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতীক। পরিবারে নতুন বউমা এলে বউভাতে জমকালো পার্টি দেওয়া হত। পার্টিতে নতুন বউমা নেকলেস পরে সিংহাসনে বসে থাকতেন। পার্টি শেষ হলে ওটা খুলে নিয়ে গিয়ে পাতালঘরে লক্ষ্মী প্রতিমার গলায় পরানো হত। এটাই ছিল বংশানুক্রমে রীতি। সে রাত্রে পার্টি শেষ হতে তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। হঠাৎ দেখা গেল বউমার গলায় নেকলেস নেই।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু বলছেন আপনি নেকলেস চোরকে চিনতে পেরেছিলেন!"

"হ্যাঁ। কিছু সূত্র থেকে অনুমান করেছিলাম রাজবাড়ির জয়গোবিন্দ নামে এক কর্মচারী যেভাবেই হোক নেকলেস চুরি করেছে। সে একা থাকত রাজবাড়ির একটা ঘরে। কিন্তু তার ঘরে শেষরাত্রে হানা দিয়ে দেখা গেল তল্পিতল্পা গুটিয়ে সে উধাও হয়ে গেছে। তবে রহস্যটা থেকে গেল। জয়গোবিন্দ কখন কীভাবে নেকলেস চুরি করল? হলঘরের পার্টিতে প্রচুর লোক ছিল। চোখধাঁধানো আলো ছিল। সব চেয়ে আশ্চর্য, নতুন বউমাও টের পাননি কখন তাঁর গলা থেকে নেকলেস উধাও হয়েছে।"

ডাক্তারবাবু ঘড়ি দেখে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। "উঠি কর্নেলসায়েব! এতক্ষণ রোগীরা আমার মুণ্ডুপাত করছে।"

তারক ডাক্তার চলে যাওয়ার পর কর্নেল একটু হেসে বললেন, "তারকবাবু ডাক্তার হিসেবে জনপ্রিয়। কিন্তু মশা মারতে কামান দেগেছেন। একে তো ষষ্ঠী ওষুধ খেতেই ভয় পায়, তাতে এত সব ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, সিরাপ! তুমি একটু বোসো জয়ন্ত! দেখি,

কাউকে দিয়ে ওষুধগুলো আনানো যায় নাকি।"

বললাম, "আমি এনে দিচ্ছি।"

এই সময় ডোরবেল বাজল এবং ড্রয়িং রুমের দরজায় পরদার ফাঁকে অবাক হয়ে দেখলাম, ষষ্ঠীচরণ গিয়ে দিব্যি দরজা খুলে দিল। তারপর প্রায় তাকে ঠেলে সরিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সটান এ-ঘরে এসে ঢুকলেন। নমস্কার করে কাচুমাচু মুখে তিনি বললেন, "কর্নেলসায়েবের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। দাদা বলে গেছেন, টাইম ইজ মানি। তো কাগজে আপনার কীর্তিকলাপ পড়েছি। ছবি দেখেছি। অনেক চেষ্টায় ঠিকানা জোগাড় করে ছুটে এসেছি। টাইম ইজ মানি। কিন্তু—"

ওঁর কথার ওপর কর্নেল বললেন, "আপনি বসুন। বলুন কী ব্যাপার।"

ভদ্রলোক সোফায় বসে রুমালে মুখ মুছে বললেন, "সব কথা গুছিয়ে বলতে সময় লাগবে। কিন্তু ওই যে বললাম! দাদা বলে গেছেন টাইম ইজ মানি! ইংরিজি প্রবাদ হলেও কথাটা সত্যি।"

ভদ্রলোক পাগল নন তো? একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, "বারবার টাইম ইজ মানি বলছেন। অথচ নিজেই টাইম নষ্ট করছেন।"

ভদ্রলোক চটে গিয়ে বললেন, "আমার কথা হচ্ছে কর্নেল সায়েবের সঙ্গে।"

কর্নেল হেসে ফেললেন। "ঠিক। তবে উনি একজন সাংবাদিক। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী। আপনি নিশ্চয় জানেন, রিপোর্টাররা সবকিছুতে খবর খোঁজেন?"

ভদ্রলোক ঝটপট আমাকে নমস্কার করে বললেন, "আপনিই সেই বিখ্যাত সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী? কী সৌভাগ্য! আপনি আমার এই খবরটা দয়া করে লিখুন! বজ্জাতদের মুখোস খুলে দিন। হ্যাঁ, এবার খবরটা সংক্ষেপে বলি। কারণ টাইম ইজ মানি।" বলে উনি কর্নেলের দিকে ঘুরে বসলেন। "আগে আমার নাম ঠিকানা বলি। আমার নাম প্রাণনাথ রায়। সাতাশ বাই তিন, নকুড় মিস্ত্রি লেনে একটা মেসবাড়িতে একখানা আলাদা ছোট্ট ঘরে থাকি। চাকরি করি মতিলাল ট্রেডিং কোম্পানিতে। তো কিছুদিন থেকে একটা ভুতুড়ে ঘটনা লক্ষ করছি। ধরুন, টেবিলে যে পাঁজিখানা যেখানে রেখে বেরিয়েছিলাম, বাসায় ফিরে দেখি, সেখানা ঠিক সেইখানে নেই। কিংবা ধরুন, যে শার্টটা হ্যাঙ্গারে যেভাবে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, ফিরে এসে দেখি, সেটা সেইভাবে ঝোলানো নেই। একটা কাঠের ছোট্ট আলমারি আছে। তার তালা তেমনই আটকানো। অথচ ভেতরকার জিনিসপত্র এদিক-ওদিক হয়ে আছে। রোজ বিকেলে ছড়ি হাতে পার্কে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস। কাল ছড়িটা দেখি, ব্র্যাকেটের যেখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে নেই। এইরকম অসংখ্য ব্যাপার প্রতিদিন ঘটছে। আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। চোর ঢুকলে তো সে কিছু চুরি করত। কিন্তু এ-পর্যন্ত কিছুই চুরি যায়নি। আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেউ বজ্জাতি করে আমাকে তাড়াতে চাইছে। কিন্তু গত রাত্রে হঠাৎ একটি শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই টেবিলবাতি জ্বেলে দেখি কাঠের আলমারিটা নড়ছিল। সদ্য থেমে গেল। আতঙ্কে সারা রাত্রি আর ঘুম হয়নি। তো টাইম ইজ মানি। আর দেরি করা চলে না। আপনার শরণাপন্ন না হয়ে উপায় ছিল না।"

pathagar.net

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণে বললেন, "আপনার ঘরে কোনও দামি জিনিস আছে?"

"না। যৎসামান্য টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে রাখি। এই রিস্টওয়াচটা যদি দামি বলেন, এটা প্রায় সারাক্ষণ আমার হাতেই বাঁধা থাকে। শুধু স্নানের সময় টেবিলে খুলে রেখে যাই। কিন্তু এটা চুরি হয়নি।"

"আপনার দাদার নাম কী?"

"আমার দাদার নাম ছিল হরনাথ রায়।"

"তিনি বেঁচে নেই?"

"আজ্ঞে না। এখন আমি মেসবাড়ির যে-ঘরে থাকি, দাদা সেখানেই থাকতেন। বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বিয়ে করেননি। আমার সঙ্গে বহু বছর দাদার কোনও যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ দু'মাস আগে টেলিগ্রাম পেলাম, হার্ট অ্যাটাক হয়ে দাদা হাসপাতালে আছেন। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এলাম কলকাতা।"

"আপনি কোথায় ছিলেন তখন?"

"সাহেবগঞ্জে। আমার কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ আছে সেখানে। আমাদের পৈতৃক বাড়িও আছে। আমার ফ্যামিলি এখনও সাহেবগঞ্জে আছে।"

"তারপর কী হল বলুন।"

"হাসপাতালে দাদা তখন মরণাপন্ন। আমাকে চিনতে পেরে শুধু বললেন, 'পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস!' ব্যস! ওই শেষ কথা।"

"কথাটা একটা ইংরেজি প্রবচন। যাই হোক, তারপর?"

"দাদার শেষকৃত্য করে কোম্পানির হেড অফিসে গেলাম। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল কলকাতায় বদলি হওয়ার। হেড অফিসে থাকলে অনেক সুযোগসুবিধা, বুঝলেন তো?"

"বুঝলাম। কোম্পানি তা হলে আপনাকে কলকাতায় বদলি করল?"

"আজ্ঞে। দাদার সঙ্গে মেসের ম্যানেজার প্রভাতবাবুর বন্ধুতা ছিল। তাই দাদার ঘরটা আমাকে একই ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন।"

"ওই ঘরে তো আপনার দাদার জিনিসপত্র ছিল?"

"ছিল। একটা তক্তাপোশ, বিছানাপত্তর, চেয়ারটেবিল, একটা সুটকেস, ছোট্ট কাঠের আলমারি—এইসব।"

"আর কিছু?"

প্রাণনাথবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "আর তেমন কিছু—ও হ্যাঁ। একটা প্রকাণ্ড দেওয়ালঘড়ি। ঘড়িটা অচল। দাদা কেন এটা কিনেছিলেন, কেনই বা আর সারাননি, কে জানে! আমি ওটা বেচে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু দাদার স্মৃতি।"

কর্নেল হাসলেন। "হ্যাঁ। টাইম ইজ মানি।"

প্রাণনাথবাবু সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "কথাটা দাদা বলেছিলেন। সেই থেকে কেন কে জানে কথাটা আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে।"

"আমাকেও।" বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন,

"আপনার ঘরের ভুতুড়ে ঘটনার কথা কি ম্যানেজার প্রভাতবাবু কিংবা আর কাউকে বলেছেন?"

"প্রভাতবাবুকে বলেছিলাম।"

"উনি কী বলেছিলেন?"

"উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'আপনার দাদাও ঠিক একই কথা বলতেন'।"

প্রাণনাথবাবু এবার চাপা গলায় বললেন, "ওই মেসবাড়িতে যাওয়ার পর দিন মেসের একজন বোর্ডার ননীবাবু আমাকে বলেছিলেন, ওই ঘরে নাকি ভূত আছে। বহুবছর আগে কে নাকি আত্মহত্যা করেছিল।"

"ঠিক আছে। টাইম ইজ মানি। আমরা আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আপনার বাসায় যাব। তবে আপনি যেন কথাটা গোপন রাখবেন। আমরা আপনার কোম্পানির অফিসার হিসেবে যাব।"

প্রাণনাথবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল অভ্যাসমতো টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "কী বুঝলে জয়ন্ত?"

"ম্যানেজার ওঁকে তাড়াতে চাইছেন। কারণ নতুন বোর্ডার ঢোকাতে পারলে বেশি ভাড়া এবং সেলামিও পাবেন।"

"তাড়াতে চাইলে হরনাথবাবুর মৃত্যুর পর ওঁকে একই ভাড়ায় থাকতে দিলেন কেন?"

"তা হলে কোনও বোর্ডার-ধরুন, সেই ননীবাবু ঘরটা পাওয়ার জন্য ওঁর পেছনে লেগেছেন।"

কর্নেল হাসলেন। "টাইম ইজ মানি। কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ডার্লিং।"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "কথাটা দেখছি সত্যিই ভূতের মতো আপনাকে পেয়ে বসেছে।"

"হ্যাঁ। ওটা আসলে ভূত। সেই ভূতের উপদ্রব ঘটেছে প্রাণনাথবাবুর ডেরায়।"

বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "নীচের ফ্ল্যাটের লিণ্ডার দাদা গোম্‌সকে দিয়ে ষষ্ঠীর ওষুধগুলো আনিয়ে নিই। তুমি বোসো। দু'জনে আজ রান্নাবান্না করব। তারপর বিকেলে নকুড় মিস্ত্রি লেনে যাব।"

দোতলা মেসবাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি। ঘিঞ্জি গলির বাঁকের মুখে একটা ছোট্ট পার্ক দেখা যাচ্ছিল। প্রাণনাথবাবু নীচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ির একতলায় দোকানপাট। দোতলায় মেস। শেষ প্রান্তে প্রাণনাথবাবুর ডেরা। তার লাগোয়া ম্যানেজারের ঘর। সেই ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাণনাথবাবু ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে জানিয়ে গেলেন, ওঁর কোম্পানির অফিসাররা 'ইমপর্ট্যান্ট' কাজে এসেছেন। প্রভাতবাবু চেয়ারে বসেই করজোড় নমস্কার করলেন। ভদ্রলোক রোগা এবং বেঁটে। মুখে অমায়িক ভাব। তালা খুলে প্রাণনাথবাবু বললেন, "আপনারা দয়া করে একটু বসুন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।"

"টাইম ইজ মানি!" বলে কর্নেল দেওয়াল ঘড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর

নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। ঘড়ির কাঁটা বারোটা তিরিশে থেমে আছে।

বললাম, "একেই বলে বারোটা বেজে যাওয়া।"

কর্নেল আমার রসিকতায় কান দিলেন না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর উঠে আতশ কাচ বের করলেন। একটু পরে বললেন, "ডায়ালে কিছু কথা লেখা ছিল। ঘষে ফেলা হয়েছে। তবে ঘড়িটা বিলিতি এবং খুব দামি। হরনাথ কিংবা তাঁর পূর্বপুরুষকে কেউ হয়তো উপহার দিয়েছিল।"

চেয়ার থেকে নেমে কর্নেল চেয়ারটা আগের জায়গায় রেখে কাঠের আলমারিটার কাছে গেলেন। উঁকি মেরে পেছন দিক দেখে আপন মনে বললেন, "সত্যিই এটা নাড়ানো হয়েছে। ডান দিকের দুটো পায়া ইঞ্চিটাক সরে এসেছে।"

"কীভাবে বুঝলেন?"

"কোনও আসবাব অনেককাল এক জায়গায় রাখলে মেঝেয় তার ছাপ পড়ে। পায়া দুটো সেই ছাপ থেকে সরে এসেছে।"

এইসময় প্রাণনাথবাবু ফিরে এলেন। তাঁর হাতে চায়ের দুটো কাপপ্লেট। বললেন, "আগে চা খেয়ে নিন আপনারা। তারপর সব দেখাচ্ছি।"

কর্নেল বললেন, "আপনি এই আলমারিটা খুলুন।"

"খুলছি। ওতে দাদার জামাকাপড় আর বইপত্তর ছাড়া কিছু নেই।"

প্রাণনাথবাবু কাঠের আলমারিটা খুলে দিলেন। কর্নেল আলমারির ভেতর যেন তল্লাশ শুরু করলেন। তল্লাশ শেষ হলে উনি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "আপনার দাদার সেই সুটকেসটা দেখতে চাই।"

চামড়ার সুটকেসেও কিছু জামাকাপড় আর-একটা ফাইল পাওয়া গেল। ফাইলের কাগজপত্র দেখে কর্নেল বললেন, "আপনার দাদা দেখছি শেয়ার মার্কেট ব্রোকার ছিলেন।"

"তাই বুঝি? আমি কিন্তু দাদার কোনও কাগজপত্র এখনও খুঁটিয়ে দেখিনি!"

"আপনি ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে ডাকুন। ওঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।"

প্রাণনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ওঁকে ডাকা কি ঠিক হবে?"

"আপনি ওঁকে ডাকুন।"

কর্নেলের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ছিল। প্রাণনাথবাবু বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু উনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওঁকে পাশ কাটিয়ে প্রভাতবাবুর আবির্ভাব হল। প্রাণনাথও ফিরে এলেন। আমার সন্দেহ হল, প্রভাতবাবু দরজার পাশেই হয়তো আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেল বললেন, "আসুন প্রভাতবাবু, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

প্রভাতবাবু মিটিমিটি হেসে বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা লালবাজার থেকে এসেছেন। তবে সার, বড্ড দেরি করে এসেছেন। মরার আগে হরনাথ চোরাই জিনিস হাফিজ করে গেছে।"

কর্নেল বললেন, "চোরাই জিনিস। তার মানে?"

"মানে আপনারা ভালই জানেন। তবে আমি সার ওসব সাতে-পাঁচে ছিলাম না। হরনাথ আমাকে বলত বটে, 'খদ্দের দেখে দাও। সিকিভাগ তোমার।' আমি ওকে পাত্তা

দিইনি।”

“কিন্তু জিনিসটা কী?”

“খুলে কিছু বলেনি হরনাথ। কাজেই জিনিসটা কী আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, জিনিসের দাম ছিল বড্ড বেশি। হরনাথ আভাস দিয়েছিল লাখের ওপরে দাম। আমার মালিক ভদ্রলোক, যাঁর এই মেসবাড়ি, তিনি কোটিপতি লোক। হরনাথ গোপনে তাঁর কাছেও গিয়েছিল। কিন্তু তিনিও কিনতে সাহস পাননি। আমাকে বলেছিলেন, ‘ওই লোকটাকে তাড়াও।’ কিন্তু তাড়াব কী করে? এ পাড়ার সব গুণ্ডা, বদমাশ ছিল হরনাথের হাতে।”

প্রাণনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, “এসব কী বলছ প্রভাতদা! আমার দাদা—”

প্রভাতবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “খাল কেটে কুমির এনেছ। এখন তুমিই ঠেলা সামলাও পানু! আমাকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ো না।”

বলে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রাণনাথবাবু ধপাস করে বিছানায় বসে বললেন, “আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আমার দাদা বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া ছিলেন বটে, কিন্তু ওঁকে চোর অপবাদ কেউ কস্মিনকালে দেয়নি। আর দামি চোরাই জিনিস যদি ওঁর কাছে থাকবে, আমি তার খোঁজ পাব না? যদি বেচে দিয়েও থাকেন, সেই টাকাই বা গেল কোথায়?”

কর্নেল চুরুট ধরালেন। আমি বললাম, “এবার মনে হচ্ছে, আপনার ঘরে কেউ আপনার দাদার চোরাই জিনিস বা তা বিক্রি করা টাকা খুঁজতেই ঢোকে।”

প্রাণনাথবাবু প্রায় আর্তনাদ করলেন, “তেমন কিচ্ছু এ ঘরে নেই।”

কর্নেল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, “আপনার দাদা বলেছিলেন টাইম ইজ মানি। তাই না?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“টাইমের সঙ্গে ঘড়ির সম্পর্ক আছে। আপনি ঘড়িটা সারাতে দিচ্ছেন না কেন?”

“সারাতে অনেক টাকা লাগবে। অত টাকা পাব কোথায়?”

“আমি নিজের খরচে সারিয়ে দেব। আমার ধারণা, ঘড়িটা চালু হলে আপনার ঘরে আর ভূতের উপদ্রব হবে না। ওই অচল ঘড়িই আপনার ঘরে ভূত ডেকে আনছে।”

প্রাণনাথবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল চেয়ার টেনে নিয়ে দেওয়ালঘড়ির তলায় গেলেন। তারপর চেয়ারে উঠে প্রকাণ্ড ঘড়িটা নামিয়ে আনলেন। বললেন, “দিন সাতেক পরে আমার কাছ থেকে এটা ফেরত নিয়ে আসবেন। কোনও বড় কোম্পানিতে এটা সারাতে দেব।”

ইলিয়ট রোডে তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল ঘড়িটা খুলতে শুরু করলেন। বললাম, “সব ছেড়ে এই ঘড়ি নিয়ে পড়লেন কেন?”

কর্নেল হাসলেন, “কারণ টাইম ইজ মানি।”

“কর্নেল! আমার ভয় হচ্ছে এই অচল ঘড়ি আপনার মগজও অচল করে দিয়েছে।”

ডায়ালের কাচ খুলে আতশ কাচ রেখে কী দেখতে দেখতে কর্নেল বললেন, “এবার

স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রেজেন্টেড টু মিঃ জয়গোবিন্দ রায় ফর হিজ সিনসিয়ার সার্ভিস অ্যাণ্ড অনেস্টি, অন দা অকেশন অব কুমারবাহাদুর প্রমথনারায়ণ চৌধুরী'স সেভেনটি ফার্স্ট বার্থ অ্যানিভার্সারি..."

চমকে উঠলাম। "কর্নেল! এটা তো তা হলে সৈদাবাদ রাজবাড়ির উপহার! এই উপহার হরনাথের হাতে গেল কী করে?"

"ডার্লিং হরনাথই জয়গোবিন্দ। হরনাথের সুটকেসের ভেতর কয়েকটা পুরনো নেমকার্ড খুঁজে পেয়েছি। এই দ্যাখো, হরনাথ নাম ভাঁড়িয়ে রাজবাড়িতে কেয়ারটেকারের চাকরি জুটিয়েছিল।"

"বুঝেছি। কিন্তু জড়োয়া নেকলেসটা গেল কোথায়?"

"ভুলে যাচ্ছ জয়ন্ত! মৃত্যুর সময় হরনাথ বলেছিল, 'পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস'! পানুবাবু সূত্রটা বুঝতে পারেননি। নেকলেস চুরি যায় রাত সাড়ে বারোটায়। এই ঘড়ির কাঁটা তাই সাড়ে বারোটায় রেখেছিল হরনাথ। আর নেকলেসটা—" বলে কর্নেল ডায়াল খুলে ফেললেন এবং ভেতরে থেকে একটা লাল ভেলভেট মোড়া প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেট খুলতেই দেখা গেল ঝলমলে হিরে মুক্তোবসানো সোনার ঝালর দেওয়া একটা জড়োয়া নেকলেস। কর্নেল মিটিমিটি হেসে ফের বললেন, 'টাইম ইজ মানি'! তবে হরনাথ কীভাবে নেকলেসটা চুরি করেছিল, এখন বুঝতে পারছি। এই দ্যাখো, পিঠের দিকে নেকলেসটার ক্লিপ ঠিকভাবে আঁটা নেই। সহজেই খোলা যায় কিংবা নিজে থেকেও খুলে পড়তে পারে। বিয়ের পার্টিতে নতুন বউমা নিশ্চয় ঘুমে ঢুলছিলেন। সেই সময় নেকলেস খসে পড়ে থাকবে। কেয়ারটেকার উপহারসামগ্রীর দায়িত্বে ছিল। সে সুযোগটা ছাড়েনি। ক্লিয়ার?"

সায় দিলে বললাম, "অল ক্লিয়ার। টাইম ইজ মানি, ওটাও ক্লিয়ার।"

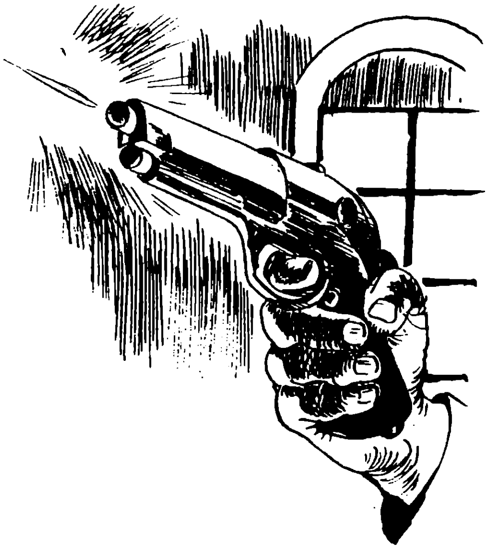

হারানো বুদ্ধমূর্তি উদ্ধার

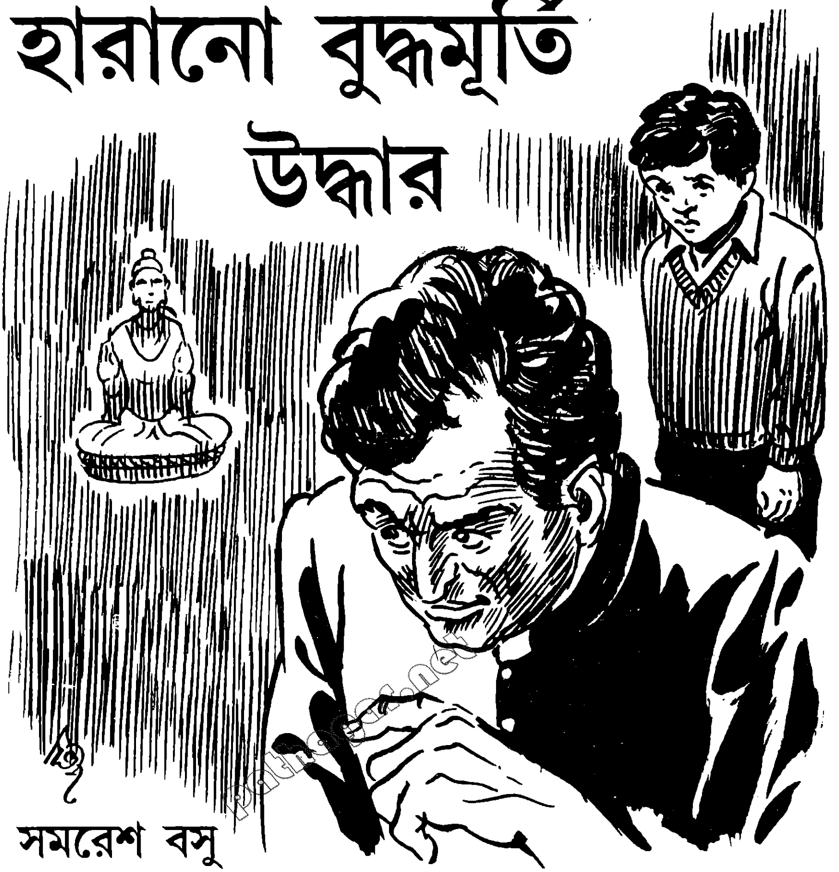

সমরেশ বসু

গোগোলের দার্জিলিং বেড়াতে যাওয়াটা নানা দিক থেকেই মনে রাখবার মত। দার্জিলিং থেকেই যাওয়া হয়েছিল কালিম্পং। সেখানে এক তিব্বতী বৌদ্ধ মঠে তো একটা সাংঘাতিক খুনের ঘটনাই ঘটে গিয়েছিল। তাও আবার গোগোলের চোখের সামনেই। এক লামা আর এক লামাকে, পিছন থেকে ছুরি ছুঁড়ে মেরেছিল।

কালিম্পং থেকে আবার দার্জিলিংয়ে ফিরে আসা। তারপরে নিমন্ত্রণ পেয়ে বেড়াবার ধূম পড়ে গেল। পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়িয়ে বাবা বেশ হাঁপিয়ে পড়লেন। হোটেলে ঢুকেই বললেন, 'আমি আর কোথাও বেরোচ্ছিনে। এখন কয়েকদিন চুপচাপ বিশ্রাম করব।'

মায়েরও সেই অবস্থা। গোগোল বলল, 'তাহলে আমি কী করব?'

মা বললেন, 'তোমার জন্য তো ঘোড়া রয়েছেই। তুমি ঘোড়া চেপে বেড়াবে, আর গায়ে ঘোড়ার গন্ধ নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু মনে রেখ, ম্যালের সমতম ছাড়া, আর কোথাও যাবে না। কালিম্পং যাবার আগে, জলাপাহাড়ে ঘোড়া নিয়ে চলে গেছিলে। ওরকম কিছু করতে যেও না।'

কিন্তু বাবা মা'র বিশ্রাম করা হল না। বাবার পরিচিত ভদ্রলোকের সংখ্যা এত, প্রায় রোজই কোন না কোন বাড়িতে নিমন্ত্রণ লেগেই রইল। দার্জিলিংয়ে ছিলেন বাবার এক উকীল বন্ধু। নাম শচীন মৈত্র। তিনি কোর্ট থেকে ফেরার পথে বাবার সঙ্গে হোটেলে গল্প করতে আসতেন। তাঁর বাড়িতেও একদিন নিমন্ত্রণ হল।

গোগোল মিঃ মৈত্রের কথা থেকে আগেই জেনেছিল, ওঁর অদ্ভুত সব জিনিস সংগ্রহ করার বাতিক আছে। সে সব জিনিসের দাম এমনিতে বেশী নয়। অথচ দাম দিয়েও নাকি সেসব জিনিস পাওয়া যায় না। অতি দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য সব জিনিস, যা মানুষের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। গোগোল জানত ওটাকে কিওরিও সংগ্রহ করা বলে।

মিঃ মৈত্র ভারতবর্ষের যেখানে যখন গিয়েছেন, সেখান থেকেই কিছু না কিছু সংগ্রহ করে এনেছেন। তার মধ্যে রাজস্থানের আদিবাসী মেয়েরা গলায় যে পাথরের মালা ব্যবহার করে, তাও যেমন আছে, তেমনি সিকিমের রাজপ্রাসাদের রাজার দেহরক্ষীর বিশেষ তলোয়ারও আছে। সেই তলোয়ারটা তিনি রাজার কাছে চেয়ে এনেছিলেন। রাজা নাকি তাকে খুশি হয়েই সেটা দান করেছিলেন। তা ছাড়া, দার্জিলিং, কালিম্পং, গ্যাংটক এসব জায়গায় নাকি বিস্তর আর অদ্ভুত সব কিওরিও সংগ্রহ হয়।

মিঃ মৈত্রের বাড়িতে যেদিন গোগোলরা নিমন্ত্রণ খেতে গেল, সেইদিন গোগোল তাঁর অদ্ভুত সংগ্রহ সব দেখল। গোগোলের উৎসাহ দেখে, উনি নিজেই সব দেখালেন। চীন, জাপান, বার্মা, এশিয়ার নানা মুলুকের তামার আর রুপোর টাকা পয়সা তো ছিলই। যাকে বলে মুদ্রা। এমন কি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাটির মুদ্রাও তাঁর কাছে ছিল। সোনা-রুপোর ছোটোখাটো জিনিসও কম ছিল না। ড্রাগনমুখো আংটি থেকে তিব্বতী নানা পাথরের জিনিস। বিচিত্র সব পশুর নখ, ল্যাজ, নানা দেশের পোশাক, টুপি, মহিলাদের ব্যবহারের অদ্ভুত সব মাথার ক্লিপ, ব্রোচ! কিছু আর বাকি নেই। এমন কি, অদ্ভুত দেখতে সব নানা দেশী দোয়াত, কলমও বাদ ছিল না। তার মধ্যে একটা জিনিস গোগোলের খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছিল মাত্র দেড় ইঞ্চি লম্বা একটি বুদ্ধ মূর্তি। সেটা তামার তৈরি। কিন্তু বুদ্ধের গলার কাছ থেকে টান দিলেই মাথাটা খুলে যায়। মাথার ভিতর দিকে, একটা চকচকে পাথর। অনেকটা হীরের মতই দেখতে। আর সেই হীরের গায়ে লাগানো আছে চকচকে সরু একটা ছুঁচ।

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

গোগোল একলাই দেখছিল না। মিঃ মৈত্রের বন্ধু এবং গোগোলের বাবারও বিশেষ পরিচিত মিঃ গাঙ্গুলিও দেখছিলেন। গোগোলের কথা শুনে মিঃ মৈত্র বললেন, 'আমাকে যে এটা দিয়েছিল, সে একজন তিব্বতী রিফুউজি। এটার জন্য সে মাত্র পঞ্চাশ টাকা দাম নিয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই ছুঁচটা এভাবে পাথরে গাঁথা কেন? জবাবে সে বলেছিল, আসলে, বুদ্ধের শরীরের ভেতরের অংশে যে ফাঁপা জায়গাটা রয়েছে ওর মধ্যে একরকম আঠার মত বিষ থাকে। ছুঁচটা সেই বিষের আঠায় গোঁজা থাকে। ছুঁচটা মাত্র ইঞ্চিখানেক লম্বা বটে, কিন্তু ওটা দিয়ে কারোর গায়ে ফুটিয়ে দিলে সে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যাবে।'

বাবা বলে উঠলেন, 'কী সাংঘাতিক! না ভাই মৈত্র, এ সব মারাত্মক জিনিস তোমার

কেনা উচিত হয়নি। এসব তো খুনীরা ব্যবহার করে।'

মিঃ মৈত্র হেসে বললেন, 'ভয় নেই, এর মধ্যে এখন আর বিষ নেই। আমি কারোকে খুন করার জন্য এটা কিনিনি। একটা রেয়ার কিওরিও হিসেবেই কিনেছি। বুদ্ধ হলেন অহিংসার প্রতীক। আর দেখ, তারই ছোট্ট একটা তামার মূর্তির মধ্যে কী ভীষণ মারণাস্ত্র লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু ছোট্ট তামার মূর্তিটা খুবই সুন্দর! আমি সেজন্যই কিনেছি।'

এই সময়ে হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। মিঃ গাঙ্গুলি দরজার দিকে তাকালেন। মিঃ মৈত্র গেলেন দরজা খুলতে। গোগোল বাবার সঙ্গে বাইরের ঘরে গেল। মিঃ গাঙ্গুলি ওদের পিছনে পিছনে এলেন। বাইরের দরজা খুলতে দেখা গেল, মিসেস গাঙ্গুলি তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে এসেছেন।

মিঃ মৈত্র বললেন, 'আসুন আসুন। মিঃ গাঙ্গুলি বলছিলেন, আপনাদের আসতে একটু দেরী হবে।'

মিসেস গাঙ্গুলি বললেন, 'হ্যাঁ আমরা স্নান সেরে এলাম। মিঃ গাঙ্গুলির তো শীত বেশী, উনি রোজ স্নান করেন না। আমরা আবার তা পারিনে।'

মিঃ গাঙ্গুলি স্যুট পরে, টাই বেঁধে এসেছিলেন। তিনি কেবল হাসলেন, কোন কথা বললেন না।

গোগোল দেখল, মিঃ গাঙ্গুলির মুখটা কেমন লাল দেখাচ্ছে। তিনি ঘামছেনও বটে। শীত করলে ঘামবেন কেন? গোগোলের খুব অবাক লাগল।

যাই হোক দুপুরে খাওয়ার পরে, খানিকক্ষণ গল্পগুজব হল। তারপরে বিদায়ের পালা। গোগোল বাবা-মায়ের সঙ্গে হোটেলে ফিরে এল। মিঃ গাঙ্গুলির স্ত্রীও গোগোলদের সঙ্গে ফিরতে চেয়েছিলেন। কারণ ম্যালে একটু বেড়িয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মিঃ গাঙ্গুলি ব্যস্তভাবে বললেন, তাঁকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। এখন-ওপরে উঠলে, ফিরতে দেরী হয়ে যাবে।

মিঃ গাঙ্গুলির বাড়ি মিঃ মৈত্রের বাড়ি থেকেও খানিকটা নীচে, প্রায় বাজারের কাছে। তাঁরা চলে গেলেন নীচের দিকে। গোগোল বাবা মা'র সঙ্গে উপরে উঠে এল।

গোগোল বিকালে বেশ কয়েক পাক ঘোড়ায় চেপে বেড়াল। মা আর বাবা ম্যালের একটা বেঞ্চিতে বসে ছিলেন। গোগোল যখন ঘোড়া ছেড়ে ফিরে এল, দেখল মিঃ মৈত্র বাবার পাশে বসে আছেন। সকলের মুখই খুব গম্ভীর। সকলেই গোগোলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

মিঃ মৈত্র হেসে বললেন, 'কী গোগোল, খুব ঘোড়ায় চড়া হল?'

গোগোল কিছু বলবার আগেই মা বললেন, 'শোন গোগোল, তুমি কি মিঃ মৈত্রের বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে এসেছ?'

গোগোল অবাক হয়ে বলল, 'না তো। ওঁর বাড়ি থেকে কী আনব?'

বাবা বললেন, 'উনি যে সেই বুদ্ধের মূর্তিটা দেখাচ্ছিলেন, যার মধ্যে সেই ছুঁচটা ছিল, সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই উনি জিজ্ঞেস করতে এসেছেন তুমি ওটা নিয়ে এসেছ কিনা।'

গোগোলের ভীষণ রাগ হয়ে গেল। বলল, 'ছি ছি, পরের জিনিস না বলে আমি কেন

নিয়ে আসব?'

মা গোগোলকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'তুমি যা পরে আছ, এই পরেই মিঃ মৈত্রের বাড়ি গেছিলে। তারপর আর হোটেলেও যাওয়া হয়নি। তোমার প্যান্টের আর জামার পকেটে কী আছে সব দেখিয়ে দাও।'

গোগোলের মুখ অপমানে লাল হয়ে উঠল। দেখল বাবা মায়ের মুখেও অপমানের ছাপ। মিঃ মৈত্র গোগোলের দিকে চুপ করে তাকিয়ে ছিলেন। মা বলেছেন বলেই গোগোল ওর সোয়েটার খুলে, ভেতরের জামার আর প্যান্টের পকেট উলটে খুলে দেখিয়ে দিল।

বাবা বললেন, 'হয়েছে মিঃ মৈত্র? নাকি গোগোলের জুতো-মোজাও খুলে দেখতে হবে?'

মিঃ মৈত্র গোগোলের পায়ের দিকে তাকালেন। গোগোল নিজেই পায়ের জুতো মোজা খুলে দেখিয়ে দিল। মিঃ মৈত্র হেসে বললেন, 'না না, ঠিক আছে। মানে—।'

'আপনার ওসব মানে টানে শুনতে চাইনে।' বাবা বেশ রেগে উঠে বললেন, 'আগে জানলে আপনার বাড়িতে কখনোই আমরা নিমন্ত্রণ খেতে যেতাম না। এটা রীতিমত অপমান। আপনি কী করে আমার ছেলেকে সন্দেহ করলেন, ও সেই বুদ্ধমূর্তিটা না বলে নিয়ে আসবে?'

মিঃ মৈত্র বললেন, 'প্লিজ রাগ করবেন না। ভাবলাম ছেলেমানুষ, হয়তো খেলাচ্ছলে ওটা নিয়ে এসেছে। আমি অপমান করার জন্য বলিনি। গোগোল আমার ছেলের মত। আমি আমার ছেলেদেরও জিজ্ঞেস করেছি। জানেন, কত কষ্ট করে আমি এসব সংগ্রহ করেছি। ওগুলো আমি আমার প্রাণের থেকেও বেশী ভালবাসি। আপনাদের অপমান করতে চাইনি।'

গোগোল রাগে ও অপমানে ফুঁসছিল। কিন্তু ওর মনে অন্য একটা চিন্তাও উঁকি দিচ্ছিল। ও বলল, 'আপনি মিঃ গাঙ্গুলির কাছে খোঁজ করেছিলেন?'

মিঃ মৈত্র জিভ কেটে বললেন, 'ছি ছি, তা কী করে হয়? উনি একজন সরকারি বড় অফিসার। দার্জিলিংয়ে ওর খুব নাম। উনি কি ও কাজ করতে পারেন।'

গোগোল বলল, 'আপনি আমার কথা যদি ভাবেন, মিঃ গাঙ্গুলির কথা ভাববেন না কেন? কলিং বেলের শব্দ শুনে আমরা সবাই যখন বাইরের ঘরে গেছিলাম, উনি সকলের পরে সেখানে এসেছিলেন।'

মিঃ মৈত্রর কপালের রেখাগুলো সাপের মত এঁকে বেঁকে উঠল। গোগোলের আরও মনে পড়ে গেল, মিঃ গাঙ্গুলি কেবল ঘামছিলেন না, তাঁকে কেমন চুপচাপ দেখাচ্ছিল। আর পিছনে পিছনে আসবার সময় উনি কোর্টের ইনসাইড পকেটে কয়েকবার হাত দিয়েছিলেন।

বাবা বললেন, 'গোগোল, ভদ্রলোকের সম্পর্কে ওরকম বলতে নেই।'

গোগোলের চোখে তখন জল এসে পড়েছে। বলল, 'বাবা, আমরা কি তবে ভদ্রলোক নই? আমার কিন্তু বিশ্বাস, মিঃ গাঙ্গুলিই ওটা নিয়েছে।'

মিঃ মৈত্র জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন তোমার এরকম বিশ্বাস হচ্ছে বলতো?'

গোগোল বলল, 'সে সব আমি বলতে চাইনে। আমার মনে হয় মিঃ গাঙ্গুলির কোর্টের ইনসাইড পকেটে এখনো বোধহয় সেটা আছে। যদি উনি লুকিয়ে না ফেলে থাকেন।'

'কী সব বলছ তুমি গোগোল।' বাবা ধমক দিয়ে উঠলেন।

মিঃ মৈত্র বললেন, 'সমরেশবাবু, গোগোল যখন এরকমভাবে বলছে, নিশ্চয়ই তার কোন কারণ আছে। অবশ্য তিনি একজন মস্ত অফিসার। তবু চলুন না, সবাই মিলে একবার তাঁর বাড়িতে যাই?'

বাবা মায়ের দিকে তাকালেন। মা বললেন, 'গিয়ে দেখাই যাক না।'

মিঃ মৈত্র উঠে দাঁড়ালেন। বাবা মাও উঠলেন। গোগোল তাঁদের সঙ্গে, আহিত ম্যানসনের পাশ দিয়ে নীচের রাস্তায় হেঁটে চলল। বাজারের কাছাকাছি মিঃ গাঙ্গুলির বাড়ি পৌঁছতে সময় লাগল প্রায় পনের মিনিট। সামনের কাঁচের দরজা জানালা বন্ধ ছিল। কলিং বেল টিপতেই, একজন নেপালী মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, মিঃ গাঙ্গুলি পাজামার ওপরে সোয়েটার আর শাল চাপিয়ে বসে একটা ম্যাগাজিন পড়ছেন। সবাইকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেলেন। গোগোল দেখল, তার চোখে মুখে একটা ব্যস্ত ত্রস্ত ভাব। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার? আসুন আসুন, বসুন। আমার স্ত্রী আর মেয়েরা সিনেমা দেখতে গেছে।'

মিঃ গাঙ্গুলি তারপর বললেন, 'বসুন একটু চা করতে বলি।'

বলেই তিনি গলা তুলে ডেকে বললেন, 'কাঞ্চি, তুমি একটু চা বানাও।'

গোগোল বলল, 'আমি একটু বাথরুমে যাব।'

গোগোল মিঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে অন্য ঘরের ভিতরে ঢুকল। সেটা একটা শোবার ঘর। ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। এক পাশে কাঠের পার্টিশন দেওয়া একটা ঘেরাওয়ের মধ্যে। ব্রাকেটে ঝোলানো ট্রাউজার শার্ট কোট শাড়ি জামাও রয়েছে। আর একটা ড্রেসিং টেবিল। মিঃ গাঙ্গুলি গোগোলকে বাথরুমের দরজা দেখিয়ে বললেন, 'আমি যাচ্ছি। তুমি ঘুরে এস।'

মিঃ গাঙ্গুলি চলে গেলেন। গোগোল বাথরুমের দরজা পর্যন্ত গেল। মিঃ গাঙ্গুলি চলে যেতেই, ও কাঠের পার্টিশনের মধ্যে ঢুকে গেল। মিঃ গাঙ্গুলি যে কোটটা পরে গিয়েছিলেন, সেটা ওর চোখে পড়ল। প্রত্যেকটা পকেট হাতড়ে, সেই বুদ্ধমূর্তি পেল না। গোগোলের লজ্জা আর ভয় দুই হল। কিন্তু ওর বিশ্বাস একেবারে অনড়। ও পাগলের মত মিঃ গাঙ্গুলির সব ট্রাউজার আর পকেট হাতড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একটা নীল জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাতেই, একটা কাগজের প্যাকেট পাওয়া গেল। গোগোল প্যাকেটটা খুলতেই, বেরিয়ে পড়ল সেই বুদ্ধমূর্তি। ওর বুকের মধ্যে তখন ধক্ ধক্ করছে, নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। তাড়াতাড়ি সেটা নীল জ্যাকেটের পকেটে ঠিক জায়গায় রেখে ফিরে গেল বসবার ঘরে।

মিঃ মৈত্র, বাবা মা সবাই ওর দিকে তাকালেন। মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, 'কী গোগোল, কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

গোগোলের মুখ লাল। ও মিঃ মৈত্রের পাশে বসে বলল, 'না। আমাকে একটা কাগজ

পেন্সিল দেবেন?'

মিঃ গাঙ্গুলি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'নিশ্চয়ই দেব। কী করবে?'

গোগোল বলল, 'আমি একটা চিঠি লিখব।'

মিঃ গাঙ্গুলি হেসে উঠে, কাছের টেবিল থেকে কাগজের প্যাড আর পেন্সিল এনে দিয়ে বললেন, 'সত্যি, আমাদের মাঝখানে ও আর কী করবে? নিশ্চয়ই কলকাতার কোন বন্ধুকে চিঠি লিখবে।'

গোগোল কিছু বলল না। মায়ের দিকে একবার দেখল। তারপর কাগজের প্যাড কোলের ওপর রাখল। মিঃ গাঙ্গুলি তখন এবারের মে মাসেও দার্জিলিংয়ে কেমন শীত, সে কথা বাবাকে বলছিলেন। মিঃ মৈত্রের চোখ গোগোলের কোলে রাখা কাগজের প্যাডের দিকে। গোগোল লিখল, বুদ্ধমূর্তিটা শোবার ঘরের ব্রাকেটে, নীল জ্যাকেটের পকেটে রয়েছে।'

মিঃ মৈত্র হঠাৎ বিষম খেয়ে কাশতে আরম্ভ করলেন। মিঃ গাঙ্গুলি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কী হল, মিঃ মৈত্র?'

মিঃ মৈত্র বললেন, 'শরীরটা খুব ভাল লাগছে না। অসময়ে খেয়েই। জানেন তো দার্জিলিংয়ের জল আমার সহ্য হয় না। আমি একটু বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।'

মিঃ গাঙ্গুলি বলেন, 'যান। আপনি তো আমার বাড়ির সবই চেনেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে আর কিছু চেনাতে হবে না স্যার।' বলে মিঃ মৈত্র উঠে গেলেন।

নেপালী মেয়েটি ট্রেতে করে চায়ের কাপ আর ঢাকনা দেওয়া টিপটটা সাজিয়ে এনে টেবিলে রাখল।

মিঃ গাঙ্গুলি সকলের কাপে চা ঢেলে দিলেন।

মিঃ মৈত্র ফিরে এলেন, তাঁর দুই চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করছে। গোগোলের পাশে এসে বসলেন। গোগোল কাগজের প্যাড থেকে লেখা কাগজটা ছিঁড়ে নিল। মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, 'কী হল, চিঠি লেখা হয়ে গেল?'

গোগোল বলল, 'হ্যাঁ।'

চা খাবার পরে, দু-চার কথাবার্তা বলে সকলেই উঠে পড়লেন। তখন সন্ধ্যা উতরে গিয়েছে। রাস্তায় আলো জ্বলছে। মিঃ গাঙ্গুলি সবাইকে বিদায় দিয়ে নমস্কার জানালেন। খানিকটা পথ গিয়েই, মিঃ মৈত্র গোগোলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখে জল। ভাঙা গলায় বললেন, 'বাবা গোগোল, আমি তোমার বাবা মায়ের মনে কষ্ট দিয়েছি, তোমাকেও কষ্ট দিয়েছি। আমি বয়সে বড় হয়েও তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তোমার সন্দেহই ঠিক।'

মিঃ মৈত্র বুদ্ধমূর্তিটা খুলে বাবা মাকে দেখালেন। কিন্তু তখনও তাঁর চোখ থেকে জল পড়ছে। বাবার হাত ধরে বারে বারে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। আর পাগলের মতই গোগোলকে আদর করতে লাগলেন।

বাবা বললেন, 'মিঃ মৈত্র, আপনার মনের অবস্থা বুঝেছি। এখন আর আমরা কিছু মনে করছিনে। আপনার সখের জিনিসটা ফেরত পেয়েছেন সেটাই আসল কথা।'

মিঃ মৈত্র বললেন, 'আর সেটা গোগোলের জন্যই। গোগোলের অনারে আজ রাত্রেও

আমার বাড়িতে আপনাদের নিমন্ত্রণ। চলুন সবাই আমার বাড়িতে।'

মা বললেন, 'মিঃ গাঙ্গুলি কী ভাববেন? সবই বুঝতে পারবেন, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারবেন না। এটাও বুঝবেন, গোগোলই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।' বলে তিনি গোগোলকে একেবারে কোলে তুলে নিলেন ; বললেন, 'জান গোগোল, মিঃ গাঙ্গুলির ওটা নিশ্চয়ই একটা রোগ। এই রোগের নাম ক্লিপটোম্যানিয়া। উনি চোর নন, তবে এক রকমের চুরিই বটে।'

বাবা বললেন, 'ঠিকই বলেছ। নইলে মিঃ গাঙ্গুলির মত লোক এটা নিয়ে আসবেন কেন?'

'কিন্তু একেই বলে টিট ফর ট্যাট।' বলে মিঃ মৈত্র হেসে উঠলেন।

দুই বন্ধুর কীর্তি

pathagar.net

প্রফুল্ল রায়

যদিও সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। বম্বে, যার নতুন নাম মুম্বই দেশের পশ্চিম প্রান্তে বলে এখানে সূর্যোদয় হয় অনেক দেরিতে। এই মুহূর্তে চারদিকে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে ঠিকই, আকাশের গায়ে আবছা আবছা আলোর ছোপও ধরেছে কিন্তু পঞ্চাশ ফুট দূরের কোনও কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না।

ছেলেবেলা থেকে সঞ্জুর খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস। পাঁচটা বাজলে সে আর শুয়ে থাকতে পারে না। হোটেলে তাদের ডবল-বেড রুমে অন্য একটা খাটে বাবা তখনও ঘুমোচ্ছেন। সে মেঝের কার্পেটের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে একটা বাইনোকুলার নিয়ে ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে চলে এসেছিল। ক'দিন ধরে ভোরের একটা দৃশ্য তাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। এই নিয়ে তার নতুন বন্ধু রাজুর সঙ্গে মানে যার ভাল নাম রজত মেনন, অনেক কথাও হয়েছে। সঞ্জু একবার ডান পাশের একটা রুমের ব্যালকনির দিকে তাকাল। অন্য দিন এই সময় রাজুও ওখানে এসে দাঁড়ায়। আজ তাকে দেখা গেল না। নিশ্চয়ই ওর ঘুম এখনও ভাঙেনি।

সঞ্জুদের হোটেলের সামনে দিয়ে ঝকঝকে রাস্তা চলে গেছে। তার ওধারে লাইন দিয়ে উঁচু উঁচু নারকেল গাছ। তারপর সোনালি বালির জুহু বীচ, সারা পৃথিবী যার নাম জানে। বীচের গা থেকে আরব সাগর ধুধু দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই অন্যদিনের মতো বীচে কিছু লোকজন চোখে পড়ছে। তবে কেমন যেন ঝাপসা মতো। সবাই এসেছে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। কেউ জগিং করছে, কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ বালির ওপর শুয়ে বা বসে যোগাসন প্র্যাকটিস করছে। বয়স যাদের বেশি, তারা ধীরে ধীরে হাঁটাহাঁটি করছে।

বীচের দিকে লক্ষ্য ছিল না সঞ্জুর। কোনাকুনি রাস্তার ওপারে যে বিরাট দশতলা বাড়িটা—সেইদিকে সে তাকিয়ে আছে। রাস্তায় মানুষজন নেই। মুম্বই শহরের ঘুম এত ভোরে কখনও ভাঙে না। অবশ্য স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ভাবে কিংবা যাদের জরুরি কাজ থাকে তারা ছাড়া এসময় কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠে না।

বিরাট বাড়িটার একতলা জুড়ে একটা ব্যাঙ্ক এবং ছোটখাট দু'চারটে অফিস। ওপরের তলাগুলোতে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের নানা জাতের মানুষ থাকে।

ক'দিন ধরে ভোরবেলার অস্পষ্ট আলোয় ক'টা লোককে দেখতে পাচ্ছিল সঞ্জু। নিজেদের মধ্যে কী পরামর্শ করে তারা ব্যাঙ্কটার তিন দিক ঘুরে ঘুরে দেখে চলে যাচ্ছিল। মিনিট পনের-কুড়ির বেশি তারা কোনও দিনই থাকেনি। একটা লম্বা জিপে করে ওরা আসত ; আবার ওই গাড়িটাতেই চলে যেত।

আজ কিন্তু লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। এত দেরি করে তারা কখনও আসে না। সঞ্জু এবং রাজু, দু'জনেরই ধারণা হয়েছিল, লোকগুলোর মাথায় খারাপ কোনও মতলব আছে। ওরা যদি আর না আসে, ধরে নিতে হবে, তারা যা ভেবেছে সেটা পুরোপুরি ভুল।

সঞ্জুর বয়স চোদ্দ। এ বছর সে ক্লাস নাইনে উঠেছে। ডিটেকটিভ বইয়ের সে পোকা। তার স্বপ্ন শার্লক হোমস বা এরকুল পোয়ারোর মতো দারুণ দারুণ কাণ্ডকারখানার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে রহস্যের সমাধান করা। মা-বাবা বলেন, আগে বড় হও, পড়াশোনা শেষ হোক, তারপর ওসব ভাবা যাবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! রহস্যের গন্ধ পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ নিয়ে মা-বাবাকে মাঝে মাঝে কম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না। বড় বড় ডিটেকটিভদের মতো সঞ্জু বাইনোকুলার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, অপরাধীদের খোঁজে উঁচু উঁচু বাড়িতে ওঠার জন্য হুক-লাগানো মজবুত দড়ি—পয়সা জমিয়ে জমিয়ে এমন অনেক কিছু কিনে ফেলেছে।

মা, বাবা, এক দিদি আর সঞ্জু—সব মিলিয়ে ওরা চারজন। বাবা অরিন্দম বসু একটা বিরাট কোম্পানির মস্ত অফিসার। হঠাৎ তাঁকে কলকাতা থেকে মুম্বইতে বদলি করা হয়েছে। বাড়ির সবাইকে নিয়ে দিন দশেক আগে তিনি এখানে চলে এসেছেন। তাঁদের জন্য কোম্পানি পালি হিলে একটা ফ্ল্যাট দেবে। আপাতত সেটা রং করে, ফার্নিচার দিয়ে সাজানো হচ্ছে। যতদিন কাজটা শেষ না হয় সঞ্জুরা হোটেলে থাকবে।

সঞ্জুর বাবা যে কোম্পানিতে কাজ করেন, রাজুর বাবা রাধাকৃষ্ণ মেনন সেই একই কোম্পানির বড় অফিসার। উনি ছিলেন তিরুবনন্তপুরমের অফিসে। সেখান থেকে অরিন্দম

বসুর মতো তাঁকেও মুম্বইতে ট্রান্সফার করে আনা হয়েছে। তিনিও সঙ্গে করে বাড়ির সবাইকে নিয়ে এসেছেন। একই হোটেলে তাঁদেরও রাখা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ মেননরা সব মিলিয়ে তিনজন। তিনি, তাঁর স্ত্রী জানকী মেনন এবং তাঁদের একমাত্র ছেলে রাজু। পালি হিলে সঞ্জুরা যে ফ্ল্যাটটায় গিয়ে উঠবে, তার পাশের ফ্ল্যাটটা দেওয়া হবে রাজুদের। সেটাও এখন ঝেড়েপুঁছে ফিটফাট করা হচ্ছে।

রাজু সঞ্জুরই বয়সী। সেও এ বছর ক্লাস নাইনে উঠেছে। মুম্বই আসার পর দু'জনকে একই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। সঞ্জুর দিদি লেডি ব্রাবোর্নে বি. এ. ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এনে তারও এখানকার কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

ক'দিনই বা সঞ্জুরা মুম্বইয়ে এসেছে! কিন্তু এর মধ্যেই রাজুর সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেছে। সারাদিন গল্প। হোটেলে আর কতক্ষণ থাকে! সামনের জুহু বীচে তো যায়ই। মুম্বইতে বেড়াবার কি মোটে একটা জায়গা! আরও দূরে দূরে তারা চলে যায়। এয়ার-ইণ্ডিয়া পার্ক, এসেল ওয়ার্ল্ড থেকে শুরু করে মেরিন ড্রাইভ, মালাবার হিলসের হ্যাঙ্গিং গার্ডেন, গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া পর্যন্ত দেখে এসেছে। কাউকে না জানিয়েই গেছে। জানাতে গেলে মা-বাবারা একেবারেই রাজী হতেন না।

সঞ্জুর মতো রাজুও ডিটেকটিভ গল্প পড়তে ভীষণ ভালবাসে কিন্তু সত্যিকারের ডিটেকটিভ হবার কথা কখনও ভেবে দেখেনি। সঞ্জু যখন বলল, সে কলকাতায় দু'চারটে রহস্যের জট ছাড়িয়েছে এবং মুম্বইতে এসে আরও একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে তখন রাজুর চোখ উৎসাহে চকচক করে উঠেছিল। মুম্বইয়ের রহস্যটা কী, রাজু জানতে চাইলে ভোরবেলায় সেই লোকগুলোর কথা বলেছিল সঞ্জু। রাজু প্রায় লাফিয়ে উঠে বলেছে, সে-ও পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে এসে সন্দেহজনক লোকগুলোকে লক্ষ্য করবে। তাকে বাদ দিয়ে সঞ্জু যেন কিছু না করে। সঞ্জু একজন সহকারী পেয়ে খুশি হয়েছিল।...

যে দশতলা বাড়িটার তলায় ব্যাঙ্ক সেদিকে তাকিয়েই ছিল সঞ্জু। সে বেশ দমেই গেছে। একটা রহস্য হাতের মুঠোয় চলে আসতে আসতে হঠাৎ যেন ফসকে গেল।

লোকগুলো যখন আসবেই না তখন আর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। তার চেয়ে বরং রাজুকে ডেকে নিয়ে এক পাক বীচে ঘুরে আসা যাক। সে ঘরের দিকে পা বাড়াতে যাবে, হঠাৎ ডানদিক থেকে রাজুর চাপা গলা ভেসে এল, 'ওই দেখ, সেই জিপটা আসছে—'

কখন ঘুম ভাঙার পর রাজু পাশের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে, জানতে পারেনি সঞ্জু। একটু চমকে উঠে সে লক্ষ্য করল, সত্যিই চেনা জিপটা ডানদিকের একটা বাঁক ঘুরে এধারে আসছে। বলল, 'এখন আর কোনও কথা বলো না। চুপচাপ দেখে যাও ওরা কী করে। আমরা যে ওদের ওপর নজর রাখছি, একদম যাতে টের না পায়।'

রোজই এই কথাগুলো বলে সাবধান করে দেয় সঞ্জু। রাজু মাথা নেড়ে জানাল—আচ্ছা।

অন্যদিনের মতো লোকগুলো আজও ব্যাঙ্ক থেকে খানিকটা দূরে জিপ থামিয়ে নেমে পড়ল। আগে পাঁচজনের বেশি কখনও আসেনি। আজ দেখা গেল—সাতজন। সংখ্যাটা

বেড়ে গেছে।

লোকগুলো নেমে ব্যাঙ্কের সামনে ভাগে ভাগে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে মনে মনে অদৃশ্য লাইন টেনে ওদের জুড়ে দিলে একটা রেক্টেঙ্গল বা আয়তক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সেটা বোধহয় পছন্দ হলো না। আবার অন্যভাবে দাঁড়াল। এবার লাইন টানলে ত্রিভুজের আকার নেবে। কিন্তু সেটাও বোধহয় ভাল লাগল না। নিজেদের মধ্যে কী আলোচনার পর শেষপর্যন্ত পাঁচটা কোণ তৈরি করে দাঁড়ায়। তিন জায়গায় একজন করে, বাকি দু'জায়গায় দু'জন দু'জন। এবার কল্পিত লাইন টানলে পেন্টাগন বা পঞ্চভুজ হবে। খুব সম্ভব এই নকশাটাই লোকগুলোর মনে ধরল। তারা আর দাঁড়াল না। পায়ে পায়ে জিপটার দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে অন্ধকার প্রায় কেটে গিয়ে আরও একটু আলো ফুটেছে। রাস্তায় দু'একটা অটো.. ট্যাক্সি বেরিয়ে পড়েছে। বীচ ছাড়াও এধারে-ওধারে কিছু মানুষজন দেখা যাচ্ছে।

সেই লোকগুলো যখন জিপে উঠতে যাবে, রাজু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে সেই লোকটা না?' তার গলায় প্রবল উত্তেজনা।

রাজু যে লোকটার কথা বলল তাকে আগেও দেখেছে সঞ্জুরা। বার তিনেক জুহু বীচে। তা ছাড়া তাদের হোটেলের গায়ে যে পান-সিগারেট আর কোল্ড ড্রিংকসের দোকানটা আছে সেখানেও বেশ কয়েকবার। লোকটাকে মনে করে রাখার কারণ, যখনই পাশের দোকানটায় সে আসে, পর পর পাঁচ-ছ-বোতল কোল্ড ড্রিংকস খায়, তারপর দুটো সিগারেট ধরিয়ে অদ্ভুত কায়দায় আঙুলের ফাঁকে রেখে টানতে থাকে। একসঙ্গে এত কোল্ড ড্রিংক আর দুটো সিগারেট খেতে আগে আর কাউকে দেখেনি সঞ্জুরা। মনে রাখার আরও একটা কারণ, তার নাকের পাশে একটা বড়, কালো, বেঢপ সাইজের জড়ুল রয়েছে।

যারা রোজ ভোরে ব্যাঙ্কটার সামনে এসে পরামর্শ করে কী সব দেখে যায় তাদের দলে এই লোকটাকে আগে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না সঞ্জু। দেখলেও চিনতে পারেনি। কেননা অন্য দিন ওরা যখন আসে তখন বেশ অন্ধকার থাকে।

আজ লোকটাকে দেখে রাজুর মতো সঞ্জুরও ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছিল। সে কিন্তু রাজুর মতো চেঁচাল না, নিচু গলায় বলল, 'এখন কোনও কথা নয়।'

রাজু আর কিছু বলল না।

লোকগুলো যেদিক থেকে এসেছিল, জিপে উঠে সেদিকে চলে গেল।

জিপটা রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হবার পর রাজু জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবে?'

সঞ্জু বলল, 'ভাবতে হবে। ব্রেকফাস্ট করে তুমি আর আমি বীচে যাব। হোটেলে বসে হবে না। কেউ শুনে ফেলবে। ফাঁকা জায়গায় ব্যাপারটা নিয়ে ভাল করে ডিসকাস করা দরকার।'

'ঠিক আছে।'

সকালের খাবার খেয়ে সাড়ে আটটায় দু'জনে জুহু বীচে চলে এল। এই সময়টা এখানে ভিড় কম থাকে। যারা স্বাস্থ্যের জন্য সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বীচে

এসেছিল তাদের বেশির ভাগই ফিরে গেছে। বিশাল সমুদ্রতীর এখন প্রায় ফাঁকাই।

সঞ্জু আর রাজু জলের ধার ঘেঁষে বালির ওপর বসে পড়ল।

বর্ষাকাল বাদ দিলে আরব সাগর বছরের বাকি সময়টা বেশ শান্ত থাকে। এখন ছোট ছোট সকালের সোনালি আলো গায়ে মেখে বীচটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তবে সমুদ্রের দিক থেকে খুব জোরালো হাওয়া বইছে।

রাজু বলল, 'আমার কী মনে হয় জানো?'

সঞ্জু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল ; মুখ না ফিরিয়ে সে বলল, 'কী?'

'ওরা ওই বড় বিল্ডিংটার কাছে কিছু একটা করতে চায়।'

'কী করতে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সঞ্জু বলল, 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

রাজু জিজ্ঞেস করল, 'কিসের আইডিয়া?'

'ওই জড়ুলওয়ালা লোকটাকে খুঁজে বার করে যদি ওর ওপর নজর রাখি, বুঝতে পারব ওদের দলটা কী মতলব আঁটছে।'

'কিন্তু তাকে আমরা পাচ্ছি কোথায়?'

সঞ্জু বলল, 'আমার মনে হয়, লোকটা এদিকেই কোথাও থাকে।'

রাজু বলল, 'এটা মনে হলো কেন?'

'তিন দিন আগে বিকেলবেলায় লোকটা আমাদের হোটেলের পাশের সেই পান-সিগারেটের দোকানে কোল্ড ড্রিংক খাচ্ছিল। আমরা তখন বেড়াতে বেরুচ্ছিলাম।' বলে সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'ওর পরনে কী ছিল মনে পড়ছে?'

অনেকক্ষণ চিন্তা করে রাজু জানাল, মনে নেই। কারণ সে ভাল করে লক্ষ্য করেনি।

সঞ্জু বলল, 'একটা সিল্কের লুঙ্গি আর গেঞ্জি। কাছাকাছি না থাকলে ওরকম পোশাকে কেউ বাইরে বেরোয় না।

রাজু বলল, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু—'

'কী?'

'এখানে এত হোটেল আর এত হাই-রাইজ বিল্ডিং ; এ সবের ভেতর থেকে খুঁজে বার করবে কী করে?'

'আরে বাবা, সারাক্ষণ কি আর লোকটা ঘরে বসে থাকবে? আমরা এখন অন্য কোনও দিকে বেড়াতে যাব না। বীচে আর এখানকার রাস্তায় ঘুরে বেড়াব। হোটেলগুলোতে গিয়ে ওর ডেসক্রিপশান দিয়ে খোঁজ করব। মনে হয় ওকে ঠিক পেয়ে যাব।'

'ধর, পেয়ে গেলে। তখন কী করবে?'

'সেটা এখনও ভাবিনি। আগে তো লোকটাকে পাই। তারপর দেখা যাবে।'

আলোচনা শেষ করে সঞ্জুরা কিছুক্ষণ বীচে ঘোরাঘুরি করল কিন্তু লোকটাকে দেখা গেল না। বীচ থেকে রাস্তায় যখন ওরা উঠে এল তখন মুম্বই শহরের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে অজস্র মানুষ। অগুনতি গাড়ি স্রোতের মতো ছুটে চলেছে। এর ভেতর

থেকে বিশেষ একটা লোককে খুঁজে বার করা অসম্ভব ব্যাপার। তবু সঞ্জুরা চারদিকে নজর রাখতে লাগল।

দুপুরে হোটেলে এলে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফের বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। এবার ওরা হানা দিল হোটেলগুলোতে। সন্ধ্যে পর্যন্ত একটার পর একটা হোটেলে গিয়ে রিসেপশানে লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইল, এরকম কেউ আছে কিনা। সব জায়গাতেই ওদের বলা হলো—নেই। রোজই হোটেলে নানা ধরনের লোক আসছে। তাদের সবার চেহারা রিসেপশানের লোকেদের পক্ষে মনে করে রাখা সম্ভব নয়। তবে কারও মুখে একটা বিশ্রী জড়ুল থাকলে নিশ্চয়ই ওদের চোখে পড়ত।

এরপর দুটো দিন সকাল থেকে রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত বীচ থেকে শুরু করে সামনের রাস্তা এবং সারি সারি দোকানগুলোতে গিয়ে দেখতে লাগল সঞ্জুরা। কিন্তু না, লোকটা একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এমন কি, ভোরের দিকে যে দলটা সেই ব্যাঙ্কটার সামনে এসে কী পরামর্শ করে, তারাও এই দু'দিন আসছে না।

রাজু হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'নাঃ, ওদের আর পাওয়া যাবে না।'

সঞ্জু বলল, 'আর, দু'একদিন দেখা যাক। তারপর এ নিয়ে আর ভাবব না।'

আশ্চর্য, সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় লোকটাকে আবার দেখা গেল। সেই পান-সিগারেটের দোকানে কোল্ড ড্রিংক খেতে এসেছে।

সঞ্জুরা বীচের দিক থেকে হোটেলে ফিরে আসছিল, দূর থেকে লোকটাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। রাজু কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে সঞ্জু বলে, 'এখন একটা কথাও নয়। একদম চুপ।'

লোকটা অন্যদিনের মতো পাঁচ বোতল কোল্ড ড্রিংক খেয়ে, জোড়া সিগারেট ধরিয়ে জুত করে টানতে টানতে ডান পাশের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলল।

সঞ্জু চাপা গলায় বলল, 'ওকে ফলো করতে হবে। এসো আমার সঙ্গে।'

রাজু বলল, 'আমার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছে।'

সঞ্জু বলল, 'অত ভয় থাকলে আসতে হবে না। হোটেলে ফিরে যাও।'

'আরে না না; তোমাকে একা যেতে দেব না। যা হবার হবে। আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

দু'জনে লোকটাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে পেছন পেছন চলল। তাদের মাঝখানে পঞ্চাশ ফুটের মতো দূরত্ব।

মিনিট চারেক হাঁটার পর একটা মাঝারি হোটেলের পাশ দিয়ে অন্য একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল লোকটা। রাস্তাটা বড় নয় ; সেটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পাশাপাশি একই রকম দেখতে দুটো চব্বিশতলা বাড়ি। বাঁ দিকেরটার নাম 'আকাশগঙ্গা', ডান দিকেরটা 'পাতালগঙ্গা'।

সঞ্জুরা লক্ষ্য করল, লোকটা 'আকাশগঙ্গা'য় ঢুকেছে। ওরা জোরে পা চালিয়ে দিল। কিন্তু লোকটার কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই সে একটা লিফটে ঢুকে পড়ল।

পাশে আরও দুটো লিফট রয়েছে। দুটোই ওপর থেকে নিচে নামছে। রাজু বলল,

'যেটা আগে নামবে সেটায় উঠে লোকটাকে খুঁজতে হবে।'

সঞ্জু বলল, 'এই বিরাট হাই-রাইজে কোথায় হাতড়ে বেড়াবে! আগে জানতে হবে লোকটা ঠিক কোন ফ্লোরে গেল।'

রাজু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী করে জানবে?'

'এদিকে এসো—'

লোকটা যে লিফটটায় ঢুকেছিল, রাজুকে সঙ্গে করে সঞ্জু তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লিফটের মাথায় লাল ইনডিকেটরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ওটা ভাল করে দেখ।'

এক, দুই, তিন—এইভাবে সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। কিন্তু পনের নম্বরের লাল আলোটা কয়েক সেকেণ্ডের মতো জ্বলে রইল। তারপর সেটা নিভে ষোল-সতের পেরিয়ে আঠার নম্বরটা জ্বলে উঠল। এবং জ্বলতেই লাগল। মিনিট তিনেক পর আলোটা নিভে সতেরো, ষোল—এইভাবে সংখ্যা কমতে লাগল।

সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বুঝতে পারলে?'

রাজু বলল, 'না।'

'লিফটটা ওপরে উঠে পনের আর আঠার, মানে ফিফ্‌টিন্‌থ্‌ আর এইটিন্‌থ্‌ ফ্লোরে থেমেছিল. তারপর এখন নেমে আসছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

সঞ্জু বলতে লাগল, 'ওই লোকটা যখন ওপরে উঠছিল তখন সে একা ছিল না। লিফটে আরও কেউ কেউ থাকতে পারে যাদের আমরা দেখতে পাইনি। লিফটটা দু' জায়গায় যে থেমেছিল সেটা অবশ্য জানতে পেরেছি। লোকটা হয় ফিফ্‌টিন্‌থ্‌, নইলে এইটিন্‌থ্‌ ফ্লোরে নেমে গেছে। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল?'

রাজু বলল, 'ঢুকেছে। এখন কী করতে চাও?'

'দেখ কী করি—'

লিফটটা নিচে এসে থামতেই দু'জন বেঢপ চেহারার মোটা মহিলা বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে রাজুকে নিয়ে সঞ্জু ভেতরে ঢুকে পনের নম্বর বাটনটা টিপে দিল। লিফ্‌টটা অটোমেটিক। আপনা থেকে দরজা বন্ধ হয়ে সেটা ওপরে উঠতে লাগল।

ফিফ্‌টিন্‌থ্‌ ফ্লোরে এসে লিফ্‌টটা থামলে বাইরে বেরিয়ে সঞ্জুরা দেখল এখানে সবসুদ্ধ চারটে ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্ল্যাটের সামনের দরজার গায়ে পেতলের ফ্ল্যাট-নাম্বার লাগানো রয়েছে।

প্রতিটি ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে কলিং বেল টিপল সঞ্জু। কেউ দরজা খুললেই জিজ্ঞেস করল, এখানে অমিতাভ সেন নামে কেউ থাকে কিনা। সবাই জানাল, ওই নামের কাউকে তারা চেনে না।

সঞ্জু রাজুকে বলল, 'না, এখানে নয়। চল, এইটিন্‌থ্‌ ফ্লোরে যাওয়া যাক।'

লিফ্‌টটায় চড়ে কখন অন্য কেউ নিচে নেমে গিয়েছিল, ওরা টের পায়নি। ওটার আশায় থাকলে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে। মোটে তিনটে তো ফ্লোর। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সঞ্জুরা ওপরে উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সিঁড়ি ভাঙার পর রাজু হঠাৎ বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, এভাবে

খোঁজ পাওয়া যাবে না।'

সঞ্জু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল বাজালে সেই লোকটাই যে দরজা খুলে দেবে, সেটা নাও হতে পারে। হয়তো সে ভেতরের কোনও ঘরে বসে আছে ; অন্য লোক দরজা খুলল।'

একটু চিন্তা করে সঞ্জু বলল, 'রাইট। তা হলেও চেষ্টা তো করতে হবে।'

রাজু এবার কিছু বলল না।

সঞ্জু বলল, 'এইটিন্‌থ্ ফ্লোরটা দেখি। তখনও যদি না পাওয়া যায়, অন্যরকম প্ল্যান করতে হবে।'

'অন্যরকম বলতে?'

'লোকটা এ বাড়িতে যে আছে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তাকে কখনও না কখনও বাইরে বেরুতে হবেই। যতক্ষণ না বেরুচ্ছে, আমরা গেটের কাছে ওয়েট করব।'

এইটিন্‌থ্ ফ্লোরে, মানে বাংলার উনিশ তলায় এসে দেখা গেল এখানেও চারটে ফ্ল্যাট। সব ফ্লোরেই বোধহয় একই রকম ব্যবস্থা।

প্রথম দুটো ফ্ল্যাটে কোনও হদিস পাওয়া গেল না। কিন্তু তিন নম্বর ফ্ল্যাটের বেল বাজাতেই দরজা খুলে যে সামনে দাঁড়াল তার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল সঞ্জুর, পা দুটো ভীষণ কাঁপছে। আর ক'দিন ধরে এই লোকটাকেই পাগলের মতো তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় লাগল সঞ্জুর। লোকটা একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

অন্য ফ্ল্যাটগুলোতে সঞ্জু যা বলেছিল, এখানেও তাই বলল।

লোকটা একটু ভেবে বলল, 'অমিতাভ সেন কত নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন?'

'সেটা বলতে পারব না। তবে এই 'আকাশগঙ্গা'তেই থাকেন।'

'এই বাড়িতে সবসুদ্ধ বিরানব্বইটা ফ্ল্যাট। কে কোন ফ্ল্যাটে থাকে বলা মুশকিল।'

যেন লোকটার পরামর্শ চাইছে, এমন একটা ভাব করে সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'কী করা যায় বলুন তো আঙ্কল?'

লোকটাকে যতটা ভীতিকর ভাবা গিয়েছিল, সামনাসামনি দেখে তেমনটা মনে হলো না। সে বলল, 'এক কাজ কর, গ্রাউণ্ড ফ্লোরে বিল্ডিংয়ের কেয়ারটেকারের অফিস আছে। সেখানে যাও ; ওরা বলতে পারবে।'

কথা বলতে বলতে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করছিল সঞ্জু। একটা সাজানো-গোছানো বিরাট ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল চোখে পড়ল। কিন্তু অন্য কাউকে দেখা গেল না। লোকটা একাই কি এখানে থাকে? না, আরও লোকজন আছে? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সঞ্জু বলল, 'থ্যাঙ্ক যু আঙ্কল।'

লোকটা কিছু বলল না, অল্প হেসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কিছুক্ষণ পর লিফটে করে নামতে নামতে রাজু জিজ্ঞেস করল, 'অমিতাভ সেন বলে সত্যি সত্যিই কেউ আছে নাকি?'

pathagar.net

সঞ্জু বলল, 'জানি না।'

'ওটা তা হলে তোমার বানানো?'

'একজাক্টলি।'

'অ্যাকটিংটা এমন করেছ যে লোকটা ধরতেই পারেনি।'

রাজুর কথা যেন শুনতে পায়নি, এমনভাবে সঞ্জু বলল, 'লোকটা যে ফ্ল্যাটে থাকে তার নাম্বারটা দেখেছিলে?'

রাজু বলল, 'হ্যাঁ। এইটিন বাই থ্রি।'

'গুড। ওটা ভুলো না।'

'লোকটাকে দেখে কিন্তু খারাপ মনে হলো না।'

'মুখ দেখে কি কার মাথায় কী ঘুরছে সবসময় বোঝা যায়!'

রাজু আস্তে মাথা নাড়াল। বলল, 'ঠিক।'

সঞ্জু বলল, 'এখন আমাদের কাজ হলো, সারাক্ষণ লোকটাকে চোখে চোখে রাখা।'

কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, তাই পরদিন সকালে এলিফ্যান্টা কেভ দেখতে যেতে হলো সঞ্জুদের। বাবা এবং রাধাকৃষ্ণ আঙ্কল, মানে রাজুর বাবা ওঁদের অফিস থেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজু এবং সঞ্জুর যাবার ইচ্ছা ছিল না। মুম্বইতে যখন থাকা হবে তখন পরে একবার কেন দশবার যাওয়া যাবে। এলিফ্যান্টা কেভ পালিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু ওই লোকটার ওপর নজর না রাখলে দারুণ একটা রহস্য হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

বাবা বা আঙ্কলকে বলা গেল না, কী কারণে তাদের এলিফ্যান্টায় যাওয়া উচিত নয়। নিরুপায় হয়ে অন্য সবার সঙ্গে গাড়িতে উঠতে হলো সঞ্জুদের।

Pathagar.net

জুহু থেকে গাড়িতে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া। সেখান থেকে মোটর বোটে আরব সাগরের ওপর দিয়ে এলিফ্যান্টা কেভে পৌঁছুতে ঘণ্টাখানেক লাগে। আদিগন্ত সমুদ্র, দূরে মুম্বই হারবারে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি সুবিশাল জাহাজ—এই সব দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগছিল।

এলিফ্যান্টায় পৌঁছে পাহাড়-কাটা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে গুহার ভেতর বহুকালের পুরনো সব শিবমূর্তি দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যায় সঞ্জুরা। শত শত বছর আগে আমাদের দেশ শিল্পে-ভাস্কর্যে কিরকম উন্নতি করেছিল, এগুলো তারই প্রমাণ।

সবই দেখছিল সঞ্জুরা, কিন্তু সেই লোকটাকে কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। ওদের দু'জনের মাথায় তার চিন্তাটা ঘুরে ঘুরে হানা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে লোকটা সম্পর্কে ওরা এমন চাপা গলায় কথা বলছে যাতে মা-বাবা আঙ্কল-অ্যান্টিরা শুনতে না পান।

এলিফ্যান্টা দেখে ওরা যখন গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়াতে ফিরে এল, তিনটে বেজে গেছে। সবার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। ঠিক হলো, কাছাকাছি কোনও একটা ভাল রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেওয়া হবে। সঞ্জুদের গাড়িটা রয়েছে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার ওধারে বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল হোটেলের সামনে কার পার্কিংয়ের জায়গায়।

খাওয়া হলে গাড়িতে করে তারা জুহুতে ফিরে যাবে।

মুম্বইতে দুপুরে এবং সন্ধ্যেয় বেশ ক'টা খবরের কাগজ বেরোয়। একটা কাগজওলা চিৎকার করে বলছিল, 'ব্যাঙ্ক ডাকাইতি। দশ আদমী মার্ডার হো গিয়া—তাজা খবর—'

লোকটার সামনে একটা নিচু টুলের ওপর প্রচুর কাগজ থাক দিয়ে সাজানো। তাকে ঘিরে রীতিমতো ভিড় জমেছে। সবাই কাগজ কিনছে আর উত্তেজিতভাবে কী যেন বলছে।

ক'দিনের মধ্যে সঞ্জুর বাবার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ আঙ্কলের দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ওঁরা গিয়ে একটা কাগজ কিনে আনলেন। প্রথম পাতাতেই বড় বড় হরফে ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার বাংলা মানে করলে এরকম দাঁড়ায়। জুহুর একটা ব্যাঙ্কে আজ বেলা এগারোটার সময় বিরাট ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা সবাই মুখোশ পরে এসেছিল, হাতে ছিল লাইট মেশিনগান। ওরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে দশজনকে খুন করে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্কের ক'জন কর্মী। যারা টাকা তুলতে এসেছিল তাদের মধ্যেও দু'জন মারা যায়। আহত হয়েছে পনের-ষোল জন। ডাকাতদের একজনকেও ধরা যায়নি। একটা জিপে করে তারা এসেছিল। নগদ তিরিশ লাখ টাকা আর ব্যাঙ্কের লকার ভেঙে প্রচুর গয়না লুট করে সেই জিপেই উধাও হয়ে যায়। খবরের সঙ্গে যে ব্যাঙ্কে ঘটনাটি ঘটেছে সেটার এবং মৃত লোকগুলির ছবিও ছাপা হয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর, দুঃসাহসিক ব্যাঙ্ক ডাকাতি এর আগে নাকি মুম্বইতে আর কখনও হয়নি।

রাধাকৃষ্ণ আঙ্কল বললেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

সঞ্জুর বাবা কাগজের ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'আরে, ব্যাঙ্কটা তো আমাদের হোটেলের কাছে সেই দশতলা বাড়িটায়!'

উত্তেজনায় সঞ্জুর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। রাজুর কানে মুখ ঠেকিয়ে সে বলল, 'আমরা আজ এলিফ্যান্টা এলাম আর আজই ব্যাপারটা ঘটে গেল! এখন ওই জড়ুলওলা লোকটাকে পেলে হয়।'

রাজু কিছু বলল না। সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর জুহুতে ফিরতে ফিরতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। গাড়ি থেকে নেমে সঞ্জু আর রাজু হোটেলের ভেতর গেল না, বাবা আর মায়েদের বুঝতে না দিয়ে ব্যাঙ্কটার কাছে চলে এল। চারদিকে প্রচুর পুলিশ রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে। এখনও রাস্তার নানা জায়গায় রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। এধারে-ওধারে মানুষের জটলা। ঘটনাটা ঘটেছে বেলা এগারোটায় কিন্তু এখনও সবার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ।

রাজু জিজ্ঞেস করল, 'সেই লোকটার কি খোঁজ করবে?'

সঞ্জু বলল, 'না। আমাদের আবার দেখলে সন্দেহ করবে।'

'তা হলে কী করতে চাও?'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সঞ্জু বলল, 'চল পুলিশ স্টেশনে যাই।'

রাজু চমকে উঠল, 'পুলিশ স্টেশনে! কেন?'

'আমরা ওই লোকগুলোর ব্যাপারে যা করেছি তার বেশি আর কিছু করা যাবে না।

এখন যা করার পুলিশকেই করতে হবে। আমরা শুধু ক্লু দিয়ে ওদের সাহায্য করব। তা ছাড়া—'

'কী?'

'আমরা এরপর কিছু করতে গেলে বাবা-মা আঙ্কল-আন্টি টের পেয়ে যাবেন। তখন ডিটেকটিভ হবার মজাটা টের পাইয়ে ছাড়বেন।'

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে ওরা থানায় পৌঁছে গেল। সেখানে ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতি এবং দশ দশটা খুন নিয়ে কিছু একটা চলছে। আবহাওয়া ভীষণ থমথমে। তার মধ্যে কনস্টেবলরা এধারে-ওধারে ছোটাছুটি করছে।

গেটের মুখে সঞ্জুদের আটকে একজন আর্মড গার্ড বলল, 'অন্দর যানা মানা হ্যায়।'

সঞ্জু হিন্দীতে বুঝিয়ে দিল, অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে তাদের দেখা করতে হবে। বিশেষ দরকার।

আর্মড গার্ড জানাল, এখন ভেতরে মিটিং চলছে। দরকার থাকলে সঞ্জুরা যেন পরে আসে।

সঞ্জুরা নাছোড়বান্দা। তারা ভেতরে যাবেই, আর্মড গার্ড কিছুতেই যেতে দেবে না। চেঁচামেচি শুনে একটি মধ্যবয়সী, পুলিশের ইউনিফর্ম পরা, গম্ভীর চেহারার অফিসার বেরিয়ে এলেন। বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে? এত হৈচৈ কিসের?'

সঞ্জু লক্ষ্য করল, বুকে মেটালের লম্বা ব্যাজে লেখা : ইন্সপেক্টর চাপেকার। তিনি মারাঠি। আর্মড গার্ড মুখ খোলার আগেই সঞ্জু বলল, 'স্যার, আমরা অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, তিনিই অফিসার-ইন-চার্জ। ভীষণ ব্যস্ত আছেন, কথা বলার সময় নেই।

সঞ্জু বলল, 'যে কারণে আপনারা ব্যস্ত সেই ব্যাপারেই আমাদের কিছু বলার আছে।'

ধমক দিতে গিয়ে থমকে গেলেন ইন্সপেক্টর চাপেকার। দু'টি অল্প বয়সের ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, 'আমরা কী ব্যাপারে ব্যস্ত তা জানো?'

'হ্যাঁ। ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর—'

সঞ্জুকে থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে—'

সঞ্জু বলল, 'আমাদের যা বলার, শুধু আপনাকেই বলব।'

একটু ভেবে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ঠিক আছে।' সঞ্জুদের সঙ্গে করে একটা ফাঁকা ঘরে নিয়ে এলেন। তাদের বসিয়ে বললেন, 'বল—'

তারা ক'দিন আগে মুম্বইতে এসেছে, জুহুর হোটেলে আছে, তাদের নাম সঞ্জয় বসু এবং রজত মেনন, ইত্যাদি জানিয়ে সেই লোকটা এবং তার সঙ্গীদের সম্বন্ধে যাবতীয় খবর দিয়ে সঞ্জু বলল, 'লোকটা কোথায় থাকে তাও আমরা জানি।'

শুনতে শুনতে মেরুদণ্ড টান টান হয়ে গিয়েছিল ইন্সপেক্টরের। চোখ দুটো চকচক করছে। বললেন, 'কোথায়?'

'জুহুর 'আকাশগঙ্গা' বিল্ডিংয়ে। ফ্ল্যাট এইটিন বাই থ্রি।' বলে কীভাবে ঠিকানাটা যোগাড় করেছে তাও জানিয়ে দিল সঞ্জু।

pathagar.net

মুখোমুখি বসে ছিলেন ইন্সপেক্টর চাপেকার। সঞ্জু আর রাজুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'ভেরি গুড ওয়ার্ক ইয়াং শার্লক হোমস। একসেলেন্ট অবজারভেশন। তোমাদের এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের খুব সাহায্য করবে।'

সঞ্জু বলল, 'স্যার, একটা রিকোয়েস্ট আছে—'

'বল—বল—'

'আমরা যে ওই লোকগুলোর ওপর নজর রেখে, ফলো করে এই সব খবর যোগাড় করেছি, আমাদের মা-বাবারা জানতে পারলে একেবারে কেটে ফেলবেন। মানে এ সব—'

'বুঝেছি, বুঝেছি। কোনও মা-বাবাই চান না তাঁদের ছেলেরা খুনী-ডাকাতদের পেছনে ঘুরে বেড়াক। তোমাদের কথা মনে থাকবে।'

সপ্তাহ দুই কেটে গেল।

সঞ্জু আর রাজুদের পালি হিলের ফ্ল্যাট রেডি হয়ে গেছে। ওরা যেদিন হোটেল থেকে সেখানে চলে যাবে, তার আগের দিন সকালে খবরের কাগজে দেখা গেল, ব্যাঙ্ক ডাকাতরা সবাই মুম্বই থেকে নব্বই মাইল দূরে পুনে শহরে ধরা পড়েছে এবং তাদের লুট-করা টাকা আর গয়নার বেশির ভাগটাই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সেদিনই সন্ধ্যের পর ইন্সপেক্টর চাপেকার সঞ্জুদের হোটেলে এসে হাজির। অফিস থেকে তার কিছুক্ষণ আগেই অরিন্দম আর রাধাকৃষ্ণ চলে এসেছেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার দুই ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে বেশ আসর জমিয়ে বসলেন। কফি খেতে খেতে বললেন, 'হঠাৎ পুলিশের লোক কেন হানা দিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনাদের কৌতূহল হচ্ছে।'

রাধাকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ, মানে—'

সঞ্জু আর রাজু মাথা হেঁট করে বসে ছিল। সব ব্যাপারটা এবার জানাজানি হয়ে যাবে, ভাবতেই তাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

ইন্সপেক্টর চাপেকার সঞ্জুদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'আমার এই দুই ইয়াং ফ্রেণ্ড আর তাদের মা-বাবাকে কনগ্র্যাচুলেট করতে এসেছি। ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পারছেন না?'

রাধাকৃষ্ণ, অরিন্দম, জানকী, সঞ্জুর মা মণিমালা, তার দিদি রিনি—সকলেই মাথা নেড়ে জানালেন, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

ইন্সপেক্টর চাপেকার এবার বললেন, 'আজকের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন, জুহুর ব্যাঙ্কে যারা ডাকাতি করেছে তারা দলবলসুদ্ধ ধরা পড়েছে। এই দুই ক্ষুদে শার্লক হোমসের সাহায্য না পেলে কিছুতেই ওদের অ্যারেস্ট করা সম্ভব হতো না।' তারপর কীভাবে সঞ্জুরা ডাকাতদের সম্পর্কে খবর যোগাড় করে তাঁকে গোপনে জানিয়ে এসেছে, তা তো বললেনই। আরও বললেন, ওদের দেওয়া সূত্র ধরে 'আকাশগঙ্গা'য় তাঁরা ফাঁদ পেতেছিলেন। সেখানে ডাকাতদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। তবে ওদের ওই ফ্ল্যাটটা দেখাশোনা করার জন্য একটা লোক ছিল। তাকে থানায় ধরে এনে বেদম পেটাতেই ডাকাতদের পুনের ঠিকানা পাওয়া যায়।

রাধাকৃষ্ণ এবং অরিন্দম ছেলেদের ওপর রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, তাঁদের থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ওদের বকবেন না। যে কাজ ওরা করেছে সে জন্যে আপনাদের গর্ববোধ করা উচিত।'

অরিন্দম বললেন, 'ডাকাতগুলো টের পেলে কী হতো বলুন তো? কত বড় রিস্ক! সঞ্জু কলকাতাতেও এমন অনেক কাণ্ড করেছে—'

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ভেবে দেখুন ওরা না সাহায্য করলে ডাকাতেরা ভবিষ্যতে আরও কত ক্ষতি করত!'

অরিন্দম চুপ করে রইলেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার বলতে লাগলেন, 'আমার ইয়াং ফ্রেণ্ডদের মোটামুটি কথা দিয়েছিলাম, আপনাদের জানাবো না। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি এত বড় একটা ব্যাপার লুকিয়ে রাখা অন্যায়। এবার একটা সুখবর দিচ্ছি।'

সবাই উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট সঞ্জয় আর রজতকে বড় অনুষ্ঠান করে খুব বড় একটা পুরস্কার দেবে। যে ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে, তারাও বিরাট কিছু দেবার কথা ভাবছে। খুব শীগগিরই আপনাদের কাছে এসে ওরা তা জানিয়ে যাবে। আজ তাহলে চলি—'

ইন্সপেক্টর চাপেকার উঠে দাঁড়ালেন।

pathagar.net

বেসরকারী গোয়েন্দা

ধীরেন্দ্রলাল ধর

রবিবার। কাজের তাড়া নেই। খান চারেক বিস্কুট আর দু'কাপ কোকো খেয়ে গোবিন্দ আরামে খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছে। এমন সময় রবীন এসে পড়লো। সামনের চেয়ারখানি দখল করে বললো—কাগজে পড়লাম, ওকালতির সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছো, তা বেশ!

চায়ের পর্ব শেষ করে রবীন আসল কথায় এলো। বললো—তোমার কাছে এলাম, তুমি আমায় কিছু সাহায্য করো দিকি। এই দেখো—

একখানা চিঠি সে এগিয়ে দিলে গোবিন্দর সামনে।

নীল খামে, নীল কাগজে সৌখীন করে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ঃ

মহারাজের সেক্রেটারী মহোদয় সমীপে—

মান্যবর মহাশয়,

কাল সন্ধ্যায় মহারাজ দিল্লী গিয়াছেন। সামন্ত রাজ্য অধিকার করার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত মহারাজকে যে বার্ষিক বৃত্তি দিয়া আসিতেছেন, মহারাজ তাহাতে সন্তুষ্ট

নন। তিনি সেই বৃত্তি বাড়াইবার জন্য প্রথমাবধি তদ্বির করিয়া আসিতেছেন। এবারও এজন্য দিল্লীতে কয়েকদিন তাঁহাকে থাকিতে হইবে। এই কয়দিন আপনিই মহারাজের কলিকাতার বাড়িতে একা থাকিবেন। সেখানে যথেষ্ট অলঙ্কার ও হীরা-জহরত আছে। সম্প্রতি সেইগুলির উপর একদল দস্যুর নজর পড়িয়াছে। সেগুলি হস্তগত করিবার জন্য তাহারা উৎসুক। আপনি সাবধান হইবেন। শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনাকে সতর্ক করিয়া দিলাম। ইতি—

অতি পরিচিত এক বন্ধু

(বিপদ ঘটিবার ভয়ে নাম প্রকাশ করিলাম না)

রবীন বললো—এই চিঠি পেয়েছি কাল সন্ধ্যায়। পরশু সকালে মহারাজ দিল্লী গেছেন। আমি একা আছি রাজবাড়িতে, সত্যি সেখানে লাখ লাখ টাকার হীরে-জহরৎ আছে! এখন আমার করণীয় কি বলো তো?

—বাড়িতে চাকর-দারোয়ান আছে, বন্দুকও তো আছে।

—চাকরদের উপর ভরসা রাখা যায় না। তাছাড়া সবচেয়ে পুরনো চাকরটা ছাড়া অন্য তিনজন দিন-তিনেকের জন্য গঙ্গাসাগরে গেছে পুণ্যি করার জন্য। আর দারোয়ান ও তার বন্দুক। দুটোই পোশাকী। দারোয়ান বোধহয় সারা জীবনে তার বন্দুকটা ছোঁড়েনি, ছুঁড়তে জানে কি না, তাই বা কে জানে!

—তাহলে পুলিশে খবর দাও।

—না, পুলিশে খবর দেওয়া চলবে না। রাজ্য দখল করার সময় মহারাজের হীরে-জহরতের একটা হিসাব দাখিল করতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। মহারাজ তখন অনেক গোপন করেছিলেন। পাগড়িতে পরার জন্য পাঁচখানা বড় বড় হীরে বসানো একটা 'ডায়মণ্ডপিন' আছে, সেটার মূল্যই অন্ততঃ দশ লাখ টাকা, হিসাবে তার কোন উল্লেখই নেই। এমনি আরো কত আছে, পুলিশ তো সে-কথা জানবে। তখন আবার আরেক দিকে মুশকিল দেখা দেবে।

—সেগুলো আছে কোথায়?

—বাড়িতে।

—কেন? ব্যাঙ্কের সেফ্ ডিপজিট্ ভল্টে রাখেনি কেন?

—সেদিকে মহারাজার আবার ভয় আছে, যদি কোন দিন গভর্নমেণ্ট ভলট্ 'লক্' করে দেয়। সোনা যেভাবে কন্ট্রোল করলো, তাতে সেই ভয় এখন আরো বেড়েছে। এখন আমি পড়েছি বিপদে। এখানে এখন আমার জিম্মায় সব। আবার তার উপর এই চিঠি। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। তুমি একবার চলো তুমি দেখেশুনে যা বলবে, আমি সেইমতো ব্যবস্থা করবো।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে গোবিন্দ ক'মিনিট চুপ করে রইল, তারপর বললো—আমার আজ জরুরী একটা কেস্ আছে। সন্ধ্যেবেলা কোর্ট থেকে ফিরে এসে জামা-কাপড় বদলে রাত আটটা-ন'টা নাগাদ তোমার ওখানে যাবো। তুমি থেকো।

—আমি সারাদিনই আছি। বাড়ি পাহারা দিচ্ছি। রাতেও জেগে থাকি, ভয়ে ঘুম হয়

না। তুমি রাত বারোটায় গেলেও দেখবে আমার ঘরে আলো জ্বলছে।

রাত ন'টা।

কলকাতার হঠাৎ-বড়লোকী পাড়া নিউ আলিপুরের একখানি সুদৃশ্য দোতলা বাড়ির সামনে এসে গোবিন্দ দাঁড়ালো। সামনে ছোট পাঁচিল। একটি ছোট ফটক পার হয়ে দু'সারি ফুলের গাছ। তার পরেই বারান্দা। দোতলায় আলো জ্বলছে, নীচেটা আগাগোড়া অন্ধকার। দরজা খোলাই ছিল, তবু গোবিন্দ কলিং বেল্ টিপলো।

কিন্তু বার তিনেক টিপেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

গোবিন্দ ডাকলো—রবীন, রবীনবাবু!

কোন সাড়া নেই। গোবিন্দর কি যেন মনে হলো। ঢুকে পড়লো বাড়ির মধ্যে। অন্ধকারে বরাবর দোতলায় উঠে যাবে নাকি? দরকার নেই। ডাইনের ঘরে পর্দা ঝুলছিল। সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলো। আলোটা জ্বেলে এইখানেই একটু বসা যাক। দরজার আশেপাশে আলোর সুইচ্‌টার জন্যে সে হাত বাড়ালো। সুইচ্ মিললো। আলো জ্বলতেই গোবিন্দ চমকে উঠলো।

সামনেই টেবিল। টেবিলের ওপাশে একখানি সোফায় রবীন ঢলে পড়েছে, জামার উপর দিয়ে রক্তের স্রোত নেমে এসেছে মেঝের উপর।

মরে গেছে! খুন! গোবিন্দ এগিয়ে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে তবু একবার দেখে নিলে। ছুরি মেরে রবীনকে হত্যা করা হয়েছে। জহুরতের জন্যই রবীন খুন হয়েছে। এখনি পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। মহারাজের মুকুটের হীরে রাখতে গিয়ে গরীব এম-এ পাস করা সেক্রেটারী প্রাণ হারালো।

ঘরে কোথাও জোর-জবরদস্তির চিহ্ন নেই। কোন চীৎকার কি আর্তনাদ শোনা গেলে আশেপাশের বাড়ির মানুষ নিশ্চয়ই কৌতূহলী হতো। বাড়ির অন্য লোকেরাও জানতো। কিন্তু বাড়িতে অন্য লোক কি আছে? তাহলে ডাকলে সাড়া পাওয়া গেল না কেন? দারোয়ানই বা গেল কোথায়? খুনী রবীনের খুবই পরিচিত মনে হয়। তার কাছ থেকে আক্রমণ রবীন বোধহয় আশাই করেনি। তাই বিনা বাধায় ঘটেছে ব্যাপারটা। গোবিন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বরাবর ভিতরে চলে গেল। নীচের অন্ধকার ঘরগুলি পার হয়েই সিঁড়ি। সিঁড়ি থেকে উপর অবধি সব ঘরেই আলো জ্বলছে। নীল পর্দা ঝুলছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রাণী নেই। ঠাকুর-চাকর গেল কোথায়? ছিমছাম সাজানো সব ঘর। কোন ঘরে চোর-ডাকাতের লণ্ডভণ্ড করে খোঁজাখুঁজির চিহ্ন নেই।

গোবিন্দ নীচে এলো। অন্ধকার ঘরগুলির ভিতরে ঢুকে একে একে আলো জ্বাললো। ভাঁড়ার ঘরে রেফ্রিজারেটারটা শুধু খোলা রয়েছে, আর কোন ঘরে কোথায় এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। কিন্তু দারোয়ান কোথাও? তার ঘর অন্ধকার। অনেক চেষ্টার পর সুইচ্ পাওয়া গেল। আলো জ্বালতেই গোবিন্দ আবার চমকে ওঠে। মেঝেয় মাদুরের ওপর দারোয়ান চিৎ হয়ে পড়ে আছে। অজ্ঞান। অদূরে একটা এনামেলের গ্লাস। কোন পানীয় ছিল মনে হয়।

সব দেখেশুনে গোবিন্দ ফিরে এলো বৈঠকখানায়। কোন কিছু সে স্পর্শ করলো না। টেলিফোনের রিসিভারটা রুমাল জড়িয়ে তুলে নিল, ডায়াল করলো—লালবাজার। এখানে

একটা খুন হয়েছে, মহারাজার সেক্রেটারী রবীন মিত্র খুন হয়েছেন। দারোয়ান তার ঘরে অজ্ঞান হয়ে আছে। বাড়িতে আর কেউ নেই। নিউ আলিপুর, ব্লক জেড,... নং বাড়ি।

আকাশে জমাট মেঘ। গোবিন্দ স্থানত্যাগ করল। চেপে বৃষ্টি এলো একটু পরেই।

একদিন পরে খবরের কাগজে বেরুলো ঃ

'নিউ আলিপুরে দেবগড়ের মহারাজার সেক্রেটারী রবীন মিত্র খুন হইয়াছেন। বাড়িতে দারোয়ান ছাড়া আর কেহ ছিল না, বিষাক্ত জল পান করায় সে অজ্ঞান হইয়াছিল। সেই অবকাশে আততায়ী সন্ধ্যার খানিক পরেই রবীনবাবুকে হত্যা করিয়া সরিয়া পড়ে। পুলিশ গৃহভৃত্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সে সিনেমার টিকিট দেখাইয়াছে, সন্ধ্যায় সে সিনেমা দেখিতে গিয়াছিল। কিন্তু পুলিশ তাহার জামার হাতায়, খুব সামান্য হইলেও, রক্তের দাগ পাইয়াছে। মহারাজার গৃহে কিছু মূল্যবান হীরা-জহরত ছিল। সে-সব কতটা লুঠ হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

মহারাজা দিল্লী গিয়াছেন, তিনি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সঠিকভাবে কিছুই জানা যাইতেছে না। তবে ভৃত্য বলিতেছে, সে খুবই বিশ্বাসী, গত পনরো বছর ধরিয়া সে ওই গৃহে কাজ করিতেছে। পুলিশ রহস্যভেদের চেষ্টা করিতেছে।'

দু'দিন পরে করোনারের আদালতে পুলিশ জানালো, গৃহভৃত্যের জামায় যে রক্তের দাগ দেখা গেছে, সে রক্ত ও নিহত রবীন মিত্রের রক্ত অভিন্ন।

মহারাজা কিন্তু বললেন—এই ভৃত্য জগারাম তার কাছে পনেরো বছর চাকরি করছে, কোন দিন তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ ঘটেনি, এর পিতাও তাঁর কাছে ভৃত্যের কাজ করে গেছে। এরা তাঁর প্রজা।

ভৃত্য জগারাম সিনেমার টিকিট দেখিয়ে আদালতে কান্নাকাটি শুরু করে। সে বলে, রক্তের দাগের কথা সে জানে না, সে ছুটি নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল। কিন্তু একটা হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এতো সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। পুলিশ জগারামকে হাজতে পুরলো ; এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হলো।

এদিকে অনেক কষ্টে দারোয়ানের প্রাণ রক্ষা পেল। কিন্তু পানীয় জল কিভাবে বিষাক্ত হলো, সে বলতে পারলো না।

তারপর মাসখানেক কেটে গেল, কিন্তু পুলিশ কোন সূত্র খুঁজে পেল না।

গোবিন্দ আসামী পক্ষের উকিল হয়ে দাঁড়ালো। ফী না নিয়েই সে মামলায় নামলো। বললো—রবীন আমার সহপাঠী ও বন্ধু ছিল। তার আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে। একটা নিরীহ চাকরকে জেলে পাঠিয়ে আসল আসামী সন্দেহের বাইরে চলে যাবে, এ আমি হতে দেবো না। জগারাম খালাস পাবে, এবং আসল আসামী ধরা পড়বে—সেইভাবে কাজ করতে হবে।

আদালতে গোবিন্দ প্রশ্ন তুললো—আসামীর হাতের ছাপ কোথাও পাওয়া গেছে কি? কেউ আসামীকে ছুরি মারতে দেখেছে? দেখেছে কি কোন-কিছু নিয়ে বাড়ি থেকে সরে পড়তে? খুন করে হীরে-জহরত নিয়ে সরে পড়ার পর আসামী আবার ফিরে আসবে কেন? আসামী যেখানে থাকতো, সেখানে তো কিছুই নেই, তাহলে লুঠের মাল সব

গেল কোথায়? এবং শেষ প্রশ্ন হত্যাকাণ্ডের পর লালবাজারে টেলিফোন করেছিল কে?

এসব প্রশ্নের জবাব পুলিশও পায়নি। কাজেই জগারাম দু'মাস পরে হাজত থেকে মুক্তি পেল।

তিন মাস জগারাম আর বাড়ি থেকে বেরোয়নি। সামান্য কাজকর্ম করে গুম হয়ে বসেছিল। চতুর্থ দিনে সকালেই সে মহারাজকে বললো—হুজুর, আমি বাড়ি যাবো।

মহারাজা বললেন—সেই ভালো, আমিও এ বাড়ি বিক্রি করে দেব। এখানে মানুষ খুন হলো, আমার হীরা-জহরত চুরি গেল,—এ বাড়ি আর রাখবো না।

—এত জিনিসপত্তর?

—সব ফার্নির্চার বেচে দেব।

হত্যাকাণ্ডের পর খুনী মূল্যবান হীরা-জহরত যা ছিল নিয়ে গেছে। সেজন্য মহারাজার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। বললেন—কলকাতায় আমি আর বাড়িঘর রাখবো না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মহারাজা গাড়ি নিয়ে বেরুলেন। শখের গাড়ি, নিজেই ড্রাইভ্ করেন। এলোমেলো খানিকটা ঘোরাফেরা করে ফিরলেন সেই রাত আটটা সাড়ে-আটটায়। দারোয়ান সদর বন্ধ করলো। জগারাম তখন রাত্রের রান্না-খাওয়ার আয়োজন করতে ব্যস্ত।

ঘণ্টাখানেক পরে—অন্ধকার তখন বেশ জমাট বেঁধেছে। হঠাৎ দেখা গেল, নিঃশব্দে জগারাম গুটি গুটি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাড়ির পিছন দিকে কয়েক কাটা জমি পড়ে ছিল। সেখানে বেশ কিছু ফুল ও ফলের গাছ। মাঝে একটু বসবার মত বাঁধানো চত্বর। জগারাম সন্তপর্ণে সেই চত্বরটার একটা কোণে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর চারিদিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে একটা রুটি-কাটা ছুরি দিয়ে সে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। নরম মাটি—অল্পক্ষণের মধ্যে প্রায় হাত দুয়েক গর্ত হয়ে গেল। জগারাম এবার সেখানে হাত ভরে দিয়ে ঢাকনিওয়ালা বড় একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র বের করলো। তারপর আবার গর্তে মাটি চাপা দিয়ে পাত্রটা হাতে নিয়ে চলে গেল বাড়ির মধ্যে।

পাঁচিলের বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক—নিঃশব্দে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। কোন কিছুতেই তার নজর এড়াল না। জগারাম ভিতরে ঢুকে যেতেই সে গিয়ে টেলিফোন করলো কাছাকাছি এক বাড়ি থেকে ঃ হ্যালো! হ্যাঁ, আমি মৃণাল কথা বলছি—

রাত দশটায় মহারাজা যখন শোবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় টেলিফোন এলো—আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমি আপনার নিহত সেক্রেটারী রবীন মিত্রের পরিচিত। খুনখারাপির ব্যাপার নিয়ে এক-আধটু মাথা ঘামাই। রবীনবাবুর খুন ও আপনার বাড়িতে ডাকাতি নিয়ে আমি বেশ কিছু ভেবেছি। যদি আমার বিশ্লেষণ ঠিক হয়, তাহলে সমস্ত হীরে-জহরত উদ্ধার হতে পারে। খুনীর সন্ধান আমি পেয়েছি বলা যেতে পারে ; তবে এজন্য আপনাকে দেড় লাখ টাকা নগদ খরচ করতে হবে। নিহত রবীনবাবুর বিধবা মাকে দিতে হবে এক লাখ টাকা, আর আমার ফী পঞ্চাশ হাজার।

—অতো টাকা এখন কোথায় পাই?

—আপনার ব্যাঙ্কে কয়েক লাখ টাকা ফিক্সড্ ডিপোজিট্ আছে। তা থেকে টাকাটা দেবেন। আপনার হীরে-জহরতের দাম তার চেয়ে অনেক বেশী। যদি দিতে রাজী থাকেন, কাল সকালে 'প্রতিশ্রুতি' লিখে রাখবেন, আমি কাজে বেরুবার পথে আপনার বাড়ি হয়ে যাবো। আপনার স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র পেয়ে তবে আমি কাজে হাত দেবো। হয়তো কালই সমস্ত জহরত আপনি পেয়ে যাবেন। আজ সারারাত এবং কাল সকাল দশটা অবধি ভেবে দেখুন, কি করবেন।

ওপার থেকে বক্তা টেলিফোন ছেড়ে দিল।

আড়াইটের ট্রেন। একটার সময় হাওড়া স্টেশনের টিকিট-ঘরের সামনে এসে লাইনে দাঁড়ালো জগারাম। তার হাতে একটা স্টিলের সুটকেস ছাড়া আর কিছু নেই। গোবিন্দ তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিল। জগা চিৎকার করে উঠলো—একি! একি!

—এসো। একবার আপিসে যেতে হবে।

—কোন্ আপিসে?

—এই যে রেলওয়ে পুলিশ।

—পুলিশ! পুলিশ কেন?

—দরকার আছে।

জগা ঘাবড়ে গেছে। সে এদিক-ওদিক চায়—পালানোর মতলব। গোবিন্দ বললো—পালানোর চেষ্টা ক'রো না। তার ব্যবস্থা করেই এসেছি।

তারপর সে জগার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বড় ঘড়িটার নীচে। চারপাশে কৌতূহলী জনতা। গোবিন্দ বললে—খোলো সুটকেস। কত টাকা আছে দেখি।

—টাকা!

—হ্যাঁ, মহারাজের জহরতের দাম।

—কী বলছেন!

—বাজে ব'কো না, সুটকেস খোলো। সেক্রেটারী রবীনবাবুকে খুন করে তুমি জহরত চুরি করেছিলে ; এখন মাড়োয়ারীর কাছে বেচে ক' লাখ টাকা পেলে, তাই জানতে চাই।

—আমি খুন করেছি! আপনি কী বলছেন! অ্যাঁ, আপনিই তো আদালতের সেই উকিলবাবু, আপনিই তো আমাকে খালাস করে আনলেন আদালত থেকে!—জগারামের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, তা না আনলে তোমার এই খুন-রাহাজানি ধরা পড়তো না। তোমার সাগরেদরাও ধরা পড়তো না। এখন সুটকেসটা খুলে ফেলো দিকি ভাল ছেলের মতো।

জগা থর-থর করে কাঁপছে। পরক্ষণে গোবিন্দর এক ধমক খেয়ে সুটকেসটা সে খুলতে বাধ্য হলো। কয়েকটি জামা-কাপড়ের নীচে একটি কাগজের প্যাকেট, প্যাকেটে তাড়া একশো টাকার নোট বাঁধা। গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলো—কত?

—পঞ্চাশ হাজার।

গোবিন্দ বললো—হুঁ, বাকী পঁচাত্তর হাজার তাহলে দলের অন্য দু'জন নিয়েছে।

তারপর সুটকেস বন্ধ করে সেটাকে হাতে নিয়ে সে বললো—এসো আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—যে মাড়োয়ারী টাকাটা দিয়েছে তার বাড়ি।

জগা ছিট্‌কে সরে পড়তে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক যুবক এসে তার হাত ধরলো। বললো—ছিঃ, ও চেষ্টা ক'রো না। চল।

বাইরে এসে পুলিশের গাড়িতে তারা গেল লালবাজার। তারপর সেখানে থেকে লোকজন নিয়ে বিবেকানন্দ রোডে এক মাড়োয়ারীর গদীতে গিয়ে হাজির।

মাড়োয়ারী মহানন্দে তাকিয়া হেলান দিয়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাচ্ছিল, মহারাজার দশ লাখ টাকার জহরত এক লাখ পঁচিশ হাজারে সিন্দুক জাত করেছে—এ কি কম কথা! হঠাৎ পুলিশ দেখে সে হকচকিয়ে গেল।

গোবিন্দ জিজ্ঞেস করলো—খুনীকে সাহায্য করার ব্যাপার,....কালো টাকা কত জমিয়েছ শেঠজী? মহারাজের হীরেগুলো বের করে দাও আর থানায় চল—

মাড়োয়ারীর মাথায় চকিতে বুদ্ধি খেলে গেল, বললো—হৈ-চৈ করবেন না বাবুজী, এখানে সবাই আমায় খাতির করে। হীরে-জহরত আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আমাকে নিয়ে আর জড়াবেন না। যা লাগে, আমি দেবো।

ঘুষে বাঙালীকে কেনা যায় বলে মাড়োয়ারীর ধারণা। সে-ভুল তার ভাঙলো। তাকে লালবাজার যেতে হলো।

ঘণ্টা দুয়েক পরে পুলিশ গিয়ে মহারাজের বাড়ির পিছন দিকে মাটি খুঁড়ে রক্তমাখা ছোরাখানি বের করলো। জগার সাগরেদ দু'জন আগেই ধরা পড়েছে। তাদের মধ্যে একজন হলো দাগী আসামী। তাদের দিক থেকে নজর সরিয়ে দেবার জন্যই সে চিঠিখানা লিখেছিল।

রবীন মিত্রের হত্যার মামলা নতুন করে শুরু হলো।

গোবিন্দ ইতিপূর্বে মহারাজার কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা আদায় করে নিয়েছে। লাখ টাকা সে দিয়ে এল রবীনের বৃদ্ধা মায়ের হাতে আর নিজে রাখলো পঞ্চাশ হাজার। তার মন্তব্য—প্রজাদের শোষণ-করা টাকার তবু কিছুটা সদ্‌ব্যয় হলো।

মীন রহস্য

pathagar.net

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরাময়দাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারছিলাম না। তাঁর এক কথা, 'না। তোমাদের সঙ্গে নিয়ে মরি। ছোট কর্তার মেজাজ খারাপ। সকাল থেকে শুরু হয়ে গেছে। খবরদার নিরাময় ওদের নিবি না। জ্বর জ্বালা হলে কে দেখবে। জায়গাটাও ভাল না। তোর যে কি মতিভ্রম হয় বুঝি না। ঋতুটাই বিশ্বাসঘাতক।'

হেমন্তের মাঝামাঝি সময়। শীত পড়ে গেছে। রাতে কুয়াশা পড়ে। তিনুডাঙ্গার মাঠে এখন ঝানু মাছ শিকারীরা ঘুরে বেড়ায়। আসলে মাঠ না বলে বিল বলাই ভাল। নদীর পাড়ে পঞ্চবটীর শ্মশান। বিল থেকে খাল নেমে গেছে শীতলক্ষ্যায়। এ-সময়টায় বর্ষার জল নেমে যেতে থাকে। মাঠ ঘাট শুকনো হয়ে ওঠে। বিলে যতদূর দেখা যায় শুধু ধানের জমি। ধানগাছের পোকামাকড় খেতে বর্ষার নদী থেকে উঠে আসে নানা কিসিমের মাছ। ধান গাছ যত বড় হয়, জল যত বাড়ে তত তারাও বাড়ে। বর্ষার মাছ শিকার, কচ্ছপ শিকার এক নেশা। শরতেই জলে টান ধরে। গ্রাম মাঠ থেকে জল নেমে যেতে থাকে। নালা খাল বিলের জল নেমে যায় নদীতে।

ছোট কর্তা রাজী না।

তা ছোট কর্তারও দোষ দেওয়া যায় না। তার না হয় তন্ত্র মন্ত্র ভরসা, এদের কি ভরসা! ছোট কর্তা রাজী হবেন না।

তা-ছাড়া গত সালে হরি বিশ্বাস মাছ শিকার করতে গিয়ে গায়েব হয়ে গেল। ভূত প্রেতের কাণ্ড। সুযোগ বুঝে এত বড় ওঝার হয়তো ঘাড় মটকে দিয়েছে। কিন্তু আমরা সকাল থেকেই বায়না করছি, 'নিরাময়দা তুমি একা যাবে কেন, আমরাও যাব। আমাদের বুঝি ইচ্ছে হয় না—আমরা দুষ্টুমি করব না। যা বলবে শুনব।'

'ঐ তো মুশকিল! হরি বিশ্বাস গায়েব হয়ে গেল। জানের মায়া নেই তোদের!' 'বারে তুমি থাকলে আমাদের ভয় করবে কেন! তুমিতো কত কিছু জান। ভূত উড়ানি মন্তর জান, গন্ধ শুঁকে টের পাও সাপ খোপের উপদ্রব আছে কি না, তুমি পার। তুমি বললে কাকা রাজি হবে। গেল বারে যে বললে, এবারে নিয়ে যাবে। বললে কেন বল! বড়দা ক্ষেপে আছে জান! তার এক কথা, "আমাদের না নিয়ে গেলে, নিরাময়দাকেও যেতে দেব না। কি করে যায় দেখব"।'

বড়দাকে নিরাময়দা সামলাতে পারে না। হেন আকাম কুকাম নেই বড়দা করতে পারে না। 'যাবে, যাও। দেখবে ফিরে, কি হয়!'

'কি আর হবে! বড়দা গোয়ালের গরু বাছুর ছেড়ে দেবে। তখন নিরাময়দার মাথায় হাত। লেজ তুলে গরু বাছুর ছুটবে। বাড়ি, ঘর, উঠোন পার হয়ে একেবারে মাঠে।

কোন মাঠে, কার ক্ষেতে মুখ দেবে—তারপর এই নিয়ে কথা কাটাকাটি। কে করেছে! কেউ জবাব দেবে না। নিরাময়দা ফাঁপরে পড়ে যায়। তার জামা নেই, লুঙ্গি নেই। মাদুর হাপিজ। তার ঘরে কে ঢুকল! কিচ্ছু নেই! আমরা সবাই চুপ।

নিরাময়দা জানে, বড়দার কাজ। বড়দা তখন কি ভালমানুষ। 'তোমার ঘরে আমরা ঢুকিই না। তোমার গামছা লুঙ্গি কোথায় আমরা কি জানি! তাছাড়া কথা দিলে কেন। এ-সালে নিয়ে যাবে বললে কেন! কথা দিলে কথা রাখতে হয়।'

অগত্যা নিরাময়দা ছোট কাকার কাছে আর্জি জানাল—'যেতে চাইছে যখন...' নিরাময়দার দাপট আছে। বিশ্বাসী মানুষ। এ-ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় মনিব। নানা আকাম কুকাম ঠিক নিরাময়দা ধরে ফেলে। কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনে বাড়িতে।

কাকা বললেন, 'বলছিস তুই।'

'তা ওদেরও তো ইচ্ছে হয়, ভয় ডর না কাটলে বড় হবে কি করে!' কাকা বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক।' নিরাময়দা বলল, 'ঠিক আছে যাবে, হাত লাগাও।'

হাত লাগাও বলতে, মাছ শিকারের নানাবিধ কৌশলের কথা বললেন।

'এই নাও বানা। পাট করে বেঁধে ফেল।' নিরাময়দার সহকারী সুধনা এবারে যেতে পারছে না। ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। ঠিক ছিল সতীশ কর সঙ্গে যাবে। তারও যাবার সখ অনেকদিন থেকে। চন্দ্রকিরণ চাই—অর্থাৎ পূর্ণিমা না হলে জো হয় না। রুপালি মাছেরা চন্দ্রকিরণে আছন্ন হয়ে থাকে। হাতেই ধরা যায়। রোজ এসে খবর নিয়ে গেছে সতীশ কর—'কি কবে যাবে ঠিক করলে! জো শুরু কবে?'

আমরা যাচ্ছি যখন সতীশ করের দরকার নেই। সকাল বেলাতে আমাদের উঠোনে

সতীশ কর আসতেই নিরাময়দা বলল, 'যাওয়া হবে না। আকাশ মেঘলা দেখছেন না! এবারে বোধ হয় 'জো' পড়বে না।' শিকারে গেলেই মাছ পাওয়া যাবে কথা নেই। ভাগ্য প্রসন্ন না থাকলে খালি হাতেও ফিরতে হতে পারে। তবে ওস্তাদ মাছ শিকারীরা জানে, কবে কখন, যেমন নিরাময়দার কাছ থেকেই আমরা জেনেছি, শনি মঙ্গলবারে গলদা চিংড়ির জ্বর আসে। কথাটা যে বেঠিক না, জল দেশে বড় না হয়ে উঠলে জানতে পারতাম না। জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টি মাঠ ঘাট ভেসে যায়। আষাঢ়ে বাড়ির ঘাটে জল। আম গাছ জাম গাছের গোড়ায় জল। কচুর বনে জল। এ-বাড়ি ও-বাড়ি যেতে জল। ঠিক ভাদ্রে জল নামতে শুরু হয়, আর নিরাময়দার কেরামতিও শুরু তখন থেকে।

'দেত ডুলাখানা।'

'আমরা যাব।'

'কি করবে গিয়ে।' এক ধমক। নিরাময়দার বাড়ি থেকে বের হলে আমরাও তার পিছনে। পরণে গামছা। খালি হাতে কাটাখানেক গলদা চিংড়ি তুলতে যাচ্ছেন। কি করে যে বোঝে! ঠিক রাজবাড়ির পিছনে জলে জঙ্গলে হেঁটে বেড়ান। খালের পাড়ে পাড়ে হেঁটে বেড়ান। সন্তর্পণে বকের মতো পা ফেলেন, আমরাও বকের মতো পা ফেলি। নিরাময়দা হাতের ইশারায় চলে যেতে বলেন, শুনি না।

দেখি, খপ। খপ করে জলে ডাঙ্গায় বড় গলদা চিংড়ির মাথা চেপে ধরেছেন। নীল রঙ। কি বাহার তার। কি করে যে বোঝেন। বড় বড় দাঁড়গুলি নাড়ে। আমরা ছুটে গেলে বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়। কাছেও যেতে পারি না। অথচ অদম্য কৌতূহল। কি ভাবে নিরাময়দা এবার বেজায় প্রসন্ন হয়ে গেল, বললো চল, কি করে বুঝবি দ্যাখ। জলে ডাঙায় কি করে মাছ ধরতে হয় শিখে রাখ।

খালের পাড়ে পাড়ে হাঁটছি। হঠাৎ হাত তুলে দিলেন। আমরা থেমে পড়লাম। তারপর তিনি ইশারায় ডাকলেন। বকের মতো পা ফেলে জল ভাঙতেই বললেন, ঐ দ্যাখ।

কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ফিস ফিস করে কথা বললেন নিরাময়দা। 'দেখতে পাচ্ছিস না!'

জলে টান ধরেছে। জলে পচা গন্ধ। জলজ ঘাস পচছে, মাছেরা পালাচ্ছে—ঐ দ্যাখ। পচা জলে একটা নীল রঙের বিশাল চিংড়ি পড়ে আছে। বোঝা যায় না। ঘাসের রঙ জলের রঙ মাছের রঙ এক রকমের। নীল হলুদ সবুজ। নিরাময়দা মাছের পোকা। আমরা বলি মাছের রাজা। সবাই বলে, হরি বিশ্বাসের চেলা। ডাঙায় মাছ লাফিয়ে ওঠে নিরাময়দাকে দেখলে।

সেই শিকারী মানুষ বললেন, ইশারায়, 'পারবি! আমি ঘাড় কাত করে বললাম, 'পারব।' বড়দা আমাকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেছিল। আর ধরতে যেই না গেল, ঝপাং করে কোথায় ছিটকে গেল মাছটা। নিরাময়দা ক্ষেপে লাল। হাত প্রমাণ সাইজের মাছটাকে তাড়ালি! তোদের দিয়ে কিছু হবে না। শনিবার মঙ্গলবার মাছের জ্বর আসে জানিস। জলের কিনারায় এসে পড়ে থাকে।'

সূর্য উঠলে চিংড়ি মাছেরা জলের গভীরে নেমে যায়। তাদের আর দেখা পাওয়া যায়

না। সেই থেকে জানি শনি মঙ্গলবারে মাছের জ্বর আসে। দাদা জানে। গুহ্য কথা বলে দিলে আমরাও জানলাম। আবার কিছুদুর হেঁটে গেল। রাত থাকতেই বের হতে হয়। অন্তত সূর্যোদয়ের আগে জলার চারপাশটা ঘুরে দেখতে হবে। ভোররাতের অন্ধকারে দাদা টের যে পায় কি করে। গাছ পাতা জলে নড়ানড়ি করলেই নাকি টের পাওয়া যায়, তেনারা উঠে আসছেন। আবার ডাক। কাছে গেলাম। আমাদের দেখালেন কি করে ধরতে হয়। খুব সন্তর্পণে উবু হয়ে বসলেন। মাথার উপর গাছের ছায়া দূরে মশার শব্দ। হাতটা ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্ছেন। হাতের থাবায় পাতলা গামছা। এক হাতে গামছার শেষ প্রান্ত ঝুলিয়ে রেখেছেন। হাত ফসকালেও রেহাই নেই। জালি গামছায় বাছাধন আটকা পড়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য খপ করে মাছের মাথাটি চেপে ঠিক ধরে ফেলেছেন। আমরা সবাই ঝুঁকে পড়েছি।

'দেখলি! কত বড় দেখলি!'

তা ঠিক, মুগুরের মতো মাথা।

নিরাময়দাকে দেখলেই প্রতিবেশীরা বকত, 'নেশা বটে, এত রাতে বানা পেতে বসে আছিস! কিছু পেলি! সাপখোপের ভয় নেই!'

হেসে বলেন, 'না!'

কারণ তিনি জানতে দেন না, কোথায় কি মাছ মিলতে পারে। বড় ডুলায়, বড় বড় পাবদা মাছ তুলছেন আর ডুলায় বোঝাই করে ফেলছেন টের পেলেই ভিড় জমে যাবে। বানা পেতে তারাও চেষ্টা করবে আরও মাছ ধরার। নিরাময়দা স্বীকারই করে না, মাছ তার বঁড়শি কিংবা বানায় আটকে যাচ্ছে। মাছের ডুলাকানাও আড়ালে রেখে দেন। দেখলে মনে হবে মানুষটা কেবল বসে বসে প্রহর গুনছে মাছের আশায়। কেউ কেউ বলত, বেটা মাছই তোকে খাবে। সেই নিরাময়দাদা দামোদরদির হাট থেকে ফিরে কাকাকে বলেছিলেন, 'কর্তা মার 'জো' পড়বে। ধানের জমিতে মাছের আওয়াজ পেলাম। দেখা যাক কি মাছ? মনে হয় বিলে আটকা পড়েছে। নেমে যাবার পথ পাচ্ছে না।' কাকা বলেছিলেন, 'গতবারেতো কিছুই পেলি না, সারা রাত মশার আর জোঁকের কামড় খেলি।'

নিরাময়দা বললেন, 'মাছ হল গে আজব জীব কর্তা। তার সঙ্গে লড়ালড়ি। সে ধরা দেবে কেন সহজে। তবে জল নামছে। ঘাপটি মেরে থাকবে কোথায়! পোদ্দারদের ঝিলে আর কত ধরবে। কিছু তো জলের টানে নেমে আসবেই।'

কাকা হাসেন, নিরাময় মাছের চলাফেরার হাল হদিশ একটু বেশিই জানে।

'তুই কি বুঝলি!' কাকার প্রশ্ন।

'মনে হয় মণ খানেক ওজনের ঢাইন মাছটাছ হবে। ধান গাছ উথাল পাতাল। তা সাঁতার জলে নেমে যেতে সাহস পেলাম না। বিলের জল দু'লগি সমান। নৌকো নিয়ে ঘোরাঘুরি করলাম। টের পেলাম না। কোথায় যে তলিয়ে গেল।'

তা হেমন্তেও সেই বিশাল বিলে গভীর জল এবং পদ্মপাতায় ভরা। তবে খাল ধরে জল নেমে যেতে থাকলে, নদীর মাছ আর বিলে থাকে কি করে! নতুন বর্ষায় মাছের শরীর তাপে ভাপে জ্বলে না। আহা সেই সুমিষ্ট জলের স্বাদ পেতে আনন্দে তারা

দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে ধানের জমিতে, বিলের জলে, খালের জলে ঢুকে যায়। আর পাখনা নাড়ায়। লেজ ওড়ে। বর্ষায় মাছের এই মজা। কাকা বললেন, 'গজার মাছ টাছ হবে।'

'তা মনে হয় না। গজার মাছের গন্তব্যস্থল বিলের মধ্যে—এ মাছ নদীতে নামার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। পূর্ণিমা রাতে সে নেমে আসতে পারে। জোনাকি পোকা ধান গাছের মাথায় তখন ওড়াউড়ি করে না। পাতায় পাতায় বসে যায়। পোকামাকড়ের তল্লাসে, মাছেরও কম নেশা থাকে না।' আমরা রওনা হবার সময় কাকা বললেন, 'নিয়ে তো যাচ্ছিস। কার বাপের সাধ্যি আছে এদের সামলাতে পারে।'

আসলে নিরাময়দা চায়, তিনি কত বড় মাছ শিকারী তারা দেখুক।

যাবার সময় আর এক প্রস্ত হিসেব। কোচ। পাল। বানা। দড়ি। হ্যারিকেন। বস্তা। চাটাই। দেশলাই।

সারারাত কাবার হয়ে যাবে। মুড়ি পাটালি গুড় সঙ্গে। দুপুর নাগাদ এই করে গেল। খালে নৌকো। নৌকোয় তোলা হল সব। এমন কি মুড়ি পাটালি গুড়ও। দরকারে দামোদরদির বাজার আছে। ঘোষের দোকান আছে। ঠাকুর বাড়ির নামে এক পাতিল দই চাইলেও মিলে যাবে। আসলে কি মাছ তাই সংশয়।

'কত বড় মাছ নিরাময়দা!'

'জলের তলায়, আমি কি মেপে দেখেছি।'

'কেমন করে দেখলে।'

'ধানের জমিতে জলের পাক। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবি না। সব ধানগাছ নুয়ে পড়েছে। জলের তলায় তাণ্ডব—কিন্তু বুঝি কি করে কি মাছ!'

'কুমীর নয় তো!'

'তোরা কেন যে এলি! কুমীর ডাঙ্গায় উঠে বিলে পড়ে থাকবে।'

'না বলছিলাম, যা বলছ, তাতে হৃৎকম্প না শুরু হয়।'

'তোদের আসা ঠিক হয় নি। কুমীর নদীতে ভেসে আসে! সেই কবে একবার এসেছিল! বাবুরা কুমিরটাকে মারার কম চেষ্টা করে নি। পালের গরু নিয়ে চড়ায় টানাটানি শুরু করে দিল শেষে। দোষতো দেওয়া যায় না। বেচারা খাবে কি! মানুষ জলে নামে না, ডাঙ্গায় মানুষ লম্প নিয়ে পাহারা দেয়—খাবেটা কি।'

'তারপর কি হল!'

'গুলি।'

'কে করল!'

'বাবুরা। ধর্মনাশ বাবু। অবিনাশ বাবু। গুলি পিঠে লেগে গেল পিছলে। কিন্তু জেদ বটে। গরুর ঠ্যাং কামড়ে ধরে আছে। জলে নিয়ে নামাবে। নদীতে ডুবিয়ে, কুমীরের আস্তানায় তুলে নিয়ে যাবে। কুমিরও কামড় ছাড়ছে না বাবুরাও গুলি করে যাচ্ছে। ফুটছে। পিঠে গুলি লেগে পিছলে যাচ্ছে। বাবুরা সটাসট গুলি করে হয়রান। তাজ্জব হারাণ মিঞা। বলল, দ্যান দেখি বন্দুকখানা। ঠ্যাং কামড়ে আছে বলে কুমীরের চোখে গুলি করছেন না। ভগবতীর গায়ে না আবার গুলি লাগে। চোখে গুলি না করলে কুমীর

pathagar.net

মরে।'

ছোড়দা বলল, 'কুমীরের খুব শক্ত পিঠ না নিরাময়দা!'

'শক্ত মানে। কচ্ছপের দশগুণ। গুলি পিঠ ফসকে আগুনের গোলা হয়ে ওড়ে যায়। কিন্তু গুলিবিদ্ধ করা যায় না।

নৌকার পাল তুলে দেওয়া হয়েছে। পেরাব, পোনাব পার হয়ে মশাবর খাল। খালে খালে বিল। বিল পার হয়ে আবার খাল। খালে কোমর জল। নিরাময়দার হিসাব অনুযায়ী আজকের রাতটাই সেই কামাল করা মীনের শেষ রাত। যদি না নামে, তবে আর, নামা হবে না। বিলের জলে আটকা পড়ে পচবে নয় ধরা পড়বে। কার ভাগ্যে এত বড় শিকার আছে কে জানে! বুক জলে নেমে বাঁশের বান পুঁতে দিল নিরাময়দা।

আমরা মুগুর এগিয়ে দিলাম। আমাদের নৌকা নদীর চড়ায় তোলা। সামনে তাকালেই নদী। শেষ জোয়ার এটা খালে জল ঢুকছে। এই জোয়ারে যদি নেমে না যায়, আর এ-সালে খালে নদীর জল ঢুকবে না। বর্ষা না পড়লে নদী নালা ভেসে না গেলে অতিকায় মীনের প্রাণনাশ হবে। মাঠে মারা পড়বে—এটাই নিরাময়দার কষ্ট। নিরাময়দার হিসাবও তাই।

জলের সঙ্গে মাছের, মানুষের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। বানা পুঁতে দিল খাল বরাবর। বড়দা বলল, 'মাছটা বানায় এসে গোত্তা 'তা কে বলেছে, হরি বিশ্বাস! লাশ শনাক্ত হয়েছিল।'

'লাশ শনাক্ত করবেটা কে শুনি। ওর আর কে আছে! নিয়ে গেল লাশ। আমি তো দেখিনি। কে আর দেখতে যায়। চাউর হয়ে গেল হরি বিশ্বাস। আমারও ধারণা, হরি বিশ্বাস। তা মনে করলে, দোষের কি আছে! যার যেমন বিশ্বাস। ভূতের খবরদারি করলে, শেষে এই হয়। তুমি বুঝি চাও না, হরি বিশ্বাস বেঁচে থাকুক।'

'কে চায়। প্রতিপক্ষ বাঁচুক কে চায় রে! বেটার তো হদিস নাই। হদিস না পেলে লাশ হয়ে যাবে না। লাশ হয়ে গেলে সনাক্ত করে কচু হবে!'

'পঞ্চবটি বনে নতুন সাধুর খবর রাখ!'

'কে বলেছে!'

'বারে দু-সাল ধরে নতুন এক সাধুর আমদানি হয়েছে জান না।'

'এত বড় গুহ্য কথা, সেই তো।' বলে নিরাময়দা কেমন ফ্যাকাসে মুখ করে বসে থাকল।

রাত বাড়ছে। জোনাকি পোকা জ্বলছে। বড়দা মেজদা নৌকোয় চলে গেছে। আমি নিরাময়দাকে ফেলে যেতে সাহস পাচ্ছি না। হাজার হোক গুনিন সে। তুক তাক জানে। কুমীর অজগরের চেয়ে পঞ্চবটি জায়গাটা যে বেশি খারাপ এটা ঠিক মাথায় আছে।

হঠাৎ কে যেন কথা কয়ে উঠল।

'আরে নিরাময় না! তা খালে এতরাতে লন্ঠন জেলে আর বসে থাকতে সাহস পাবে। তাই হাঁটা দিলাম। পড়েছে কিছু।'

নিরাময়দা বলল, 'আমি ত চিনতে পারছি না।'

'তা পারবি কি করে! চুলে জটা। মুখে দাড়ি—গায়ে গেরুয়া—বুঝবি কি করে। নদীর

পারে শ্মশানে গিয়ে শেষে হাজির। তা পড়ল কিছু!'

'আশা করছি। শ্মশানে কেন!'

'নিরাপদ জায়গা। ভয়ে ডরে কেউ আসে না। গাজা ভাং-এর বড় অভাব। মাছ শিকার করে কুলাতে পারছিলাম না। তাই শেষমেশ শ্মশানে।'

নিরাময়দা বললেন, 'বস তবে। বিড়ি খাবা।' 'দে, খাই।' বলে বিড়িখানা ঠিক নিল। কিন্তু হারিকেন থেকে আগুন জ্বালার সময় দেখা গেল—সব ফুস ফাস। কেউ নেই।

আগুনের কাছে ভূত জব্দ।

নিরাময়দা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। দাঁড়াল। ছুটতে থাকল। কার পেছনে ছুটছে বুঝতে পারলাম না। ডাকছে, 'ও হরিদা, পালাচ্ছ কেন! তুমি কি জান ওটা কি মাছ। তুমিতো মাছের রাজা ছিলে!'

কোন সাড়া নেই।

আর তখনই বানা কেঁপে উঠল।

আমার গলা শুকিয়ে গেছে। হাত পা অবশ। কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। কুমির অজগর হলেও এত ভয় পেতাম না। বোধ হয় সংজ্ঞা হারাতাম—তখনই নিরাময়দা বলল, 'বুঝলি, বাপেরও বাপ আছে। ভয় পাস না। ও টসকে গেল। আমি ভয় পাই। বেটা কি ধান্দায় আছে বুঝতে পারছি না। দেখি কি হয়!'

আর কি হয়! 'আমি নৌকায় যাব। দিয়ে এস।'

কেন যে আসিস, বলে বিরক্ত মুখে বানার দিকে তাকাতেই দেখলাম, বেশ প্রসন্ন মনে হচ্ছে। ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে বললেন, 'এসে গেছে।'

তারপর বানা তোলপাড় করে উঠলে, মারলেন জোরে টেঁটাখানা। আর মনে হল, সেই চাঁদনী রাতে জল রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। আমার কেমন মাথা ঘুরতে থাকল। টেঁটাখানা চেপে ধরে আছেন নিরাময়দা। চোখ জ্বলছে। যেন কতকালের প্রতিশোধ নিচ্ছে—অথবা মীনের চলাফেরায় খুঁজে পেয়েছে অন্য এক মারবে। ভেঙ্গে ফেলবে নাতো।'

'খুব সোজা! কত শক্ত বাঁশ! দেখেছিস। মুগুরের ঘায়ে টসকাল না। সামান্য একটা মীন, তা দেড় দু'মণও হতে পারে—যাই হোক, আজ এসপার না হয় ওসপার হবে। হয় আমি থাকব নয় মীন থাকবে।' মেজদা বলল, 'বানার উপর দিয়ে টপকাবে।'

'তা কথার মতো কথা। দু-পাঁচ হাত উপর দিয়ে লাফ মারতে পারে। টেঁটাটা দেত দেখি।'

'কি করবে?'

টেঁটার তিনটে ফলা। লম্বা বাঁশের মাথায় খাপকাটা কাঁধে ঠেসে দেওয়া। সঙ্গে হাত পঞ্চাশের লম্বা দড়ি। টেঁটার ধার দেখে নিরাময়দা বলল, ঘচাং করে বিঁধে যাবে। লাফ মারলেই হল। টেঁটাখানা কার হাতে বুঝবি না!'

দূরে পঞ্চবটী শ্মশান। তার চালাঘর। ধোঁয়া উঠছে। আমার গা শির শির করতে থাকল ভয়ে। সবে সূর্যাস্ত হয়েছে। মাছেরাও দিন রাত বোঝে। পূর্ণিমা বোঝে। জোয়ার ভাটা বোঝে। দিন দুই আগে বিলের সেই অতিকায় মীন দেখে গেছে নিরাময়দা। তা

দু'ক্রোশের মতো বিলটার হয়ে জোয়ার ধরতে সময় লেগে যাবারই কথা। আর বিলের জল তো। কত মাছ, পাবদা, চাপিলা, পুঁটি, ট্যাংরা, কই, শিং-মাগুর—আহার পর্বটি খোশ মেজাজেই চালাচ্ছে। ঠিক করেছে, শেষ জোয়ারে নদীতে নেবে যাবে। জানবে কি করে একজন মনুষ্য টের পেয়ে গেছে, তার গতিবিধি। টের পেয়ে খালের জলে বানা পুঁতে দিয়েছে। যাবে তো যাও, বানা টপকে যাও।

যাবে তো যাও টেঁটার কামড় ফসকে যাও। তা ওস্তাদ শিকারী। টেঁটাখানা এখনও হাতে নিচ্ছেন না। নদীর বুক থেকে ঝপাং করে চাঁদ লাফিয়ে উঠে গেলে, আমরা বস্তা পেতে বসে থাকলাম। বানা থেকে খানিকটা দূরে। ঘাসে কুয়াশা জমছে। 'হুঁশিয়ার—নজর রাখবে।' নিরাময়দা উঠে দাঁড়ালেন। হাতে টেঁটা।

জলের তোড়ে বানা কাঁপছে। খালের এপাড় ওপাড় বানা পুঁতে দেওয়া। বানার কাছে ঘোরাঘুরি শুরু করলেই—জলের ঘাস নড়ানড়ি করবে। জলের উপর ঘাসের লম্বা ডগা ভেসে আছে। পূর্ণিমার রাত, বুঝতে কষ্ট হয় না—যে দিকে চোখ যায় নির্জন মাঠ। কিছু হাটুরে মানুষ খালের পাড় ধরে যাবার সময় বলল, 'নিরাময় না?'

'আজ্ঞে নিরাময় দাস।'

'মাছের গন্ধ পেয়েছ!'

'তা বলতে পারেন।'

'কি মাছ মনে হয়?'

'তাতো বলতে পারব না। অগাধ জলের মাছ, মাছ না অজগর। কে জানে।'

আমরা বললাম, 'ও নিরাময়দা, অজগর বলছ কেন?'

'হতেও পারে। কাছে ভাওয়ালের গড় আছে। মুসংয়ের পাহাড় আছে। বন জঙ্গলে কারা ঘুরে বেড়ায় কেউ বলতে পারে।'

'অজগর সাপ হলে কি করবে।'

'টেঁটায় গেঁথে ফেলব।'

বড়দা বলল, 'আমি নিরাময়দা নৌকায় চলে যাচ্ছি।'

মেজদা বলল, 'না, ওটা কুমীর হতে পারে।'

আমি বললাম, 'বড়দা দাঁড়া আমিও যাব।'

মেজদা বলল, 'তুমি সত্যি করে বল নিরাময়দা ওটা কি?'

'কুমীরও হতে পারে। দেখা যাক না।' বলে একখানা বিড়ি ধরালেন জুত করে।

'হরি বিশ্বাসকে কুমীরে খেয়েছে তবে!'

'বকর বকর করবি না। কুমীরের কম্ম নয় হরি বিশ্বাসকে গিলে খায়। হরি বিশ্বাসকে খেলে কুমীর নিজেই হজম হয়ে যাবে।'

প্রতিপক্ষকে—একজন পালাল, অন্যজন জলের তলায় বুড়বুড়ি কাটছে।

টেঁটার ডগা আমার হাতে দিয়ে বলল, শক্ত করে ধর। জলে নেমে যাচ্ছি। এত বড় ওজনের মাছ সামলাতে পারব না। নিরাময়দা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর যা দেখলাম, সেই এক লম্বা শিথিল লেজ তুলে মেঘের রঙ তার এবং গভীর জলের কোনো অতিকায় জন্তু না অজগর, না কুমীর বোঝা গেল না। বানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। কিসে যেন পেঁচিয়ে ধরেছে নিরাময়দাকে। জলের গভীরে লাল রক্তের সঙ্গে নিরাময়দা ভেসে চলে যাচ্ছে। একবারই দেখেছিলাম, তার দু-খানা পা জলের উপর ভেসে উঠেছে। আমি আর পারলাম না। নদীর কাছে নৌকায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আমার আর কোন হুঁস ছিল না।

শৈশবকালের অভিজ্ঞতা এটা আমার। এখনও মনে হয়, সব কিছুর মধ্যে কোন গোলমাল আছে। কাহিনীর মাথামুণ্ডু ঠিক যেন নেই। লোকটা কি সত্যি হরি বিশ্বাস। টেঁটায় গেঁথে গেছিল মাছ, না কুমীর, না অজগর। জ্যোৎস্নায় চরাচর কেমন এক অলৌকিক রহস্য সৃষ্টি করে ফেলেছিল। বোধহয় আমার মাথাও ঠিক ছিল না। তবে সপ্তাহখানেক বাদে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নিরাময়দা ফিরে এসেছিলেন। জলে ডুবে যাননি। ভাসিয়েও নেয়নি। মুখে শুধু রা ছিল না। কার কাজ জানি না। ভাবলে সব ব্যাপারটাই আমার কাছে এখনও ভুতুড়ে মনে হয়।

বার্লো সাহেবের বাংলো

নলিনী দাস

ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট্ট স্টেশনে ওরা মালপত্র নিয়ে নামতে না নামতেই ট্রেনটা ছেড়ে চলে গেল। জনমানবশূন্য প্ল্যাটফর্মের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মনোজ ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, 'ঠিক জায়গায় নেমেছি তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ ঐ সাইনবোর্ডে লেখাই রয়েছে তো পলাশপুর', বলল শান্তনু।

পার্থ জিজ্ঞেস করল, 'অঞ্জন কোথায়? সে যে লিখেছিল অবশ্যই স্টেশনে আসবে।'

সৌমিত্র আর শান্তনু অঞ্জনের নাম ধরে হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে। বেঁটেখাটো বুড়ো স্টেশন মাস্টারটি যেরকম নিশ্চিন্তভাবে ঘরে তালা দিয়ে রওনা দিলেন, বেশ বোঝা গেল যে তিনি কেউ আসবে বলে মনে করছেন না। কালো কোট গায়ে লণ্ঠন হাতে যে রোগা লম্বা লোকটি এগিয়ে এল, ছেলেরাও তার দিকে এগিয়ে গেল দু'চার পা। সে কিন্তু ওদের দিকে না তাকিয়ে একমাত্র বেঞ্চটি দখল করে পা তুলে বসে বিড়ি ধরাল একটা।

'ও ভাই শুনছ? অঞ্জন বসুকে চেনো? তাকে আসতে দেখেছ আজ?'

'আনজান বাসু? উ কৌন আছে? হামি তো চিনে না।'—লোকটি বলল বাংলা হিন্দির এক বিচিত্র সংমিশ্রণে।

'খেলে যা!' বলল পার্থ, কিন্তু সৌমিত্র দমবার পাত্র নয়, বহু কষ্টে অঞ্জনের লম্বা-চওড়া চেহারা, তার শালকাঠ চালান দেবার কারবার, সে যে এখানে মাত্র কয়েক মাস হল এসেছে, সব কিছু বলে লোকটিকে বোঝাতে লাগল।

ঢ্যাঙা লোকটি বলল, 'হাঁ হাঁ, গাছকাটা বংগালী বাবুকো তো জরুর চিনে, রুমনী নদীকো ধারে ডিংলা পাহাড়ে ওর ডেরা—লেকিন ওকে তো দেখে নি আজ।'

'অঞ্জনের চিঠিতেও ঐ রকম বর্ণনাই ছিল। চল্ না রওনা দিই—যেতে যেতে মাঝপথে ওকে পেয়ে যাব।' বলল শান্তনু। মনোজের মনটা তবু খুঁত খুঁত করছে, 'তুমি চল না ভাই সঙ্গে'—ঢ্যাঙাকে বলল, 'আমরা নতুন লোক, যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলি?'

'হামি তো ডিউটি ছোড়ে যেতে পারব না বাবু!'

'তবে আর কাউকে ডেকে সঙ্গে দাও না—সন্ধ্যা হয়ে গেছে'—

'হাঁ হাঁ বাবু, সোনধে হইয়েছে, আপলোক আজ টিশনমে থাক, কাল ফজিরে কোই লড়কা সাথে যাবে।'

'খেলে যা!' আর একবার বলল পার্থ, 'যা-না স্টেশনের ছিরি!' 'এখানে তো ভাই ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম নাই—থাকব কি করে?' বলল শান্তনু ; সবাই হেসে উঠল।

মনোজ আবার বলল, 'চল না ভাই সঙ্গে। বক্‌শিস দেব।'—লোকটা বোধ হয় চটেছিল, গজগজ করে বলল, 'কেয়া বকশিস দেবে বাবুজি? সও রুপেয়া দেনেভি ওদিকে কেউ যাবে না সোন্‌ধে বেলা।' মনোজ ভয় খেয়ে প্রশ্ন করল, 'কোনো ভয়ের কারণ আছে নাকি ভাই?' 'ধুত্তেরি তোদের ভয় আর তার কারণ।'

শান্তনু আর সৌমিত্র নিজেদের মালটুকু কাঁধে ফেলে ততক্ষণে রওনা হয়ে পড়েছে। ঢ্যাঙা লোকটি তখনও বিড়বিড়ি করছে—'শেষে যদি পাগলা সাহেবের হাতে পড়?'

মনোজকে থেমে পড়তে দেখে শান্তনু আর সৌমিত্র তাড়া লাগাল, 'একটু পা চালিয়ে চল ভাই! এখন তবু আলো আছে—শেষে বেশি অন্ধকার হয়ে যাবে।' পার্থ বলল, 'তা ছাড়া, অঞ্জন এলো না কেন? সেটাও তো খোঁজ করা উচিত তাড়াতাড়ি—ধর, যদি তার অসুখ বিসুখ হয়ে থাকে?'

অঞ্জন তার শেষ চিঠিতে এমন সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিল যে রাস্তা চিনতে একটুও অসুবিধা হল না। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা রাস্তা উত্তর দিকে বেঁকে লাইন বরাবর গেছে। তার ধারে কিছু দোকানপাট আর খোড়ো বাড়ি। অন্য পথটা সোজা ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমে চলে গেছে। দূরে গাছপালা, আরো দূরে ডিংলা পাহাড়, এদিকে কোনো লোকালয় চোখে পড়ে না।

মাঘ মাস শেষ হয়ে সবে ফাল্গুন শুরু হয়েছে। কলকাতায় এখন বেশ গরম পড়েছে। কিন্তু এই পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যাবেলা রীতিমতন শীত শীত লাগছে। সবে সূর্য ডুবছে দূরে ডিংলা পাহাড়ের পিছনে, কিন্তু তার রক্তিম আলোয় ধানক্ষেত, গাছপালা সবই যেন অপূর্ব সুন্দর, কেমন যেন রহস্যময় লাগছে!

যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি হেঁটেও কিন্তু রুমনী নদীর ধারে পৌঁছতে পৌঁছতে রীতিমতন

অন্ধকার হয়ে গেল।

পার্থ বলল, 'রাস্তাটা যে সোজা নদীর জলে নেমেছে, কি হবে?' 'সেই রকমই তো লিখেছিল অঞ্জন।' বলল সৌমিত্র, 'ভয় নেই,—ঐ দেখ পূর্বদিকে কত বড় চাঁদ উঠেছে। নদীতেও এখন জল নেই বললেই হয়। সহজেই যেতে পারব।'

জুতো খুলে, প্যান্টের পা গুটিয়ে ওরা সাবধানে নদী পার হল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল পথটা আবার নদী থেকে উঠে পাহাড়ের দিকে চলেছে। 'খেলে যা' বলল পার্থ আবার! 'এদিকে লোকালয় কোথায়? কেমন যেন ভুতুড়ে—'

'ভীতুরাম!' বলে মনোজকে এক ধমক দিতে যাচ্ছিল শান্তনু, কিন্তু হঠাৎ একটা বিকট 'হা-হা-হা-হা' শব্দে তার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল,—গা ছম-ছম-করা ভুতুড়ে হাসি!

'ও-ওটা কি-কি-রে?' ভীত কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করল মনোজ।

'পাগলা সাহেবের ভূত!' ফিসফিস করেই বলল পার্থ।

চাঁদের আলোয় ওরা দেখতে পেল বাঁ দিকে একটা ছোট্ট বাংলো আর তারপর অনেক দূরে, ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে একটা বড় বাড়ির আভাস।

'ওটাই নিশ্চয় অঞ্জনের বাড়ি—ঠিক যেমন বর্ণনা দিয়েছিল'—

'সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আলো জ্বলেনি কেন? আশ্চর্য!'

'বেচারার শরীরটরির হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ল নাকি?'

'অঞ্জন! কোথায় রে—আমরা এসে গেছি!'

অঞ্জনের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, কিন্তু সকলের হাঁকডাকে ঘরের ভিতর থেকে একটা কালো কুকুর বেরিয়ে কান পিছনে দিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করল, 'ঔ-ঔ-ঔ—'

'আরে, ঐ নিশ্চয় অঞ্জনের কেলো—আয়, আয়, কেলো, কেলো!'

ডাক শুনে কেলো এগিয়ে এলো, গুটানো ল্যাজের ডগাটা একটু নাড়িয়ে বলল, 'ভুক! ভুক!'

'দেখেছিস—নাম শুনেই কাছে এসেছে!'

'অঞ্জন? অঞ্জন কোথায় রে কেলো?'

অঞ্জনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সবাই ঘরে ঢুকল।

ছোট্ট বাংলো। সামনে পিছনে একটু বারান্দা, ছোট ছোট দুটো ঘর। একটা ঘরে তিনটে খাটিয়া পাতা, অন্য ঘরে দুটো, আর কিছু অন্য আসবাব। একটা খাটিয়ায় বিছানা পাতা। কিন্তু কোনো ঘরে কেউ নেই। বারান্দাতেও না।

'দেখেছিস? আমাদের শোবার ব্যবস্থা রেডি।'

'কিন্তু অঞ্জনের পাত্তা নেই—আশ্চর্য তো!'

টর্চের আলোয় পার্থ একটা লণ্ঠন আবিষ্কার করে জ্বালাতেই সব কিছু স্পষ্ট দেখা গেল। দেয়াল আলনায় কিছু জামাকাপড়, তাকে বাসনপত্র, আর একটা জালের আলমারি; খুলে দেখা গেল—রুটি আর কলা রয়েছে। একটিন মাখনও।

'উঃ, খিদেয় পেট জ্বলে গেল!—আয় নিজেরাই নিজেদের প্রতি আতিথেয়তা করি।'

বাসনপত্রের হাঙ্গামা না করে ওরা হাতে হাতেই রুটি মাখন কলা তুলে নিয়ে খেতে

লাগল।

কিছুক্ষণ পরে পার্থ বলল, 'পেটটা তো ঠাণ্ডা হল, এবার মাথা ঠাণ্ডা করে বলো দেখি, ব্যাপারটা কেমন বুঝেছিস?'

'অঞ্জন আমাদের জন্য খাবার, শোবার ব্যবস্থা করেছিল। এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।'

'আমাদের আনতে সে স্টেশনে যাবে লিখেছিল, হয়তো গ্রামে কিছু কিনতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছে। যার ফলে আমাদের ধরতে পারেনি।'

'খুব অদ্ভুত কথা!—ঐ তো পাশেই ছোট্ট গ্রাম, রেল লাইনের ধারে—ট্রেন আসবার পরে দৌড়ে এলেও আমাদের ঠিক স্টেশনে পেয়ে যেত।'

'যদি কোনো কারণে একটু দেরি করে ফেলে থাকে—চল না একবার স্টেশনে আর গ্রামে খোঁজ করে আসি।' বলল, শান্তনু।

'বাপরে, এই রাত্রে নির্জন পথে আবার?—আমি ওর মধ্যে নেই।' খাটিয়ায় পা তুলে গুছিয়ে বসল মনোজ।

'তা ছাড়া তোর যুক্তিটাও ঠিক নয়।' বলল, সৌমিত্র। 'যদি একটু দেরী করে ফেলেও থাকে, তারপর ঢ্যাঙাকে জিজ্ঞেস করলেই তো জেনে যেত যে আমরা তার বাড়ির পথে রওনা দিয়েছি। কাল সকালের আগে অন্য ট্রেনও নাই যে পরের গাড়ির জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করবে।'

'গ্রামে না গিয়ে যদি অঞ্জন এদিকেই কোথাও গিয়ে থাকে?'

'কোথায় যাবে শুনি? সে তো লিখেছিল যে কিছুদুরে একটা পোড়ো বাংলা ছাড়া এ তল্লাটে কোনো ঘরবাড়ি নাই।'

'কেলোকে জিজ্ঞাসা করো না—সে নিশ্চয় অঞ্জনের ঘর জানে।'

কেলো দরজার কাছে বসে ছিল, ওরা যতক্ষণ খাচ্ছিল, সে ওদের ছুড়ে দেওয়া ছোট্ট ছোট্ট রুটির টুকরো খাচ্ছিল আর ল্যাজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিল। নিজের নাম শুনে আবার ঘন ঘন ল্যাজ নাড়ল। শান্তনু একটা মস্ত বড় রুটির টুকরো দিতেই কেলো সেটা মুখে তুলে নিল কিন্তু না খেয়ে হঠাৎ পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে সাঁই সাঁই করে ছুটে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

'গেল কোথায় ব্যাটা?'

নিজের পেট তো ভরেছে এবার ছেলেমেয়েদের জন্য খাবার নিয়ে গেল।'

সৌমিত্রের কথায় সবাই হেসে উঠল।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা হ'ল। তবু অঞ্জনের দেখা নেই। সকলেরই মনে উৎকণ্ঠা, কি হল ছেলেটার? দূরে আবার সেই 'হা-হা-হা-হা' হাসির শব্দ শোনা গেল। মনোজ তাড়াতাড়ি উঠে দরজা দুটো বন্ধ করল।

ক্রমে রাত আটটা হল, নটা হল! একটা স্টোভ দেখতে পেয়ে সেটা জ্বেলে, ছেলেরা আলমারি থেকে চাল, আলু ডিম বার করে রান্না চড়িয়ে দিল।

ক্রমে রাত দশটা বেজে গেল, ক্লান্ত ছেলেরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু উদ্বেগে ঘুম আসতে চায় না।

পালা করে জেগে থাকা স্থির করেও এক সময়ে সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাতে দু-একবার দূরে কোথাও সেই 'হা-হা-হা-হা' শব্দ শোনা গেল। দু-একবার মনে হল কেউ যেন বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিল। অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থাতেই পার্থ বলল, 'খেলে যা।' কিন্তু কারো ঘুম ভাঙলো না পুরোপুরি।

ছোটবেলা থেকেই স্কুলে এক সঙ্গে পড়েছিল অঞ্জন, পার্থ, মনোজ, শান্তনু আর সৌমিত্র! পাঁচজনের পরস্পরের মধ্যে ভাব দেখে অন্যান্য বন্ধুরা ওদের ঠাট্টা করে বলত 'পঞ্চ পাণ্ডব'।

প্রথম ছাড়াছাড়ি হলো হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ করবার পরে অঞ্জন ওদের মত বি.এ, বি.এস.সি ক্লাসে ভর্তি হল না, একটা 'টিম্বার' কোম্পানীর চাকরী নিয়ে কলকাতা থেকে অনেক দূরে নির্জন গণ্ডগ্রাম পলাশপুরে চলে গেল। তবু যোগাযোগ রইল চিঠিপত্রের মাধ্যমে—অঞ্জন বার বার তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ জানাল তার কাছে এসে কিছুদিন থেকে যাবার জন্য। বার বার চিঠি লিখতে লাগল—'এটা কোন নাম করা স্বাস্থ্যনিবাস নয়। কিন্তু কি যে সুন্দর এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আর মিষ্টি কুয়োর জল, সে তোরা নিজেরা না দেখলে বিশ্বাস করবি না। লোকালয় থেকে অনেক দূরে ডিংলা পাহাড়ের কোলে শালবনের ধারে। রুমনী নদীর বাঁকে আমার ছোট্ট বাংলোটা ছবির মত সুন্দর। মনোজ এখানে এলে তো দূর গ্রামের ওপারে সূর্যোদয় আর ডিংলা পাহাড়ের পিছনে সূর্যাস্ত দেখে একখানা কবিতা লিখে ফেলবে। পার্থ লিখবে গল্প। আরো আছে। কিছু দূরে সেই বিখ্যাত বার্লো সাহেবের পোড়ো বাড়িকে কেন্দ্র করে সে এক রহস্য—না থাক, আগে থেকে ফাঁস করব না। তোরা সবাই এলে দল বেঁধে উদঘাটন করা যাবে। তাড়াতাড়ি চলে আয়।'

pathagar.net

এই চিঠি পেয়ে শান্তনু আর সৌমিত্র তো রওনা হতে প্রস্তুত। কিন্তু সাবধানী ছেলে, সব ব্যবস্থা করে চিঠিপত্র লিখে আসতে আসতে ফাল্গুন মাস পড়ে গেল।

শেষ চিঠিতে অঞ্জন লিখেছিল ভালোই হল। ফাল্গুন মাসটা এখানে থাকলে বুঝবি যে পলাশপুর নামের সার্থকতা। শুনেছি তখন নাকি পাহাড়ে-বনে বনে যেন আগুন লেগে যায়! তা ছাড়া ফাল্গুন মাসে সর্দার দেশে যাবে, সুতরাং ক'দিন কাজ বন্ধ রেখে ছুটি করে নিয়ে আমিও তোদের সঙ্গে বেরিয়ে বেড়াব। সেই সময়েই সেই রহস্য উদঘাটন করা যাবে'—

বেশ কিছুক্ষণ ধরে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল।

ঘুম-জড়ানো গলায় সৌমিত্র জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

কোনো উত্তর নেই। কিছুক্ষণ পরে আবার দরজায় ধাক্কা।

শান্তনুকে উঠতে দেখে মনোজ শুয়ে শুয়ে বলল, 'ফস করে দরজা খুলিস না, যদি পাগলা সাহেবের ভূত এসে থাকে?'

'ওসব ভূত প্রেতকে আমি গ্রাহ্য করি না'—বলে শান্তনু একটা ডাণ্ডা বাগিয়ে ধরে দরজাটা খুলে দিল, সঙ্গে সঙ্গে কালো কুকুরটা ঘরে ঢুকে এসে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

'ওরে কেলো! তুই ভোর না হতে আমাদের ঘুম ভাঙাতে এসেছিস? অঞ্জন

কোথায়? রাত্তিরে তুই কোথায় ছিলি?'

ল্যাজ নেড়ে নেড়ে কেলো বলল, 'ভুক ভুক ভুক।' বাইরে ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটেছে, শালবনে নাম না জানা পাখি ডাকছে এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি সবাই স্টোভ জ্বেলে চা করল। আবার ডিম রুটি কলা-ই পেট ভরে খেয়ে নিল। কেলোও প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হল না। সব শেষে বড় এক খণ্ড রুটি দিতেই কেলো আগের দিনের মতন রুটি মুখে দৌড়ে পালাল।

'দ্যাখ, দ্যাখ কেলো কোথায় গেল!'

কিন্তু জুতো পরে বেরুতে বেরুতে সে অনেক দূর চলে গেছে—দূর থেকে দেখা গেল একটা বড় পোড়ো বাংলো, তার আশে পাশে ঝোপঝাড়, তার ভিতরে কুকুরটা ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ওটাই নিশ্চয় সেই বার্লো সাহেবের বাংলো, যার কথা অঞ্জন অমন রহস্য করে লিখেছিল।'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সবাই চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখল। কিন্তু অঞ্জনের জন্য একটা দারুণ উদ্বেগের জন্য তেমন উপভোগ করতে পারল না।

শান্তনু বলল, 'আমার মনে হয় ঐ পোড়ো বাড়ির মধ্যেই অঞ্জনের নিরুদ্দেশ হবার রহস্য খুঁজে পাওয়া যাবে।' সৌমিত্র বলল, 'ঐ বাংলোটা আমাদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু তার আগে গ্রামে গিয়ে অঞ্জনের বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখা দরকার।'

boiRboi.net

সমস্ত সকাল স্টেশনে আর গ্রামে ঘুরে, বহুজনকে প্রশ্ন করে, ছেলেরা কিছু সংবাদ কিছু রসদ আর অনেকখানি দুশ্চিন্তা সংগ্রহ করে যখন বাংলোয় ফিরলো তখন বেলা প্রায় এগারটা। বোঝা গেল অঞ্জনকে সবাই চিনত, কিন্তু সে কারো অন্তরঙ্গ ছিল না। তার বন্ধুরা আসবে, সে কথা সবাই জানত, অঞ্জনকে খাটিয়া ভাড়া করতে, খাবারদাবার কিনতে দেখেছে অনেকেই। 'কাল বিকেলে কি অঞ্জন স্টেশনে এসেছিল।' এই প্রশ্নের সদুত্তর কিন্তু দিতে পারল না কেউ।

বার্লো সাহেবের বাংলোর ইতিহাস শোনাল অনেকেই। বহু বছর আগে ঐ বাংলোটা তৈরী করেছিল এক খামখেয়ালি সাহেব, মিস্টার বার্লো। তখন ঐ সব এলাকায় আরো অনেক শালবন ছিল, বড় বাঘ না হোক, হায়না, চিতা আর নেকড়ে হামেশাই দেখা যেত, বসন্তকালে মহুয়া খাবার লোভে ভাল্লুক আসত। দিনের বেলাও দল বেঁধে ছাড়া, ওদিকে যেতে ভয় পেত লোকে। কিন্তু সাহেব দিব্যি একা একা সারাদিন পাহাড়ে, বনে আর রুমনী নদীর ধারে ধারে হ্যাটকোট পরে ঘুরে বেড়াত।'

'এ সব কত বছর আগেকার কথা?' জিজ্ঞেস করতে সবাই বলল যে তারা কেউ বার্লো সাহেবকে দেখেনি। কেউ নিজের দাদামশাই কেউ বা ঠাকুদাদার কাছে গল্প শুনেছে। শুনে শুনে বার্লো সাহেবের নানা গল্প তাদের চোখে দেখা ঘটনার মতো সত্যি হয়ে উঠেছে।

তারপর ঝগড়ু একদিন বুড়ো হয়ে গেল। তখন বার্লো সাহেব তার ছেলেকে কাজে লাগালো, কিন্তু তাকেও সে ঝগড়ু' বলে ডাকতে লাগল। গ্রামের লোকে বলত, 'দ্বিতীয়

ঝগড়ু'। যত বুড়ো হতে লাগল, সাহেব ততই খামখেয়ালি হয়ে পড়ল। লোকে বলতে শুরু করল, 'পাগলা সাহেব'। অবশেষে কোনো একদিন যখন পাগলা সাহেব মরে গেল তখনও তার দেশের লোক কেউ তার কাছে এল না। দ্বিতীয় ঝগড়ুই কোনো মতে বাংলোর কাছেই তাকে কবর দিল। সেই থেকেই বাংলোটা খালি পড়ে আছে। লোকে বলে যে উপযুক্ত সৎকার না হবার জন্যই হয়তো পাগলা সাহেবের ভূত এখনও সেখানে ঘুরে বেড়ায়। মাঝরাতে তার 'হা-হা-হা-হা' হাসি দূর থেকে শুনেছে আর জ্যোৎস্নারাতে তার হ্যাট-কোট পরা মূর্তি দূর থেকে দেখেছে কোনো কোনো দুঃসাহসী যুবক—কিন্তু কাছে যাবার সাহস ছিল না কারো।

ক্রমে দ্বিতীয় ঝগড়ুও বুড়ো হয়ে মরল। তাদেরই বাড়ির একটি খামখেয়ালি ছোকরা তারপর বার্লো সাহেবের বাংলোর বারান্দায় বাসা বেঁধেছিল, নিজের নাম বলত 'ঝগড়ু', লোকে বলত 'তৃতীয় ঝগড়ু।' তার যে কি হল কেউ জানে না, কিন্তু কিছুদিন হল আর এক ব্যক্তি নিজেকে 'ঝগড়ু' বলে পরিচয় দেয়। কেউ বলে সে তৃতীয় ঝগড়ুর পালিত ছেলে, কেউ বা বলে এমনি পরিচিত লোক। এর মাথাটা রীতিমত খারাপ, কোথায় কেউ জানে না, মধ্যে মধ্যে গ্রামে এসে ভিক্ষে করে। আবার ডুব মারে। লোকে তাকে বলে 'চতুর্থ ঝগড়ু' বা 'পাগলা ঝগড়ু'। বার্লো সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করলে সে কখনও সেলাম ঠুকে বলে 'সায়েব সগ্‌গে গেছে, আবার কখনো বার্লো সাহেবের জন্য খানা বানাতে হবে—গুড, গুড!' বলে বিচিত্র ভঙ্গীতে নাচে।

ছোট বাংলোটা বানিয়েছিল এক টিম্বার কোম্পানী। কিন্তু ভূতের ভয়ে কেউ সেখানে থাকত না বলে এতদিন সেটা খালিই পড়ে ছিল। এখন তাদের নতুন কর্মচারী অঞ্জন এসে সেটাই দখল করেছে।

বৃদ্ধ স্টেশন মাস্টারটি আক্ষেপ করে মাথা নেড়ে বললেন—'বহু বছর পড়ে ছিল মশাই, আর আপনাদের বন্ধুর কিনা সেই বাংলোই ভাড়া নেওয়া চাই! আমি পই-পই করে বারণ করলাম—কিন্তু সে গোঁয়ারগোবিন্দ ছোকরা কি শুনল? গ্রামের মধ্যে থাকলে তবু দিনান্তে একটা বাঙালীর মুখ দেখতাম। এখন খুঁজে দেখুন—'

ভারাক্রান্ত মনে ছেলেরা ফিরে চলল। রুমনী নদী পার হয়ে বাংলোর দিকে তাকিয়ে পার্থ বলল, 'বারান্দায় কারা বসে আছে?' কাছে যেতে দেখা গেল বিচিত্র বর্ণের ছেঁড়া শার্ট ও সবুজ লুঙ্গি পরা একটা লোক কেলোর গলা জড়িয়ে ধরে বসে আছে, তার নিজের গলায় ও মাথায় আর কেলোর গলায় রঙবেরঙের বুনো ফুলের মালা।

দূর থেকে ছেলেদের দেখেই লোকটি বলে উঠল—'এসে গেছে? গুড—গুড! ইয়েস-নো—ভেরি গুড!'

'ঐ নিশ্চয় সে পাগল—চতুর্থ ঝগড়ু!'

'চল ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।'

ছেলেরা কাছে আসতেই ঝগড়ু একগাল হেসে বলল, 'খাবার এনেছ! গুড! ঝগড়ু খাবে হি-হি-হি!' বলেই সে হেলে দুলে নাচতে শুরু করে দিল।

'হ্যাঁ—হ্যাঁ খাবে বৈকি, কিন্তু ঝগড়ু ভাই আমাকে যে ক'টা কথার জবাব দিতে হবে আগে।—পারবে তো?'

'হেঁ—কেন পারব না। আমি তো সব কিছু জানি—'

'বল তো অঞ্জন কোথায় গেছে?'

'হেঁ হেঁ আমি অঞ্জনবাবুকে জানি—সেই গাছ-কাটা বাঙালীবাবু। বার্লো সাহেবকে জানি, সেই যে পাগলা সাহেব নদীর ধারে হীরে মুক্তো খুঁজে বেড়ায়—'

'চেন তো অঞ্জনকে? এখন বল তো দেখি সে কোথায় গেছে?'

'সে তো সগ্‌গে গেছে।' বলেই পাগল একটা সেলাম ঠুকল। ওদের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল, 'অঞ্জন সগ্‌গে গেছে।'

'না না—সে তো গাছ কাটা বাঙালী বাবু। সাহেব সগ্‌গে গেছে। কিন্তু রোজ নদীর ধারে হীরে মুক্তো খোঁজে—'

হাজার জেরা করেও পাগলার কাছে থেকে এর চাইতে বেশি কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেল না। একটা শালপাতায় তাকে ভাত দিয়ে, ছেলেরা নিজেরা খেয়ে নিল। কেলো কিন্তু ভাত খেয়ে সন্তুষ্ট নয়। কেবল একটু একটু ল্যাজ নাড়ে আর ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কুঁই কুঁই করে আবেদন জানায়। হাসতে হাসতে মনোজ বলল, 'নিজে খেয়ে এখন স্ত্রী পুত্রের জন্য খাবার চায়।'

বড় এক খণ্ড রুটি ছুঁড়ে দিতেই সত্যিই কেলো না খেয়ে মুখে নিয়ে তীর বেগে পোড়োবাড়ির দিকে ছুটে চলে গেল।

'এইবার চল আমরাও পোড়োবাড়িতে অনুসন্ধান চালাই—আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ঐ বাড়িতেই মূল রহস্যের চাবিকাঠি পাব।' সৌমিত্র বলল, 'কিন্তু বড় জটিল রহস্য ভাই! আগে মনে মনে একটু ভাল করে সব ব্যাপারাটা বুঝে নেওয়া দরকার।'

সবাই বলতে লাগল আর পার্থ কাগজ কলম নিয়ে সব লিখতে লাগল।

প্রথমতঃ অঞ্জন নিজেই লিখেছিল যে এখানে একটা কিছু দারুণ রহস্য আছে, সবাই মিলে তার সমাধান করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ অঞ্জন আমাদের স্টেশনে আনতে যাবে বলেছিল তা তো যায় নি, উপরন্তু কাল থেকে তার বাড়িতে বসে আছি—এখন পর্যন্ত তার পাত্তা নেই।

তৃতীয়তঃ আমরা এই বাড়ির কাছাকাছি আসবার পর থেকে কয়েকবার একটা বিদঘুটে হাসির শব্দ শুনেছি।

'লিখে দে গ্রামের লোকে বলে যে ওটা ভূতের হাসি।'

'না না আমরা প্রথম থেকেই ভূত টুত কিছু ধরে নেব না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে অনুসন্ধান চালাব।'

'তা হলে লেখ যে সেই ঢ্যাঙা লোকটার দারুণ ভয়—'

'শুধু ঢ্যাঙা কেন, অনেকের মনেই তো দারুণ ভূতের ভয়। বেশ তা হলে লিখলাম যে গ্রামের সকলের মতে বার্লো সাহেবের পোড়োবাড়িটা ভূতের বাড়ি। চতুর্থতঃ।'

'তারপর লেখ্‌ যে কেলো রুটি না খেয়ে মুখে করে ঐ বাড়িটাতে নিয়ে যায়—কেন যায়? ভূতে কি রুটি খায়?'

'যাঃ যাঃ—এর মধ্যে কোন রহস্যই নেই—খুঁজে দেখিস ঐ পোড়ো বাড়িটাতে কেলোর দেড়গণ্ডা পুত্রকন্যা আছে।'

'তা হলে লেখ পঞ্চমতঃ ঝগড়ু বলেছে যে বার্লো সাহেব নদীর ধারে আর শালবনে হীরে মুক্তো খোঁজে।'

'পাগলে কিনা কয়—এটাও লিখলাম না' বলল—পার্থ।

অন্যরা যতক্ষণ রহস্যের তালিকা তৈরী করছিল সৌমিত্র অঞ্জনের টেবিল, বিছানা, বাক্স ঘেঁটে দেখছিল কোথাও কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি না। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো—'এই তো—এটাই এতক্ষণ খুঁজছিলাম!'

'কি রে? কি ব্যাপার?'

অঞ্জনের ডায়েরি। মনে নেই তার ডায়েরি লেখার বাতিকের কথা? সব কথাই লিখে রাখা চাই—'

একটা বাঁধানো লাল খাতা—প্রথম পৃষ্ঠায় নিজের নাম, ঠিকানা আর '১৯৭৬' লেখা, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে দিনলিপি শুরু হয়েছে। যা-যা ঘটেছে সবই অঞ্জন তারিখ দিয়ে পর পর লিখে গেছে। তার নতুন বাড়িতে আসা, বুড়ো স্টেশন মাস্টার আর গ্রামের অন্যান্য লোকের ভয় দেখান, পাগলা সাহেবের হাসি শোনা, পাগলা ঝগড়ুর সঙ্গে পরিচয়, কেলোকে সংগ্রহ করা—সবই লিখে গেছে পর পর। বন্ধুদের আসার কথাও লিখতে ভোলেনি।

সবাই আগ্রহের সঙ্গে অঞ্জনের ডায়েরি পড়তে লাগল যদি তার মধ্যে কোনোরকম সূত্র আবিষ্কার করা যায়।

দূর থেকে পাগলা সাহেবের ভূতকেও দেখেছিল সে, কিন্তু ভয় পায় নি। বরঞ্চ কেমন যেন একটা অদম্য আকর্ষণ বোধ করেছিল সেই পোড়োবাড়ির রহস্য সমাধান করবার জন্য! শীতের রাতে বার বার ভূতের হাসি শুনে বাইরে বেরনোর জন্য জ্বর এসে গেছিল অঞ্জনের, সেই জ্বরের ঘোরে সে কি স্বপ্ন দেখেছিল? নাকি সেটা অসুস্থ মনের বিকার? না সত্যিই কোনো 'সাহেব' তাকে দেখা দিয়েছিল? অঞ্জন লিখেছে যে সেই ছায়ামূর্তি তাকে বার বার পোড়োবাড়িতে ডেকেছে। হীরে জহরতের কথা সেকি বলেছিল? ভালো করে বোঝা গেল না। শেষ লেখাটা—'১৬ই ফেব্রুয়ারী! আজই ওরা আসবে। যদিও আমার শরীরটা এখনও সারে নি, তবু স্টেশনে যেতেই হবে নইলে নতুন জায়গায় পথ চিনে আসতে ওদের কষ্ট হবে। ওদের সঙ্গে নিয়ে কাল সকালেই পোড়োবাড়িটায় তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখব সত্যি কোনো রহস্য আছে কিনা সেখানে। কিন্তু আজকেই যে একবার ঘুরে দেখে আসতে ইচ্ছা করছে! যাব নাকি?'

এর পরে আর কোনো কথা লেখা ছিল না। ডায়েরিটা যেন বড় হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। হয়তো ১৬ই আরো কিছুটা লিখবে ভেবেছিল তাই সেদিনের লেখাটা কেমন যেন খাপছাড়া। অসম্পূর্ণ লাগছে।

চিন্তিতভাবে পার্থ বলল, 'এও তো এক রহস্য! কালই লিখছে অঞ্জন আমাদের আনতে স্টেশনে যাবে—কিন্তু গেল না কেন?'

'তার চেয়ে বড় রহস্য গেল কোথায় সে?'

শান্তনু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জুতো পরে নিল 'রহস্য কি রে? নিশ্চয় সে অসুস্থ শরীরেই পোড়োবাড়িতে গিয়েছিল, বেশি দুর্বল হয়ে পড়ার জন্য ফিরতে পারে নি—২৪

ঘণ্টা হতে চলল, জলদি চল্ এখনই তাকে ফিরিয়ে আনি।'

ব্যস্তভাবে সবাই তাড়াতাড়ি পোড়োবাড়ির দিকে চলল। কোনো রাস্তা ছিল না—পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে পায়ে চলার পথের মতো ছিল একটা। জায়গায় জায়গায় ঝোপ আর ঝাউগাছ, কোথাও কালো কালো পাথরের স্তূপ।

পোড়োবাড়িতে ঢোকাটা কিন্তু সহজ হল না। সমস্ত দরজা-জানালা শক্ত করে বন্ধ, ঠেলাঠেলিতেও খুলতে চায় না। সব কটা দরজাই ভিতর থেকে বন্ধ হতে পারে কি করে? হয়তো আসলে বন্ধ নয়, বহু বছর না খোলার জন্য এঁটে গেছে।

তাহলে অঞ্জন ভিতরে ঢুকল কি করে?

বাড়ির চারিদিকে ঘুরে দেখেও সমস্যার সমাধান হল না। পিছন দিকে ঝোপঝাড়, খানাখন্দ বেশি, দুতিনটে নালার মত বাড়ির কাছ পর্যন্ত এসেছে। মনে হয় বর্ষার সময়ে সব জল গিয়ে নদীতে পড়ে ঐ সব নালা দিয়েই।

বহু কষ্টে বাড়ির পিছনে গিয়ে মনে হল একটা জানলা খুব নড়বড়ে। গায়ের জোরে চার বন্ধু ধাক্কা মারতেই একটি পাল্লা ভেঙে গেল। শান্তনু হামচে খামচে সেই জানালা দিয়ে ঢুকে পাশের ছোট ঘরটার দরজা খুলে দিলে, সবাই বাড়ির ভিতর ঢুকল। ওরা ধরে নিয়েছিল যে অঞ্জন বাংলোর মধ্যেই কোথায় শুয়ে আছে, তাই তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এঘর ওঘর ঘুরতে লাগল। কিন্তু কোথায় অঞ্জন? সব কটা ঘরই খালি পড়ে আছে। ঘরের সংখ্যা খুব বেশি নয়—মাঝখানে একটা খুব বড় আর ধুলোয় ভরা পোকায় কাটা, জীর্ণ অবস্থা সমস্ত কিছুর। একপাশের ঘরে মস্ত বড় একটা খাট। এক সময়ে বিছানা পাতা ছিল, এখন পোকায় কেটে আর ধুলোয় মিশে সব ধুলো হয়ে গেছে, কিন্তু খাটের কাঠামোটা মোটামুটি ঠিক আছে। অন্য দিকের ঘরে ভাঙাচোরা আসবাব, বাক্স, কোদাল-খন্তা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, ভাঙা শিশিবোতল সব আবর্জনার স্তূপ হয়ে আছে। বাড়ির পিছনের দিকে তিন চারটে ঘর। বোধ হয় বাথরুম ছিল, একটা হয়তো ভাঁড়ার ঘর ছিল। দেয়াল জোড়া তাকে তখনও কিছু বাসন, টিন, বোতল সাজানো, কিন্তু সে ঘরের কাঠের মেঝে এমনই জীর্ণ যে পা দিলেই খচমচ করে উঠল, সুতরাং ঘরে ঢোকা গেল না।

বহুক্ষণ ধরে সব কটা ঘর খুঁজে, খাটের তলায় আলমারির পিছনে পর্যন্ত দেখেও অঞ্জনের কোনো খোঁজ যখন পাওয়া গেল না তখন হতাশ মনে চার বন্ধু পোড়োবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। অনেক ধাক্কাধাক্কি করে সামনের একটি দরজা খুলে বেরোল তারা। তখন ডিংলা পাহাড়ের পিছনে সূর্য অস্ত গেছে।

পূর্বদিকে ঢেউ খেলানো মাঠ, ধান ক্ষেত, পলাশপুর গ্রাম—সব ছাড়িয়ে দিগন্তে মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে। রুমনী নদীর জলে পড়েছে একদিকে গোধুলির রক্তিমাভা, অন্যদিকে চাঁদের আলো।

'আহা কি সুন্দর!'

'সাধে কি অঞ্জন এই জায়গা ছেড়ে গ্রামে যেতে চায় নি!'

দরজা খুলে ছেলেরা ঢুকে পড়ল। শান্তনু বলল, 'কেমন আছ ঝগড়ু ভাই? সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় আজকাল?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—সায়েবের সঙ্গে দেখা হয়, সায়েব হীরেমুক্তো খোঁজে। তোমরা এখানে এসেছ কেন? সায়েব দেখতে পেলে রাগ করবে।—আমাকে চা খেতে দেবে তো? গুড, গুড।'

'খাওয়াব বৈকি, আমাদের সঙ্গে চল।'

পাগলা সাহেবের ভূতের রহস্যের তো এইভাবে সমাধান হল, কিন্তু তবু অঞ্জনের কোনো খবর না পেয়ে সবার মন খারাপ।

শান্তনু হঠাৎ বলল, 'উঃ, পেটে যে আগুন জ্বলছে! আজ তো ভোর থেকে কিছুই খাই নি—এবার কিছু রসদ না পেলে আর মাথায় কিছু ঢুকবে না—'

ধীরে ধীরে সবাই বাংলোয় ফিরল। চা তৈরি হল, হাতে হাতে ডিম-রুটি-কলা খাওয়া হল, ঝগড়ুও সব কিছুর ভাগ পেল। হঠাৎ কেলোও এসে হাজির হয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

'দেখছিস, ঠিক খাবার গন্ধ পেয়ে এসে গেছে!'

আজ যেন কেলোর কেমন বিজয়ীর মতন গর্বিত ভাব, একবার এর কাছে গিয়ে একবার ওর কাছে গিয়ে ল্যাজ নাড়ছে।

'আরে, কাল তোর গলায় ফুলের মালা ছিল, আজ দেখি রুমাল বাঁধা কেলো! কে দিয়েছে?—ঝগড়ু নাকি?'

হঠাৎ সৌমিত্র উত্তেজিত হয়ে কেলোকে জাপটে ধরে রুমালটা খুলে নিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'যা ভেবেছি—অঞ্জনের রুমাল। দেখ—এই কোণে নাম লেখা রয়েছে!'

উত্তেজিত হয়ে সবাই কেলোকেই প্রশ্ন করতে লাগল, 'অঞ্জন কোথায়?!'

কেলো এই প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'ভুক! ভুক!' সৌমিত্র মাথা ঠাণ্ডা রেখে এক বাণ্ডিল দড়ির একটা প্রান্ত তার গলায় বেঁধে দিল তার সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে।

মস্ত বড় একটা রুটির টুকরো দিতেই কেলো যেই পোড়োবাড়ির দিকে ছুটল, তখনই তার পিছন পিছন ছুটল শান্তনু দড়ির অপর প্রান্ত ধরে, আর তারপরে বাকি সকলে। কেলো কিন্তু পোড়োবাড়িতে ঢুকবার কোনো চেষ্টাই করল না—পাশ কাটিয়ে, ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়ে পিছন দিকে ছুটল। কাঁটার খোঁচা অগ্রাহ্য করে শান্তনুও ছুটল কেলোর পিছন পিছন। কেলো গিয়ে একটা নালায় নামল, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও নামল সেই নালায়।

'এটা কি ব্যাপার? বাড়ির ভিতরে ঢুকবার টানেল নাকি? ততক্ষণে কেলো ঝোপের পিছনে একটা ছোট্ট ভাঙ্গা দরজার তলা দিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে ঢুকে গেছে। এবার অবশ্য শান্তনু তার পিছন পিছন ঢুকতে পারল না, শাবল দিয়ে দরজায় ঘা মারতে লাগল।

পার্থ বলল, 'বিলেতে যেমন থাকে শুনেছি, সেই রকম একটা সেলার জাতীয় গুদামের বাইরের দরজা এটা।'

জীর্ণ দরজাটা ভেঙ্গে পড়তেই গুদামের ভিতরটা দেখা গেল। একটা মই উঠেছে ওপর দিকে। ঠিক তার নিচে আধশোয়া অবস্থায় আবর্জনার মধ্যে কে? অঞ্জন না? চেহারাটা অত্যন্ত দুর্বল, শীর্ণ আর মলিন, কিন্তু নিঃসন্দেহে অঞ্জন। তার বাঁ-হাতে রুটির টুকরোটা ধরিয়ে দিয়ে কেলো যেন গর্বভরে হাসছিল। ডান হাত প্রসারিত করে মৃদুস্বরে

অঞ্জন বলল, 'তোরা এসেছিস, জানতাম আসবি'—বলেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

পাঁজাকোলা করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে, মুখে-চোখে জল দিয়ে, গরম চা খাইয়ে অঞ্জনকে কিছুটা সুস্থ করে তোলা হল। তারপর সে একটু দুধ-রুটি খেয়ে, এমনই ঘুমোল যে সন্ধ্যার আগে তার ঘুমই ভাঙলো না। তাকে ফিরে পেয়েই সবাই খুশি, প্রশ্নও করল না কেউ। সকলে খুব ক্লান্ত ছিল। দারুণ উদ্বেগে কেটেছে প্রায় দুটো দিন, রাত্রে ঘুম হয় নি ভালো। অঞ্জন ফিরে আসতে এখন সবাই মনের আনন্দে খেয়ে দেয়ে দিবানিদ্রা লাগাল।

সন্ধ্যেবেলা পাঁচ বন্ধু মিলে বহুদিন পরে আবার চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আড্ডা জমাল। আধশোয়া অঞ্জনকে রোগা আর বিবর্ণ দেখলেও সে যে এখন অনেকটা সুস্থ তা তার হাসি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তাকে ফিরে পেয়ে বন্ধুদের আনন্দের সীমা নেই, তারা প্রাণ ভরে হৈ-চৈ শুরু করেছে।

মনোজ বলল, 'বেশ একখানা খেল্ দেখালি বাবা, আমার তো আর একটু হলেই হার্টফেল করছিল!'

পার্থ যোগ করল, 'আরে তোর হার্ট তো সব সময়েই ফেল করতে চায়—আমাদের মতন সুস্থ হৃদ্‌যন্ত্রের মানুষদেরই চক্ষু চড়কগাছ!'—

'কিন্তু, তোর ব্যাপারটা কি বল দেখি অঞ্জন?' জিজ্ঞেস করল সৌমিত্র। '—ডায়রিতে লিখেছিস পোড়ো বাড়িতে একবার ঘুরে আসতে চাস—'

'কিন্তু, বাড়ির তলার গুদামে কেন ঢুকলি? কি করে?'

'বাইরে থেকে ঘুরে দেখবারই ইচ্ছে নিয়ে গেলাম, জানালা অর্ধেক খোলা দেখে ঢুকলাম, ভাঁড়ার ঘরে মেঝেতে সেলারের 'ট্র্যাপ্‌ডোর' দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। তখন কি জানি যে নিচে পড়ে, পা মচকে আটকে পড়ব!'

'আশ্চর্য! আমরা তো ভাঁড়ার ঘরে ট্র্যাপ্‌ডোরের অস্তিত্ব বুঝি না। তারপর হঠাৎ কেলো আমার হাত চাটতে লাগল! বাইরে চলে গেল, রুটি নিয়ে এসে আমায় দিল, খিদের চোটে তাই খেয়ে নিলাম। অনুমানে বুঝলাম তোরা এসেছিস, তোদের সাড়াশব্দও পেলাম পরে। কিন্তু বুঝলাম যে আমার ক্ষীণকণ্ঠের ডাক তোরা কিছুতেই শুনতে পাবি না।'

'কেলোর গলায় রুমাল বাঁধার আইডিয়াটা কিন্তু চমৎকার ছিল।'

মৃদু হেসে অঞ্জন বলল, 'কি করব? কাগজ পেনসিল নেই তোদের খবর দেব কি করে? তার আগেই ঝগড়ুর রহস্য বুঝে ফেলেছি।'

শান্তনু বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ভূতটা আসলে কোন দুষ্ট লোক—তার মাথা ভাঙবার জন্য আমার হাত নিশপিশ করছিল—'

সৌমিত্র প্রশ্ন করল, 'পাগলা সাহেবের ভূত সেজে ঝগড়ুর কি লাভ?'

'আরে পাগল কি সব কাজই লাভের জন্যে করে?'

'কিন্তু অদ্ভুত কথাবার্তায়ও কি সবই পাগলের প্রলাপ? কোনো কিছু মানে নেই? হীরে মুক্তোটুক্তো কি ব্যাপার?'

অঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'এসব আমার জ্বরের বিকার, না স্বপ্ন, কিংবা অসুস্থ অবস্থায় কল্পনা কিছুই জানি না—কিন্তু কেবলই মনে হতো

যে রাত্রে হ্যাট কোট পরা কে যেন মাথার কাছে এসে ডাকত—মনে হতো সেই যেন আমাকে কেবলই পোড়োবাড়িতে যেতে বলত,—এখন তো প্রমাণ হয়ে গেছে যে পাগলা ঝগড়ুই হ্যাট-কোট পরে বার্লো সাহেবের ভূত সেজে হা-হা করে হেসে বেড়াত—'

'হতে পারে ঝগড়ুই আসত—কিন্তু যে-ই হোক, সে আমাকে বলেছিল কোন জানালা খোলা আছে, কোন ঘরের তলায় ট্র্যাপ্‌ডোর আছে, আর গুদামের কোন খানে বার্লো সাহেবের সংগ্রহ করা সব হীরে জহরত লুকানো আছে—সব খুঁজে বার করতে বলত।'

'অ্যাঁ! কি বললি? এই বার্লো সাহেবের সঞ্চিত হীরে মুক্তো পেয়েছিস? এ যে একেবারে রোমাঞ্চকর উপন্যাস!'

'পেলাম আর কোথায় রে? সেলারে ঢুকবার মুখেই তো পপাত ধরণীতলে, তোরা উদ্ধার না করলে এতক্ষণে মমার-চ'—

বাধা দিয়ে শান্তনু বলল, 'সব চেয়ে বেশি কৃতিত্ব কেলোর। হীরে মুক্তো পেলে ওকে হীরের কলার বানিয়ে দিস—'

'সত্যি কি বার্লো সাহেব হীরে জহরত খুঁজে বেড়াত? কিছু কি সত্যিই সেই গুদামে লুকিয়ে রেখেছিল?'

'পাগলের প্রলাপে কান দিস কেন?

'কেবল মাত্র পাগলা ঝগড়ুর কথায় তো নয়—গ্রামসুদ্ধ সকলের ঠাকুরদা দাদামশাই যে বলে গেছে বার্লো সাহেব পাহাড়ে আর নদীর জলে কি যেন খুঁজে বেড়াত!'

'তা হলে, চল আমরাও খুঁজে দেখি। অঞ্জন একটু ভালো হোক।'

অঞ্জন একটু সুস্থ হবামাত্র পাঁচ বন্ধু সেলারের ভাঙ্গা দরজা দিয়ে ঢুকে আবর্জনার স্তূপের তলায় মাটি খুঁড়ে তিনটে ছোট্ট ছোট্ট তামার মুখ ঢাকা দেওয়া কলসী খুঁজে পেল! ওরে বাবা! কি যে সাংঘাতিক ভারি অতটুকু কলসীগুলো! হবে না কেন? বাড়ি নিয়ে এসে, ঢাকনা খুলে ওরা দেখলো যে কলসী ঠাসা ছোট্ট ছোট্ট পাথর আর নুড়ি—কতকগুলো পাথর খুব ঝকঝকে কাচের মতন, কিন্তু নুড়িগুলো যেন ম্যাড়মেড়ে।

'সত্যি সত্যি হীরে জহরত নাকি?' উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল পার্থ। মনোজ হেসে উঠলো 'ক্ষেপেছিস নাকি? শালবনে মুক্তো ছড়ানো ছিল বুঝি?'

জিওলজির ছাত্র সৌমিত্র কিন্তু এতক্ষণ খুব মন দিয়ে পাথরগুলো নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করছিল। এবার বলল, 'ব্যাপারটা আজগুবি মনে করছিস তা কিন্তু নয় রে! দাক্ষিণাত্য-মালভূমির পূর্বদিকে,—একেবারে উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর পর্যন্ত অনেক নদীর বালিতে আগে ছোট্ট ছোট্ট সোনা আর হীরের টুকরো পাওয়া যেত ওটা তো ঐতিহাসিক সত্য,—তাও জানিস না? আর এসব পাহাড়ে স্ফটিক অথবা রক-ক্রিস্টাল তো এখনো পাওয়া যায়? এই ঝকঝকে পাথরগুলো সম্ভবতঃ স্ফটিক। আর এই ম্যাড় মেড়ে নুড়িগুলো যাকে এত অবহেলা করছিস, সেগুলো বোধহয় হীরেই।'

ছেলেরা হতবাক! চোখ গোল গোল করে শান্তনু বলল, 'তা হলে, পলাশপুরের কাছাকাছি মাটির তলায় হীরে আছে? চল্‌ না এই ছুটিতে আমরা দ্বিতীয় গোলকুণ্ডা আবিষ্কার করি।'

সবাই হেসে উঠল। সৌমিত্র বলল, 'হীরের খনি আবিষ্কার করা অত সহজ নয় ভাই,

তবে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াকে খবর তো দিতে হবেই—আর খবর পেলে নিশ্চয়ই তারা অনুসন্ধান চালাবে। আর এইগুলো খুঁজে পাবার জন্য আমরা কি পুরস্কার পাব? তাও নিশ্চয় পাব। আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবী করবার জন্য বার্লো সাহেব যখন উপস্থিত নেই—আমাদেরই প্রাপ্য সেই গৌরব।'

'কেলোর কথা ভুলিস না—আর চতুর্থ ঝগড়ুর কথা।'

তার নাম করতে না করতেই হঠাৎ পাগলা ঝগড়ুর সেই হা-হা-হা-হা হাসি শোনা গেল। এবার কোট-প্যান্ট পরেই পাগলা ঝগড়ু তাদের সামনে এসে হাজির—'ওকি! ওগুলো কি? সায়েবের হীরেগুলো পেয়েছ? ইয়েস? নো? ভেরি গুড।'

বলেই সে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে হেলে দুলে নাচতে শুরু করল।

সমাদ্দারের চাবি

সত্যজিৎ রায়

ফেলুদা বলল, এই যে গাছপালা মাঠবন দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে, এর বৈজ্ঞানিক কারণটা কী জানিস? কারণ, আদিমকাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে গাছপালার মধ্যে বসবাস করে সবুজের সঙ্গে মানুষের চোখের একটা স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজকাল গাছ জিনিসটা ক্রমে শহর থেকে লোপাট হতে চলেছে, তাই শহর ছেড়ে বেরোলেই চোখটা আরাম পায়, আর তার ফলে মনটাও হালকা হয়ে ওঠে। যত চোখের ব্যারাম দেখবি শহরে। পাড়াগাঁয়ে যা, কি পাহাড়ে যা, দেখবি চশমা খুঁজে পাওয়া ভার।

আমি জানি ফেলুদার নিজের চোখ খুব ভাল, তার চশমা লাগে না, সে ঘড়ি ধরে তিন মিনিট পনের সেকেণ্ড চোখের পাতা না ফেলে থাকতে পারে, যদিও সে কোনওদিন গ্রামে-টামে থাকেনি। এটা ওকে বলতে পারতাম, কিন্তু যদি মেজাজ বিগড়ে যায় তাই আর বললাম না। আমাদের সঙ্গে মণিবাবু রয়েছেন, মণিমোহন সমাদ্দার, তাঁর চোখে পুরু মাইনাস পাওয়ারের চশমা। তিনিও অবিশ্যি শহরের লোক। বয়স পঞ্চাশ-টঞ্চাশ, বেশ

ফরসা রঙ, নাকটা যাকে বলে টিকোলো, কানের কাছের চুলগুলো পাকা। মণিমোহনবাবুর ফিয়াট গাড়িতেই আমরা যশোর রোড দিয়ে চলেছি বামুনগাছি। কেন যাচ্ছি সেটা এই বেলা বলা দরকার।

গতকাল ছিল রবিবার। পুজোর ছুটি সবে আরম্ভ হয়েছে। আমরা দু'জনে আমাদের বৈঠকখানায় বসে আছি। আমি খবরের কাগজ খুলে সিনেমার পাতায় বিজ্ঞাপন দেখছি, আর ফেলুদা একটা সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে বই খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে। আমি লক্ষ্য করছি সে কখনো আপন মনে হেসে আর কখনো ভুরু দুটোকে ওপরে তুলে ভাল লাগা আর অবাক হওয়াটা বোঝাচ্ছে। বইটা ডক্টর ম্যাট্রিক্স সম্বন্ধে। ফেলুদা বলছিল এই ডক্টর ম্যাট্রিক্সের মতো মানুষের জীবনে সংখ্যা বা নম্বর জিনিসটা নাকি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সাধারণ বা অসাধারণ ঘটনার পিছনেই নাকি খুঁজলে নানারকম নম্বরের খেলা আবিষ্কার করা যায়। ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হত না যদি না ফেলুদা বইটা থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিত। বলল, ডক্টর ম্যাট্রিক্সের একটা আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শোন। আমেরিকার দু'জন বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট খুন হয়েছিল জানিস তো?

লিঙ্কন আর কেনেডি?

হ্যাঁ। আচ্ছা এই দু'জনের নামে ক'টা করে অক্ষর? L-I-N-C-O-L-N—সাত। K-E-N-N-E-D-Y—সাত।

বেশ। এখন শোন—লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট হন ১৮৬০ সালে, আর কেনেডি হন ১৯৬০ সালে—ঠিক একশো বছর পরে। দু'জনেই খুন হন শুক্রবার। খুনের সময় দু'জনেরই স্ত্রী পাশে ছিল। লিঙ্কন খুন হন থিয়েটারে ; সে থিয়েটারের নাম ছিল ফোর্ড। কেনেডি খুন হন মোটর গাড়িতে। সেটা ফোর্ড কোম্পানির তৈরি গাড়ি। গাড়িটার নাম ছিল লিঙ্কন। লিঙ্কনের পরে যিনি প্রেসিডেন্ট হন তাঁর নাম ছিল জনসন, অ্যান্ড্রু জনসন। কেনেডির পরে প্রেসিডেন্ট হন লিন্ডন জনসন। প্রথমজনের জন্ম ১৮০৮, দ্বিতীয়জনের জন্ম ১৯০৮--ঠিক একশো বছর পর। লিঙ্কনকে যে খুন করে তার নাম জানিস?

জানতাম, ভুলে গেছি।

জন উইল্‌ক্স বুথ। তার জন্ম ১৮৩৯ সালে। আর কেনেডিকে খুন করে লী হারভি অসওয়াল্ড। তার জন্ম ঠিক একশো বছর পরে—১৯৩৯। এইবারে নাম দুটো আরেকবার লক্ষ্য কর। John Wilkes Booth–Lee Harvey Oswald—ক'টা করে অক্ষর আছে নামে?

অক্ষর গুনে থ হয়ে গেলাম। ঢোক গিয়ে বললাম, দুটোতেই পনের!

ফেলুদা হয়ত ডক্টর ম্যাট্রিক্সের তাজ্জব আবিষ্কারের বিষয়ে আরো কিছু বলত, কিন্তু ঠিক এই সময়ে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে এসে হাজির হলেন মণিমোহন সমাদ্দার। ভদ্রলোক নিজের পরিচয়-টরিচয় দিয়ে সোফায় বসে বললেন, আমি আপনাদের পাড়াতেই থাকি—লেক প্লেসে।

ফেলুদা 'ও' বলে চুপ করে গেল। আমি ভদ্রলোককে আড়চোখে দেখছি। গায়ে একটা হালকা রঙের বুশসার্ট আর ব্রাউন প্যান্ট, পায়ে বাটার স্যান্ডক জুতো। ভদ্রলোক

একটু ইতস্তত করে গলা খাঁকরিয়ে বললেন, আপনি হয়ত আমার কাকার নাম শুনে থাকবেন, রাধারমণ সমাদ্দার।

এই সেদিন যিনি মারা গেলেন? ফেলুদা প্রশ্ন করল। যাঁর খুব গান-বাজনার শখ ছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনেক বয়স হয়েছিল না?

বিরাশি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাগজে পড়ছিলাম। অবিশ্যি মৃত্যু-সংবাদটা পড়ার আগে তাঁর নাম শুনেছিলাম বললে মিথ্যে বলা হবে।

সেটা কিছুই আশ্চর্য না। উনি যখন গান-বাজনা ছেড়েছেন তখন আপনি নেহাতই ছেলেমানুষ। প্রায় পনের বছর হলো রিটায়ার করে বামুনগাছিতে বাড়ি করে সেখানেই চুপচাপ বসবাস করছিলেন। আঠারোই সেপ্টেম্বর সকালে হার্ট অ্যাটাক হয়। সেইদিন রাত্রে মারা যান।

আই সী।

ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ড চুপ। ফেলুদা তার বাঁ পা-টা ডান পায়ের উপর তুলে বসেছিল, এই ফাঁকে ডান পা-টা বাঁ পায়ের উপর তুলে দিল। মিস্টার সমাদ্দার একটু কিন্তু কিন্তু ভাব করে বললেন, আপনি হয়ত ভাবছেন লোকটা কী বলতে এল। আসলে ব্যাক-গ্রাউন্ডটা একটু না দিয়ে দিলে...।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, ফেলুদা বলে উঠল। আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না। টেক ইওর টাইম।

মণিমোহনবাবু বলতে লাগলেন, আমার কাকা ঠিক সাধারণ মানুষ ছিলেন না। ওঁর পেশা ছিল ওকালতি, এবং তাতে রোজগারও করেছেন যথেষ্ট। বছর পঞ্চাশেক বয়সে সেটা ছেড়ে দিয়ে একেবারে পুরোপুরি গান-বাজনার দিকে চলে যান। শুধু গাইতেন না, সাত-আট রকম দিশি-বিলিতি যন্ত্র বাজাতে পারতেন। সেতার বেহালা পিয়ানো হারমোনিয়াম বাঁশি তবলা এবং এছাড়াও আরো কয়েকটা। তার উপরে সংগ্রহের বাতিক ছিল। ওঁর বাড়িতে বাদ্যযন্ত্রের একটা ছোটখাটো মিউজিয়াম করে ফেলেছিলেন।

কোন বাড়িতে? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

আমহার্স্ট স্ট্রিটে থাকতেই শুরু হয়, তারপর সে সব যন্ত্র বামুনগাছির বাড়িতে নিয়ে যান। যন্ত্রের সন্ধানে ভারতবর্ষের নানান জায়গায় গেছেন। বম্বেতে একবার এক ইতালিয়ান জাহাজীর কাছ থেকে একটা বেহালা কেনেন, সেটা কলকাতায় এনে কিছুদিনের মধ্যেই বিক্রি করে দেন ত্রিশ হাজার টাকায়।

ফেলুদা একবার আমাকে বলেছিল ইটালিতে প্রায় তিনশো বছর আগে দু'-তিনজন লোক ছিল যাদের তৈরি বেহালার এমন কয়েকটা আশ্চর্য গুণ ছিল যে আজকের দিনে সেগুলোর দাম প্রায় লাখ টাকায় পৌঁছে গেছে।

সমাদ্দার মশাই বলে চললেন, এই সব গুণের পাশে কাকার একটা মস্ত দোষ ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৃপণ। এই যে শেষ বয়সে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে দূরে সরে

pathagar.net

গেলেন, তার একটা প্রধান কারণ হলো তাঁর কৃপণতা।

আত্মীয় বলতে আপনি ছাড়া আর কে আছে?

এখন আর বিশেষ কেউ নেই। দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিছু এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে। আমার কাকারা ছিলেন চার ভাই, দুই বোন। বোনেরা মারা গেছেন। ভাইদের মধ্যে কাকাকে নিয়ে তিনজন মারা গেছেন, আর একজন জীবিত কি মৃত জানা নেই। তিনি প্রায় ত্রিশ বছর আগে সংসার ছেড়ে চলে যান। রাধারমণ নিজে বিপত্নীক ছিলেন। একটি ছেলে ছিল, মুরলীধর, তিনিও প্রায় পঁচিশ বছর হলো মারা গেছেন। তাঁর ছেলে ধরণীধর হলো কাকার একমাত্র নাতি। ছেলেবেলায় সে কাকার খুবই প্রিয় ছিল। শেষটায় পড়াশুনোয় জলাঞ্জলি দিয়ে যখন নাম বদলে থিয়েটারে ঢুকল, তখন থেকে কাকা আর তার মুখ দেখেননি। এই হলো আত্মীয়।

ধরণীধর বেঁচে আছেন?

হ্যাঁ। সে এখন থিয়েটার ছেড়ে যাত্রার দলে যোগ দিয়েছে। কাকার মৃত্যুর পর তার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু সে কলকাতায় নেই। দলের সঙ্গে কোন অজ পাড়াগাঁয়ে ট্যুরে বেরিয়েছে। ওর বেশ নামটাম হয়েছে। গান-বাজনাতেও ট্যালেন্ট ছিল, যে কারণে কাকা ওকে ভালবাসতেন।

মণিমোহনবাবু হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করলেন। তারপর আবার বলে চললেন—

আমার সঙ্গে কাকার যে খুব একটা যোগাযোগ ছিল তা নয়। বড়জোর দু'মাসে একবার দেখা হত। ইদানিং আরো কম। আসলে, আমার একটা ছাপাখানা আছে ভবানীপুরে, ইউরেকা প্রেস, তাতে এই গত ক'মাস লোডশেডিং নিয়ে খুব ভুগতে হচ্ছে। কাকার হার্ট অ্যাটাকটা হওয়াতে ওঁর প্রতিবেশী অবনীবাবু আমাকে টেলিফোন করে খবর দেন, আমি তৎক্ষণাৎ চিন্তামণি বোসকে নিয়ে চলে যাই। যখন পৌঁছই তখন জ্ঞান ছিল না। মারা যাবার ঠিক আগে জ্ঞান হয়। আমাকে দেখে মনে হলো চিনলেন। দু'-একটা ভাঙা ভাঙা কথাও বললেন—ব্যস্—তারপরেই শেষ।

কী বললেন? ফেলুদা জিগ্যেস করল। সে এখন আর পায়ের উপর পা তুলে নেই ; চেয়ারের সামনের দিকে এগিয়ে বসেছে।

প্রথমে বললেন—'আমার...নামে...'। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁট নড়ছে, কথা নেই। শেষে অনেক কষ্টে দু'বার বললেন—'চাবি...চাবি..'। ব্যস্।

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছে মণিমোহনবাবুর দিকে। বলল, কী বলতে চাচ্ছিলেন সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কি?

প্রথম অংশ শুনে মনে হয় ওঁর নামে যে কৃপণ বলে অপবাদ রটেছিল সেটার বিষয় কিছু বলতে চাইছেন। আমার ধারণা ওঁর মনে একটা অনুশোচনার ভাব জেগেছিল। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে ওই চাবি। কিসের চাবির কথা বলছেন কিছুই বোঝা গেল না। ঘরে একটা আলমারি আর একটা সিন্দুক ছিল। তার চাবি ওঁর খাটের পাশের টেবিলের দেরাজে থাকত। বাড়িতে ঘর মাত্র তিনটে, আর একটা বাথরুম, সেটা শোবার ঘরের সঙ্গে লাগা। আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছুই নেই। অন্তত চাবি লাগে এমন জিনিস তো

pathagar.net

নেই বললেই চলে। দরজার যে তালা ব্যবহার করতেন, সেটা একরকম জার্মান তালা, তাতে চাবির দরকার হয় না, নম্বরের কম্বিনেশনে খুলতে হয়।

সিন্দুক আর আলমারিতে কী ছিল?

আলমারির তাকে কিছু জামাকাপড় ছিল, আর দেরাজে কিছু কাগজপত্র। দরকারী কিছুই না। আর সিন্দুক ছিল একেবারে খাঁ খাঁ খালি।

টাকাপয়সা?

নাথিং। নট এ পাইস। টেবিলের দেরাজে কিছু খুচরো পয়সা ছিল, আর বালিশের নিচে একটা বটুয়াতে কিছু দু'টাকা পাঁচ টাকার নোট। ব্যস্। বটুয়া থেকে নাকি সংসারের জন্য টাকা বার করে দিতেন। অন্তত চাকর অনুকূল তাই বলে।

কিন্তু সেও তো বলছেন সামান্য টাকা। সেটা ফুরিয়ে গেলে অন্য কোথাও থেকে বার করতে হত নিশ্চয়ই।

নিশ্চয়ই।

আপনি কি বলতে চান উনি ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন না?

মণিমোহনবাবু হেসে বললেন, তাই যদি রাখবেন তাহলে আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে তফাতটা হবে কোথায়? এককালে রাখতেন, তবে বছর পঁচিশেক আগে একটা ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় উনি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তারপর থেকে আর ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোনও সংশ্রব রাখেননি। অথচ—মণিবাবু গলার স্বর নামিয়ে নিলেন—আমি জানি ওঁর বিস্তর টাকা ছিল। এবং সেটা যে বাড়ি তৈরি করার পরেও ছিল সেটা তাঁর দুষ্প্রাপ্য বাজনার কালেকশন দেখলেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া উনি নিজের পিছনে বেশ ভালই খরচ করতেন। ভাল খেতেন, বাড়িতে ভাল বাগান করেছিলেন, একটা সেকেন্ডহ্যান্ড অস্টিন গাড়িও কিনেছিলেন ; মাঝে মাঝে বেরোতেন, শহরে আসতেন। কাজেই...

ফেলুদা পকেট থেকে চারমিনার বার করেছে। মণিমোহনবাবুকে অফার করে দেশলাই ধরিয়ে দিল। ভদ্রলোক বেশ ভাল করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এতক্ষণে হয়ত আন্দাজ করেছেন কেন আপনার কাছে এসেছি। এতগুলো টাকা—সব গেল কোথায়? কোন চাবির কথা বলছিলেন কাকা? সে চাবি দিয়ে কোন জিনিসটা খুললে কী পাওয়া যাবে? সেটা কি টাকা, না অন্য কিছু? যদি উইল থেকে থাকে, তাহলে সেটা তো পাওয়া দরকার। উইল না থাকলে অবিশ্যি টাকা নাতিই পাবে, কিন্তু তার আগে টাকাটা তো পেতে হবে। আপনার বুদ্ধির অনেক তারিফ শুনেছি। আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাকে একটু হেল্প করতে পারেন!...

মণিমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক হলো যে পরদিনই সকালে আমরা বামুনগাছি যাব। ওঁর গাড়ি আছে, উনি নিজেই সকাল সাতটায় এসে আমাদের তুলে নিয়ে যাবেন। আমি বুঝেছি যে ফেলুদার কাছে এটা একটা নতুন ধরনের রহস্য। রহস্য না বলে হেঁয়ালিও বলা যেতে পারে।

অন্তত গোড়াতে তাই মনে হয়েছিল। শেষে দেখলাম হেঁয়ালির চেয়েও অনেক বেশি গোলমেলে প্যাঁচালো একটা কিছু।

।। দুই ।।

বারাসত ছাড়িয়ে একটা রাস্তা যশোর রোড থেকে ডান দিকে মোড় নিয়ে বামুনগাছির দিকে গেছে। সেই মোড়ের মাথায় একটা খাবারের দোকান থেকে মণিমোহনবাবু আমাদের চা আর জিলিপি কিনে খাওয়ালেন। তাতে পনের মিনিট গেল, তা না হলে আমরা আটটার মধ্যেই বামুনগাছি পৌঁছে যেতাম।

গোলাপী রঙের পাঁচিল আর ইউক্যালিপটাস গাছে ঘেরা সাত বিঘে জমির উপর রাধারমণ সমাদ্দারের একতলা বাড়ি। যে লোকটা এসে গেট খুলে দিল সে বোধহয় মালি, কারণ তার হাতে একটা ঝুড়ি ছিল। গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকে বাগানের পাশ দিয়ে কাঁকড় বিছানো রাস্তার উপর দিয়ে একেবারে বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ডান দিকে খানিকটা দূরে একটা গ্যারেজের ভিতর একটা পুরনো কালো গাড়ি রয়েছে। সেটাই বুঝলাম রাধারমণ সমাদ্দারের অস্টিন।

গাড়ি থেকে নামতেই একটা ঠাঁই শব্দ শুনে বাগানের দিকে ফিরে দেখি নীল হাফপ্যান্ট পরা আট-দশ বছরের একটি ছেলে হাতে একটা এয়ার গান নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখছে। মণিমোহনবাবু তাকে বললেন, তোমার বাবা বাড়িতে আছেন? তাঁকে গিয়ে বল তো যে মণিবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন, একবার ডাকছেন।

ছেলেটি বন্দুকে ছর্‌রা ভরতে ভরতে চলে গেল। ফেলুদা বলল, প্রতিবেশীর ছেলে বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর বাবা অবনী সেনের একটা ফুলের দোকান আছে নিউ মার্কেটে। এখানে পাশেই ওঁর বাড়ি, তার সঙ্গে ওঁর নার্সারি। মাঝে মাঝে স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে এসে থাকেন।

ইতিমধ্যে একজন বুড়ো চাকর আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে। মণিবাবু তাকে দেখিয়ে বললেন, এ বাড়িটার যদ্দিন না একটা ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন অনুকূল এখানেই থাকছে। প্রায় ত্রিশ বছরের পুরনো চাকর। অনুকূল, এঁদের জন্য একটু সরবতের ব্যবস্থা কর তো।

চাকর মাথা হেঁট করে হ্যাঁ বলে চলে গেল, আমরা তিনজন বাড়ির ভিতর ঢুকলাম।

দরজা দিয়ে ঢুকেই একটু খোলা জায়গা। সেটাকে ঘর বলা মুশকিল, কারণ মাঝখানে একটা গোল টেবিল আর দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার ছাড়া আর কিছুই নেই। বাতিটাতিও নেই, কারণ এদিকটায় ইলেকট্রিসিটিই নেই। আমাদের সামনেই একটা দরজা রয়েছে, মণিবাবু সেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, দেখুন, এই হলো সেই জার্মান তালা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলকাতা শহরেই কিনতে পাওয়া যেত। এর নাম হলো এইট-টু-নাইন-ওয়ান।

গোল তালা, তাতে চাবির গর্ত-টর্ত নেই, তার বদলে আছে চারটে খাঁজ। প্রত্যেকটা খাঁজের পাশে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত নম্বর লেখা আছে, আর প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে ছোট্ট হুকের মতো জিনিস বেরিয়ে আছে। এই হুকগুলোকে খাঁজের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ঠেলে সরানো যায়, আর দরকার হলে যে-কোনও একটা নম্বরের পাশে বসিয়ে দেওয়া যায়। কোনটাকে কোন নম্বরে বসাতে হবে না জানলে তালা খোলা অসম্ভব।

pathagar.net

মণিবাবু বাঁ দিকের খাঁজ থেকে শুরু করে হুকগুলোকে পর পর ৮, ২, ৯ আর ১ নম্বরে ঠেলে দিতেই খড়াৎ শব্দ করে ম্যাজিকের মতো তালাটা খুলে গেল। মণিবাবু বললেন, বন্ধ করাটা আরো সহজ। তালাটা লাগিয়ে যে-কোনও একটা হুক নম্বর থেকে একটু সরিয়ে দিলেই লক্‌।

আমরা তিনজন রাধারমণ সমাদ্দারের ঘরে ঢুকলাম।

ঘরটা বেশ বড়। তাতে মণিবাবু যা যা বলেছিলেন সবই আছে, কিন্তু বাজনা যে এতরকম আছে সেটা ভাবতেই পারিনি। তার কিছু রয়েছে দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের গায়ে একটা লম্বা শেল্‌ফের তিনটে তাকের উপর, কিছু পুবদিকের দেয়ালের সামনে একটা লম্বা বেঞ্চির উপর, কিছু ঝুলছে দেয়ালের হুক থেকে, আর কিছু রয়েছে ছোট ছোট টেবিলের উপর। এ ছাড়া ঘরে যা আছে তা হলো খাট, খাটের পাশে একটা ছোট টেবিল, উত্তর দিকের দেয়ালের সামনে একটা আলমারি। আর এক কোণে একটা ছোট সিন্দুক। খাটের তলায় একটা ছোট ট্রাঙ্কও চোখে পড়ল।

ফেলুদা প্রথমে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকটা দেখে নিল। তারপর আলমারি আর সিন্দুক খুলে তার ভিতরে বেশ ভাল করে হাত আর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর দেরাজ সমেত টেবিলটাকে পরীক্ষা করল, খাটের তোশকের নিচে দেখল, খাটের নিচে দেখল, ট্রাঙ্কের ভিতর দেখল (তাতে একজোড়া পুরনো জুতো আর একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া ছাড়া আর কিছু নেই)। তারপর প্রত্যেকটা বাজনা আলাদা করে হাতে তুলে ওজন পরীক্ষা করে নেড়েচেড়ে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে তার ফাঁপা বা ফোলা অংশে চাবির গর্ত আছে কিনা দেখে আবার ঠিক যেমনভাবে রাখা ছিল তেমনিভাবে রেখে দিল। তারপর ঘরের মেঝে আর দেয়ালের প্রত্যেকটা জায়গা আঙুলের গাঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখল। সমস্ত ব্যাপারটা করতে তার লাগল পনের মিনিট। তারপর আরো সাত মিনিট লাগল অন্য দুটো ঘর আর বাথরুম দেখতে। সবশেষে আবার রাধারমণবাবুর ঘরে ফিরে এসে বলল, মণিমোহনবাবু, আপনাদের মালিটিকে একবার ডাকুন তো।

মালি এলে ফেলুদা তাকে দিয়ে ঘরের জানলায় রাখা দুটো ফুলের টব থেকে মাটি বার করিয়ে তাতে কিছু নেই দেখে আবার মাটি ভরিয়ে ফুল সমেত টব জানালায় রাখালো।

এর মধ্যে অনুকূল বসবার ঘর থেকে চারটে চেয়ার এনে তার সামনে একটা গোল টেবিল পেতে তার উপর লেবুর সরবৎ রেখে গেছে। সরবতে চুমুক দিয়ে মণিবাবু বললেন, কিছু বুঝলেন?

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, এতগুলো বাজনা একসঙ্গে না থাকলে এঘরে যে কোনও অবস্থাপন্ন লোক বাস করত সেটা বিশ্বাস করা কঠিন হত।

সেই তো বলছি, মণিবাবু বললেন, সাধে কি আপনাকে ডেকেছি! আমি তো একেবারে বোকা বনে গেছি মশাই।

আমি বাজনাগুলোর দিকে দেখছিলাম। তার মধ্যে সেতার সরোদ তানপুরা এসরাজ তবলা বাঁশি—এগুলো আমি চিনি। অন্যগুলো আমি কখনো চোখেই দেখিনি। ফেলুদাও দেখেছে কিনা সন্দেহ। সে মণিবাবুকে প্রশ্ন করল, সব ক'টা বাজনার নাম জানেন? ওই

যে দেয়াল থেকে তারের যন্ত্রটা ঝুলছে, ওটার কী নাম?

মণিবাবু হেসে বললেন, আমি মশাই এক্কেবারে বেসুরো। আমাকে ওসব জিগ্যেস করলে কিন্তু ফাঁপরে পড়ব।

একটা পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দেখি সেই বন্দুকওয়ালা ছেলেটির সঙ্গে বছর চল্লিশের একজন ফরসা ভদ্রলোক আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। মণিবাবু আলাপ করিয়ে দিতে জানলাম ইনিই হলেন ফুলের দোকানের মালিক অবনী সেন। ছেলেটির নাম হলো সাধন। অবনীবাবু প্রদোষ মিত্তিরের নাম শুনেছেন জেনে ফেলুদা একটা ছোট্ট একপেশে হাসির সঙ্গে একটা গলা খাক্‌রানি দিল। অবনীবাবু খালি চেয়ারটায় বসে মণিবাবুর দিকে ফিরে বললেন, ভাল কথা, আপনার কাকা কি কাউকে তাঁর কোনও বাজনা বিক্রি করার কথা বলেছিলেন?

কই না তো! মণিবাবু অবাক।

কাল একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন। এখানে কাউকে না পেয়ে আমার বাড়িতে যান। আমি তাঁকে আজ আবার আসতে বলে দিয়েছি। আমি আন্দাজ করেছিলাম আপনি হয়ত আসতে পারেন। ভদ্রলোকের নাম সুরজিৎ দাশগুপ্ত। আপনার কাকার মতোই বাজনা সংগ্রহের বাতিক। রাধারমণবাবুর লেখা একটা চিঠি দেখালেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই লেখা। সেই চিঠি পেয়ে ভদ্রলোক নাকি আগেই একবার দেখা করে গেছেন। আপনাদের চাকরও তাকে দেখেছে বলে বলল।

আমিও দেখেছি।

কথাটা বলল সাধন। সে একটা টেবিলের উপরে রাখা ছোট্ট হারমোনিয়ামের মতো একটা বাজনার সামনে দাঁড়িয়ে তার পর্দার উপর আস্তে আস্তে আঙুল টিপে টুং টাং সুর বার করছে।

অবনীবাবু ছেলের কথা শুনে হেসে বললেন, সাধন প্রায় সারাটা দিনই এই বাড়ির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে। দাদুর সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল।

দাদুকে কেমন লাগত তোমার? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

মাঝে মাঝে খারাপ। সাধন আমাদের দিকে পিছন ফিরেই উত্তরটা দিল।

খারাপ কেন? ফেলুদা আবার প্রশ্ন করল।

খালি খালি সারেগামা গাইতে বলতেন।

আর তুমি গাইতে না?

না। কিন্তু আমি গাইতে পারি।

যত রাজ্যের হিন্দি ফিল্মের গান, হেসে বলে উঠলেন অবনীবাবু।

দাদু জানতেন তুমি গান গাইতে পার? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ।

তার মানে তোমার গান শুনেছিলেন তিনি?

না।

তাহলে কী করে জানলেন?

দাদু বলতেন যার নামে সুর থাকে, তার গলায়ও সুর থাকে।

pathagar.net

কথাটা ঠিক পরিষ্কার হলো না, তাই আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ফেলুদা বলল, তার মানে?

জানি না।

তোমার দাদুর গান তুমি শুনেছ?

না। বাজনা শুনেছি।

এই কথাটায় মণিমোহনবাবু যেন বেশ হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, সে কি, সাধনবাবু! তুমি ঠিক বলছ? আমি তো জানি উনি বাজনা বাজানো ছেড়ে দিয়েছিলেন। তোমার সামনে বাজিয়েছেন কখনো?

সামনে না। আমি বাইরে ছিলাম, বাগানে। বন্দুক দিয়ে নারকোল মারছিলাম। উনি তখন বাজালেন।

অন্য কোনও লোক বাজায়নি তো? মণিবাবু জিগ্যেস করলেন।

আর কেউ ছিল না।

ফেলুদা বলল, অনেকক্ষণ ধরে বাজনা শুনলে?

না। বেশিক্ষণ না।

ফেলুদা এবার মণিমোহনবাবুকে বলল, একবার আপনার অনুকূলকে ডাকুন তো।

অনুকূল এসে হাত দুটোকে জড়ো করে দরজার মুখে দাঁড়ালো। ফেলুদা বলল, তোমার মনিবকে সম্প্রতি কখনো বাজনা বাজাতে শুনেছ?

অনুকূল ভীষণ কাঁচুমাচু ভাব করে বলল, এজ্ঞে বাবু তো ঘরের ভিতরেই থাকতেন সর্বক্ষণ, তা সে কখন কি করতে না করতেন...

তোমার সামনে বাজনা বাজাননি কখনো?

এজ্ঞে না।

বাজনার আওয়াজ শুনেছ?

এজ্ঞে তা যেন কয়েকবার...তবে কানে তো ভাল শুনি না...

মারা যাবার আগে একজন অপরিচিত লোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কি? যিনি কাল সকালেও এসেছিলেন?

তা এসেছিলেন বটে। এই ঘরে বসেই কথা বললেন।

প্রথম কবে এসেছিলেন মনে আছে?

এজ্ঞে হ্যাঁ। যেদিন তিনি চলে গেলেন সেদিন সকালে।

যেদিন কাকা মারা গেলেন? মণিবাবু চোখ বড় বড় করে জিগ্যেস করলেন।

এজ্ঞে হ্যাঁ।

অনুকূলের চোখে জল এসে গেছে। সে গামছা দিয়ে চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, সে ভদ্দরলোক গেলেন চলে, আর তার কিছু পরেই আমি বাবুর চানের জল গরম করে নিয়ে তেনাকে বলতে গিয়ে দেখি কি তেনার যেন হুঁশ নেই। কয়েকবার 'বাবু বাবু' করে ডেকে যখন সাড়া পেলাম না তখন এনার বাড়িতে গেলাম খবর দিতে। অনুকূল অবনীবাবুর দিকে দেখিয়ে দিল। অবনীবাবু বললেন, আমি ব্যাপার দেখেই মণিবাবুকে টেলিফোন করে একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে বলি। অবিশ্যি বিশেষ কিছু করার ছিল না।

একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। অনুকুল বাইরে চলে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই ঘরে এসে ঢুকলেন লম্বা জুলপি, ঝাঁকড়া চুল, লম্বা গোঁফ আর পুরু ফ্রেমের চশমা পরা এক ভদ্রলোক। জানা গেল ইনিই সুরজিৎ দাশগুপ্ত। অবনীবাবু মণিমোহনবাবুকে দেখিয়ে বললেন, আপনি এঁর সঙ্গে কথা বলুন। ইনি রাধারমণবাবুর ভাইপো।

ও, আই সী। আপনার কাকার সঙ্গে আমার চিঠিতে আলাপ হয়। উনি আমাকে এসে দেখা করতে—

মণিবাবু তার কথার উপরেই বললেন, কাকার চিঠিটা সঙ্গে আছে কি?

ভদ্রলোক তাঁর কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড বার করে মণিবাবুর হাতে দিলেন। মণিবাবুর পড়া হলে সে চিঠি ফেলুদার হাতে গেল। আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম তাতে রাধারমণবাবু ভদ্রলোককে রবিবার ১৮ই সেপ্টেম্বর সকালে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন। কারণটাও বলা আছে—বাদ্যযন্ত্র আমার যাহা আছে তাহা আমার নিকটেই আছে। আপনি আসিলেই দেখিতে পাইবেন। উল্টোদিকে ভদ্রলোকের ঠিকানাটাও ফেলুদা দেখে নিল—মিনার্ভা হোটেল, সেন্ট্রাল এভিনিউ, কলকাতা ১৩।

ফেলুদা চিঠিটা পড়ে খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা সুলেখা ব্লু-ব্ল্যাক কালিটার দিকে এক ঝলক দেখে নিল। চিঠিটা মনে হয় সেই কালিতেই লেখা।

সুরজিৎবাবু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার যেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই খাটের একটা কোণে গিয়ে বসলেন। পরের প্রশ্নটাও মণিমোহনবাবুই করলেন।

আঠারো তারিখে আপনার সঙ্গে কী কথা হয়?

সুরজিৎবাবু বললেন, কিছুদিন আগে একটা পুরনো গীতভারতী পত্রিকায় বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে ওঁর একটা লেখা পড়ে আমি রাধারমণবাবু সম্বন্ধে জানতে পারি। এখানে এসে ওঁর কালেকশন দেখে আমি তার থেকে দুটো যন্ত্র কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করি। দাম নিয়ে কথা হয়। আমি দুটোর জন্যে দু'হাজার টাকা অফার করি। উনি রাজি হন। আমি তখনই চেক লিখে দিচ্ছিলাম, উনি দু'দিন পরে ক্যাশ নিয়ে আসতে বললেন। তাই বুধবার আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়। মঙ্গলবার কাগজে দেখি উনি মারা গেছেন। তারপর আমি দেরাদুন চলে যাই। পরশু ফিরেছি।

মণিবাবু বললেন, আপনি যেদিন দেখা করতে আসেন সেদিন ওঁর শরীর কেমন ছিল?

ভালই তো। তবে ওঁর বোধহয় একটা ধারণা হয়েছিল উনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। দু'-একটা কথায় সেরকম একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

আপনার সঙ্গে কোনও কথা কাটাকাটি হয়নি তো?

প্রশ্নটা শুনে সুরজিৎবাবুর মুখ কয়েক মুহূর্তের জন্য বেশ কালো হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় বললেন, আপনি কি ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাকের জন্য আমাকে দায়ী করছেন?

মণিবাবুও যথাসম্ভব ঠাণ্ডাভাবেই বললেন, আপনি ইচ্ছে করে কিছু করেছেন বলছি

না। তবে আপনি যাবার কিছুক্ষণ পরেই তো উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই...

তা হতে পারে, তবে আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। এনিওয়ে, আপনি আমার ব্যাপারে নিশ্চয় একটা ডিসিশন নিতে পারবেন। আমি ক্যাশ টাকা নিয়ে এসেছি—দু'হাজার—ভদ্রলোক পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করলেন—যন্ত্র দুটো আজ পেলে ভাল হত। আমি কাল দেরাদুন ফিরে যাচ্ছি। আমি থাকি ওখানেই। ওখানেই মিউজিক নিয়ে রিসার্চ করি।

কোন দুটো যন্ত্রের কথা বলছেন আপনি?

সুরজিৎবাবু খাট থেকে উঠে দেয়ালের দিকে গিয়ে হুকে ঝোলানো একটা বাজনার দিকে দেখিয়ে বললেন, একটা হলো এটা। এর নাম খামাঞ্চে—ইরানের যন্ত্র। এটার নাম জানতাম, কিন্তু দেখিনি কখনো। বেশ পুরনো যন্ত্র। আর অন্যটা হলো—

সুরজিৎবাবু ঘরের উল্টো দিকে একটা নিচু টেবিলের উপর রাখা ছোট্ট হারমোনিয়ামের মতো দেখতে যন্ত্রটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এটাই কিছুক্ষণ আগে সাধন বাজাচ্ছিল। ভদ্রলোক সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এটার নাম মেলোকর্ড। এটা বিলিতি যন্ত্র ঃ আগে দেখিনি কখনো। আমার বিশ্বাস অল্প কয়েকদিনের জন্য ম্যানুফ্যাকচার হয়েছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। খুব সিম্‌পল্‌ যন্ত্র ; তবে আর পাওয়া যায় না বলে এক হাজার অফার করেছিলাম। উনি তখন রাজিই হয়েছিলেন—

ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না মিস্টার দাশগুপ্ত।

সুরজিৎবাবু থম্‌কে গেলেন। কথাটা বলেছে ফেলুদা, আর বলেছে বেশ জোরের সঙ্গে। 'তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ হানা'র কথাটা কোন বইয়ে যেন পড়েছি। সুরজিৎবাবু মণিবাবুর দিক থেকে বাঁই করে ঘুরে ফেলুদার দিকে সেই রকম একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ হেনে শুকনো ভারি গলায় বললেন, আপনি কে?

উত্তর দিলেন মণিবাবু।

উনি আমার বন্ধু। তবে উনি ঠিকই বলেছেন। ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না। তার প্রধান কারণটা আপনার বোঝা উচিত। কাকা যে ওগুলো আপনাকে বিক্রি করতে রাজি ছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ কিছু না বলে গট্‌গট্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফেলুদাও দেখি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। সুরজিৎবাবুর ঘটনাটা যেন কিছুই না এই রকম একটা ভাব করে সে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে খামাঞ্চে যন্ত্রটাকে মন দিয়ে দেখল। রাস্তায় যে খেলার বেহালা বিক্রি হয়, অনেকটা সেই রকম দেখতে। যদিও তার চেয়ে অনেক বড়, আর গোল অংশটায় খুব সুন্দর কাজ করা।

এবার খামাঞ্চে ছেড়ে ফেলুদা গেল মেলোকর্ড যন্ত্রটার কাছে। সাদা-কালো পর্দায় চাপা দিতেই আবার সেই পিয়ানো আর সেতার মেশানো টুং টাং শব্দ।

এই বাজনার আওয়াজই শুনেছিলে কি? ফেলুদা সাধনকে জিগ্যেস করল।

হতে পারে।

সাধনের মতো এত অল্প বয়সে এত গম্ভীর ছেলে আমি খুব কম দেখেছি।

pathagar.net

এবার ফেলুদা আলমারির দেরাজ থেকে এক তাড়া পুরনো কাগজ বার করে মণিবাবুকে বলল, এগুলো আমি একটু বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি কি?

মণিবাবু বললেন, নিশ্চয়ই! আরো যদি কিছু...

না, আর কিছু দরকার নেই।

আমরা যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি তখন সাধন জানালা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত সুর গুন গুন করছে।

সেটা কিন্তু কোনও ফিল্মের গানের সুর নয়।

।। তিন ।।

ফেলুদা মণিমোহনবাবুর কাছ থেকে দু'দিন সময় চেয়ে নিয়েছিল। চাইতেই হবে, কারণ রাধারমণবাবুর বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনও চাবি, বা চাবি দিয়ে খোলা যায় এমন কোনও বাক্স বা ওই ধরনের কিছু পাওয়া যায়নি। তাই ফেলুদা বলল, এক নম্বর, ওকে চুপচাপ বসে চিন্তা করতে হবে ; দুই নম্বর, রাধারমণবাবুর কাগজপত্র ঘেঁটে লোকটা সম্বন্ধে আরো কিছু জানা যায় কিনা দেখতে হবে, আর তিন নম্বর গান-বাজনা সম্বন্ধে আরেকটু ওয়াকিবহাল হতে হবে।

বামুনগাছি থেকে ফেরার পথে মণিমোহনবাবু বললেন, কি রকম বুঝছেন মিস্টার মিত্তির?

ফেলুদা তার গম্ভীর ও অন্যমনস্ক ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আপনাকে কতগুলো সন তারিখের ব্যাপারে একটু হেল্‌প করতে হবে।

বলুন।

আপনার খুড়তুতো দাদা—অর্থাৎ রাধারমণবাবুর ছেলে মুরলিধর—কবে মারা গেছেন?

ফর্টি ফাইভে। আটাশ বছর আগে।

তখন তাঁর ছেলের বয়স কত ছিল?

ধরণীর? ধরণীর বয়স ছিল সাত কিম্বা আট।

ওরা কলকাতাতেই থাকত?

না। দাদা ভাগলপুরে ডাক্তারি করতেন। উনি মারা যাবার পর বৌদি ছেলেদের নিয়ে কলকাতায় এসে শ্বশুরবাড়িতে ওঠেন। তখন বাবা ছিলেন আমহার্স্ট স্ট্রিটে। আমহার্স্ট স্ট্রিটেই বৌদি মারা যান। ধরণী তখন সিটি কলেজে পড়ছে। মা মারা যাবার পর থেকেই তার মতিগতি বদলে যায়। সে পড়াশুনো ছেড়ে থিয়েটারে ঢোকে। আর তার বছরখানেক পরে কাকাও চলে গেলেন বামুনগাছি। ওঁর বাড়িটা তৈরি হয়েছিল—

ফিফটি-নাইনে। গেটের গায়ে ডেট লেখা রয়েছে।

রাধারমণবাবুর কাগজপত্রের মধ্যে ছিল কিছু পুরনো চিঠি, কিছু ক্যাশমেমো, দুটো ওষুধের প্রেসক্রিপশন্, স্পীগ্‌লার নামে একটা জার্মান কোম্পানির পুরনো ক্যাটালগ—তাতে নানারকম বাজনার ছবি ও দাম—খাতার কাগজে লেখা কয়েকটা বাংলা গানের স্বরলিপি, খবরের কাগজ থেকে নানান সময়ে কাটা পাঁচটা নাটকের সমালোচনা—সেগুলোতে সঞ্জয়

pathagar.net

লাহিড়ী বলে একজন অভিনেতার প্রশংসা নীল পেন্সিলে আন্ডারলাইন করা।

এর মধ্যে তিনটে জিনিস নিয়ে ফেলুদা মন্তব্য করল। স্বরলিপিগুলো দেখে বলল, সুরজিৎবাবু যে পোস্ট্কার্ডটা দেখালেন, তার হাতের লেখার সঙ্গে এ লেখা মিলে যাচ্ছে। ক্যাটালগটা দেখে বলল, মেলোকর্ড বলে কোনও যন্ত্রের নাম এতে দেখেছি না। আর থিয়েটারের সমালোচনাগুলো দেখে বলল, যদ্দুর মনে হচ্ছে, এই সঞ্জয় লাহিড়ী আর ধরণীরধর সমাদ্দার একই লোক। আর তাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে নাতির মুখ না দেখলেও তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবরটা রাখতেন রাধারমণবাবু।

কাগজগুলো সযত্নে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখে ফেলুদা থিয়েটারের পত্রিকা মঞ্চলোক-এ টেলিফোন করে সঞ্জয় লাহিড়ী কোন যাত্রার দলে আছে জিগ্যেস করল। জানা গেল দলের নাম মর্ডান অপেরা। সেখানে সঞ্জয় লাহিড়ী হিরোর পার্ট করে। তারপর মর্ডান অপেরার অফিসে ফোন করে জানা গেল যাত্রার দল তিন সপ্তাহ হলো জলপাইগুড়ি ট্যুরে বেরিয়ে গেছে। ফিরতে আরো দিন সাতেক। এ খবরটা অবিশ্যি মণিবাবু আগেই দিয়েছিলেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা বেরোলাম। একদিনে একসঙ্গে এতরকম জায়গায় অনেকদিন যাইনি। প্রথমে যাদুঘর। কেন যাচ্ছি আগে থেকে জানি না, কারণ ফেলুদার এখন মৌনীপর্ব। তার উপরে মাঝে মাঝে আঙুল মটকাচ্ছে। বুঝাচ্ছে সে ভীষণ মন দিয়ে ভাবছে, তাই ডিস্টার্ব করা চলবে না। যাদুঘরে যে এরকম একটা বাজনার সংগ্রহ আছে সেটা জানতাম না। অবিশ্যি সবই দিশি বাজনা—একেবারে মহাভারতের যুগ থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত। শুধু বীণাই যে এতরকম হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না।

এর পরে বিলিতি বাজনার দোকান। ফ্রী স্কুল স্ট্রিটের সাল্‌দান্‌হা কোম্পানি বলল মেলোকর্ডের নাম কখনো শোনেনি। সেখান থেকে গেলাম লালবাজারে। লালবাজারের মণ্ডল কোম্পানির একটা ক্যাশমেমো রাধারমণবাবুর কাগজপত্তরের মধ্যে ছিল, তাই বোধহয় ফেলুদা সেখানে গেল। দোকানের মালিক একেবারে জহর রায়ের মতো দেখতে। বললেন, সমাদ্দার মশাই আমাদের অনেকদিনের খদ্দের। সেই আমার ফাদারের টাইম থেকে।

মেলোকর্ড বলে কোনও যন্ত্রের নাম শুনেছেন? ফেলুদা জিগ্যেস করল।

মেলোকর্ড? কই, না তো। ক্ল্যারিয়োনেট টাইপের কিছু? ফুঁ দেওয়া যন্ত্র? উইন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট?

ফেলুদা বলল, না। বলতে পারেন হারমোনিয়াম টাইপের। সাইজে অনেক ছোট। আওয়াজটা পিয়ানো আর সেতারের মাঝামাঝি।

ছোট সাইজের বাজনা? তাতে ক'টা অকটেভ পাচ্ছেন আপনি?

আমি জানি যে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা—এই আটটা সুরে মিলে একটা অকটেভ হয়। মণ্ডলের দোকানেই একটা হারমোনিয়ামে দেখছি তিন অকটেভের বেশি পর্দা রয়েছে। মেলোকর্ডে মাত্র একটা অকটেভ রয়েছে শুনে মণ্ডল মাথা নেড়ে বললেন, না মশাই। এ শুনে মনে হচ্ছে খেলনা-টেলনা ধরনের কিছু হবে। আপনি বরঞ্চ নিউ মার্কেটে দেখুন।

এর পরে ফেলুদা কলেজ স্ট্রিটের দাশগুপ্তের দোকান থেকে উনিশ টাকা দিয়ে

তিনটে সংগীতের বই কিনল। তারপর সেখানে থেকে বিধান সরণিতে মঞ্চলোকের অফিসে গিয়ে অনেক খুঁজে সঞ্জয় লাহিড়ীর একটা দুমড়ানো ছবি চেয়ে নিল। দাম দিতে হবে কিনা জিগ্যেস করাতে সম্পাদক প্রতুল হাজরা জিভ কেটে বলল, দামের কথা কী বলছেন! আপনি ফেলু মিত্তির না?

রাস্তার মোড়ের একটা দোকান থেকে ঠাণ্ডা লস্যি খেয়ে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরতে হয়ে গেল সাড়ে সাতটা। এসে দেখি পাড়া ঘুরঘুট্টি, লোডশেডিং চলছে। ফেলুদা তার মধ্যেই মোমবাতি জ্বালিয়ে গানের বইগুলো উলটে-পালটে দেখতে লাগল। ন'টায় আলো আসার পর বলল, তোপসে—তুই শ্রীনাথকে নিয়ে চট্ করে একবারটি পটুদের বাড়ি চলে যা তো—গিয়ে বল ফেলুদা একদিনের জন্যে হারমোনিয়ামটা চেয়েছে।

ঘুমোবার আগে পর্যন্ত শুনলাম ফেলুদা প্যাঁ প্যাঁ করে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ঘরে একটা প্রকাণ্ড লোহার দরজা আর তাতে একটা প্রকাণ্ড ফুটো। ফুটোটা এত বড় যে তার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে উলটো দিকে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু তা না করে আমি, ফেলুদা আর মণিমোহনবাবু তিনজনে একসঙ্গে একটা প্রকাণ্ড চাবিকে আঁকড়ে ধরে সেটাকে ফুটোটার মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করছি আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত একটা আলখাল্লা পরে তিড়িং-বিড়িং লাফাচ্ছেন আর সুর করে বলছেন, এইট টু নাইন ওয়ান—এইট টু নাইন ওয়ান—এইট টু নাইন ওয়ান!

।। চার ।।

পরদিন মঙ্গলবার। মণিমোহনবাবু বলেছিলেন বুধবার আবার খবর নেবেন, কিন্তু সকাল সাতটায় তাঁর টেলিফোন এসে হাজির। ফোনটা আমিই ধরেছিলাম ; ফেলুদাকে ডেকে দিচ্ছি বলাতে বললেন, দরকার নেই। তুমি ওঁকে বল আমি এক্ষুণি আসছি, জরুরি কথা আছে।

পনের মিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোক এসে গেলেন। বললেন, অবনীবাবু এই একটুক্ষণ আগে বামুনগাছি থেকে ফোন করেছিলেন। কাকার শোবার ঘরে মাঝরাত্রে লোক ঢুকেছিল।

ওই জার্মান তালার সংকেত আর কে জানে? ফেলুদা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল।

আমার ভাইপো জানত। অবনীবাবু জানেন কিনা জানি না। বোধহয় না। তবে সামনের দরজা দিয়ে ঢোকেনি সে লোক।

তবে?

বাথরুমে জমাদার ঢোকার দরজা দিয়ে।

কিন্তু কাল যখন বাথরুমে গেলাম তখন তো সে দরজা বন্ধ ছিল। আমি নিজে দেখেছি।

পরে হয়ত কেউ খুলেছিল। যাই হোক—কিছু নিতে পারেনি! ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অনুকূল টের পেয়ে গেস্‌ল।...আপনি এখন ফ্রী আছেন? একবার যেতে পারবেন?

নিশ্চয়ই। তবে তার আগে একটা প্রশ্ন আছে। রাধারমণবাবুর নাতিকে—অর্থাৎ আপনার ভাইপো ধরণীধরকে—এখন দেখলে চিনতে পারবেন?

মণিবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, অনেক কাল দেখা নেই ঠিকই, তবু হাজার হোক ভাইপো তো!

ফেলুদা তার ঘর থেকে একটা ছবি এনে মণিমোহনবাবুকে দিল। মঞ্চলোকের অফিস থেকে আনা সঞ্জয় লাহিড়ীর ছবি, তার উপর ফেলুদা কালি দিয়ে একজোড়া গোঁফ আর একটা মোটা ফ্রেমের চশমা এঁকে দিয়েছে। মণিবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, আরে, এ যে দেখছি—

সুরজিৎ দাশগুপ্তের মতো মনে হচ্ছে কি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কেবল নাকের কাছটায় একটু...

যাই হোক, মিল একটা আছে। এটা আসলে আপনার ভাইপোরই ছবি, আমি কেবল একটু রং চড়িয়েছি।

আশ্চর্য!...আমারও কথাটা মনে হয়নি তা নয়। ইনফ্যাক্ট, কাল রাত্রে একবার ভেবেছিলাম আপনাকে ফোন করে বলি। কিন্তু প্রেসে ওভারটাইম কাজ হচ্ছিল, ফিরতে অনেকরাত হলো, তাই আর বলা হয়নি। অবিশ্যি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা সম্ভবও হত না। ধরণীকে গত পনের বছরে প্রায় দেখিনি বললেই চলে। থিয়েটারেও না, কারণ ও বাতিকটা আমার একদম নেই ; আর যাত্রা তো ছেড়েই দিলাম। অথচ আপনার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে তো...

তাহলে দুটো ব্যাপার প্রমাণ করতে হয়। এক—সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলে আসলে কেউ নেই, দুই—সঞ্জয় লাহিড়ী যাত্রার দল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছে, এবং সেটা এসেছে আপনার কাকার মৃত্যুর আগেই। তোপ্সে—মিনার্ভা হোটেলের নম্বরটা বার কর তো।

হোটেলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলে একজন সেখানে এসেছিলেন বটে, কিন্তু গতকাল সন্ধ্যেবেলা তিনি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।

মর্ডান অপেরায় ফোন করে লাভ নেই, কারণ কালকেই তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, আর তারা বলেছে যে সঞ্জয় লাহিড়ী ট্যুরে গেছে।

বামুনগাছি পৌঁছিয়ে ফেলুদা প্রথমে পাঁচিলের বাইরেটা ঘুরে দেখল। যেই আসুক, তাকে গাড়ি বা ট্যাক্সি করে আসতে হয়েছে। আর সে গাড়ি বাড়ি থেকে দূরে রেখে বাকি পথটা হেঁটে এসে পাঁচিল টপকাতে হয়েছে। শেষের কাজটা কঠিন নয়, কারণ তিন জায়গায় পাঁচিলের বাইরে গাছ রয়েছে, আর সে গাছের নিচু ডাল পাঁচিলের উপর দিয়ে কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকেছে। মুশকিল হচ্ছে কি, বর্ষার দিন হলে মাটিতে পায়ের ছাপ পড়ত, কিন্তু এ মাটি একেবারে খটখটে শুকনো।

অনুকূলের শরীর ভাল নয়। সে তার ঘরে বিছানায় শুয়ে কুঁই-কুঁই করে যা বলল তাতে বোঝা গেল যে মাথার যন্ত্রণায় আর মশার কামড়ে রাত্রে তার ভাল ঘুম হচ্ছিল না। সে যেখানে শোয় সেখান থেকে তার খাটের পাশের জানালা দিয়ে সোজা রাধারমণবাবুর ঘরের জানলা দেখা যায়। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ সেই ঘরে একটা আলো দেখে সে ধড়মড়িয়ে উঠে 'কে কে' বলে হাঁক দিয়ে ছুটে যায়। কিন্তু সে পৌঁছবার আগেই দেখে একজন লোক রাধারমণবাবুর বাথরুমের দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বাকি রাতটা নাকি অনুকূল রাধারমণবাবুর ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকে।

অন্ধকারের মধ্যে সে লোককে চিনতে পারনি বোধহয়? মণিবাবু প্রশ্ন করলেন।

না বাবু। আমি বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখি না, আর কাল আবার ছিল অমাবস্যা...

রাধারমণবাবুর ঘরে গিয়ে দেখলাম জিনিসপত্তর যেমন ছিল তেমনিই আছে। কিন্তু তাও ফেলুদার গম্ভীর গলার স্বরে বেশ ঘাবড়ে গেলাম।

মণিবাবু, বারাসত থানায় খবর দিতে হবে। এ বাড়িতে আজ রাত থেকে পাহারার বন্দোবস্ত করতে হবে। সে লোক আবার আসতে পারে। আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত যদি সঞ্জয় লাহিড়ী নাও হন, তাহলেও তাকে সন্দেহ করতে হবে, কারণ ওই দুটো যন্ত্রের উপর তার যথেষ্ট লোভ। পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব না হলে অন্য উপায়ে ওগুলো হাত করার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। এই সব কালেক্টরদের গোঁ বড় সাংঘাতিক।

মণিবাবু বললেন, আমি অবনীবাবুর বাড়ি থেকে এক্ষুণি থানায় ফোন করে দিচ্ছি। ও-সির সঙ্গে আমার আলাপ আছে।

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফেলুদা মেলোকর্ডটাকে নিয়ে খাটের উপর বসে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল। দারুণ মজবুত তৈরি, দু'পাশের কাঠে সুন্দর কাজ করা। জিনিসটাকে চিৎ করে আলোতে ধরতে একটা রং চটে যাওয়া লেবেল দেখা গেল। ফেলুদা চোখ কুঁচকে লেখাটা পড়ে বলল, স্পীগ্‌লার কোম্পানির তৈরি। মেড ইন জার্মানি।

ফেলুদা হারমোনিয়াম বাজাতে জানে না ঠিকই, কিন্তু কাঁচা হাতে একটা একটা করে পর্দা টিপে যখন জনগনমন-র খানিকটা মেলোকর্ডে বাজাল, তখন যন্ত্রটার গুণে সেটা শুনতে বেশ ভালই লাগছিল। তারপর সেটাকে আবার টেবিলের উপর রেখে বলল, একবার ইচ্ছে করে জিনিসটাকে ভেঙে ভেতরে কী আছে দেখি ; কিন্তু যদি দেখি কিছু নেই তাহলে বাজনাটার জন্য আপশোস হবে। সুরজিৎ দাশগুপ্ত এক হাজার টাকা অফার করছিল এটার জন্যে।

অনুকূল এই শরীর নিয়েও সরবত করে এনেছিল, সেটায় চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মণিমোহনবাবু ফিরে এসে বললেন, থানায় বলে দিয়েছি। দু'জন লোক থাকবে সন্ধ্যা থেকে। অবনীবাবু বাড়ি ছিলেন না ; সাধনকে নিয়ে কলকাতা গেছেন। ফিরবেন বিকেলে।

ফেলুদা বলল, রাধারমণবাবুর টাকা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা আপনি ছাড়া আর কে জানতে পারে?

মণিবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, আমি নিজে জেনেছি কাকার মৃত্যুর পরে। টাকা যে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে সেটা অবিশ্যি অবনীবাবু জানেন, কিন্তু তার অ্যামাউন্টটা কত হতে পারে সেটা জানার কথা নয়। আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত যদি আসলে ধরণীধর হয়ে থাকে, তাহলে সে যেদিন কাকার সঙ্গে এসে কথা বলেছিল, সেদিন কিছু জেনে থাকতে পারে। আমার তো বিশ্বাস সে কাকার কাছে টাকাই চাইতে এসেছিল। তারপর কাকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়, তার ফলে...

মণিবাবু কথাটা শেষ করলেন না।

ফেলুদা তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, তার ফলে আপনার কাকার হার্ট অ্যাটাক হয়। আর সেই অবস্থাতেই ধরণীধর ঘরের মধ্যে টাকার অনুসন্ধান করে। আপনি এই

ভাবছেন তো?

হুঁ...কিন্তু আমি এটাও জানি যে সে টাকা খুঁজে পায়নি।

যদি পেত তাহলে সে বাজনা কেনার অজুহাতে আবার ফিরে আসত না—এই তো?

ঠিক তাই। তার ধারণা ওই দুটো বাজনার একটার মধ্যে টাকাটা রয়েছে।

মেলোকর্ড।

মণিবাবু ফেলুদার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলেন।

আপনি তাই বলছেন?

আমার মন তাই বলছে, ফেলুদা বলল। তবে আমি আন্দাজে ঢিল মারা পছন্দ করি না। আর আপনার কাকার শেষ কথাগুলোও আমি ভুলতে পারছি না। আপনার শুনতে কোনও ভুল হয়নি তো? উনি 'চাবি' কথাটাই বলেছিলেন তো?

মণিবাবু হঠাৎ কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, কী জানি মশাই, চাবি বলেই তো মনে হলো। অবিশ্যি...এমন হতে পারে যে কাকা আসলে প্রলাপ বকছিলেন। চাবি কথাটার হয়ত কোনও অর্থ নেই।

কথাটা শুনে আমার মনটা বেশ দমে গিয়েছিল। কিন্তু ফেলুদার মধ্যে দমবার কোনও লক্ষণ দেখলাম না। ও বলল, প্রলাপই হোক আর যাই হোক, এ ঘরে টাকা আছে। আমি যেন সে টাকার গন্ধ পাচ্ছি। চাবিটা আসল কথা নয়। আসল কথা টাকা।

তাহলে আপাতত কী করবেন সেটা ঠিক করুন।

করেছি। আপাতত বাড়ি ফিরব। দিনের বেলা কোনও ভয় নেই। অনুকূলকে বলে দেবেন চোখ রাখতে আর বাইরের কোনও লোককে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়। রাত্রে তো পাহারাই থাকবে। আমি বাড়ি গিয়ে আমার খাতা নিয়ে আমার ঘরে আমার খাটের উপর বালিশে বুক দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে চিন্তা করব। একটা আবছা আলো দেখতে পাচ্ছি, সেটা আরো উজ্জ্বল হওয়া দরকার। তবে একটা কথা, তেমন বুঝলে রাতটা আমি এখানে কাটাতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো?

মোটেই না। আটটা নাগাদ আপনাকে তুলে নিতে পারি।

ভাল কথা—আপনি সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাস করেন!

সংখ্যাতত্ত্ব? মণিমোহন ভ্যাবাচ্যাকা।

ফেলুদা তার একপেশে হাসি হেসে বলল, আপনাদের সবাইয়ের নাম দেখছি পাঁচ অক্ষরের—রাধারমণ, মুরলিধর, ধরণীধর, মণিমোহন—তাই প্রশ্নটা মনে এল।

।। পাঁচ ।।

আগে লেখ্—মৃতব্যক্তির নাম কী ছিল।

ফেলুদা তার খাটে বসে আছে, আমি তার পাশে চেয়ারে। আমার হাতে সে খাতা পেনসিল ধরিয়ে দিয়েছে। আমি লিখলাম—

রাধারমণ সমাদ্দার।

তার নাতির নাম?

ধরণীধর সমাদ্দার।

নাতির থিয়েটারী নাম?

সঞ্জয় লাহিড়ী।

দেরাদুনের বাজনা সংগ্রাহকের নাম?

সুরজিৎ দাশগুপ্ত।

রাধারমণের প্রতিবেশীর নাম?

অবনী সেন।

তার ছেলের নাম?

সাধন সেন।

রাধারমণের শেষ কথা কী ছিল?

আমার নামে...চাবি...চাবি...

গানে একটা সা থেকে তার পরের সা পর্যন্ত ক'টা সুর থাকে?

এর মধ্যে ফেলুদা তার কেনা সংগীত প্রবেশিকার প্রথম চ্যাপ্টারটা আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে। গান নিয়ে সে কেন এত মেতে উঠেছে জানি না। যাই হোক্, আমি লিখলাম—

বারোটা।

কী কী?

সাতটা শুদ্ধ, চারটে কোমল, একটা কড়ি।

শুদ্ধ সুর কী কী? কিভাবে লেখে?

স র গ ম প ধ ন।

কোন-কোনটা কোমল হয়?

র গ ধ ন।

কীভাবে লেখে?

ঋ জ্ঞ দ ণ।

আর কড়ি?

ম।

কীভাবে লেখে?

হ্মা।

এবার দে কাগজটা।

দিলাম।

এবার বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বোস্। দরজাটা ভেজিয়ে দে। আমি কাজ করব।

গেলাম বৈঠকখানায়। দরজা ভেজালাম। সোফায় বসলাম। চাঁদের পাহাড় বইটা তিনবার পড়েছি, আবার পড়তে শুরু করলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফেলুদার ঘরের এক্সটেনশন টেলিফোনে ডায়াল করার আওয়াজ পেলাম। কৌতূহল সামলাতে না পেরে দরজার কাছে গিয়ে কান লাগালাম। ফেলুদার গলা পেলাম,—ডাক্তার বোস আছেন, চিন্তামণি বোস?

ফেলুদা সেই হার্ট স্পেশালিস্টকে ফোন করছে, যাকে মণিবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর

pathagar.net

কাকাকে দেখাতে।

ফোনটা কাকে করছে সেটাই জানতে চাইছিলাম, বাকি কথা শোনার দরকার নেই। আমি আবার জায়গায় এসে বসলাম।

দশ মিনিট পরে আবার কটর কটর শব্দ। ডায়ালিং-এর।

উঠে দরজায় গেলাম। কান লাগালাম।

ইউরেকা প্রেস? কে কথা বলছেন?

মণিমোহনবাবুর প্রেস। ব্যস্—এইটুকুই যথেষ্ট। আমি আবার চাঁদের পাহাড় নিয়ে বসলাম।

চারটের সময় যখন শ্রীনাথ চা আনল, তখনও ফেলুদা ঘর থেকে বেরোল না। শেষে যখন দেয়াল ঘড়িতে দেখি চারটে পঁয়ত্রিশ, আর আমি ভাবছি আমার ওই ক'টা লেখা নিয়ে ফেলুদা অত কী ভাবছে, ঠিক সেই সময়ে ও দরজা খুলে হাতে একটা আধপোড়া চারমিনার নিয়ে বেরিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, মাথা ভোঁ ভোঁ করছে রে তোপ্সে, একটা বিরাশি বছরের বুড়োর মরার মুখে বলা সামান্য তিনটে কথার মানে নিয়ে এত কেন ভাবতে হলো সেটা ভেবে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। এর জন্যে অবিশ্যি দায়ী আমাদের বাংলা ভাষা...

আমি অবিশ্যি ফেলুদার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে না পেরে ওর দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। দেখতে পাচ্ছি ওর মুখের চেহারা বদলে গেছে, আর বুঝতে পারছি যে, যে আবছা আলোটার কথা ও বলছিল সেটা ওর কাছে আর আবছা নেই।

সা ধা নি সা নি..সব ক'টা শুদ্ধ সুর। শুনে কিছু মনে পড়ছে? কোনও মানে বুঝতে পারছিস?

আমার মাথা আরো গুলিয়ে গেল। ফেলুদা বলল, তোর বুঝতে পারার কথা নয়। পারলে তোতে আর ফেলু মিত্তিরে কোনও তফাত থাকত না।

ভাগ্যিস তফাতটা আছে! আমি ফেলুদার স্যাটিলাইটের বেশি আর কিছু হতে চাই না।

ফেলুদা এই প্রথম সিগারেটটা ছাইদানে না ফেলে ক্যারামের স্ট্রাইকার মারার মতো করে জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে বৈঠকখানার টেলিফোনে গিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করল। দশ সেকেণ্ড পরেই কথা।

কে—মিস্টার সমাদ্দার? চলে আসুন—এক্ষুণি—বামুনগাছি যেতে হবে—হ্যাঁ, হয়ে গেছে—সব পরিষ্কার...মেলোকর্ড...হ্যাঁ, মেলোকর্ডই আমাদের রহস্যের চাবিকাঠি।

তারপর টেলিফোনটা রেখে গম্ভীর গলায় বলল, একটা রিস্ক আছে রে তোপ্সে, কিন্তু সেটা না নিলেই নয়।

মণিবাবুর ড্রাইভার গুরুচরণ দেখতে বুড়ো হলেও ভি আই পি রোডে পঁচাশি কিলোমিটার পার আওয়ার স্পীড তুলল। ফেলুদার ভাব দেখে মনে হলো হান্ড্রেড-টান্ড্রেড হলে সে আরো খুশি হত। এয়ারপোর্টের পর খানিকটা রাস্তা লোকজনের ভিড়ে স্পীড অনেক কমল, কিন্তু পরের দিকে আবার ষাটে উঠল—যদিও রাস্তা তত চওড়া নয়, আর সন্ধ্যেও হয়ে আসছে।

রাধারমণবাবুর গেটের কাছাকাছি এসে ফেলুদা বলল, পাহারার লোক আসার সময় হয়নি বোধহয় এখনো।

গেট দিয়ে ঢুকতেই বাগানে দেখলাম বন্দুক হাতে সাধন দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে ফেলুদা বলল, কী সাধনবাবু, এই সন্ধ্যের আলোতে কী শিকার হচ্ছে?

সাধন বলল, বাদুড়।

রাধারমণবাবুর কম্পাউন্ডের ঠিক বাইরে একটা অশ্বত্থ গাছ থেকে কয়েকটা বাদুড় ঝুলছে সেটা গাড়ি থেকে নেমেই আমার চোখে পড়েছিল।

অনুকূল গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ; মণিবাবু তাকে লণ্ঠন জ্বালতে বলে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন, আর আমরাও ঢুকলাম তাঁর পিছন পিছন। এইট-টু-নাইন-ওয়ান তালাটা খুলতে খুলতে মণিবাবু বললেন, রহস্যের কীভাবে সমাধান হলো সেটা জানতে খুব ইচ্ছে করছে। আসলে মণিবাবুর যা অবস্থা, আমারও তাই।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে ফেলুদা তার ভীষণ জোরালো টর্চটা ঘরে পশ্চিমের দেয়ালের নিচের দিকে ফেলল। আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। আলোটা সোজা গিয়ে টেবিলে রাখা মেলোকর্ডের উপর পড়েছে। ঝক্‌ঝকে সাদা পর্দাগুলো দেখে মনে হচ্ছে বাজনাটা দাঁত বের করে হাসছে। ফেলুদা টর্চটাকে সেইভাবেই ধরে রেখে বলল—

চাবি। ইংরিজিতে Key, বাংলায় চাবি। ওই যে সাদা-কালো পর্দাগুলো দেখছিস, ওর আর একটা নাম হলো চাবি, আর সেই চাবির কথাই—

চোখের পলকে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল যেটা ভাবতে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মণিবাবু হঠাৎ বাঘের মতো লাফিয়ে মেলোকর্ডটাকে তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে ফেলুদার মাথায় একটা প্রচণ্ড বাড়ি মেরে আমাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ফেলুদা মার খাবার ঠিক আগেই নিজেকে বাঁচানোর জন্য টর্চ সমেত হাত দুটো মাথার উপর তুলেছিল। তাই হয়ত তার মাথায় চোট লাগেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাতের যন্ত্রণাতেই সে দেখি খাটে বসে পড়েছে। আমি নিজে মেঝে থেকে উঠতে না উঠতেই বুঝলাম মণিবাবু বাইরে থেকে এইট-টু-নাইন-ওয়ান বন্ধ করে দিয়েছেন।

আমি তাও দৌড়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে দরজায় একটা ধাক্কা মেরেছি, এমন সময় ফেলুদার গলা পেলাম—বাথরুম!

বাইরে থেকে গাড়ি স্টার্ট দেবার একটা শব্দ, আর তারপরেই ঠাঁই করে একটা আওয়াজ।

আমরা দু'জনে ঝড়ের মতো বাথরুমে ঢুকে জমাদারের দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। বাগানের দিক থেকে গোলমাল, অনুকূলের গলা, অবনীবাবুর গলা। মণিবাবুর গাড়িটা বাঁই করে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমরা সামনের দরজার কাছে পৌঁছে গেছি।

ওটা কে বসে আছে কাঁকড় বিছানো রাস্তার উপর? অবনীবাবু চেঁচাচ্ছেন—তুমি কী করলে সাধন! এটা কী করলে তুমি! ছি-ছি-ছি!

সাধন তার সরু অথচ গম্ভীর গলায় বেশি ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, ও যে দাদুর বাজনা নিয়ে পালাচ্ছিল!

এবার ফেলুদা বলল, ও ঠিকই করেছে, অবনীবাবু! অপরাধীকে এয়ার গান দিয়ে পঙ্গু করে ও আমাদের সাহায্যই করেছে—যদিও ভবিষ্যতে ওকে একটু সাবধানে বন্দুক চালাতে হবে।...আপনি এক্ষুণি থানায় ফোন করে দিন। গাড়িটাকেও যেন পালাতে না দেয়—ওর নম্বর হলো ডব্লু এম এ সিক্স ওয়ান সিক্স ফোর।

অনুকূল আর ফেলুদা দু'জনে মিলে মণিবাবুকে ধরে তুলল। তাঁর কপালের বাঁ দিক থেকে ছর্‌রার গুলি লেগে রক্ত পড়ছে। ভদ্রলোক একেবারে থুম মেরে গেছেন।

মেলোকর্ডটা মণিবাবুর পাশেই কাঁকড়ের উপর পড়ে ছিল, আমি সেটাকে খুব সাবধানে তুলে নিলাম।

আমরা চারজন রাধারমণবাবুর খাটের পাশে গোল হয়ে চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি। চারজন মানে আমি, ফেলুদা, অবনীবাবু, আর বারাসত থানার দীনেশ গুঁই, ইনি বোধহয় ইনস্পেক্টর-টিনস্পেক্টর হবেন। ঘরের এক কোণে সিন্দুকটার সামনে আরো দু'জন লোক রয়েছে। একজন দাঁড়িয়ে, সে বোধহয় কন্‌স্টেবল, আর আরেকজন চেয়ারে ঘাপটি মেরে বসে। ইনি হলেন অপরাধী মণিমোহন সমাদ্দার, যার কপালে এখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এছাড়া সাধনও রয়েছে। সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে দেখছে। আমাদের পাঁচজনের মাঝখানে টেবিলের উপর রাখা হয়েছে মেলোকর্ড। এইবার বোধহয় ফেলুদা একটা রহস্য উদঘাটন করবে। ফেলুদার ঘড়ির কাচ ভেঙে গেছে, আর বাঁ হাতের কবজির খানিকটা ছাল উঠে গেছে। রাধারমণবাবুর বাথরুম থেকে ডেটল নিয়ে লাগিয়ে সেখানে সে রুমাল বেঁধে রেখেছে।

হাত থেকে চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ফেলুদা বলতে আরম্ভ করল—মণিমোহন সমাদ্দারকে আমি সন্দেহ করতে আরম্ভ করি আজ দুপুর থেকে। কিন্তু তিনি কোনও একটা বেচাল না চাললে তাঁকে বাগে আনা যাচ্ছিল না। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব। আমি তাই খানিকটা রিস্ক নিয়েই তাঁকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলাম। আমাকে আচমকা আক্রমণ করে বাজনা নিয়ে পালানটাই হলো তাঁর ভুল চাল। শেষ পর্যন্ত তিনি পালাতে পারতেন না ঠিকই, কিন্তু তিনি যে এত তাড়াতাড়ি সায়েস্তা হলেন তার জন্য অবিশ্যি দায়ী সাধনের এয়ার গান।

মণিমোহনবাবুর একটা কথায় প্রথম খটকা লাগে। কথাটা যখন বলেছিলেন তখন লাগেনি, পরে লাগে। উনি বলেছিলেন পরশু ওঁর প্রেসে ওভারটাইম কাজ হচ্ছিল, তাই ওঁর বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল। পরশু ছিল সোমবার। আমি জানি যে-পাড়ায় মণিবাবুর প্রেস, সে-পাড়ায় সন্ধ্যায় নিয়মিত লোডশেডিং হয় ; আমার এক প্রোফেসর বন্ধু সেই একই পাড়ায় থাকে। আজ ইউরেকা প্রেসে ফোন করে জানতে পারি যে প্রথমত, সোমবার বিকেল থেকে লোডশেডিং-এর জন্য কাজ বন্ধ ছিল, আর দ্বিতীয়ত, মণিমোহনবাবু দুপুরের পর আর সেদিন প্রেসেই যাননি। এই মিথ্যে কথাটাতেই আমার মনে ভীষণ খট্‌কা লাগে। আর তার পরেই সন্দেহ হয়—উনি রাধারমণবাবুর শেষ কথা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সেটা সত্যি তো? রাধারমণের মৃত্যুর সময় মণিবাবু ছাড়াও একজন লোক সেখানে ছিলেন। তিনি হলেন ডাক্তার চিন্তামণি বোস। তাঁকে ফোন করে জানতে পারি যে মণিবাবু পুরোপুরি সত্যি কথা বলেননি—রাধারমণের একটা কথা তিনি

গোপন করেছিলেন। রাধারমণ আসলে বলেছিলেন—'ধরণী...আমার নামে...চাবি...চাবি...'। ধরণী হলো রাধারমণের নাতি। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তাঁর নাতিকেই কিছু বলার কথা মনে এসেছিল, ভাইপোকে নয়। ভাইপোকে হয়ত সেই অবস্থায় তিনি চিনতেই পারেননি। আসলে নাতির সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও তার উপর থেকে রাধারমণবাবুর স্নেহ যায়নি। তার অভিনয়ের প্রশংসা কাগজে বেরোলে তিনি তা কেটে রাখতেন। কিন্তু যে কথাটা তিনি নাতিকে বলতে চেয়েছিলেন সেটা শুনে ফেলল তাঁর ভাইপো। 'চাবি' কথাটা শুনে মণিমোহন বুঝলেন যে টাকাপয়সার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু শেষটায় চাবি দিয়ে কিছুই বেরোল না। তখন মণিবাবুকে গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরের কাছে আসতে হলো। মতলব এই যে আমি টাকার সন্ধান দেব, আর উনি সুযোগ বুঝে সেটি আত্মসাৎ করবেন। উইল আছে কিনা জানা নেই। না থাকলে টাকা নাতি পাবে। আর থাকলেও মণিবাবুর পাবার সম্ভাবনা কম, কারণ আমার বিশ্বাস রাধারমণবাবু তাঁর ভাইপোকে পছন্দ করতেন না।

এখন কথা হচ্ছে, আমার কাছ থেকে কিছু একটা লুকোবার জন্যই নিশ্চয়ই মণিবাবুর মিথ্যে কথা বলার দরকার হয়েছিল। তাঁর মাথায় কি সেদিন কোনও ক্রূর অভিসন্ধি খেলছিল, যে কারণে তাঁর পক্ষে প্রেসে যাওয়া সম্ভব হয়নি? সেইদিনই মাঝরাত্রে যে-লোক রাধারমণবাবুর ঘরে হানা দিয়েছিল সে কি তাহলে মণিমোহন সমাদ্দার? এটা আমার কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়, কারণ সেদিনই সকালে আমি যখন রাধারমণবাবুর বাথরুম পরীক্ষা করে দেখি, তখন জমাদারের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। সে দরজা খুলবে কে, এবং কেন? বাথরুমটা তো আর ব্যবহারই হচ্ছে না! আসলে যে লোক ঢুকেছে সে সামনের দরজা দিয়ে জার্মান তালা খুলে ঢুকেছে, সে তালার সংকেত তার জানা, ঘরে ঢুকে সে লোক জমাদারের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জার্মান তালা বন্ধ করে, আবার বাথরুম দিয়ে ঢুকেছে। এই লোক যে মণিমোহন সমাদ্দার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি বোধহয় বাকি কথাটার মানে বুঝে ফেলে মেলোকর্ড নামক চাবিওয়ালা যন্ত্রটা নিতে এসেছিলেন, তাই না?

আমাদের সকলের দৃষ্টি মণিবাবুর দিকে গেল। মাথা হেঁট অবস্থাতেই তিনি আবছা অন্ধকারে দু'বার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

ফেলুদা বলল, চাবি যে বাজনার চাবি সেটা বুঝলেও মণিবাবু বোধহয় রাধারমণের বাকি সংকেতটা ধরতে পারেননি। কারণ অতটা বুদ্ধি ওঁর নেই। এই বাকি সংকেতটা আমি বুঝতে পারি আজ বিকেলে, আর সেটার জন্যেও দায়ী শ্রীমান সাধন।

এবার আমরা সকলে অবাক হয়ে সাধনের দিকে চাইলাম। সেও দেখি বড় বড় চোখ করে ফেলুদার দিকে দেখছে। ফেলুদা বলল, তোমার দাদু সুরের বিষয় কী বলেছিলেন সেটা আরেকবার বলে দাও তো সাধন।

সাধন প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, যার নামে সুর থাকে, তার গলাতেও সুর থাকে।

ফেলুদা বলল, ভেরি গুড। এবার রাধারমণবাবুর আশ্চর্য বুদ্ধির দিকটা ক্রমে বোঝা যাবে। যার নামে সুর থাকে। বেশ। সাধনের নামটাই ধরা যাক। সাধন সেন। এবার অ-কার এ-কার বাদ দিয়ে কি দাঁড়ায় দেখা যাক্। স. ধ. ন. স. ন। অর্থাৎ গানের সুরের

ভাষায় সা ধা নি সা নি। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা নতুন দিক খুলে গেল। 'আমার নামে...চাবি।' রাধারমণবাবু কি এখানে নিজের নামের কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছেন? রাধারমণ সমাদ্দার রে ধা রে মা ণি সা মা দা দা রে! কী সহজ, অথচ কী ক্লেভার, কী চতুর! ধরণীধরও কিন্তু গাইতে পারত, আর তার নামেও দেখছি সুর—ধা রে ণি ধা রে সা মা দা দা রে!

এইটে বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে ওই মেলোকর্ডেই রাধারমণের ব্যাঙ্ক। যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিকে রাধারমণের যে একটা ঝোঁক ছিল সেটা ওই জার্মান তালা থেকে বোঝা যায়। এই মেলোকর্ডও জার্মানিতেই তৈরি। স্পীগ্‌লার কোম্পানি নামে একটি বিখ্যাত বাজনা প্রস্তুতকারক রাধারমণবাবুর বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী এই মেলোকর্ড তৈরি করে। কী ভাগ্যিস এটি সুরজিৎ দাশগুপ্তের হাতে চলে যায়নি। অবিশ্যি যন্ত্র দেবার আগে রাধারমণ তার ভিতরের জিনিস নিশ্চয়ই বার করে নিতেন। বোধহয় ব্যাঙ্কের আর প্রয়োজন বোধ করছিলেন না তিনি। হয়ত তাঁর আর বেশিদিন বাঁচা হবে না এটা তিনি সত্যিই বুঝতে পেরেছিলেন। সুরজিৎ ভদ্রলোকটিকে আমরা মিছিমিছি সন্দেহ করছিলাম, ভাবছিলাম উনি ছদ্মবেশী ধরণীধর। আসলে সুরজিৎবাবু সত্যিই একজন বাজনা পাগল সংগীতজ্ঞ লোক! তার উল্লেখ আমি গানের বইয়েতে পেয়েছি। আর ধরণীধর সত্যিই তার যাত্রার দলের সঙ্গে ট্যুরে বেরিয়েছে। এখন জানা দরকার যে তার ভাগ্যে সত্যিই কোনও অর্থপ্রাপ্তি আছে কিনা। তার অনেকদিন থেকেই একটা নিজের যাত্রা দল করার ইচ্ছে ; মঞ্চলোকের একটা ইন্টারভিউতে সে তাই বলেছে। তোপ্‌সে—লণ্ঠনটা কাছে এনে ধর তো।

আমি লণ্ঠনটা খাটের পাশের টেবিল থেকে তুলে মেলোকর্ডের পাশে এনে ধরলাম।

ফেলুদা বলল, অনেক ধকল গেছে এটার উপর দিয়ে। তবে জার্মান জিনিস তো—দেখা যাক রাধারমণের বুদ্ধি আর স্পীগ্‌লার কোম্পানির কারিগরি মিলে কী জিনিস দাঁড়িয়েছে।

রাধারমণ সমাদ্দারের নামের অক্ষর ধরে ধরে ফেলুদা চাবি টিপতে আরম্ভ করে দিল। টুং টাং টুং টাং করে একটা অদ্ভুত সুর বেরোচ্ছে মেলোকর্ড থেকে। শেষ সুরটা টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাবুকের মতো শব্দ করে সকলকে চমকে দিয়ে মেলোকর্ডের ডান পাশের কাঠটা দরজার মতো খুলে গেল। আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সেই দরজাটার পিছনে রয়েছে লাল মখমলের লাইনিং দেওয়া একটা খুপরি, আর সেই খুপরিতে ঠাসা রয়েছে তাড়া তাড়া একশো টাকার নোট!

নোটগুলো টেনে বার করে ফেলুদা বলল, কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার। আসুন অবনীবাবু, গোনা যাক।

ফেলুদার চোখ লণ্ঠনের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। আমি জানি সেটা লোভ নয়। সেটা তার শান দেওয়া বুদ্ধির খানিকটা অংশ খাটিয়ে একটা মনধাঁধানো জটিল রহস্য সমাধান করার আনন্দ।

কোন হত্যাই নিখুঁত নয়

চিরঞ্জীব সেন

সন্ধ্যা হয়ে গেল। ছেলেটা এখনও ঘরে ফিরল না, অথচ ছাগলটা ফিরে এসেছে বাবা ও মা দু'জনেই উদ্বিগ্ন হল। কোথায় গেল? রোজই ত ফেরে, আজও ত সকলের ছেলেমেয়ে ঘরে ফিরেছে, প্রত্যেকটা গোরু, ছাগল সবই ফিরেছে। তাদের গ্রামের আজ পর্যন্ত কেউই ত নিখোঁজ হয়নি। কোথায় গেল।

সন্ধ্যা পার হল, রাত্রি হল। যারা লণ্ঠন হাতে খুঁজতে বেরিয়েছিল তারা একে একে ম্লানমুখে ফিরে এল। না, কোথাও তার পাত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত সকলে সাব্যস্ত করল, ও বড় রাস্তায় গিয়েছিল, নিশ্চয়ই লরী চাপা পড়েছে, লরীওয়ালা ধরা পড়বার ভয়ে ছেলেটার লাশ তুলে নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেলে দিয়েছে।

তবুও সন্দেহ থাকে। চাপাই যদি দেবে তাহলে সেই ড্রাইভার ত এমনিই পালাতে পারে, আর চাপা পড়লে ত রাস্তায় কোথাও না কোথাও রক্তের দাগ থাকবে নিশ্চয়ই। কোথায় রক্তের দাগ? গ্রাম থেকে এদিকে এক ক্রোশ ওদিকে এক ক্রোশ-এর মধ্যে কোথাও কোনো রক্তের দাগ নেই। রাত্রে বৃষ্টিও হয়নি যে, দাগ ধুয়ে যাবে। তাহলে ছেলেটা কি উবে গেল।

একজন বুদ্ধি করে ছেলের চেহারার বর্ণনা জানিয়ে থানায় খবর দিয়ে এল। থানার লোকেরা এ অঞ্চলে ছেলেধরার কোনো খবর পায়নি, তবে তারা খোঁজ করবে এবং বেঁচে থাকলে ছেলেকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, আশ্বাস দিল বাপ-মাকে থানার দারোগাবাবু।

"তাহা হইলে কি অপরাজেয় ডিটেকটিভ লোকনাথ রায় শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিল? খুনের কোনো কিনারাই সে করিতে পারিবে না?"

লোকনাথের কপালের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরা দপ্ দপ্ করিতেছে। আশ্চর্য! আজ পর্যন্ত লোকনাথ রায় এমনভাবে অপদস্থ হয় নাই। নিষ্ফল আক্রোশে লোকনাথ মুষ্টিবদ্ধ হস্তে ঘরে পায়চারী করিতে লাগিল।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত মাসে মধ্য-কলিকাতার একটি হোটেলের কক্ষে যে সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, পুলিশ তাহার কিনারা করিতে না পারিয়া বিখ্যাত গোয়েন্দা লোকনাথ রায়ের উপর তদন্তের ভার দিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় লোকনাথ রায়ের মতো খ্যাতনামা গোয়েন্দাও এ যাবৎ খুনের কোনো সন্ধান করিতে পারিলেন না। তবে আর কে পারিবেন?

যুবতীটীর কি কোনো আত্মীয়-স্বজন নাই? কেহ ত তাহার সন্ধান লইতে আসিল না!

যাহা হউক লোকনাথ রায় এখনও আশা ছাড়েন নাই এবং শেষ পর্যন্ত তিনি খুনী ধরিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং ধরিয়াছিলেন কি না তাহা পাঠক যথাসময়ে জানিতে পারিবেন..."

পরাশর সামন্তের লেখা বিখ্যাত একখানি ডিটেকটিভ বই রুদ্ধশ্বাসে পড়ে চলেছে গৌরীশঙ্কর। গৌরীশঙ্করের বাবা অতি উচ্চপদস্থ একজন সরকারী অফিসার। সরকারী বাংলোতেই বাপ-মায়ের সঙ্গে সে থাকে। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে গৌরীশঙ্কর, স্বভাবতঃই কিছু আদুরে। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে গৌরীশঙ্কর। পড়ার বই যত না পড়ে তার চেয়েও বেশি পড়ে ডিটেকটিভ বই আর পত্রিকা। প্রত্যেকটি খুন-জখমের রিপোর্ট খবরের কাগজ থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে খাতায় সে বসিয়ে রাখে, গোয়েন্দাতত্ত্ব নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে।

একদিন কলেজের ছুটি ছিল। দুপুরটা কি করে কাটানো যায়? নতুন কোনো বই নেই, সব বই দুই দু'বার তিনবার করে পড়া হয়ে গেছে। কাছে টাকা নেই যে, তখুনি নতুন বই কিনে আনে।

আচ্ছা একটা মজা করা যাক না, ভাবে গৌরীশঙ্কর। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। যা ভেবেছিল তাই। মা ঘুমোচ্ছেন। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে মায়ের আলমারির চাবি নিয়ে আস্তে আস্তে আলমারি খুলে ফেলল। তারপর আরও আস্তে আর একটা চাবি দিয়ে আলমারির সেই ড্রয়ারটা। ড্রয়ারটা খুলে আর একবার উঁকি মেরে দেখে এল মা তখনও ঘুমোচ্ছেন। অনেকটা নিশ্চিন্ত হল, দেওয়ালে টিকটিকিটা ছাড়া কোনো সাক্ষী নেই। সে জানত ড্রয়ারের মধ্যে তার মায়ের কাশ্মীরী যে বাক্সটা আছে তাতে অনেক কুঁচো সোনার গয়না আছে। সেই বাক্সটা আস্তে আস্তে বার করল, ওপরেই ছিল একটা বগলস আংটি। সেইটা সে তুলে নিয়ে বাক্স বন্ধ করে বাক্স ড্রয়ারে রাখল, ড্রয়ার বন্ধ করে চাবি লাগাল, তারপর আলমারি বন্ধ করে চাবি যথাস্থানে রেখে দিল। তার মা কিছুই জানতে পারল না। কোত্থেকে জানতে পারবে? কোনো 'ক্লু' ত আর সে রাখেনি

বাড়ির চাকর ছাড়া মা কাকেই বা 'সাস্পেক্ট' করবেন? বেশ মজা হল।

বেপাড়ায় সোনার দোকানে আংটিটা বেচে দিল গৌরীশঙ্কর। একরাশ ডিটেকটিভ বই কিনল। বাকি টাকাটা রেখে দিল। এই নতুন বইগুলোও এক সময় পড়া শেষ হল।

আর একদিন একটা এক্সপেরিমেণ্ট করতে ইচ্ছে হল গৌরীশঙ্করের। কলেজ থেকে একটু আগেই ফিরেছে। জলটল খেয়ে বাড়ি থেকে বেরুলো হাতে ব্যাডমিন্টনের ব্যাট নিয়ে। মা ভাবলেন ছেলে বুঝি খেলতে গেল। ব্যাটখানা বেরুবার আগে মালীর ঘরে রেখে দিল তারপর গেট খুলে বাইরে বেরুলো। পর পর সব অফিসারদের বাংলো। মিঃ মিশ্রর বাংলোর সামনে এসে মনে হল বাংলোটা যেন বড়ই নির্জন। কেউ নেই নাকি? দেখাই যাক না কেন? একটু ওধারে বুগেনভেলিয়ার ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে মালীর পিঠ আর কোনো একটা মেয়েমানুষের শাড়ীর কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। কে তাকে সন্দেহ করবে? সকলেই ত তাকে চেনে, বলবে ডিকশনারি চাইতে এসেছি। মিসেস্ মিশ্রও তাকে চেনেন। বারান্দায় পা দিয়েই বুঝলো ছেলেমেয়েরাও নেই। তারা আয়ার সঙ্গে বেড়াতে গেছে। মিঃ মিশ্র সম্ভবতঃ এখন ক্লাবে। ড্রইংরুমে ঢুকলো! না কেউ ত নেই? মিসেস্ মিশ্র? এঘরে-ওঘরে উঁকি মেরে বুঝল তিনি বাথরুমে। গৌরীশঙ্কর ইচ্ছে করে একটু আওয়াজ করল। কোনো সাড়া নেই, বুঝল মিসেস্ মিশ্রের বাথরুম থেকে বেরুতে দেরি আছে।

ড্রেসিং টেবিলের ওপরে মিসেস্ মিশ্রের কানের দুটো গয়না পড়ে রয়েছে। গৌরীশঙ্কর গয়না দুটো প্যাণ্টের পকেটে পুরলো। পঞ্চাশটা টাকা ত পাবে। তারপর নিঃশব্দে মিশ্র সাহেবের বাংলো থেকে বেরিয়ে এল।

গৌরীশঙ্করের ক্রমশঃ সাহস বেড়ে গেল। ঐ রকম ছোটোখাটো চুরি সে করতে লাগল। কিন্তু শুধু চুরিতে সে সন্তুষ্ট হচ্ছে না। চুরি করা ত অতি সহজ, ওতে নেই কোনো অ্যাডভেঞ্চার, নেই থ্রিল। যে লোকটা হোটেলে সেই যুবতীকে মেরেছে সে হয়ত সামনের বাড়িটাতেই থাকে। কিন্তু কি মজা, সে সব দেখছে অথচ পুলিশ কিংবা লোকনাথ রায় তাকে ধরতে পারছে না। কি মজা!

একদিনের ঘটনা। বিকেল।

২৩শে জুলাই—গৌরীশঙ্করের মা দেখলেন যে, গৌরী গম্ভীর হয়ে ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে, কোলের ওপর মড়ার খুলি আঁকা একখানা বই রয়েছে। গৌরীশঙ্কর কি যেন চিন্তা করছে। হঠাৎ সে উঠে পড়ল। তারপর তার মাকে বলে বাবার গাড়ি নিয়ে একাই চালিয়ে নিয়ে কোথায় বেরিয়ে পড়ল। মা ভাবলেন, যাক একটু বেড়িয়ে আসুক। সন্ধ্যা পার করে সে ফিরল।

২৭শে জুলাই পুলিশ গৌরীশঙ্করকে গ্রেফতার করল। পুলিশ প্রথমে ইতস্ততঃ করেছিল, অতবড় অফিসারের ছেলে, শেষে তারা নিজেরাই না বিপদে পড়ে, চাকরিটা না যায়। কিন্তু অকাট্য প্রমাণ যে তাদের হাতে।

২৪শে জুলাই একজন লোক এক থানায় গিয়ে খবর দেয় যে, সে দুপুরে যখন তার কুকুর নিয়ে সজারু শিকারের চেষ্টায় বনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল তখন তার কুকুর এক জায়গায় সদ্য খোঁড়া কাঁচা মাটি দেখে পা দিয়ে আঁচড়াতে থাকে। মাটি তুলতে তুলতে একটা ছোট ছেলের হাত দেখা যায়। সে বলে, "আমি ভয় পাই। কুকুরকে জোর করে টেনে নিয়ে আমি

সোজা থানায় চলে এসেছি।” লোকটা বাস্তবিকই ভয় পেয়েছে। তার ভয় থানার লোকরা উল্টে তাকেই ধরে চালান দেয়। দারোগা তাকে ঠাণ্ডা করে সেই জায়গায় নিয়ে গেলেন। কয়েকজন কনস্টেবলও চলল। কুকুরটাই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সেই জায়গায় গিয়ে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে আর লেজ নাড়ে। কাঁচা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটা ছোট ছেলের মৃতদেহ উঠে এল। বুকে যেখানে হৃৎপিণ্ড থাকে ঠিক সেইখানে ছোরা মেরে তাকে খুন করা হয়েছে। ছেলেটার বয়স হবে সাত কিংবা আট বছর। দারোগার মনে পড়ল, পাশের থানার দারোগা একটা খবর দিয়েছেন বটে যে, ছোট একটা ছেলে হারিয়েছে, তাহলে এই কি সেই ছেলে?

যে মাটি খুঁড়ছিল সে ভাবল এই গর্তে হয়ত ছোরাখানাও পাওয়া যাবে। না ছোরা পাওয়া গেল না, যা পাওয়া গেল তার দ্বারা খুনীকে খুব তাড়াতাড়ি ধরা গেল। সেই গর্তে পাওয়া গেল একটা রোল্ড-গোল্ড ফ্রেমের দামী চশমা। এই চশমা কার? এই চশমা ছাড়া আর কোথাও কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না এমন কি জুতোর দাগও নয়। কিছু দূরে নরম ভিজে মাটির ওপর খানিকটা মোটরের টায়ারের দাগ। ব্যস্ আর কোথাও কিছু নেই। দারোগা সেই গর্ত আর মোটরের টায়ারের ছাপের ফটো তোলালেন। তারপর লাশ নিয়ে থানায় ফিরলেন। পাশের থানায় খবর দেওয়া হল। সেই থানার দারোগা আবার হারানো ছেলের বাপ-মাকে খবর দিলেন। হ্যাঁ। এই তাদের ছেলে। কিন্তু এমন নিষ্ঠুর কাজ কে করল? ঐটুকু সরল নিষ্পাপ গ্রাম্য ছেলে কারও ত কোনো ক্ষতি করেনি। এদিকে একটা শুকনো ডোবা থেকে মর্চে পড়া কিন্তু নতুন একখানা ছোরাও পাওয়া গেল।

পুলিশের প্রথম কাজ হল চশমার মালিককে খুঁজে বার করা। এই শহরে দেড়লাখ দু'লাখ লোক আছে। কাকে ধরবে?

শহরে চশমার দোকান বড় বেশি নেই, তিন-চারটে ভাল দোকান আছে আর বাকি দু'চারটে যা আছে তা উল্লেখযোগ্য নয়। প্রথম দোকানদার চশমা দেখে বলল, না এত ভাল চশমা এখানে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় চশমাওয়ালা দেখেই চিনল। বলল, হ্যাঁ এই চশমা আমি বিক্রি করিনি তবে মেরামতের জন্যে আমার কাছে মাসখানেক আগে একবার এসেছিল। চোরাই মাল ধরেছেন বুঝি?

পুলিশ বলল সে কথা পরে বলব, কিন্তু চশমা কার?.........অ্যাঁ! মিঃ অমুক অফিসারের ছেলের! বলেন কি? ঠিক করে বলুন। পুলিশ আবার জিজ্ঞাসা করে। ঠিকই বলছি। আমার ভুল হয়নি—জবাব দেয় চশমাওয়ালা। আপনি ফোন করুন না কেন? পুলিশ আর কিছু বলে না।

যাক একটা ক্লু পাওয়া গেল। সাদা পোশাকে একটা লোক গৌরীশঙ্করের বাবার গাড়ির চাকার দাগ দেখে এল। ঠিক মিলে যাচ্ছে। আরও একটা ক্লু পাওয়া গেল।

ছোরাখানা নতুন! নিশ্চয়ই এখানেই কোনো দোকানে কেনা। দু-তিনটে দোকান খুঁজতে খুঁজতে এক দোকানদার বলল—হ্যাঁ এ ছোরা সেই বিক্রি করেছে, তারিখও বলল। তারিখ সেই ছেলেটি হারানোর দিন। কে কিনেছে? চেহারার যে বর্ণনা দিল তা গৌরীশঙ্করের, চোখে সোনার চশমা ছিল, সে কথাও জানা গেল।

পুলিশ আর বিলম্ব করতে পারে না। পরামর্শসভায় স্থির হল আগে এবং অবিলম্বে গৌরীশঙ্করকে থানায় নিয়ে আসা হক। তার বাবা জানতে পারলে অনেক বাধা আসতে

পারে এবং শেষ পর্যন্ত সব ব্যাপারটাই হয়ত বানচাল হয়ে যাবে।

এদিকে গৌরীশঙ্কর নিশ্চিন্ত। তার ধারণা পুলিশ তাকে সন্দেহ করতেই পারে না, কোথাও কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ রাখেনি, সে ভেবে-চিন্তে প্ল্যান করে কাজ করেছে। ইংরাজীতে যে বলে কোনো হত্যাই নিখুঁত নয়, সে কথা ভুল। কিন্তু শিক্ষিত ও সদ্বংশের ছেলে গৌরীশঙ্করের পক্ষে কি নিরীহ একটা শিশুকে হত্যা করা সম্ভব? আসল হত্যাটা হয়ত আর কেউ করেছে।

ধরা পড়ে কিন্তু গৌরীশঙ্কর কেমন যেন বিহ্বল আর হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, তখন তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নেওয়া পুলিশের পক্ষে সহজ হয়ে পড়ল। চশমাটা দেখাতেই সে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। চট করে তার মনে পড়ল ছেলেটার লাশ নামাবার আগে চোখ থেকে চশমাটা কী ভাবে খুলে গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। ভেবেছিল ছেলেটাকে নামিয়ে চশমাটা তুলে নেবে। কিন্তু সদ্য একটা ঘোরতর অন্যায়ের পর সে এতই উত্তেজিত ছিল যে, চশমার কথা তার আর মনেই পড়েনি। পরে ভেবেছিল চশমাটা অন্য কোথাও হারিয়ে গেছে। ওটি তার মাথাধরার জন্যে সখের চশমা, না পরলেও চলত।

গাড়ী নিয়ে সেদিন বেরিয়ে গৌরীশঙ্কর বাজারে গেল। প্রথমে কিনল একজোড়া রাবারের জুতো তারপর ছোরা আর সব শেষে কিনল দশ গজ মার্কিন থান। সেগুলি নিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। তারপর শহর ছাড়িয়ে চলল। মাইল দশ যাবার পর সেই ছোট্ট ছেলেটাকে দেখল, রাস্তার ধারে নিজের মনে একা একাই খেলা করছে, কাছাকাছি কেউ নেই। গাড়ি থামিয়ে ছেলেটাকে মিষ্টিসুরে কাছে ডাকল, বলল এই হাওয়া গাড়ীতে চড়বি? আয়। ছেলেটা খুব খুশি। একরকম লাফিয়ে সে গাড়িতে উঠল।

খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে সে আরও মাইল ছয়েক গেল। বনের ধারে এক জায়গায় গাড়ি থামল। তারপর জুতো জোড়া খুলে রবারের নতুন জুতো পরল। তারপর কাপড়ের থানটাকে পাট খুলে খুলে লম্বা করে পাতল। একটা গাছের গোড়ায় এসে কাপড়টা শেষ হল। গাড়িতে সে আবার ফিরে এল। গাড়ি থেকে ছোরাখানা বার করল। ছোরায় রক্ত লেগেছিল। গাছের গোড়ায় আবার ফিরে এসে সেই ছোরা দিয়ে বেশ বড় একটা গর্ত খুঁড়ল। গাড়িতে আবার ফিরে এসে মরা ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিল। হাত ঝেড়ে গাড়ীতে এসে উঠল। ফেরবার সময় ছোরাটা একটা ডোবায় ফেলে দিল। জুতোজোড়া একটা গর্তে আর কাপড়টা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে এখানে ওখানে রাস্তার দু'পাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল, খালি যেখানটায় ছেলেটার রক্ত পড়েছিল সেই অংশটা সঙ্গে নিয়ে এল। গ্যারেজে একটু পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিল। ব্যস্, আর কোনোও প্রমাণ রইল না। নিজের ঘরে ঢুকে বই নিয়ে পড়তে বসল।

তাহলে ছেলেটাকে সে গাড়ির মধ্যেই মেরেছিল আর ছোরাটা যেখানে ফেলেছিল সেটা ডোবা বা পুকুর নয়, গর্ত একটা, বৃষ্টির জল জমেছিল।

গৌরীশঙ্কর সব স্বীকার করে শেষে বলল, "অনেক ভেবেচিন্তে যা করেছি, ভেবেছিলুম তা বুঝি নিখুঁত কিন্তু দেখা যাচ্ছে ত্রুটি থেকেই গেছে। নিখুঁত হত্যা গল্প-উপন্যাসের পাতাতেই দেখা যায়।"

বিচারে গৌরীশঙ্করের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল।

রহস্য রজনীগন্ধার

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

ভোরে ওঠা আমার বরাবরের অভ্যাস। কিন্তু ইদানীং রাত সাড়ে তিনটে কি চারটে বাজতে-না-বাজতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। সেই যে ঘুম ভাঙে, হাজার এপাশ-ওপাশ করলেও আর ঘুম আসে না। আমি তখন শয্যাত্যাগ করে কখনও ছাদে যাই, কখনও-বা বাগানে পায়চারি করি। এই সময় আমার খুব চা খেতে ইচ্ছে করে। আমার সবরকমের কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য রাখহরি আছে। কিন্তু সে বেচারা তখন এমন অকাতরে ঘুমোয় যে, ওকে ডাকতেও আমার মায়া হয়। ছেলেমানুষ তো! আমি তাই নিজেই এক কাপ চা করে খাই।

আজ ঘুম ভাঙল শেষ রাতে। তিনটেয়। কেন এমন হল? অথচ খুব একটা বেশি রাতেও ঘুমোইনি। যাই হোক, ঘুম থেকে উঠে মুখে-চোখে জল দিয়ে চায়ের একটু ব্যবস্থা করে যখন জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, তখনই বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই মনে হল, ঘুম যখন ভাঙেই আর উঠতেও যখন হয় তখন এইভাবে বদ্ধ ঘরের মধ্যে আটকে না থেকে একটু মর্নিং ওয়াক করে নিলে কেমন হয়? মনে হওয়ামাত্রই আমার

শরীরচর্চার সঙ্গে আর একটা নতুন মাত্রা যোগ করে দিলাম।

ডেকে তুললাম রাখহরিকে।

ওকে দরজায় খিল দিতে বলে আমি বাইরে বেরোলাম। এখনও চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। চৈত্রের প্রথম। তবুও মনে হচ্ছে, যেন মধ্যরাত। পাখিরা সবে জাগছে। দু-একজন সাইকেল আরোহী টিং-টিং করে ঘন্টি বাজিয়ে কোথায় যেন গেল। যে যেখানেই যাক, আমি আমার পথচলা শুরু করলাম।

মৌড়িগ্রাম এখন আর আগের মতো গ্রাম নেই। দ্বিতীয় হুগলি সেতু হয়ে যাওয়ার ফলে নিত্যনতুনভাবে তার চেহারা পালটাচ্ছে। আমি দ্রুত পা চালিয়ে রথতলার দিকে চললাম। হাঁটাটা একটু রপ্ত হয়ে গেলে আরও দূরে খটির বাজার কিংবা প্রশস্তর দিকে চলে যাব। প্রশস্তর মূর্তি মহল্লা-বিখ্যাত।

মৌড়ি রথতলার কাছাকাছি যখন এসেছি তখন হঠাৎই একটা বাড়ির দিকে আমার নজর পড়ল। দেখলাম গেঞ্জি ও শর্টস পরা এক যুবক একজনের বাড়ির দোতলা থেকে কিছু একটা বেয়ে নীচে লাফিয়েই অন্ধকারে মিশে গেল। যুবকটির গায়ের রং কালো, বেঁটেখাটো চেহারা। ও যে চোর এবং চুরি করতে এসেছিল তা বোঝাই গেল।

আমি ধীরে-ধীরে সেই বাড়িটার দিকে এগোলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম ওপরের ঘরের বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা। বোধ হয় গরমের জন্য। আর বারান্দার সঙ্গে লোহার হুকে আটকানো একটা নাইলনের ফিতে বাইরের দিকে ঝুলছে। চোর পালাবার সময় এটা না নিয়েই চলে গেছে। বাড়ির দরজায় নেমপ্লেট দেখেই চমকে উঠলাম আমি। আরে, এ যে প্রোফেসর এম. এল. বোসের বাড়ি! ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। কিন্তু শুনেছি উনি অত্যন্ত গুণী মানুষ। হাওড়ারই কোনও একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ওঁর কোচিং-এরও নামডাক আছে খুব।

একবার ভাবলাম চোরটার পেছনে একটু তাড়া লাগালে হত। যদিও দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠতাম না, তবু একটা শোরগোল ওঠানো যেত। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই আচমকা ঘটে গেল যে, তখন আর কিছুই করবার ছিল না আমার।

আমি অনেকক্ষণ সেই জায়গাটায় পায়চারি করে আকাশ একটু ফরসা হলে প্রোফেসরের বাড়ির দরজায় নক করলাম।

ভেতর থেকে সাড়া এল, "কে?"

তারপর সদ্য ঘুমভাঙা এক মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, "কাকে চাই?"

"প্রোফেসর বোস আছেন?"

"উনি এখন ঘুমোচ্ছেন। এখন তো দেখা হবে না। বেলায় আসবেন।"

"ওঁকে একবার ডাকুন, ডেকে বলুন বাড়িতে চোর এসেছিল।"

মহিলা ভয়েই হোক, বা যে-কোনও কারণেই হোক 'ও মাগো' বলে আমার মুখের ওপর সশব্দে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

আমি আর কী করি, বাধ্য হয়েই বাড়ি ফিরে এলাম।

রাখহরি বলল, "আজ এত ভোরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন দাদাবাবু?"

"মর্নিং ওয়াকে। শুধু আজ নয়, এবার থেকে রোজই আমি বেরোব। মর্নিং ওয়াকটা

আমার কাছে এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।”

“কিন্তু আপনার মতো লোকের পক্ষে অত ভোরে একা ওইভাবে বেরনোটা কি ঠিক? কে কখন সন্ধান নিয়ে পিছু নেয়, তা কে বলতে পারে?”

“ও-ভয় করলে তো ঘর থেকেই বেরনো যাবে না রে! আজ শুধু হাতে গেছি। কাল থেকে তৈরি হয়েই বেরোব। যাক, তুই এখন বেশ জুতসই করে একটু চা কর দিকিনি।”

রাখহরি ওর কাজে গেল।

আমি ইজি চেয়ারটা বাইরের বাগানে এনে আমার প্রিয় রঙ্গনগাছগুলোর কাছে গিয়ে বসলাম।

একটু পরেই কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে গেল। সেইসঙ্গে একটা দুঃসংবাদ।

কাগজওয়ালা বলল, “জানেন তো চ্যাটার্জিদা, একটা খুব খারাপ খবর আছে আজ। কাগজে নেই অবশ্য খবরটা, তবে কালকের কাগজে নিশ্চয়ই বেরোবে।”

“কী রকম!”

“প্রোফেসর এম. এল. বোস খুন হয়েছেন।”

আমার তো আঁতকে ওঠার পালা। বললাম, “সে কী!”

“হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, খুনি খুন করে নীচের দিদিকে জানিয়েও গেছে।”

রাখহরি তখন চা আর টোস্ট নিয়ে এসেছে। আমি কোনওরকমে ওর হাত থেকে সেটা নিয়ে মাটিতে ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখলাম।

কাগজওয়ালা বলল, “এই ধরনের অজাতশত্রু মানুষের যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে দেশের পরিস্থিতি কীরকম এবার বুঝতে পারছেন তো?” বলে চলে গেল।

আমি কাঁপা-কাঁপা হাতে টোস্টে কামড় দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। এই মুহূর্তে নিজের ওপর দারুণ রাগ হল আমার। কেন যে ভোরবেলা সেই খুনিটার পেছনে ধাওয়া করলাম না, তা ভেবেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই মুহূর্তে আগাগোড়া ঘটনাটা পুলিশকে জানানো দরকার। তারপর যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে আততায়ীকে।

থানায় গিয়ে পুলিশকে সব কথা বলতেই ইনস্পেক্টর ত্রিবেদী বললেন, “অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন আপনার এবং আততায়ীর মধ্যে দূরত্ব এতটাই ছিল যে, আপনি উদ্যম নিলেও ধরতে পারতেন না।”

“ঠিক তাই।”

“তবু খুনির চেহারার একটু বর্ণনা দিতে পারেন?”

“বেঁটেখাটো চেহারা। শর্টস আর গেঞ্জি পরে ছিল।”

“মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি?”

“দূরত্বের জন্য বোঝা যায়নি।”

মিঃ ত্রিবেদী একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, “মনে হয় চোর-গণেশ। ছোটখাটো যত চুরিটুরির প্রধান হচ্ছে ও। তবে কিনা এইরকম খুন-জখমের মতো জঘন্য অপরাধের কোনও রেকর্ড ওর নেই। আচ্ছা, লোকটাকে আর একবার দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?”

“না পারাই স্বাভাবিক। আমি যখন রথতলার বাঁকের মুখে এসেছি, ও তখন দড়ি

বেয়ে ঝুপ করে নেমে পালাল।"

ত্রিবেদী একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঠিক আছে। চলুন একবার ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক।"

আমি বললাম, "যেতে তো হবেই ত্রিবেদীজি। তবে একটা কথা, এই খুনের তদন্তটা কিন্তু আমি করব। আপনারা আমাকে হেল্প করবেন।"

"অন্তত এই একটা ব্যাপারে আপনি আমাদের পরম বন্ধু। আপনার সহযোগিতা আমাদের কাছে অলওয়েজ অ্যাক্সেপ্টেব্‌ল।"

আমরা একটুও দেরি না করে ঘটনাস্থল চলে এলাম।

সেই দিদি তো আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন, "এই তো! এই বাবুই আমাকে খবর দিয়েছিলেন। উনি চলে যাওয়ার পর ওপরে গিয়েই দেখি এই কাণ্ড। আমি তো ভয়েই মরি। ভাবলাম উনিই বোধ হয় বাবুকে খুন করে আমাকে জানিয়ে গেলেন। এখন তো দেখছি উনি পুলিশেরই লোক।"

ইনস্পেক্টর ত্রিবেদী এবং আমি বাইরের লোকজনের ভিড় ঠেলে ওপরে উঠে গেলাম। নীচের কনস্টেবলরা ভিড় কন্ট্রোল করতে লাগল।

আমরা ঘরে ঢুকেই দেখলাম মিঃ বোস মাথায় আঘাতের চিহ্ন নিয়ে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর মাথা রেখে এমনভাবে পড়ে আছেন, যাতে মনে হচ্ছে অত্যন্ত ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন তিনি। টেবিলের ওপরে একটা ফুলদানি আছে। সম্ভবত এই ফুলদানিটা দিয়েই ওঁর মাথার ব্রহ্মতালুতে আঘাত করা হয়। ওঁর হাতের মুঠোয় আছে একগোছা রজনীগন্ধা। টেবিলের ওপর একটা বিদেশি গোয়েন্দা গল্পের বই এবং একটি 'সুইসাইড নোট'। একটি ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর লেখা আছে 'আমিই খুনি'। লেখার নীচে ওঁর সই।

রহস্যময় ব্যাপার। রহস্যময় এই কারণে যে, উনি যদি নিজের মাথায় ফুলদানি দিয়ে আঘাত করে থাকেন, তা হলে সেটা ওইভাবে টেবিলের ওপর থাকতে পারে না। সুইসাইড নোটে কেউ নিজেকে নিজের খুনি বলে লিখে রাখে না। আর তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, সেটা হল ওই রজনীগন্ধা ফুলগুলো। এই ফুলগুলো ওঁর হাতের মুঠোয় এল কীভাবে?

এইবার ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের দিকে নজর দেওয়া হল। সবই ঠিকঠাক আছে। শুধু স্টিলের আলমারিটাই যা লণ্ডভণ্ড। তার মানে খুনি যার লোভে এই কাজ করেছে তা পেয়ে অথবা না পেয়েই করেছে এই কাজ। ওই আলমারিতেই একটি খাতায় লেখা ছিল ওঁর সঞ্চয়ের হিসেবনিকেশ। প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার মতো ইন্দিরা বিকাশ কিনেছিলেন উনি, তার একটিও নেই। জাতীয় সঞ্চয়ের কিছু কাগজ ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে। সেও প্রায় দেড় লাখ টাকার মতো। ব্যাঙ্কে এফ.ডি-র জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দেওয়ার ফর্ম ফিলআপ করেছিলেন, কিন্তু ফর্ম আছে, অথচ টাকা নেই। অর্থাৎ খুনি এটাকেও হাতিয়েছে। এই টাকাটা সম্ভবত কোনও পলিসি ম্যাচিওর হওয়ার পর জমা পড়তে যাচ্ছিল। খুনি সেটা জানত।

ত্রিবেদী বললেন, "কী বুঝলেন মিঃ চ্যাটার্জী?"

"রীতিমত সন্ধানী চোর।"

"কিন্তু ওই সুইসাইড নোটের অর্থ কী?"

"বোঝা যাচ্ছে না। তবে লেখাটা ওঁরই। কেননা ওঁর খাতাপত্র বা অন্য লেখাটেখা দেখে এই লেখার কোনও গরমিল পাচ্ছি না।"

এবার আমরা বারান্দার কাছে এসে একজোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। পরে আরও লক্ষ করে ঘরের ভেতর পর্যন্ত একই পায়ের যাওয়া আসার ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমরা। আততায়ী জুতো পরে আসেনি। সে এসেছিল ধুলোমাখা খালি পায়ে। কিন্তু সেই পায়ের ছাপ বোসবাবুর চেয়ারের কাছ পর্যন্ত আছে, তারপর আর নেই। তা হলে স্টিলের আলমারি ভেঙে জিনিসপত্রগুলো চুরি করল কে?

আমি ওঁর সম্পত্তির হিসেব লেখা খাতা ও ডায়েরিটা আদায় করে পুলিশকে বললাম, "আপনারা এবার আপনাদের কাজ করুন। আমি ততক্ষণ দিদির সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।"

কাজের দিদি নীচের ঘরে বসে নীরবে চোখের জল মুছছিলেন। আমি গিয়ে বললাম, "আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

উনি বললেন, "বেশ তো, করুন।"

"আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

"তা ধরুন না কেন, বছর পনেরো।"

"আগে কোথায় ছিলেন? আপনার কে-কে আছে?"

"আগে দেশে ছিলাম। আমার কেউ নেই। গরিব মানুষ, বিধবা। উনি আমাকে ওঁর চরণে ঠাঁই দেন।"

"বোসবাবুর কে-কে আছেন? এখানে অথবা দেশের বাড়িতে?"

"উনি তো আমারই দেশের লোক। দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বহু বছর। কেননা যা যেখানে ছিল সবই বেচেবুচে দিয়ে এইখানে এসে বাড়ি করেছেন। ওঁরও কেউ কোথাও নেই। বিয়ে করেছিলেন, ছেলেপুলে হয়নি। বউদিমণি মারা গেছেন ক্যান্সারে। তারপর উনি আর বিয়েও করেননি। তবে কিছুদিন ধরে বলেছিলেন অবসর নেওয়ার পর থেকে তীর্থে-তীর্থে ঘুরবেন। তা তীর্থে যে উনি চলে গেলেন বাবা, তা কে জানে?"

"আচ্ছা, সম্প্রতি ওঁর সঙ্গে কি কারও মনোমালিন্য হয়েছিল?"

"না বাবা। সকলে ওঁকে দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করত।"

"কাল উনি কখন ফিরেছেন? কতক্ষণ কাজ করেছেন? কে-কে দেখা করতে এসেছিল ওঁর সঙ্গে?

"উনি তো কাল কলেজে যাননি। কী একটা বই লিখবেন বলে ক'দিনের ছুটি নিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীও আসেনি কেউ। বাইরের কেউও আসেনি দেখা করতে। শুধু ভোরবেলা আপনিই যা এসেছিলেন।"

কাজের দিদির কথায় একটু আলোর ইশারা পেলাম। অর্থাৎ সুইসাইড নোটের রহস্যটা একটু পরিষ্কার হল। উনি তা হলে বই লিখতে যাচ্ছিলেন। আর সেই বইটার, অথবা সেই বইয়ের কোনও গল্পের নাম নিশ্চয় 'আমিই খুনি'। হয়তো বা ওই ইংরেজি বইয়ের কোনও গল্পের অনুবাদ করতে বসেছিলেন। আর ঠিক সেই সময়ে খুনি এসে

তার ফায়দাটা লুটেছে। কিন্তু কীভাবে?

আমি আবার ওপরে উঠে এসে বোসবাবুর টেবিলের ওপর রাখা সেই ইংরেজি বইটার পাতা উলটেই এমন একটা গল্প দেখতে পেলাম, যার বাংলা করলে নামটা দাঁড়ায় 'আমিই খুনি'। বইটা ত্রিবেদীকে দেখাতে তিনিও চমকে উঠলেন। বললেন, "আরে, তাই তো! আমরা তো এতক্ষণ ভুল সিদ্ধান্তে যাচ্ছিলাম।"

আমার মনের মধ্যে তখন একটাই দুশ্চিন্তা তোলপাড় করতে লাগল, খুনি কে? তার পায়ের ছাপ মৃতের কাছ পর্যন্ত গেল কিন্তু আলমারির কাছে নেই কেন? আর মৃতের হাতের মুঠোয় ওই রজনীগন্ধার অর্থ কী?

দুপুরবেলা ঘরে বসে নিজের মনে কত কী চিন্তা করতে লাগলাম। কোন সূত্র ধরে এই তদন্তের কাজে কীভাবে এগোব তা কিছুতেই ভেবে পেলাম না। আততায়ী একমাত্র পদচিহ্ন ছাড়া আর কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি। বোসবাবুর সম্পত্তির হিসেব লেখা খাতায় ষাট ভরি সোনার গয়নার উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই গয়নাও মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে উধাও। অমন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এমন অমূল্য সম্পদ লকারে না রেখে কেন যে ঘরে রেখেছিলেন, তা ভেবে পেলাম না। হয়তো-বা এইসবের প্রতি কোনও মোহ ছিল না, তাই।

যাই হোক, আমি যখন বসে-বসে এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, ঠিক তখনই টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। ফোন ধরতেই ত্রিবেদীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "মিঃ চ্যাটার্জি, শিগ্‌গির একবার আসুন। বোধ হয় আপনার খুনি ধরা পড়েছে।"

বোধ হয়? তবুও আমি এক মুহূর্ত দেরি না করে থানায় এলাম। দেখলাম বেঁটেখাটো চেহারার একজন লোককে লকআপে রাখা হয়েছে। এই চোর-গণেশ লোকটাকে এই এলাকায় বহুবার দেখেছি। তবে নাম জানতাম না। আমাকে দেখেই কেঁদে ফেলল সে। বলল, "আমাকে বাঁচান বাবু। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। সুযোগ পেলেই ছোটখাটো চুরিটুরি একটু-আধটু করে থাকি বটে, তবে এই সমস্ত খুন-খারাপির ব্যাপারে আমি নেই। দরকার হলে আপনারা পুলিশ-কুকুর আনান, দেখবেন সে আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। শুধু আমি কেন, ওঁকে খুন করবে এই অঞ্চলে এমন কেউ নেই।"

আমি চোর-গণেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললাম, "এ লোকটাকে ছেড়ে দিতে পারেন। এর পায়ের সঙ্গে ওই ঘরের ভেতরের পায়ের ছাপ মিলছে না। তার এক পায়ে ছ'টা আঙুল ছিল।"

এই কথা শুনেই লাফিয়ে উঠল চোর-গণেশ, "কী বললেন বাবু, ছ'টা আঙুল ছিল? বাঁ পায়ে কী?"

ত্রিবেদী উৎসাহিত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁ পায়ে। তুমি চেনো তাকে?"

"চিনি মানে? ওর জামার কলার ধরে এখনই ওকে টেনে আনছি আপনার কাছে। সামান্য ক'টা টাকার লোভে শেষপর্যন্ত এই কাজ করল ও?"

"ও কে?"

"সুবল বাগ। ঘরামির কাজ করে। আমি এখনই টেনে আনছি ওকে। দু'নম্বর বস্তিতে ঘর ছাইতে গেছে ও।"

চোর-গণেশকে ছেড়ে দেওয়া হল। লোকটা বোধ হয় ম্যাজিক জানে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে মারতে-মারতে যাকে নিয়ে এসে হাজির করল তার নাম সুবল বাগ।

সুবল প্রথমেই এসে ত্রিবেদীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর আমার পায়ে। বলল, "অপরাধ নেবেন না হুজুর। আমি চোর বটে, তবে খুনি নই।"

ত্রিবেদী বললেন, "তা হলে কি সাধু?"

আমি ইশারায় ত্রিবেদীকে চুপ করতে বললাম।

সুবল বলল, "হুজুর কাল অনেক রাতে বেগড়ি থেকে একজনের ঘর ছেয়ে খটিরবাজারে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি, সুন্দরপনা এক ভদ্রলোক বাবুর বাড়ির দোতলা থেকে কী একটা বেয়ে নামল। তার কাঁধে ছিল একটা ঝোলা-ব্যাগ। পায়ে মোজা। নীচে নেমেই জুতো পরে একটা ভটভটিতে চেপে কোথায় যেন চলে গেল। বাবুর ওপরের ঘরে তখন আলো জ্বলছে। আমি তখন ব্যাপারটা কী হল তা বোঝবার জন্য কাছে গিয়ে দেখি একটা নাইলনের ফিতে ওপর থেকে ঝুলছে। দেখেই কেমন সন্দেহ হল। আমাদের মতো চোরেরা ফিতে ধরে ওঠে না, আবার ভটভটিতেও চাপে না। তাই কৌতূহলী হয়ে সেই ফিতে ধরে ওপরে উঠেই দেখি ওই কাণ্ড। বাবু টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। দু'চোখ বোজা। আস্তে করে দু'বার ডেকে সাড়া না পেয়ে বুঝলাম বাবুর দেহে প্রাণ নেই। টেবিলের ওপর ফুলদানিটা কাত হয়ে পড়ে ছিল। ঘরের মেঝেয় ফুলদানির জল। সেটাকে ঠিক করে রেখে গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম শরীরে তখনও উত্তাপ আছে যদিও, তবুও উনি মৃত। আমি তখন আলোটা নিভিয়ে দিলাম। কেননা দারুণ ভয়ে হাত-পা তখন কাঁপছে আমার। যদি কেউ নামবার সময় আমাকে দেখে ফেলে তা হলে আমাকেই খুনি ভাববে। তাই কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলাম। কিন্তু বেঁচেও কি রেহাই পেলাম? আমার পায়ের ছাপের জন্য ধরা পড়ে গেলাম। বাবুরা বিশ্বাস করুন আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

আমি বললাম, "তুমি তখন ওই লোকটাকে নামতে দেখে চেঁচালে না কেন?"

"ভয়ে। কেননা ওই জোয়ান লোকটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আমি ওর সঙ্গে পেরে উঠতাম না। তা ছাড়া ওইসব লোকের কাছে গোলাগুলিও থাকে।"

"তুমি তখন পুলিশে খবর দিতে পারতে!"

ত্রিবেদী বললেন, "যাক, এসব তো হল। এখন ওই বাবুর ঘর থেকে কী-কী জিনিস চুরি করেছিলে তুমি?"

"হুজুর, মা-বাপ। ওই খুন দেখেই আমার সব কিছু তখন মাথায় উঠে গেছে। তা ছাড়া ওই সমস্ত নামীদামি লোকের ঘরে চুরি করবার মতো দুর্মতি আমার হয় না বাবু। আসলে হয় কী, পেটে টান পড়লে তখনই...।"

যাই হোক, সুবলের অকপট স্বীকারোক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হল। কেননা ও মৃতের কাছ পর্যন্ত যে গিয়েছিল, সে-প্রমাণ আমরাও পেয়েছি। কিন্তু আলমারির কাছে ওর কোনও পদচিহ্ন ছিল না। চতুর খুনি মোজা পরে ঘরে ঢোকার ফলে তারও পায়ের ছাপ কিছু পাওয়া যায়নি। তাই সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর সুবলকেও ছেড়ে দেওয়া হল।

সন্ধ্যেবেলা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এল। বোসবাবুকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে, পরে মাথায় ফুলদানির ঘা দিতেই আঘাতজনিত কারণে মারা যান বোসবাবু। পুলিশ কুকুরও এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কোনওরকম আলোকপাত করতে পারেনি আমাদের।

পরদিন সকালে আমি আবার বোসবাবুর বাড়ি গেলাম। কাজের দিদি তখন অত্যন্ত কান্নাকাটি করছিলেন। বললেন, "বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো। এই অনাথিনীর একটা ব্যবস্থা করে দাও বাবা। আমাকে কোনও একটা আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। কেউ কোথাও নেই আমার। এই বাড়িতে একা আমি কী করে থাকব, কী খাব? আর শোনো, বউদিমণির গয়নার বাক্সটা নীচের ঘরে থাকত। তাই ওটা চোরে নিয়ে যেতে পারেনি। ও তুমি থানায় জমা দিয়ে দাও। ও আমি কতদিন আগলে রাখব বাবা? কার জন্য রাখব?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "বউদিমণির গয়নার বাক্স আপনার কাছে থাকত কেন?"

"ওগুলো নীচের ঘরের আলমারিতে থাকত। তার চাবি আমার কাছে। আমি যে বাবুর মায়ের মতো, দিদির মতো ছিলাম বাবা। উনি যে আমাকে খুবই বিশ্বাস করতেন।"

কাজের দিদির এই কথা শুনে শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল আমার। আজকের দিনে এমন নির্লোভ মানুষও হয়? এইজন্যই এই মহিলাকে দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন বোসবাবু। আমি বললাম, "আপনার কোনও চিন্তা নেই দিদি। আপনি এই বাড়িতেই থাকবেন। পরে আপনার ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নেব। সেরকম হলে আপনি নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে ওপর তলায় থাকবেন।" তারপর বললাম, "আচ্ছা, একটু মনে করে দেখুন তো, ওঁর এই বিষয়সম্পত্তির দাবি করতে পারে এমন কেউ কি কোথাও নেই?"

"আমার অন্তত জানা নেই বাবা। তবে ওঁর এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো দাদা কাশীতে ছিলেন। শুনেছি তিনিও মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র ছেলে খোকনবাবু একবার এখানে এসে এক রাত ছিলেন।"

"কতদিন আগের কথা?"

"এই তো গত মাসে। তা, বাবু ওঁকে কিছু টাকাও দিয়েছেন। বলেছেন আর কখনও যেন এখানে না আসেন।"

"বাবু ওকে এখানে আসতে বারণ করলেন কেন? সে-ব্যাপারে কিছু কি জানেন?"

"না। তবে শুনেছি উনি বাবুকে এখানকার বাড়ি বেচে দিয়ে কাশীতে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি কিনে চলে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। সেরকম বাড়িও নাকি ওঁর সন্ধানে আছে। তা বাবু একদমই রাজি হননি।"

"আপনি ওদের কাশীর বাড়ির ঠিকানাটা জানেন?"

"না, বাবা, তাও জানি না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "খোকনবাবু যা লোক দেখছি তাতে মনে হয় ওঁকে একটা খবর দেওয়া একান্তই দরকার। কেননা যদি কখনও এই বাড়ির দাবি করে উনি কোর্টে যান তখন কিন্তু আপনি মুশকিলে পড়ে যাবেন।"

দিদি চোখের জল মুছে বললেন, "আমার আর মুশকিল কী বাবা? যাদের যা পাওনা তারা তাই নেবে। আমাকে দয়া করে থাকতে দেয় দেবে, না দেয় তোমরা কোনও একটা আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ো আমাকে। শেষমেশ ভিক্ষে করব। তাও যদি না জোটে গঙ্গায় জল

তো আছেই বাবা!”

আমি তখন দিদিকে বললাম গয়নার বাক্সটা দেখাতে। দিদি আলমারি খুলে বাক্স বের করে দেখালেন। ওই আলমারিতেও অনেক পুরনো কাগজ ও চিঠিপত্র ছিল। হঠাৎ একটি চিঠি দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার। চিঠিটা লিখেছেন নিশিকান্ত বসু। সম্ভবত জ্যাঠতুতো দাদা। চিঠিটা এই ঃ “বউমার মৃত্যুসংবাদ লোকমুখে শুনে অত্যন্ত দুঃখ পেলাম। আরও দুঃখ পেলাম তুমি দেশের পাট চুকিয়ে হাওড়ায় বাড়ি কিনেছ বলে। তাই আমার অনুরোধ, যদি তুমি কাশীর এই বাড়িটা কিনে রাখো তা হলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একটু নিশ্চিন্ত হই। তোমার বাড়ি তোমারই থাকবে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আর আমি বেঁচে যাই ভাড়া গোনার হাত থেকে। মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা হলেই বাড়িটা কিন্তু তোমার হয়ে যায়। ছেলেটাকে মানুষ করতে পারিনি। আমার জীবনের এইটাই চরম ব্যর্থতা।”

আমি চিঠিটা পকেটে রেখে গয়নার বাক্সটা দিদিকে ফেরত দিলাম। বললাম, “এখনই এটা থানায় জমা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। সাবধানে থাকবেন। বাড়ির বাইরে যাবেন না। আর অচেনা কেউ এলে বাড়ির দরজা খুলবেন না।”

দিদি আমার কথায় সায় দিয়ে ‘হ্যাঁ’ বললেন।

আমি বাড়ি ফিরে এলাম। এসে আবার বোসবাবুর ডায়েরিটা নিয়ে বসলাম। একমাস আগের একদিনের পাতায় লেখা আছে, “পুরনো পরিচয়ের সূত্র ধরে খোকন এসে হাজির। প্রথমে ওকে চিনতেই পারিনি। পরে পরিচয় দিতে চিনলাম। ও কাশীর একটি চার লাখ টাকার বাড়ির দালালি করতে এসেছে। আমাকে ওই বাড়িটা কেনবার জন্য বিশেষভাবে চাপ দিতে লাগল। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। শেষমেশ ও আমাকে ওর নানারকম বিপদের কথা বলে দশ হাজার টাকা চাইল। আমি ওকে তাও দিলাম না। বললাম, আমার সব টাকাই এখন ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসে ডবল ইনভেস্টমেন্ট-এ আছে। এমনকী, ওর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আলমারি থেকে কাগজপত্রগুলোও বের করে দেখালাম। তারপর হাজারখানেক টাকা ওর হাতে দিয়ে বিদায় করলাম ওকে, এবং এও জানালাম, ভবিষ্যতে আর কখনও যেন ও আমাকে এইভাবে বিরক্ত করতে না আসে।”

এই ডায়েরি পড়ে মনে-মনে আমি স্থির করলাম যেভাবেই হোক একবার কাশীতে গিয়ে ওই খোকনবাবুর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। ঠিকানা না থাকলেও পাঁড়েঘাটের ওদের সেই পুরনো বাড়ি থেকেই শুরু হবে আমার অনুসন্ধান। একান্ত খুঁজে না পাই তদন্তের কাজে গিয়ে বারাণসী ভ্রমণ তো হবে! জয় বাবা বিশ্বনাথ।

কিন্তু ভাগ্য আমার এতই ভাল যে, কাশীযাত্রা আর করতে হল না। হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা এক অবাঙালি যুবক দেখা করতে এল আমার সঙ্গে, “আপনিই মিঃ অম্বর চ্যাটার্জি? মানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ...।”

“হ্যাঁ আমিই। আপনার পরিচয়?”

“আমার নাম শিবকুমার শর্মা। আমার বাড়ি বারাণসীতে। আমি সালকিয়ায় থাকি।”

“কী ব্যাপার বলুন তো?”

“শুনলাম, আপনি নাকি মিঃ বোসের খুনের ব্যাপারে তদন্ত করছেন। তা এই ব্যাপারে আমার বন্ধু খোকনবাবু একটু দেখা করতে চান। কেননা মিঃ বোসের ওই বাড়ি এবং

তাঁর অন্যান্য সম্পত্তির ও-ই এখন একমাত্র দাবিদার।"

"আপনার সেই বন্ধুটি কোথায়?"

"বাইরে অপেক্ষা করছে।"

"বাইরে কেন? ভেতরে নিয়ে আসুন।"

"আসলে এই মর্মান্তিক সংবাদে ও খুব ভেঙে পড়েছে। মাসখানেক আগে একবার ও এখানে এসেছিল। সেই শেষ দেখা।"

"ঠিক আছে। ওঁকে আসতে বলুন।"

রহস্যের গন্ধ পেয়ে আমি অস্থির হলাম।

একটু পরেই শিবকুমার যাকে নিয়ে ভেতরে এল সুবল বাগের বর্ণনার সঙ্গে তার হুবহু মিল। ওরা ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলে বললাম, "আপনারই নাম খোকনবাবু?"

"হ্যাঁ, ভাল নাম রজনীকান্ত বোস।"

"কিন্তু আপনি যে সেই লোক তার প্রমাণ কী? আপনাকে চেনে এমন কেউ কি আছে এখানে?"

শিবকুমার বলল, "কেন, আমি আছি।"

"আমি তো আপনাকে চিনি না।" তারপর ওদের দু'জনের আপাদমস্তক আর একবার নিরীক্ষণ করে বললাম, "আচ্ছা ওই বাড়িতে যে কাজের দিদি আছেন তিনি কি চিনবেন আপনাকে?"

খোকনবাবু বললেন, "চিনবেন না মানে? মাত্র একমাস আগে আমি ওই বাড়িতে এসে এক রাত কাটিয়ে গেছি, এত তাড়াতাড়ি ভুল হবে কী করে? আমি এসেছিলাম দাদাভাইকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে কাশীতে নিয়ে যাব বলে। তা ওই মহিলার চক্রান্তেই সেটা হল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই মহিলাই সম্পত্তির লোভে খুন করিয়েছেন আমার দাদামণিকে।"

"কী এমন সম্পত্তি ছিল যে, তার লোভে মহিলা ওই কাজ করতে যাবেন?"

"কী ছিল না? সাড়ে তিন লাখ টাকার ইন্দিরা বিকাশ। দু'লাখ টাকার 'কিষাণ বিকাশ', 'জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট'। ব্যাঙ্কে এফ. ডি.-তে লক্ষাধিক টাকা আর ছিল প্রচুর সোনার গয়না। ওই মহিলা সবকিছুরই সন্ধান জানেন। তা ছাড়া দোতলা ওই বাড়িটার দামও নেহাত কম নয়!"

আমি বিস্মিত হওয়ার ভান করে বললাম, "ওরে বাবা, আপনি মাত্র এক রাত এই বাড়িতে থেকেই সবকিছু জানতে পেরেছেন?"

"আসলে উনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই বিশ্বাস করে এ-কথা আমাকে বলেছিলেন, এবং এও বলেছিলেন শিগ্‌গিরই উনি এই-সবই আমার নামে উইল করে দেবেন। এ-কথা জানতে পেরেই ওই মহিলা এই সর্বনাশটি ঘটিয়েছেন।"

"সর্বনাশ যে কে কীভাবে ঘটাল তা ভগবানই জানেন। কিন্তু রজনীবাবু ওরফে খোকনবাবু, ওঁর ডায়েরি যে অন্য কথা বলছে। আপনার কথার সঙ্গে তো তা মিলছে না।"

"কী লিখেছেন উনি ডয়েরিতে?"

"সে-কথা নাই-বা জানলেন?" বলে একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললাম, "জাস্ট

এ মিনিট। ছেলেটাকে একটু চা করতে বলে আসি।" বলে উঠে গিয়ে রাখহরিকে যা করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলাম।

ও ঘাড় নেড়ে ওর কর্তব্যপালনে চলে গেল।

আমি আবার ঘরে এসে ওদের সামনে বসে বললাম, "বোসবাবুর মৃত্যুসংবাদটা আপনারা কীভাবে পেলেন?"

খোকনবাবু বললেন, "কেন খবরের কাগজ মারফত পেয়েছি।"

"আপনি এখন থাকেন কোথায়?"

'বেনারসেই থাকি।"

"ওরে বাবা, আজকের কাগজে খবর পেয়ে আজই চলে এলেন?"

"না, না, আমি খবরটা পাই শিবকুমারের মারফত। ও-ই আমাকে ভোরবেলা ফোনে জানায়। আমি তখনই পূর্বা এক্সপ্রেস ধরে চলে আসি।"

"আজকের কাগজ তো ছ'টার পরে বেরিয়েছিল। আর বারাণসীতে পূর্বা এক্সপ্রেস ছাড়ে ভোর পাঁচটা দশে। এটা কী করে সম্ভব হল?"

"আসলে ট্রেনটা আজ এক ঘণ্টা লেট ছিল কিনা?"

"বুঝলাম। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার। আজ তো পূর্বা এক্সপ্রেস বারাণসী দিয়ে আসে না।"

"তা হলে কি বলতে চান—আমি মিথ্যে কথা বলছি।"

"না, না, তা কেন? আমারও ভুল হতে পারে। কিন্তু আমি যে এই ঘটনার তদন্ত করছি এ-কথা আপনাদের কে বলল?"

খোকনবাবু গদগদ হয়ে বললেন, "বাবা, কাল থেকে সবার মুখেই আপনার নাম। সবাই বলছে অম্বর চ্যাটার্জি যখন তদন্ত করছে ; খুনি তখন ধরা পড়বেই।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ভাই। আজকের ভোরে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সুদূর বারাণসী থেকে এই সবে এখানে এসে পৌঁছলেন আপনি, অথচ কাল সকাল থেকেই এই খুনের তদন্ত আমি করছি বলে আপনি জেনে গেছেন!"

শিবকুমার বলল, "ও-কথা আমিই বলেছি ওকে।"

"আপনিও তো মশাই আজই পড়ে জেনেছেন খবরটা। এখানে 'কাল' আসে কোত্থেকে?"

শিবকুমার চুপ করে গেল।

আমি খোকনবাবুকে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি ট্রেন থেকে নেমেই সোজা এখানে আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

"ওরে বাবা, পূর্বা এক্সপ্রেস দেখছি আজকাল বিমানেরও আগে আসে। যাক, স্টেশন থেকে কিসে এলেন? হেলিকপ্টারে?"

"আপনি কি আমাদের বিদ্রূপ করছেন? আমরা আমাদের স্কুটারে এসেছি।"

"আপনার জিনিসপত্র?"

"কিছুই আনিনি সঙ্গে।"

"বন্ধু নিশ্চয়ই আপনাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন?"

"ঠিক তাই।"

এবার একটু যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল শিবকুমার। বলল, "শুনুন মিঃ চ্যাটার্জি, আমার বন্ধুটি সবে ট্রেন থেকে নেমেছেন। এখন ওঁর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনার সঙ্গে পরিচয়পর্বটা সারা হয়ে গেল। আমরা কাল সকালে দেখা কবর আপনার সঙ্গে। আজ তা হলে আসি, কেমন?"

"সে কী! আপনাদের জন্য চা করতে বললাম যে!"

"মাফ করবেন। আমরা কেউই চা খাই না।"

"তা হলে আমি যখন চায়ের কথা বললাম তখন আপনারা না করলেন না কেন?"

ওরা দু'জনেই তখন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

আমি গলার স্বর কঠিন করে বললাম, "এখন কিন্তু আপনারা যেতে পারবেন না। তার কারণ, যে-রাতে বোসবাবু খুন হন সে-রাতে উনি কিছু মাত্র লিখে যেতে না পারলেও ওঁর হাতের মুঠোয় আমরা একগোছা রজনীগন্ধা পেয়েছি। তাতেই বুঝেছি রজনী নামের কারও কথা উনি মরণকালে বলতে চেয়েছিলেন। আর এখন এই ঘরেও একজন রজনী আছেন। তিনি এমন এক রজনী যিনি এক মাস আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করে ওঁর নাড়িনক্ষত্র জেনেছেন এবং যাঁকে উনি পছন্দ করেননি। গত রাতে খুনি যখন খুন করে পালায় তখন আমাদেরই পরিচিত একজন লোক খুব কাছ থেকেই তাকে দেখে ফেলে। তারও দেওয়া বিবৃতির সঙ্গে এই রজনীর চেহারার জুতসই একটা মিল আছে। কাল রাতে খুনি পালাবার সময় একটা ভটভটি অর্থাৎ মোটরবাইক কিংবা স্কুটারে চেপে পালায়। আজ আপনারাও একটি স্কুটারে চেপেই এখানে এসেছেন।"

খোকনবাবু ও শিবকুমারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

খোকনবাবু বললেন, "এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় আমিই খুনি?"

"ইয়েস। নাউ ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।" বলতে-বলতেই হাতে হাতকড়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিঃ ত্রিবেদী। সঙ্গে আরও পুলিশ। এমনকী সেই সুবল বাগও।

সে রজনীকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "এই, এই তো সেই লোক। একেই আমি দেখেছি কাল।"

ত্রিবেদী বললেন, "একজনকে খুনের অপরাধে এবং অন্য জনকে খুনিকে সাহায্য করার অপরাধে গ্রেফতার করা হল।"

রাখহরি তখন দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমার নির্দেশে সে-ই গিয়ে পুলিশে খবর দিয়েছিল।

আমি তখন খোকনবাবুকে বললাম, "কী রজনীবাবু, এই ব্যাপারে আর কিছু আপনার বলবার আছে?"

ক্লান্ত রজনী মাথা নত করে ঘাড় নাড়লেন।

"তা হলে আপনার অপরাধ আপনি স্বীকার করছেন তো?"

রজনীকান্ত অশ্রুসজল চোখে বলল, "হ্যাঁ। আমিই খুনি।"

শিবকুমারের দু'চোখে তখন আগুন জ্বলছে।

তিন খুনে

বিশু মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

ঘটনাটি কাল্পনিক নয়, সত্যি। ঘটেছিল, কানাডায়, ১৯৩৫ সালে।

৭ই অক্টোবর, সোমবার সকাল সাড়ে আটটার একটু পরে জন কালাঞ্চি নামে কানাডার একজন চাষী তার মাল-বওয়া ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশে একটা ঝোপের কাছ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ ঘোড়াটা থেমে গেল। নানাভাবে টানাটানি করেও সে আর কিছুতে এগোতে চাইলো না। তাই তো, এর কারণ কি? জন গাড়ি থেকে নেমে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিতেই দেখে, রাস্তার পাশে একটা স্পষ্ট দাগ। দাগটা দেখলেই বুঝতে পারা যায়, কোনো একটা ভারি জিনিস ঘষ্‌ড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এখান থেকে ঝোপের ভেতর। আরও কয়েক পা এগিয়ে ঝোপের দিকে উঁকি দিয়েই জন-এর চোখ একেবারে কপালে উঠে গেল। ঝোপের মধ্যে একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে, রক্তে তার পোশাক লাল হয়ে গেছে—নিথর, নিস্তব্ধ প্রাণহীন সেই দেহ। তাড়াতাড়ি ভয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরাতেই

দেখে আরও একটা মানুষ—হাত চার-পাঁচ দূরে ঠিক ঐরকম করেই পড়ে আছে। একটা নয়, একেবারে জোড়া খুন!

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে জন কালাঞ্চি ফিরে এলো আরানে—এই শহরটি পশ্চিম কানাডায়। কাছাকাছি কোথাও পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারায় অগত্যা সে বারো মাইল দূরে পেলি শহরের পুলিশ-ঘাঁটিতে টেলিফোন করলো।

খবর শুনেই আর্থার রিড ও আরস্কিন নামক দু'জন পুলিশ অফিসার তৎক্ষণাৎ আরানে এসে উপস্থিত হলেন। জন তাঁদের পথ দেখিয়ে ঘটনাস্থলে নিয়ে গেল। তখন কেউ ভাবতেও পারেনি যে, এই দু'জনের মৃত্যুর পেছনে আরও পাঁচজনের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। আর্থার ও আরস্কিন দু'জনে সযত্নে মৃতদেহ দু'টিকে চিৎ করে শোয়ালেন। কিন্তু একি সর্বনাশ! এরা দু'জনেই যে তাঁদের খুব চেনা। একজন হচ্ছে, ডফিনের কনষ্টেবল জন জি. শ' আর অপর জন বেনিটো শহরের কনেষ্টবল উইলিয়ম ওয়েন্‌রাইট।

মৃতদেহ দু'টির দিকে তাকিয়ে রিড দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুমি এখান থেকে এক পাও ন'ড়ো না—পাহারা দাও। আমি ঘাঁটিতে একবার টেলিফোন করে আসি।

রিড চলে গেলেন। গিয়ে টেলিফোন করলেন প্রায় একশো মাইল দূরের একটি ঘাঁটিতে ইনস্‌পেক্টর কেলিকে। খবরটা শুনেই কেলি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, এখুনি জন মেট্‌কাফ, জন মন মলিনেক্স ও বব্‌ ওয়াকারকে পাঠাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ এই খুন সম্বন্ধে খোঁজ-খবর সংগ্রহ করো। জোড়া খুনের এই খবর দেখতে দেখতে চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। আশেপাশে লোক জড়ো হতে লাগলো, রিড তাদের কাছে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। নিকোলাস চেনুক নামে সেই গ্রামের একজন চাষী তাঁকে বললো, ডফিনের কনেষ্টবল জন জি. শ', যিনি খুন হয়ে পড়ে আছেন, তাঁকে সে ৫ই অক্টোবর শনিবার খুব ভোরে পুলিশের গাড়ি করে এই গ্রামে দেখেছে—পল বুগুরা নামে একটি যুবক সেই সময় তাঁর গাড়ি থেকে নেমে যায়।

রিড জিগ্যেস করলেন, বুগুরার বাড়ি চেনো তুমি?

হ্যাঁ। নিকোলাস চেনুক ঠিকানাটা বলে দিলো। রিড তৎক্ষণাৎ বুগুরার বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

॥ দুই ॥

ভেতরে আসতে পারি কি? প্রশ্ন করে রিড বুগুরার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। বুগুরার বয়স মাত্র বছর কুড়ি। পুলিশের লোককে দেখেই সে একটু ঘাব্‌ড়ে গেল।

জোড়া খুনের খবর তুমি শুনেছো? রিড জিগ্যেস করলেন।

হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি।

আচ্ছা, ৫ই তারিখের খুব ভোরে তুমিই কনেষ্টবল শ'-এর গাড়ি থেকে নেমেছিলে, না?

হ্যাঁ।

তাহলে আর বেশি সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি ঘটনাটা আমার কাছে বলো তো, শুনি।

রিডের প্রশ্নে বুগুরা বলতে লাগলো ভয়ে ভয়ে ঃ শুক্রবার দিন বেনিটোয় এক নাচের আসরে আমি গিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত যারা ছিল তাদের মধ্যে ফ্রান্সেস আর পলিন দু'বোন এবং জো. পোশনি-কফ্, পিটার উয়োকেন, জন কালামাকফ্ এই তিনজন রুশীয় যুবক—এরা তিনজনেই 'ডুকোবর' দলের।—বুগুরা একটানা বলে যেতে লাগলো ঃ রাত হয়েছিল বেশি, তাই একই গাড়িতে করে সবাই সেই মেয়ে দু'টিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলাম। গাড়ি যখন মেয়ে দু'টির বাড়ির কাছে থামলো, তখন দেখলাম, রাস্তার ধারে কনেষ্টবল জন শ' ও ওয়েন্‌রাইট এদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

শ' এগিয়ে এসে রুশ যুবক তিনজনকে জিগ্যেস করলেন, দিনকতক আগে এখানে একটা গুদামে ডাকাতি হয়ে গেছে, আপনারা জানেন?

তারা 'না' বলে দিল।

তারপর শ' এই রুশ যুবক তিনজনের পকেটের ভেতর বা পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে কোনো অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায় কি না, তল্লাস করলেন। যখন তেমন কিছু সন্দেহজনক পাওয়া গেল না, তখন তিনি পোশনিকফ্‌কে বললেন, তোমার গাড়ির লাইসেন্স নেই কেন?

গাড়িখানা চালাচ্ছিলেন পোশনিকফ্, জবাব দিল, এটা আমার এক প্রতিবেশীর পুরোনো গাড়ি, অনেকদিন পড়েছিল—কেমন চলে দেখবার জন্যে একবার বের করেছি, পছন্দ হলে কিনে নেবো। তখন যে লাইসেন্স করিয়ে নেবো, তাতে আর সন্দেহ কি!

পোশনিকফ্ এমন গুছিয়ে জবাবটা দিল যে, মনে হলো, শ' কথাটা বিশ্বাস করেছেন। তবুও তিনি বললেন, তোমরা তিনজনেই সোমবার দিন সকালে আদালতে যাবে এবং কৈফিয়ৎ দেবে যে, কেন তোমরা বিনা লাইসেন্সে গাড়ি চালাচ্ছিলে।

বেশ, তাই যাবো। বলে, পোশনিকফ্ রাজী হলো। তারপর আমাদের গাড়িটা চলতে আরম্ভ করলো, আর ওঁরা গিয়ে পুলিশের মোটরে উঠলেন।

পুলিশের নজরের বাইরে গাড়িখানা যেতেই ওরা গদির তলা থেকে দুটো রিভলবার আর একখানা চকচকে মারাত্মক ছুরি বার করে আস্ফালন করে বললো, পুলিশগুলো শুধু বোকা নয়, আস্ত গাধা!—আরে বাবা, পকেট হাতড়ালে কি কিছু মেলে, গদির তলায়-টলায় চোরা কোটরগুলি দেখতে হয়।

এমন সময় শ' আর ওয়েন্‌রাইটের গাড়িখানাকে আবার আসতে দেখা গেল। আমাদের গাড়িখানা থামলো। কনেষ্টবল শ' বললেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে ডুকোবর দলের লোক তোমরা—তোমরা হয়তো সোমবার আদালতে যাবে না—সুতরাং এই গাড়ির পেছনের সিটে বসে তোমাদেরকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আর তুমি, আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, ওদের গাড়িখানা চালিয়ে আমার গাড়ির আগে আগে চলো।

তাঁর কথামতো আমি যদিও গাড়িতে উঠলাম, কিন্তু সত্যি বলছি, তখন আমি এতো ক্লান্ত হয়েছিলাম যে আমার হাত-পা টলছিল—ফলে, একটুখানি গিয়েই একটা নর্দমায় আমার গাড়িটার চাকা বসে গেল, কিছুতেই তাকে কায়দা করতে পারলাম না। তখন আর কি করা যায়, পুলিশের গাড়িতেই উঠতে হলো এবং শ' আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন শনিবার ভোর পাঁচটায়।

আচ্ছা, কনেস্টবল শ' কি গাড়িতে করে ঐ তিনজনকে নিয়ে গেলেন?

হ্যাঁ। তিনি ওদের পেলি-র থানায় নিয়ে গেলেন।

এরপর রুশীয় যুবক তিনজনের বাড়ির ঠিকানা নিয়ে তিনি তাদের খোঁজে গেলেন। জানা গেল, শুক্রবার নাচের আসরে যাবার পর থেকে তারা কেউই আর বাড়ি ফেরেনি।

॥ তিন ॥

রুশীয় তিনজনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে রিড দেখলেন, যেখানে খুন হয়েছে সেই রাস্তার ধারে অনেক লোক জমেছে। পেরুনাক নামে একজন তাঁকে বললো, শনিবার বিকেলের দিকে একখানা গাড়ি করে তিনজন লোক তার বাড়িতে এসেছিল—তারা বললো, আমরা ক্ষুধার্ত, কিছু খাওয়াও—যদিও আমাদের পোশাক-আশাক সাধারণ দেখছো, তবু আমরা পুলিশের গোয়েন্দা—শ' ওয়েন্‌রাইটের হত্যাকারীর খোঁজে বেরিয়েছি। আমি ভয়ে সামান্য কিছু খাবার যা ছিল, বার করে দিলাম, তারা তাড়াতাড়ি তা খেয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার কিন্তু তাদের দেখা পর্যন্ত সন্দেহ হচ্ছে।

পেরুনাকের কথা শেষ হতে-না-হতেই আর একজন চাষী বললো, শনিবার দিন বিকেলে, তিনজন লোক লেজিবোকফ্ খুড়োর বাড়িতে গিয়েছিল।

লেজিবোকফ্ও স্থানীয় একজন ক্ষেত-চাষী। তখনি ডাকতে পাঠানো হলো তাকে। লেজিবোকফ্ কাছেই থাকতো, তাড়াতাড়ি সেও সেখানে উপস্থিত হয়ে বললো, যা শুনেছেন ঠিকই, ঐরকম তিনজন রুশ সেদিন আমার কাছে এসেছিল। তারা বলাবলিও করছিল যে, দু'জন কনেস্টবলকে তারা শেষ করে এসেছে—রক্তের দাগ যা একটু সামনের সিটে লেগেছিল—আঙুল দিয়ে তাও ঘষে মুছে দিয়েছে। তারা আরও বলছিল যে, নিজের দেশের জন্যে যে কাজ তারা করছে, তাতে যদি কেউ বাধা দেয় তো তাকে শেষ করে দিতেও তারা পরোয়া করে না। এমনি ধারা আরও অনেক কথা বলাবলি করতে করতে ভোঁ ভোঁ করে গাড়ি চালিয়ে তারা বেরিয়ে যায়।

রিড এইবার ইনস্‌পেক্টর কেলিকে টেলিফোন করে ঐ তিনজনের চেহারার খানিকটা বর্ণনা দিলেন। শোনামাত্রই কেলি খবর পাঠালেন চারিদিকে। রেলে, স্টেশনে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, চারিদিকে পুলিশ মোতায়েন হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে জন মেটকাফ্ বব ওয়াকার ও জন মলিনেক্স পুলিশ লাইনের পাকা তিনজন লোক ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছলেন। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে একজন ডাক্তারকে সঙ্গে করে ইনস্‌পেক্টর কেলিও এলেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন : শ'-এর মাথার পেছনের দিকে তিনটে গুলীর চিহ্ন, আর গালের পাশে ছুরি দিয়ে চেরার একটা দাগ হাঁ হয়ে আছে—তাছাড়া একটা হাত কাটা দেখে মনে হয়, তিনি ছুরি-দিয়ে আক্রমণটা আটকাতে গিয়েছিলেন। বেশ বোঝা যায় তিনজনে পেছন থেকে হঠাৎ এঁদের দু'জনকে আক্রমণ করেছিল।

এর মধ্যে খুনে তিনজনের বর্ণনা খবরের কাগজ ও রেডিও মারফৎ ছড়িয়ে পড়লো। সাধারণ লোকেরা এ ব্যাপারে বেশ ভয়ও পেয়ে গেল। তিন মূর্তিকে একসঙ্গে দেখলেই আতঙ্ক হতে লাগলো সবার।

এই তিন খুনীর প্রথম সূত্র পাওয়া গেল, ডবলিউ. ডি. ডাউনসের কাছ থেকে। ডাউনস্‌ হচ্ছেন নিকটবর্তী এই শহরের পেট্রল ব্যবসায়ী। তিনি টেলিফোন করে পুলিশকে জানালেন যে, শনিবার গভীর রাত্রে তিনজন রুশ যুবক তাঁর দোকানে পেট্রল নিতে আসে। তাদের চেহারা দেখেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল। আরো একটা কথা—তাদের গাড়ির একটা কাচ ভাঙা ছিল।

এই খবর থেকে আন্দাজ করা যায়, তারা কানাডার এলাকা পার হয়ে বৃটিশ কলম্বিয়াতে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে পাড়ি দিয়েছে।

এর খানিকক্ষণ পরেই আরো একটা খবর পাওয়া গেল : জোড়া খুনের জায়গা থেকে প্রায় সাতশো মাইল দূরে, 'এক্স' শহরের রয় জেলার নামে এক পেট্রলওয়ালা টেলিফোন করে জানালো যে, বাইরে থেকে একটা মোটরের তীব্র হর্নের শব্দ শুনে আমি বেরিয়ে এসে দেখলাম, তিনজন লোক একটি গাড়িতে বসে আছে। তারা হুকুম করলো, খুব শীগ্‌গির আমাদের তেল, জল আর পেট্রল দাও। হুকুম তামিল করার সঙ্গে-সঙ্গেই ওরা হু-হু করে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল। ভেতরে এসে দেখি, আমার স্ত্রীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ভয়ে সে কাঁপছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি হলো, অমন করছো কেন?

স্ত্রী হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, রয়, তুমি খুব বেঁচে গেছ। এইমাত্র রেডিওতে শুনলাম, তিনজন খুনে সাস্কাচিউওয়ানে দু'জন পুলিশকে খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। খুব সম্ভব এরাই সেই খুনের দল—কারণ, এদের গাড়ির নম্বর ২৯৮১২। উঃ, খুবই বেঁচে গেছ তুমি। কি ভাগ্যি খুন করে সব কেড়েকুড়ে নেয়নি!

রয় তখনি খবরটা ১৫ মাইল দূরের পুলিশঘাঁটিতে জানালো, আর তারা জানালো কানাডার শেষ ঘাঁটিতে, যে ঘাঁটি পার হলে তবে বৃটিশ কলম্বিয়ায় পৌঁছোনো যায়।

এই খবর পেয়েই সার্জেণ্ট ওয়ালেস, কনেষ্টবল হ্যারিসন কুম্ব ও ক্যাম্পবেল বেরিয়ে পড়লেন খুনীদের ধরবার জন্যে।

কানাডার শেষ ঘাঁটিতে পৌঁছে তাঁরা গেট-কীপারের কাছে শুনলেন যে, ম্যানিটোবার একখানি পুলিশের গাড়ি চড়ে তিনজন কম-বয়সী যুবক এসে গেট খুলতে বলেছিল। কিন্তু তাদের কাছে দু'ডলার টোল-ট্যাক্স ছিলো না বলে সে তাদের ছাড়েনি। গেট খোলা হবে না শুনে তারা গুলী করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। গেট-কীপার চালাকি করে আড়ালে পালিয়ে কোনোরকমে বেঁচে গেছে। অগত্যা সেই তিনজন যে রাস্তা ধরে এসেছিল, সেই রাস্তা ধরেই ফিরে যায়।

কথাটা শোনামাত্র সার্জেণ্ট ওয়ালেস আর দেরি না করে হাওয়াগাড়ি খানাকে হাওয়ার বেগেই ছুটিয়ে দিলেন। কিছুদূর যেতেই দেখলেন, একখানি মোটর এই দিকে আসছে। ওঁরা তাড়াতাড়ি রাস্তায় নিজেদের গাড়িখানাকে আড়াআড়িভাবে রেখে সবাই বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়ালেন, আর খুব তেজী টর্চলাইটের আলো ফেলে ওদের থামবার জন্য নির্দেশ দিতে লাগলেন। সামনের গাড়িখানা এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। তার আরোহী মুখ বাড়িয়ে ভীতি-জড়ানো গলায় বললেন, আমার নাম টি. সি. স্কট, আমি ক্যালগারীতে থাকি। এই একটু আগে তিনজন বন্দুকধারী গুণ্ডার হাতে পড়েছিলাম, তারা আমার সব টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েছে।

এক কাজ করুন, ওয়ালেস বললেন, আপনি খানিক এগিয়ে অপেক্ষা করুন, দেখি আপনার টাকা আমরা উদ্ধার করতে পারি কি না। ওঁরা আবার খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে দিলেন! কয়েক মাইল এগিয়ে যাবার পর একটা খুব তেজী মোটরের আলো এসে পড়লো তাঁদের গাড়ির গায়ে। আলোটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে—খুব জোরে, আরও জোরে। সার্জেন্ট ওয়ালেস বললেন, রাস্তা আটকে দাঁড়াও। এরাই বোধহয় আমাদের শিকার।

তাই করা হলো। সামনের গাড়িখানা চোখ-ঝলসানো আলো ফেলে হু-হু করে এগিয়ে এসে কয়েক গজ দূরে ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। ওয়ালেস ও হ্যারিসন গাড়ি থেকে নেমে রিভলবার নিয়ে কয়েক পা এগোবার সঙ্গে সঙ্গেই উপরি-উপরি প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ শুরু হলো তাঁদের ওপর। উঃ, বলেই বুকটায় হাত দিয়ে চেপে ধরে ওয়ালেস ঝুঁকে পড়লেন, তারপর একটু সামলে নিয়ে রিভলবার তুললেন গুলী করবার জন্যে, কিন্তু হাত আর চললো না—তিনি টলে পড়ে গেলেন। ইতিমধ্যে হ্যারিসন্ রিভলবার চালাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঐ গাড়িটার তেজী আলোয় চোখ তাঁর ধাঁধিয়ে যেতে লাগলো। এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও গুলী ছোঁড়বার আগেই আর্তনাদ করে পড়ে গেলেন। ওদের গাড়িটা এই সুযোগে কখন ষ্টার্ট দিয়েছে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে—আহত হ্যারিসনকে এবার বোধ হয় ওরা গাড়ির চাকার তলায় পিষে দেবে!

গাড়ি থেকে অনেক আগেই কুম্ব ও ক্যাম্পবেল নেমে পড়েছেন। হেডলাইটের তেজী আলোয় তাঁদের বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে, ওরা কিন্তু ঐ আলোয় এঁদের সবাইকে বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে। যাই হোক, এঁদের গুলী-গোলা আততায়ীদের জখম করতে না পারলেও ইঞ্জিনটার উপর বিঁধে সেটাকে শীগ্‌গিরই বিকল করে দিলো।

গাড়িটা খারাপ হয়ে যেতে ওরা দেখলো, পালাবার উপায় বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই আত্মগোপন করবার জন্য তিনজনে ছুটে বেরিয়ে এসে বনের মধ্যে একটা ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেল।

এতক্ষণে কুম্ব ও ক্যাম্পবেল আহতদের দেখবার সময় পেলেন। ওয়ালেস ও হ্যারিসন দু'জনেই অচৈতন্য। ঠিক এই সময় আর একখানা গাড়ি করে ক্যানমোর থেকে কনেষ্টবল বোনার ও হক্ এসে পৌঁছোলেন। এঁরা পথ আটকে ছিলেন। এঁদের গাড়ি করে আহত দু'জনকে তখুনি ক্যানমোর পাঠানো হলো।

তারপর চারজনে যুক্তি করে কর্তব্য স্থির করলেন। যেদিকে খুনী তিনটে আত্মগোপন করে আছে—ওঁরা সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। চারজনে সেই ঘন ঝোপ সরিয়ে খুঁজতে লাগলেন দুর্বৃত্তদের। কি সাংঘাতিক কাজ মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়া!

হঠাৎ দূরে একটা খশ্ খশ্ শব্দ শুনে কুম্ব তাঁর তেজী টর্চলাইটটা তুলে ধরে বোতাম টিপলেন। দেখা গেল, গজ চল্লিশ দূরে একটা টুপিহীন মাথা, গাছের পেছনে লুকোবার চেষ্টা করছে। টর্চের আলোর সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর কানের পাশ দিয়ে বোঁ বোঁ করে গুলী বেরিয়ে গেল। কুম্ব বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রতায় বন্দুক তুলে ধরলেন, কিন্তু তিনি ঘোড়া টেপার আগেই একটা আর্তনাদ করে সেই টুপিহীন মাথাটা ছিটকে পড়ে গেল। গুলীটা তাঁর পেছন থেকে অন্য একজন করেছে। সবাই গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এলো—দেখা গেল,

লোকটা জো পোশনিকফ্। তাঁদের চোখের সামনেই হতভাগ্যের দেহটা একটু নড়ে উঠেই চিরকালের মতো নিশ্চল হয়ে গেল। এমন সময় ইনস্‌পেক্টর বার্ক তাঁর দলবল নিয়ে এসে হাজির হলেন।

তখুনি দু'মাইল জোড়া বনটি গোটাটা ঘিরে ফেললেন। কড়া পাহারা—খুনীরা যে এই বনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এর মধ্যে 'ডেল' নামে একটি কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে ক্যালগারীর জে. এল. কেসি এসে উপস্থিত হয়েছেন।

কাছাকাছি একটা হোটেল থেকে থম্‌সন ও হোয়াইট নামে দুই ভদ্রলোক গাড়ি করে খাবার আর কফি নিয়ে ওঁদের সাহায্য করবার জন্য এসে উপস্থিত হলেন। তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গাড়ি এসে বনের পাশের রাস্তায় দাঁড়াতেই তাঁদের নজরে পড়লো, অন্ধকারে আবছা আবছা দু'টি মূর্তি ডানপাশের বন থেকে বেরিয়ে গুঁড়ি মেরে বাঁ পাশের বনের ভেতর ঢুকছে।

গুলীর শব্দ হলো। ঐ দিকে। ইনস্‌পেক্টর বার্ক ছুটে এলেন, পেছনে এলেন নিশ। বার্ক আসতেই থম্‌সন জায়গাটা দেখিয়ে বললেন, ঐখানে দু'জনকে ঢুকতে দেখেছি। আমি ভেবেছিলাম, আপনাদেরই কেউ হবেন, তাই খাবার খেতে ডাকছিলাম।

নিশ এগিয়ে চললেন সেই দিকে, ততক্ষণে আকাশে আলো ফুটে উঠেছে। সবাই নিশের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলেন। হঠাৎ নিশের পাশের একজন লোক ইশারা করতে নিশ দেখলেন, একটা কাঠের মস্তবড়ো গুঁড়ি, মাঝরাতে হঠাৎ বৃষ্টি আর তুষারপাত হয়েছিল বলে গুঁড়িটা সেই তুষারে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

এক পা, দু'পা—। নিশের নজর পড়লো, সেই তুষারের ঢিবিতে কে যেন পা দিয়ে দাগ করেছে। আরও এগিয়ে মনে হলো, সেই তুষার ঢিবির ওপরে বন্দুকের বেয়নেট যেন উঁকি মারছে।

কাঁধের ওপর বন্দুক তুলে নিয়ে গুলী করার ভঙ্গীতে উঁচিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ভালো চাও তো আত্মসমর্পণ করো।

জবাব এলো গুলীর শব্দে।

বার্ক বললেন, সকলে ঐ কাঠের গুঁড়ির ওপর গুলী চালাও।

বিপক্ষে মাত্র দুটো লোক, তবু তারা কী গুলীই না চালালো! উভয় পক্ষে বেশ কিছুক্ষণ গুলী-বৃষ্টির পর ক্রমে কাঠের গুঁড়ির ওদিকটা নিস্তব্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

সুযোগ বুঝে বার্ক লাফ দিয়ে তুষারাবৃত কাঠের গুঁড়িটার ওপর উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গের লোকজনদের ডাকলেন, এসো তোমরাও। উঠেই নজরে পড়লো দু'টি মূর্তি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। তাদের দেহের সমস্ত ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে তুষার লাল হয়ে গেছে। উয়োকেনের হাতে তখনও কনেস্টবল শ-এর রিভলবারটা ধরা ছিল।

বার্ক পরীক্ষা করে দেখলেন, তারা তখনও বেঁচে আছে! তাড়াতাড়ি তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু তারা কোনো চিকিৎসাই করাতে রাজী নয়। কেননা, তারা জানে, বেঁচে উঠলেই তাদের ফাঁসি হবে।

একটা সামান্য গুদাম-ডাকাতিতে এইভাবে সর্বসমেত সাত-সাতটা প্রাণ নষ্ট হলো।

রহস্যের হোমটাস্ক

আনন্দ বাগচী

গরমের ছুটির দুপুরবেলা আর যেন কাটতে চায় না। বাবা-কাকারা সবাই অফিসে, মা-ও রান্নাঘর সেরে গল্পের বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে যখন ঘুমে তলিয়ে যায় তখন সারাবাড়ি নিঝুম। রোদে পোড়া ছাদ রাস্তা মাঠ ঘাট খাঁ খাঁ করে। নিমগাছের পাতার ছায়ায় দু-একটা একলা-কাক নিরিবিলিতে ঝিমোয়। কোনো রকের ছায়ায় ইরানি বাসনওলি তার বোঝা নামিয়ে হয়তো বিশ্রাম করে। সব মিলিয়ে যেন দিনদুপুর নয়, রাতদুপুর।

কুট্টুদের চিলেকোঠার ঘরে কিন্তু চার খুদে গোয়েন্দার চোখে ঘুম নেই। প্রতিদিনের মতো আজও তাদের গোপন অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে। হাতে কোনো কাজ নেই, কিন্তু কাগজ আছে। খবরের কাগজের খুন ডাকাতি ব্যাঙ্কলুটের তরতাজা খবরগুলো নিয়েই তারা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়। তর্ক বিতর্ক আলোচনায় ঘরের হাওয়া আরও গরম হয়ে ওঠে। ঘরে বসেই মুখে মুখে তারা রহস্যের কিনারা করার চেষ্টা করে, সাধ্যমতো সমাধানে পৌঁছায়।

গল্পের বই পড়তে পড়তেই এই মজার খেলার আইডিয়াটা প্রথম সুনন্দর মাথায় আসে। সে ভাবে, আমাদের নাইবা থাক বন্দুক পিস্তল, কেউ আমাদের ডেকে নাইবা দিল তদন্তের ভার। অন দ্য স্পট মানে অকুস্থলে আমরা নাইবা পৌঁছোলাম সশরীরে। কিন্তু মনে মনে আমরা যা খুশি তাই করতে পারি, যেখানে খুশি যখন খুশি যেতে পারি। কেউ আমাদের নিষেধ করতে পারবে না। পথ আটকে কৈফিয়ত চাইবার সাধ্যও নেই কারো। আমাদের বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে আসল অপরাধীকে আমরা খুঁজে বের করবই। কেউ তাকে আমাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

সেই থেকে এই প্রতিদিনের খেলায় মেতে উঠেছে ওরা চার বন্ধু। বন্ধু হলেও ওরা আসলে চার ভাই, মামাতো, পিসতুতো, বয়সে কিছু ছোট-বড়ও হবে, এক ইস্কুলে, কিন্তু এক ক্লাসে পড়ে না সবাই। কিন্তু এই গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে ওদের চিন্তা-ভাবনা প্রায় একই রকমের। চারজনেই সমান বুদ্ধিমান। সাহসেও কেউ কম যায় না।

'জোড়া খুন আর জোড়া খুন!' কুট্টু খবরের কাগজখানা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বলল, 'আজকের কাগজেও একজোড়া খুনের খবর ফলাও করে লিখেছেন।'

বাবুয়া হাসল, 'এ সবই পুরনো ব্যাপার হয়ে গছে। আমি কাগজে না পড়েও বলতে পারি, কেউ গ্রেপ্তার হয়নি এবং পুলিশ আত্মহত্যা বলেই সন্দেহ করছে।'

বুবুন বলল, 'যা বলেছ বাবুয়াদা, সেই পুরনো টেকনিক, সেই পুরনো যুক্তি আসলে পুলিশের এখন দর্শকের ভূমিকায় রেস্ট নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

সুনন্দ বলল, 'বাবা বলেন, এটা নাকি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিটিশনের যুগ। মানে, ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতার হুজুগ। যাকে বলে দেখাদেখির পাল্লা। ঠিকই বলেন, একজন মাথা খাটিয়ে যেই একটা জিনিস বের করল অমনি তার পাশাপাশি সেই রকম জিনিস বেরিয়ে বাজার ছেয়ে গেল। একই মাল, শুধু লেবেল আলাদা। টেপরেকর্ডার, টেলিভিশন, ভি.ডি.ও. দেখ, রান্নার সরঞ্জাম দেখ, ওষুধ কোম্পানির ওষুধ থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত দেখ। পত্রিকার পাতা ওল্টালেই রাশি রাশি পাশাপাশি বিজ্ঞাপন দেখতে পাবে, এ বলছে আমারটা দেখুন, ও বলছে আমারটা দেখুন। ভাল, আরও ভাল, সবচেয়ে ভাল।'

কুট্টু গম্ভীর ভারিক্কে গলায় বলল, 'বাবাইয়ের (সুনন্দর ডাকনাম) কথার মানেটা খুব স্পষ্ট হল না কিন্তু! ও যে এত উদাহরণ দিয়ে কী বোঝাতে চাইছে তা আমার এই নিরেট মাথায় ঠিক প্রবেশ করল না।'

সুনন্দ হেসে ফেলে বলল, 'গোয়েন্দা কুট্টু প্রসাদ, আপনার একটু ডাইনে-বাঁয়ে চিমটি কাটার অভ্যেস আছে আমি জানি—'

'আহা আহা, নিজেদের মধ্যে আবার ল্যাং মারামারি কেন!' বাবুয়া বলে ওঠে, 'শখের প্রাণ গড়ের মাঠ বলে একটা কথা আছে জানো তো? তোমরা, মানে আমরা সবাই হচ্ছি শখের গোয়েন্দা-আমাদের মন-প্রাণ একটু উদার আর বড় হওয়া দরকার। বাবাই কী বলতে চেয়েছে, আমিই বলছি, শোনো। ও বলেছে, এখন হচ্ছে দেখাদেখির কম্পিটিশন। তাই একটা অপরাধ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধরনের অপরাধ আরও ঘটতে শুরু করেছে। এক ফর্মুলা, একই ধরনের ফিনিশিং টাচ। জোড়া খুন তো জোড়া খুন, ছেলেচুরি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, কেপমারি-একটার নকল করে আর একটা। ঠিক, বাবাই ঠিকই বলেছে—' হঠাৎ

কথা থামিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে বাবুয়া উৎকর্ণ হয়ে কী শুনতে লাগল। শব্দটা ততক্ষণে ওরা সবাই শুনতে পেয়েছে। একটা ভারী জুতোর মসমস শব্দ। দোতলার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসছে।

কান পেতে আওয়াজটা শুনে কুট্টু চাপা গলায় বলল, 'না পুলিশ না। ওদের বুটের আওয়াজ অন্যরকম হয়, ভোঁতা ভরাট ভারী-একটু রাগী রাগী।'

বুবুন বলল, 'একজাক্টলি। সেই সঙ্গে একটু অসাবধানী, বেপরোয়া।'

সুনন্দ বলল, 'গল্পের বইতে দেখা যায়, ঠিক এ-রকম সময়ে সাধারণত ডিটেকটিভদের কাছে তাদের মক্কেলরা আসে, নতুন মামলার আবেদন নিয়ে।'

'আর ব্যোমকেশ বক্সী কিংবা শার্লক হোমস তার সহকারীকে সেটা চোখ বুজে বলে দেয়। আর একটু পরেই দেখা যায় তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। লেট আস ট্রাই। কুইক।' বাবুয়া বলে।

কুট্টু বলল, 'আওয়াজটা বুটের নয়। ভারী জুতোরও নয়। আওয়াজটা ভারী শরীরের। আসছেন মাথায় গেরুয়া পাগড়ি বাঁধা এক শেঠজি। সিন্দুক থেকে জহরতের থলে উধাও।'

'নেক্সট' বাবুয়া রেফারির মতো নির্দেশ দেয়।

বুবুন বলল, 'যিনি মক্কেল হয়ে আসছেন তিনি আমাদের নমস্য ব্যক্তি। তাঁর পায়ে বুট, গলায় নেকটাই। এক টাকারও কম দামি একটা জিনিস খোয়া যাওয়ায় তিনি দিশেহারা। আসছেন কুট্টুর কাছে।'

কুট্টু চমকে উঠে বলল, 'কে?'

বাবুয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী সেই জিনিস?'

pathagar.net

বুবুন দো-নলা বন্দুকে যেন দু'জনের দিকে দুটো উত্তর ছুঁড়ল, 'কুট্টুস' ফাদার। স্টেটসম্যান পত্রিকা। অফিস থেকে একটু বেটাইমে ফিরেছেন আজ।'

'আমি বলছি।' বাবুয়া দুষ্ট হেসে বলল, 'যিনি আসছেন তিনি প্রায় এসেই পড়েছেন, এক্ষুনি তাঁকে আমরা দেখতে পাব, আমি এর বেশী বলতে চাই না। নেক্সট।'

'কমলেশকাকা।' সুনন্দ বলল, 'আসছেন লং জার্নি করে। একটা খুনের স্পট থেকে।'

সুনন্দর কথা শেষ হবার পর পাঁচ থেকে সাত সেকেণ্ডের মধ্যেই সত্যি সত্যি গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার এবং সুনন্দর বাবার বন্ধু কমলেশ রায়ের আবির্ভাব ঘটল। বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে ওঠা সকলের চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, 'কারেক্ট। এভরিথিং কারেক্ট। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, দুর্গাপুর থেকে সোজা আসছি, হাণ্ড্রেস কিলোমিটারস অ্যান আওয়ার, গলা শুনে মনে হল সুনন্দ তুমি বলেছ কথাটা। কিন্তু কী করে বললে?'

সামান্য সঙ্কোচের সঙ্গে সুনন্দ বলল, 'শুনলে আপনি হাসবেন।'

'কক্ষনো হাসব না, তুমি বলো।'

সুনন্দ ওরফে বাবাই আঙুল দিয়ে তিনতলার সিঁড়ির বাঁকের মুখের দেওয়ালে টাঙানো বিশাল ল্যাণ্ডস্কেপখানা দেখিয়ে বলল, 'ওই ছবির কাঁচের মধ্যে আপনার ছায়া দেখতে পেয়েছিলুম। আর সেটা দেখতে পাব জেনেই সব শেষে আমি বলতে

চেয়েছিলুম।'

কুট্টু বোকা বনে গিয়ে রেগেমেগে বলল, 'চোট্টা গোয়েন্দা।'

কমলেশকাকা হাত তুলে বললেন, 'আহা, সবটুকু আগে শুনতে দাও, পরে বিচার হবে। বলো সুনন্দ, শেষ করো।'

'একটা গাড়ি এসে থামার আওয়াজ আমি আগেই শুনেছিলাম।' সুনন্দ একটু থেমে বলল, 'তারপরেই বনেট খোলার আওয়াজ। একটানা অনেকটা পথ গাড়ি ছুটিয়ে এলে ইঞ্জিন গরম হয়ে যায় বলে অনেক সময় দেখেছি ড্রাইভাররা বনেট তুলে দেয়। তাই অনুমান করে নিয়েছিলাম যিনি আসছেন, অনেক দূর থেকে একটানা আসছেন। আমার দ্বিতীয় অনুমান আপনাকে দেখতে পাওয়ার পর। খুব সিরিয়াস কোনো প্রবলেম ঘটলে, এর আগের অনেকগুলো ঘটনায় আমি দেখেছি, আপনি ব্রেনটাকে রেস্ট দেবার জন্যে আমার সঙ্গে হালকা চালে আলোচনা করতে আসেন। তাই মনে হল খুনটুনের মতো গুরুতর কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই এর পেছনে আছে।'

মেঝেতে শেতলপাটি বিছিয়ে ওরা বসেছিল এতক্ষণ, কমলেশকাকা ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়েছিল সবাই। বাবুয়া চট করে ঘরের কোণ থেকে একখানা চেয়ার টেনে এনে ওঁর সামনে পেতে দিয়ে বলল, 'বসুন।'

কমলেশকাকা চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, 'বাঃ বাঃ, চমৎকার। না, এই চেয়ারের কথা বলছি না, গোয়েন্দা সুনন্দর কথাই বলছি। সেইসঙ্গে তোমাদের সকলকেই বলছি। সুনন্দ যা পেরেছে, তোমরা প্রত্যেকেই তা পারতে, কিন্তু পারোনি। কেন পারোনি জানো? শুধু সজাগ ছিলে না বলে। স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান—সে তোমাদেরও ছিল, শুধু অ্যাপ্লাই করোনি। ভাল গোয়েন্দা হবার কতকগুলো শর্ত আছে। প্রথমত তোমাকে পরিবেশ-পরিস্থিতি-সচেতন হতে হবে। তুমি যেখানে আছ, তার চারপাশ তোমাকে সকলের আগে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। আর তা করতে হলে নাকে কানে চোখে খাটো হলে চলে না। সামান্য শব্দ, সামান্য গন্ধ কিংবা এক বিন্দু দাগও অনেক সময় অনেক কথা বলে, অনেক সংকেত রেখে যায়। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝে নিতে হয়। আসলে গোয়েন্দাদের কাছে কিছুই ফেলনা নয়, সামান্য একটা পোড়া দেশলাই-কাঠি কিংবা ভাঙা বোতাম না-দেখা ঘটনার সাক্ষী হতে পারে। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই তোমাদের খেলাটা ধরতে পেরে গেছি। ভাল, খুব ভাল। এভাবেই রাফখাতায় হাত পাকাতে হয়।'

সুনন্দ ভাবল, বাড়ির সবাই যদি কমলেশকাকার মতো হত তাহলে তাদের আর কোনো দুঃখই থাকত না। কিন্তু মানুষ বড় হয়ে গেলে ভুলে যায় তারাও একদিন ছোটই ছিল, পদে পদে কেবল শুনতে হয়েছে এটা করো না, ওটা করো না।

চার খুদে গোয়েন্দার মাঝখানে চেয়ারে বসে কমলেশ রায় ধীরেসুস্থে একটা চুরুট ধরালেন, তারপর মজার মুখ করে বললেন, 'পাঁচমাথার মোড় কোথায় আছে জানো?'

বুবুন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কলকাতার শ্যামবাজারে।'

'গুড। আর কোথায়?'

চার বন্ধু মাথা চুলকোতে লাগল। সুনন্দ ধর্মতলার কথা বলতে গিয়েও সামলে নিল।

ওখানে পাঁচটা রাস্তা মিশেছে বটে কিন্তু একটু খুঁত থেকে গেছে, কাটাকুটিটা ঠিক এক পয়েন্টে এসে হয়নি, একেবারে শেষ মুহূর্তে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটকে ল্যাং মারতে গিয়ে ব্যাপারটা কাঁচিয়ে দিয়েছে। কমলেশকাকা সুনন্দর চোখের টুনি বাল্‌বের জ্বলে উঠেই নিবে যাওয়া লক্ষ্য করে মুচকি হেসে বললেন, 'ঠিক তাই। এখানেও সেই একই ব্যাপার ঘটেছে, বুঝলে সু! আমরা পাঁচমাথা এক জায়গায় মিললেও আমি একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি। মার্ডার কেসটায় আগে পৌঁছে গেছি। সুতরাং এ-ঘরে নিখুঁতভাবে বলতে গেলে চৌমাথা এক হয়েছে। তোমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো হচ্ছে এক-একটা পৃথক রাস্তা। এই চৌরাস্তার মোড়ে এবার আমি একটা জটিল অঙ্ক হোমটাস্ক হিসেবে রেখে যেতে চাই। তোমরা এর নির্ভুল সমাধান বের করো।'

'এক মিনিট।' কুট্টু উঠে দাঁড়িয়ে কথাটা বলেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে দৌড়ল। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে কমলেশ রায় ভুরু কুঁচকে চুপচাপ চুরুট টানতে লাগলেন। এক মিনিটের আগেই কুট্টু হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল, 'ভজুদাকে চা করতে বলে এলাম আপনার জন্যে। এবার বলুন।'

'শাবাশ গোয়েন্দা! এই তো মনের কথা বুঝতে শিখেছ, আমার মন এখন এক পেয়ালা চা-ই চাইছিল। আচ্ছা, এবার শোনো আমার কাহিনী।' কমলেশকাকা কয়েক সেকেণ্ড থেমে ব্যাপারটা গুছিয়ে নিলেন পাকা গোয়েন্দা-লেখকের মতো, 'হ্যাঁ, সংক্ষেপে গল্পের আউটলাইনটা এইরকম। দুর্গাপুরে আমি যে বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম সেখানে কাল বিকেলে একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান আর খাওয়া দাওয়া ছিল। এই পরিবারটি অত্যন্ত পাংচুয়াল, ছোটবড় সবাই ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। বাড়ির বড় ছেলে সুমিত স্টীল প্ল্যান্টে কাজ করে। ওর দুটি সহকর্মী বন্ধুকেও এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেছিল। তারা আবার দু'জনেই শিল্পী, একজন ভাল ম্যাজিক দেখায়, অন্যজন রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। বিয়ে-থা করেনি, একই জায়গায় মানে একটি কোয়ার্টারে মেস করে থাকে। সুমিত বলল, কাকু চলুন, গাড়ি করে ওদের নিয়ে আসার কথা আছে। আপনি গেলে আর পাশের বাড়ির সাহায্য নিতে হয় না। আপনারও ওই অঞ্চলটা দেখা হয়। গাড়িতে সুমিতকে নিয়ে বেরোলাম। ছ'টায় অনুষ্ঠান, দু-এক চক্কর এদিক-ওদিক ঘুরে, সুমিতের দেওয়া কথামতো ঠিক পৌনে ছ'টায় গিয়ে ওদের কোয়ার্টারের সামনে হর্ন বাজালাম। দরজা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে, যেন অপেক্ষাই করছিল। সতীকান্ত, যার আজ ম্যাজিক দেখাবার কথা, সে দেখলাম সুটে বুটে তৈরী। ভেতরে ডাকল আমাদের। বসবার ঘরে বসিয়ে বলল, মুশকিল হয়েছে, ব্রজেন সেই দুপুরে দুর্গাপুর স্টেশনে কাকে রিসিভ করতে বেরিয়েছিল, এখনো ফেরেনি। বলেছিল পাঁচটার মধ্যে অবশ্যই ফিরবে, কিন্তু এখনো তো—। সুমিত নিজের হাতঘড়ি দেখে দুঃখিত গলায় বলল, তাহলে? এদিকে তো পৌনে ছ'টাও বেজে গেল, আর অপেক্ষা করা যায় না। সতীকান্ত বলল, ঠিক আছে, এক কাজ করি বরং। একটা চিঠি লিখে রেখে যাই। একটা প্যাড টেনে খসখস করে চিঠিটা লিখে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল, দেখুন তো, এই রকম লিখলাম, এতেই হবে, কী বলেন? দেখার কিছু ছিল না, দু লাইনের চিঠি। ফিরেই সঙ্গে সঙ্গে স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়িস, আমরা এগোলাম। সতীকান্ত। যে টেবিলে তাস ছড়িয়ে বসে পেশেন্স খেলছিল এতক্ষণ,

শেখানেই একটা অ্যাশট্রে চাপা দিয়ে চিঠিটা রেখে সতী বলল, আপনারা এগোন আমি আসছি। বেরিয়ে গাড়ির কাছে এলাম। ম্যাজিক দেখাবার ব্যাগটা আলমারি থেকে বের করে নিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে সতী বেরিয়ে এল। দরজায় ডোর ল্যাচ বসানো, টেনে দিলে আপনা থেকেই তালা বন্ধ হয়ে যায়। আমার কাহিনীর প্রথম দৃশ্যের এখানেই সমাপ্তি।'

কমলেশকাকা চুরুট নিভে যাওয়ায় থামলেন। দেশলাই জ্বেলে দুটো টান দিয়ে ফের বললেন, 'কিন্তু গাইয়ে ব্রজেন বসু কথা রাখল না, এল না। সতীকান্তর অনুরোধে ব্রজেনের সন্ধানে যাকে পাঠানো হয়েছিল সে সাতটা নাগাদ সাইকেলে করে ফিরে এসে জানাল যে, সতীকান্তদের কোয়ার্টারে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে, বোধহয় একটা টেপ রেকর্ডারও বাজছে ভেতরের ঘরে কিন্তু বারবার কলিং বেল টিপে আর দরজা ধাক্কিয়েও কারো সাড়া পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। আমি, সুমিত আর সতীকান্ত তক্ষুণি বেরোলাম গাড়ি নিয়ে। চাবি ঘুরিয়ে সতীকান্ত দরজা খুলল। বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে, ভেতরের ঘর থেকে গানের আওয়াজ আসছিল। আমরা ছুটে গেলাম। এই দ্বিতীয় দৃশ্য বড় ভয়ঙ্কর দৃশ্য। ঘরের মেঝেয় ব্রজেন পড়ে আছে লুটিয়ে, হুমড়ি খেয়ে। পরণে দামি ট্রাউজার্স, কিন্তু মুখ দেখা যাচ্ছিল না, নাইলনের একটা সুদৃশ্য নেভিকাট গেঞ্জিতে মুখখানা ঢাকা। বোধ হয় গা থেকে গেঞ্জিটা যখন খুলছিল সেই বেকায়দায় মুহূর্তে কেউ লোহার রড বা স্টীলের পাত দিয়ে পিছন থেকে ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল, ফলে শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেনের মৃত্যু হয়।'

কমলেশ রায়কে আবার থামতে হল। কারণ এই সময় ভজনলাল ওরফে কুট্টুর ভজুদা প্রায় গন্ধমাদনের সাইজের একটা বিশাল ট্রে ঘাড়ে করে আবির্ভূত হল। ট্রের ওপরে একগাদা গেলাস, গুটি পাঁচেক প্লেট আর একটি চায়ের কাপ, যেন খাদ্য ও পানীয়ের এক ধূমায়িত কলোনি।

'তোমাদের জন্যি কিন্তুক চায়ের হুকুম নাই, বরনভিটা আনিচি।' তরমুজের বিচির মতো এক সার দাঁত বের করে হাসতে হাসতে ভজনলাল চলে গেল। বাবুয়া ওদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় আর এসব ব্যাপার ম্যানেজ করতে ওস্তাদ। একটা বড় টিপয় টেনে এনে মিনিট-দেড়েকের মধ্যেই সে হাতে হাতে বিলিব্যবস্থা করে ট্রে খালি করে ফেলল।

সুনন্দ বলল, 'কমলেশকাকা, আপনি চা খেতে খেতেই বলুন।'

'হ্যাঁ বলি। তোমরা যেহেতু সেখানে কেউ যাওনি, এবং যাবার সম্ভাবনাও নেই, তাই আমি আমার প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট এবার জানাই। ব্রজেনের পকেট থেকে মাত্র তিনটে জিনিস পাওয়া গিয়েছে। মানিব্যাগ, সদরের চাবি আর সতীকান্তের লেখা সেই চিঠিটা।'

কুট্টু জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু না?'

'না। এক কুচি সুপুরি কি একটা লবঙ্গ পর্যন্ত না। মানিব্যাগের মধ্যে গুটি পঞ্চাশ টাকা আর প্ল্যাটফর্ম টিকিট ছিল। ঘরে অনেক তল্লাসি করেও দুটো জিনিস খুঁজে পেলাম না। এক নম্বর—হত্যার সেই অস্ত্রটি, আর থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখা খবরের কাগজের ভেতর

পরশুদিনের আগের দিনের কাগজটা। কী ছিল সেই কাগজে? ওই তারিখের কাগজে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কাজে লাগতে পারে এমন কোনো খবর কিংবা ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন কিছুই পাইনি।'

'কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য?' বুবুন হঠাৎ একের পর এক প্রশ্ন তোলে, 'ব্রজেনবাবু কি খুব বড়লোক ছিলেন? ওঁর কি খুব দামি জিনিস কিছু খোয়া গেছে? ওঁর কি অনেক টাকার লাইফ ইন্সিওর, ব্যাঙ্কে অনেক টাকা, দেশে অনেক জমিজমা সম্পত্তি ছিল?'

'ঠিক তার উল্টো।' কমলেশকাকা গম্ভীর মুখে বললেন, 'অনেকভাবে যা খবর সংগ্রহ করেছি তা হচ্ছে, ওর নিজের এবং বাড়ির অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, শুধু মাইনের টাকায় সংসার চলত।'

'কোনো শত্রু?'

'না।'

সুনন্দ এবার বলল, 'ব্রজেনবাবু আর সতীকান্ত দু'জনে খুব বন্ধু ছিলেন?'

'হ্যাঁ, বন্ধুই ছিল। দু'জনের স্বভাব দু'রকমের হলেও কখনো মতের অমিল কিংবা ঝগড়া হয়নি।'

'দু' রকমের স্বভাব বললেন কমলেশকাকা? কী রকমের দু' রকমের?'

'ব্রজেন শান্ত, লাজুক, পড়ুয়া আর অন্যমনস্ক ধরনের। বই কেনা, লটারির টিকিট কেনা আর রেকর্ড কেনা ছাড়া কখনো বাজে পয়সা খরচা করত না। কোনো নেশাও ছিল না। আর সতীকান্ত খুব হিসেবি, চালাক, তার আছে সিগারেট আর মাছ ধরার নেশা। ডাকটিকিট জমানো হবি। তাসের নেশা, ম্যাজিক দেখাতে সে খুব ভালবাসে। বাড়ির অবস্থাও ভাল। খবরের কাগজ ছাড়া আর কিছুই পড়ে না। আসর জমাতে ওস্তাদ।'

এর পর বেশ কিছু সময় নিঃশব্দে কাটল। খাদ্য আর পানীয়ের সদ্ব্যবহারে ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মনে হলেও সবাই তখন মনে মনে ধাঁধা দেখছে আর আকাশ-পাতাল ভাবছে। তাজ্জব ব্যাপার, একটা মানুষ এত সহজে, প্রায় বিনা কারণে খুন হয়ে যায় আজকাল! অথচ আগেকার দিনের মতো খুনি ভুলেও একটা ক্লু ফেলে যায় না। যেন সব কিছু চেঁছেমুছে পরিষ্কার করে রেখে যায়। পুলিশের কিছুই করার থাকে না।

চা বোর্নভিটা খাবারদাবার সব একসময় ফুরিয়ে গেল, তবু কারো মুখে কথা নেই, সবারই গালে হাত। কমলেশ রায় হাসলেন, 'কী ব্যাপার, তোমাদের যে কথা বন্ধ হয়ে গেল! আরে এক্ষুণি কিছু বলতে হবে না, পরে, আজ হোক কাল হোক আমাকে টেলিফোন করে জানালেই হবে। আপাতত ধাঁধা রইল আর তোমরা রইলে, আমি চলি।'

বাবুয়া বলল, 'নিজের চোখে আমরা কুটোটিও দেখতে পেলাম না। এ অবস্থায় কিছু অনুমান করা খুব শক্ত, কাকাবাবু।'

কমলেশ রায় হাসলেন, 'তোমরা শুধু তোমাদের মতো বলবে। তোমাদের অনুমান আর কল্পনার ওপরে অপরাধী সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হতে যাচ্ছে না। সুতরাং তোমাদের কোনো দায়দায়িত্ব থাকছে না। আর কুটোটিও দেখতে পেলে না, এমন হতে পারে না। দুটো কুটো তোমাদের দেখাচ্ছি।' পকেট থেকে একটা তোবড়ানো-দুমড়ানো চিঠির কাগজ আর একটি প্ল্যাটফর্ম টিকিট বের করে ওদের সামনে ধরলেন। ওঁরা সবাই ঝুঁকে পড়ে

দেখল। ওদের দেখা হয়ে গেলে কমলেশকাকা সে দুটো পকেটে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বিদায় নিয়ে দরজা পর্যন্ত গেছেন এমন সময় সুনন্দ বলল, 'কমলেশকাকা, পিছু ডাকলাম, একটু দাঁড়িয়ে যান। আচ্ছা কাকাবাবু, দুর্গাপুরে কী রকম লোডশেডিং হচ্ছে আজকাল?'

ভুরু কুঁচকে কমলেশবাবু বললেন, 'তোমাদের এই কলকাতায় মতো নয়, ওখানে দিনক্ষণ আগে থেকে স্থির করা থাকে। ঝপ করে আচমকা ড্রপ সিন পড়ে না।'

'কাল যখন সতীকান্তবাবুদের বাড়ি গিয়েছিলেন তখন নিশ্চয় লোডশেডিং চলছিল?'

'হ্যাঁ, তুমি কি করে জানলে?'

'সমস্ত বাড়িময় আলো, পাখা এবং ভেতরের ঘরে টেপ রেকর্ডার চলছিল শুনে আমার সন্দেহ হল।'

'হুঁ। তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে তুমি আরও কিছু সন্দেহ করেছ। নির্ভয়ে বলতে পারো।'

'আবার কয়েকটা জায়গায় খটকা লেগেছে।' মাথা চুলকে সুনন্দ বলল, 'ব্রজেনবাবুর পকেটে এই গ্রীষ্মের দিনেও একখানা রুমাল, যা প্রায় জরুরি ছিল, পাওয়া গেল না কেন? প্ল্যাটফর্ম টিকিট মানিব্যাগের মধ্যে কেন? দরজার চাবি আর ওই চিঠিটাও কিন্তু ব্রজেনবাবুর পকেটে থাকবার কথা নয়। তিনি তো প্রায় তখনই বাড়ি ফিরেছেন। গেঞ্জিটা তিনি খুলছিলেন না পরছিলেন আমার খুব সন্দেহ আছে আর যে চিঠিটা টেবিলে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল সেটাই ওঁর পকেটে পাওয়া ড্যালাপাকানো অবস্থায় পাওয়া এই চিঠি নিশ্চয়ই নয়।

'কী করে বুঝলে?'

'এই চিঠিটা লিখে সঙ্গে সঙ্গে ড্যালাপাকানো হয়েছিল, কালি শুকোবার সময় পায়নি। চিঠিতে কী রকম কালির ছোপ লেগেছে দেখতে পাবেন।'

'বুঝেছি। তুমি বলতে চাইছ সতীকান্তই খুনি? সেই দ্বিতীয়বার আমাদের সামনে আগের চিঠির বয়ান মুখস্থ লিখে গিয়েছিল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে নিজের পকেটে পুরে নিয়েছিল। আমরা প্রথম যখন ওখানে গিয়েছিলাম, তুমি বলতে চাও, তখনই ব্রজেন ভেতরের ঘরে খুন হয়ে পড়ে ছিল?'

'হ্যাঁ', সুনন্দ বলল, 'আর খুনের কারণ বোধহয় লটারির ফার্স্ট প্রাইজ বা ওই রকম কিছু। টিকিটটা সতীকান্ত আগেই সরিয়ে ফেলেছিল।'

কিট্টুর রোমহর্ষক কীর্তি

pathagar.net

হিমানীশ গোস্বামী

ইঁদারাপাড়া লেনে সুপ্রিয়াপিসির বাড়িতে আজ প্রায় উৎসবের আবহাওয়া। সুপ্রিয়াপিসি নাকি এমন চিনে খাদ্য নিজে তৈরী করেছেন, যেটি নাকি কিট্টুর বন্ধু অভিভাবক ঝাড়ুদার এবং পাচক শেয়ালমামার রান্নার চেয়ে একশো একুশ গুণ ভাল! এই খাদ্য খাওয়ার জন্য তিনি কিট্টুকে এবং 'শেয়ালমামা'কে রাত্রে নেমন্তন্ন করেছেন। সারাদিন ধরে তিনি আর নিয়তিমাসি রান্নাবান্না করেছেন। উপলক্ষ আরও একটা ছিল সেটা হল কোনও এক ক্যাসেট কোম্পানি মিহিরের দুটি কবিতায় সুর দিয়ে সেই ক্যাসেট বাজারে ছেড়েছে। অবশ্য কেবল মিহির নয়, সঙ্গে আরও তিনজন কবিরও দুটি করে কবিতাকে গান করা হয়েছে। এই বাবদ মিহির নাকি নগদ পাঁচশো টাকা পেয়েছে। সুপ্রিয়াপিসি কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করেন না। তিনি টেপ শুনে বলেছেন, এর জন্য কেউ একটি পয়সাও দিতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস মিহিরই টাকা দিয়ে ক্যাসেট করেছে। টাকা ফেললে কলকাতায় সব করা যায়।

যাই হোক, এই বাবদ মিহির আরও দু'জনকে নেমন্তন্ন করেছিল, এবং খাওয়াদাওয়া

চলেছিল রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। সুপ্রিয়াপিসির রান্না খেয়ে বাঘাকাকাও নাকি খুব তারিফ করেছেন। বলেছেন, এত চমৎকার রান্না, ঠিক যেন কলকাতার কোনও বিখ্যাত চিনে দোকানের রান্না। এই গোলমালের মধ্যে কিট্টুর পিসেমশাই শান্তিরঞ্জনবাবু একবার মাত্র দু'মিনিটের জন্য এসে এক প্লেট খাদ্য, একটা কাঁটা আর একটা চামচ নিয়ে সোজা ওপরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এইরকম গোলমাল হইহুল্লোড় একদম পছন্দ হয় না। শুধু ওপরে যাওয়ার সময় কিট্টুর কানে কানে বলে গিয়েছিলেন, যত দেরিই হোক না কেন, বাড়ি ফেরার আগে কিট্টু যেন একা তাঁর সঙ্গে দেখা করে। একটা জরুরি দরকার আছে।

সকলে চলে যাওয়ার পর কিট্টু বাঘাকাকাকে বলল, "তুমি বাড়ি চলে যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

সুপ্রিয়াপিসি কিট্টুকে বললেন, "তোর পিসে সারাদিন গুম হয়ে রয়েছেন, কারও সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলছেন না। চিরকালই উনি ওইরকম, যেন কারও সঙ্গে কথা বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়! তা তোর ভাগ্যি ভাল, তোর সঙ্গে কথা বলতে চান। বোধ হয় ঐতিহাসিক কোনও তথ্য ভুল বলে তিনি প্রমাণ করে ফেলেছেন। হয়তো শুনবি সিপাইরা নাকি মোটেই বিদ্রোহ করেনি, ব্রিটিশরা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা লিখে গেছে কিংবা ওইরকমই আজগুবি কিছু।"

কিট্টু ওপরে যেতেই শান্তিরঞ্জনবাবু ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি বললেন, "একটা ব্যাপার ঘটে গেছে বলে মনে হচ্ছে কিট্টুবাবু! তোমার মনে পড়ছে আমার দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধু কে. ভি. রামকৃষ্ণ নারায়ণস্বামী আমাদের এই বাড়িতে দু'দিন ছিলেন? বয়স অনেক হলেও দেহের আর মনের শক্তি ছিল তাঁর প্রভূত পরিমাণেই। মনে পড়ছে?"

"হ্যাঁ পিসেমশাই!" কিট্টু বলল, "মনে পড়ছে ভাল করেই। উনি জনজীবনে সুস্থতা আনার জন্য আন্দোলন করছিলেন, বলেছিলেন তিনি নিজেই।"

"ঠিক!" বললেন, শান্তিরঞ্জনবাবু। তারপর গলাটা বেশ আস্তে করে বললেন, "তিনি দিন পনেরো আগে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ভীষণ উত্তেজিতভাবে তিনি বলেছিলেন, তিনি একটি র‍্যাকেটের সন্ধান পেয়েছেন। মানে কিছু ঠক আর জোচ্চোর নাকি এই অঞ্চলের লোকদের ঠকাচ্ছে লক্ষ-লক্ষ টাকা! যাই হোক, দরকার হলে আমি ওঁকে সাহায্য করতে পারি কিনা জানতে চাইলে আমি বলি, নিশ্চয়ই পারব। আমি তাঁকে বলি তোমার কথা। তা নারায়ণস্বামী খুব খুশি হয়ে বললেন, তিনি দু-তিনদিনের মধ্যেই এসে ফের দেখা করবেন। তিনি বললেন, আপাতত, আলিপুর রোডের শ্রীবসন্ত গেস্ট হাউসে উঠেছেন। কিন্তু তিনি তিনদিন পরে এলেন না। আমি আর খোঁজখবর কিছু করিনি, কেননা নারায়ণস্বামী লোকটিই ছিলেন একটু খেয়ালি। ওঁর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু আজ সকালে খবরের কাগজে ওঁর ছবি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। নারায়ণস্বামীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে গঙ্গায় শ্রীরামপুরের ঘাটের কাছে। পুলিশ ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। পুলিশ অবশ্য জানে না এঁর পরিচয়। আমার মনে হয় ইনিই নারায়ণস্বামী। তুমি দ্যাখো তো কিট্টু, তোমারই তাই মনে হয় কি না?"

কিট্টু ছবিটিকে মনোযোগ দিয়ে দেখল। বলল, "হ্যাঁ, এটা তাঁর ছবিই বলে মনে হয়, যদিও মুখটা অনেক ফোলা আর বিকৃত। আপনি কি পুলিশকে জানিয়েছেন কিছু?"

শান্তিরঞ্জনবাবু বললেন, "ভেবেছিলাম ফোন করব একটা, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমি একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। কী থেকে কী হয় কে জানে ভেবে কিছুই করিনি। ভেবেছিলাম আজ তো তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছেই, তখন তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করে যা হোক কিছু করা যাবে। তুমি কী বলো?"

কিট্টু বলল, "শ্রীবসন্ত গেস্ট হাউসে একবার খবর নিলে কিছুটা বোধ হয় হদিস পাওয়া যাবে। ওঁর বাড়িতেও একটা ফোন করে দেখলে হয়। ওঁর বাড়ির ঠিকানা তো আপনার জানা আছে।"

শান্তিরঞ্জন বললেন, "ছিল। একটা পুরনো ডায়েরিতে লেখা ছিল, সে-ডায়েরিটা এই ঘরেই কোথাও হারিয়ে আছে, পাচ্ছি না।"

কিট্টু দেখল বড় ঘরটির প্রায় সর্বত্রই বই, না হয় নানা কাগজপত্রে ভরা। ওর মধ্যে একটা বিশেষ ডায়েরি খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

কিট্টু বলল, "শ্রীবসন্ত গেস্ট হাউসেই ওঁর ঠিকানা পাওয়া যাবে। গেস্ট হাউসে থাকতে গেলে প্রথমেই বড় খাতায় ওসব লিখতে হয়।"

শান্তিরঞ্জনবাবু বললেন, "আজ রাত হয়ে গেছে, কাল তা হলে একটু খোঁজখবর করো। ছবি দেখে তো মনে হচ্ছে ওটি নারায়ণস্বামীরই ছবি। তা ছাড়া ওঁর হদিস নেই, আসবেন বলেও এলেন না, এদিকে ওঁর মতো দেখতে একজনের মৃতদেহ!"

কিট্টু বেরিয়ে যাচ্ছিল, সুপ্রিয়াপিসি আটকালেন, "ওরে কিট্টু, খুব যে চোরের মতো সরে পড়ছিস, বলি ব্যাপার কী? তোর পিসে তো কারও সঙ্গে কথা বলে না, হঠাৎ তোর সঙ্গে আধঘণ্টা ধরে দরজা বন্ধ করে কী বলল রে?"

কিট্টু বলল, "এমন কিছু নয় পিসি। সামান্য দু-চারটে কথা।"

সুপ্রিয়াপিসির তাতে সন্দেহ গেল না। বললেন, "যত বড় হচ্ছিস তত মিথ্যে কথা বলতে শিখেছিস! তোর মতো বয়সে আমরা একটা মিথ্যে কথাও বলতাম না রে কিট্টু।"

কিট্টু বলল, "তার মানে পরে মিথ্যে কথা বলা ধরেছ!" বলে দরজা খুলে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল।

বাঘাকাকাকে সব কথা বলে কিট্টু সকালেই বেরিয়ে গেল আলিপুর রোডের শ্রীবসন্ত গেস্ট হাউসের উদ্দেশে, ফোন না করেই। কিট্টু দেখল তিনতলা চমৎকার একটা বাড়ি, বছরদশেক হবে বাড়িটির বয়স। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গেস্ট হাউস। সামনে একটুখানি বাগানও আছে। পাশে একটা চওড়া গলি, গেস্ট হাউসের সঙ্গে লাগানো কয়েকটি গ্যারাজ। কিট্টু রিসেপশনে ঢুকে গেল। সেখানে দেখল টাই-পরা এক যুবক বসে-বসে ঢুলছে। কিট্টু যেতেই যুবকটি সোজা হয়ে বসে বলল, "মর্নিং স্যার!"

কিট্টু যথাযথ শুভেচ্ছা বিনিময় করে বলল, "এখানে নারায়ণস্বামী বলে একজন দিন পনেরো আগে এসেছিলেন। তিনি কি এখনও আছেন?"

যুবকটি বলল, "দেখি, খাতা দেখে বলতে হবে। এখানে পঁয়তাল্লিশটি ঘর আছে, সকলের খবর রাখি না তো।" খাতা দেখে যুবকটি বলল, "তিনি ছিলেন দু'রাত। তারপর তিনি ফিরে আসেননি। পাঁচদিনের অগ্রিম টাকা জমাও দিয়েছিলেন। তাঁর জিনিসপত্র তাঁর ঘর থেকে বের করে স্টোরে রেখে দেওয়া হয়েছে ...পনি কি তাঁর আত্মীয়? তা হলে

প্রমাণ দিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে যান। প্রতিদিন দশ টাকা করে চার্জ করা হয় জিনিস ফেলে রাখলে...।"

কিট্টু বলল, "ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা দরকার ছিল। মাদ্রাজ থেকেই তো উনিই এসেছিলেন? আমার পিশেমশাইয়ের বন্ধু উনি।"

"ঠিকানা দিতে আপত্তি নেই", যুবকটি বলল, "এগারোর বাইশ, পোয়েজ গার্ডেন্স, চেন্নাই।"

"চেন্নাই! সে আবার কোথায়?"

"কিছুদিন আগেও যার নাম ছিল মাদ্রাজ।"

"ও। থ্যাঙ্ক ইউ", কিট্টু বলল। তারপর একটু ভেবে বলল, "আচ্ছা, নারায়ণস্বামীর ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র কি এখানেই পড়ে থাকবে?"

যুবকটি বলল, "জিনিসপত্র সামান্যই। দুটো বলপয়েন্ট পেন, একটা নাম লেখা লেখার প্যাড, ছোট্ট একটা হালকা আধুনিক সুটকেস, তাতে কিছু জামাকাপড়, টেবিলে রাখা ছিল একটা শেভিংসেট, ছোট দুটো তোয়ালে, চানের ঘরের চটি, ব্যস! তবু চিঠি লেখা হয়েছে ওঁর ঠিকানায়, সেও তো সাতদিন হয়ে গেল, উত্তর আসেনি। আপনি এইসব খোঁজখবর করছেন কেন জানতে পারি কি?"

কিট্টু বলল, "আমি একজন শখের গোয়েন্দা। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে নারায়ণস্বামী জীবিত নেই।"

"সে কী মশাই, বলেন কী!" যুবকটি বলল, "কে খুন করল?"

"খুন!" কিট্টু বলল, "আপনি জানলেন কেমন করে তিনি খুন হয়েছেন? আমি তো কেবল বলেছি জীবিত নেই।"

যুবকটি একটু আমতা-আমতা করতে লাগল। কিট্টুর তাতে বেশ আমোদ হল। কিট্টু বলল, "ওঁর ডায়েরিটায়েরি কিছু ছিল কি জিনিসপত্রের মধ্যে?"

"না।"

"কোনও লেখা? চিঠি বা ক্যাশমেমো—"

"লেখার প্যাডের ওপর কয়েকটা টেলিফোনের নম্বর লেখা ছিল মনে হচ্ছে।"

"প্যাডটা কি আমাকে দেখাতে পারেন, নম্বরগুলো একটু টুকে নিতাম।"

"আমি বিপদে পড়ব না তো?" যুবকটি প্রশ্ন করল।

"কথাটা আর কেউ জানলে তবেই বিপদের কথা আসে, তাই না?" যুবকটি একটি আলমারির চাবি খুলে ফেলে তা থেকে একটা ছোট্ট প্যাড বের করল। তাতে চারটে নম্বর লেখা ছিল, নম্বরের আগে 'জি এস', 'এইচ এইচ', 'আর কে আর' এবং 'পি পি'।

টুকে নিয়ে কিট্টু বলল, "থ্যাঙ্কস। এটা কাউকে বলার দরকার নেই।" তারপর কিছু অদ্ভুত কথা লেখা ছিল, '১৬৫-এল ৯০০০ টা. ৮% ২৩০ এল ১৬,০০০ টা. ১১% সিটিভি ২৪০০০ ১২% ভিসিপি ১১,০০০, ১০% এইরকম আরও কিছু। নারায়ণস্বামী ফ্রিজ, কালার টিভি, ভিসিপি-র দাম নোট করেছিলেন, অদ্ভুত তো? আবার পাশে-পাশে শতকরার অঙ্কও। তিনি কি সেই চেন্নাই থেকে কলকাতায় এসেছিলেন এইসব কিনতে?

কিট্টু তার কার্ডটি যুবককে দিয়ে শ্রীবসন্ত গেস্ট হাউস থেকে বের হল। কিছু দূরে

কয়েকটা ট্যাক্সি থেমে ছিল, কিট্টু একটিতে চড়ে বলল, "পার্ক সার্কাস।" ঘড়িতে তখন আটটা বেজে কুড়ি।

ন'টার মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে কিট্টু বাঘাকাকাকে বলল সব কথা। বাঘাকাকা বললেন, "আগে একটু সুস্থ হয়ে নাও, ব্রেকফাস্ট করে নাও, তারপর ভাবা যাবে।"

কিট্টু চানটান করে বেশ সতেজ হয়ে ফিরে এসে কফির সঙ্গে চিজ-ওমলেট খেতে-খেতে দুটো খবরের কাগজ মোটমুটি দেখল, কিন্তু তেমন কিছু খবর তার চোখে পড়ল না। তবে দুটো টিভির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল, একটি দোকানের নাম 'জেনারেল স্টোর্স', লেনিন সরণির ঠিকানা, অন্য একটি বিজ্ঞাপনে ছিল 'কে. কে. এম্পোরিয়াম'। কিট্টু দেখল, জেনারেল স্টোর্সের টেলিফোন নম্বরের সঙ্গে নারায়ণস্বামীর লেখা একটি নম্বর মিলে যাচ্ছে, যার আগে জি এস লেখা ছিল! কিট্টু চট করে কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে মুখ ধুয়ে ওই নম্বরে ডায়াল করল। টেলিফোন বেজেই চলল, কেউ ধরল না। তখন তার খেয়াল হল, দোকানগুলো বোধ হয় দশটার আগে খুলবে না।

বাঘাকাকা বললেন, "শোনো কিট্টুবাবু, ওই নম্বরগুলো যে কিসের, কোন দোকানের, সেটা আন্দাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে না। ওটার খোঁজখবর পরে করলেও চলবে। এখন একবার শ্রীরামপুরে গেলে বোধ হয় কিছু বোঝা যেতে পারে, যদি অবশ্য তোমার টাকা খরচ করার ইচ্ছে থাকে। একটা কথা জানো তো, এই তদন্তের ভার কেউ তোমাকে দেয়নি?"

"কথাটা ঠিক নয়, পিসেমশাই তো তদন্তের ভার দিয়েছেন!"

বাঘাকাকা হেসে বললেন, "তা বটে! তা হলে এক কাজ করতে হয়। শ্রীরামপুর যেতে হলে একটা গাড়ি ভাড়া করে এখনই রওনা হওয়া ভাল।"

"তুমি যাবে নাকি বাঘাকাকা?"

"হ্যাঁ কিট্টুবাবু। আমারও মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব সহজ নয়! আমার কী মনে হচ্ছে জানো?"

"কী?"

"নারায়ণস্বামী ফ্রিজ, টিভি, ভিসিপি, এইসবের ব্যবসা করার জন্য বহু টাকা সঙ্গে এনেছিলেন, কোনও দুষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ওই টাকা হস্তগত করে তাঁকে খুন করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে।"

কিট্টু বলল, "তা হলে তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! কিন্তু চেন্নাইয়ে কি এইসব জিনিস পাওয়া যায় না? আর এসব জিনিস কি সব নগদেই বিক্রি হয়?"

বাঘাকাকার কপালের রেখা কুঞ্চিত হল। তিনি বললেন, "তা বটে!"

॥ দুই ॥

কিট্টুদের বাড়ির সামনের দোকান 'সুরসাথী'র এখন উন্নতি হয়েছে। কাপড়জামা ইস্ত্রি করতে-করতে সে নিজের চেষ্টায় আর উৎসাহে একটা পুরনো গাড়ি কিনেছে, সেটা সে ভাড়া দেয়। ওই গাড়িটিকে মাঝে-মাঝে কিট্টু ভাড়াও নেয়। কিট্টু গাড়ি চালানো জানে, কিন্তু চালাতে ভয় পায় কলকাতা শহরে। বাঘাকাকার অবশ্য গাড়ি চালানোর লাইসেন্স

আছে, গাড়ি তিনিই চালান।

পার্ক সার্কাস থেকে গাড়ি ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে গিয়ে ভি আই পি রোড ধরে কিছুটা গিয়ে লেকটাউনের ভেতর দিয়ে যশোর রোড দিয়ে টালা পার্ক পেরিয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যেতে-যেতে ডানলপ ব্রিজের কাছে বাঁ দিকে ঘুরবার সময় দেখা গেল, সেদিকে ট্রাফিক জ্যাম। বিবেকানন্দ সেতু মেরামত হওয়ার জন্য রোজই নাকি এই অসুবিধে হচ্ছে। অতএব সোজা গাড়ি চালিয়ে ব্যারাকপুর, সেখানে একটি গ্যারাজে গাড়িটিকে রেখে নৌকোয় করে গঙ্গা পার হওয়ার আগে চোখে পড়ল ছোট-ছোট অনেক পোস্টার। 'শতকরা ৭০ পর্যন্ত ছাড়ে বিভিন্ন কোম্পানির ফ্রিজ, টিভি, রেডিও, ভিসিপি, ভিসিআর বিক্রয়'। ব্যারাকপুরের একটা ঠিকানাও তাতে দেওয়া ছিল। খেয়া পার হওয়ার সময় বাঘাকাকা দু-একজনের সঙ্গে কী সব কথা বললেন। কিট্টু দেখছিল গঙ্গার অপরূপ দৃশ্য! মাঝে-মাঝে শুশুক ভুস করে জলের ওপরে ছিটকে উঠছে আবার ভুস করে ডুবে যাচ্ছে। অদ্ভুত লাগল কিট্টুর।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গঙ্গা পার হয়ে নামতে যাচ্ছে যখন কিট্টু, বাঘাকাকা কিট্টুর হাত ধরে বললেন, "আমরা নামছি না কিট্টুবাবু।"

কিট্টু তো অবাক! কিট্টু বলল, "নামছি না মানে কী বাঘাকাকা?"

"নামছি না মানে নামছি না! রহস্যটা কী বাঘাকাকা?"

"রহস্য হচ্ছে আমরা ব্যারাকপুরে ফিরে যাচ্ছি। সেখানে হঠাৎ খুলে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা ফ্রিজ টিভি ভিসিআর ভিসিপি-র দোকানের কাছাকাছি একটু ঘুরঘুর করতে চাই।"

"ঘুরঘুর করতে চাই আবার কী ভাষা?"

"ওই হল একরকম ভাষা। বুঝতে পারলেই হল!"

"কিন্তু কী ব্যাপার বাঘাকাকা?"

"ব্যাপার তো সাঙ্ঘাতিক। শস্তার মোহ! শস্তার মোহ মানুষকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়। ব্যারাকপুরে একটা সরকারি খালি জায়গায় তাঁবু ফেলে ঘটা করে একটি কোম্পানি দোকান খুলল, কী ব্যাপার, না তারা শস্তায়, অবিশ্বাস্য শস্তায়, শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ছাড়ে নতুন টিভি, ফ্রিজ, রেডিও সব বিক্রি করবে বলে প্রচার করল। প্রথমদিকে লোকে বিশেষ পাত্তা দিল না। দু-একজন বোকাসোকা লোক রেডিও, সাদাকালো টিভি এসবের জন্য অর্ধেক দাম জমা দিল। শর্ত হল, আগে দাম জমা দিতে হবে। পরে জিনিসপত্র দেওয়া হবে। সন্দেহ যাদের ছিল, তারা পরে দেখল, বাঃ, ভারী মজা তো। যে যেরকম জিনিসের অর্ডার দিয়েছিল, সে সে-রকম জিনিস পেতে শুরু করল। সত্যি-সত্যিই নতুন আর চমৎকার সব জিনিসপত্র। ওই দেখে প্রথমে ডজনে-ডজনে লোক টাকা জমা দিতে লাগল, আর দশ দিন পর জিনিসপত্র পেতেও লাগল। শেষে এমন হল যে, দোকানে পাঁচজন লোক ক্রমাগত টাকা নিতে-নিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ঘণ্টায় লাখ টাকার ওপর অর্ডার আসতে লাগল। আসবে না? এত কম টাকায় কত জিনিস! কিন্তু শেষ দশদিনে প্রায় দু'কোটি টাকা সংগ্রহ করে একদিন রাত্রে ওঁরা সব ফুড়ুত!"

"ফুড়ুত?" কিট্টু বলল।

"ফুড়ুত!" বাঘাকাকা বললেন। "প্রথম দশদিন দ্বিতীয় দশদিনে তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে ঠিক, কিন্তু শেষ দশ দিনে যা পেয়েছে তাতে তাদের হাতে এসে গেছে খরচটরচ বাদ দিয়েও আনুমানিক এক কোটি ষাট লাখ টাকা! মন্দ কী!"

"সর্বনাশ!" বলল কিট্টু।

বাঘাকাকা বললেন, "এ রকম ব্যাপার দেখেই যেখানে লোকের পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল তারা তা না করে ব্যাঙ্ক থেকে কষ্টে অর্জন করা টাকা এনে তাদের উপহার দিল, এই হচ্ছে মানুষের বোকামি, বা ট্র্যাজেডি কিট্টুবাবু!"

কিট্টু বলল, "এখন আমরা কী করব?"

বাঘাকাকা বললেন, "আমরা অকুস্থলে যাব। সেখানকার লোকজনদের কাছে জিজ্ঞেস করব। আমার মনে হয় নারায়ণস্বামীর হত্যার সঙ্গে এই ব্যাপারের একটি সম্পর্ক আছে। আমার ধারণা কী জানো?"

"কী?"

"এই দল—মানে ঠকবাজের দলটি দক্ষিণ ভারতের। নারায়ণস্বামী এদের চিনতেন। তিনি যেভাবেই হোক খবর পান দলটি পশ্চিমবাংলায় এসেছে লোক ঠকাতে। তিনি অত্যন্ত সৎ মানুষ, তিনি নিজের টাকা খরচ করে কলকাতায় আসেন। মানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজে লেগে যান। তিনি বিভিন্ন টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি কোম্পানিকে প্রশ্ন করেন টেলিফোনে, দোকানদাররা সর্বোচ্চ কত কমিশন পেতে পারেন। কোনও প্রস্তুতকারকই কোনও টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদিতে শতকরা ৫০ ভাগ, বা তার বেশি কমিশন দিতে পারে না। এটা অবশ্য অজানা নয় কারও কাছেই, কিন্তু বোকারামের দল যারা ঠকাতে চায় তাদের কাছে এ প্রশ্ন দেখা দেয় না। নারায়ণস্বামী নিজেও এটা ভাল করেই জানতেন। আমার মনে হয় তিনি ওইসব দোকানকে ফোন করে জানতে চেষ্টা করেছিলেন হঠাৎ কোনও দোকানকে তারা প্রচুর পরিমাণে টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি সরবরাহ করেছিল কি না। আমার এও অনুমান, তিনি হয় টেলিফোনে খবর পান, নয়তো নিজে ওইসব দোকানে গিয়ে জানবার চেষ্টা করেন কোথায় তারা ওইসব জিনিস সরবরাহ করেছে! তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে নারায়ণস্বামী ব্যারাকপুরে নিজে গিয়ে বিপদে পড়েন। তাঁকে ঠকবাজেরা চিনতে পারে এবং তাঁকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দেয়।"

কিট্টু বলল, "এর মধ্যে শ্রীবসন্ত গেস্ট হাউসের ব্যবহারও বেশ সন্দেহজনক।"

"কেন?"

"তাদের একজন বোর্ডার ফিরলেন না, এটা কি পুলিশকে জানানো প্রয়োজন বা কর্তব্য ছিল না? এটা কি সন্দেহজনক ব্যাপার নয়!"

বাঘাকাকা বললেন, "কথাটা ঠিকই। কিন্তু এটা অন্যায় হলেও ওরা নারায়ণস্বামীর হত্যার সঙ্গে বোধ হয় জড়িত নয়।"

ব্যারাকপুরের ঘাটে নেমে আদালতের কাছাকাছি একটা মিষ্টির দোকানে কিছু খেয়ে সেখান থেকে কিট্টু শান্তিরঞ্জন পিসেমশাইকে ফোন করে বলল, শান্তিরঞ্জনবাবু যেন অবিলম্বে চেন্নাইয়ের পুলিশকে খবর দেওয়ার জন্য কলকাতা পুলিশকে অনুরোধ করেন।

খোঁজ নিয়ে কিট্টুরা জানতে পারল ওই অঞ্চলের বহু হাজার ব্যক্তি সর্বস্বান্ত না

হলেও প্রচুর ধাক্কা খেয়েছেন। কেউ-কেউ দুটো-তিনটে ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিনের অর্ডার দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আবার পুলিশও ছিলেন বেশ কিছু। লোকগুলিকে প্রথমে সন্দেহ হলেও পরে সে-সন্দেহ চলে গিয়েছিল। হ্যাঁ, লোকগুলোর দু-তিনজন দক্ষিণ ভারতের মানুষ। তাদের নাম কেউ জানে না, সঙ্গে যারা ছিল তারা কেউ বাঙালি নয়, তাদের অন্য কোনও রাজ্য থেকে আনা হয়েছিল বলে মনে হয়।

পুলিশকে প্রশ্ন করে জানা গেল না তেমন কিছুই। লোকগুলো কে, কোথা থেকে এল, কোথায় গেল, কোনও খবরই তাদের দফতরে পাওয়া গেল না। একজন বললেন তাঁরা অন্ধকারে। যে-রাতে ওরা সদলবলে পালাল, সে-রাতে দমদম এয়ারপোর্টে বড়-বড় চারটে সুটকেস নিয়ে কয়েকজন বিমানে উঠেছিল কি না সেটাও পুলিশ বলতে পারল না, অথচ লোকজনকে জিজ্ঞেস করে কিট্টুরা জানতে পেরেছিল যেদিন সকালে তারা বেপাত্তা হয়েছে দেখা গেল তার আগের রাত্রে দুটো ট্যাক্সিতে চারটে বড়-বড় ট্যাঙ্ক তোলা হয়েছিল। এদিকে এই ঠগবাজদের কীর্তিকলাপের সঙ্গে যে একটা খুনও জড়িত, সেটাও পুলিশ জানে না, আন্দাজও করেনি, কেননা নারায়ণস্বামীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে শ্রীরামপুরের কাছের গঙ্গায়!

কিট্টুরা সারাদিনই ব্যারাকপুরে কাটিয়ে দিল। লোকদের কাছে কথা বলে জানা গেল, ঠগদের একজনের নাম মূর্তি, আর-একজনের নাম কুপু। এ-দুটিই দক্ষিণ ভারতীয় নাম। কিট্টু এবং বাঘাকাকা গাড়িতে করে সন্ধ্যের সময় দমদম বিমানবন্দরে গিয়ে অনেক চেষ্টাচরিত্তির করে চেন্নাইয়ের সেই রাত্তিরের ফ্লাইটের সমস্ত যাত্রী-তালিকা পড়বার সুযোগ পেল। তাতে কৃষ্ণমূর্তি আর কুপুস্বামীর নাম পাওয়া গেল। সঙ্গে ঠিকানাও। বাঘাকাকা বললেন, "নাম আর ঠিকানা দুটোই বানানো হতে পারে।"

কিট্টু বিমানবন্দর থেকেই শান্তিরঞ্জনপিসের কাছে সব জানিয়ে দিল। শান্তিরঞ্জনবাবু বললেন "চেন্নাইয়ের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।"

কিট্টু ওই বিশেষ রাত্তিরের বিমানের ফ্লাইট নম্বর আর দু'জন যাত্রীর নাম পিসেমশাইকে জানিয়ে দিল। পিসেমশাই বললেন, "এই খবর এক্ষুনি পুলিশকে জানিয়ে দিচ্ছি।"

কিট্টু বাঘাকাকাকে বলল, "কী অদ্ভুত ব্যাপার, আর কী অদ্ভুত যোগাযোগ! পিসেমশাই যদি নারায়ণস্বামীর বন্ধু না হতেন, কিংবা তিনি যদি পিসেমশাইয়ের সঙ্গে এবারে দেখা না করতেন তা হলে ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ত নাকি?"

বাঘাকাকা বললেন, "আরও একটা কথা। খবরের কাগজে নারায়ণস্বামীর ছবি যদি ছাপা না হত আর সেই ছবি যদি শান্তিরঞ্জন পিসেমশাইয়ের চোখে না পড়ত, তা হলেও ব্যাপারটা অন্ধকারেই থাকত। পুলিশ খুবই অপদার্থ, কিন্তু তবু এই কর্মটি যে তারা করেছে সেটাও সুলক্ষণ! আসলে কী হয় জানো, সবই দায়িত্ব এড়ানোর খেলা। একটি মৃতদেহ জলে ভাসল, সেটা কোথা থেকে এল কেউ খোঁজ করল না, কোথায় পাওয়া গেল সেটাই বড় হয়ে দেখা দিল। নারায়ণস্বামীকে নিশ্চয় খুন করা হয়েছে ব্যারাকপুরেই, কিন্তু গঙ্গার জলের স্রোতে সেটি চলে গেছে ব্যারাকপুরের উলটো দিকে শ্রীরামপুর। সেখানকার পুলিশ তদন্ত করেছে, একটা ফাইল বানিয়েছে আর সেটিকে আলমারিতে

রেখে দিয়েছে। এ নিয়ে বিশেষভাবে তদ্বির বা তদন্ত করেনি।"

রাত প্রায় দশটার সময় ক্লান্ত হয়ে বাঘাকাকা আর কিট্টু বাড়িতে পৌঁছনোমাত্র টেলিফোনের আওয়াজ। কিট্টু টেলিফোন ধরেই বলল, "কে পিসেমশাই? জরুরি দরকার—এক্ষুনি যেতে হবে? যাচ্ছি।" তারপর "কী হল কে জানে", বলে কিট্টু যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে গেল। পিসেমশাইয়ের বাড়িতে গিয়েই কিট্টু দেখতে পেল, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় এক ভদ্রলোক বসে আছেন খাবার টেবিলে। খাওয়াদাওয়ার পর গল্পগুজব করছেন। পিসেমশাই বললেন, "কিট্টু চিনতে পারছ?"

কিট্টু বলল, 'না!"

পিসেমশাই বললেন, "না চিনবারই কথা। খড়গপুরে এক আত্মীয়বাড়িতে যাওয়ার সময় রিকশার সঙ্গে একটা জিপের সঙ্ঘর্ষে আহত হয়ে দশ-বারোদিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় রেল হাসপাতালে ছিলেন। ইনিই হলেন নারায়ণস্বামী, আমার বন্ধু। ইনি খুন হননি। খবরের কাগজে যাঁর ছবি বেরিয়েছে তিনি অন্য লোক।" কথাটা পিসেমশাই ইংরেজিতেই বললেন।

নারায়ণস্বামী ক্ষীণ হেসে বললেন, "খুন হইনি বটে, তবে তার কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম! স্মৃতিটাও প্রায় চলে গিয়েছিল, পরশু রাত থেকে প্রায় সুস্থ হয়ে প্রথমেই চলে এলাম তোমার আঙ্কল মৈত্রের কাছে। আমার একটা টাকা নেই। আমার পকেট থেকে পাঁচশো টাকার ওপর খোয়া গেছে। কাগজপত্র, চেকবই ব্যাঙ্ক কার্ড এ-সবই আমি আহত হওয়ায় কেউ সরিয়েছে! যাকগে, বেঁচে গিয়েছি এই ঢের!" কিট্টু তো হতভম্ব! সেটি খুব উপভোগ করলেন শান্তিরঞ্জনবাবু! তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য শান্তিরঞ্জনবাবু বললেন, "ঘাবড়ে যেয়ো না কিট্টু। তোমার পরিশ্রম বৃথা যায়নি। ব্যারাকপুরের ঠগিরা ধরা পড়েছে! এইমাত্র আমার বন্ধু তোমাদের পূর্বপরিচিত পুলিশকর্তা ঘোষসাহেব ফোন করে জানিয়ে দিলেন চেন্নাইয়ে পালের গোদারা ধরা পড়েছে, পাওয়া গেছে দেড় কোটি টাকার ওপর। মনে হচ্ছে কিছু পুরস্কার তুমি আর বাঘাকাকা পাবে!"

কিট্টু মুখ গোমড়া করেই রইল। তার মনে হল এইরকম হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করে সেই ভুলই করেছিল। খবরের কাগজের ছবি দেখে কি মানুষকে অত স্পষ্ট ভাবে চেনা যায়? তার রাগ হল শান্তিরঞ্জন পিসেমশাইয়ের ওপর! কিন্তু নায়ারণস্বামীও কম নন। তিনি তাঁর প্যাডের ওপর সব টিভি আর ফ্রিজের দাম, শতকরা ছাড় এসব তা হলে কেন লিখলেন? কিট্টু বলল, "আচ্ছা, মিস্টার নারায়ণস্বামী, আপনি আপনার প্যাডের ওপর সব টিভি ফ্রিজের দোকানের টেলিফোন নম্বর লিখেছিলেন কেন?"

"আমি! না তো!" নারায়ণস্বামী বললেন। "আমি লিখিনি ওসব।"

"তবে?"

"আরে আমার এক ভাইপোর আবদার রাখতে এটা নিয়ে এসেছিলাম। ও সাংবাদিক। ওর ধারণা, একই কোম্পানির একই জিনিস কলকাতায় শস্তায় পাওয়া যায়। আমাকে ও নিজেই ওইসব টেলিফোন নম্বর লিখে দিয়েছিল, তার পাশে লিখে দিয়েছিল ওখানকার দাম আর ওখানে কত কমিশন পাওয়া যায়।"

"আপনি খোঁজ করেননি?"

"না! খোঁজ করবার সময়ই তো পেলাম না। খড়গপুরে আমার বন্ধু দাশগুপ্তের বাড়িতে যাওয়ার সময় হল দুর্ঘটনা। প্রায় দু'সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে ওঁর খোঁজ করলাম, তা উনি তো বদলি হয়ে গেছেন আসানসোলে! ফিরে এলাম তাই।"

"তা আপনি নাকি কী অন্যায় সব ব্যাপার ঠেকাতে কলকাতায় এসেছিলেন?"

নারায়ণস্বামী হেসে বললেন, "ওটা ঠিক কথা নয়। ওটা বানিয়ে বলেছিলাম মিস্টার মৈত্রকে!"

"ব্যারাকপুরের ঠগিদের সঙ্গে আপনার কোনও ব্যাপার ছিল না?"

"সে আবার কী?"

কিট্টু হাই তুলল। বলল, "থাক ওসব কথা। বড় ঘুম পাচ্ছে, বাড়ি যাই।"

এই সময় হঠাৎ সুপ্রিয়াপিসি এসে বললেন, "কিট্টু তোকে বড় শুকনো দেখাচ্ছে রে! বোধ হয় খাওয়াদাওয়া হয়নি? তা হলে বসে যা, আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি। চিনে খাবার—এবারে ফ্রায়েড চিলি প্রন।"

"নাঃ, ভাল লাগছে না।" কিট্টু বলল, "যাই, বাড়ি যাই। বাঘাকাকা অপেক্ষা করে আছেন। ওঁকে একটা সংবাদ দিতে হবে।"

"দুঃসংবাদ তো? আমি সব শুনেছি। তা ওই দুঃসংবাদ পরে দিলেও ক্ষতি নেই।"

খেয়েদেয়ে মনটা একটু ভাল হল কিট্টুর। সে বলল, "পিসি, একটা কথা বাঘাকাকা তোমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন, অবশ্য যদি জানাতে আপত্তি না থাকে!"

"না, না, কী আর এমন কথা হবে যা জানাতে আমার আপত্তি থাকতে পারে?"

"তা হলে বলো তো পিসি, তোমার ওই সুন্দর চিনে খাদ্য তৈরির গোপন রেসিপিটা কী? বাঘাকাকা আর ভুলতে পারছেন না।"

"না, ওটা আমি বলব না।" সুপ্রিয়াপিসি বললেন, "যারা রান্না করে এটা তাদের গোপন রাখার অধিকার আছে কিট্টু! কিছু মনে করিস না।"

কিট্টু বলল, "আচ্ছা পিসি।" বলে চলে যাচ্ছিল।

সুপ্রিয়াপিসির কীরকম দুঃখ হল। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, গোপন রহস্যটা বলছি। বইমেলা থেকে একটা চমৎকার বই কিনেছিলাম বুঝলি, 'চিনা মেনুসংহিতা' সেটার নাম। অনেক রেসিপি আছে ওটাতে, চমৎকার বই, চমৎকার লেখা, লেখকের নাম ফটিকচাঁদ শর্মা!"

কিট্টু হাহা করে হেসে উঠল। বাঘাকাকারই লেখা বই! হাসবারই কথা। কিন্তু সেটা সুপ্রিয়াপিসিকে বলল না। নিজের মনেই হাসতে লাগল। ঠিক করল, কথাটা সে আপাতত বাঘাকাকাকেও বলবে না!

pathagar.net

খানিকটা তামার তার

হেমেন্দ্রকুমার রায়

pathagar.net

মানিক চেঁচিয়ে পড়ছিল খবরের কাগজ। শ্রোতা হচ্ছে জয়ন্ত। সে চোখ বুজে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। তার মুখে বিরক্তির লক্ষণ। কোন খবরে নূতনত্ব নেই। খুনীরা খুন করছে সেই পুরাতন উপায়ে। চোরেরাও চুরি করবার নূতন পথ আবিষ্কার করতে পারছে না। সাধু এবং অসাধু সব মানুষই হচ্ছে একই বাঁধা পথের পথিক।

মানিক একটা নূতন খবর পড়ছে ঃ

'অদ্ভুত দৈব দুর্ঘটনা!

গত সপ্তাহে শালিখার একটা বাড়িতে অজিতকুমার বসু নামক জনৈক যুবক বজ্রাঘাতে মারা পড়িয়াছিল, এই সংবাদ আমরা যথাসময়ে পত্রস্থ করিয়াছি। গতপরশু রাত্রে আবার সেই বাড়িতেই অজিতকুমারের দ্বিতীয় ভ্রাতা অসীমকুমারের মৃত্যু হইয়াছে ঐ বজ্রাঘাতের ফলেই। ইংরেজি প্রবাদে বলে, দুর্ভাগ্য কখনো একাকী আসে না। কিন্তু উপর-উপরি দুইবারই একই পরিবারে একই দুর্ভাগ্যের এমন আশ্চর্য আবির্ভাবের কাহিনী আমরা আর কোনদিনই শ্রবণ করি নাই।

জয়ন্ত চোখ মেলে সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, 'থামো মানিক। আপাতত আর কোন খবর পড়ে শোনাতে হবে না।'

মানিক হেসে বললে, 'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?'

'এই খবরটার ভিতরে তুমি চিন্তার খোরাক পেয়েছ।'

'তা পেয়েছি বৈকি। আমার পাপী মন একরকম অসম্ভব দৈব দুর্ঘটনাকে সহজে স্বীকার করতে রাজি নয়। ভগবানের হাতের আড়ালে আমি দেখছি মানুষের হাত।'

মানিক জবাব না দিয়ে কাগজখানা সামনের টেবিলের উপর রেখে দিলে।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে, 'টেলিফোনের রিসিভারটা এগিয়ে দাও তো।'

'কাকে ফোন করবে?'

'আমাদের বন্ধু গিরীন্দ্র চৌধুরীকে।'

'ইনস্পেক্টর গিরীন্দ্র চৌধুরী?'

'হ্যাঁ। তার কার্যক্ষেত্র তো ঐ অঞ্চলেই ; হয়ত সে আমাদের অন্ধকার মনকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করতে পারবে।'

যথাসময়ে ফোনের মধ্যে জাগ্রত হল গিরীন্দ্র চৌধুরীর কণ্ঠস্বর।

'গিরীন্দ্র, আমি জয়ন্ত।'

'ব্যাপার কী? হঠাৎ আমাকে মনে পড়ল কেন?'

'একই বাড়িতে বজ্রাঘাতে দুই ব্যক্তির মৃত্যু। ঘটনা কি তোমারই এলাকায় ঘটেছে?'

'ও হো হো, বুঝেছি। মনসা পেয়েছে ধুনোর গন্ধ! তা, ঠিক আন্দাজ করেছ ভাই। ঘটনাস্থলে আমাকেও হাজির হতে হয়েছে বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত।'

'মানে?'

'মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারছে সন্দেহ। কিন্তু সে সন্দেহ প্রকাশ বা পোষণ করবার উপায় নেই।'

'কেন?'

'লোক দুটো সত্য-সত্যই বজ্র বা বিদ্যুতের আক্রমণে মারা পড়েছে।'

'তবে আবার সন্দেহ কিসের?'

'না, ঠিক সন্দেহও নয়। তবে মাঝে মাঝে পাচ্ছি যেন বিপরীত ইঙ্গিত। একবার বেড়াতে বেড়াতে আমার এখানে আসবে নাকি?'

'নারাজ নই।'

।। ২।।

জয়ন্ত ও মানিককে দেখে গিরীন্দ্র বললে, 'প্রথমেই তোমরা কি এক-এক পেয়ালা কফি পান করতে চাও? জান তো, আমি চায়ের ভক্ত নই।'

জয়ন্ত বললে, 'কফি বা চা কিছুই চাই না। আমরা আজ গল্প শুনতে এসেছি।'

'তাহলে একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করি?'

'হ্যাঁ, গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে।'

'শোন। আজ এক বৎসর হল, অমরনাথ বসু মারা গিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন বড় জমিদার, যথেষ্ট স্থাবর আর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। অজিতকুমার, অসীমকুমার আর অমলকুমার হচ্ছে তাঁর তিন ছেলে। ছোট অমল নাবালক, সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। অমরবাবুর একটি মাত্র মেয়ে সুষমা, তার বিবাহ হয়েছে, স্বামীর নাম সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। সুষমার শ্বশুরবাড়ি বিদেশে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর ভাইদের অনুরোধে স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়িতেই বাস করে। এই হচ্ছে গত আর বর্তমান পাত্রপাত্রীদের পরিচয়।

'প্রথমে অজিত যখন বজ্রাঘাতে মারা পড়ে, ঘটনাটা আমার মনে স্থায়ী রেখাপাত করেনি। ডাক্তার বললে, মৃত্যুর কারণ বিদ্যুতের আঘাত। কিন্তু গেল পরশু অসীমও ঐ ভাবে মারা পড়তে আমরা রীতিমত চমকে গিয়েছি। এবারেও ডাক্তারের মুখে মৃত্যুর কারণ শুনলুম বটে, কিন্তু দুই সপ্তাহের মধ্যে একই পরিবারের উপর বজ্রের এমন পক্ষপাতিত্ব বিস্ময়কর। অবশ্য দুই ঘটনার রাত্রেই মেঘাচ্ছন্ন সজল আকাশ থেকে বজ্রের হুঙ্কার আমরা সকলেই শুনেছি।'

'তবে তুমি সন্দিগ্ধ হয়েছ কেন?'

'দু-দিনই ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটো মৃতদেহ ছাড়া বজ্রাঘাতের আর কোন চিহ্নই দেখতে পাইনি।'

'এ ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করেছ?'

'করেছি। দু-দিনই লাস পাওয়া গিয়েছে পূর্বদিকের জানালার তলদেশে মেঝের উপরে। এও লক্ষ্য করেছি মৃত্যুর রাত্রে অজিত আর অসীম যে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়েছিল, খাটের শয্যার উপরে সে প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু দুর্যোগময় গভীর রাত্রে তারা শয্যা ত্যাগ করে জানালার ধারে এসেছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাইনি।'

'তাহলে তোমরা কোন মামলা খাড়া করতে পারনি?'

'উঁহু! মামলা দাঁড়াবে কিসের উপরে? প্রমাণ কই? সন্দেহ তো প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না!'

'আমাকে একবার ঘটনাস্থলে নিয়ে যেতে পার?'

'অনায়াসে। সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে পাঁচ-ছয় মিনিটের বেশি লাগবে না। কিন্তু সেখানে গিয়ে তুমি কী দেখবে?'

'যা দেখবার তাই।'

গিরীন্দ্র হেসে উঠে বললে, 'কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি সেখানে গিয়ে আমরা যা দেখেছি, তার চেয়ে বেশি কিছুই তুমি দেখতে পাবে না। এটা মামলাই নয়, আশ্চর্যভাবে দৈব দুর্ঘটনায় দুটো লোক মরেছে এইমাত্র।'

'আশা করি তোমার কথাই সত্য হবে। এখন চল।'

অমরবাবুর বাড়িখানি মাঝারি। তার পূর্বদিকে ট্রাম লাইনের পাতা রাস্তা, পশ্চিম দিকে খিড়কির পুকুর ও বাগান এবং দক্ষিণ দিকে প্রতিবেশীদের বাড়ির সারি।

গিরীন্দ্রের সঙ্গে জয়ন্ত ও মানিক রাস্তার দিকের দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

গিরীন্দ্র সব দেখাতে দেখাতে বললে, 'বারান্দার কোণে এই যে তিনখানা ঘর দেখছ, এর প্রথমখানা হচ্ছে অজিতের ঘর। দ্বিতীয়খানা অসীমের আর তৃতীয়খানা অমলের। প্রথম ঘরের এই জানালার তলায় অজিতের, আর দ্বিতীয় ঘরের ঐ জানালার তলায়

পাওয়া গেছে অসীমের মৃতদেহ। এ দুটো ঘর এখন খালি পড়ে আছে।'

জয়ন্ত দু'খানা ঘরেই ঢুকে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

প্রত্যেক জানালা, এমনকি দেওয়ালের লোহার গরাদে পর্যন্ত ভাল করে পরীক্ষা করলে। উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না।

তারপর তারা তৃতীয় ঘরের একটা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাহির থেকেই দেখা গেল, ঘরের ভিতরে চেয়ারের উপরে বসে রয়েছে দুটি লোক। একজনের বয়স হবে আঠারো উনিশ আর এক জনের চল্লিশের কাছাকাছি।

জয়ন্তের দিকে ফিরে গিরীন্দ্র চুপি চুপি বললে, 'অমল আর তার ভগ্নিপতি সুরেনবাবু।' তারপর ঘরের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললে, 'কী হয়েছে সুরেনবাবু, অমলের মুখের ভাব অমনধারা কেন?'

অমলের মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে সুরেন বললে, 'বাড়িতে আবার পুলিশ দেখে অমল ভয় পেয়েছে। তাই আমি একে বোঝাবার চেষ্টা করছি।'

'বেশ করেছেন। আমরা বাঘ নই, তেড়ে গিয়ে অমলকে কামড়ে দেব না। আজ একেবারে শেষ তদন্ত করতে এসেছি, আর আসব না।'

সুরেন বললে, 'আর তদন্ত! এ হচ্ছে ভগবানের মার, পুলিশ তদন্তের ধার ধারে না!'

সেদিক থেকে ফিরে আসতে আসতে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'অমল কি এখনো এই ঘরে থাকে?'

'হ্যাঁ।

'একলা?'

'হ্যাঁ।'

'সুরেনবাবুর ঘর কোথায়?'

'বাড়ির পশ্চিম দিকে।'

বারান্দার রেলিঙের উপরে হাত রেখে ট্রামের রাস্তার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে যে কী ভাবছে, তার মুখ দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই।

মানিক বললে, 'কী হে, ধ্যান সাগরে তলিয়ে গেলে নাকি?'

'আমি তলাবার চেষ্টা করছি না মানিক, আমি ভাসবার চেষ্টা করছি।'

গিরীন্দ্র ঠাট্টার সুরে বললে, 'কী আবিষ্কার করলে শুনি?'

'শুনবে? এই বাড়িতে চোর আসতে পারে খুব সহজেই।'

'তাই নাকি?'

'নিচের ঐ গ্যাস-পোস্টটার দিকে তাকিয়ে দেখ। ওর উপরে উঠলেই এই বারান্দার নাগাল পাওয়া যায়।'

'উঃ, অভাবিত আবিষ্কার!'

'আর একটা আবিষ্কার করেছি। রাস্তার ওধারকার ঐ বাড়িখানার গায়ে ভাড়া-পত্র টাঙানো রয়েছে। ও-বাড়িখানা ভাড়া দেওয়া হবে।'

'তাতে তোমারই বা কী, আমারই বা কী?'

'মনে করছি বাড়িখানা আমিই ভাড়া নেব। জায়গাটি আমার বেশ লাগছে। কিছুদিন

pathagar.net

এখানে বাস করব।'

'মানে?'

'মানে কিছুই নেই। এ হচ্ছে আমার খেয়াল। আর খেয়াল হচ্ছে অর্থহীন। অতঃপর আমরা প্রস্থান করতে পারি।'

জয়ন্ত ঠাট্টা করেনি, আজ ক'দিন হল সত্যসত্যই শালিখার সেই বাড়িখানায় উঠে এসেছে। মানিকের কৌতূহলের সীমা নেই। সে বিলক্ষণ জানে, জয়ন্তর খেয়াল হয় না অকারণে। ঐ দুই মৃত্যুর ভিতর থেকে সে কোন সূত্র আবিষ্কার করেছে নিশ্চয়ই। নইলে ঘটনাস্থলের সামনা-সামনি থাকবার জন্যে তার এতখানি আগ্রহ কেন?

জয়ন্তের মনের ভিতর প্রবেশ করবার জন্যে গিরীন্দ্রও কম ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। সে রোজই আসে আর একই প্রশ্ন করে, 'কেন তুমি এ বাড়িখানা ভাড়া নিলে? এখানে থাকলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?'

জয়ন্ত বোবা। শুধু মুখ টিপে হাসে আর নস্য নেয়।

হপ্তা-দুই কেটে গেল। দুপুরবেলায় জয়ন্ত বাইরে বেরিয়েছিল। একটা ছোট ব্যাগ হাতে করে ফিরে এল সন্ধ্যার সময়ে।

মানিক বললে, 'ব্যাগটি নতুন দেখছি। ভিতরে কী আছে?'

ব্যাগটা সযত্নে আলমারির ভিতর পুরে রহস্যময় হাসি হেসে জয়ন্ত বললে, 'যথাসময়েই বুঝতে পারবে।'

মানিক রাগ করে বললে, 'এত লুকোচুরি কেন?'

'প্রথম পরিচ্ছেদেই পরিশিষ্টের কথা বলে দিলে উপন্যাস পড়তে কারুর ভাল লাগে না। গোয়েন্দা-কাহিনীর আর্ট প্রকাশ পায় লুকোচুরির ভিতর দিয়ে।'

রাত এগারোটা বেজে গেল। এই সময়ে নৈশ আহার শেষ করে জয়ন্ত শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু আজ সে খেয়ে দেয়ে রাস্তার ধারের জানালার সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বসে পড়ল।

মানিক শুধোলে, 'ঘুমোতে যাবে না?'

'না।'

'কেন হে?'

'আমি দেখতে চাই আজ গভীর রাত্রে চাঁদের মুখে কালি ঢেলে গোটা আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে যায় কি না। তারপর হয়ত জাগবে হু-হু ঝোড়ো বাতাস, হয়ত ঝরবে, ঝরো-ঝরো বাদলধারা, হয়ত বাজবে ডিমি ডিমি বজ্র ডমরু।'

'হঠাৎ উদ্ভট কবিত্বের কারণ কী?'

'কবি হতে চায় না কে বল?'

'আকাশে তো দেখি প্রতিপদের চাঁদের প্রতাপ। কেমন করে আজ ঝড়বৃষ্টি নামবে?'

'গণৎকার জানিয়ে দিলে।'

'সে আবার কে?'

'আবহবিদ্যা নিয়ে যাদের কারবার। জান তো আবহবিদ্যা জাহির করবার জন্যে সরকারি অফিস আছে? আজ আমি সেখানে গিয়েছিলাম। খবর পেলুম, আজ শেষ

রাতের দিকে রীতিমত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।'

'তুমি ক্রমেই অন্যায় রকমের দুর্বোধ্য হয়ে উঠছ। আর তোমাকে বোঝবার চেষ্টা করব না। আমি এখন ঘুমোতে চাই।'

'তথাস্তু।'

অনেক রাতে কিসের শব্দে হঠাৎ মানিকের ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের ভিতর হু-হু করে ঢুকছে জোর হাওয়া। ঘরের দরজাটা খোলা। জানালার সামনে চেয়ারের উপর জয়ন্ত নেই। তার বিছানাও শূন্য।

বজ্রের হুঙ্কারে চমকে মানিক বাহিরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, চাঁদের আলোর বদলে সেখানে দেখা যাচ্ছে কেবল অন্ধকারকে। বৃষ্টি নামার শব্দও শোনা গেল।

তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করতে গিয়ে মানিকের চোখে পড়ল আর এক দৃশ্য। অমরবাবুর বাড়ির সামনে গ্যাস-পোস্টের উপরে একটা মূর্তি। পরমুহূর্তে মূর্তিটা ঝাঁপ খেল মাটির উপরে। গ্যাসের আলোতে চিনতে বিলম্ব হল না। জয়ন্ত।

মানিক হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে, জয়ন্ত আবার এসে দাঁড়ালো ঘরের ভিতরে। তার হাসি-হাসি মুখ।

'এসব কী, জয়ন্ত, তুমি চোরের মত অমরবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলে?

'গিয়েছিলাম।'

তোমার পায়ে রবারের জুতো, হাতে রবারের দস্তানা।'

হ্যাঁ, এ হচ্ছে vulcanised রবার।'

'আশ্চর্য!'

'এর চেয়ে বেশি আশ্চর্য যদি হতে চাও তাহলে ছুটে যাও টেলিফোনের কাছে।'

'তারপর?'

'গিরীন্দ্রকে ফোন কর। বল, এখনি সদলবলে ছুটে আসতে।'

'সেকি, এই রাতে? এই ঝড়-জলে'?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করো না। গিরীন্দ্রকে বল, এখনি সদলবলে অমরবাবুর বাড়িতে না গেলে এ মামলার কিনারা হবে না। ততক্ষণে আমি একটু বিশ্রাম করে নি।'

অল্পক্ষণ পরেই একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে গিরীন্দ্র এসে হাজির হলেন হন্তদন্তের মত।

সে কোন প্রশ্ন করবার আগেই জয়ন্ত বললে, 'এখন কোন কথা নয়। এখনই আমাদের যেতে হবে অমরবাবুর বাড়ির ভিতরে।'

দারোয়ানরা দরজা খুলে দিয়ে এই অসময়ে পুলিশ দেখে অবাক হয়ে গেল। জয়ন্ত সকলকে নিয়ে উঠে গেল একেবারে উপরে। রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে সে টর্চের আলো ফেললে। সেখানে পড়ে আছে একটা নিশ্চেষ্ট মূর্তি।

গিরীন্দ্র সভয়ে বললে, 'বাবা! আবার বজ্রাঘাতে মৃত্যু নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'আরো এগিয়ে গিয়ে দেখ।'

গিরীন্দ্র কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে ভাল করে দেখে মহা বিস্ময়ে বলে উঠল, 'একি, সুরেনবাবু! এঁর হাত পা মুখ বাঁধলে কে?

pathagar.net

জয়ন্ত বললে, 'আমি।'

'কেন?'

'সুরেন হচ্ছে খুনী।'

'খুনী! সুরেনবাবু আবার কাকে খুন করেছেন?'

'অজিত আর অসীমকে।

এমন সময় বারান্দার তৃতীয় ঘরের একটা জানলা খুলে গেল। ভিতর থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল অমলের ভীত মুখ।

জয়ন্ত বললে, 'সুরেন আজ আবার বধ করতে চেয়েছিল ঐ বেচারা অমলকে।

গিরীন্দ্র বললে, 'কিন্তু অজিত আর অসীমের মৃত্যু হয়েছে বজ্রাঘাতে। বজ্র তো সুরেনবাবুর হাতে-ধরা নয়!'

'অজিত আর অসীম বজ্রাঘাতে মারা পড়ে নি। তাদের মৃত্যু হয়েছে মানুষের হাতে বন্দী বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্বারা।

'প্রমাণ?'

'ঐ জানলার দিকে তাকিয়ে দেখ।'

জানলার ছয়টা গরাদের গায়ে জড়ানো রয়েছে খানিকটা তামার তার।

গিরীন্দ্র মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বিদ্যুৎ-প্রবাহ সবচেয়ে বেশি জোরে চলে রুপোর ভিতর দিয়ে। তারপর তামার স্থান। তারপর সোনা, অ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি।

'বুঝলুম। কিন্তু এই তামার তারের ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হবে কেমন করে?

'সামনেই ট্রামের লাইন। মাথার উপরকার যে মোটা তারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে, জানলার এই তামার তারের অন্য প্রান্ত এখনো ঝুলছে তার সঙ্গে লগ্ন হয়ে। মাঝখান থেকে তার কেটে দিয়েছি আমি নইলে এতক্ষণে আমাকেও কেউ জীবিত অবস্থায় দেখতো পেতো না।'

'কী ভয়ানক, কী ভয়ানক! কিন্তু—'

'এখনো তোমার মনে "কিন্তু" আছে? তাহলে আরো একটু পরিষ্কার করে বলছি শোন।'

।। ৪ ।।

জয়ন্ত বলতে লাগল :

'সুরেন হচ্ছে একটি প্রথম শ্রেণীর অতি-চালাক শয়তান। মাথা খাটিয়ে নরহত্যার বেশ একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করেছিল। কাজ করত এমন এক রাতে, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র যেদিন তাকে সাহায্য করবে। কী করে সে মনের মত রাত্রি নির্বাচন করত, এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমি মনে করি, আমার মতন সেও কোন সরকারি আবহ-বিদ্যাবিদের কাছে আনাগোনা করত।

'এরূপ অবস্থায় মানুষের পক্ষে কী করা স্বাভাবিক, এ নিয়ে সে মনে মনে আলোচনা করেছিল। এই বর্ষাকালেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ আমরা, শয়নগৃহের জানলার পাশেই

শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করি। রাত্রে যদি হঠাৎ বৃষ্টি আসে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে নিদ্রাজড়িত চক্ষে তাড়াতাড়ি সর্বাগ্রে খোলা জানালাগুলো দুমদাম শব্দে বন্ধ করে দি।

'আমাদের এই অভ্যাসের উপরেই নির্ভর করে সুরেন ফাঁদ পাতত, চমৎকার ফাঁদ। খানিকটা তামার তার সে এমনভাবে জানলার গরাদগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে রাখত যে জানলা বন্ধ করতে গেলেই সেই তার স্পর্শ করা ছাড়া উপায় নেই। তামার তারের ওপর প্রান্ত সে নিক্ষেপ করত বৈদ্যুতিক শক্তিতে জীবন্ত ট্রামের তারের উপরে। ফলে জানলার তার আরও জ্যান্ত হয়ে উঠত, তখন তাকে ছুঁলেই মৃত্যু অনিবার্য।

'তারপর যথাসময়ে সুরেন আবার এসে নিজের অপকীর্তির গুপ্ত চিহ্নগুলো বিলুপ্ত করে দিত। আমার বিশ্বাস বিপজ্জনক মৃত্যুকে এমনভাবে খেলা করার সময়ে আমার মত সুরেনও ব্যবহার করত vulcanised রবারের জুতো ও দস্তানা। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি তাকে আক্রমণ করতে পারত না।

'সুরেন এটাও হয়ত অনুমান করেছিল যে, একই বাড়িতে একই ভাবে উপর-উপরি তিনজন লোকের মৃত্যু হলে পুলিশের সন্দেহের সীমা থাকবে না। কিন্তু এটাও তার অজানা ছিল না যে, আসল রহস্য আবিষ্কার করতে না পারলে যেকোন সন্দেহই পঙ্গু হয়ে থাকবে কারণ সন্দেহ ও প্রমাণ এক কথা নয়। কিন্তু সুরেন অতি-চালাক কিনা, তার চক্রান্ত বুঝবার মতন লোকও যে পৃথিবীতে থাকতে পারে, এটা সে ধারণায় আনতে পারে নি। এ হচ্ছে অতি-চালাকির দুর্বলতা।

'একই বাড়িতে উপরি-উপরি দুই ব্যক্তির বজ্রাঘাতে মৃত্যু, অথচ ঘরে বজ্রাঘাতের অন্য কোন চিহ্ন নেই এবং মৃত ব্যক্তিকে পাওয়া যায় ঠিক জানলার ধারেই। এইসব অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখেই আমি পেয়েছিলুম এর মধ্যে হত্যাকারীর হাতের সন্ধান। তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে জীবন্ত তারের দিকে তাকিয়ে থাকতেই আমার মনে ফুটে উঠল সন্দেহের ভীষণ ইঙ্গিত।

'তারপর হত্যার উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে বিলম্ব হল না। অমরবাবুর তিন পুত্রের অবর্তমানে সম্পত্তির মালিক হবেন তাঁর কন্যা এবং সুরেন হচ্ছে সেই কন্যার স্বামী।

'ঘটনাস্থলের উপর পাহারা দেবার জন্যেই আমি সামনের বাড়িখানা ভাড়া নিয়েছিলুম। আবহ-বিদ্যাবিদ বললেন, আজ গভীর রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। আমিও অতিজাগ্রত হয়ে উঠলুম, বারান্দার উপরে চোরের মতন সুরেনের আবির্ভাব। আমিও চুপি চুপি গ্যাসপোস্টের সাহায্যে বারান্দায় উঠে অন্ধকারে লুকিয়ে রইলুম। তারপর সুরেনের মৃত্যু-ফাঁদ পাতা যেই শেষ হল, আমিও অমনি বাঘের মতন তার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়লুম—আমি চেয়েছিলুম তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলতে। সে টুঁ-শব্দটি করবার আগেই আমি তাকে বন্দী করে ফেললুম এবং তখনই কেটে দিলুম বৈদ্যুতিক শক্তিতে জীবন্ত মৃত্যু-ফাঁদের তার।

'গিরীন্দ্র, বোধহয় তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই? কিন্তু আমার আরও একটি ছোট্ট বক্তব্য আছে। বন্ধু, পুলিশে চাকরি নিয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়ো না। কল্পনা-শক্তির চর্চা করতে শেখো। কল্পনা-শক্তি কেবল কবিদের একচেটে নয়, তাকে দরকার প্রতি মানুষের প্রতি পদে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে।'

টর্চ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ইনস্‌পেক্টার রাজেশবাবু এসে দেখলেন, নন্দবাবুর হাত-পা-মুখ কষে কাপড় দিয়ে বাঁধা। চোখের তারা কপালে তুলে তিনি গোঁ গোঁ করছেন।

সঙ্গের কন্‌স্টেবল তাঁর বাঁধন খুলে দিল। নন্দবাবু তখনও কথা বলতে পারছেন না—হাঁপাচ্ছেন।

রাজেশবাবু একটু জিরিয়ে নেবার সময় দিলেন। ঢক-ঢক করে পুরো এক ঘটি জল খেয়ে নন্দবাবু ধাতস্থ হলেন একটু। তারপর হঠাৎ গোঙিয়ে উঠলেন, 'আমার ভাই মুকুন্দ? তার—তার কী হয়েছে?'

একটু বিষণ্ন মুখে রাজেশবাবু বললেন, 'আপনাকে দুঃসংবাদ দিচ্ছি, কিছু মনে করবেন না, তিনি খুন হয়েছেন। তাঁর বুকে ছোরা বেঁধানো।'

'অ্যাঁ!'—একটা চিৎকার করে নন্দবাবু অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ পুলিশের সামনে অজ্ঞান হয়ে থাকা যায় না, কাজেই উঠে বসতে হলো একটু পরে। রাজেশবাবু পকেট থেকে নোট বই আর পেন্সিল বের করলেন তখন।

'দেখুন লোক ধরবার সময় পরে অনেক পাবেন। কিন্তু হত্যাকারীকে আগে ধরবার চেষ্টা করা দরকার। সুতরাং দয়া করে আমাদের একটু সাহায্য করুন।'

ধরা গলায় নন্দবাবু বললেন, 'বলুন।'

'আপনি তো পাটের দালালী করেন, আর আপনার ছোটো ভাই মুকুন্দবাবু?'

'ওর একটা জুয়েলারী দোকান আছে রাধাবাজারে। মাঝে মাঝে দু'একটা হীরে-টীরে সঙ্গে করে বাড়িতে আনতো—কী সব পরীক্ষা করতো এনে। আমি অনেকবার বলেছি—মুকুন্দ, বাড়িতে আমরা দু'ভাই মোটে থাকি, ও-সব সর্বনেশে জিনিস আনিসনি, তা—' বলতে বলতে নন্দবাবু আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন : 'আমি বুঝেছি, কালও ওই রকম একটা কিছু বাড়িতে এনেছিলো, আর কেউ তাকে ফলো করে—'

বাধা দিয়ে রাজেশবাবু বললেন, 'তাই সম্ভব। কিন্তু ও-সব পরে হবে। তার আগে বলুন, কাল রাত্রে কি হয়েছিল?'

'তখন রাত সাড়ে ন-টা। খেয়ে-দেয়ে আমরা দু'ভাই শুতে গেলাম। আমরা বরাবরই তাড়াতাড়ি শুই, ভোরে উঠি।'

'বাড়িতে আর কে থাকে?'

'কেউ না। আমরা ব্যাচেলর।'

'থানায় যে খবর দিয়ে এলো—দরজা হাট করে খোলা, আপনি মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে, আপনার ভাই খুন হয়েছেন—আপনাদের সেই চাকরটি কোথায় থাকে?'

'খ্যাংরাপটিতে। আমাদের রান্নাবান্না করে দিয়ে, ন'টার মধ্যেই ও খেয়ে বাড়ি চলে যায়। আমি কাল ঠিক ন'টায় ও চলে গেলে সদর বন্ধ করেছি।'

'ঠিক ন'টা? খেয়াল থাকলো কী করে?'

'তখনি কোথায় একটা পেটা-ঘড়িতে ন'টা বাজছিল।'

'ঠিক আছে। তারপর বলুন।'

'তখন দশটা সাড়ে-দশটার বেশি নয়। আমার ঘুম এসেছিলো। হঠাৎ পাশে মুকুন্দর ঘর থেকে যেন একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি আর গোঁ গোঁ আওয়াজ কানে এলো। উঠে আলো জ্বালতে গেলাম—জ্বললো না, মেন অফ্ করে দিয়েছে কেউ। দিনকাল তো জানেন, যখন-তখন কারেণ্ট বন্ধ হয়ে যায়। আমার বালিশের নিচে ছোট্ট একটা দু'সেলের টর্চ থাকে, সেইটে জ্বেলে আমি মুকুন্দের ঘরের দিকে ছুটে গেলাম।'

'একটু দাঁড়ান। মুকুন্দবাবুর ঘরের দরজা খোলা ছিল?'

'বরাবরই থাকে। আমরা দু'ভাই-ই দরজা খুলে ঘুমোই।'

'মারাত্মক অভ্যেস, এ-কাজ কখনো করা উচিত নয়। সে যাক, তারপরে কী দেখলেন?'

'টর্চ ফেলে দেখি, একটা মুসকো জোয়ান লোক মুকুন্দর বুকে চেপে বসেছে, সে গোঁ-গোঁ করছে। আমি কিছু করবার আগেই অন্ধকারে কারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, হাত-মুখ বেঁধে ফেললো, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। যখন জ্ঞান হলো, কত রাত জানি না! টের পেলাম—বারান্দায় পড়ে আছি। উঠতে পারলাম না, কিছু করতেও পারলাম না—ছটফট করলাম সমানে। আবার জ্ঞান হারালাম। সকালে কখন যে বনমালী,

মানে আমাদের চাকরটা এসেছে, আপনাদের খবর দিয়েছে—'

'ভালো কথা, আপনার টর্চ কি হলো?'

'ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় আমার হাত থেকে ঠিকরে পড়ে গিয়েছিল জ্বলন্ত টর্চটা। ওই ঘরেই কোথাও আছে নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ, সেটাকে আমরা ও ঘরের একটা কোণায় পেয়েছি। এখন আর দু'একটা কথার জবাব দিন। বাইরে থেকে আপনাদের বাড়িতে লোক ঢুকলো কী করে? সদর তো আপনি নিজের হাতেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ওরা নয় খুলেই বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ঢুকলো কোন্ রাস্তা দিয়ে?'

পাশেই তো কানাগলি। বাড়ির রেন-ওয়াটার পাইপ সেখানে। সেটা বেয়েই ডাকাতরা ছাতে উঠেছে। ছাতের দরজা বন্ধ করা হয়নি। আমরাও তো ঘর খুলেই রাখি।'

'ঠিক। তা হলে মুকুন্দবাবু হীরে এনেছিলেন কাল?'

'সেই রকমই বলছিল। কোন্ রানীর হীরে—খুব দামী, যাচাই করতে দিয়েছিল বোধ হয়, সেই লোভেই—'

'হ্যাঁ, সেই লোভেই।'—মৃদু হেসে রাজেশবাবু বললেন, 'সেই লোভেই নিজের ভাইকে আপনি খুন করেছেন নন্দবাবু। তারপর চাকর বনমালীকে দিয়ে হাত-মুখ বাঁধিয়ে নিতে বেশি অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।'

নন্দবাবুর মুখটা ঝুলে পড়লো হঠাৎ। তারপরেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন : 'কী বলছেন আপনি পাগলের মতো? নিজের ভাই মুকুন্দকে আমি খুন করবো?'

'লোভ, নন্দবাবু, লোভ। লোভে মানুষ পশু হয়ে যায়। কিন্তু নিজেকে নিজেই ধরিয়ে দিয়েছেন আপনি। টর্চের কায়দাটা না করলেই পারতেন।'

'অ্যাঁ?'—নন্দবাবু হাঁ করে রইলেন।

'নন্দবাবু, ঘটনাটা রাত সাড়ে-দশটার। বেলা সাড়ে-সাতটা এখন। আপনার টর্চ এখনো পুরো তেজে জ্বলছে। কোনো ছোট্ট দু'-সেলের টর্চে অমন অলৌকিক ব্যাটারী থাকে না, নন্দবাবু! অতএব দয়া করে উঠুন আর থানায় চলুন। আপনার বনমালীকেও সহযাত্রী করতে হচ্ছে, কারণ সেও আপনার সহযোগী—হীরে বিক্রির ভাগ সেও পেতো নিশ্চয়ই।'

মাথায় শিকড়-পরা সাপের মতো নন্দবাবুর ঘাড় নুয়ে এলো।

দুর্দান্ত গোয়েন্দা কাহিনী

আশা দেবী

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে দারুণ অন্ধকার ঘুটঘুট করছে, গোবর্দ্ধন পোদ্দার লোডশেডিং-এর আশঙ্কায় প্রহর গুনছেন। নিচে একটি শুটকী মাছের দোকান। সেখান থেকে দারুণ উৎকট একটা উগ্র গন্ধ বেরিয়ে কাঠের দোতলা পর্যন্ত আমোদিত করছে। কারা যেন গোপন পদক্ষেপে দিনরাত ঘোরা-ফেরা করছে। নিশ্চয়ই ওরা নেংটি এবং ধেড়ে ইঁদুর। উঁই যে নেই ঘরে এমন কথা বলা যায় না। তবে ইঁদুরের ব্যবহারের সঙ্গে কার তুলনা—গোবর্দ্ধনবাবু বাঁ হাতের করাতের মত আঙ্গুল দিয়ে খুচ খুচ করে দাদ চুলকোলেন। একবার নিজের নখগুলোর দিকে তাকালেন। পুলিশকে যদি তার এই হাত দু'খানা দেখান হতো তবে নির্ঘাত তিনি অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার হতেন। কিন্তু না, পুলিশ তাঁর হাত দেখবার সৌভাগ্য হোতে বঞ্চিত। গোবর্দ্ধনবাবু নিজের ভুঁড়ি এবং গোঁফ নিয়েও একটু বিব্রত হলেন। অন্ধকার নামলেই ভুঁড়ির ওপর মশার দল দারজিলিং-এর পাহাড়ে চড়বার মত করে চড়ে বসে। এত বড় পেটটার ওপর কোথায় যে কে বসে তার হিসেব রাখাও শক্ত। তার দোকানের কর্মচারী ভোজুয়া বলে, তাঁর গোঁফে নাকি উকুনে

বাসা করবে। তা এত জায়গা থাকতে তার গোঁফের ওপর সবার নজর কেন? না! আবার সেই খুট খুট শব্দ। উঁই আর ইঁদুরের দুর্ব্যবহারের কথা মনে করতেই তাঁর মন বেদনায় ভরে গেল। উঁই আর ইঁদুর যদি খারাপ না হবে তবে কেন কবিরা বলবেন, "উঁই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার, যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার।"

গোবর্দ্ধনবাবু বাইরে বেরিয়ে এলেন। দোতলা কাঠের বাড়ী। যেমন নড়বড়ে তেমনি হাল্কা, মনে হয় একটু ঝড়ের হাওয়া লাগলেই একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে।

কিন্তু পড়েনি এখনো।

গোবর্দ্ধনবাবুদের তিন পুরুষের শুটকী মাছের ব্যবসা এই এখানে এই বাড়ীতেই।

অনেকদিন থাকতে থাকতে বাড়ীটার ওপর কেমন যেন মায়া বসে গেছে গোবর্দ্ধনবাবুর। ইঁদুর, উঁই আর চোরের উৎপাতে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ভাবেন চলেই যাব। এই পুরোনো ঝরঝরে বাড়ী আর শুটকী মাছের ব্যবসাও ছেড়ে দেব। এ বাজে মাছের ব্যবসার চেয়ে ঝোলাগুড়ের ব্যবসাও ভাল। কিন্তু কার্যকালে আর ছাড়া হয় না। কেমন যেন বাধ বাধ লাগে তিন পুরুষের ব্যবসা ছাড়তে, ছাড়বো বললেই কি ছাড়া এত সহজ?

খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন গোবর্দ্ধন। অন্ধকার অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তা-ঘাটে লোক ঘরমুখো ছুটছে। বাদুড় আর চামচিকে দারুণ ব্যস্ত হয়ে কোথায় যেন রওনা দিল। কতগুলো চামচিকে ঘুরে ঘুরে শুটকী মাছের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে গোল হয়ে ঘুরতে লাগলো।

গোবর্দ্ধন চামচিকিকে খুব ভয় করেন, কে যেন তাঁকে বলেছিল চামচিকের ইংরিজি "ব্যাটলেট্"—মানে ছোট বাদুড়। ওরা নাক কামড়ে নেয়। তাই ছুটে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। তারপর শুটকী মাছের স্টক করা বাকসের ওপর লাল খাতা আর সুতোয় বাঁধা পেনসিলটা দিয়ে হিসেব লিখতে বসলেন।

ছত্রিশ টাকা ছাপান্ন পয়সার হিসেব আর কিছুতেই মিলছে না। মিলবে কী? যতবার হিসেব শুরু করেন ততবার মাথার ওপর দিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে সেই হতচ্ছাড়া চামচিকেটা। না—কিছুতেই আর হিসেবটা আজ মিলবে না।

গোবর্দ্ধন সটান বাক্স-কাম-খাটের ওপর লম্বা হয়ে পা ছড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও বিপদ—মশা। তারা গান করে করে ওঁকে ঘিরে ধরলো যেন ওরা সমবেত সঙ্গীত ঘুরে ঘুরে গাইছে : "মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এলে ফাগুন দিনের স্রোতে।"

না! শিবু খাবারটা দিয়ে গেলেও তো পারে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বেন, কিন্তু সে তো দশটার আগে কিছুতেই খাবার দেবে না। দেবে তো ছাই পঁয়ত্রিশখানা রুটি, খানিকটা ছোলার ডাল আর একটা ঘ্যাঁট্, গোবর্দ্ধন হাঁক দিলেন :

ওরে শিবে আজ একটু তাড়াতাড়ি খাবার দিবি।

আচ্ছা-আচ্ছা। আজ রান্না তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে। নীচের থেকে শিবুও হাঁক দিলো।

গোবর্দ্ধন এপাশ-ওপাশ করতে করতে একটু ঘুমিয়ে গিয়েছেন। শিবু কখন খাবার দিয়ে বলে গেছে, বাবু খাবার রইলো।

গোবর্দ্ধন ঘুমের চোখে উঠে খাবার খেতে গিয়ে একটা ধেড়ে ইঁদুরকে চেপে ধরলেন

ঘ্যাটের বাটিতে। গোবর্দ্ধনের অবর্তমানে সে খানিকটা ঘ্যাঁট খেয়ে কমিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গোবর্দ্ধন বাদ সাধলেন।

ঘণ্টাখানেক ধরে বেশ তরিবৎ করে খাওয়া শেষ করে গোবর্দ্ধন একটা পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুললেন। তারপর একটা খালি র‍্যাগ গায়ে জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

খাওয়ার পর আজ গোবর্দ্ধনের মনটা খুবই ভাল হয়ে গেছে কারণ আজ সনাতন ঠাকুর ঘ্যাটটা খুব ভালই রেঁধেছে—তাই খাওয়ার পর খুব খোস মেজাজে বিছানায় শুয়েই ঘোরতর বেগে নাক ডাকতে লাগলেন তিনি।

রাত গভীর হতে লাগলো। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগলো, শুটকী মাছের বস্তার ওপর দিয়ে ধেড়ে নেংটি নানা মাপের ইঁদুর ঘোরাফেরা শুরু করে দিল।

গোবর্দ্ধনের নাক কখনও মিহি—কখনও মোটা সুরে ডাকতে লাগলো।

হঠাৎ মনে হলো গোবর্দ্ধনের কাঠের জানালার মধ্যে দিয়ে কে বা কারা হুড়মুড় করে চটে জড়ানো একটা কিছু যেন অন্ধকারের মধ্যে দুম করে ওর মেঝেয় ফেলে দিয়ে যেমন তড়িঘড়ি এসেছিল তেমনি তীর বেগে নেমে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, তোমার কুট্টিপিসির শবদেহ অনেকদূর থেকে বয়ে নিয়ে এলাম। তিনি আজই সকালে বাগুইহাটি নামে এক ঘোরতর জঙ্গলের মধ্যে খুন হয়েছেন।

অ্যাঃ! গোবর্দ্ধন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন—যেন তিনি হরিপদ ময়রার দোকানে গিয়ে বসেছেন। বহুদিন পর আবার তাঁদের দু'জনের দেখা। হরিপদ ময়রা তাঁকে দেখেই ভুঁড়ি নাচিয়ে নাচিয়ে অনেকক্ষণ হাসলেন তারপর বললেন ঃ কতদিন পরে এলেন। বাড়ীর সব কুশল তো?

তারপর কী খাবেন? লবঙ্গলতিকা না ছানার পায়েস না মিহিদানা? যা আপনার ইচ্ছে।

মনে মনে গোবর্দ্ধন বললেন ঃ ইচ্ছের কথা যদি বলেন তবে তো সবই খেতে ইচ্ছে করে, আবার ওখানে কী ক্ষীরমোহন—ওটা আমার খুব প্রিয়—লোভী বেড়ালের মত ঠোঁট চাটতে লাগলেন গোবর্দ্ধন।

এই যে দাদা—ঠোঁট চাটছেন কী, মরা পিসিমা রইলো মেঝের ওপর। আমরা চললাম—বিদায়—বলতে না বলতে লোকগুলো ঝুপঝুপ করে জানালা দিয়ে নেমে পড়লো অন্ধকারের মধ্যে তারপর কোথায় হাওয়ায় মিশে গেল।

অ্যাঃ এ সব কী শুনছি। বলে চোখ কচলাতে লাগলেন গোবর্দ্ধন। নিজের চোখকে যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যিই কি ওরা মেঝের ওপর কুট্টিপিসির মৃতদেহ ফেলে দিয়ে চলে গেল নাকি? ওরা সব পারে। যেমন ষণ্ডামার্কা লোকগুলো, ওদের অসাধ্য কী আছে?

বিছানার ওপর বসে ভয়ের চোটে পৈতে দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে পটাস করে পৈতেটা ছিঁড়ে গেল গোবর্দ্ধনের কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এমন ভয়াবহ যে গোবর্দ্ধন থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। বিছানা থেকে নেমে এসে দেখতে সাহস পেলেন না যে সত্যই ওরা কি দিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কাটলো। ঘরের মধ্যে একটা ফরসা ধবধবে সাহেব

আরশোলা প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে গোবর্দ্ধনের পিঠে এসে পড়লো।

গোবর্দ্ধন চীৎকার করতে লাগলেন—বিচ্ছু বিচ্ছু তাড়াতাড়ি আয়, দেখ ঘরের মধ্যে কি?

একটা টেমি হাতে গোবর্দ্ধনের প্ল্যাংকিং অর্থাৎ তক্তা পাতা কাঠের নড়বড়ে শ্রীকৃষ্ণের মত বাঁয়ে হেলা বাড়ীর নীচের তলার হোটেলের বয়। নামে এবং কাজে এমন মিল সচরাচর দেখা যায় না। নামেও বিচ্ছু এবং কাজেও সে কাঁকড়া বিচ্ছু, সুতরাং গোবর্দ্ধনের ডাক শুনে সে প্রথম ঠিক করলো ঃ

উঠবো না। ও আলুর বস্তা রোজ রাতে জ্বালায়, হয় স্বপ্ন দেখে চেঁচায়, নয় ওকে বোবায় ধরে, নয় ধেড়ে ইঁদুর নাক কামড়ে দিচ্ছে। আমি উঠবো না, কিন্তু যখন একেবারে চীৎকার শুরু করলেন গোবর্দ্ধন ঃ পুলিশ—পুলিশ—ইধার আও। তখন আর না এসে পারা গেল না কিছুতেই, ছুটে এসে হাতের টেমি তুলে ধরে বিচ্ছু বললে ঃ কী হয়েছে বাবু?

ওই দেখ মেঝের উপর আমার কুট্টি পিসির শব! আমি পরিষ্কার দেখলাম কতগুলো লোক জানালা দিয়ে ঢুকে এসে একটা চট জড়ানো মড়া ধপাস করে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বললে ঃ এই নাও তোমার পিসিমার মড়া—বাগুইহাটির জঙ্গলে কে বা কারা একে খুন করে ফেলে রেখে গেছে। আমি ধড়মড় করে উঠে দেখি চটে জড়ানো একটা যেন কী মেঝের ওপর আছে। তুই আলো ধরে দেখ্।

বিচ্ছু চারদিকে খুব ভাল করে খুঁজে খুঁজে দেখে বললে ঃ না তো, কিছু নেই।

মানে?—গোবর্দ্ধনবাবু হতবাক। এই তো দেখলাম এখানে পড়ে আছে। চট দিয়ে শক্ত করে জড়ানো। গোবর্দ্ধনের মাথা যেন ঘুরতে লাগলো বাঁই-বাঁই করে। একটু আগেই তো তিনি বেশ মন গিয়ে রুটি, তরকারী, পুদিনার চাটনিটুকু বেশ তরিবৎ করে চেটে চেটে খেয়ে দিব্যি খোস মেজাজে ঘুমোচ্ছিলেন, এক হাজার এনোফিলিস আর কিউলেকস্ মশার বৃন্দগানও তাঁর শান্তি ভঙ্গ করতে পারেনি। আর যখন একটা ভাল স্বপ্ন দেখবো দেখবো করছেন ঠিক তখন গোটাকতক লোক ছুটে এসে তাঁর ঘরের মেঝেয় চটে জড়ানো একটা মড়া ধপাস করে ফেলে দিয়ে জানালা দিয়ে গলে বেরিয়ে যাবার সময় বললে ঃ বাগুইহাটির জঙ্গলে তোমার কুট্টিপিসিকে কে বা কারা খুন করে বেমালুম চলে গেছে। এই নাও তার মড়াটা।

আর এরই মধ্যে মড়া-ফড়া সব বেমালুম ভ্যানিশ, একি পি. সি. সরকারের ম্যাজিক না কি? না তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা-মসকরা করতে শুরু করেছে লোকে? বিচ্ছু ঢুলুঢুলু চোখ করে বললে ঃ রাতে একটু বেশী খাওয়া হয়ে গিয়েছিল বোধ হয় তাই হয়তো আপনি স্বপ্ন দেখেছেন।

তুই আর গজদন্ত বের করিস না বলে দিলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবো কেন? জেগে দেখলাম—লোকগুলোর সঙ্গে কথা বললাম। মেঝেতে চোখ রেখে চটে জড়ানো মড়া দেখলাম। তুই খবর দে বরং, আমার ব্যাপারটা খুব ভাল লাগছে না।

পুলিশকে খবর আমি দিতে পারি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে এসব মড়া-টড়ার ব্যাপারে জড়াবেন না বলে দিলাম।

গোবর্দ্ধন কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন ; তোকে এসব ব্যাপারে জড়াব আমি কি তাই বলেছি? আস্ত মানুষটা নির্বিকার চিত্তে মরে গেল—আমি নিজের চোখে সব দেখলাম আর আমার চোখের সামনে একেবারে ভ্যানিশ? আমি পুলিশে খবর দেব না—বলিস কিরে? যদি শেষে কিছু হয় তখন হ্যাপা সামলাবে কে? তুই ছুটে যা—এই টাকাটা নে। চলে যা—

বিচ্ছু ছুটলো পুলিশের খোঁজে থানায়। আর গোবর্দ্ধন নড়বড়ে তক্তপোষটার ওপর বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

আচ্ছা এতলোক থাকতে কুট্টিপিসিকেই বা লোকে খুন করলো কেন? তিনি তো কোন গোলমালেই নেই। খান-দান কাঁসি বাজান—পরমানন্দেই তো ছিলেন তাঁর দমদমের বাড়ীতে। সঙ্গে থাকতো হাজারীলাল। সে তো বেশ তেলতাগড়া লোক ছিল আর অনেক দিনের পুরোনো লোক। ধরতে গেলে তিন পুরুষ তাঁরা এ বাড়ীতে কাটিয়ে দিয়েছেন। আর কুট্টিপিসিরও তো যে খুব ধন-সম্পত্তি আছে বা তিনি কোন গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছেন এমন তো মনে হয় না। তবে তাকে খুন করার কারণ কি? কিংবা অকারণ পুলকেই তাকে কে বা কারা মেরে বসলো? কিংবা হাজারীলাল ভেবেছিল কুট্টিপিসির অনেক টাকা-পয়সা লুকনো আছে তাই ওকে খুন করেছেন টাকা-পয়সা কব্জা করবার জন্যে।

ভাবতে ভাবতে গোবর্দ্ধনের মাথাটা কেমন টিপটিপ করতে লাগলো। ঝ্যাটা গোঁফের ভেতরে দারুণ কুটকুট করতে লাগলো যেন গোঁফে গুঁফো উকুনে বাসা বেঁধেছে।

হঠাৎ ঘরের ভেতরে আলো দেখে একটা চামচিকে পাঁই পাঁই করে ঢুকে এসে ঘুরে ঘুরে যেন সার্কাস দেখতে লাগলো। অন্য দিন হলে গোবর্দ্ধন ছাতা নিয়ে ছুটে এসে চামচিকেকে তাড়াতেন কিন্তু আজ তিনি ভয়ে ঘামতে ঘামতে যেন অস্থির হয়ে পড়লেন।

যত গোলমাল তিনি এড়িয়ে চলতে চান ততই গোলমাল তাঁকে চেপে ধরে—যত সব ইয়ে—দরজায় ভারী জুতোর আওয়াজ হচ্ছে। পুলিশ আসছে নিশ্চয়ই। গোবর্দ্ধন উঠে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ ঠিকই, পুলিশই আসছে।

বেশ তেলতাগড়া এক পুলিশ আর শুটকে একজন দারোগা এসে হাজির হলেন। এ বাড়ীতে নাকি খুন হয়েছে? বাটারফ্লাই গোঁফ চুমড়ে তিনি পিটপিট করে গোবর্দ্ধনকে কথা ক'টা ছুঁড়ে দিলেন।

গোবর্দ্ধন পুলিশের এক টোকায় যেন কেন্নর মত গোল হয়ে গেলেন। হ্যাঁ স্যার, হয়েছিল বটে।

হয়েছিল বটে মানে? পুলিশের লোকের সঙ্গে চালাকি! বলুন সে লাশ কোথায়?

কাঁচুমাচু হয়ে গোবর্দ্ধন বললেন, স্যার-

স্যারট্যার ছাড়ুন। এখন কাজের কথা বলুন। ব্যাপারটা খুবই জটিল এবং সিরিয়াস্।

মানে, আমি রাতের খাওয়া খেয়ে ওই বাক্সটার ওপর ঘুমাচ্ছিলাম, তখন মাঝরাত। চারদিক অন্ধকার। কতগুলো লোক হুড়মুড় করে জানালা দিয়ে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে মেঝের সামনে চটে জড়ানো একটা কী যেন আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললে ; এই নাও তোমার কুট্টিপিসির শব।

দারোগাবাবু হাতের ব্যাটনটা ঠুকতে লাগলেন ; তারপর?

তারপর–, গোবর্দ্ধন ঢোক গিললেন। তারপর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম মেঝেতে পড়ে আছে কী একটা! আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে খাটের ওপর বসে রইলাম।

বিচ্ছুকে ডাকলেন কখন? পুলিশ সাহেব ভ্রূকুটি করলেন।

তখনই স্যার তখনই। তখনই ডেকে আপনাদের খবর দেবার জন্যে পাঠালাম কিন্তু আশ্চর্য কে বা কারা ওই মড়াটা আবার তুলে নিয়ে পালিয়ে গেছে। বলেই গোবর্দ্ধন ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন।

মড়াটা কি রসগোল্লা যে তুলে নিয়ে গেলেই হলো। পুলিশ অফিসারের গোঁফজোড়া সূঁচের মত তীক্ষ্ণ হয়ে খাড়া হয়ে রইল। মনে হলো তিনি রাগে হুলো বেড়ালের মত রোঁয়া ফুলিয়ে রয়েছেন এবং বেশ খানিকক্ষণ এভাবে থাকবার পর তিনি কপালের ওপরকার ভুরু জোড়া নাচাতে লাগলেন। দেখে মনে হলো ভুরু জোড়া যেন আর এক জোড়া গোঁফের মত নাকটাকে ব্যালান্স করে রেখেছে–কিন্তু আর হয়তো বেশীক্ষণ রাখতে পারবে না।

মড়াটা কার?

আমার কুট্টিপিসির–কুট্টিপিসি আমাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে। খুব ভাল লোক। মাথায় একটা তরমুজের বোঁটার মত টিকিই হয়তো তাঁর এই নির্মম মৃত্যুর কারণ।

মানে?–পুলিশ অফিসার এবার পকেট থেকে একটা ছোট খাতা বের করলেন। বলুন–বলুন–তাহলে এর মধ্যে রহস্য আছে। আপনি বলে যান আমি ব্যাপারটা নোট করছি।

কুট্টিপিসি লোক তো খুবই ভাল। কিন্তু ঝগড়ায় তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। তাঁর ঝগড়ার খ্যাতি এতো বেশী এবং দিন দিন তাঁর ঝগড়ার দক্ষতা এত বেড়ে যেতে লাগলো যে তিনি ইদানিংকালে ঝগড়ার ভাড়া খাটতে লাগলেন। ধরুন আপনার আমার মধ্যে ঝগড়া বাঁধলো। আপনি যদি কুট্টিপিসিকে টাকা পনেরো দিয়ে ভাড়া করে এনে শুধু লেগে যান বলে লড়িয়ে দেন–তাহলে আর দেখতে হবে না। কুট্টিপিসি নিজস্ব প্রতিভায় ঝগড়া শুরু করে দিলেন। তারপর খাওয়া-দাওয়ার সময়ে বা খুব হাঁপিয়ে গেলে খেলোয়াড়রা যেমন জল খাওয়ার বিরতি দেন তেমনি ঝগড়ার বিরতি ঘোষণা করে ঝগড়ার যাতে খেই না হারিয়ে যায় তাই ধামা চাপা দিয়ে ঝগড়াকে বন্ধ করে রেখে বেরিয়ে গেলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার ধারাবাহিক উপন্যাসের মত যেখান থেকে ঝগড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেইখান থেকে শুরু করে দিলেন। আজকাল ঝগড়ার গুরুত্ব হিসাবে কনশেসন রেটেও ঝগড়া করতেন। ঝগড়ার দক্ষতা তাঁর এতদূর পৌঁছেছিল যে বারদুই অলিম্পিকেও ডাক এসেছিল। কিন্তু কুট্টিপিসি টিকিতে গাঁদা ফুল বেঁধে বিজয়িনীর মত বলেছিলেন "না"।

কিন্তু বিপদ ঘটলো টিকি নিয়ে।

টিকি? কেন?

কেন আবার জিজ্ঞেস করছেন? বেল মাথা, তাতে এক লম্বা টিকি! একবার ট্রেনে হরিদ্বার যাচ্ছেন কুট্টিপিসি। ঠাণ্ডার মধ্যে কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন–শীতের

বাতাসে আমলকী ডালের মত টিকি দোল খাচ্ছে। এক ভদ্রমহিলা গাড়ীতে উঠে ওঁকে সমানে ঠেলতে লাগলেন ছেলেদের গাড়ীতে যাবার জন্যে। শেষে কুট্টিপিসিকে দেখে তো অবাক! এ কেমন জানানা।

কিন্তু এর সঙ্গে ওঁর মৃত্যুর যোগ কোথায়?

কোথায় কি স্যার? সর্বত্র। হয়তো কোথায় ভাড়াটে লড়িয়ে হয়ে ঝগড়া করতে গিয়ে টিকি কাটা গেছে এবং সেই বেণীর সঙ্গে মাথার মত আততায়ী কোন উঠতি ঝগড়াটের টিকি কাটতে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করবে বলে একেবারে মাথা কেটে বসে আছে।

আপনি কি চেনেন কে বা কারা এ কাজ করেছে—পুলিশ অফিসার উদাসীনভাবে জানতে চাইলেন।

এবার গোবর্দ্ধন যেন একটু সাহস সঞ্চয় করেছেন মনে হলো। একটু মুচকি হেসে তিনি বললেন ঃ আপনি তো আচ্ছা লোক মশায়? কেউ যখন খুন করে তখন কি লোকজনকে ডেকে সাক্ষী-সাবুদ রেখে—জনতার সামনে দাঁড়িয়ে সকলকে ডেকে বলে ঃ ওগো মশায়রা, আপনারা কি শুনেছেন আমি অমুক লোককে খুন করব? তারপর বেশ ধীরে সুস্থে হিন্দী সিনেমার নায়িকাকে খুন করার মত কুচ করে গলাটা কেটে দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ঝমঝমাঝম বাজনা বেজে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাটা গলার ভেতর দিয়ে তারস্বরে চীৎকার করে নায়িকা গান ধরবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নাচ। যারা এতক্ষণ খুন দেখেও না দেখার ভান করে জঙ্গলের মধ্যে কচুগাছতলায় ইঁট পেতে বসেছিল তারা গলাকাটা নায়িকার গান এবং নাচ দেখে দলে দলে কচুগাছের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নাচের দলে যোগ দেবে।

ঠাট্টা রাখুন। এতক্ষণ তো বেশ ঘ্যান-ঘ্যান করে কাঁদছিলেন। এখন তো দেখছি বেশ সাহস হয়েছে। যাকগে—আপনার কুট্টিপিসির টিকি কত ইঞ্চি লম্বা এবং তাতে কতগাছা চুল ছিল? যদি তিনি টিকিতে ফুল বাঁধতেন তবে কি ফুল তিনি বেশী পছন্দ করতেন, মালসাভোগ পছন্দ করতেন না অন্য কিছু খাওয়া ভালবাসতেন? মুখের ভেতর ক'টা দাঁত ছিল এবং ক'টা বাঁধান ছিল না। মালা জপের সময় সাধারণভাবে তিনি কী ভাবতেন এবং ঝগড়ায় ক'টি মেডেল পেয়েছিলেন এবং অলিম্পিকের ঝগড়ার ব্যাপারে ডাক পড়াতে এতবড় সম্মান প্রত্যাখ্যান করার মূলে কি মনোভাব কাজ করেছে—এই সব প্রশ্নের জবাব লিখে আমার কাছে সাতদিনের মধ্যে দিয়ে আসবেন। যদি আততায়ীর খবর পান তাকে বসতে বলে আমাকে খবর দেবেন।—পুলিশ অফিসারের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। হঠাৎ যাবার বেলায় যেন পিছু ডাকলো গোবর্দ্ধনের কাঁচ ভাঙা আলমারীতে থরে থরে সাজানো আচার। সুড়ুৎ করে মুখে জল টেনে পুলিশ অফিসার আলমারীর দিকে করুণ দৃষ্টি ফেলে বললেন ঃ তবে যাই এখন!

ছিঃ দাদা—যাই বলতে নেই। বলুন আসি!—গোবর্দ্ধন গোঁফের মত ভুরু দুটো নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন।

কিন্তু পুলিশরা চলে গেলেও বিপদ কাটলো না। লোকে বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলে আটত্রিশ ঘা। গোবর্দ্ধন দারুণ চিন্তায় পড়লেন। যিনি মারা গেছেন তাঁর ক'টা দাঁত বাঁধান ছিল—বা মালা জপের সময় তিনি কী ভাবতেন এসব কথার সদুত্তর

শুধু কুট্টিপিসির পেতাত্মাই দিতে পারে! গোবর্দ্ধনের পক্ষে দেওয়া তো সম্ভব নয় কিছুতেই। কিন্তু কথায় বলে খুনের "কেস"—এখন এসব খবর না দিতে পারলে যদি তার আটটা আচারের বয়াম লোপাট হয়—আর যদি এসব লোপাট হয়েও ফাঁড়া না কাটে এবং পুলিশের যা কারবার যদি তাকেই খুনের মামলার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে—। না—আর ভাবতে পারা গেল না, গোবর্দ্ধনের মাথা ঘুরতে লাগলো। চোখের সামনে হাজার হাজার সর্ষে ফুলে ভরা ক্ষেত ভেসে উঠলো এবং তাতে ভূত তাড়াবার জন্যে যেন অজস্র সর্ষে ধরে আছে মনে হলো।

পুলিশের কারবারই তো আলাদা। তারা কি শুনবে যে কুট্টিপিসি তাঁর নিজের পিসি নয়। তাঁকে গোবর্দ্ধন পিসি বলে ডাকতো এই মাত্র। আর তাঁর কাছে গোবর্দ্ধন খুবই কৃতজ্ঞ ছিল কারণ তিনি আচার—সদাচার—কদাচার ইত্যাদি বানাতেন এবং প্রভূত পরিমাণে গোবর্দ্ধনের সেবার জন্য সরবরাহ করতেন। তাই বলে কুট্টিপিসির সবরকম খবর রাখতে হবে এর কী মানে আছে? আরে নিজের পিসি কী ভাবছে তাই বোঝাই দায় তার ওপর কুট্টিপিসির চিন্তা। তার চিন্তার খেই রাখে কার সাধ্য? যখন তুমি ভাবছো কুট্টিপিসি তোমাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে নিশ্চয়ই তাঁর মুখখানা এই মুহূর্তে ঠিক ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াবার মত হয়েছে—ঠিক তখনই দেখবে হাতে পুঁটলি—গায়ে নামাবলী কুট্টিপিসি কালীঘাটের পথে চললেন ১৭/এ বাসে চেপে। সুতরাং কুট্টিপিসি সম্পর্কে কোন কথা ভাবা বা বলা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়—। আর জীবিতকালেই যখন সম্ভব ছিল না—মরলে তো আরো অসম্ভব হয়ে গেছে।

গোবর্দ্ধন আর ভাবতে পারলেন না। তাঁর চিন্তা করতে করতে যেন মাথায় টাক পড়বার উপক্রম হয়ে গেল।

পুলিশরা চলে গেছে সেই সকাল এগারটায়, এখনও পর্যন্ত তার চান খাওয়া তো দূরের কথা, চা পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। চা-এর কথা মনে পড়তেই গোবর্দ্ধনের নিজের ওপর দারুণ বিতৃষ্ণা জাগলো। বর্তমান সভ্য জগতে কোন লোক সকাল থেকে এগারটা পর্যন্ত চা না খেয়ে থাকে বা থাকা উচিত?

বিচ্ছু—বিচ্ছু, গোবর্দ্ধন হাঁক দিলেন।

বলুন স্যার?

বলুন স্যার। গোবর্দ্ধন ভেংচি কেটে উঠলেন। আর মস্করা করতে হবে না। যা শিগ্গীর দৌড়ে গিয়ে আমার জন্যে এক কাপ ভেলীগুড়ের চা আর খানচারেক নেড়ী বিস্কুট নিয়ে আয়। ক্ষিদেয় যেন পেটের মধ্যে পাঁচশো ইঁদুরের নাচ শুরু হয়ে গেছে। একটুও দেরী করবি না কিন্তু, আমি ততক্ষণে মুখটা একটু ধুয়ে-টুয়ে নি।

মুখ ধুতে ধুতেই চায়ের কাপ এবং নেড়ী বিস্কুট সমেত বিচ্ছু এসে হাজির। ঠ্যাং ভাঙ্গা প্যাকিং বাক্সটার ওপর খাবারটা রেখে বিচ্ছু চলে যেতেই প্রায় ছুটে এসে গোবর্দ্ধন চা আর বিস্কুট গোগ্রাসে খেলেন। তারপর লম্বা হয়ে নড়বড়ে তক্তাপোষের ওপর শুয়ে পড়লেন।

মনের মধ্যে হাজার রকমের চিন্তা। কুট্টিপিসির হত্যার মূলে কারা কারা থাকতে পারে। কে কে তার শত্রু ছিল। এ সব প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আগে দরকার।

হঠাৎ গোবর্দ্ধনের মনে হলো কুট্টিপিসির তো জমানো টাকা-পয়সা লুকোনো ছিল না। কুট্টিপিসি সারা জীবনই তো তাঁদের বাড়ীতে কাটালেন। নিজের খরচ বলতে তো কিছুই ছিল না। তার ওপর ঝগড়া করে ইদানিং বেশ দু'পয়সা রোজগারও হতো। কুট্টিপিসি ঝগড়ার ব্যাপারে দলাদলি করতে গিয়ে কালো টাকাও হয়তো কিছু নিতেন—অবশ্য এ সবই আন্দাজ। এবং তাতে কত জমা হয়ে রয়েছে কে জানে। হয়তো বারোশোই হবে এবং সেই টাকার লোভে কেউ তাকে হত্যা করেছে।

গোবর্দ্ধন উঠে বসলেন। এ কথা এতক্ষণ তাঁর মনেও হয়নি যে তাঁদের বাড়ীর কুট্টিপিসির ঘরটা একবার দেখা উচিত, হয়তো কোন খুনের নিশানা পাওয়া যেতে পারে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে গোবর্দ্ধন রাতের অন্ধকারের জন্যে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। দিনের বেলায় যাওয়া ঠিক নয় কারণ যদি ঘরে টাকা-পয়সা থাকে বা সোনার গয়না থাকে তবে তার ভাগীদার জুটতে পারে।

সুতরাং, রাতের অন্ধকারেই যাওয়া সবচেয়ে ভাল, নিরাপদ এবং সঙ্গত।

মাথা ভর্তি চিন্তা মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ নিয়ে গোবর্দ্ধন এবার যাবার জন্য তৈরী হতে লাগলেন। কালো রাত তাতে কালো মুখে একটা বিকট মুখোস পরে তিনি হাতে ঘড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত একটু গভীর না হলে বেরুনো ঠিক হবে না।

জানালার কাছে বসে তিনি দেখতে লাগলেন রাস্তা ধীরে ধীরে নিরালা হয়ে আসছে। চেনা-চেনা মুখগুলো আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে গেছে—এবার বাড়ী থেকে বেরোনো যাক্।

গোবর্দ্ধন বাড়ী থেকে বেরিয়ে টিপটিপে পায়ে সেই গলির মোড়ে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন—তাঁরই পোষা কুকুর, কালীপদ, বিষ্টু আর শ্রীকুমার তাঁকে চারদিক থেকে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করলো। ভেবেছে হয়তো চোর চোট্টা ডাকু। কোন ভাল লোক হলে এত রাতে কি নিরালা পথে বেরোয়।

গোবর্দ্ধন মিনতি করে বললেন : তোরা তো আমার আপনার—কত এঁটোকাঁটা খাইয়েছি। অমন বেইমানী করিস না, তোদের শুটকী মাছের দোহাই।

ঠিক তখনই কাণ্ডটা ঘটে গেল অর্থাৎ তদন্তের কাজে লেগে গেলেন ও. সি. নিজে। কুট্টিপিসি নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল। কর্ণের যেমন সহজাত কবচ-কুণ্ডল ছিল কুট্টিপিসির তেমনি কবচ-কুণ্ডলের মত একটি জিনিস ছিল সেটা তার টিকি। এই টিকি নিয়ে তাকে অনেক হেনস্তা সহ্য করতে হলেও তার টিকির একটা গুণ ছিল সেখান দিয়ে ইলেকট্রিক স্পার্ক দিত।

রাতে চুরি করতে এসে চারজনের মধ্যে একজন বেজায় জখম হয়ে ঠিক করল কুট্টিপিসিকে খুন করবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। কুট্টিপিসির বদলে যা খুন হলো তা তার কোল-বালিশ। এবং যেটি চওড়া চটে জড়িয়ে এনে ধপাস করে ঘরের মেঝেতে ফেলেছিলো সেদিন। কোল-বালিশের শবদেহ—কুট্টিপিসির নয়।

সমস্ত ব্যাপারটার জট ছাড়িয়ে প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ মহীন্দ্র রায় একটা সিগারেট ধরালেন : না, গোবর্দ্ধনবাবু আপনার পিসির কোন দোষ নেই তবে তার যা গুণ আছে তাও সবার থাকে না। এমন বলিহারী টিকির কথা কেউ কখনও শুনেছেন? হনুমান লেজের আগুনে লঙ্কাকাণ্ড করেছিলেন। আর কুট্টিপিসি হত্যাকাণ্ড করলেন। অবশ্য দুটোর

মধ্যে তফাৎ অত্যন্ত কম।

মহীন্দ্র রায় উঠে দাঁড়িয়ে লাঠি ঘোরাতে লাগলেন। এই জন্যে আমরা কুট্টিপিসিকে পুরস্কার দিতে চাই।

শুনে গোবর্দ্ধনের সুঁচের মত গোঁফ আনন্দে নাচতে লাগলো আর কুকুরের দল চীৎকার ভুলে গিয়ে কুট্টিপিসিকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে তেড়ে এলো।

ঘরের মধ্যে তখন কাঁথার তলায় শুয়ে শুয়ে মালা জপ করছিল কুট্টিপিসি। কুকুরের চীৎকারে বিরক্ত হয়ে হাঁক দিলেন ; বাইরে এত গণ্ডগোল কেনরে গোবরা! ব্যাপার কি?

গোবর্দ্ধন বললেন ঃ পুলিশ, পিসি। তোমার টিকির তরে পেরাইজ দিতে চায়।

পিসি বললে, মরণ!

পুলিশ ইন্সপেক্টর দারুণ খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে লাগলো।

boiRboi.net

গোয়েন্দার চোখ

শেখর বসু

অনি ছোটমামার দারুণ ভক্ত। ছোটমামা ভক্ত গোয়েন্দা-গল্পের। দেখা হলেই ছোটমামা অনিকে মারাত্মক সব গল্প শোনায়। গল্প শুনতে শুনতে অনির গায়ে কাঁটা দেয়, বুকের মধ্যে ধুপ্‌ধুপ্ করে, আবার অদ্ভুত একটা মজাও পায়। সব গল্পের শেষে খুনী ধরা পড়ে, সমস্ত রহস্যের কিনারা হয়। তবে এমনি এমনি হয় না, পুরো কৃতিত্ব গোয়েন্দার। যত বড় অপরাধীই হোক না কেন, ঝানু গোয়েন্দার কাছে সবাই কেঁচো।

সেদিন একটা রোমাঞ্চকর গল্প শোনবার পর ছোটমামা অনিকে বলল, 'আমি ঠিক করে ফেলেছি যে, বড় হয়ে গোয়েন্দাই হব।' শুনে গা শিরশির করে উঠল অনির। ছোটমামা গম্ভীরভাবে বলল, 'গোয়েন্দা হলে সবসময় ভয়ঙ্কর সব ব্যাপারের মধ্যে থাকা যায়। অপরাধী ধরে দেশের উপকার করা যায়। আর সবচাইতে বড় কথা হল, গোয়েন্দা হলে মরার ভয় থাকে না একটুও। খুনীরা গোয়েন্দাকে খুন করার কত চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে না।

কথাগুলো শুনতে শুনতে অনি অনেক কিছু ভেবে ফেলল, ছোটমামা বড় হয়ে বিরাট

গোয়েন্দা হয়েছে। ওর চারপাশে সবসময় রহস্য-রোমাঞ্চ। খুনীরা ওকে ভয় করে যমের মতো। কিন্তু প্রত্যেক বড় গোয়েন্দারই তো একজন করে সহকারী থাকে। ছোটমামার অ্যাসিস্ট্যান্ট কে হবে?

অনি একটু আদুরে গলায় বলল, 'ছোটমামা, আমাকে তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নাও।'

ছোটমামা অনির কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'গোয়েন্দার অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়া কী অত সোজা! অ্যাসিস্ট্যান্টকেও অনেকখানি গোয়েন্দা হতে হয়।' 'আমিও অনেকখানি গোয়েন্দা হব ছোটমামা।'

ছোটমামা এবারও পাত্তা দিল না অনিকে। 'গোয়েন্দা হওয়া কী চাট্টিখানি কথা। একজন ভাল গোয়েন্দা হতে গেলে অনেক গুণ থাকা দরকার। প্রথমেই দরকার প্রচণ্ড বুদ্ধির। তোর আছে?' উত্তরে অনি করুণ মুখ করে তাকায়।

একটু থেমে ছোটমামা আবার বলতে শুরু করল, 'শুধু বুদ্ধি থাকলেই হবে না, অসম্ভব গায়ের জোর থাকা দরকার। যুযুৎসু আর বক্সিংয়ে চ্যাম্পিয়ান হতে হবে। পিস্তলে হাত এমন পাকা করতে হবে যাতে একটা গুলিও ফসকে না যায়। ফোরেনসিক পরীক্ষার সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে হবে। জানতে হবে কাকে বলে মাইক্রোফিল্ম্, কাকে বলে আলট্রা ভায়োলেট রে, কাকে বলে অটোপসি, ডিকম্পোজড বডি সনাক্ত করার কৌশল শিখতে হবে—সে-সব অনেক কঠিন ব্যাপার। পারবি?

অনির মুখ এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল। তাই দেখে ছোটমামার দয়া হল একটু। বলল, 'ঠিক আছে চেষ্টা করে দেখ্‌। তবে, খাটতে হবে খুব। স্কুলে যেমন শেখায় ঠিক সেইভাবে তোকে আমি শেখাব। মন দিয়ে শিখবি তো?'

অনির মুখ এবার হাসি-হাসি হয়ে উঠেছে। ও মাথাটা একপাশে অনেকখানি কাত করে বলল, 'হ্যাঁ।'

ছোটমামা মুখটা ঠিক বড়দের মতো করে বলল, 'আজকেই তোকে ফার্স্ট লেস্‌ন দিচ্ছি। তোর প্রথম কাজই হবে, পাওয়ার অব অবজারভেশন বাড়ানো।' 'সেটা আবার কী?' 'অবজারভেশন হল পর্যবেক্ষণ।' 'পর্যবেক্ষণের বাংলা কী?'

'দূর বোকা, পর্যবেক্ষণ তো বাংলা শব্দই। আসলে তোকে দেখার চোখ তৈরি করতে হবে। কবিতায় আছে না—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন। আমার মনে হয় কথাটা আসলে গোয়েন্দাদের উদ্দেশ্যে বলা। অনেক সময় একটুখানি ছাই, এককুচি ধুলো থেকে আস্ত একটা রহস্যের কিনারা হয়ে যায়। তুই এবার থেকে ছোটখাট সবকিছু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করবি। ফাইণ্ডিং, মানে ওই সব থেকে যা পাবি, আমাকে রিপোর্ট করবি। ব্যস, আজকের পড়া এই পর্যন্তই।

ছোটমামা চলে যাওয়ার পর থেকেই অনি চোখ বড় বড় করে চারদিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু নতুন কিছু চোখে পড়ল না ওর। পড়ল পরদিন সকালেই। ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল, বারান্দার এককোণে লালচে রঙের খুব সরু একটা ফিতে পড়ে আছে। ফিতে থেকে চোখ সরে যাওয়ার মুখেই ছোটমামার উপদেশ মনে পড়ে গেল অনির। দেখার চোখ তৈরি করতে হবে, ছোটখাট সবকিছু দেখতে হবে খুঁটিয়ে-

খুঁটিয়ে, তারপর......অনি সরু ফিতেটা হাতে তুলে নিল। কোত্থেকে এল এটা?

একটু মাথা খাটাতেই ধরতে পারল, মিষ্টির প্যাকেটে এই ধরনের ফিতে বাঁধা থাকে। কিন্তু মিষ্টির প্যাকেট বাঁধার ফিতে বারান্দায় এল কীভাবে! ফিতে থাকলে মিষ্টির প্যাকেটও থাকবে। তবে, আজ সাত-দশদিনের মধ্যে মিষ্টির প্যাকেট তো এ বাড়িতে ঢোকেনি। তাহলে কী এই ফিতেটা আরও আগে আনা কোনো মিষ্টির প্যাকেটের গায়ে জড়ানো ছিল? হতে পারে।

ফিতেটা হয়তো অনেকদিন পড়ে ছিল খাটের তলায়, আজ সকালে ঘর ঝাঁট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়। কিন্তু, খাটের তলায় পড়ে থাকলে ফিতের গায়ে ধুলো কিংবা সামান্য ঝুল কালি জমে যেত না? তা তো হয়নি। দিব্যি চকচকে ফিতে। এ ফিতে নির্ঘাত আজ-কালের মধ্যে এ-বাড়িতে এসেছে। এমনি-এমনি অবশ্য আসেনি, এসেছে মিষ্টির প্যাকেটের গা জড়িয়ে।

অনি চমকে উঠল, একেই কী বলে, 'ফাইণ্ডিং'। সামান্য এক টুকরো ফিতে থেকে এক এক করে কত কিছু জানা যাচ্ছে। আরও ভালভাবে দেখলে হয়ত আরও জানা যাবে। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস থাকলে বেশ হত। গোয়েন্দারা এই ধরনের ছোটখাট সূত্র ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েই তো পরীক্ষা করে থাকে।

অনিদের বাড়িতে আতস কাচ নেই, কিন্তু আতস কাচের সমস্যা মেটাল বাবার বই-পড়ার চশমা। এই চশমায় ছোট জিনিস বড় দেখায়। অনি বাবার চশমাটা পকেটে নিয়ে চলে গেল কোণের ঘরে। চশমার কাচ ফিতের ওপর ধরতেই সরু ফিতে বেশ চওড়া হয়ে গেল। কিন্তু খালি চোখে ও যা দেখেছিল, তার বাইরে আর কিছু দেখতে পেল না। ফিতের ওপর দূরে দূরে কয়েকটা ইংরেজি হরফ ছাপানো।

বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা চালাবার পরে অনি হতাশ হয়ে চশমাটা নামিয়ে রাখার মুখে দেখল, একটা হরফ কেমন যেন জড়িয়ে গেছে। সমান করতে গিয়ে দেখল, ফিতের ওই জায়গাটা কড়কড়ে। কড়কড়ে কেন?

নিশ্চয়ই এটা মিষ্টির রস। তার মানে এই ফিতেটা যে প্যাকেটে বাঁধা ছিল সেই প্যাকেটে রসের মিষ্টি এসেছে। অনি আবিষ্কারের উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। এবার মিষ্টির প্যাকেটটা খুঁজে বার করতে হবে। ও কাল রাতে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাবা বাড়ি ফিরেছেন তার পরে। বাবা নিশ্চয়ই সঙ্গে করে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে এসেছেন।

নিশ্চিন্তে অনুসন্ধান চালানো বেশ কঠিন। মা, ছোট বোন তিতলি আর কাজের লোক এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না। ফাঁক বুঝে অনি প্রথমেই ফ্রিজ খুলল। ফ্রিজে আর সব আছে, শুধু মিষ্টির প্যাকেট নেই।

তাহলে?

কিছুক্ষণ পরে ও প্রত্যেকের চোখে ধুলো দিয়ে রান্নাঘরের আলমারিটা খুলল। মা এই আলমারিতে মিষ্টিটিষ্টি রাখেন অনেক সময়, কিন্তু এখানেও মিষ্টির প্যাকেট নেই। নেই রান্নাঘরের তাকেও। মাঝেমধ্যে মিষ্টির প্যাকেট সোজাসুজি ঠাকুরঘরে চলে যায়, কিন্তু ঠাকুরঘরে কয়েকটা বাতাসা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না অনির।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ ধরে অনুসন্ধান চালাল ও। কিন্তু চারটে ঘরের কোথাও মিষ্টির

প্যাকেটের হদিস মিলল না। মন খারাপ হয়ে গেল অনির। তাহলে কী ওর পর্যবেক্ষণে, কোনও ভুল ছিল?

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, বাবা-মা রাত্তিরেই সব মিষ্টি খেয়ে ফেলেছেন! অবশ্য ওদের না দিয়ে ওঁরা কিছু খান না। কিন্তু ঠাকুমা প্রায়ই বলেন না, 'মানুষের মন বলে কথা!' বাবা-মায়ের সেইরকম 'মানুষের মন' যদি হয়ে থাকে কাল রাত্তিরে। অনি একছুটে বাথরুমের পাশের টিনের ড্রামটা দেখে এল। ড্রামে আবর্জনা ফেলা হয়, কিন্তু আবর্জনার মধ্যে কোনও মিষ্টির প্যাকেট চোখে পড়ল না, ওর। এবার!

শোবার ঘরের একটা চেয়ারের ওপর বসে পুরো ব্যাপারটা আবার গোড়া থেকে ভাবতে শুরু করল অনি। নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। নাকি মূল সূত্রেই গোলমাল! এমনও তো হতে পারে, অন্য কোন বাড়ি থেকে কাকের মুখে ফিতেটা এসেছে এ-বাড়ির বারান্দায়।

আরও কী যেন ভাবতে যাচ্ছিল অনি, এমন সময়ে ওর চোখে পড়ল, একটা পিঁপড়ের সারি মেঝে থেকে দেয়াল বেয়ে স্টিলের আলমারির মাথায় উঠে যাচ্ছে। খুবই সাধারণ দৃশ্য, কিন্তু ছোটমামার উপদেশ ওর মনে পড়ে গেল আবার। যতই তুচ্ছ জিনিস হোক না কেন, কোনো কিছুতেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে নেই।

সত্যিই তো, পিঁপড়েগুলো আলমারির মাথায় উঠছে কেন? ওখানে কী কোনও খাবারদাবার আছে! কী খাবার? পিঁপড়েরা মিষ্টি খেতে ভালবাসে। ওর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। মিষ্টির প্যাকেট কী আলমারির মাথায়!

অনি চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেল আলমারির কাছে। কিন্তু নিচু চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে সাড়ে ছ'ফুট আলমারির মাথায় হাত পৌঁছল না ওর। চেয়ারের ওপর একটা ছোট্ট জলচৌকি এনে বসাল অনি। কিন্তু তাতেও কাজ হল না। তখন জলচৌকির ওপরে একটা গুঁড়ো দুধের টিন বসাল। টিনের ওপর খুব সাবধানে পা রেখে দাঁড়াল ও। এই তো, ওই তো মিষ্টির প্যাকেট। রহস্য সমাধানের উত্তেজনায় প্যাকেটটা খামচে ধরল অনি। সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে গেল ওর।

চেয়ার, জলচৌকি, দুধের টিন আর অনি একসঙ্গে বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর। হাতে ধরা মিষ্টির প্যাকেট থেকে সবকটা চমচম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মেঝে থেকে ওঠার আগেই ওই ঘরে ছুটে এল অনির মা, বাবা, তিতলি আর কাজের লোক।

তারপরের ঘটনা খুব করুণ।

অনির কানদুটো খুব শক্ত বলে কিছুতেই মায়ের হাতে উঠে এল না। সময়মতো কায়দা করে সরে গিয়েছিল বলে ওর পিঠটা ভাঙল না, তবে পিঠের ওপর মায়ের পাঁচ আঙুলের ছাপ পড়ে গেল স্পষ্ট।

মা চেঁচাতে চেঁচাতে বলতে লাগলেন, 'হতচ্ছাড়া ছেলে, তোর জন্যে একটা জিনিসও তুলে রাখা যাবে না। সবকিছু না চাইতেই পাস, তাও চুরি করা চাই। হ্যাংলা কোথাকার!'

কানের জ্বলুনি আর পিঠের ব্যথায় অনির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল টপটপ করে, কিন্তু 'হ্যাংলা' শব্দটা কানে যেতেই ওর আত্মসম্মানে লাগল। অনি কান্নাজড়ানো গলায় বলল 'আমি চুরি করিনি, অবজারভেশন করছিলাম।'

'কী ভেশন?'

অনি মায়ের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। ওর হঠাৎ মনে হল, ও 'নীল ড্রাগন'দের খপ্পরে পড়ে গেছে।

ঘরের মধ্যে মা, বাবা আর তিতলির বদলে দাঁড়িয়ে আছে নীল মুখোশ-পরা দস্যুরা।

বিকেলে ছোটমামা দুই বগলে দুটো ডিটেকটিভ বই নিয়ে এসে অনিকে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে তোর অবজারভেশন কদ্দুর বাড়ল? রিপোর্ট দে।'

অনি থমথমে মুখ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে বলল, 'যে গোয়েন্দা নিজের অ্যাসিস্ট্যান্টকে বাঁচাতে পারে না, আমি তার অ্যাসিস্ট্যান্টগিরি করতে চাই না, বলেই ও ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ছোটমামা এ বয়েসেই কয়েকশো গোয়েন্দা-গল্প পড়ে ফেলেছে। যে-কারও একটা-দুটো কথা শুনে আর চলাফেরা দেখেই ধরে ফেলতে পারে, রহস্যটা কোথায়। কিন্তু অনির এই উদ্ভট ব্যবহারের রহস্য ছোটমামার কাছে রহস্যই থেকে গেল।

pathagar.net

খুনী কে

দুলেন্দ্র ভৌমিক

সকালবেলায় আনন্দবাজার পত্রিকাটা হাতে নিয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকল তপসে। ফেলুদা তখন দাড়ি কামানো শেষ করে গালে আফটার শেভ লোশন লাগাচ্ছে। তপসে কাগজের প্রথম পাতাটা ফেলুদার চোখের সামনে এগিয়ে দিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, 'দেখেছো কী সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটেছে! এরকমভাবে খুন ভাবা যায়?'

ফেলুদার মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। তোয়ালে দিয়ে গাল মুছতে মুছতে শুধু একবার তপসের দিকে তাকাল, তারপর বাঁ হাত বাড়িয়ে চারমিনারের প্যাকেটটা টেনে নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে যথারীতি আরাম কেদারায় শুয়ে পড়ল। ফেলুদার এই এক দোষ। কোন কথাটা শুনছে অথবা কতটুকু শুনছে, শুনলেও তার কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা সেটা একদম বোঝা যায় না। তপসে ভেতরে ভেতরে রেগে যাচ্ছিল। ফেলুদা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটা পুরনো বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। বইটার নাম, 'কলিকাতার পথ-ঘাট'। শহরে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, এখন কি এই বই পড়বার সময়? ক্ষুব্ধ গলায় তপসে বলল, 'খবরটা কি তোমার চোখে পড়েছে?'

বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে ফেলুদা আবেগহীন গলায় বলল, 'তুই নিশ্চয়ই স্টোনম্যানকে নিয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আছিস।' তপসে মোড়ার ওপর বসতে বসতে বলল, 'হব না? এ পর্যন্ত ক'টা খুন হল জানো?'

ঠাণ্ডা গলায় ফেলুদা বলল, 'ছ'টা। সব ক'টাই ফুটপাতবাসী এবং প্রত্যেকটা খুন ঘটেছে শেষ রাতে আর তারাই স্টোনম্যানের শিকার হয়েছে যারা দলবদ্ধভাবে না শুয়ে একা-একা একটু তফাতে শুয়েছে।'

'খুনের মোটিভটা কী হতে পারে?' তপসে প্রশ্ন করল। ফেলুদা জবাব দেওয়ার আগেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন লালমোহনবাবু, অর্থাৎ জটায়ু। তিনি যেন বিরাট কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তেমন ভঙ্গিতে আর উত্তেজনায় দু'হাত মাথার ওপর তুলে বলতে লাগলেন, 'পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি।'

তপসে জিজ্ঞেস করল, 'কী পেয়ে গেছেন?'

লালমোহনবাবু টাকের ওপর হাত বুলিয়ে বললেন, 'সেই জুন মাস থেকে ভেবে-ভেবে আজ সকালে নামটা পেয়ে গেলাম। 'রক্তাক্ত ফুটপাত' কী, কেমন থ্রিল আছে না নামটায়?'

তপসে বলল, 'এটা কোন বইয়ের নাম?'

লালমোহনবাবু বললেন, 'হুঁ-হুঁ, পুজো সংখ্যার নতুন উপন্যাস, স্টোনম্যানকে নিয়ে।' ফেলুদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'মানুষের ঘুমের ক'টা স্তর আছে জানেন?' লালমোহনবাবুকেই প্রশ্নটা করা হয়েছে। তিনি একবার তপসের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টে বললেন, 'ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কে আর গোনাগুনি করে মশাই?'

ফেলুদা বলল, 'গোনাগুনি না করলেও জানতে হয়। প্রথম স্তরে ঘুমটা পাতলা হয়, দ্বিতীয় স্তরে আরও একটু গভীর আর তৃতীয় স্তরে খুবই গভীর। আর সেটা ঘটে রাত্রি দুটো থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে। চুরি-টুরি সব ওই সময়েই হয়ে থাকে। ওটাকে চোরা রাত্রি বলে।'

ফেলুদার এসব কথার অর্থ প্রথম দিকে ধরা যায় না। একটু পরে বইয়ের ভিতর থেকে একটা কাগজ বার করে তপসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর।'

তপসে অবাক! কাগজে ফেলুদা একটা স্কেচ করেছে। একটা লোক হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে বিশাল একটা পাথর তুলে আছে। লোকটার মুখ অস্পষ্ট এবং হিজিবিজি করা। হিজিবিজির ডিজাইনটা একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো। তার মানে খুনি কে সেটা ফেলুদা এখনও ঠিক করতে পারেনি।

ফেলুদা সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে গিয়ে বলল, 'তুই মোটিভের কথা বলছিলি না? মোটিভটা জানা গেলে খুনীকে ধরা অনেক সহজ হয়ে যায়। শেষ রাতের ঘাতক যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে, সেটা ওই মোটিভ নিয়ে। খুনী শুধুই কেন খুন করবে? কেনই বা সে কেবলমাত্র বেছে নেবে ফুটপাত বাসিন্দাদের। যে খুন করে বা করছে তার পেছনে যে বা যারা রয়েছে তাদের কি অন্য কোনও মোটিভ রয়েছে? অচেনা খুনীর পেছনে

আরও অচেনা লোকগুলো কারা হতে পারে।'

কথার মধ্যে কথা বলে ওঠা লালমোহনবাবুর স্বভাব। তিনি স্কেচ করা কাগজটা তপসের হাত থেকে ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'এটাই আমার উপন্যাসের প্রচ্ছদ হয়ে যাবে। তবে মুখটা একটু ক্লিয়ার করলে হয় না?'

ফেলুদা বলল, 'ওখানে কার মুখ দেব? আপনার?'

রাত্রে খেতে বসে ফেলুদা বলল, 'কলকাতায় ক'টা রাস্তা ক'টা ফুটপাত আর কোন এলাকায় কত লোক ফুটপাত দখল করে ঘুমোয় সেই হিসেবটা দরকার। এমনও তো হতে পারে কেউ হয়তো ফুটপাতটাই দখল করে নিতে চাইছে, স্টোনম্যান হয়তো তার হয়ে কাজ করে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে।'

খাওয়ার পর ফেলুদা বাইরে বেরুবার পোশাক পরতে পরতে বলল, 'যাবি নাকি?' তপসে জানতে চাইল, 'কোথায়?' ফেলুদা হালকা গলায় উত্তর দিল, 'রাতের ফুটপাত দেখতে। খুনীকে ধরা সহজ হবে না। তবে—'

ফেলুদা থেমে গিয়ে জামার বোতাম আটকাতে আটকাতে বলল, 'তবে জায়গাগুলো দেখতে দোষ কি? দু'চারটে আসল অথবা নকল পাগলকেও তো পেয়ে যেতে পারি, কি বলিস? কিংবা ধর এমন একটা গাড়ি যাতে করে নিঃশব্দে আসা-যাওয়া চলে অথচ গাড়িটাকে দেখে কারও সন্দেহ হবার কথা নয়। যেন পাতাল রেলের কাজ করছে।'

মধ্য দুপুরে হঠাৎ কলিং বেলের শব্দ। কিরীটি রায় ভ্রূ জোড়া কুঁচকে দরজার দিকে তাকালেন। চাকর দরজা খুলে দিতেই ঘর্মাক্ত কলেবরে এক প্রৌঢ় এসে হাজির হলেন কিরীটির সামনে। হাত জোড় করে বললেন, 'কিরীটিবাবু, দোহাই আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।'

কিরীটি চোখ তুলে আগন্তুককে দেখলেন। খুবই সাধারণ চেহারার এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলেন, 'কীসের ব্যবস্থা?'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, 'শহরে স্টোনম্যান ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ তাকে ধরতে পারছে না। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।'

কিরীটি হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'নীহারবাবু মারা যাবার পর আমি গোয়িন্দাগিরির কাজ ছেড়ে দিয়েছি, এখন ধর্মগ্রন্থ পড়ে সময় কাটাই। আমাকে এসব ব্যাপারে অনুরোধ করবেন না।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক তো নাছোড়বান্দা। কিরীটি বললেন, 'শহরে এখন অনেক ভাল ভাল গোয়েন্দা আছে। আপনি প্রদোষবাবু অথবা কাকাবাবুর কাছে যান। ওঁরা তো খুব ভাল কাজ করছেন এখন।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে আপনি ভেবেছেন?'

কিরীটি একটু চুপ করে থেকে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'ভাবতে চাইনি, তবে দীর্ঘদিনের অভ্যাস আমাকে কিছুটা ভাবিয়েছে। যে লোকটা এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে সে কলকাতার লোক। কলকাতার পথঘাট তার চেনা। ফুটপাতে যারা শোয় সেই সব দরিদ্র মানুষগুলোর ওপর কোন খুনীর কোন রকম রাগ থাকার কথা নয়। আর প্রত্যেকটা খুনই হচ্ছে একই ভাবে, অর্থাৎ পাথরের সাহায্যে। ঘাতক এক্ষেত্রে রিভলবার

বা ধারালো কোনও অস্ত্র ব্যবহার করছে না। কেন করছে না? কারণ, খুব কাছাকাছি থেকে একটা ভারী পাথর মুখে বা মুখের একপাশে সজোরে মারলে মৃত ব্যক্তির আর্তনাদ করে ওঠার অবকাশ কম। যেটা, গুলি বা অন্য অস্ত্রে হতে পারে। ঘাতক হত্যার জন্য এমন একটা হাতিয়ার ব্যবহার করছে যেটা খুন করার কমন হাতিয়ার হিসাবে পরিচিত নয়। তার মানে এটা কিন্তু কোন উন্মাদের কাণ্ড নয়—একেবারে পরিকল্পনা মাফিক কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, 'কেন ওদের খুন করা হচ্ছে? কী পাবে ওদের কাছ থেকে?' কিরীটি রায় বললেন, 'সেটাই তো প্রশ্ন। হয়তো যে সব পাওয়ার কথা আমরা ভাবছি, এই খুনি বা তার লোকেরা তার চাইতেও বড় কিছু পেতে চায়, যে পাওয়ার সঙ্গে এই খুনের আপাত কোনও সাযুজ্য নেই, অথচ খুব গভীরে অতীব নিকট সম্পর্ক আছে। যেমন ধরুন ফাত্‌না দিয়ে মাছ ধরা যায় না, মাছ গাঁথে বড়শিতে। শিকারীর চোখ কিন্তু ফাত্‌নার দিকে থাকে—বড়শির দিকে নয়।'

কথা শেষ করে কিরীটি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

বদগাঁও জায়গাটা ভারি চমৎকার। চক্রধরপুর থেকে রাঁচি যাবার জন্য পাহাড়ের গা দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিলিটারিদের যাতায়াতের জন্য নাকি এই রাস্তাটা করা হয়েছিল। এখন অবশ্য সবাই ব্যবহার করে। কাকাবাবুর এই জায়গাটা খুব পছন্দ, বিশেষ করে বদগাঁও বাংলোটা। নিরিবিলিতে বিশ্রামের জন্য কাকাবাবু মাঝে মধ্যেই এখানে চলে আসেন।

কাকাবাবু এক কাপ কফি খেয়ে টেবিলে ডায়েরি লিখতে বসেছেন। একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। পাকা রাস্তা থেকে এই বাংলোতে লাল সুরকি দেওয়া যে রাস্তাটা উঠে এসেছে সেটা একটু খাড়াই ধরনের। এখানে গাড়ি বিশেষ আসে না। গাড়িটা এসে বাংলোর সামনে দাঁড়াল এবং তার হেডলাইটের আলোটা এসে কাঁচের দরজাটাকে অতিরিক্ত উজ্জ্বল করে তুলল। কাকাবাবু লেখা থামিয়ে বিরক্ত মুখে বললেন, 'এখানে আবার কে এল?'

সন্তু এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দিতেই দেখতে পেল বারান্দার সামনে একটা জংগা জিপ দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে দু'জন ভদ্রলোক নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী আছেন?'

ভিতরে আসার পর কাকাবাবু ওঁদের দেখে বললেন, 'আপনারা! এখানে কী মনে করে?'

মনে হল ভদ্রলোক দু'জন কাকাবাবুর চেনা। ওঁদের মধ্যে যিনি একটু বয়স্ক এবং যিনি সাফারি পরে আছেন তিনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'আপনাকে এখানে এসে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত মিঃ রায়চৌধুরী। কিন্তু কী করব বলুন, সি. এম. নিজে আমাদের পাঠালেন এখানে। আমরা ওনারই অনুরোধ নিয়ে এসেছি।'

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একবার হাঁক দিয়ে দেখ তো সাংকিকে পাওয়া যায় কি না। পেলে কফি করতে বল।'

তারপর ভদ্রলোক দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলুন, সি. এম.-এর অনুরোধটা

pathagar.net

কী?'

সাফারি পরা ভদ্রলোক বললেন, 'স্টোনম্যানকে নিয়ে আমরা খুবই দুশ্চিন্তায় আছি। কলকাতা শহরের বুকে ছ'টা খুন হয়ে গেল অথচ এখনও আমরা কিছুই করতে পারিনি। এ ব্যাপারে সি. এম. তো বোম্বাই পুলিশের সাহায্য চেয়েছেন শুনেছি।'

'তা চেয়েছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজ তো কিছুই এগোয়নি।'

কফি এসে গেল। ভদ্রলোক দু'জন অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলেন। বললেন, 'আমরা কর্নেল সাহেবের কাছেও গিয়েছিলাম। উনি অবশ্য মনে করেন এটা একজনের কাজ নয়। এর পেছনে একটা দল আছে। আমরা ব্যোমকেশ বক্সির সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি। উনি পণ্ডিচেরীতে আছেন। ওঁর ধারণা এর সঙ্গে এমন একটা গোষ্ঠীর যোগ রয়েছে যাঁরা মূলত কলকাতার আদি বাসিন্দা নয়। কিন্তু খুনগুলো করানো হচ্ছে কলকাতার লোক দিয়ে।'

লোক দু'জন চলে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, 'সন্তু, তৈরি হয়ে নে। আজই কলকাতা যাব।'

সন্তু অবাক হয়ে বলল, 'আজই!'

কাকাবাবু জবাব দিলেন, 'আজই, এবং এখনই।'

সন্তু বলল, 'কিন্তু এখন যাবো কেমন করে, গাড়ি কোথায়? তার চেয়ে ওদের জিপেই তো যাওয়া যেত।'

কাকাবাবু বললেন, 'সামনে একটা পুলিশ চৌকি আছে। ওখানে থেকে আমি সিংহানিয়াকে ফোন করলে মুড়ি থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। হয়তো ভোররাত্রে কলকাতায় পৌঁছে যাব।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি স্টোনম্যানকে নিয়ে ভাবছ?'

কাকাবাবু বলেন, 'মাঝে মাঝে এরকম অস্বাভাবিক খুনীদের উৎপাত বাড়ে। ৬৩-র গোড়ার দিকে নিউজার্সিতে এরকম একজন খুনীকে ধরা হয়েছিল। সে শুধু স্কুলবয়দের গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করতো। কয়েকটা খুনের পর অবশ্য লোকটা সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিল।'

সন্তু বলল, 'কলকাতার স্টোনম্যান কি পাগল?'

কাকাবাবু বললেন, 'একদম নয়। পাগল এত ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে! খুনের জায়গাগুলোকে ক্রমশ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তদন্তের বা পাহারার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য। খুনী খুন করার পর হয়তো কাছাকাছি কোন জায়গায় আত্মগোপন করে নয়তো গাড়ি করে পালায়। মনে হচ্ছে প্রথমটাই ঠিক। কোন এক ব্যক্তি খুন করছে বলে মনে হয় না, কাজটা করছে অন্তত তিনজন বা চারজনের একটা গ্রুপ।'

সন্তু প্রশ্ন করল, 'কিন্তু কেন করছে?'

কাকাবাবু ক্রাচটা বগলে নিয়ে দাঁড়ালেন। সন্তুর দিকে না তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'সেটাই তো আসল রহস্য। কলকাতা শহরে কার যে কোথায় কীভাবে স্বার্থ জড়িত সেটা চট করে বোঝা যায় না। ভিখারি উৎখাত করার জন্য এ কাজ কেউ করবে না! ফুটপাত বাসিন্দারা কি এবার পুনর্বাসন দাবি করবে? নাকি মোটিভ হচ্ছে ফুটপাত।

pathagar.net

কলকাতার মুশকিল হচ্ছে এখানে সব ব্যাপারটাই বড্ড রাজনীতি ঘেঁষা। কেউ কি আইন-শৃঙ্খলা তছনছ করে পুলিশকে বোকা বানিয়ে সরকারকে অপদস্থ করতে চাইছে। কিন্তু তার জন্য ওই গরিব লোকগুলো কেন শিকার হবে? এমনও হতে পারে প্রথম খুনটা ছিল কোন ঝগড়ার আকস্মিক পরিণতি। যেহেতু খুনি ধরা পড়ল না এবং খুনটা অদ্ভুত বলে রটনা হতে লাগল তাই সেই আইডিয়াটা নিল অন্য কেউ—যারা পর পর পাঁচটা খুন করল। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কিন্তু পুরুষ মরেছে, মহিলা না। কিন্তু ওদের বোন, মেয়ে বা বৌরা কোথায়? কেউ কি ওদের বিক্রি করার ফন্দি আঁটছে—অসহায় পেয়ে সহজেই কব্জা করে বাইরে চালান দেবে?' কাকাবাবুকে এবার সত্যিই চিন্তিত দেখাল।

মাকড়সা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বিরূপাক্ষ বলছিল, জানিস শিশির, মাকড়সা দেখেছিস তো ঠিক তেমনি। মাকড়সার মতো তেমনি কুৎসিত, তেমনি রোমশ আর তেমনি নিঃশব্দে তার আসা যাওয়া, জীবনে অনেক ক্রিমিন্যালের মুখোমুখি হয়েছি কিন্তু অমন একটি ক্রিমিন্যালের মুখোমুখি হইনি। কবেকার কথা বলছিস, আমিই শুধালাম। বাইরে ঝর ঝর করে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ছে, শ্রাবণের আকাশ ঢেকে যেন নেমেছে অবিশ্রান্ত ধারা, মাঝে মাঝে আকাশটা কালো হয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে গুরু গুরু মেঘের ডাক—একটা হিংস্র জন্তু যেন খাচার মধ্যে বন্দী হয়ে থেকে থেকে গর্জে চলেছে। বিরূপাক্ষ তার হাতের চারমিনারে একটা সুখটান দিয়ে আবার বললে, তোকে বলা হয়নি, আমার সে অভিজ্ঞতার কথা। লোকটার নাম নিশিকান্ত হোড়—জাতে কৈবর্ত, আবার বড় ঘরের কৈবর্ত, ছোট রোগা গা ভর্তি লোম। মুখটা অনেকটা মঙ্গোলিয়ান টাইপের। ছোট ছোট কোটরে বসা চোখ, চোখই নয় যেন দুখণ্ড হীরের মতো সর্বদা জ্বলছে। দাঁড়া আবার একটা সিগারেট ধরাই বলতে বলতে একটু থেমে নতুন একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে লাইটারের সাহায্যে, খানিকটা কূটগন্ধী

ধোঁয়া ছেড়ে বললে, বছর পাঁচেক আগেকার কথা—পূর্ণ লাহিড়ী তখন ডি. সি. ডি. ডি.। পূর্ণ লাহিড়ীকে তো জানিস ক্রিমিন্যালদের ছিল সে সাক্ষাৎ যম। থামিস না বল—

পূর্ণ লাহিড়ীই একদিন আমায় কথা প্রসঙ্গে সর্ব প্রথম নিশিকান্তর কথা বলেন—লোকটা একটা দুর্ধর্ষ স্মাগলার। তার গতিবিধি ছিল খিদিরপুর ডক এরিয়াতে, ঐ অঞ্চলেই থাকত। নিশিকান্ত স্মাগলার—

শুধু স্মাগলার বললেই ওর সব পরিচয় নয়—লোকটা ছিল একটা ম্যানিয়াক, মানুষ খুন করতে ওর আর দ্বিতীয় ছিল না। লোকটা যে কখনো ধরা পড়েনি তা নয়, পড়েছে ধরা কিন্তু পুলিশের আইন তাকে ছুঁতে পারে নি, পাঁকাল মাছের মতো পিছলে গেছে। পূর্ণ লাহিড়ী বললেন, মিঃ সেন পারবেন লোকটাকে ধরতে। বললাম, চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তবে করুন চেষ্টা। I want that criminal dead or alive. জীবিত বা মৃত, I want him.

পূর্ণ লাহিড়ীর সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর, বিরূপাক্ষ বলতে লাগল, আমি খিদিরপুর অঞ্চলে যাতায়াত শুরু করলাম। নিশিকান্তর চেহারার বর্ণনা যেমনটি পুলিশের খাতায় ছিল তেমনি একটা মানুষকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু তখনো জানতাম না নিশিকান্তর বড় রকমের একটা দাঁও মারার পর কিছুকাল তার সরীসৃপের মতো hibernation period চলতো। সেটা ছিল সেই সময়—ঠিক এমনি সময় মানে দিন পনের বাদে হঠাৎ একদিন নিশিকান্তকে Fancy market এরিয়াতে দেখতে পেলাম। জানিস তো চোরাই মালের সরকারকে ফাঁকি দেওয়া হাজার রকমের চোরাই বিদেশী জিনিসের বেচাকেনা ওখানে চলে, তেমনি একটা দোকানের সামনে। দোকানের মালিক হায়দারকে আমি চিনতাম। নিশিকান্ত চলে যাবার পর হায়দারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হায়দার—সেলাম সাব, কিছু চাই। হ্যাঁ—আচ্ছা হায়দার, ঐ যে লোকটা এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলছিল—কে—নিশিকান্ত। হ্যাঁ—হায়দার আমার কাজকারবার জানত। জানত আমি একজন সত্য-সন্ধানী।

হায়দার বলল, ওদিকে হাত বাড়াবেন না সাব। কেন? বহুৎ খতরনাক আদমী ঐ নিশিকান্ত।

তাই বুঝি? জী! ওর দু'হাতে চোরা হাতিয়ার চলে সমান। ও একটা সাক্ষাৎ ইবলিসের বাচ্ছা, শয়তানের চর। আমি মৃদু হাসলাম।

হাসনা মাৎ বাবুজী উসকা পিছু মাত যা না—আমি আর কথা বাড়ালাম না, চলে এলাম।

দিন পাঁচেক বাদে বসার ঘরে বসে একটা ক্রাইম নভেল পড়ছি টেলিফোনটা বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং........

হ্যালো—নমস্তে সেন সাব ম্যায় নিশিকান্ত। কে। নিশিকান্ত হোড়—আপকো ত জরুর মালুম হোগা মেরা নাম। কোই আব জানে নেহি—চমৎকার হিন্দিতে কথা বলতে লাগল নিশিকান্ত।

আর ভাবছিলাম বাঙালী হলেও ওর জন্ম বিহারে—ভাগলপুর জিলায়—সেখানেই বড়

হয়েছে, মানুষ হয়েছে এবং সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার লোকটা লেখাপড়া করেছে। একজন সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, বি.এস.সি. পাস করবার পর অনেক চাকরির সন্ধান করেছিল কিন্তু একটা চাকরি যোগাতে পারেনি। তিন বৎসর বেকার থাকবার পর ঐ লাইনে এসেছিল। সংসারে এক অন্ধ মা ছাড়া কেউ আপনার জন ছিল না।

বিরূপাক্ষ বলতে লাগল, লোকটা চেহারার মতো গলাটা কিন্তু ছিল না। সামান্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলার স্বর কিন্তু একটু তোতলা।

সেন সাব—আমি চুপ করে থাকি। আবার গলার স্বর ভেসে এলো, নিশিকান্তকে আপ সায়েত নেহি জানতে। উসি লিয়ে এক বাত ইয়াদ রাখনা, আপ হামারা রাস্তা মে আনেকো কৌসিস মাত করিয়ে, জান চলা জায়গা। আচ্ছা নমস্তে।

লোকটার স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্যে আমি যেন বোবা হয়ে যাই সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চ্যালেঞ্জ জানাই।

ঐ টেলিফোন পাওয়ার ঠিক পনের দিন পরে খিদিরপুর অঞ্চলে বিরাট স্মাগলিং হয়ে গেল—সাতটা জাপানী কালার T. V. জানা গেল নিশিকান্ত বিক্রী করেছে। কিন্তু পূর্ণ লাহিড়ীর সহযোগিতা পেয়েও নিশিকান্তকে ধরতে পারলাম না। তার ছায়াও দেখতে পেলাম না।

আরো দিন সাতেক বাদে একজন ইনফরমার সংবাদ দিল, দিন সাতেকের মধ্যে একটা জাহাজ আসছে তারা সমুদ্রের মোহানার কাছাকাছি মাল ডেলিভারী দেবে। আমি মোহনার কাছে ডেরা বাঁধলাম একটা পুলিশ লঞ্চে—সঙ্গে আটজন আর্মড পুলিশ। তাদের ইনচার্জ ছিল হাবিলদার ওয়ালিখান। শীতকাল তখন। প্রায় প্রত্যেক ভোরেই ঘন কুয়াশা নামে। দশ বার হাতের মধ্যে কিছু দেখা যায় না। ভোরের দিকে বায়নাকুলার হাতে লঞ্চের ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা পালতোলা নৌকা।

নৌকাটা মাঝ দরিয়ায়। লঞ্চকে সেই দিকে এগিয়ে যেতে বললাম। লঞ্চ আমার নির্দেশ মতো নিঃশব্দে জল কেটে কুয়াশার মধ্যে এগিয়ে চলল।

কিছুদূরে এগিয়েছি—পর পর কয়েকটা গুলি এসে লঞ্চের গায়ে লাগল। সারেং চেঁচিয়ে বললে, সাহেব সর্বনাশ হয়েছে লঞ্চ ফুটো হয়ে ভিতরে জল ঢুকতে শুরু করেছে। লঞ্চ ডুবছে। ধীরে ধীরে ডুবছে। আমি আর হাবিলদার তখন জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কুয়াশার মধ্যে সাঁতরাতে শুরু করলাম।

কতক্ষণ সাঁতরেছি মনে নেই। কারণ সময়ের হদিশ করবার মতো আমাদের সে সময় মনের অবস্থা নয়, তাছাড়া শীতের ঠাণ্ডায় হাত পা ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসছে তখন। এই বুঝি অতলে তলিয়ে যাই। হঠাৎ দুটো বলিষ্ঠ হাত আমাকে টেনে তুলল জল থেকে। নিদারুণ পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছি তখন। সেলাম সেন সাহেব। চেয়ে দেখি নিশিকান্ত দাঁড়িয়ে তার পায়ের সামনে পড়ে হাঁপাচ্ছি তখন।

নিশিকান্তর হাতে ধরা একটা পিস্তল। পিস্তলটার লক্ষ্য আমিই।

ঝুমন মিঞা সাহেবকে ঘরে নিয়ে যাও, জামাকাপড় দাও, ভিজে জামা-কাপড় উনি ছেড়ে ফেলুন, বাৎচিৎ পরে হবে আমাদের। আরো ঘণ্টা খানেক বাদে। বাইরে কড়া রোদ উঠেছে। চেয়ে দেখি পাটাতনের উপর সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ওয়ালী খান ও তিনজন

আর্মড পুলিশ।

অল্প দূরে দাঁড়িয়ে নিশিকান্ত—তার হাতে পিস্তল। নিশিকান্ত বললে, কুত্তার বাচ্চারা তোদের আমি সবকটাকে গুলি করে মারবো। তারপর তোদের মুর্দাগুলো লাহিড়ী সাহেবের কাছে নজরানা পাঠাবো। শুধু মুখের কথা নয়—কাজেও তাই করল নিশিকান্ত। ধীর শান্তভাবে নিশিকান্ত—পর পর চারজনকে গুলি করে গেল। চার চারটে লাশ নৌকার পাটাতনের উপর লুটিয়ে পড়ল। দে ওগুলোকে দরিয়ায় ফেলে দে। তিনজন মাল্লা অতঃপর ওদের মৃতদেহগুলি একের পর এক টেনে জলের মধ্যে ফেলে দিল। চারিদিকে শুধু জল আর জল। ক্রূর আর হিংস্র ঢেউগুলো ঘন ঘন শব্দ করছে। মাথার উপরে নীল আকাশ রৌদ্রকরোজ্জ্বল। বহুদূরে মাথার উপর কয়েকটা চিল উড়ে বেড়াচ্ছে ডানা ছড়িয়ে।

নিশিকান্ত এবারে আমার দিকে ফিরে তাকাল। সেন সাহেব, সর্বক্ষণই আপনার গতিবিধির উপর আমি নজর রেখেছিলাম। আপনি যে আমাকে ধরবার জন্য দরিয়ার মধ্যে লঞ্চ নিয়ে অপেক্ষা করছেন তাও আমার নজর এড়ায়নি। আমার প্ল্যান পূর্ব থেকে করা ছিল। আমি প্ল্যান মাফিক প্রস্তুত ছিলাম। আপনি এবারে আমাদের ধরতে পারলেও আমার নৌকায় কোনো মাল আপনি পেতেন না। মালের ডেলিভারী ডায়মণ্ড হারবারে হবে। আমি তখন 'থ' হয়ে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে আছি।

ভয় নেই—আপনাকে আমি মারব না। শুধু একটা ক্ষতচিহ্ন আপনার কপালের, ডানপাশে বাকী জীবনের জন্য আপনার থাকবে।

আমার দুই হাত তখন বাঁধা। পাও বাঁধা। পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বের করে নিশিকান্ত আমার কপালে একটা ক্ষত করে দিল। হাসতে হাসতে নিশিকান্ত অতঃপর বলল, আমার লোকেরা আপনাকে বাগবাজারের ঘাটে নামিয়ে দেবে।

বিরূপাক্ষ বলেন।

চেয়ে দেখলাম বিরূপাক্ষের কপালের ডানটিকে ছোট একটা আধইঞ্চি পরিমাণ লম্বা ক্ষতচিহ্ন।

আমি নির্বাক। এত বড় পরাজয়, এত বড় অপমান জীবনে কখনো আমাকে আর পেতে হয়নি শিশির।

আমি বললাম, তারপর?

তারপরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত।

মাস দুই পরেই—আবার নিশিকান্তর পিছু নিলাম। শ'চারেক দামী রিস্ট ওয়াচ স্মাগল করে সেগুলো বিক্রির জন্য ডক এরিয়াতে একজন মুসলমানের সঙ্গে কথা বলছিল দামের ব্যাপারে। পিছন থেকে গিয়ে দশজন আর্মড পুলিশ নিয়ে নিশিকান্তর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আধঘণ্টা ধরে দুই পক্ষে গুলি বিনিময় হলো। নিশিকান্ত উণ্ডেড হয়েও পালাল, আমারও বাঁ-হাত জখম, সে চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। 'তারপর?' তারপর আর নেই শিশির।

সে তার দলের লোকেদের হাতেই গুলি খেয়ে মারা যায়।

মারা গেল? হ্যাঁ।

তুই খবরটা পেলি কি করে? ওর স্ত্রী এসে আমাকে খবরটা দিয়েছিল। নিশিকান্তর স্ত্রী

রাধারাণী আমাকে বললেন, তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য নাকি আমিই দায়ী—যাহোক পুলিশ তার মৃতদেহটা পেয়েছিল। তার দলের লোকেরাই নিশিকান্তর মৃতদেহটা লালবাজারে পৌঁছে দিয়েছিল।

তারপর কতদিন কেটে গেছে। কিন্তু নিশিকান্ত হোড়কে আজও আমি ভুলিনি শিশির। আজো মাঝে মধ্যে, ঘুমের ভেতরে নিশিকান্তর স্মৃতি আমাকে হানা দেয়। একটা কালো মাকড়সা যেন তার রোমশ পা-গুলো নিয়ে নিঃশব্দে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কালো কুচকুচে তার রং। হীরের কুচির মতো জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ। একটা কালো মাকড়সা। গা ঘিন ঘিন করে।

সত্যান্বেষী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সন তেরশ' একত্রিশ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি শেষ করিয়া সবেমাত্র বাহির হইয়াছি। পয়সার বিশেষ টানাটানি ছিল না, পিতৃদেব ব্যাঙ্কে যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সুদে আমার একক জীবনের খরচা কলিকাতার মেসে থাকিয়া বেশ ভদ্রভাবেই চলিয়া যাইত। তাই স্থির করিয়াছিলাম, কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সাহিত্যচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিব। প্রথম যৌবনের উদ্দীপনায় মনে হইয়াছিল, একান্তভাবে বাগদেবীর আরাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে অচিরাৎ যুগান্তর আনিয়া ফেলিব। এই সময়টাতে বাঙালির সন্তান অনেক ভালো স্বপ্ন দেখে,--যদিও সে-স্বপ্ন ভাঙিতেও বেশি বিলম্ব হয় না।

কিন্তু ও কথা যাক। ব্যোমকেশের সহিত কি করিয়া পরিচয় হইল এখন তাহাই বলি।

যাঁহারা কলিকাতা শহরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে হয়তো জানেন না যে এই শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি পল্লী আছে, যাহার এক দিকে দুস্থ ভাটিয়া-মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বাস, অন্য দিকে খোলার বস্তি এবং তৃতীয় দিকে

তির্যক্‌চক্ষু পীতবর্ণ চীনাদের উপনিবেশ। এই ত্রিবেণী সঙ্গমের মধ্যস্থলে যে 'ব'-দ্বীপটি সৃষ্টি হইয়াছে, দিনের কর্ম-কোলাহলে তাহাকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না যে ইহার কোনো অসাধারণত্ব বা অস্বাভাবিক বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু সন্ধ্যার পরেই এই পল্লীতে এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করে। আটটা বাজিতে না বাজিতেই দোকানপাট সমস্ত বন্ধ হইয়া পাড়াটা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায় ; কেবল দূরে দূরে দু'একটা পান বিড়ির দোকান খোলা থাকে মাত্র। সে সময় যাহারা এ অঞ্চলে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করে, তাহারা অধিকাংশই নিঃশব্দে ছায়ামূর্তির মতো সঞ্চরণ করে এবং যদি কোনও অজ্ঞ পথিক অতর্কিতে এ পথে আসিয়া পড়ে, সেও দ্রুতপদে যেন সন্ত্রস্তভাবে ইহার এলাকা অতিক্রম করিয়া যায়।

আমি কি করিয়া এই পাড়াতে আসিয়া এক মেসের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বিশদ করিয়া লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দিনের বেলা পাড়াটা দেখিয়া মনে কোনও প্রকার সন্দেহ হয় নাই এবং মেসের দ্বিতলে একটি বেশ বড় হাওয়াদার ঘর খুব সস্তায় পাইয়া বাক্যব্যয় না করিয়া তাহা অধিকার করিয়াছিলাম। পরে যখন জানিতে পারিলাম যে, এই পাড়ায় মাসের মধ্যে দুই তিনটি মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় এবং নানা কারণে সপ্তাহে অন্তত একবার করিয়া পুলিশ-রেড্ হইয়া থাকে তখন কিন্তু বাসাটার উপর এমন মমতা জন্মিয়া গিয়াছে যে, আবার তল্পিতল্পা তুলিয়া নূতন বাসায় উঠিয়া যাইবার প্রবৃত্তি নাই। বিশেষত সন্ধ্যার পর আমি নিজের লেখাপড়ার কাজেই নিমগ্ন হইয়া থাকিতাম, বাড়ির বাহির হইবার কোনও উপলক্ষ্য ছিল না ; তাই ব্যক্তিগতভাবে বিপদে পড়িবার আশঙ্কা কখনও হয় নাই।

আমাদের বাসার উপরতলায় সর্বসুদ্ধ পাঁচটি ঘর ছিল, প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহারা সকলেই চাকরিজীবী এবং বয়স্ক ; শনিবারে শনিবারে বাড়ি যাইতেন, আবার সোমবারে ফিরিয়া অফিস যাতায়াত আরম্ভ করিতেন। ইঁহারা অনেকদিন হইতে এই মেসে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি একজন কাজ হইতে অবসর লইয়া বাড়ি চলিয়া যাওয়াতে তাঁহারই শূন্য ঘরটা আমি দখল করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর তাসের বা পাশার আড্ডা বসিত—সেই সময় মেসের অধিবাসীদের কণ্ঠস্বর ও উত্তেজনা কিছু উগ্রভাব ধারণ করিত। অশ্বিনীবাবু পাকা খেলোয়াড় ছিলেন—তাঁহার স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ঘনশ্যামবাবু। হারিয়া গেলে চেঁচামেচি করিতেন। তারপর ঠিক নয়টার সময় বামুন ঠাকুর আসিয়া জানাইত যে আহার প্রস্তুত ; তখন আবার ইঁহারা শান্তভাবে উঠিয়া আহার সমাধা করিয়া যে যাঁহার ঘরে শুইয়া পড়িতেন। এইরূপ নিরুদঘাত শান্তিতে মেসের বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কাটিতেছিল ; আমিও আসিয়া নির্বিবাদে এই প্রশান্ত জীবনযাত্রা বরণ করিয়া লইয়াছিলাম।

বাসার নিচেরতলার ঘরগুলি লইয়া বাড়িওয়ালা নিজে থাকিতেন। ইনি একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার—নাম অনুকূলবাবু। বেশ সরল সদালাপী লোক। বোধ হয় বিবাহ করেন নাই। কারণ, বাড়িতে স্ত্রী পরিবার কেহ ছিল না। তিনি মেসের খাওয়া-দাওয়া ও ভাড়াটেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতেন। এমন পরিপাটীভাবে তিনি সমস্ত

কাজ করিতেন যে, কোনও দিক্ দিয়া কাহারও অনুযোগ করিবার অবকাশ থাকিত না, মাসের গোড়ায় বাড়িভাড়া ও খোরাকি বাবদ পঁচিশ টাকা তাঁহার হাতে ফেলিয়া দিয়া সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

পাড়ার দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাক্তারের বেশ পসার ছিল। সকালে ও বিকালে তাঁহার বসিবার ঘরে রোগীর ভিড় লাগিয়া থাকিত। তিনি ঘরে বসিয়া সামান্য মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। রোগীর বাড়িতে বড় একটা যাইতেন না, গেলেও ভিজিট লইতেন না। এই জন্য পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত খাতির ও শ্রদ্ধা করত। আমিও অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার ভারি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বেলা দশটার মধ্যে মেসের অন্যান্য সকলে অফিসে চলিয়া যাইত, বাসায় আমরা দুইজনে পড়িয়া থাকিতাম। স্নানাহার প্রায় একসঙ্গেই হইত, তারপর দুপুরবেলাটাও গল্পে-গুজবে সংবাদপত্রের আলোচনায় কাটিয়া যাইত, ডাক্তার অত্যন্ত নিরীহ ভালোমানুষ লোক হইলেও ভারি চমৎকার কথা বলিতে পারিতেন। বয়স বছর চল্লিশের ভিতরেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উপাধি তাঁহার ছিল না, কিন্তু ঘরে বসিয়া এত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান তিনি অর্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে বিস্ময় বোধ হইত। বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি লজ্জিত হইয়া বলিতেন—"আর তো কোনও কাজ নেই, ঘরে বসে বসে কেবল বই পড়ি। আমার যা কিছু সংগ্রহ সব বই থেকে।"

এই বাসায় মাস দুই কাটিয়া যাইবার পর একদিন বেলা আন্দাজ দশটার সময় আমি ডাক্তারবাবুর ঘরে বসিয়া তাঁহার খবরের কাগজখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিলাম। অশ্বিনীবাবু পান চিবাইতে চিবাইতে অফিস চলিয়া গেলেন ; তারপর ঘনশ্যামবাবু বাহির হইলেন, দাঁতের ব্যথার জন্য এক পুরিয়া ওষুধ ডাক্তারবাবুর নিকট হইতে লইয়া তিনিও অফিস যাত্রা করিলেন। বাকি দুইজনও একে একে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সারা দিনের জন্য বাসা খালি হইয়া গেল।

ডাক্তারবাবুর কাছে তখনও দু'একজন রোগী ছিল, তাহারা ঔষধ লইয়া একে একে বিদায় হইলে পর তিনি চশমাটা কপালে তুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।—"কাগজে কিছু খবর আছে না কি?"

"কাল বৈকালে আমাদের পাড়ায় খানাতল্লাশি হয়ে গেছে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—"সে তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোথায় হল?"

কাছেই—ছত্রিশ নম্বরে। শেখ আবদুল গফুর বলে একটা লোকের বাড়িতে।"

ডাক্তার বলিলেন—"আরে লোকটাকে যে আমি চিনি, প্রায়ই আমার কাছে ওষুধ নিতে আসে।—কি জন্যে খানাতল্লাশি হয়েছে, কিছু লিখেছে?"

"কোকেন। এই পড়ুন না!" বলিয়া আমি 'দৈনিক কালকেতু' তাঁহার দিকে আগাইয়া দিলাম।

ডাক্তার চশমা-জোড়া পুনশ্চ নাসিকার উপর নামাইয়া পড়িতে লাগিলেন,—

"গতকল্য—অঞ্চলে ছত্রিশ নং—স্ট্রীটে শেখ আবদুল গফুর নামে জনৈক চর্ম-ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুলিসের খানাতল্লাশি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনও বে-আইনী মাল পাওয়া যায় নাই। পুলিসের অনুমান, এই অঞ্চলে কোথাও একটি কোকেনের গুপ্ত আড়ত আছে,

সেখান হইতে সর্বত্র কোকেন সরবরাহ হয়। এক দল চতুর অপরাধী পুলিসের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বহুদিন যাবৎ এই আইন-বিগর্হিত ব্যবসা চালাইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই অপরাধীদের নেতা কে এবং ইহাদের গুপ্ত ভাণ্ডার কোথায়, তাহা বহু অনুসন্ধানেও নির্ণয় করা যাইতেছে না।"

ডাক্তার একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—"কথাটা ঠিক। আমারও সন্দেহ হয় কাছে-পিঠে কোথাও কোকেনের একটা মস্ত আড্ডা আছে। দু' একবার তার ইশারা আমি পেয়েছি,—জানেন তো নানা রকম লোক ওষুধ নিতে আমার কাছে আসে। আর যাই করুক, যে কোকেনখোর, সে ডাক্তারের কাছে কখনও আত্মগোপন করতে পারে না।—কিন্তু ঐ আবদুল গফুর লোকটাকে তো আমার কোকেনখোর বলে মনে হয় না। বরং সে যে পাকা আফিংখোর এ কথা জোর করে বলতে পারি। সে নিজেও সে কথা গোপন করে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা, অনুকূলবাবু, এ পাড়ায় যে এত খুন হয়, তার কারণ কি?"

ডাক্তার বলিলেন—"তাঁর তো খুব সহজ কারণ রয়েছে। যারা গোপনে আইন ভঙ্গ করে একটা বিরাট ব্যবসা চালাচ্ছে, তাদের সর্বদাই ভয়—পাছে ধরা পড়ে। সুতরাং দৈবক্রমে যদি কেউ তাদের গুপ্তকথা জানতে পেরে যায়, তখন তাকে খুন করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। ভেবে দেখুন, আমি যদি কোকেনের ব্যবসা করি আর আপনি যদি দৈবাৎ সে কথা জানতে পেরে যান, তাহলে আপনাকে বাঁচতে দেওয়া আমার পক্ষে আর নিরাপদ হবে কি? আপনি যদি কথাটি পুলিসের কাছে ফাঁস করে দেন, তাহলে আমি তো জেলে যাবই, সঙ্গে সঙ্গে এতবড় একটা ব্যবসা ভেস্তে যাবে। লক্ষ লক্ষ টাকার মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আমি তা হতে দিতে পারি?" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—"আপনি অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব বেশ অনুশীলন করেছেন দেখছি!"

"হ্যাঁ। ওদিকে আমার খুব ঝোঁক আছে!" বলিয়া আড়মোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমিও উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময় একটি লোক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বয়স বোধ করি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা,—মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে। কিন্তু বোধ হয়, সম্প্রতি কোনও কষ্টে পড়িয়াছে ; কারণ, বেশভূষার কোনও যত্ন নাই, চুলগুলি অবিন্যস্ত, গায়ের কামিজটা ময়লা, এমন কি পায়ের জুতাজোড়াও কালির অভাবে রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছে। মুখে একটা উৎকণ্ঠিত আগ্রহের ভাব। আমার দিক হইতে অনুকূলবাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"শুনলুম এটা একটা মেস—জায়গা খালি আছে কি?"

ঈষৎ বিস্ময়ে আমরা দু'জনেই তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, অনুকূলবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না। মশায়ের কি করা হয়?" লোকটি ক্লান্তভাবে রোগীর বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—"উপস্থিত চাকরির জন্য দরখাস্ত দেওয়া হয় আর মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা খোঁজা হয়। কিন্তু এই হতভাগ্য শহরে একটা মেসও কি খালি পাবার যো নেই-

-সব কানায় কানায় ভর্তি হয়ে আছে।”

সহানুভূতির স্বরে অনুকূলবাবু বলিলেন—“সীজনের মাঝখানে মেসে-বাসায় জায়গা পাওয়া বড় মুশকিল। মশায়ের নামটি কি?”

“অতুলচন্দ্র মিত্র। কলকাতায় এসে পর্যন্ত চাকরির সন্ধানে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেশে ঘটি বাটি বিক্রি করে যে ক'টা টাকা এনেছিলুম, তাও প্রায় শেষ হয়ে এল—গুটি পঁচিশ-ত্রিশ বাকি আছে। কিন্তু দু'বেলা হোটেলে খেলে সেও আর কদ্দিন বলুন? তাই একটি ভদ্রলোকের মেস খুঁজছি—বেশি দিন নয়, মাসখানেকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে—এই ক'টা দিনের জন্যে দু'বেলা দুটো শাকভাত আর একটু জায়গা পেলেই আর আমার কিছু দরকার নেই।”

অনুকূলবাবু বলিলেন—“বড় দুঃখিত হলাম অতুলবাবু, কিন্তু আমার এখানে সব ঘরই ভর্তি।”

অতুল একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“তবে আর উপায় কি বলুন—আবার বেরুই। দেখি যদি ওড়িয়াদের আড্ডায় একটু জায়গা পাই।—আর তো কিছু নয়, ভয় হয়, রাত্তিরে ঘুমুলে হয়তো টাকাগুলো চুরি করে নেবে।—এক গেলাস জল খাওয়াতে পারেন?”

ডাক্তার জল আনিতে গেলেন। লোকটির অসহায় অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় দয়া হইল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম—“আমার ঘরটা বেশ বড় আছে—দু'জনে থাকলে অসুবিধা হবে না। তা—আপনার যদি আপত্তি না থাকে—'

অতুল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—“আপত্তি? বলেন কি মশাই—“স্বর্গ হাতে পাব।” তাড়াতাড়ি ট্যাক হইতে কতকগুলো নোট ও টাকা বাহির করিয়া বলিল—'কত দিতে হবে? টাকাটা আগাম নিয়ে নিলে ভালো হত না? আমার কাছে আবার—”

তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম—“থাক্, টাকা পরে দেবেনখন তাড়াতাড়ি কিছু নেই—” ডাক্তারবাবু জল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে বলিলাম—“ইনি সঙ্কটে পড়েছেন তাই আপাতত আমার ঘরেই থাকুন—আমার কোনও কষ্ট হবে না।”

অতুল কৃতজ্ঞতাগদ্‌গদ্ স্বরে বলিল,—“আমার ওপর ভারি দয়া করেছেন ইনি! কিন্তু বেশি দিন আমি কষ্ট দেব না—ইতিমধ্যে যদি অন্য কোথাও জায়গা পেয়ে যাই, তাহলে সেখানেই উঠে যাব।” বলিয়া জলপানান্তে গেলাসটা নামাইয়া রাখিল।

ডাক্তার একটু বিস্মিতভাবে আমার দিকে ফিরিয়ে বলিলেন—“আপনার ঘরে? তা—বেশ। আপনার যখন অমত নেই, তখন আমি কি বলব? আপনার সুবিধাও হবে—ঘরভাড়াটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে—”

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—“সে জন্যে নয়—“উনি বিপদে পড়েছেন—”

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—“সে তো বটেই।—তা আপনি আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আসুন গে, অতুলবাবু। এইখানেই আপাতত থাকুন।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ জিনিসপত্র সামান্যই—একটা বিছানা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ। এক হোটেলের দারোয়ানের কাছে রেখে এসেছি—এখনই নিয়ে আসছি।”

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ—স্নানাহার এখানেই করবেন।"

"তাহলে তো ভালোই হয়।"—কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া অতুল বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে আমরা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম। অনুকূলবাবু কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কী ভাবছেন ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তার চমক ভাঙিয়া বলিলেন—"কিছু না। বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, আপনি ভালোই করেছেন। তবে কি জানেন—'অজ্ঞাতকুলশীলস্য'—শাস্ত্রের একটা বচন আছে—। যাক্, আশা করি, কোনও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে না।" বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

অতুল মিত্র আমার ঘরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। অনুকূলবাবুর কাছে একটা বাড়তি তক্তপোশ ছিল, তিনি সেখানা অতুলের ব্যবহারের জন্য উপরে পাঠাইয়া দিলেন।

অতুল দিনের বেলায় বড় একটা বাসায় থাকিত না। সকালে উঠিয়া চাকরির সন্ধানে বাহির হইয়া যাইত, বেলা দশটা এগারোটার সময় ফিরিত ; আবার স্নানাহারের পর বাহির হইত। কিন্তু যতটুকু সময় সে বাসায় থাকিত, তাহারই মধ্যে বাসার সকলের সঙ্গে বেশ সম্প্রীতি জমাইয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর খেলার মজলিসে তাহার ডাক পড়িত। কিন্তু সে তাস-পাশা খেলিতে জানিত না, তাই কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া আস্তে আস্তে নিচে নামিয়া গিয়া ডাক্তারের সহিত গল্প-গুজব করিত। আমার সঙ্গেও তাহার বেশ ভাব হইয়া গিয়াছিল। দু'জনের একই বয়স, তার উপর একই ঘরে ওঠা-বসা ; সুতরাং আমাদের সম্বোধন 'আপনি' হইতে 'তুমি'তে নামিতে বেশি বিলম্ব হয় নাই।

অতুল আসিবার পর হপ্তাখানেক বেশ নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। তারপর মেসে নানা রকম বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার পর অতুল ও আমি অনুকূলবাবুর ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। রোগীর ভিড় কমিয়া গিয়াছিল ; দু' একজন মাঝে মাঝে আসিয়া রোগের বিবরণ বলিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছিল, অনুকূলবাবু আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঔষধ দিতেছিলেন ও হাতবাক্সে পয়সা তুলিয়া রাখিতেছিলেন। গত রাত্রিতে প্রায় আমাদের বাসার সম্মুখে একটা খুন হইয়া গিয়াছিল, আজ সকালে রাস্তার উপর লাশ আবিষ্কৃত হইয়া একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা সেই বিষয়েই আলোচনা করিতেছিলাম। বিশেষ উত্তেজনার কারণ এই যে, লাশ দেখিয়া লোকটাকে দরিদ্র শ্রেণীর ভাটিয়া বলিয়া মনে হইলেও তাহার কোমরের গেঁজের ভিতর হইতে একশ' টাকার দশকেতা নোট পাওয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বলিতেছিলেন—"এ কোকেন ছাড়া আর কিছু নয়। ভেবে দেখুন, টাকার লোভে যদি খুন করত, তাহলে ওর কোমরে হাজার টাকার নোট পাওয়া যেতো না—আমার মনে হয়, লোকটা কোকেনের খরিদ্দার ছিল ; কোকেন কিনতে এসে কোকেন ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে কোনও মারাত্মক গুপ্তকথা জানতে পারে। হয়তো তাদের পুলিশের ভয় দেখায়, blackmail করবার চেষ্টা করে। তার পরেই ব্যস্,—খতম্।" অতুল বলিল-—"কে জানে মশায়, আমার তো ভারি ভয় করছে। আপনারা এ পাড়ায় আছেন কি করে? আমি যদি আগে জানতুম, তাহলে—"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—"তাহলে ওড়িয়াদের আড্ডাতেই যেতেন? আমাদের কিন্তু ভয় করে না। আমি তো দশ বারো বছর এ পাড়ায় আছি, কিন্তু কারুর কথায় থাকি না বলে কখনও হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি।"

অতুল ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—"ডাক্তারবাবু, আপনি নিশ্চয় কিছু জানেন—না?"

হঠাৎ পিছনে খুট করিয়া একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, আমাদের মেসের অশ্বিনীবাবু দরজার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতেছেন। তাঁহার মুখের অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা দেখিয়া আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"কি হয়েছে অশ্বিনীবাবু? আপনি এ সময় নিচে যে?"

অশ্বিনীবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—"না, কিছু না—অমনি। এক পয়সার বিড়ি কিনতে" বলিতে বলিতে তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

আমরা পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিলাম। প্রৌঢ় গম্ভীর-প্রকৃতি আশ্বিনীবাবুকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করিতাম—তিনি হঠাৎ নিঃশব্দে নিচে নামিয়া আসিয়া আড়ি পাতিয়া আমাদের কথা শুনিতেছিলেন কেন?

রাত্রিতে আহারে বসিয়া জানিতে পারিলাম অশ্বিনীবাবু পূর্বেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াছেন। আহারান্তে অভ্যাসমতো একটা চুরুট শেষ করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, অতুল মেঝের উপর কেবল একটা বালিশ ফেলিয়া শুইয়া আছে। একটু বিস্মিত হইলাম, কারণ, এমন কিছু গরম পড়ে নাই যে মেঝেয় শোয়া প্রয়োজন হইতে পারে। ঘর অন্ধকার ছিল, অতুলও কোনও সাড়া দিল না—তাই ভাবিলাম, সে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমার তখনও ঘুমের কোনও তাগিদ ছিল না, কিন্তু আলো জ্বালিয়া পড়িতে বা লিখিতে বসিলে হয়তো অতুলের ঘুম ভাঙিয়া যাইবে, তাই খালি পায়ে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এইভাবে বেড়াইবার পর হঠাৎ মনে হইল, যাই অশ্বিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তাঁহার কোনো অসুখ-বিসুখ করিয়াছে কি না। আমার দু'খানা ঘর পরেই অশ্বিনীবাবুর ঘর ; গিয়া দেখিলাম, তাঁহার দরজা খোলা, বাহির হইতে ডাক দিয়া সাড়া পাওয়া গেল না। তখন কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিলাম ; দ্বারের পাশেই সুইচ ছিল, আলো জ্বালিয়া দেখিলাম ঘরে কেহ নাই। রাস্তার ধারের জানালাটা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, কিন্তু রাস্তাতেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তাই তো! এত রাত্রে ভদ্রলোক কোথায় গেলেন? অকস্মাৎ মনে হইল—হয়তো ডাক্তারের নিকট ঔষধ লইতে গিয়াছেন। তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া গেলাম। ডাক্তারের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। এত রাত্রে নিশ্চয় তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন। বন্ধ দরজার সম্মুখে অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় ঘরের ভিতর গলার শব্দ শুনিতে পাইলাম। অত্যন্ত উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে অশ্বিনীবাবু কথা কহিতেছেন।

একবার লোভ হইল কান পাতিয়া শুনি কি কথা। কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা দমন করিলাম—হয়তো অশ্বিনীবাবু কোনও রাগের কথা বলিতেছেন, আমার শোনা উচিত নয়। পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে ফিরিয়া আসিলাম।

ঘরে আসিয়া দেখিলাম, অতুল পূর্ব্ববৎ মেঝের উপর শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া ঘাড় তুলিয়া বলিল—"কি, অশ্বিনীবাবু ঘরে নেই?"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"না, তুমি জেগে ছিলে?"

"হ্যাঁ। অশ্বিনীবাবু নিচে ডাক্তারের ঘরে আছেন।"

"তুমি জানলে কি করে?"

"কি করে জানলুম যদি দেখতে চাও, এই বালিশে কান রেখে মাটিতে শোও।"

"কি হে, মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

"মাথা ঠিক আছে। শুয়েই দেখ না।"

কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া অতুলের মাথার পাশে মাথা রাখিয়া শুইলাম। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পর অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ কানে আসিতে লাগিল। তারপর পরিষ্কার শুনিতে পাইলাম, অনুকূলবাবু বলিতেছেন—"আপনি বড় উত্তেজিত হয়েছেন। ওটা আপনার দৃষ্টি-বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে অমন হয়। আমি ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে। কাল সকালে উঠে যদি আপনার ঐ বিশ্বাস থাকে, তখন যা হয় করবেন।"

উত্তরে অশ্বিনীবাবু কি বলিলেন, ধরা গেল না। চেয়ার টানার শব্দে বুঝিলাম, দু'জনে উঠিয়া পড়িলেন।

আমি ভূ-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম—"ডাক্তারের ঘরটা যে আমাদের ঘরের নিচেই, তা মনে ছিল না। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো? অশ্বিনীবাবুর হয়েছে কি?"

অতুল হাই তুলিয়া বলিল—"ভগবান জানেন। রাত হল, এবার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়া যাক।"

আমি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি মাটিতে শুয়েছিলে কেন?"

অতুল বলিল—"সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, মেঝেটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হল, তাই শুয়ে পড়লুম। ঘুমও একটু এসেছিল, এমন সময় ওঁদের কথাবার্তায় চটকা ভেঙে গেল।"

সিঁড়িতে অশ্বিনীবাবুর পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘড়িতে দেখিলাম, রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজে। অতুল শুইয়া পড়িয়াছিল, মেসও একেবারে নিশুতি হইয়া গিয়াছে। আমি বিছানায় শুইয়া অশ্বিনীবাবুর কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে অতুলের ঠেলা খাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বেলা সাতটা বাজিয়াছে। অতুল বলিল—"ওহে, ওঠ ওঠ ; গতিক ভাল ঠেকছে না।"

"কেন? কি হয়েছে?"

"অশ্বিনীবাবু ঘরের দরজা খুলছেন না। ডাকাডাকিতে সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কি হয়েছে তাঁর?"

"তা বলা যায় না। তুমি এস"—বলিয়া সে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

আমিও তাহার পশ্চাতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, অশ্বিনীবাবুর দরজার সম্মুখে

সকলেই উপস্থিত আছেন। উৎকণ্ঠিত জল্পনা ও দ্বার ঠেলাঠেলি চলিতেছে। নিচে হইতে অনুকূলবাবুও আসিয়াছেন। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ক্রমে বাড়িয়াই চলিল, কারণ, অশ্বিনীবাবু এত বেলা পর্যন্ত কখনও ঘুমান না। তা ছাড়া, যদি ঘুমাইয়া পড়িয়াই থাকেন, তবে এত হাঁকডাকেও জাগিতেছেন না কেন?

অতুল অনুকূলবাবুর নিকটে গিয়া বলিল—"দেখুন দরজা ভেঙে ফেলা যাক। আমার তো ভালো বোধ হচ্ছে না।"

অনুকূলবাবু বলিলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আর বলতে! ভদ্রলোক হয়তো মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন, নইলে জবাব দিচ্ছেন না কেন? আর দেরি নয়, অতুলবাবু, দরজা ভেঙে ফেলুন।"

দেড় ইঞ্চি পুরু কাঠের দরজা, তাহার উপর ইয়েল-লক্ লাগানো। কিন্তু অতুল এবং আরও দুই তিনজন একসঙ্গে সজোরে ধাক্কা দিতেই বিলাতি তালা ভাঙিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে দরজা খুলিয়া গেল। তখন মুক্ত দ্বারপথে যে-বস্তুটি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে ভয়ে কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। স্তম্ভিত হইয়া সকলে দেখিলাম, ঠিক দরজার সম্মুখেই অশ্বিনীবাবু ঊর্ধ্বমুখ হইয়া পড়িয়া আছেন—তাঁহার গলা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কাটা। মাথা ও ঘাড়ের নিচে পুরু হইয়া রক্ত জমিয়া যেন একটা লাল মখমলের গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। আর, তাঁহার প্রক্ষিপ্ত প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে একটা রক্ত-মাখানো ক্ষুর তখনও যেন জিঘাংসাভরে হাসিতেছে।

নিশ্চল জড়পিণ্ডবৎ আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর অতুল ও ডাক্তার একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার বিহ্বলভাবে অশ্বিনীবাবুর বীভৎস মৃতদেহের প্রতি তাকাইয়া থাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন,—"কি ভয়ানক, শেষে অশ্বিনীবাবু আত্মহত্যা করলেন!"

অতুলের দৃষ্টি কিন্তু মৃতদেহের দিকে ছিল না। তাহার দুই চক্ষু তলোয়ারের ফলার মতো ঘরের চারদিকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে একবার বিছানাটা দেখিল, রাস্তার ধারের খোলা জানালা দিয়া উঁকি মারিল, তারপর ফিরিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল—"আত্মহত্যা নয়, ডাক্তারবাবু, এ খুন, নৃশংস নরহত্যা। আমি পুলিশ ডাকতে চললুম—আপনারা কেউ কোনও জিনিস ছোঁবেন না।"

অনুকূলবাবু বলিলেন—"বলেন কি, অতুলবাবু—খুন! কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল—তা ছাড়া ওটা—" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মৃতের হস্তে রক্তাক্ত ক্ষুরটা দেখাইলেন।

অতুল মাথা নাড়িয়া বলিল—"তা হোক, তবু এ খুন! আপনারা থাকুন—আমি এখনই পুলিস ডেকে আনছি।"—সে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ডাক্তারবাবু কপালে হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"উঃ শেষে আমার বাসাতে এই ব্যাপার হল!"

পুলিসের কাছে মেসের চাকর বামুন হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সকলেরই এজাহার হইল। যে যাহা জানি, বলিলাম। কিন্তু কাহারও জবানবন্দীতে এমন কিছু প্রকাশ পাইল না যাহাতে অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুর কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। অশ্বিনীবাবু

অত্যন্ত নির্বিরোধী লোক ছিলেন, মেস ও অফিস ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ ছিল বলিয়াও জানা গেল না। তিনি প্রতি শনিবারে বাড়ি যাইতেন। দশ-বারো বৎসর এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। কিছুদিন হইতে তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন ; এইরূপ গোটাকয়েক সাধারণ কথাই প্রকাশ পাইল।

ডাক্তার অনুকূলবাবুও এজাহার দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে অশ্বিনীবাবুর মৃত্যু-রহস্য পরিষ্কার না হইয়া যেন আরও জটিল হইয়া উঠিল। তাঁহার জবানবন্দী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"গত বারো বৎসর যাবৎ অশ্বিনীবাবু আমার বাসায় ছিলেন। তাঁর বাড়ি বর্ধমান জেলায় হরিহরপুর গ্রামে। তিনি সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন, একশ কুড়ি টাকা আন্দাজ মাইনে পেতেন। এত অল্প মাহিনায় পরিবার নিয়ে কলকাতায় থাকার সুবিধা হয় না, তাই তিনি একলা মেসে থাকতেন। এ মেসের প্রায় সকলেই তাই করে থাকেন।

"অশ্বিনীবাবুকে আমি যতদূর জানি, তিনি সরল-প্রকৃতির কর্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। কখনও কারুর পাওনা ফেলে রাখতেন না, কারুর কাছে এক পয়সা ধার ছিল না। কোনো বদখেয়াল কি নেশা ছিল বলেও আমার জানা নেই ; মেসের অন্য সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষী দিতে পারবেন।

"এই বারো বছরের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিনি। গত কয়েক মাস থেকে ডায়েবিটিসে ভুগছিলেন, আমারই চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু তাঁর মানসিক রোগের কোনো লক্ষণ ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি। কাল হঠাৎ তাঁর চাল-চলনে একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব প্রথম লক্ষ্য করলুম।

"কাল বেলা প্রায় পৌনে দশটার সময় আমি আমার ডাক্তারখানায় বসেছিলুম। হঠাৎ অশ্বিনীবাবু এসে বললেন—'ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে।' একটু আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম ; তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হল। জিজ্ঞাসা করলুম—'কি কথা?' তিনি এদিক-ওদিক চেপে চাপা গলায় বললেন—'এখন নয়, আর এক সময়।' বলেই তাড়াতাড়ি অফিস চলে গেলেন।

"সন্ধ্যার পর আমি, অজিতবাবু আর অতুলবাবু আমার ঘরে বসে গল্প করছিলুম, হঠাৎ অজিতবাবু দেখতে পেলেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্বিনীবাবু আমাদের কথা শুনছেন। তাঁকে ডাকতেই তিনি কোনো গতিকে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমরা সবাই অবাক হয়ে রইলুম, ভাবলুম, কি হল অশ্বিনীবাবুর?

"তারপর রাত্রি দশটার সময় তিনি চোরের মতো চুপি চুপি আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। মুখ দেখেই বুঝলুম, তাঁর মানসিক অবস্থা প্রকৃতিস্থ নয়। দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি আবোল-তাবোল নানারকম বলতে লাগলেন। কখনও বলেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভীষণ বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখেছেন, কখনও বলেন, একটা ভয়ানক গুপ্তরহস্য জানতে পেরেছেন। আমি তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তিনি ঝোঁকের মাথায় বকেই চললেন। শেষে আমি তাঁকে এক পুরিয়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে বললুম—"আজ রাত্রে শুয়ে পড়ুন গিয়ে, কাল সকালে আপনার কথা শুনব।' তিনি ওষুধ নিয়ে উপরে উঠে গেলেন।

"সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা,—তারপর আজ সকালে এই কাণ্ড! তাঁর ভাবগতিক দেখে তাঁর মানসিক প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি যে এই ক্ষণিক উত্তেজনার বশে আত্মঘাতী হবেন, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।"

অনুকূলবাবু নীরব হইলে দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি মনে করেন, এ আত্মহত্যা?"

অনুকূলবাবু বলিলেন—"তা ছাড়া আর কি হতে পারে। তবে অতুলবাবু বলছিলেন যে, এ আত্মহত্যা নয়—অন্য কিছু। এ বিষয়ে তিনি হয়তো বেশি জানেন, অতএব তিনিই বলতে পারেন।"

দারোগা অতুলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"আপনিই না অতুলবাবু? এটা যে আত্মহত্যা নয়, তা মনে করবার কোনও কারণ আছে?"

"আছে। নিজের হাতে মানুষ অমন ভয়ানকভাবে নিজের গলা কাটতে পারে না। আপনি লাশ দেখেছেন—ভেবে দেখুন, এ অসম্ভব।"

দারোগা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"হত্যাকারী কে, আপনার কোনও সন্দেহ হয় কি?"

"না।"

"হত্যার কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন কি?"

অতুল রাস্তার দিকের জানলাটা নির্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ জানলাটা হত্যার কারণ।"

দারোগা সচকিত হইয়া বলিলেন—"জানলা হত্যার কারণ? আপনি বলতে চান, হত্যাকারী ঐ জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল।"

"না। হত্যাকারী দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল।"

দারোগা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আপনার বোধহয় স্মরণ নেই যে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।"

"স্মরণ আছে।"

দারোগা ঈষৎ পরিহাসের স্বরে বলিলেন—"তবে কি অশ্বিনীবাবু আহত হবার পর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন?"

"না, হত্যাকারী অশ্বিনীবাবুকে হত্যা করবার পর বাইরে থেকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।"

"সে কি করে হতে পারে?"

অতুল মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"খুব সহজে, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

অনুকূলবাবু এতক্ষণ দরজাটার দিকেই তাকাইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক তো! ঠিক তো! দরজা সহজেই বাইরে থেকে বন্ধ করা যায়, এতক্ষণ আমাদের মাথাতেই ঢোকেনি। দেখছেন না দরজায় যে ইয়েল্ লক্ লাগানো।"

অতুল বলিল—"দরজা বাইরে থেকে টেনে দিলেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর ভিতর থেকে ছাড়া খোলবার উপায় নেই।"

দারোগা প্রবীণ লোক, তিনি গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—"সে ঠিক। কিন্তু একটা জায়গায় খটকা লাগছে। অশ্বিনীবাবু যে রাত্রে দরজা খুলে শুয়ে ছিলেন তার কি কোনো প্রমাণ আছে?"

অতুল বলিল—"না, বরঞ্চ তার উল্টো প্রমাণই আছে। আমি জানি, তিনি দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলেন।"

আমি বললাম—"আমিও জানি। আমি তাঁকে দরজা বন্ধ করতে শুনেছি।"

দারোগা বলিলেন—"তবে? অশ্বিনীবাবু রাত্রে উঠে হত্যাকারীকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন, এ অনুমানও তো সম্ভব বলে মনে হয় না।"

অতুল বলিল—"না। কিন্তু আপনার বোধহয় স্মরণ নেই যে, অশ্বিনীবাবু গত কয়েক মাস থেকে একটা রোগে ভুগছিলেন।"

"রোগে ভুগছিলেন? ওঃ! ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন, অতুলবাবু! ও কথাটা আমার খেয়ালই ছিল না।" দারোগা একটু মুরুব্বীয়ানাভাবে বলিলেন—"আপনি দেখছি বেশ intelligent লোক, পুলিসে ঢুকে পড়ুন না! এ পথে আপনি উন্নতি করতে পারবেন। কিন্তু এদিকে ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। যদি সত্যিই এটা হত্যাকাণ্ড হয়, তাহলে হত্যাকারী যে ভয়ানক হুঁশিয়ার লোক, তাতে সন্দেহ নেই। কারুর উপর আপনাদের সন্দেহ হয়?" বলিয়া উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাহিলেন।

সকলেই নীরবে মাথা নাড়িলেন। অনুকূলবাবু বলিলেন—"দেখুন, এ পাড়ায় প্রায়ই একটা-দুটো খুন হয়, এ খবর অবশ্য আপনার কাছে নূতন নয়। পরশু দিনই আমাদের বাসার প্রায় সামনে একটা খুন হয়ে গেছে। এই সব দেখে আমার মনে হয় যে, সবগুলো হত্যাই এক সুতোয় গাঁথা,—একটার কিনারা হলেই অন্যটার কিনারা হবে। অবশ্য যদি অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলে মেনে নেওয়া হয়!"

দারোগা বলিলেন—"তা হতে পারে। কিন্তু অন্য খুনের কিনারা হবার আশায় বসে থাকলে বোধহয় অনন্তকাল বসেই থাকতে হবে।"

অতুল বলিল—"দারোগাবাবু, যদি এ খুনের কিনারা করতে চান, তাহলে ঐ জানালাটার কথা ভালো করে ভেবে দেখবেন।"

দারোগা ক্লান্তভাবে কহিলেন—"সব কথাই আমাদের ভালো করে ভেবে দেখতে হবে, অতুলবাবু। এখন আপনাদের প্রত্যেকের ঘর আমি খানাতল্লাশ করতে চাই।"

তারপর উপরে নিচে সব ঘরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খানাতল্লাশ করা হইল কিন্তু কোথাও এমন কিছু পাওয়া গেল না যাহার দ্বারা এই মৃত্যু-রহস্যের উপর আলোকপাত হইতে পারে। অশ্বিনীবাবুর ঘরও যথারীতি অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু দু' একটা অতি সাধারণ পারিবারিক চিঠিপত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ক্ষুরের শূন্য খাপটা বিছানার পাশেই পড়িয়াছিল। তিনি নিজে ক্ষৌরকার্য করিতেন এ কথা আমরা সকলেই জানিতাম, খাপটা চিনিতেও কষ্ট হইল না। অশ্বিনীবাবুর মৃতদেহ পূর্বেই স্থানান্তরিত হইয়াছিল, অতঃপর তাঁহার দরজায় তালা লাগাইয়া সীলমোহর করিয়া দারোগা বেলা দেড়টা নাগাদ প্রস্থান করিলেন।

অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে 'তার' পাঠানো হইয়াছিল, বৈকালে তাঁহার পুত্ররা ও অন্যান্য

নিকট-আত্মীয়বর্গ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিস্মিত বিমূঢ় শোকের চিত্রের উপর যবনিকা টানিয়া দিলাম। আমরা অনাত্মীয় হইলেও অশ্বিনীবাবুর এই শোচনীয় মৃত্যুতে প্রত্যেকেই গভীরভাবে আহত হইয়াছিলাম। তা ছাড়া নিজেদের প্রাণ লইয়াও কম আশঙ্কা হয় নাই। যেখানে পাশের ঘরে এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে, সেখানে আমাদের জীবনেরই বা নিশ্চয়তা কি? মলিন সশঙ্ক অবসন্নতার ভিতর দিয়া এই বিপদভারাক্রান্ত দুর্দিন কাটিয়া গেল।

রাত্রিকালে শয়নের পূর্বে ডাক্তারের ঘরে গিয়া দেখিলাম, তিনি স্তব্ধগম্ভীরমুখে বসিয়া আছেন। এই এক দিনের ঘটনায় তাঁহার শান্ত নিশ্চিন্ত মুখের উপর কালো কালো রেখা পড়িয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার পাশে বসিয়া বলিলাম—"বাসার সকলেই তো মেস ছেড়ে চলে যাবার যোগাড় করছেন।"

ম্লান হাসিয়া অনুকূলবাবু বলিলেন—"তাঁদের তো দোষ দেওয়া যায় না, অজিতবাবু! এ রকম ব্যাপার যেখানে ঘটে, সেখানে কে থাকতে চায় বলুন!—কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না—একে খুন বলা যেতে পারে কি করে? আর যদি খুনই হয়, তাহলে মেসের বাইরের লোকের দ্বারা তো খুন সম্ভব হতে পারে না। প্রথমত, হত্যাকারী উপরে উঠল কি করে? সিঁড়ির দরজা রাত্রিকালে বন্ধ থাকে, এ তো আপনারা সকলে জানেন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, লোকটা কোনও কৌশলে উপরে উঠেছিল—কিন্তু সে অশ্বিনীবাবুর ক্ষুর দিয়ে তাঁকে খুন করল কি করে? এ কি কখনও সম্ভব? সুতরাং বাইরের লোকের দ্বারা খুন হয়নি এ কথা নিশ্চিত। তা হলে বাকি থাকেন কারা?—যাঁরা মেসে থাকেন। এঁদের মধ্যে অশ্বিনীবাবুকে খুন করতে পারে, এমন কেউ আছে কি? অবশ্য অতুলবাবু অল্পদিন হল এসেছেন—তাঁর বিষয়ে আমরা কিছু জানি না—"

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম—ডাক্তারবাবু খাটো করিয়া বলিলেন।

"অতুলবাবু লোকটিকে আপনার কি রকম মনে হয়?"

আমি বলিলাম—"অতুল? না না, এ কখনও সম্ভব নয়। অতুল কি জন্য অশ্বিনীবাবুকে—"

ডাক্তার বলিলেন—"তবেই দেখুন, আপনার মুখ থেকেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, মেসের কেউ এ কাজ করতে পারেন না। তাহলে বাকি থাকে কি?—তিনি আত্মহত্যা করেছেন, এই কথাটাই কি বাকি থেকে যাচ্ছে না?"

"কিন্তু আত্মহত্যা করবারও তো একটা কারণ থাকা চাই।"

"সে কথাও আমি ভেবে দেখেছি। আপনার মনে আছে—কিছুদিন আগে আমি বলেছিলুম যে এ পাড়ায় একটা কোকেনের গুপ্ত সম্প্রদায় আছে।—এই সম্প্রদায়ের সর্দার কে তা কেউ জানে না।"

"হ্যাঁ—মনে আছে।"

ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিলেন—"এখন মনে করুন, অশ্বিনীবাবুই যদি এই সম্প্রদায়ের সর্দার হন?"

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম—"সে কি? তাও কি কখনও সম্ভব?"

ডাক্তার বলিলেন—"অজিতবাবু, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। বরঞ্চ কাল রাত্রে

অশ্বিনীবাবু আমাকে যে-সব কথা বলেছিলেন, তাতে এই সন্দেহই ঘনীভূত হয়—খুব সম্ভব তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। অত্যধিক ভয় পেলে মানুষ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়তে পারে। কে বলতে পারে, হয়তো এই অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন!—ভেবে দেখুন, এ অনুমান কি সঙ্গত মনে হয় না?”

এই অভিনব থিয়োরি শুনিয়া আমার মাথা একেবারে গুলাইয়া গিয়াছিল, আমি বলিলাম—‘কি জানি ডাক্তারবাবু, আমি তো কিছুই ধারণা করতে পারছি না। আপনি বরং আপনার সন্দেহের কথা পুলিশকে খুলে বলুন।”

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—“কাল তাই বলব। এ সমস্যার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।”

দুই তিনটা দিন কোনো রকমে কাটিয়া গেল। মনের একান্ত অশান্তির উপর সি-আই-ডি বিভাগের বিবিধ কর্মচারীর নিরন্তর যাতায়াতে ও সওয়াল-জবাবে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মেসের প্রত্যেকেই পালাই পালাই করিতেছিলেন, কিন্তু আবার পালাইতেও সাহস হইতেছিল না। কি জানি, তাড়াতাড়ি বাসা ছাড়িলে যদি পুলিশ তাঁহাকেই সন্দেহ করিয়া বসে।

বাসারই কোনও ব্যক্তির চারিধারে যে সন্দেহের জাল ধীরে ধীরে গুটাইয়া আসিতেছে, তাহার ইশারা পাইতেছিলাম। কিন্তু সে ব্যক্তি কে, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছিলাম না। মাঝে মাঝে অজ্ঞাত আতঙ্কে বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিতেছিল—পুলিস আমাকেই সন্দেহ করে না তো?

সেদিন সকালে অতুল ও আমি ডাক্তারের ঘরে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলাম। একটা মাঝারি গোছের প্যাকিং কেস্-এ ডাক্তারের ঔষধ আসিয়াছিল।, তিনি বাক্স খুলিয়া সেগুলি সযত্নে বাহির করিয়া আলমারিতে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। প্যাকিং কেসের উপর আমেরিকা ছাপ মারা ছিল ; ডাক্তারবাবু দেশী ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, দরকার হইলেই আমেরিকার কিংবা জার্মানি হইতে ঔষধ আনাইয়া লইতেন। প্রায় মাসে মাসে তাঁহার এক বাক্স করিয়া ঔষধ আসিত।

অতুল খবরের কাগজের অর্ধাংশটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল—“ডাক্তারবাবু, আপনি বিদেশ থেকে ঔষুধ আনান কেন? দেশী ওষুধ কি ভালো হয় না!”

অতুল একটা বড় সুগার-অফ-মিল্কের শিশি তুলিয়া লইয়া তাহার গায়ে লেখা বিখ্যাত বিক্রেতাদের নাম দেখিয়া বলিল—“এরিক এণ্ড হাভেল্। এরাই বুঝি সবচেয়ে ভালো ওষুধ তৈরি করে?”

“হ্যাঁ।”

“আচ্ছা, হোমিওপ্যাথিতে সত্যি সত্যি রোগ সারে? আমার তো বিশ্বাস হয় না। এক ফোঁটা জল খেলে আবার রোগ সারবে কি?”

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“এত লোক যে ওষুধ নিতে আসে, তারা কি ছেলেখেলা করে?”

অতুল বলিল—“হয়তো রোগ আপনিই সারে, তারা ভাবে ওষুধের গুণে সারল। বিশ্বাসেও অনেক সময় কাজ হয় কিনা।”

ডাক্তার শুধু একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। কিয়ৎকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"খবরের কাগজে আমাদের বাসার কথা কিছু আছে না কি?"

"আছে" বলিয়া আমি পড়িয়া শুনাইলাম—"হতভাগ্য অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর হত্যার এখনও কোনো কিনারা হয় নাই। পুলিসের সি-আই-ডি বিভাগ এই হত্যা-রহস্যের তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিছু কিছু তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে, শীঘ্রই আসামী গ্রেপ্তার হইবে।"

"ছাই হবে। ঐ আশা করা পর্যন্ত।" ডাক্তারবাবুর মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ কি! দারোগাবাবু—

দারোগা ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে দুইজন কনস্টেবল। ইনি আমাদের সেই পূর্ব-পরিচিত দারোগা ; কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া একেবারে অতুলের সম্মুখে গিয়া বলিলেন—"আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে। থানায় যেতে হবে। গোলমাল করবেন না, তাতে কোনো ফল হবে না। রামধনী সিং, হ্যাণ্ডকফ লাগাও।" একজন কনস্টেবল ক্ষিপ্র অভ্যস্ত হস্তে কড়াৎ করিয়া হাতকড়া পরাইয়া দিল।

আমরা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। অতুল বলিয়া উঠিল—"এ কি!"

দারোগা বলিলেন—"এ দেখুন ওয়ারেন্ট। অশ্বিনীকুমার চৌধুরীকে হত্যা করার অপরাধে অতুলচন্দ্র মিত্রকে গ্রেফতার করা হল। আপনারা দুজন একে অতুলচন্দ্র মিত্র বলে শনাক্ত করছেন?"

নিঃশব্দে অভিভূতের মতো আমরা ঘাড় নাড়িলাম।

অতুল মৃদু হাসিয়া বলিল—"শেষ পর্যন্ত আমাকেই ধরলেন। আচ্ছা, চলুন থানায়।—অজিত, কিছু ভেবো না—আমি নির্দোষ।"

একটা ঠিকা গাড়ি ইতিমধ্যে বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অতুলকে তাহাতে তুলিয়া পুলিশ সদলবলে চলিয়া গেল।

পাংশুমুখে ডাক্তার বলিলেন—"অতুলবাবুই তা হলে—! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! মানুষের মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই।"

আমার মুখে কথা বাহির হইল না। অতুল হত্যাকারী! এই কয় দিন তাহার সহিত একত্র বাস করিয়া তাহার প্রতি আমার মনে একটা প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার স্বভাবটি এত মধুর যে, আমার হৃদয় এই অল্পকালমধ্যেই সে জয় করিয়া লইয়াছিল। সেই অতুল খুনী! কল্পনার অতীত বিস্ময়ে ক্ষোভে মর্মপীড়ায় আমি যেন দিগভ্রান্ত হইয়া গেলাম।

ডাক্তার বলিলেন—"এই জন্যেই অজ্ঞাত-কুলশীল লোককে আশ্রয় দেওয়া শাস্ত্রে বারণ। কিন্তু তখন কে ভেবেছিল যে লোকটা এতবড় একটা—"

আমার কিছুই ভালো লাগিতেছিল না, উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। স্নানাহার করিবারও প্রবৃত্তি হইল না। ঘরের ওপাশে অতুলের জিনিসপত্র ছড়ানো রহিয়াছে—সেই দিকে চাহিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। অতুলকে যে কতখানি ভালবাসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

অতুল যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে—সে নির্দোষ। তবে কি পুলিশ ভুল করিল! আমি

বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। যে রাত্রে অশ্বিনীবাবু হত হন, সে রাত্রির সমস্ত কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলাম। অতুল মেঝেয় বালিশের উপর কান পাতিয়া ডাক্তারের সহিত অশ্বিনীবাবুর কথাবার্তা শুনিতেছিল। কেন শুনিতেছিল? কি উদ্দেশ্যে? তারপর রাত্রি এগারোটার সময় আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম—একেবারে সকালে ঘুম ভাঙিল। ইতিমধ্যে অতুল যদি—

কিন্তু অতুল গোড়া হইতেই বলিতেছে, এ খুন—আত্মহত্যা নয়। যে স্বয়ং হত্যাকারী, সে কি এমন কথা বলিয়া নিজের গলায় ফাঁসি পরাইবার চেষ্টা করিবে? কিংবা, এমনও তো হইতে পারে যে, নিজের উপর হইতে সন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যেই অতুল এক কথা বলিতেছে, যাহাতে পুলিশ ভাবে যে, অতুল যখন এত জোর দিয়া বলিতেছে এ হত্যা, তখন সে কখনই হত্যাকারী নহে।

এইরূপ নানা চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত উৎপীড়িত মন লইয়া আমি বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলাম, কখনও উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে লাগিলাম। এমনই করিয়া দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল।

বেলা তিনটা বাজিল। হঠাৎ মনে হইল, কোনও উকিলের কাছে গিয়া পরামর্শ লইয়া আসি। এরূপ অবস্থায় পড়িলে কি করা উচিত কিছুই জানা ছিল না, উকিল কাহাকেও চিনি না। যাহা হউক, একটা উকিল খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর হইবে না বুঝিয়া একটা জামা গলাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়িল। দ্বার খুলিয়া দেখি—সম্মুখেই অতুল!

"অ্যাঁ—অতুল!" বলিয়া আমি আনন্দে তাহাকে প্রায় জড়াইয়া ধরিলাম। সে দোষী কি নির্দোষ, এ সন্দেহ মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেল।

রুক্ষ মাথা, শুষ্ক মুখ, অতুল হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ ভাই, আমি। বড্ড ভুগিয়েছে! অনেক কষ্টে একজন জামিন পাওয়া গেল—তাই ছাড়া পেলুম, নইলে আজ হাজত বাস করতে হত। তুমি চলেছ কোথায়?"

একটু অপ্রতিভভাবে বলিলাম—"উকিলের বাড়ি।"

অতুল সস্নেহে আমার হাত চাপিয়া দিয়া বলিল—"আমার জন্যে? তার আর দরকার নেই ভাই! আপাতত কিছুদিনের জন্যে ছাড়ান পাওয়া গেছে!"

দু'জনে ঘরের মধ্যে আসিলাম। অতুল ময়লা জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল—"উঃ, মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে! সমস্ত দিন নাওয়া খাওয়া নেই। তুমিও দেখছি নাওনি খাওনি! বেচারি! চল চল, মাথায় দু ঘটি জল ঢেলে যাহোক দু'টো মুখে দেওয়া যাক! নাড়ি একেবারে চুঁইয়ে গেছে!"

আমি দ্বিধা ঠেলিয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম—"অতুল—তুমি—তুমি—"

"আমি কি? অশ্বিনীবাবুকে খুন করেছি কি না?" অতুল মৃদুকণ্ঠে হাসিল—"সে আলোচনা পরে হবে। এখন কিছু খাওয়া দরকার। মাথাটা ধরেছে দেখছি। যা হোক, স্নান করলেই সেরে যাবে বোধ হয়।"

ডাক্তারবাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অতুল বলিল—"অনুকূলবাবু, ঘষা দোআনির মত আবার ফিরে এলুম। ইংরাজিতে একটা কথা আছে না।—bad penny,

আমার অবস্থাও প্রায় সেই রকম—পুলিসেও নিলে না, ফিরিয়ে দিলে।"

ডাক্তার একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"অতুলবাবু, আপনি ফিরে এসেছেন, খুব সুখের বিষয়। আশা করি, পুলিশ আপনাকে নির্দোষ বুঝেই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার এখানে আর—আপনার— ; বুঝতেই তো পারেন, পাঁচজনকে নিয়ে মেস। এমনিতে সবাই পালাই পালাই করছেন, তার উপর যদি আবার—আপনি—আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনার প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই—কিন্তু—"

অতুল বলিল—"না না, সে কি কথা! আমি এখন দাগী আসামী, আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনারা বিপদে পড়বেন কেন? বলা তো যায় না, পুলিস হয়তো আপনাকেও এডিং অ্যাবেটিং চার্জে ফেলবে।—তা, আজই কি চলে যেতে বলেন?"

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অনিচ্ছাভরে বলিলেন—'না, আজ রাতটা থাকুন ; কিন্তু কাল সকালেই—

অতুল বলিল নিশ্চয়ই। কাল আর আপনাদের বিব্রত করব না। যেখানে হোক একটা আস্তানা খুঁজে নেব—শেষ পর্যন্ত ওড়িয়া হোটেল তো আছেই" বলিয়া হাসিল।

ডাক্তার তখন থানায় কি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। অতুল ভাসা-ভাসা জবাব দিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। ডাক্তার আমাকে বলিলেন—"অতুল মনে মনে ক্ষুন্ন হলেন বুঝতে পারছি—কিন্তু উপায় কি বলুন? একে তো মেসের বদনাম হয়ে গেছে—তার ওপর যদি পুলিসের গ্রেপ্তারী আসামী রাখি—সেটা কি নিরাপদ হবে, আপনিই বলুন!"

বাস্তবিক এটুকু সাবধানতা ও স্বার্থপরতার জন্য তাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমি বিরসভাবে ঘাড় নাড়িলাম, বলিলাম—"তা আপনার মেস, আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন।"

আমি গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নানঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিলাম ; ডাক্তার বিমর্ষমুখে বসিয়া রহিলেন।

স্নানাহার শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতেছি এমন সময় ঘনশ্যামবাবু অফিস হইতে ফিরিলেন। সম্মুখে অতুলকে দেখিয়া তিনি যেন ভূত দেখার মতো চমকিয়া উঠিলেন, পাংশুমুখে বলিলেন—"অতুলবাবু আপনি—আপনি—?"

অতুল মৃদু হাসিয়া বলিল—"আমিই বটে ঘনশ্যামবাবু। আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?"

ঘনশ্যামবাবু বলিলেন—"কিন্তু আপনাকে তো পুলিসে—" এই পর্যন্ত বলিয়া একটা ঢোক গিলিয়া তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

অতুলের চক্ষু কৌতুকে নাচিয়া উঠিল, সে মৃদু কণ্ঠে বলিল—"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশ ছুঁলে বোধ হয় আটান্ন। ঘনশ্যামবাবু আমায় দেখে বিশেষ ভয় পেয়েছেন দেখছি।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অতুল বলিল—"ওহে দেখ তো, দরজার তালাটা লাগছে না।"

দেখিলাম, বিলাতি তালায় কি গোলমাল হইয়াছে। গৃহস্বামীকে খবর দিলাম, তিনি আসিয়া দেখিয়া বলিলেন—"বিলিতি তালায় ঐ মুশকিল, ভালো আছেন তো বেশ আছেন, খারাপ হলে একেবারে এঞ্জিনীয়ার ডাকতে হয়। এর চেয়ে আমাদের দেশি

হুড়কো ভালো। যাহোক, কালই মেরামত করিয়ে দেব।" বলিয়া তিনি নামিয়া গেলেন।

রাত্রে শয়নের পূর্বে অতুল বলিল—"অজিত, মাথা ধরাটা ক্রমেই বাড়ছে—কি করি বল তো?"

আমি বলিলাম—"ডাক্তারের কাছ থেকে এক পুরিয়া ওষুধ নিয়ে খাও না।"

অতুল বলিল—"হোমিওপ্যাথি ওষুধ, তাতে সারবে?—আচ্ছা, দেখা যাক্—হুমো পাখির জোর।"

আমি বললাম—"চল, আমার শরীরটাও ভালো ঠেকছে না।"

ডাক্তার তখন দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসুভাবে মুখের দিকে চাহিলেন। অতুল বলিল—"আপনার ওষুধের গুণ পরীক্ষা করতে এলুম। বড্ড মাথা ধরেছে—কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন?"

ডাক্তার খুশি হইয়া বলিলেন—"বিলক্ষণ! পারি কি বৈ কি! পিত্তি পড়ে মাথা ধরেছে—বসুন, এখনি ওষুধ দিচ্ছি।" বলিয়া আলমারি হইতে নূতন ঔষধ পুরিয়া করিয়া আনিয়া দিলেন—যান, খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে—কাল সকালে আর কিছু থাকবে না।—অজিতবাবু আপনার চেহারাটাও ভালো ঠেকছে না।—উত্তেজনার পর অবসাদ বোধ হচ্ছে—না? শরীর টিস-টিস করছে? বুঝেছি, আপনিও এক দাগ নিন—শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে।"

ঔষধ লইয়া বাহির হইতেছি, অতুল বলিল—"ডাক্তারবাবু ব্যোমকেশ বক্সী বলে কাউকে চেনেন?"

ডাক্তার ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিলেন—"না। কে তিনি?"

অতুল বলিল—"জানি না। আজ থানায় তার নাম শুনলুম। তিনি না কি এই হত্যার তদন্ত করছেন।"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না, আমি তাকে চিনি না।"

উপরে নিজেদের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আমি বলিলাম—"অতুল, এবার সব কথা আমায় বল।"

"কি বলব?"

"তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছো। কিন্তু সে হবে না। সব কথা খুলে বলতে হবে।"

অতুল একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর দ্বারের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"আচ্ছা, বলছি। এসো, আমার বিছানায় বসো। তোমার কাছে যে আর লুকিয়ে রাখা চলবে না, তা বুঝেছিলুম।"

আমি তাহার বিছানায় গিয়া বসিলাম, সে-ও দরজা ভেজাইয়া আমার পাশে বসিল। ঔষধের পুরিয়াটা তখনও আমার হাতে ছিল, ভাবিলাম, সেটা খাইয়া নিশ্চিন্ত মনে গল্প শুনিব। মোড়ক খুলিয়া ঔষধ মুখে দিতে যাইতেছি, অতুল আমার হাতটা ধরিয়া বলিল—"এখন থাক, আমার গল্পটা শুনে নিয়ে তারপর খেয়ো।"

সুইচ তুলিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া অতুল আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিসফিস করিয়া তাহার গল্প বলিতে লাগিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনিয়া চলিলাম। বিস্ময়ে আতঙ্কে মাঝে মাঝে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল।

pathagar.net

পনের মিনিট পরে সংক্ষেপে গল্প সমাপ্ত করিয়া অতুল বলিল—"আজ এই পর্যন্ত থাক, কাল সব খুলে বলব।" রেডিয়ম অঙ্কিত ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—"এখনও সময় আছে। রাত্রি দু'টোর আগে কিছু ঘটছে না, তুমি বরঞ্চ ইতিমধ্যে একটু ঘুমিয়ে নাও, ঠিক সময়ে আমি তোমাকে তুলে দেব।"

রাত্রি তখন বোধ করি দেড়টা হইবে। অন্ধকারে চোখ মেলিয়া বিছানায় শুইয়াছিলাম। শ্রবণেন্দ্রিয় এত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়া ছিল যে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বিছানার উপর দেহের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। অতুল যে জিনিসটি দিয়াছিল, সেটি দৃঢ় মুষ্টিতে ডান হাতে ধরিয়াছিলাম।

হঠাৎ অন্ধকারে কোনো শব্দ শুনিলাম না কিন্তু অতুল আমাকে স্পর্শ করিয়া গেল। ইশারাটা আগে হইতেই স্থির করা ছিল, আমি ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, সময় উপস্থিত হইয়াছে।

তারপর কখন দরজা খুলিল, জানিতে পারিলাম না ; সহসা অতুলের বিছানার উপর ধপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলিয়া উঠিল। লোহার ডাণ্ডা হস্তে আমি তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে আলোর সুইচ ধরিয়া অতুল এবং তাহারই শয্যার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, মরণাহত বাঘ যেমন করিয়া শিকারীর দিকে ফিরিয়া তাকায়, তেমনি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া—ডাক্তার অনুকূলবাবু।

অতুল বলিল—"বড়ই দুঃখের বিষয় ডাক্তারবাবু, আপনার মতো পাকা লোক শেষকালে পাশবালিশ খুন করলেন।—ব্যস! নড়বেন না! ছুরি ফেলে দিন। হ্যাঁ, নড়েছেন কি গুলি করেছি। অজিত, রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দাও তো—বাইরেই পুলিশ আছে।—খবরদার—"

ডাক্তার বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দরজা দিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতুলের বজ্রমুষ্টি তাহার চোয়ালে হাতুড়ির মতো লাগিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল।

মাটিতে উঠিয়া বসিয়া ডাক্তার বলিল—"বেশ, হার মানলুম। কিন্তু আমার অপরাধ কি শুনি।"

"অপরাধ কি একটা ডাক্তার, যে মুখে মুখে বলব। তার প্রকাণ্ড ফিরিস্তি পুলিশ অফিসে তৈরি হয়েছে—ক্রমে প্রকাশ পাবে। আপাতত—"

চার-পাঁচজন কনস্টেবল সঙ্গে করিয়া দারোগা ও ইন্সপেক্টর প্রবেশ করিল।

অতুল বলিল—"আপাতত, ব্যোমকেশ বক্সী সত্যান্বেষীকে আপনি খুন করার চেষ্টা করেছেন, এই অপরাধে পুলিসে সোপর্দ করছি। ইন্সপেক্টরবাবু, ইনিই আসামী।

ইন্সপেক্টর নিঃশব্দে ডাক্তারের হাতে হাতকড়া লাগাইলেন। ডাক্তার বিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"এ ষড়যন্ত্র! পুলিস আর ঐ ব্যোমকেশ বক্সী মিলে আমাকে মিথ্যে মোকদ্দমায় ফাঁসিয়েছে। কিন্তু আমিও দেখে নেব। দেশে আইন আদালত আছে—আমারও টাকার অভাব নেই।"

ব্যোমকেশ বলিল—'তা তো নেই-ই। এত কোকেন বিক্রির টাকা যাবে কোথায়!"

বিকৃত মুখে ডাক্তার বলিল—"আমি কোকেন বিক্রি করি তার কোনো প্রমাণ আছে।"

"আছে বৈকি ডাক্তার! তোমার সুগার-অফ-মিল্কের শিশিতেই তার প্রমাণ আছে।"

জোঁকের মুখে নুন পড়িলে যেমন হয়, ডাক্তার মুহূর্ত মধ্যে তেমনই কুকড়াইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, শুধু নির্নিমেষ চক্ষু দু'টা ব্যোমকেশের উপর শক্তিহীন ক্রোধে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার মনে হইল এ যেন আমার সেই সাদাসিধা নির্বিরোধ অনুকূলবাবু নহে, একটা দুর্দান্ত নরঘাতক গুণ্ডা ভদ্রতার খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহারই সহিত এতদিন পরম বন্ধুভাবে কাল কাটাইয়াছি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কি ওষুধ আমাদের দু'জনাকে দিয়েছিলে ঠিক করে বল দেখি ডাক্তার? মর্ফিয়ার গুঁড়ো—না? বলবে না? বেশ, বোলো না। কেমিক্যাল পরীক্ষায় ধরা পড়বেই।" একটা চুরুট ধরাইয়া বিছানায় আরাম করিয়া বসিয়া বলিল—"দারোগাবাবু এবার আমার এস্তালা লিখুন।

ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট লিপিবদ্ধ হইলে পর ডাক্তারের ঘর খানাতল্লাশ করিয়া দুটি বড় বড় বোতলে কোকেন বাহির হইল। ডাক্তার সেই যে চুপ করিয়াছিল, আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে নাই। অতঃপর তাহাকে বমাল সমেত থানায় রওনা করিয়া দিতে ভোর হইয়া গেল। তাহাদের চালান করিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল—'এখানে তো সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। চল আমার বাসায়—সেখানে গিয়ে চা খাওয়া যাবে।"

হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ির তেতলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দ্বারের পাশে পিতলের ফলকে লেখা আছে—

শ্রীব্যোমকেশ বক্সী

সত্যান্বেষী

ব্যোমকেশ বলিল—"স্বাগতম্! মহাশয় দীনের কুটিরে পর্দাপণ করুন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"সত্যান্বেষীটা কি?"

"ওটা আমার পরিচয়। ডিটেক্‌টিভ কথাটা শুনতে ভালো নয়, গোয়েন্দা শব্দটা শুনতে আরও খারাপ। তাই নিজের খেতাব দিয়েছি—সত্যান্বেষী। ঠিক হয়নি?"

সমস্ত তেতলাটা ব্যোমকেশের—গুটি চার-পাঁচ ঘর আছে ; বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"একলাই থাক বুঝি?"

"হ্যাঁ। সঙ্গী কেবল ভৃত্য পুঁটিরাম।"

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—দিব্যি বাসাটি। কত দিন এখানে আছ?"

"প্রায় বছরখানেক—মাঝে কেবল কয়েক দিনের জন্যে তোমাদের বাসায় স্থান পরিবর্তন করেছিলুম।"

ভৃত্য পুঁটিরাম তাড়াতাড়ি স্টোভ্ জ্বালিয়া চা তৈয়ার করিয়া আনিল। গরম পেয়ালায় চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"আঃ! তোমাদের মেসে ছদ্মবেশে ক'দিন মন্দ কাটল না। ডাক্তার কিন্তু শেষের দিকে ধরে ফেলেছিল।—দোষ অবশ্য আমারই!"

"কি রকম?"

"পুলিশের কাছে জানালার কথাটা বলেই ধরা পড়ে গেলুম—বুঝতে পারছ না? ঐ জানালা দিয়েই অশ্বিনীবাবু—"

"না না, গোড়া থেকে বল।"

চায়ে আর এক চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল—"আচ্ছা, তাই বলছি। কতক তো কাল রাত্রেই শুনেছ—বাকিটা শোন। তোমাদের পাড়ায় যে মাসের পর মাস ক্রমাগত খুন হয়ে চলেছিল, তা দেখে পুলিসের কর্তৃপক্ষ বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। এক দিকে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, অন্য দিকে কাগজ ওয়ালারা পুলিসকে ভিতরে-বাইরে খোঁচা দিয়ে দিয়ে আরও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এইরকম যখন অবস্থা, তখন আমি গিয়ে পুলিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলুম, বললুম—'আমি একজন বে সরকারী ডিটেক্‌টিভ, আমার বিশ্বাস আমি এই খুনের কিনারা করতে পারব।' অনেক কথাবার্তার পরই কমিশনার সাহেব আমাকে অনুমতি দিলেন ; শর্ত হল, তিনি আর আমি ছাড়া এ কথা আর কেউ জানবে না।

"তারপর তোমাদের বাসায় গিয়ে জুটলুম। কোনও অনুসন্ধান চালাতে গেলে অকুস্থানের কাছেই base of operations থাকা দরকার, তাই তোমাদের মেসটা বেছে নিয়েছিলুম। তখন কে জানত যে, বিপক্ষ দলেরও base of operations ঐ একই জায়গায়!

"ডাক্তারকে গোড়া থেকেই বড্ড বেশি ভালোমানুষ বলে মনে হয়েছিল। এবং কোকেনের ব্যবসা চালাতে গেলে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সেজে বসা যে খুব সুবিধাজনক, সে-কথাও মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। কিন্তু ডাক্তারই যে নাটের গুরু, এ সন্দেহ তখনও হয়নি!

"ডাক্তারকে প্রথম সন্দেহ হল, অশ্বিনীবাবু মারা যাবার আগের দিন। মনে আছে বোধহয়, সেদিন রাস্তার উপর একজন ভাটিয়ার লাশ পাওয়া গিয়েছিল। ডাক্তার যখন শুনলেন যে, তাঁর ট্যাঁকের গেঁজে থেকে এক হাজার টাকার নোট বেরিয়েছে, তখন তার মুখে মুহূর্তের জন্য এমন একটা ব্যর্থ লোভের ছবি ফুটে উঠল যে, তা দেখেই আমার সমস্ত সন্দেহ ডাক্তারের ওপর গিয়ে পড়ল।

"তারপর সন্ধ্যাবেলায় অশ্বিনীবাবুর আড়ি পেতে কথা শোনার ঘটনা। আসলে, অশ্বিনীবাবু আমাদের কথা শুনতে আসেননি, তিনি এসেছিলেন ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইতে। কিন্তু আমরা রয়েছি দেখে তাড়াতাড়ি যা হয় একটা কৈফিয়ত দিয়ে চলে গেলেন।

"অশ্বিনীবাবুর ব্যবহারে আমার মনে আবার ধোঁকা লাগল, মনে হল হয়তো তিনিই আসল আসামী। রাত্রিতে মেঝেয় কান পেতে যা শুনলাম, তাতেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হল না। শুধু এইটুকু বুঝলুম যে, তিনি ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখেছেন। তারপর সেরাত্রে যখন তিনি খুন হলেন, তখন আর কোনও কথাই বুঝতে বাকি রইল না। ডাক্তার যখন সেই ভাটিয়াকে রাস্তার ওপর খুন করে, দৈবক্রমে অশ্বিনীবাবু নিজের জানালা থেকে সেই দৃশ্য দেখে ফেলেছিলেন। আর সেই কথাই তিনি গোপনে ডাক্তারকে বলতে গিয়েছিলেন।

"এখন ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পারছ? ডাক্তার কোকেনের ব্যবসা করত, কিন্তু কাউকে জানতে দিত না, সে এই কাজের সর্দার! যদি কেউ দৈবাৎ জানতে পেরে যেত, তাকে তৎক্ষণাৎ খুন করত। এইভাবে সে এতদিন নিজেকে বাঁচিয়ে এসেছে।

"ঐ ভাটিয়াটা সম্ভবত ডাক্তারের দালাল ছিল, হয়তো তারই মারফত বাজারে কোকেন সরবরাহ হত। এটা আমার অনুমান, ঠিক না হতেও পারে। সে-দিন রাত্রে সে ডাক্তারের কাছে এসেছিল, কোনও কারণে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। হয়তো লোকটা ডাক্তারকে blackmail করবার চেষ্টা করে—পুলিসের ভয় দেখায়। তার পরেই—যেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, অমনই ডাক্তারও পিছ্ন পিছ্ন গিয়ে তাকে শেষ করে দেয়।

"অশ্বিনীবাবু নিজের জানলা থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেলেন এবং ঘোর নির্বুদ্ধিতারবশে সে-কথা ডাক্তারকেই বলতে গেলেন।

"তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল, জানি না। তিনি ডাক্তারের কাছে উপকৃত ছিলেন, তাই হয়তো তাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন। ফল হল কিন্তু ঠিক তার উল্টোটা। ডাক্তারের চোখে তাঁর আর বেঁচে থাকবার অধিকার রইল না। সেই রাত্রেই কোনও সময় যখন তিনি ঘর থেকে বেরুবার উপক্রম করলেন, অমনই সাক্ষাৎ যম তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

"আমাকে ডাক্তার গোড়ায় সন্দেহ করেছিল কি না বলতে পারি না, কিন্তু যখন আমি পুলিসকে বললুম যে ঐ জানলাটাই অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর কারণ, তখন সে বুঝলে, আমি কিছু-কিছু আন্দাজ করেছি। সুতরাং আমারও ইহলোক ত্যাগ করবার খাঁটি অধিকার জন্মালো। কিন্তু ইহলোক ত্যাগ করবার জন্য আমি একেবারে ব্যগ্র ছিলুম না। তাই অত্যন্ত সাবধানে দিন কাটাতে লাগলুম।

"তারপর পুলিস এক মস্ত বোকামি করে বসল আমাকে গ্রেপ্তার করে। যা হোক, কমিশনার সাহেব এসে আমাকে খালাস করলেন, আমি মেসে ফিরে এলুম। ডাক্তার তখন স্থির বুঝলে যে, আমি গোয়েন্দা ;—কিন্তু সে ভাব গোপন করে আমাকে রাত্রির জন্যে মেসে থাকতে দিয়ে ভারি উদারতা দেখিয়ে দিলে। উদারতার আড়ালে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল—কোনও রকমে আমাকে খুন করা। কারণ, তার বিষয়ে আমি যত কথা জানতুম, এত আর কেউ জানত না।

"ডাক্তারের বিরুদ্ধে তখন পর্যন্ত কিন্তু সত্যিকারের কোনও প্রমাণ ছিল না। অবশ্য তার ঘর খানাতল্লাশি করে কোকেন বার করে তাকে জেলে দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু সে যে একটা নিষ্ঠুর খুনী, এ কথা কোনও আদালতে প্রমাণ হত না। তাই আমিও তাকে প্রলোভন দেখাতে শুরু করলুম। দরজার তালায় পেরেক ফেলে দিয়ে আমিই সেটাকে খারাপ করে দিলুম। ডাক্তার খবর পেয়ে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল—আমরা রাত্রে দরজা বন্ধ করে শুতে পারব না।

"তারপর আমরা যখন ওষুধ নিতে গেলুম, তখন সে সাক্ষাৎ স্বর্গ হাতে পেলে। আমাদের দু'জনকে দু'পুরিয়া গুঁড়ো মর্ফিয়া দিয়ে ভাবলে, আমরা তাই খেয়ে এমন ঘুমই ঘুমব যে, সে নিদ্রা মহানিদ্রায় পরিণত হলেও জানতে পারব না।

"তার পরেই ব্যাঘ্র এসে ফাঁদে পা দিলেন। আর কি?"

আমি বলিলাম—"এখন উঠলুম ভাই। তুমি বোধ হয় উপস্থিত ওদিকে যাচ্ছ না?"

"না। তুমি কি বাসায় যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"বাঃ! কেন আবার! বাসায় যেতে হবে না?"

"আমি বলছিলুম কি, ও বাসা তো তোমাকে ছাড়তেই হবে, তা আমার এখানে এলে হত না? এ বাসাটা নেহাৎ মন্দ নয়।"

আমি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—"প্রতিদান দিচ্ছ বুঝি?"

ব্যোমকেশ আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—"না ভাই, প্রতিদান নয়। মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে এক জায়গায় না থাকলে আর মন টিকবে না। এই ক'দিনেই কেমন একটা বদ-অভ্যাস জন্মে গেছে।"

"সত্যি বলছ?"

"সত্যি বলছি।"

"তবে তুমি থাকো, আমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসি।'

ব্যোমকেশ প্রফুল্লমুখে বলিল—"সেই সঙ্গে আমার জিনিসগুলো আনতে ভুলো না যেন।"

অ্যাকসিডেন্ট্

জরাসন্ধ

ডাউন মথুরা এক্সপ্রেস ঘণ্টা চারেক লেট। হাওড়া পৌঁছবার কথা ভোরবেলায়। ব্যাণ্ডেল আসতেই বাজল নটা। কাগজওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল। একখানা বাংলা কাগজ কিনলাম। ভাঁজ খুলে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি, নিজের নামটা চোখে পড়তে থেমে যেতে হল। পড়ে দেখলাম, কাল রাতে আমার মৃত্যু হয়েছে।

চশমাটা বেশ করে মুছে নিয়ে আর একবার পড়লাম। না, ভুল করিনি। নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, 'হাটখোলা নিবাসী বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী শ্রীগোলোকচন্দ্র সান্যাল গত রাত্রে মথুরা এক্সপ্রেস-যোগে কলিকাতা আসিতেছিলেন। পথি-মধ্যে ট্রেন হইতে পড়িয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার আত্মার সদগতি হউক।'

বর্ণনা নির্ভুল। আমারি নাম গোলোক সান্যাল। নিবাসও হাটখোলা। বস্ত্র-ব্যবসায়ে কিছুদিন হল "বিখ্যাত" হয়েছি, সে কথাও ঠিক। যে রাস্তা ধরে বিখ্যাত হয়েছি সেটা ঠিক 'সাদা' রাস্তা নয়। সেই জন্যেই বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় আমার আত্মার সদগতি কামনা করেছেন।

প্রথমটা বেশ মজা লাগল। মন্দ কি? নিজের মৃত্যুসংবাদ নিজেই পড়ছি। সে সুযোগ ক'জন পায়? হঠাৎ গা কাঁটা দিয়ে উঠল। খবরটা সত্যি নয় তো? রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। কে জানে তখন যদি দেহান্তর হয়ে গিয়ে থাকে? এই যে আমি শ্রীগোপাল সান্যাল, মথুরা এক্সপ্রেসের একখানা ক্লাশ টু কামরায় বসে কাগজ পড়ছি, এ হয়তো ঠিক কালকের "আমি" নই। নাড়ি দেখলাম ; ঠিক আছে। নিঃশ্বাস? তাও বইছে। হাতে চিমটি কেটে দেখলাম, রীতিমত লাগছে। গাড়িতে রোদ এসে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, ছায়াও পড়ছে। তবে?

পাশের বেঞ্চিতে যে ভদ্রলোক ছিলেন, বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, কি ব্যাপার? আপনাকে যেন একটু চঞ্চল মনে হচ্ছে?

বসে পড়ে বললাম, না, না। ও কিছু না। অন্য লোককে কেমন করে বলি যে আমি মরে গেছি, আর খবরের কাগজে বেরিয়েছে সেই খবর? মনে পড়ল, অনেক দিন আগে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। কে এক যাদব চক্রবর্তী ; বেজায় কৃপণ। বাড়ির লোকে রটিয়ে দিল, তিনি মারা গেছেন। বেচারী যত বলে,—আরে এই তো আমি বেঁচে আছি,—কেউ স্বীকার করে না। আমার কি সেই দশা হল? কিন্তু আমি তো কৃপণ নই। এই সেদিনও পাড়ায় শখের থিয়েটারে ২০০ টাকা দিয়েছি। গিন্নীর হাতে ভারি আর্মলেট। হরিভক্তি-প্রদায়িণী সভা খোলের দাম বলে নিয়ে গেল পঞ্চাশ টাকা। নাঃ, আমি দু-নম্বর যাদব চক্রবর্তী হতে রাজী নই। এ-সব এই কাগজওয়ালার ধাপ্পা। নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে। আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো। আমার নাম গোলোক সান্যাল।

হাওড়ায় পৌঁছে বাড়ী যাওয়া আর হল না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ছুটলাম সেই কাগজওয়ালার অফিসে।

pathagar.net

একটা প্রকাণ্ড টেবিল। পুরনো বনাতে মোড়া। জায়গায় জায়গায় কালির দাগ। মাঝে মাঝে ছেঁড়া। একরাশ কাগজপত্তর ছড়ানো তার ওপর। একদিকের চেয়ারে বসে যে ভদ্রলোক একমনে লিখে চলেছেন, তাঁর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। আমার দিকে একবার চোখ তুলে বললেন, বসুন। বলেই আবার ডুবে গেলেন লেখার মধ্যে। খানিকক্ষণ বসে থেকে বললাম, আপনিই কি সম্পাদক?

—সহকারী সম্পাদক।

—আপনাদের আসল ব্যবসাটা কি বলুন তো?

এবার তিনি চোখ তুললেন। কাগজখানা তাঁর সামনে ফেলে দিয়ে বললাম, এ সব কি হচ্ছে? একটা জ্যান্ত মানুষকে মড়া বানিয়ে কী কাজ হাসিল করতে চান?

সহকারী সম্পাদকের নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়ে হাঁ-টা বড় হয়ে গেল। মোটা চশমার আড়ালে চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে উঠল। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। মুচকি হেসে মিহি গলায় বললেন, দেখুন, প্রথমত আপনিই যে গোলোক সান্যাল সে কথা এখনো প্রমাণ হয় নি। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে আমাদের সংবাদ-দাতা এ খবরটা কোত্থেকে পেয়েছেন।

তৃতীয়ত—

বাধা দিয়ে বললাম, থাক, আর তৃতীয়তে দরকার নেই। এই নিজস্ব সংবাদ-দাতার ঠিকানাটা দিন। বোঝাপড়া ঐখানেই করে নেবো।

সহকারী মহাশয় গলাটা আরো মিহি করে বললেন, আজ্ঞে, সংবাদ-দাতার নাম ঠিকানা আমরা প্রকাশ করতে পারি না।

—কেন?

—ওটা সাংবাদিক রীতি নয়।

—তার মানে, ঐ সব সংবাদ-দাতা-টাতা সব ভুয়ো। আজগুবি খবরগুলো বুঝি এই বনাত-ছেঁড়া টেবিলে বসেই তৈরী হয়।

কোন জবাব এল না। কাগজ তুলে নিয়ে বললাম, এই দামী খবরটা কোত্থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেটুকু বলবেন কি?

—ঐ কাগজে যেটুকু আছে, ওর বেশী আমার কিছু বলবার নেই।

কাগজটা খুলে দেখলাম খবর এসেছে ধানবাদ থেকে।

ঝোঁকের মাথায় কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল, আসলে দেখলাম তার চেয়ে অনেক কঠিন। ধানবাদের মত জায়গায় খবর কাগজের নিজস্ব সংবাদ-দাতা খুঁজে বের করা গোয়েন্দা বিভাগের পক্ষেও অসম্ভব। কিন্তু এসে যখন পড়েছি তখন কিছু একটা না করে ফিরেই বা যাই কি করে? একদিন এ-পাড়া একদিন ও-পাড়া ধরনা দেওয়া শুরু করলাম। বাংলা কাগজখানার নামই কেউ জানে না, তার সংবাদদাতার খোঁজ দেওয়া তো দূরের কথা। একটা উড়ো খবর পেয়ে বাইরেও ঘুরে এলাম দিন দুই। এমনি করে কেটে গেল ছ-সাত দিন। শরীরে আর কুলোয় না। পকেটও পাতলা হয়ে এসেছে। ফিরে যাব মনে করেই শেষটায় ইস্টেশনে ওয়েটিং রুমে এসে আড্ডা নিয়েছি। দেখলাম একজন খদ্দর-ধারী চশমা পরা ছোকরা রোজ কলকাতার খবরকাগজগুলো বুঝে নিতে আসে। গাড়ি আসতেই চেপে ধরলাম তাকে।

—আপনিই কি অমুক কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা?

লোকটি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বারকয়েক তাকিয়ে নিয়ে বললে, কেন বলুনতো?

বুঝলাম, নরম রাস্তা ধরতে হবে। একেবারে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, বিদেশী লোক। বড্ড বিপদে পড়েছি ভাই, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। আপনিই তাহলে—

—হ্যাঁ, আমিই এখানকার রিপোর্টার। বলুন কি করতে হবে আমাকে?

—ওঃ, বাঁচালেন মশাই। এই খবরটা দেখুন। এই গোলোক সান্যাল আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ইনি কি করে মারা গেলেন, দেহটারই বা কি ব্যবস্থা হল? অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা—বিশেষ করে ওঁর বাড়ির সবাই। ভদ্রলোক বললেন, সব খবর আমি আপনাকে দিতে পারব না। রেল পুলিশে খবর নিন। মৃতদেহ এখানেই আনা হয়েছিল। ময়না তদন্তও হয়েছে, এই পর্যন্ত জানি। নামধাম সব ওদের কাছ থেকেই পেয়েছি।

পরদিন রেল-পুলিশের অফিসে হানা দিলাম। দারোগাবাবু মন দিয়ে আমার সমস্ত কথা শুনে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে এবং আপনার এ খবরে কী দরকার?

—আমি গোলোক সান্যালের নিকট আত্মীয় ; এবং সেই জন্যেই এ খবরে আমার

বিশেষ দরকার।

—কিন্তু আমরা তো সেই দিনই তার বাড়ির ঠিকানায় তার করে সব জানিয়ে দিয়েছি।

নিজের অগোচরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কি বললেন! বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছেন?

—তা ছাড়া আর কি করা যেত বলুন? অন্যায় হয়েছে কিছু?

—শুধু অন্যায়? সর্বনাশ! চরম সর্বনাশ করেছেন আপনি। দারোগার চোখে মুখে ঘোর সন্দেহের ছায়া পড়ল। বললেন, আপনার নামটা জানতে পারি?

নাম মুখে এসে গিয়েছিল ; সামলে নিলাম। সত্যি পরিচয় দিয়ে লাভ হত না। বিশ্বাস করবে না। বললাম, নাম দিয়ে আর কি হবে আপনার?

জানতে ইচ্ছে হয় বৈকি একটু। নতুন আলাপ হল।

হঠাৎ যা মনে এল বলে ফেললাম,—আমার নাম গোবিন্দলাল সামন্ত।

দারোগাবাবু হেসে বললেন, দেখুন বাবুসাব, আমরা পুলিশের লোক, বুদ্ধিশুদ্ধি কম। কিন্তু যতটা কম আপনারা মনে করেন, ঠিক ততটা নয়। সান্যালের আত্মীয় হতে হলে আর যাই হোক, সামন্ত হওয়া চলে না। নামটা বদলে দিন। নইলে অনেক ফ্যাসাদ। জানেন তো পুলিশের লোক আমরা।

এর পরে আর ধৈর্য রাখা সম্ভব হল না। বললাম, তা জানি বৈকি? আপনাদের বিদ্যার কি আর অন্ত আছে? একটা জ্যান্ত মানুষকে মড়া বানিয়েই শুধু ক্ষান্ত হন নি, মরার খবরটা বেশ ঘটা করে তার বাড়িতে জানিয়েও বসে আছেন।

দারোগাবাবু এবার চটলেন। রুক্ষভাবে বললেন, এ সব আপনি কি বলছেন?

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ঠিকই বলছি। আমার আসল নামটা শুনলে বিশ্বাস করবেন? যে লোকটাকে নিয়ে আপনারা এত কাণ্ড করছেন, আমিই সেই গোলোক সান্যাল।

চলে যাচ্ছিলাম। দারোগাবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান। এত কাণ্ডের পর কি আর আপনাকে ছেড়ে দেওয়া যায়? উঁহুঁ। এটা মোটেই সাধারণ অ্যাকসিডেন্ট্ নয়। এর মধ্যে রহস্য আছে। বলে এক হাঁক দিলেন, এই, কৌন হ্যায়? একজন সিপাই ছুটে এল। দারোগা হুকুম দিলেন, উনকো হাজতমে লে যাও। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। কিছু মনে করবেন না। কাল আবার দেখা হবে। নমস্কার।

আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি। না হয় ছেপেছিল একটা মৃত্যুসংবাদ। সত্যি সত্যিই তো আর মরিনি। শুধু কাগজে কলমে মরা। কোনো ক্ষতি ছিল না। আর, এবার যে সত্যিই মরতে বসেছি। দুরাত ধরে ছারপোকা আর মশা মিলে যে রক্তটা নিয়েছে, এই হাজত-ঘর থেকে যে জ্যান্ত ফিরে যেতে পারব, এমন ভরসা নেই। তাছাড়া দুটো দিন পেটে কিছু পড়েনি। দারোগাবাবু খাবার পাঠাতে ত্রুটি করেন নি। ত্রুটি আমারই, সেটা মুখে তুলতে পারি নি। ছেঁড়া কম্বলের উপরে একরকম অসাড় হয়ে পড়েছিলাম। একটি পুলিশ এসে বলল আমাকে এবার জেলে যেতে হবে।

যেখানে হোক যাবার জন্যে মনটা অত্যন্ত ছটফট করছিল। বললাম, বেশ চল। জেলেই চল।

রাস্তা দিয়ে চলেছি। হাতে হাত-কড়া, কোমরে দড়ি। তারই একটা দিক পুলিশের

হাতে। সবাই তাকিয়ে দেখছে। কেউ কেউ দাঁত দেখিয়ে হাসছে, দুধার থেকে কানে আসছে—চোট্টা হ্যায়...নামকরা পকেট-মার...কি রকম ডাকাত দেখেছ?

চোখে জল এসে পড়ল খানিকটা। পাশ দিয়ে একখানা গাড়ি যাচ্ছিল। যে লোকটি ভিতরে বসে, মনে হল যেন চেনা মুখ। সেও ঝুঁকে পড়ে দেখল, মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু তার চোখ এড়ানো গেল না।

—এই, রোখো, রোখো—

গাড়ি থামিয়ে ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ধানবাদের কয়লা-খনির মালিক বংশীপ্রসাদ, আমার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু। চোখের জল এবারে আর বাধা মানল না, অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল।

—ব্যাপার কি সানিয়েল বাবু?

ব্যাপার বলবার মত অবস্থা তখন আমার নয়। বংশীপ্রসাদের গাড়িতে থানায় ফিরে এলাম এবং খানিকটা সামলে নিয়ে মোটামুটি ঘটনাটা খুলে বললাম। বংশী গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে গেল, এবং কিছুক্ষণ পরেই সেই দারোগাটি ছুটতে ছুটতে এলেন। একগাল হেসে, একরাশ ক্ষমা চেয়ে এবং একবোঝা বিনয় দেখিয়ে এমন আদর-আপ্যায়ন শুরু করলেন যে, আমার কেবলই মনে হতে লাগল, কখন এর হাত থেকে রেহাই পাব। অবিশ্যি দেরী হল না। বংশীর গাড়িতে যেতে হল তার বাড়ি, সেখান থেকে কিছু মুখে দিয়েই সোজা ইস্টিশনে।

তার-বেগে ট্যাক্সি ছুটছে। বাড়ির কাছে এসে কীর্তনের সুর কানে এল। মনে হল যেন আমার বাড়ি থেকেই। মনটা বিষিয়ে উঠল। স্ফূর্তি করবার আর সময় পেলেন না বাবাজিরা! কুলাঙ্গার কোথাকার!

গেটে গাড়ি থামল। একি! এত লোকজন কিসের? দুধারে কলাগাছ। আগা-গোড়া গেটটা ফুল, লতাপাতা দিয়ে সাজানো। বাড়ি ভুল করিনি তো? নাঃ। ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম, একেবারে চক্ষুস্থির!

সামনের মাঠটার প্রায় সবখানি জুড়ে জমকালো চাঁদোয়া খাটানো। তার নীচে একেবারে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। মেহগিনির খাট, তার ওপরে দামী বিছানা, চৌকি, আসন, বোঝা বোঝা বাসন পত্তর,—রুপোর সেট, কাঁসার সেট,—ছাতা, জুতো, কার্পেট, সতরঞ্চি, আরো কত কি! হঠাৎ চোখে পড়ল তারি মধ্যে বসে আমার বড় শ্রীমান—মাথা কামানো, গলায় উত্তরীয়। পাশে পুরোহিত। এবার আর বুঝতে বাকী রইল না, যে এটা হচ্ছে শ্রাদ্ধবাসর। শ্রাদ্ধ হচ্ছে আমারই। ছেলেরা বেশ ঘটা করেই করছে, যেমনটা ঠিক হয়ে থাকে অন্য পাঁচজন বড়লোকের বেলায়।

কীর্তন আগেই থেমে গিয়েছিল। যে যেখানে ছিল যেন পাথর হয়ে গেছে। ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। পুরুত ঠাকুর তার হাতে এক কুশী জল দিয়ে বললেন, ভীত হয়ো না বৎস! নিশ্চয়ই আমাদের অনুষ্ঠানে কোনো গুরুতর ত্রুটি হয়েছে। তোমার স্বর্গত পিতার প্রেতাত্মা কুপিত হয়েছেন। এই জল সিঞ্চন কর। বল, স্নাত্বাপিত্বা সুখীভব।

হঠাৎ মাথায় খুন চেপে গেল। প্রেতাত্মা! লাথির পর লাথি মেরে সব একাকার করে

দিলাম। প্রেতাত্মা! হটাও সব। চারদিকে একটা হুলস্থূল পড়ে গেল। দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে গেল অতবড় শ্রাদ্ধবাসর। বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখলাম—সে আর এক কাণ্ড। হল্ ঘরের মেঝের উপর গিন্নী পড়ে আছেন। পরনে সাদা থান, গয়না নেই, পুরোপুরি বিধবার বেশ। দু'-তিন জনে মাথায় জল ঢালছে। জ্ঞান নেই।

এমন সময় খবর এল পুলিশের কোন সাহেব এসেছেন দেখা করতে। ফিরে এলাম বৈঠকখানায়।

—কি চাই বলুন?

—আপনার সম্বন্ধে যে ভুল খবর বেরিয়েছিল সেজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। সব কাগজে প্রতিবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—সে তো দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?

পুলিশ সাহেব একখানা নাম-ছাপানো কার্ড বের করে বললেন, এটা আপনার কার্ড?

—হ্যাঁ, আমারই কার্ড। আপনারা ওটা কোথায় পেলেন?

—২২ তারিখে ডাউন মথুরা এক্সপ্রেস থেকে নামতে গিয়ে একজন লোক হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। তার মানিব্যাগে নাম ঠিকানা লেখা এই কার্ডখানা ছিল।

—ওঃ! সেই মারোয়াড়ী ভদ্রলোক! এলাহাবাদে তার সঙ্গে আলাপ। আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছিল। একখানা কার্ড দিলাম। মানিব্যাগেই যেন রাখল মনে হচ্ছে। আহা! লোকটি মারা গেছে।

pathagar.net

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তারপর কার্ড দেখেই বুঝি আপনারা আমার মরার খবরটা চারদিকে ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন?

পুলিশ সাহেব কথা বললেন না। জিজ্ঞেস করলাম, ভুলটা ধরা পড়ল কি করে?

—ময়না তদন্তে ডাক্তারের সন্দেহ হল, মৃত ব্যক্তি বোধ হয় মারোয়াড়ী। আরো তদন্ত চলল। তারপর ধানবাদ থানায়—

—তার সাক্ষী তো আমি নিজেই। কিন্তু এই ভুলটা আগে জানতে পারলে নিজের শ্রাদ্ধটা আর নিজের চোখে দেখতে হত না। আর এতগুলো টাকার শ্রাদ্ধও এড়ানো যেত।

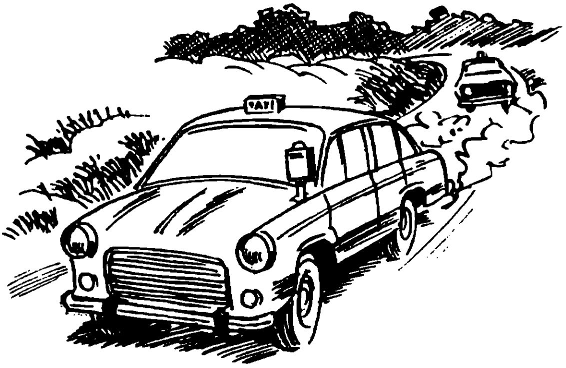

কৃষ্ণধাম কথা

বিমল কর

বাসটা ঠিক জায়গাতেই নামিয়ে দিল। রাস্তা ঘেঁষে বটগাছ। একটার গায়ে গায়ে আরেকটা। বাসস্টপের নাম ‘জোড়া বটতলা’। বৃষ্টি পড়ছে তখনও। তবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আকাশে মেঘ। চেহারা দেখে মনে হয় সারা দিনেও এই বাদলা ঘুচবে না। আশপাশে গাছগাছালি, ঝোপ, জংলা লতাপাতা। একপাশে একটা ভাঙা মন্দির। অন্যপাশে, সামান্য তফাতে, কোন এক মিশনারিদের অনাথালয়। চারদিকে পাঁচিল তোলা। ফটকটাও দেখা যায়।

বটগাছের তলায় ছাতা হাতে যশোদাজীবন দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরনে ধুতি, মালকোঁচা মেরে পরেছেন যেন। গায়ে একরঙা শার্ট। পায়ে বর্ষা-জুতো, আজকাল বাজারে যা দেখা যায়।

কিকিরা দেখতে পেয়েছিলেন যশোদাকে।

“আমি আধঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে আছি”, যশোদা কয়েক পা এগিয়ে এলেন। “বাসটা তা হলে পেয়েছেন! দিনটা বড় খারাপ আজ।”

কিকিরা বললেন, "কেন, সময়েই তো পৌঁছে গেলাম। ক'টা বাজে এখন? দশটার বেশি নাকি?"

"না, না, ওইরকমই হবে। ...এদিককার বাস কম। গোটা তিন-চার। খারাপ হয়ে গেলে তাও কমে যায়। তার ওপর দিন বুঝে বাস চালায়। আজ দিনটা একেবারে পুরো বর্ষার মতন। আসুন—।"

কিকিরা তারাপদকে ইশারা করলেন এগিয়ে যেতে। যশোদাকে বললেন, "কত দূর যেতে হবে?"

"বেশি নয়। মিনিটবিশেক হাঁটতে হবে। রাস্তা ভাল নয়, কাঁচা। কাদায় পা ডুবে যায়..."

"ঠিক আছে চলুন। তা যশোদাবাবু, বাসটা থেকে আমরা দু'জন মাত্র নামলাম এখানে। আর তো কেউ নামল না।"

"ওইরকমই। এক-আধজনই নামে এখানে। হাটের দিনে অবশ্য ভিড় হয়। ওই ওপাশে মঙ্গলঘাটা বলে একটা জায়গায় হাট বসে রবিবার। পাইকাররা আসে। অন্যদিন ভোঁ-ভা।"

"অনাথালয়টা কাদের?"

"মিশনারি সাহেব বাবুদের পয়সায় তৈরি। শুনেছি কোন এক নামকরা বিদেশি মেমসাহেব এদিকে একবার বেড়াতে এসে টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যরাও টাকা দেয়। ওদের নিজেদের একটা পুরনো জিপগাড়ি আছে। কাজেকর্মে বাইরে যায়।"

কিকিরারা হাঁটতে শুরু করেছিলেন। কাঁচা রাস্তা। হাত-কয়েক চওড়া মাত্র। জল কাদায় পা রাখা দায়। মাঝে মাঝে ইটের টুকরো, ভাঙা পাথরের চাঁই ফেলা রয়েছে। দু'পাশে নিচু জমি। কোথাও কোথাও আধখাপচাভাবে চাষ হয়েছে, কোথাও সবজি বাগান, ছোট একটা নার্সারিও চোখে পড়ল।

তারাপদ তেমন খুশি হচ্ছিল না। কিকিরা দিন-দিন যেন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছেন। কোথাকার কে হীরালাল বলে এক ভদ্রলোক দিন চার-পাঁচ হল তাঁর বাগান থেকে উধাও। ভদ্রলোক নাকি বড়সড় কারবারি, কলকাতা শহরে তিনটে আর হাওড়ায় একটা কাপড়ের দোকান। ছোটখাটো দোকান নয়। মস্ত দোকান। বেশ নামডাক আছে দোকানগুলোর, হাজার-হাজার টাকার কারবার করেন। তা করুন কারবার, ভাল কথা। তা ওই ভদ্রলোক—হীরালালবাবু,—বছর তিন-চার আগে এদিকে অনেকটা জমি কিনে তাঁর শখের 'কৃষ্ণধাম' বলে একটা বাগানবাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। বাগানবাড়ি বলতে ঠিক যা বোঝায়—তেমন বাড়ি অবশ্য নয়। একটা ছোট বাড়ি, আর আশেপাশে বাগান—ফলফুলুরির। লোকজন রেখেছিলেন নিজের পছন্দ মতন। প্রত্যেক হপ্তায় শুক্রবারে হীরালাল তাঁর কৃষ্ণধামে চলে আসতেন। থাকতেন সোমবার পর্যন্ত। ওঁর স্ত্রী বিগত। সংসারে ছেলেমেয়েরা আছে। তাদের বয়েসও কম হল না। বাবার ব্যবসা ছেলেরাই দেখে। হীরালালবাবু নিজে ব্যবসাপত্র থেকে ধীরে-ধীরে সরে এসেছেন। তবু তিনি থাকা মানে মাথার ওপর ছাতা থাকা। ইদানীং ভদ্রলোক কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিলেন। উদাস,

নিস্পৃহ। তিনি কোনও ব্যাপারেই মন বা নজর দিতে চাইতেন না। একেই বোধ হয় বলে বৃদ্ধ বয়সের সংসার বৈরাগ্য।

গত শুক্রবার হীরালাল যথারীতি তাঁর কৃষ্ণধামে চলে আসেন। সঙ্গে যশোদা। যশোদা হীরালালের নিত্যসঙ্গী। বন্ধু নয়, কর্মচারী। হীরালালের যৌবনকাল থেকে পাশে পাশে আছেন। দুঃখের দিনের সঙ্গীকে সুখের দিনেও ছাড়েননি হীরালাল। সম্পর্কটা প্রায় বন্ধুর মতন হয়ে উঠেছিল। লোকে জানে, যশোদা হলেন হীরালালের ম্যানেজার এবং বিশ্বস্ত বান্ধব।

গত শনিবার বিকেল থেকে হীরালালকে কৃষ্ণধামে পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না—সে অন্য কথা। কিন্তু হীরালালের হাতে লেখা যে তিনটি চিরকুট পাওয়া গিয়েছে—সেটাই মারাত্মক।

চিরকুটগুলো পড়লে ধাঁধা লেগে যায়। মনে হয় ঃ (১) হীরালাল আত্মহত্যা করার কথা ভাবছিলেন, (২) আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে নেন সম্প্রতি, (৩) সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর হীরালাল আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন বলে একটা চিরকুট লিখে রেখে উধাও হয়ে গিয়েছেন।

শনিবার বেলার দিকে হীরালাল যশোদাকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন। কাজটা মোটেই জরুরি নয়। মাইল চারেক দূরে 'বৈকুণ্ঠ নার্সারি'-তে গিয়ে খোঁজ করতে হবে তারা সত্যি-সত্যি নার্সারি বিক্রি করার কথা ভাবছে কিনা! যদি বিক্রি করাই ঠিক করে থাকে—তবে জমিজায়গা নার্সারি সমেত দরদাম কী পড়তে পারে!

যশোদা যেতে চাননি। কী হবে নার্সারিতে, বা জমিজায়গায়। ঈশ্বরের কৃপায় বড়বাবু—মানে হীরালালের তো কম সম্পদ নেই ; তা হলে অযথা আর সম্পত্তি বাড়ানো কেন? তা ছাড়া একটা পড়তি নার্সারি সম্পত্তি হিসেবেও কেনার কোনও মানে হয় না। আপত্তি সত্ত্বেও যেতে হল যশোদাকে ; হাজার হোক বড়বাবুর হুকুম।

মেঠো রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যশোদা বৈকুণ্ঠ নার্সারিতে গিয়েছিলেন। ফিরতে ফিরতে বিকেল। ফিরে এসে আর বড়বাবুকে দেখেননি।

আশপাশে কোথাও আছেন ভেবে যশোদাও আর হীরালালের খোঁজ করেননি তখন। যশোদারও বয়েস হয়েছে ; যাওয়া-আসায় আট মাইল। তাও মেঠো পথে। সাইকেল চালাবার ধকল সামলে যশোদা যখন খানিকটা সামলে নিয়েছে নিজেকে, তখন বড়বাবুর খোঁজ করলেন। ভাদ্রমাসের বিকেল ততক্ষণে মরে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে। এখানে ইলেকট্রিক নেই! কেরোসিনের বাতিতেই কাজ চালাতে হয়। মাঝে মাঝে বড়বাবুর খেয়ালে কৃষ্ণধামের বারান্দায় একটা ছোট পেট্রম্যাক্স বাতি জ্বালানো হয়। চতুর্দিক ফাঁকা, যেদিকে তাকাও মাঠ আর গাছপালা আর অন্ধকার। ওর মধ্যে পেট্রম্যাক্স বাতিটা যেন আকাশের তারার মতন দেখায়। অবশ্য জ্যোৎস্নার দিনে বাতি জ্বালানো হয় না বাইরে। তখন অঢেল জ্যোৎস্না আর জোনাকির নৃত্যই যেন কৃষ্ণধামকে ঘিরে থাকে।

সন্ধ্যের মুখেও হীরালালকে দেখতে না পেয়ে যশোদা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কাজের লোক তিনজন। একজন রান্নাবান্না নিয়ে থাকে, অন্যজন ঘরদোর সাফসুফ রাখে। তৃতীয়জনের কাজ হল জল তোলা আর চৌকিদারি। বাড়তি দু'জন মালি আসে হপ্তায়

তিনদিন। তারা বিকেল বিকেল চলে যায়।

কাজের লোকরা বলতে পারল না বড়বাবু কোথায় গিয়েছেন। তাঁকে বিকেলের পরে তারা দেখেছে। তারপর আর দেখেনি।

যশোদা তখন হীরালালের শোয়ার ঘরে খোঁজ করতে আসেন। এসে দেখেন বিছানার ওপর তিনটুকরো কাগজ রাখা। প্রত্যেকটি কাগজের ওপর ভারী কিছু চাপা দেওয়া—যেন না বাতাসে উড়ে যায় কাগজগুলো।

কাগজের লেখাগুলো পড়েই যশোদার মাথা ঘুরে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেও পারেননি। তারপর খোঁজ-খোঁজ পড়ে যায় আবার। এবার যশোদা নিজে বাড়ির কাজের তিনটে লোককে নিয়ে মাঠেঘাটেও খুঁজে বেড়াতে শুরু করেন বড়বাবুকে। আত্মহত্যা করুন আর না করুন, কোথাও হয়তো পড়ে আছেন মাথা ঘুরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে, সাপেখোপেও কামড়াতে পারে।

লণ্ঠন আর টর্চ নিয়ে ঘণ্টাখানেকের বেশি খোঁজ চলল। রাত্রে আর কত খোঁজ করা যায়। এদিকে কলকাতা যাওয়ার শেষ বাস চলে গিয়েছে সোওয়া সাতটা নাগাদ। কলকাতায় যাওয়ারও উপায় নেই। রাতটা উদ্বেগে আর দুর্ভাবনায় কাটিয়ে পরের দিন যশোদা ছুটলেন কলকাতায়। বড়বাবুর বাড়ি বাগবাজারে। তেতলা বাড়ি। ছেলেরা সকলেই একসঙ্গে থাকে। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার।

বড়বাবুর বড় ছেলে বড়দা—মানে কানাইলাল। মেজো ছেলে শ্যামলাল। তিনি হলেন মেজদা। ছোটর নাম কুমারলাল। বড়দা এখন বেনারসে, পুজোর মরসুমে কাশীর চকপট্টি আর তাঁত মহল্লায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ব্যবসার কাজে। এখন থেকে না ব্যবস্থা করে রাখলে বিয়ের মরসুমে মনের মতন বেনারসী পাবেন না। তা ছাড়া আজকাল সুতি কাপড়েও বেনারসী ধরনের কাজ হয় কাশীতে। মালের অর্ডার দিয়ে দু-একদিনের মধ্যেই ফিরবেন। তাঁরে হুট করে এ-সময় একটা দুঃসংবাদ দেওয়া যায় না। আর না-জেনে না-দেখে—কেমন করে বড়দাকে খবর দেওয়া যায় যে, বাবা আত্মহত্যা করেছেন, তুমি পত্রপাঠ ফিরে এসো।

মেজো শ্যামলাল স্বভাবে ভিতু আর সাবধানী। তার মোটেই ইচ্ছে নয়, ব্যাপারটা নিয়ে হুট করে থানা-পুলিশ করা। বাবা যদি আত্মহত্যা না করে থাকেন—আর থানা-পুলিশ করতে ছোটে বাড়ির লোকে—তবে ভবিষ্যতে বিরাট একটা গোলমাল হবে। আত্মহত্যা করতে চলেছি—এই ব্যাপারটা পুলিশকে জানালেও সেটা বিশ্রী অপরাধ বলে গণ্য হবে। আইনের কত না ফ্যাকড়া!

কুমারলাল এখন ছুটেছে বর্ধমান, আসানসোল, কালনা—যেখানে যেখানে জ্ঞাতি, গোষ্ঠী আছে তাদের—সকলের কাছে গিয়ে বাবার খোঁজ নিতে। মানুষ বুড়ো হলে ভীমরতি ধরে। বাবারও যে ধরেনি কে বলবে!

শ্যামলালের সঙ্গে পরামর্শ করে যশোদা এসে ধরেছিলেন কিকিরাকে। রায়বাবুর সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় ছিল যশোদার। অনেককাল আগে একই পাড়ায় থাকতেন দু'জনে।

কিকিরা মন দিয়ে সব শুনেছিলেন ঘটনাটা। কৌতুক এবং কৌতূহল—দুই-ই বোধ

করেছিলেন। শেষমেশ রাজিও হয়ে গেলেন।

মাথায় ছাতা। গায়ে রেন কোট। মাঠঘাট, জলকাদা ভেঙে, মাঝে মাঝে বুনো ঝোপ সরিয়ে কিকিরারা শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণধামে পৌঁছে গেলেন।

দূর থেকে ভাল করে বোঝা যায় না, আন্দাজ করা চলে। তার ওপর বৃষ্টির বিরাম নেই। কাছে এসে বোঝা গেল, কৃষ্ণধামের কম্পাউণ্ড-ওয়াল তেমন উঁচু নয়, হাত তিনেক হবে। তার ওপর অবশ্য ছোট ছোট লোহার খুঁটি জড়িয়ে তারকাঁটা লাগানো। গাছপালাই নজরে পড়ে বেশি, সামনের দিকে। বড় বড় গাছও রয়েছে অনেক ; আম, জাম, পেয়ারা। পেছন দিকে কৃষ্ণধাম। বাড়িটা বড় নয়। ছোট। দেড়তলার মতন লাগে তফাত থেকে দেখলে। বাড়ির ছাঁদ অনেকটা মন্দিরের মতন। মানে নকশাটা মন্দির ধরনের। আশপাশে ফুলগাছ, সরু সরু পথ, মোরাম আর নুড়ি পাথর বিছানো পথ।

ভালই লাগে দেখতে।

তারাপদ বলল, "কিকিরা সার, আপনি বললেন বর্ষায় একটু 'ফিশিং' করতে যাবেন! এই আপনার ফিশিং?"

কিকিরা বললেন, "দ্যাখো তারাবাবু, আমি অনেক কিছু জানি ; তার চেয়েও বেশি হল যা জানি না। পৃথিবীর একভাগ স্থল, তিনভাগ জল। আমার ব্রেনেরও সেই অবস্থা, সার বস্তু ওয়ান পার্ট ওনলি! ফিশিংটা আমার শেখা হয়নি বাপু। ছিপ আমি দেখেছি ; মাছ ধরতেও দেখেছি বাবুদের। কিন্তু জীবনে কখনও ছিপ ধরিনি।...তা সে যাই হোক, তোমাকে আমি এই ফিশিংয়ের ব্যাপারটা বলেছি আগেই।"

"তা অবশ্য বলেছেন।"

"তবে?"

"ব্যাপারটা আমার কাছে বাজে বলে মনে হচ্ছে। এই বৃষ্টিবাদলায় কেউ এমন অজ গাঁয়ে আসে! চাঁদু বেঁচে গিয়েছে।"

"বেঁচে গেল, কিন্তু মজাটা জানতে পারল না। চাঁদু কথায় কথায় বাড়ি ছোটে কেন বলতে পারো?"

"ও বোধ হয় হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দেবে। বাড়ি গিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে বসবে।"

"পারবে?"

"পারবে। মন বসাতে পারলে। চাঁদু দারুণ ছেলে। তবে কিকিরা, চাঁদু কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে আমি মরে যাব। ও আমার বন্ধু, ভাই, গার্জেন..."

কিকিরা হেসে বললেন, "তুমি এক কাজ করো।"

তারাপদ তাকিয়ে থাকল।

কিকিরা মজার গলায় বললেন, "কম্পাউণ্ডারিটা শিখে নাও। চাঁদুর 'কম্প' হয়ে পাশে পাশে থাকতে পারবে।"

তারাপদ হেসে ফেলল। বলল, "তা ঠিক। ...তবে আমি একটা চিরকুট রেখে এসেছি চাঁদুর কোয়ার্টারে। কাল পরশু ফিরলেই জানতে পারবে।"

॥ দুই ॥

হাত-পা ধুয়ে ভিজে পোশাক পালটে কিকিরারা চা খেতে বসলেন। বেলা প্রায় এগারোটা। বৃষ্টি ধরে রয়েছে, তবে আবার নামবে।

চা খেতে খেতে কিকিরা যশোদাকে বললেন, "কই, সেই কাগজগুলো দিন, দেখি।"

যশোদা আগেই নিয়ে এসেছেন কাগজের চিরকুটগুলো। জামার পকেটেই ছিল। এগিয়ে দিলেন।

কিকিরা হাত বাড়িয়ে নিলেন কাগজগুলো। দেখলেন একবার। একই ধরনের কাগজ। এক্সারসাইজ খাতার সাদা পাতা। লেখার কালি কলমও এক। হীরালালের হাতের লেখা চলনসই।

যশোদা বললেন, "পর পর গুছনো আছে। ওপরেরটা প্রথম..।"

কিকিরা লেখাটা পড়লেন মনে মনে। "আমার বয়েস আটষট্টি হইয়া গিয়াছে। দেশ ছাড়া হইয়া যখন আসি, উনিশ-কুড়ি বয়েস ছিল। লেখাপড়া ঠিকঠাক শেখা হইয়া উঠে নাই। পাঁচ ঘাটের জল খাইয়া কাটা কাপড়ের ব্যবসা শুরু করি। তাহার পর কাপড়ের গাঁঠরি পিঠে করিয়া বাড়ি বাড়ি তাঁতের শাড়ি বিক্রি করিতাম। পরিশ্রম অনেক করিয়াছি। অবশেষে শ্যামবাজারে একটি কাপড়ের দোকান দিতে পারি। ঈশ্বরের কৃপায় ইহা সম্ভব হইয়াছিল। সৎভাবে ব্যবসা করিয়াছি। ভাগ্যও সহায় হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে আমাদের ব্যবসা বাড়িল। তিন-তিনটি দোকান দিলাম। এখন তো অভাব অনটন কিছুই আর নাই। ছেলেরাও দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমার মনে কিন্তু সুখ নাই। অনর্থক আর বাঁচিতে ইচ্ছা করে না। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ লইতে ইচ্ছা করে।"

লেখাটা বার দুই-তিন পড়ে কাগজটা তারাপদকে পড়তে দিলেন কিকিরা।

দ্বিতীয় চিঠিটা ছোট। তাতে লেখা ঃ "অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, এবার সংসার হইতে বিদায় লওয়াই আমার উচিত। বাঁচিয়া থাকিলে না জানি কত অধর্ম অন্যায় দেখিতে হইবে। মহাভারতে পড়িয়াছি, স্বয়ং মহাজ্ঞানী ভীষ্মও নিজের ইচ্ছামৃত্যুর জন্য অনুতাপ করিতেন। ভাবিতেন, উহা যেন অভিশাপ! আমি সামান্য মানুষ। আমার আর কতটুকু ক্ষমতা। আমি মনঃস্থির করিয়া ফেলিয়াছি। আমার যাওয়া আর কে আটকায়।"

চিঠিটা তারাপদকে পড়তে দিলেন কিকিরা। শেষ টুকরোটা হাতে নিয়ে যশোদাকে বললেন, "এইটেই শেষ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

চিঠিটা খুবই ছোট। কয়েকটি মাত্র কথা। "আমি শেষ যাত্রায় চলিলাম। স্বেচ্ছায়। আমার পরিণতির জন্য কাহাকেও আমি দায়ী করি না। ঈশ্বর উহাদের মঙ্গল করুন।"

বার দুই-তিন শেষ চিঠিটা পড়ে কিকিরা কাগজের টুকরোটা তারাপদকে এগিয়ে দিলেন।

সামান্য চুপচাপ। পকেট থেকে কিকিরা চুরুট বার করলেন। সরু আঙুলের মতন চুরুট। দেশলাইটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে। চুরুট ধরাতে দশ-বারোটা কাঠি নষ্ট হল।

"যশোদাবাবু?"

"বলুন?"

"চিঠি তিনটের হাতের লেখা তো একই লোকের মনে হচ্ছে। হীরালালবাবুর। চিঠির শেষে নামও লিখেছেন, হীরালাল দাশ। আপনি কী বলেন?"

"হাতের লেখা বড়বাবুরই।"

"নকল নয় তো?"

"আজ্ঞে না।"

"কালির রং কলমও একই বলে মনে হচ্ছে।"

"ঠিকই বলেছেন। আমিও কোনও তফাত দেখিনি।"

কিকিরা এবার তারাপদর দিকে তাকালেন। বললেন, "তারা, তুমি একটা জিনিস নজর করে দেখেছ? চিঠিতে কাটাকুটি বোধ হয় মাত্র দু' তিন জায়গায়। হাতের লেখা স্পষ্ট। কোথাও হাত কাঁপেনি, এলোমেলো হয়নি লেখা। দেখেছ?"

তারাপদ দেখল। মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ—কথাটা ঠিকই।"

কিকিরা বললেন, "একজন লোক যখন সুইসাইড নোটের মতন চিঠি লেখে—তখন তার মাথা কতটা ঠাণ্ডা হতে পারে? তার কোথাও একটু আবেগ থাকবে না, দুঃখ থাকবে না? তোমার কী মনে হয়?"

"থাকা বোধ হয় উচিত।"

"বেশ, উচিত বাদ দিলাম। হয়তো হীরালালবাবুর মাথা বেজায় ঠাণ্ডা ছিল। স্ট্রং নার্ভ। তিনি বেশ গুছিয়ে নিজের কথাগুলো লিখেছেন। মনে মনে মক্শও করে থাকতে পারেন। কিন্তু আমার যে ধোঁকা লাগছে হে!" বলে কিকিরা যশোদার দিকে তাকালেন। "যশোদাবাবু, আপনাকে খোলাখুলি ক'টা কথা জিজ্ঞেস করি। যা জানেন বলবেন, কথা লুকোবেন না।"

"লুকবো কেন! বলুন।"

"হীরালালবাবুর সঙ্গে আপনি অনেকদিন ধরে আছেন, আমি জানি। তবু ঠিক কত বছর রয়েছেন জানা নেই।"

"আঠাশ-তিরিশ বছর। বড়বাবু যখন শ্যামবাজারে তাঁর প্রথম দোকান করেন—তখন থেকেই আমি তাঁর কর্মচারী। বাবু আমি আর বিনোদ বলে একটা ছেলে দোকান দেখতাম।"

"দ্বিতীয় দোকানটা কবে হয়?"

"পাক্কা দশ বছর পরে। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে।"

"তৃতীয়টা?"

"ভবানীপুরে। সেটা হয়েছিল মেজদার বিয়ের আগে।"

"আর হাওড়ার দোকান?"

"ওটা তেমন পুরনো নয়। বছর পাঁচ-সাত আগে হয়েছে।

"দোকানগুলোর মালিকানা?"

"আগে সবই বড়বাবুর ছিল। পরে তিনি ভাগ করে দেন। আদি দোকান পায় বড়দা, কলেজ স্ট্রীটের দোকান দেওয়া হয় মেজদাকে। ভবানীপুরের দোকানের মালিকানা ছোড়দার।"

"আর হাওড়ার দোকান?"

"ওটা বড়বাবু অন্যরকম ব্যবস্থা করেন। তাঁর শ্যালক ও শ্যালকের ছেলেদের লিখে দেন। অবশ্য ওই দোকানটায় শালাবাবুদেরও টাকা খাটত।"

"আপনার মনিবই বলুন আর বড়বাবুই বলুন—মানুষ কেমন ছিলেন?"

"বাবু বড় ভাল লোক ছিলেন। সাদামাঠা, সরল। সৎ মানুষ। ব্যবসাদার হলেও তিনি শুধু লাভের দিকে চোখ রাখতেন না। বরং দশ পয়সার জায়গায় আট পয়সা লাভেই সন্তুষ্ট থাকতেন। ঠাকুর দেবতায় অগাধ ভক্তি ছিল। বউ ঠাকুরন গত হওয়ার পর পুরোপুরি নিরামিষ আহার করতেন। আর গত তিন-চার বছর দোকানের ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না বিশেষ। বাড়ির কাছে বলে শ্যামবাজারের আদি দোকানটায় সন্ধ্যের মুখে এক-আধ ঘণ্টা বসতেন। পুরনো লোকজন এলে কথাবার্তা বলতেন সুখদুঃখের।

কিকিরা চুরুট টানতে টানতে মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন।

তারাপদ হঠাৎ কিকিরাকে বললেন, "সার, ছেলেদের সঙ্গে মন কষাকষি হয়নি তো? বুড়োমানুষ, কোন ব্যাপারে মান-অভিমান হতে পারে।"

যশোদাই জবাব দিলেন। বললেন, "না, তেমন কিছু নয়। তবে বড়দা শ্যামবাজারের দোকানটা বাড়িয়ে নিয়েছিল। পাশের একটা ছোট হোসিয়ারি দোকান কিনে নেয়। আর আজকাল যা ফ্যাশান, দোকানটা হাল কায়দায় সাজিয়ে—ঠাণ্ডা-মেশিন চালু করে দোকানে। বড়বাবুর এটা পছন্দ হয়নি। তিনি সাবেকি মানুষ, নিজের হাতে গড়া দোকান, অত ঝকমকি তিনি মেনে নিতে পারেননি।"

"ও! তা এ নিয়ে ছেলের সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছিল?"

"না। বড়বাবু চুপ করেই থাকতেন। মুখে কিছুই বলেননি। মনে লেগেছিল।"

"দোকান সাজানোর পর বিক্রিবাটা কমেছিল, না, বেড়েছিল?"

"বেড়েছিল।"

"তবে আর কী! অন্য দোকানগুলোর বেলায় কী হয়েছিল?"

"না, সেগুলো আগের মতনই ছিল।"

"কেমন চলত?"

"খারাপ নয়। মেজদার কলেজ স্ট্রীটের দোকানে তিন-চার মাস খুব বেচাকেনা হত—এই পুজোর টাইমে। ভবানীপুরের দোকানও ভাল চলত। ছোড়দা তার দোকানে রেডিমেড পোশাক রাখত। বাচ্চাদেরই বেশি।"

"আর হাওড়ার দোকান?"

"আজ্ঞে, ওটা আজকাল ভাল চলত না। তবে দোকানটা তো বড়বাবু শালাবাবুকে দান করেছিলেন। কাজেই ওটা হীরালাল দাশ অ্যাণ্ড সন্সের মধ্যে পড়ে না।"

বেলা হয়ে আসছিল। আবার বৃষ্টি নামল।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, এখন থাক। এবার স্নান-খাওয়া সেরে নিই। দুপুরে একটু জিরিয়ে, বিকেলে কৃষ্ণধামের ঘরদোর দেখা যাবে। চোখে সব দেখে নেওয়া ভাল। আজ আমরা কিন্তু রাত্তিরেও আছি এখানে। মনে আছে তো?"

যশোদা বললেন, "ও-কথা কেন বলছেন! আপনাদের জন্যে সবরকম ব্যবস্থা করা

আছে। যতদিন খুশি থাকতে পারেন!”

চুরুট নিভে গিয়েছিল কিকিরার। সেঁতিয়ে গিয়েছে। তারাপদর কাছে একটা সিগারেট চাইলেন কিকিরা।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে হঠাৎ যশোদাকে বললেন, “আপনার বড়বাবু পান-তামাক খেতেন না?”

“আজ্ঞে না। ওঁর কোন নেশা ছিল না। দু'বেলা দু' পেয়ালা চা খেতেন মাত্র। আর গলা খুসখুস করে কাশি আসত বলে লবঙ্গ মুখে রাখতেন বেশিরভাগ সময়। বড়বাজার থেকে বাবুর জন্যে বাছাই করা ভাল লবঙ্গ আসত। আমিই আনতাম।”

“চলুন ওঠা যাক।” কিকিরা উঠে পড়লেন।

॥ তিন ॥

বিকেলে কৃষ্ণধামের ঘরগুলো দেখলেন কিকিরারা। নীচের তলায় চার পাঁচটি ঘর। মাঝারি মাপের। রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা সামান্য তফাতে, এক পাশে। বারান্দা প্রায় চারপাশেই। বারান্দার তলায় লতাপাতা আর ফুলগাছের ঝোপ। হাসনুহানা, টগর, বেল—আরও কত। ঘরগুলো পাকাপোক্তভাবে তৈরি। তবে বাহুল্য নেই, বিলাসিতা নেই। একটা ঘরে দু' আলমারি ধর্মগ্রন্থ। দেওয়ালে দুর্গা, কালী, শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীগৌরাঙ্গর পট। সরল সাধাসিধে ঘরদোর। কিন্তু বেশ লাগে।

শেষে হীরালালের শোয়ার ঘরে এলেন কিকিরারা। অবাকই হলেন ঘরটি দেখে। আসবাব যৎসামান্য। একটি পুরনো পালঙ্ক, ড্রয়ার একটি, কাঠের আলমারি, আলনা। দুটি মাত্র চেয়ার। টেবিল নেই। ঘরে চারটি জানলা। কাঠের পাল্লা, গ্রিলও রয়েছে।

যশোদা পালঙ্কটি দেখিয়ে বললেন, “চিঠির টুকরো তিনটি এই বিছানার ওপরেই ছিল।”

কিকিরা আর তারাপদ নজর করে ঘর দেখছিলেন।

কিকিরা বললেন, “যশোদাবাবু, অনেককাল আগে আপনার সঙ্গে দোকানে বেড়াতে গিয়ে একবার হীরালালবাবুকে দেখেছিলাম। চেহারাটি ঠিক মনে নেই। বেঁটে রোগা মতন ভদ্রলোক না?”

“আজ্ঞে বেঁটে ঠিক নয়, তবে মাথায় খাটো। গায়ের রং ছিল ধবধবে। মাথায় চুল অল্প। ইদানীং সবই পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল।”

“সাজপোশাকও সাধারণ ছিল না?”

“ধুতি-পাঞ্জাবি। গায়ে ফতুয়া পরতেন। গেঞ্জি কখনও পরেননি। চামড়ার জুতোও পায়ে দিতে পারতেন না।”

“কেন?”

“পায়ে অনেক কড়া ছিল। ওষুধ বিষুধ করেছেন। কাটিয়েছেন। আবার গজিয়ে যেত। ক্যাম্বিসের পা-ঢাকা জুতো পরতেন।”

“একটা হারমোনিয়াম দেখছি যে মশাই?”

যশোদা বললেন, “এখানে থাকলে নিজের মনে একটু গান গাইতেন। রামপ্রসাদী

গানই বেশি।”

তারাপদ বলল, “ধার্মিক মানুষ।”

“তা ঠিকই। অমন মানুষ কেন যে...”

কথা থামিয়ে কিকিরা বললেন, ‘চলুন, এবার ওপরে যাওয়া যাক।”

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে দক্ষিণ দিকে দুটি ঘর। উত্তরে ঘর নেই, ফাঁকা ছাদ। বাড়িটাকে তাই দোতলা না বলে দেড়তলা বলাই ভাল। আকাশে মেঘ রয়েছে। তবে ছেঁড়া ছেঁড়া। বৃষ্টি আপাতত বন্ধ। আলো মরে এসেছে। টুকরো মেঘগুলো জমে গেলেই আবার অন্ধকার হয়ে যাবে।

যশোদা বললেন, “আসুন, ঘর দুটো দেখুন।”

কিকিরা এগিয়ে গেলেন। পাশাপাশি দুটি ঘর। একটি একেবারে ফাঁকা। মাটিতে একপাশে একটি কার্পেট পাতা। দেওয়ালে মস্ত বড় এক শ্রীগৌরাঙ্গর পট।

যশোদা বললেন, “এটিতে বড়বাবু কখনও-কখনও কীর্তনগানের আসর বসাতেন। বরানগর থেকে বাণীবাবু আসতেন কীর্তন গাইতে। তাঁর দলবল থাকত। আর আমরা থাকতাম। আশপাশের দু’-পাঁচজন।”

কিকিরা দেখলেন ঘরটা। পরিচ্ছন্ন। হীরালাল নেই, তবু ঘরটি যে ঝাঁট পড়েছে, মোছা হয়েছে—বুঝতে কষ্ট হয় না।

পাশের ঘরটি হীরালালের ঠাকুরঘর। একপাশে উঁচু বেদি। বেদির ওপর সাদা মার্বেল পাথরের স্ল্যাব। মাঝখানে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। কালো পাথরের। আন্দাজে মনে হয়, হাত দুই উঁচু বিগ্রহ। দেখতে সুন্দর। চিৎপুরের পাথর বাজারে যা বিক্রি হয়—সেরকম মামুলি জিনিস নয়। বিগ্রহের দু’পাশে দুটি লম্বা বাতিদান। পেতলের। ঝকঝক করছে। ঘরের ঘোলাটে আলোতেও সেটা চোখে পড়ে। বেদির তিন পাশে গ্লাস ফাইবার, ধোঁয়া রঙের ; সামনের দিকটা খোলা। বেদির তলায় দু’ ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ির ধারগুলো আলপনার নকশায় রং করা। দেওয়ালের একটি পাশে দেওয়াল-তাক, কাচের পাল্লা, ভেতরে কয়েকটা রুপোর বাসন, বাটি, চন্দন কাঠ, আরতির পঞ্চপ্রদীপ—এইরকম কত কী! আর গোল গোল কাচের শিশি। শিশির মধ্যে বাতাসা, কিশমিশ, শুকনো খেজুর, মিছরি। একটা শিশিতে লবঙ্গও রয়েছে। শিশিটা কাত হয়ে গিয়েছে একপাশে।

যশোদা বললেন, “এসব ঠাকুরের।”

“বোঝাই যায়। ...আচ্ছা যশোদাবাবু, ওই ফাইবার গ্লাসগুলো লাগানো হয়েছিল কেন?”

“ঠাকুরের গায়ে ধুলোময়লা যাতে না পড়ে।”

“ও।” বলে কিকিরা মাথার ওপর তাকালেন, তারপর তারাপদকে বললেন, “দেখেছ?”

তারাপদ আগেই দেখেছে। এই ঘরের ছাদের ধাঁচটা যেন মন্দিরের চুড়োর মতন।

“চলুন বাইরে যাই”, কিকিরা বললেন।

বাইরে, ঠাকুরঘরের পেছনের আর পাশের খানিকটা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। গ্রিলের রেলিং। হাতকয়েক চওড়া ফাঁকা বারান্দা। ব্যালকনি মতন। ঠাকুরঘরের পেছন

দিকের ব্যালকনি থেকে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে যেখানে তার চারপাশে কলাঝোপ আর পাতকুয়ো। কলাঝোপ যথেষ্ট ঘন। তার ওপর বর্ষায় পাতাগুলো যেন বিস্তর বেড়ে উঠেছে। ঝোপ ছাড়ালেই একটা জাম গাছ। জাম গাছের ওপাশে ঢালু জমি। বাঁশঝোপ। তারপর কৃষ্ণধামের পেছন দিকের পাঁচিল।

কিকিরা মন দিয়ে দেখছিলেন।

তারাপদও নজর করে দেখছিল আশপাশ।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, এই সিঁড়িটা দিয়ে নেমে গেলেই কলাঝোপ?"

"আজ্ঞে।"

"কুয়োর জল কেমন?"

"ভাল।"

"একটাই কুয়ো নাকি?"

"না, আরও একটা আছে। গোয়ালঘরের দিকে।"

তারাপদ কী বলতে যাচ্ছিল তার আগেই কিকিরা পায়ের তলা থেকে কী যেন কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লেন। কাচের টুকরো। পায়ে লাগতে পারত। টুকরোটা তুলে নিতে গিয়ে কিকিরার চোখে পড়ল, কয়েকটা লবঙ্গ ছড়িয়ে আছে। বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে অন্যরকম দেখায়।

লবঙ্গগুলো তুলে নিলেন কিকিরা। তারপর চোখের ইশারায় তারাপদকে কিছু বললেন।

তারাপদ বুঝতে পারল।

কিকিরা যশোদাকে নিয়ে অন্যপাশে সরে গেলেন। তারাপদ লোহার সিঁড়ি বরাবর কী যেন খুঁজতে লাগল হেঁট হয়ে।

অন্যপাশে সরে গিয়ে কিকিরা যশোদাকে বললেন, "আপনি হীরালালবাবুর সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক। উনি যে এরকম একটা কাজ করতে পারেন—আপনাকে আভাসমাত্র দেননি!"

"না।"

"আপনিও বুঝতে পারেননি?"

"না। শুধু বুঝতে পেরেছিলাম উনি মনে-মনে কেমন যেন ভেঙে পড়েছেন। কথায়বার্তায় আফসোস। দুঃখ করতেন।"

"কিসের আফসোস?"

যশোদাজীবন ইতস্তত করছিলেন ; শেষে বললেন, "সেভাবে সরাসরি আমায় কিছু বলেননি। বোধ হয় বলতে চাইতেন, পারতেন না। তবে বুঝতে পারতাম, তিনি যা চান না, ভাবতেও পারেন না—এমন একটা ব্যাপার বাড়ির মধ্যে কোথাও হচ্ছে।"

কিকিরা নজর করে দেখলেন যশোদাকে। মনে হল, হীরালালের এই বিশ্বস্ত বন্ধু এবং কর্মচারীটি সঠিক জবাব দিলেন না। কথা লুকোলেন।

কথা পালটে নিলেন কিকিরা। সহজভাবে বললেন, "বাড়িতে তিন ছেলের মধ্যে

pathagar.net

সদ্ভাব কেমন?"

"আজ্ঞে, হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান হয় না, সংসারে ভাইবোনরাও সকলে সমান হয় কি! ফারাক থাকবেই।"

"যেমন?"

"যেমন ধরুন, বুদ্ধি-বিবেচনা, সাহস, জেদ, এইরকম আর কি! কেউ ধূর্ত হয় বেশি, লোভী ; কেউ যেমন আছে তেমনই থাকতে চায়। কেউ ভিতু, সাবধানী। কেউ বা হালকা স্বভাবের। নিজেরটি নিয়ে থাকে।"

"কথাটা ঠিকই যশোদাবাবু, পাঁচ আঙুল সমান হয় না। ...তা ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে?"

"বড়দা কানাইলাল। অতিশয় বুদ্ধিমান বলতে পারেন। সাহসী।"

"মেজো ছেলে?"

"শ্যামলাল—মানে মেজদার কথা আগেই বলেছি। ভিতু ধরনের, শখশৌখিনতাও নেই। সাদামাঠা।"

"আর ছোট ছেলে?"

"কুমারলাল এখনও ঝোঁকের মাথায় চলে। হালকা স্বভাবের, বয়েসও কম। তবে হাল কায়দায় চলতে চায়। তা সে যাই করুক, ভবানীপুরের দোকানের ব্যবসাটা মন্দ চালায় না।"

তারাপদ ততক্ষণে ফিরে এসেছে।

কিকিরা আর কথা বাড়ালেন না। "চলুন, নীচে যাই। ...ভাল কথা, হীরালালবাবু চলে যাওয়ার পর ওপরতলার ঠাকুরঘর, বাইরের এই জায়গাগুলো ঝাঁট পড়েনি? মোছামুছি করেছে তো?"

"মনে হয় করেনি। সকলেই বড়বাবুকে খোঁজাখুঁজিতে ব্যস্ত। আমি না হয় জিজ্ঞেস করব ওদের?"

"করবেন?...আপনিও তো ব্যস্ত। চলুন যাই, চা-টা খেতে হবে।"

কিকিরারা নীচে নেমে গেলেন।

॥ চার ॥

কিকিরা আর তারাপদ মুখোমুখি বসে কথা বলছিল। ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। সন্ধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে, তবে রাত নয়। তবুও, এই ফাঁকা জায়গায় সন্ধ্যে-রাতই যেন অনেক। বাইরে বৃষ্টি নেই, ঝিঁঝি ডাকছে। বাঁশবাগান আর কলাঝোপের দিক থেকে ক্রমাগত ব্যাঙ ডেকে যাচ্ছিল।

কিকিরা বললেন, "তারা, চিঠিগুলো—মানে, হীরালালবাবুর লেখাগুলো আমি বারবার পড়েছি। আমার কী মনে হয় জানো?"

"কী?"

"ভদ্রলোক ব্যবসাদার হলেও সৎ সরল মানুষ। তিনি শুধু ধর্মকর্ম করতেন না, মনে-মনেও অধর্ম করার কথা ভাবতেন না। তাঁর কাছে ধর্ম ভেক ছিল না। অথচ নিজের

সংসারের মধ্যেই এমন কোনও অন্যায় অধর্ম হচ্ছিল যা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। আবার মুখ ফুটে বলতেও পারছিলেন না।"

"কেন?"

"এরকম হয়। বুড়োমানুষ, সংসারের সাতপাঁচে থাকতেন না। বলতে গিয়ে যদি বিপত্তি হয়। তা ছাড়া আমার ধারণা, বলার মতন জোর প্রমাণও তাঁর হাতে ছিল না। হয়তো সন্দেহ করেছিলেন। কানাঘুষো শুনেছিলেন..."

"হতে পারে। তবে কিসের সন্দেহ?"

"সেটাই ভাবছি। যশোদাবাবুর পেটে এখনও কথা আছে। বলতে পারছেন না।"

"তা হলে মামলা ছেড়ে দিন, সার। আমার মনে হয়, আত্মহত্যা করার কথাটা বাজে। এখানে কেউ আত্মহত্যা করলে আজ ক'দিনে তার কোনও হদিশ মিলবে না?"

"তোমার কথাটা ঠিকই। আমারও মনে হয় না, হীরালালবাবু সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করেছেন। ...আরে, একটা মানুষ যখন আত্মহত্যা করতে যায় তখন কি সে ঠাকুরঘরের লবঙ্গর শিশি থেকে এক মুঠো লবঙ্গ তুলে নিয়ে চলে যায়! অসম্ভব! তখন তার মনের সে-অবস্থা থাকে না।"

তারাপদ বলল, "আপনি ওপরে লোহার ঘোরানো সিঁড়ির সামনে লবঙ্গ পেয়েছেন সার, আমি সিঁড়ির নীচের ধাপেও গোটা দুয়েক পেয়েছি।"

"ভদ্রলোক যাওয়ার আগে ঠাকুরঘরে ঢুকেছিলেন। হয়তো ঠাকুর প্রণাম করতে। তারপর কাচের আলমারি থেকে এক মুঠো লবঙ্গ তুলে নিয়ে সিঁড়ির পথ ধরেই কলাঝোপ আর বাঁশঝাড়ের আড়াল দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন কোথাও।"

তারাপদ মাথা নাড়ল। বলল, "বেশ বুদ্ধি করেই পালিয়েছেন। যশোদাবাবুকে কোন এক নার্সারি দেখে আসতে বলে, কাজের লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে দিব্যি গা-ঠাকা দিলেন! কিন্তু সার, ওই বুড়োমানুষ কোথায় যেতে পারেন! এখানে কাছাকাছি লুকিয়ে থাকার জায়গা কোথায় পাবেন? সবই তো ফাঁকা।"

কিকিরা মাথা দোলাতে লাগলেন। ভাবছিলেন। পরে বললেন, "শোনো বাপু, আমাকে একটু ভাবতে দাও। হীরালাল আত্মহত্যা করেননি বলেই আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি কোথায় লুকিয়ে আছেন বুঝতে পারছি না। আরও বুঝতে পারছি না, ভদ্রলোক কেন, কিসের জন্যে এই নাটক করছেন! বাড়ির গণ্ডগোল একটা কারণ হতে পারে। সেই গণ্ডগোল কেমন? কে বা কারা করেছে? কেনই বা?...তা আপাতত আমরাও আর এখানে থাকছি না। কালই ফিরে যাব কলকাতায়। আবার আসব আসছে হপ্তায়। শুক্র বা শনিবার। চাঁদুও ততদিনে ফিরে আসছে। তখন একবার চেষ্টা করা যাবে।"

তারাপদ বলল, "এই ক'দিন কী করবেন?"

"দাশবাবুর পারিবারিক খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করব। দোকানগুলো দেখব। আর ফন্দিফিকির খুঁজব।"

"দেখুন চেষ্টা করে।"

"তুমি একবার যশোদাবাবুকে ডেকে আনো। কথা বলব।"

তারাপদ বাইরে গেল যশোদাজীবনকে ডাকতে।

ক' মুহূর্ত পরেই যশোদা এলেন।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।"

"বলুন।"

"আমরা কাল ফিরে যাব। ...না, না, আসব আবার, আসছে হপ্তায়—শুক্র বা শনিবার। এর মধ্যে আপনি যেভাবে খবরটা চেপেচুপে আছেন সেইভাবে থাকবেন। থানা-পুলিশ করবেন না। মেজবাবু ছোটবাবুকে সামলে রাখবেন।"

"বড়দা?"

"তাঁকে আলাদা করে খবর না দিলেই ভাল। তবে তিনি যদি নিজেই ফিরে আসেন কাশী থেকে অন্য কথা। ...ক'টা দিন সবুর করে থাকুন, হইচই করবেন না। একটা কথা জানবেন, আপনার বড়বাবু সত্যি-সত্যি আত্মহত্যা করেননি। আর যদি করেও থাকেন তবে এখানে কোথাও নয়। বুঝলেন!"

মাথা নাড়লেন যশোদাজীবন।

॥ পাঁচ ॥

পরের শুক্রবারই এলেন কিকিরা। একা।

বর্ষাবাদলা নেই। ভাদ্রমাসের চড়া রোদ থাকছে দিনভর। গাছপালার সেঁতানি ভাব শুকিয়ে এসেছে অনেকটা। রাত্রে হালকা জ্যোৎস্না। শুক্লপক্ষ চলছে।

এসেই বললেন, "আপনাদের বড়দা ফিরেছেন নাকি?"

"না। দু-চারদিনের মধ্যেই আসছেন।"

"বাড়িতে হইচই হচ্ছে?"

"আজ্ঞে তা তো হবেই। মেজদাকে আমি সামলে রেখেছি। কিন্তু ছোড়দা আর শুনতে চাইছে না। বলছে, বাবার আত্মহত্যা করার কথাটা না হয় চেপে গেলুম। হারিয়ে যাওয়ার কথাটা তো পুলিশকে জানাতে পারি।"

কিকিরা একটু হাসলেন। বললেন, "মিসিং! তা অবশ্য জানাতে পারেন ; তবে মিসিংয়ের সঙ্গে অনেক ফ্যাকড়া জড়িয়ে আছে। সুতোর জট খুলতে গেলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আপনাদের ছোড়দার জানা নেই।"

যশোদা মাথা হেলালেন। মানে, তিনি বোঝেন সবই।

সামান্য চুপচাপ থাকার পর কিকিরা হঠাৎ বললেন, "আপনাদের এখানে শুকনো খড় পাওয়া যাবে। খড়ের আঁটি?"

যশোদা অবাক! হকচকিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। "আজ্ঞে খড়?"

"খড়ের আঁটি! গোরু গোয়ালঘর যখন রয়েছে এখানে—আপনাদের কৃষ্ণধামে তখন খড় পাওয়া সহজ। না কি!"

"পাওয়া যাবে।"

"ধরুন একটু বেশিই লাগবে।"

"দেখি। খড়ের গাড়ি এ হপ্তায় আসেনি। জোগাড় হয়ে যাবে।"

"আপনাদের এখানে কেরোসিন তেল দিয়েই লণ্ঠন জ্বলে। চার-পাঁচ বোতল বা ধরুন

দু'-চার লিটার তেল পাব নিশ্চয়।"

যশোদা কিছুই বুঝলেন না। তাকিয়ে থাকলেন হাঁ করে।

কিকিরা মুচকি হাসলেন। ঠাট্টার গলায় বললেন, "ঘাবড়ে যাবেন না। ভয়ের কিছু নেই। ...শুনুন, কাল আমার জন্য দুজন লোক লাগবে। মালি আসবে না?"

"আসতে পারে।"

"ঠিক আছে। ...না এলে আপনাদের এখানে কাজের লোক আছে। দুটো ঠিকে মজুর ধরে দিতে পারবেন না?"

যশোদা কিছু না বুঝলেও মাথা নাড়লেন। পরে বললেন, "তারাপদবাবু এলেন না?"

"কাল আসবে। অফিস সেরে। আমি আগে আগে এলুম কাজ খানিকটা গুছিয়ে রাখতে। একটাই শুধু আমার ভয় মশাই, হঠাৎ করে যদি বৃষ্টি নেমে যায় কাল-পরশু—তবেই বিপদ।"

"আর এখন নামবে বলে মনে হয় না। ক'টা দিন একটু মাঠঘাট শুকুক। তবে ভাদ্রমাস, বলা যায় না কিছুই।"

পরের দিন তারাপদ এল। বিকেল-বিকেল। কাঁধে কিটব্যাগ, হাতেও একটা নাইলনের ছোট হাত-ঝোলা।

কিকিরা বাগানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বোধ হয় অপেক্ষা করছিলেন তারাপদর। বললেন, "সংবাদ কী?"

"ভাল।"

"চাঁদু?"

"স্যারের অ্যাডভাইস জানিয়ে এসেছি। হাজির থাকবে সময় মতন। আপনার কাজ কতটা এগুলো?"

কিকিরা আঙুল দিয়ে কৃষ্ণধামের কম্পাউণ্ড-ওয়ালের দিকটা দেখালেন। বললেন, "দুটো পাশ হয়ে গিয়েছে। বাকি দু' পাশ কাল দুপুরের মধ্যেই হয়ে যাবে। যাও না, একবার দেখে এসো।"

তারাপদ এগিয়ে গিয়ে দেখে এল। বলল, "সার, গর্তগুলো আগুপিছু কেন?"

কিকিরা মুচকি হাসলেন। "একে বলে জিগজাগ ট্রেঞ্চ। অবশ্য এটা ট্রেঞ্চ নয়। মানে, মাটি কাটা নালা নয় হে, ফুট তিনেক অন্তর একটা করে গর্ত। তা গর্তগুলো ফুট দুই-আড়াই হবে, তলার দিকে, ডিপ আর কী। আর গোললাইয়ের মাপও মোটামুটি ওইরকম। ...আগুপিছু—জিগজাগ করার মানে হল, তফাত থেকে দেখলে চোখের ভুল হবে। বোঝা যাবে না, একটা গর্ত থেকে আর-একটা গর্তের মধ্যে হাত কয়েক তফাত। আগুন যখন জ্বলবে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে, একটানা দাউদাউ করে জ্বলছে।"

তারাপদ হেসে বলল, "এটা কি আপনার ম্যাজিশিয়ানের টেকনিক?"

"খানিকটা তো বটেই", বলে আবার হাত তুলে একটা জায়গা দেখালেন, "ওই যে দেখছ জায়গাটা, ওখানে যত রাজ্যের গাছের শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে এনে জমানো হয়েছে। আরও দু-চার ঝুড়ি কাল জমানো যাবে। খড় রেডি। কেরোসিন তেল মজুত।

pathagar.net

আর তুমি তো অন্য মালমশলাও এনেছ!” অন্য মালমশলা বলতে খানিকটা গন্ধক।

বাগান থেকে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে তারাপদ বলল, “সবই না হয় হল। আপনি লঙ্কাদহন পর্বটা সারলেন, কিন্তু যার জন্য এত—সেই ভদ্রলোক যদি ধরা না দেন!”

“না দিলে করার কিছু নেই। আমরা যশোদাবাবুকে বলব, আপনারা থানা-পুলিশ করুন, আমাদের দিয়ে হল না।”

তারাপদ যশোদাজীবনকে দেখতে পেল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। বলল কিকিরাকে।

কিকিরা গলা নামিয়ে বললেন, “তারাপদ, কাল তুমি যশোদাবাবুর ওপর নজর রাখবে। উনি যেন এই বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যেতে না পারেন। এমনিতেই ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছেন। মগজে কিছুই ঢুকছে না ওঁর। তার ওপর কাল সন্ধ্যের ঝোঁকে যখন বাড়ির চারপাশে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে, উনি বোধ হয় পাগলামি শুরু করবেন।”

তারাপদ সে-কথার কোনও জবাব দিল না। শুধু বলল, “হীরালালবাবু এখানেই কাছাকাছি কোথাও আছেন বলে আপনার ধারণা। যদি না থাকেন—?”

“না থাকেন? দ্যাখো তারাবাবু, আমি ফিশিং এক্সপার্ট নই, তবে শুনেছি এক-একরকম মাছের জন্যে এক-একরকম চার কাজে লাগে। বঁড়শিরও হেরফের হয়। হীরালালবাবুর এই কৃষ্ণধামই আমার টোপ। এই টোপে হয় তিনি ধরা দেবেন, না হয় আমরা হার মেনে নিয়ে ফিরে যাব। ...যাক গে, চাঁদুকে সব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছ তো?”

“দিয়েছি। ও জায়গাটা আন্দাজ করতে পেরেছে। এদিকে একবার ওদের ক্যাম্প বসেছিল। ডাক্তারদের ক্যাম্প। ...ও ঠিক সময়ে হাজির হয়ে নিজের পজিশন নেবে।” তারাপদ হাসল।

“ভাল কথা। দেখা যাক কী হয়?”

বারান্দায় উঠে এলেন কিকিরা। যশোদাজীবন দাঁড়িয়ে আছেন। দেখলেন তারাপদকে। কিকিরা হেসে বললেন, “যশোদাবাবু, আমার চেলা এসে গিয়েছে। বলেছিলুম না, সময় মতন চলে আসবে।”

যশোদা বললেন, “দেখেছি ওঁকে। আসুন, চা তৈরি, ডাকতেই এসেছিলাম আপনাকে।”

“চলুন।”

॥ ছয় ॥

দূর থেকে দেখলে মনে হবে, সত্যি-সত্যিই কৃষ্ণধামে আগুন লেগে গিয়েছে। কম্পাউণ্ড-ওয়ালের কাছাকাছি মাটি খুঁড়ে করা গর্তগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া শুকনো খড়, গাছের পাতা জ্বলে উঠেছে দাউদাউ করে। ভাদ্রমাসের বাতাসে দমকা নেই, তবু যেটুকু হাওয়া দিচ্ছিল ফাঁকা মাঠে তাতেই শিখা উঠেছে আগুনের, ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে আশপাশ। বোঝা যাচ্ছে না, একটা গর্তের সঙ্গে অন্য গর্তের হাত কয়েক ফাঁক আছে।

এই মাঠে, দু'-পাঁচটা ঝোপঝাড় গাছপালার মধ্যে সামান্য আগুনেই কম হলকা ছড়ায় না। আর এই সন্ধ্যেবেলার মুখেই ঝাপসা জ্যোৎস্নার মধ্যে কৃষ্ণধামের আগুন কার না নজরে পড়বে! কাছাকাছি গাঁ-গ্রাম নেই, তবু সামান্য তফাতে দু'-চার ঘরের বসতি তো আছেই, আছে এক-আধটা ছোট নার্সারি-বাগান। লোকজন সাকুল্যে হয়তো দশ-পনেরোজন। প্রথমটায় হয়তো এরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর মাঠ ভেঙে ছুটে আসতে লাগল।

যশোদাজীবন হতবাক! কী যে হচ্ছে তিনি বুঝতেই পারছিলেন না। ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা অবস্থা তাঁর। কৃষ্ণধামের কাজের লোক তো তিনটি—তারাও বোকার মতন এই অগ্নিকাণ্ড দেখছিল।

ঠিক যে কতক্ষণ সময় কাটল, বোঝা গেল না। হঠাৎ চন্দনের গলা পাওয়া গেল, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছে, "তারা, ধরে ফেলেছি, শিগ্‌গির আয়, ধরা পড়ে গিয়েছেন।"

তারাপদ ফটকের দিকে দৌড়ে গেল। খোলাই ছিল ফটক। চন্দনকে দেখতে পেল তারাপদ, বুড়োমতন এক ভদ্রলোককে জাপটে ধরে রেখেছে চন্দন।

হীরালাল।

বারান্দায় একটা চেয়ারে বসানো হল হীরালালকে। ভদ্রলোকের যেন হুঁশ নেই। কী দেখছেন, কাদের দেখছেন—বোঝাই যায় না। কাঁপছেন তখনও। কপালে ঘাম। চন্দন একবার নাড়ি দেখল ভদ্রলোকের। বলল, "আগে জল দিন ওঁকে, একটা পাখা এনে বাতাস করুন কেউ।"

যশোদা প্রায় কেঁদে ফেললেন, "বড়বাবু!"

জল এল, পাখাও এল।

হীরালাল জল খেলেন, চোখেমুখে দিলেন। একজন পাখার বাতাস করতে লাগল।

আগুন ধরেছে দেখে যারা ছুটে এসেছিল তারা দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর যশোদার কথায় চলে গেল একে-একে। কৃষ্ণধামের গায়ে কোথাও আগুনের চিহ্ন নেই, বাগান ছাড়িয়ে পাঁচিলের গায়ে-গায়ে যা আগুন জ্বলছে তখন, তাও নিভে এসেছে বারোআনা।

হীরালাল কাশছিলেন। যশোদা বড়বাবুর জন্যে লবঙ্গ আনতে বললেন।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে হীরালাল খানিকটা সুস্থ হলেন। যশোদাকে বললেন, "এসব কী? এঁরা কারা?"

কিকিরাই কথা বললেন, "আমরা আপনার খোঁজেই এসেছিলাম। আমি কিঙ্করকিশোর রায়, লোকে বলে কিকিরা। এরা দু'জন আমার চেলা, তারাপদ আর চন্দন। ...আমরা নিজের গরজে আসিনি মশাই, যশোদাবাবু আমার চেনা লোক, উনিই আমায় ধরে এনেছিলেন।"

"আপনারা পুলিশ...?"

"না। আপনি যা করেছিলেন—তাতে থানা-পুলিশ করা যেত। করা হয়নি। আপনি বুড়োমানুষ, আপনার মতন মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকার কথা। তবু এমন ভীমরতি ধরল কেন? আপনি কি জানেন না, আত্মহত্যা করার শাসানিও পুলিশ ভাল নজরে দেখে না।

pathagar.net

কেন আপনি এসব থিয়েটার করতে গিয়েছিলেন! কেন?"

হীরালাল কথা বলতে পারছিলেন না। অসহায়ের মতন মুখ করে যশোদার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ জলে ভরে আসতে লাগল। বিপন্ন, হতবুদ্ধি মানুষ।

কিকিরা বললেন, "কী হয়েছিল আপনার? ...আমি আপনার লেখা কাগজের টুকরোগুলো পড়েই বুঝেছিলাম—আত্মহত্যা করার মানুষ আপনি নন। এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছেন।"

হীরালাল আধ-বোজা গলায় বললেন, "আপনারা আমায় ধরে আনলেন!"

"আমরা নিমিত্ত ; আপনাকে ধরে এনেছে—আপনার কৃষ্ণধাম। আপনার এত সাধের, এমন ভক্তি-ভালবাসার বাড়ি, বিগ্রহ পুড়ে যাবে—সে কী আপনি জীবন থাকতে সইতে পারেন! দেখুন মশাই—মানুষ যা ভালবাসে অন্তর দিয়ে, ভক্তি করে, বিশ্বাস করে—তার ক্ষতি সইতে পারে না। আপনি ধার্মিক মানুষ, বিশ্বাসী মানুষ, ন্যায়-অন্যায় বোধ রয়েছে। সৎ সহজ ভদ্রলোক আপনি। এই কৃষ্ণধাম আপনাকে টেনে এনেছে। কিন্তু কোন আঘাতে অভিমানে আপনি চিঠিগুলো লিখেছিলেন বলুন তো?"

হীরালাল প্রথমটায় কথা বলতে পারছিলেন না। ঠোঁট কাঁপছিল।

"বলুন! সত্যি কথাই বলুন।"

"আমার বড় ছেলে—" হীরালাল বললেন। "আমার বড় ছেলে কানাই যা করতে যাচ্ছিল তার চেয়ে বড় অন্যায় অধর্ম কী হতে পারে!"

"কী করতে যাচ্ছিল?"

"আমাদের শ্যামবাজারের আদি দোকানে আগুন লাগাবার ফন্দি করেছিল। দোকানের গায়ে একটা ছোট দরজির দোকানও আছে। ভাল চলে না আজকাল। আমাদের দোকান অনেক আগেই ইনসিওর করিয়ে নিয়েছিল ছেলে। পরে আরও মোটা টাকায় ইনসিওর করায়। দোকান বেড়েছে, মালপত্র বেড়েছে, কাজেই অসুবিধে হয়নি।"

কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন।

হীরালাল বললেন, "হঠাৎ একদিন আমার কানে গেল, কানাই দোকান থেকে তলায় তলায় দামি শাড়ি কাপড়চোপড় সরাচ্ছে। এর পর ভাড়াটে লোক দিয়ে আগুন ধরাবে। তারপর ইনসিওরেন্স থেকে টাকা নেবে। বখরার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল বোধ হয়। দোকান পুড়িয়ে সে নতুন করে সাজিয়ে পশার বসাবে। এয়ারকণ্ডিশন করবে। দরজির দোকানটাকে কিছু টাকা দিয়ে তুলে দেবে। ...বলুন, এ অধর্ম নয়, পাপ নয়, জুয়াচুরি নয়! আমি আমার কাঁধে, মাথায় শাড়ির বোঝা বয়ে জীবন শুরু করেছিলাম। অনেক রক্ত জল করে আমার ওই দোকান। প্রায় চল্লিশ বছরের...! সেই দোকানে আজ ও আগুন লাগাবে!" হীরালাল কপাল চাপড়ে ছেলেমানুষের মতন কেঁদে ফেললেন।

তারাপদ বলল, "আপনি ছেলেকে বলতে পারেননি কিছু?"

"না বাবা, পারিনি। যদি অস্বীকার করত! তা ছাড়া কী জানো? সন্তানস্নেহ মানুষকে শুধু অন্ধ করে না, তার বিবেককেও বোবা করে রাখে। ধৃতরাষ্ট্রের কথাই মনে করো।"

কিকিরা বললেন, "আপনার বড় ছেলে দেখছি অতি ধূর্ত, সে নিজে গিয়ে কাশীতে বসে থাকল কাজের ছুতোয়, আর এখানে দোকান পোড়াবার জন্যে লোক লাগিয়ে গেল!

যেন তাকে কেউ সন্দেহ না করে।"

"ঠিকই বলেছেন আপনি। ...আমি ভেবেছিলাম চিঠিগুলো ছেলেদের হাতে পড়লে হয়তো..."

"আপনার মেজ ছেলে, ছোট ছেলে—এসব কিছু জানে না?"

"না।"

"আপনি কোত্থেকে জানলেন?"

হীরালাল মুখে বললেন না কিছুই। শুধু ঘাড় তুলে একবার যশোদার দিকে তাকালেন।

"তা কোথায় লুকিয়ে ছিলেন এতদিন?"

"মিশনারিদের বাড়িতে। ওখানকার সরকারবাবু আমার জানাশোনা। বন্ধুর মতন। ওঁর আশ্রয়েই ছিলাম।"

কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

ডিটেকটিভ

মনোজ বসু

কলমটা নেই। সোনালী দামি কলম—এ জিনিস বড় দুর্লভ এখনকার দিনে। সকলের বড় কথা, কলমটা বড় মেনে দিয়েছিল, অভ্যাসের গুণই হয়তো—এ কলম হাতে নিয়ে বসলে ঝরঝর করে লেখা বেরিয়ে আসে। ভাবতে হয় না মোটে, কলমই যেন বানিয়ে বানিয়ে লিখে যায়! এ হেন কলমটা গেল। সারা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজছি। লেখা-টেখা মাথায় উঠে গেছে। হাত মুচড়ে নুলো করে দিল, লিখব আর কি করে?

শান্তা আর আমি—দু'জনের সংসার। আর ছোকরা চাকর একটি রঞ্জিত। এ হেন অবস্থায় স্ত্রীর কাছে লোকে সহানুভূতির প্রত্যাশা করে। ঠিক উল্টো। রণং দেহি ভাব শান্তার ঃ কে তোমায় নুলো করল শুনি? মানুষটা কে? চোর—

ঠারেঠোরে বললে হবে না। কাকে সন্দেহ করছ, শুনতে চাই—

মোটমাট তিনজন তো আমরা। আমার জিনিসটা নিজে আমি চুরি করতে যাই নি। আর টাকাকড়ির ব্যাপার হলে না হয়—

ঢোক গিলে বলি, মানে নিজের জন্য নয় ভাবতে পারতাম, সংসার খরচের দায়ে

নিয়ে নিয়েছ তুমি। কলম কেন তুমি নিতে যাবে? শান্তা এগিয়ে এল, তিন জনের ভিতর দু'জন তবে বাদ হয়ে গেল। রইল গিয়ে—

বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠল ঃ সে জানি। রঞ্জিত দু-চোখের বিষ হয়েছে তোমার। 'মা' বলে ঐ যে আমার কাছে কেঁদে এসে পড়েছিল, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছি। অনাথ গরীব মানুষ—সে চোর না হয়ে অন্য কে হতে যাবে?

তা বলে কলম টেবিল থেকে পাখনা মেলে উড়ে পালাতে পারে না। গর্জে উঠল শান্তা, তুমি সরিয়েছ দোষটা রঞ্জিতের ঘাড়ে পড়বে বলে। তাড়ানোর অজুহাত।

কুরুক্ষেত্রের উদ্যোগপর্ব। এমন সময় যাকে নিয়ে ব্যাপার সেই রঞ্জিত কেঁদে এসে পড়ল ঃ সর্বনাশ হয়েছে মাগো। ঘুমিয়েছিলাম দুপুরবেলা, বালিশের তলায় চাবি দিয়ে বাক্স খুলে দশটাকার নোটখানা নিয়ে নিয়েছে। আর বাবু যে সেই রুমাল দিয়েছিলেন—

আরো জিনিস নিয়েছে হয়তো। কিন্তু রুমালের কথায় স্বররুদ্ধ হয়ে রঞ্জিত আর বলতে পারে না। বম্বে থেকে আমার এক বন্ধু ডজন খানেক ছাপা রুমাল পাঠিয়েছিল, একটা তার মধ্যে বখশিস করেছিলাম রঞ্জিতকে। মানে শান্তাই দিয়েছিল তাকে। সামনের ফাল্গুনে রঞ্জিতের বিয়ে--বিয়ে করতে যাবার সময় বুকপকেট থেকে শৌখিন রুমালের একটা কোণ বের করে দেবে, বরের বাহার খুলবে তাতে। রুমাল পরম যত্নে সে বাক্সে রেখে দিয়েছিল।

শান্তা চোখ পাকাল আমার দিকে। অর্থাৎ রঞ্জিতকে বড় যে সন্দেহ করেছিলে—এবার? নেহাৎ রঞ্জিত সামনের উপর বলে কথাগুলো বলল না তোলা রইল জানি, নিরিবিলিতে সুদে-আসলে শোধ নেবে। আমি সান্ত্বনা দিই, ভাবছ কেন রঞ্জিত? রুমাল আরও আছে, আর একটা দেবো। টাকা দশটাও দিয়ে দেবো। বিয়ের সাতটা মাস মাত্র বাকি—টাকা এখন তোমার কাছে দশ মোহরের সমান। তোমার টাকা-রুমাল যে নিয়েছে সেই লোকই আমার লেখার ঘরে ঢুকে কলম চুরি করেছে। দিন দুপুরে ঘরে ঢুকে চুরি করেছে। ছাড়ব না আমি, ডিটেকটিভ লাগিয়ে চুরির আস্কারা করব।

ধাপ্পা নয়। একেবারে হাতের কাছেই ডিটেকটিভ—দুর্গাদাস। আমায় খুব খাতির করে। রণক্ষেত্র যতক্ষণ রঞ্জিত মাত্র ছিল ডিটেকটিভের নামোচ্চারণের উপায় ছিল না, শান্তা আস্ত রাখত না তা হলে আমায়। তৃতীয় লোক এসে পড়ায় এখন আর বাধা নেই।

কলমটা চাই দুর্গাদাস, তবে বুঝব তোমার ক্ষমতা। দুর্গাদাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদ্যোপান্ত শুনল। বলে, তদন্ত আমরা বাড়ি থেকে শুরু করি। আগে চাকর-বাকর—শিউরে উঠে বারণ করি ঃ দাদা বলে মান্য করো, আমায় কেন বিপদে ফেলবে। চাকর নামে যিনি এ বাড়িতে বিচরণ করেন, আসলে তিনি গুরুঠাকুর—

খাতিরে দুর্গাদাস পদ্ধতি বদলায়। বলে, ড্রয়ার থেকে কলম নিয়ে গেছে। বাকি ড্রয়ার সুদ্ধ হাতড়েছে নিশ্চয়? যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকবে, আপনার কি বউদির কারো হাতের ছাপ না পড়ে।

রঞ্জিতকে ডেকেও সেই কথা, তোমার খোলা ট্রাঙ্ক যেমনটি আছে রেখে দাও। সকালবেলা আমাদের লোক আসবে।

পরের দিন ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা এসে গেল। ম্যাগ্নিফাইং-গ্লাস ঘুরিয়ে এখানে-

ওখানে বিস্তরক্ষণ প্রণিধান করে দেখে। টেবিলের উপর আর রঞ্জিতের বাক্সে সাদা মতন গুঁড়ো ছড়িয়ে সন্তর্পণে মুছে দেয়। ক্যামেরা নিয়ে এসেছে টুকটুক করে ফোটো তুলল বিস্তর। দলবল নিয়ে বিদায় হয়ে গেল।

ক'দিন পরে দুর্গাদাসের আবির্ভাব। হদিস পেলে কিছু?

তাচ্ছিল্যের সুরে দুর্গাদাস বলে, পাব না মানে? এই বিজ্ঞানের যুগে চোর ধরা তো ডাল-ভাতের সামিল। চুরি করতে এসে চোর নাম-ধাম লিখে রেখে যায়। লেখা সব নিয়ে এসেছি, শুধু পড়ে নেবার অপেক্ষা। আঙুলের ছাপের একগাদা ফোটোগ্রাফ ব্যাগ থেকে বের করল। দু'খানা বাছাই করে নিয়ে মেলে ধরল সামনে ঃ দেখুন—

আমি কি বুঝব? তুমি পড়তে জানো পড়ে দেখে যা বলবার বলো। কিছু বিরক্তি হয়ে দুর্গাদাস বলে, কেন বুঝবেন না? কানা মানুষও বুঝতে পারবে ফোটো হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, মিলিয়ে দেখুন। এই ছাপ আপনার টেবিলের উপরের, আর ওটা রঞ্জিতের বাক্সর। কি দেখছেন বলুন এবারে?

দেখছি তো অন্ধকারই শুধু। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করে বলা যায় না। দুর্গাদাস সদয় হয়ে বুঝিয়ে দিল ঃ কার্ভ মিলিয়ে দেখুন, হুবহু এক। একই হাতের আঙুলের ছাপ। দুটো মানুষের মুখের আদল কিম্বা হাতের লেখা যেমন এক হয় না, আঙুলের ছাপও তেমন একরকম হবার জো নেই। চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়ে দিই, আসুন।

ব্যাগের মধ্যে দেখছি কালির প্যাডও রয়েছে। সম্মতির অপেক্ষা মাত্র না করে প্যাডের কালি আমার বুড়ো আঙুলে মাখিয়ে দুর্গাদাস ছাপ তুলে নিল। রঞ্জিতকে ডাকে ঃ তুমি এসো। তারও আঙুলের ছাপ নিল। দুটো ছাপ চোখের সামনে নিয়ে ভাল করে দেখে আমার হাতে দিল ঃ একেবারে আলাদা দেখছেন? হতেই হবে। সিদ্ধান্ত তা হলে কি দাঁড়াচ্ছে।

আনাড়ির মতো বলে ফেলি, আমার কলম আর রঞ্জিতের রুমাল একই লোক নিয়েছে।

সায় দিয়ে দুর্গাদাস আরও জুড়ে দেয় ঃ সেই লোক আপনি নন, রঞ্জিত নয়। যেহেতু ছাপ আলাদা। চোর হল বাইরের, দিন দুপুরে বাইরে থেকে এসে ঢোকে পয়লা নম্বরের ঘুঘুচোর সে মানুষ—কিন্তু মানুষটা কে, ধরো।

দুর্গাদাস তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, তদন্তের পনের আনা সেরেছি তো ঐ এক আনাও বাকি থাকবে না দাদা। মানুষ ধরব, দেখিয়ে নিয়ে যাবো।

অবাক হয়ে বলি, এক আনা কি বলছ দুর্গাদাস? আরও তো বাড়ল গোলমাল—ঘর নাকচ করে অজানা সমুদ্রে দাপাদাপি।

দুর্গাদাস বলে, অজানা নয়, সমুদ্রও নেই আর। ঘুঘুচোর বলেই সুবিধা-পুকুরের মাছের মতন তারা সব আমাদের কাছে জিয়ানো থাকে।

রেজেষ্ট্রি-খাতায় নামধাম কাজকর্মের ফিরিস্তি, লাইব্রেরীতে ফিংগার প্রিণ্টের বিপুল সংগ্রহ। ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে হাত পড়ানোর কাজটুকু মাত্র বাকি এখন। মানুষ আমি আন্দাজে ধরছি একজন দু-জন নয় ভারী-সারি দিব্যি একটি দল। একলা তোমার বাড়ি নয় দাদা, পাড়ায় পাড়ায় এমনি রহস্যময় চুরি হচ্ছে।

করিৎকর্মা বটে দুর্গাদাস। পরের দিনই হাতকড়া পরানো একটি লোক নিয়ে আমার বাড়ি হাজির। চোর দেখতে সকলে বারান্দায় এসে জুটেছি। কঙ্কালসার চোরকে সামনে থেকে টানছে এক কনস্টেবল, পিছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে আর একজন। দুই ইঞ্জিনে চালিয়ে নিয়ে এসেছে, নইলে মুখ থুবড়ে পড়ে যেত নিশ্চয়।

দুর্গাদাস রঞ্জিতকে বলে, চিনতে পারো কিনা দেখ। এ বাড়ির আশে পাশে কিম্বা পাড়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখছ কিনা।

রঞ্জিত এক নজরে আবিষ্ট হয়ে দেখছিল। থতমত খেয়ে বলে উঠল, কই না।

দুর্গাদাস হুঙ্কার দিয়ে ওঠে ঃ ঠাহর করে দেখে বলো। চোর হুট করে ঘরে ঢোকে না। আগে থেকে ঘোরাঘুরি করে সুযোগ সন্ধান নেয়। তখন বুদ্ধিদিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। হুঁ, দেখেছি বটে।

লোকটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, দেখেছ আমায়, কোথায় দেখেছ? ধর্মকথা বলো।

সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্গাদাস তার চুলের মুঠি ধরল ঃ আবার চালাকি খেলছিস? খেলা করে পার পাবিনে, সত্যি জিনিস সরল ভাবে স্বীকার কর।

লোকটা তটস্থ হয়ে বলে, যে আজ্ঞে। এই রাস্তায় এই বাড়ি থেকেই নিয়েছি আমি। টিনের বাক্স থেকে টাকা নিয়েছি, টেবিলের খাপ থেকে কলম। প্রশ্ন করি, কি রকম টেবিল আমার বড় না ছোট? কি রঙের? টেবিল আছে কোন্ ঘরে।

দুর্গাদাস আহত কণ্ঠে বলে, ঐটা কিন্তু জুলুম আপনার দাদা।

অত্যাচারই বলব। টুক করে এসে কাজ সেরে চলে গেছে তার মধ্যে ফিতে মেপে টেবিলের মাপজোখ করবে? ঘর নিরিখ করে রাখবে। এত সময় ছিল কোথা? জেরা করবেন না, জেরায় হেরে যাবে।

লোকটাও কবুল জবাব দিল ঃ আজ্ঞে না, জেরায় পেরে উঠব না! বেশ, জেরা বন্ধ। পায়ের উপর ছড়াছড়া দাগ কিসের বাপু? এটা কিছু মাপজোখের ব্যাপার নয়, এটা বলো।

দুর্গাদাস হেসে বলে, জবাব দেবে। সত্যি কথাই বলবি। দাদা কত কি সন্দেহ করছেন হয়তো। এত খেটে মরি, বদনামের তবু অন্ত নেই কি হয়েছিল, পায়ের উপর কিসের দাগ ওগুলো?

একবার দুর্গাদাসের দিকে তাকিয়ে লোকটা বলে, মশা বড্ড লক আগে, খানিকটা আপন মনে দুর্গাদাস বলে, এতদুর, বুঝতে পারিনি। আজকেই মশারির বন্দোবস্ত হবে, মশা আর কামড়াতে পারবে না।

আমি বললাম, তাই তো উচিত। গড়গড় করে সবাই স্বীকার করে গেল, এর উপরে আর মশা দিয়ে কামড়ানো উচিত হবে না। কিন্তু আসলে কিছু হয়নি দুর্গাদাস। চোরের গরজ নেই, আমি চাই কলম।

অমন কলম একটা বই দুটো হয় না।

দুর্গাদাস মাথা চুলকে বলে, সেই তো মুশকিল দাদা। মাল চোরে সঙ্গে সঙ্গে পাচার করে দেয়। খুন করে ফেললেও তারপরে আর খোঁজ দিতে পারে না। চোর ধরে এনে দেখিয়ে গেলাম, কলম আনতে পারব কিনা কথা দিতে পারি নে।

সরেজমিন তদন্ত সেরে চোর নিয়ে দুর্গাদাসের দলটা চলে গেল। এতক্ষণের নির্বাক শান্তা এইবারে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তুমি যে খুশি নও মনে হচ্ছে। রঞ্জিত ফসকে গেল সেই দুঃখে? সংসারের মালিক হলে তুমি আমায় মা বলতে অজ্ঞান, সেই দোষে রাখতে না চাও স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিলেই তো হয়। নির্দোষীকে কলঙ্ক দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা কেন?

রঞ্জিত জানতাম সিঁড়ির ঘর মুছতে চলে গেছে। তা নয়, হতভাগাটা ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল, দোর ঠেলে হঠাৎ নাটকীয় ভাবে ঢুকল। বলে, এখন চলে গেলে সন্দেহ আসবে, সেই জন্য আছি। নয় তো সেই চুরির দিনই বিদায় হয়ে যেতাম। গণ্ডগোল মিটে গেলে তারপর একটা দিনও আর থাকব না, এই আমার বলা রইল। শান্তা কটমট করে তাকাচ্ছে। বিগলিত কণ্ঠে আমি বলে উঠি : এটা কি হল বাবা রঞ্জিত, আমাদের দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে ছেলে হয়ে কেন আড়ি পাতবে? শান্তা বকাবকি করে সেই সঙ্গে তুমিও যদি লাগো, বাড়ি ছেড়ে আমি বেরিয়ে পড়ব। ছেলেয় মায়ে চালাও গে তোমাদের সংসার।

তবু সরে পড়ে না দেখে আচ্ছা এক তাড়া দিয়ে উঠলাম : যাও, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। চেহারাখানা কি দাঁড়িয়েছে, আয়না ধরে দেখ। চানটান করে খেতে বসোগে এবার।

রঞ্জিতকে ঠাণ্ডা করলাম। তবু শান্তা ভ্রূকুটি করে : গোড়া কেটে আগায় জল, সবাই বুঝতে পারে। মুখেই ছেলে ছেলে করছ—বিশ্বাস করো ও কে? তা যদি হত, লেখার ঘরে তালা দিয়ে বেরুতে না অমন। সেটা বাচ্চার অত্যাচারে। সেদিন দেখলাম, ঘরে ঢুকে টেবিল হাণ্ডুল পাণ্ডুল করছে। বাচ্চা হল পাশের ফ্লাটের। আসে সে প্রায়ই, কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জেঠা-জেঠা করে আমায়।

শান্তা তাই বলল, বাচ্চার অত্যাচার তো নতুন নয়। কলম চুরি যাবার পর থেকেই তুমি তালা আঁটাআঁটি করছ। রঞ্জিত কি মানে বোঝে না এর?

তারপরে ঠাণ্ডা মাথায় আদ্যোপান্ত ভেবে নিয়ে পড়ার ঘরের চাবি রঞ্জিতকেই দিয়ে দিলাম, দেখ বাবা, চাবি হারানো আমার রোগ। কত যে চাবি হারিয়েছি, গোনা গুণতি নেই। অথচ ঘর খুলে রাখবারও জো নেই বাচ্চাটা ইদানীং বড় বাড়িয়েছে। তুমি রেখে দাও চাবি, আমি এলে খুলে দিও।

এই মাত্র নয়, ক'দিন পরে আলমারির চাবি গুঁজে দিই তার হাতে। যে আলমারিতে আমার টাকা পয়সা থাকে : এই ভারটাও নিতে হবে বাবা। তোমার মা খরচে মানুষ, এক হপ্তায় খরচা করে ফেলে সারা মাস উপোস করাবে। আর আমিই বা লেখাপড়া ফেলে এক টাকা দু'টাকা করে কাঁহাতক বের করে দিই। তোমাকেই সব দেখে শুনে বিলি ব্যবস্থা করতে হবে। চাপটা বেশি হয়ে যাচ্ছে জানি, কিন্তু উপায় নেই বাবা।

চাবি হাতে নিয়ে রঞ্জিত কেমন এক আচ্ছন্নভাবে তাকিয়ে থাকে। চোখ ছলছল করে যেন তার। শান্তাই তখন বলে, বাড়াবাড়ি তোমার। মিছে সন্দেহ করবে না—তা বলে কি এমনি ঢেলে বিশ্বাস করতে হবে। এমনি ব্যবস্থার ভিতরেও আবার চুরি হল। হাতঘড়ি আমার। সন্দেহ পাছে রঞ্জিতের উপর পড়ে, সেই শঙ্কায় আমিই শতকণ্ঠে নিজের দোষ

বলছি ঃ ভুলো স্বভাব যে আমার। ঘড়িটা হাতে করে নিয়ে বাইরের বেঞ্চিতে বসেছিলাম। কথায় কথায় পরতে আর মনে নেই, ওখানে ফেলেই চলে গিয়েছি। তারপর দফাদার এসেছে, ডাকপিওন এসে চিঠি দিয়ে গেছে—পেশাদারি চোরও হতে পারে। দুর্গাদাসকে ডাকি। বেঞ্চির ওদিকটা কেউ তোমরা যেও না—সে এসে হাতের ছাপ টাপ নিয়ে তদন্ত করুক।

ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞা ভরে রঞ্জিত বলে, করবে কচু আর ঘেঁচু। ভাঁওতা দিয়ে গুচ্ছের টাকা নেবার ফিকির।

তা বললে হবে কেন রঞ্জিত। কলমের চোর ওই তো ধরল। বাড়ি এনে দেখিয়ে গেল চোরকে। রঞ্জিত বলে, কলম দিল কই?

আরো কঠিন ব্যাপার সেটা। চেষ্টা করছে। ভরসা দিল, এই মাসের ভিতরেই পাওয়া যাবে। রঞ্জিত বলে, ঘোড়ার-ডিম।

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে, আমি নিয়েছি কলম। মারতে হয় মারুন, কাটতে হয় কাটুন। আমারই দোষে একটা লোক মিছিমিছি মারগুতোন খেলো।

দু-চোখে জল পড়ছে তার, তুলে ধরে আমি হাসছি। রঞ্জিত বলে, বিয়ের জন্য ধরেছে তো সকলে—পনের টাকার দরকার। লোভে পড়ে নিয়েছিলাম। কলম আবার আমি বাড়ি এনে রেখেছি। আপনি ধরেছিলেন ঠিকই। আপনার দুর্গাদাস কিছু জানেন না, ওঁকে আনা অনর্থক।

হাসতে হাসতে বলি, না আনব না। ঘড়ি আমি নিয়ে নিয়েছি। শান্তা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে চেয়ে বলি, শুনেছ সব?

দুর্গাদাসের চেয়ে বড় ডিটেকটিভ তবে আমি—কি বলো?

pathagar.net

হীরের আংটি

প্রতিভা বসু

দরজা খুলে সন্দীপ খুশির গলায় বলে উঠল, "এই তো বিকাশমামা এসে গেছেন। কী হয়েছিল? এতদিন আসেননি কেন? মা তো ভেবে অস্থির। ভাল আছেন তো?"

"তোরা সব ভাল তো?" বিকাশমামা ঘরে ঢুকে এলেন।

বসার ঘরে নিয়ে বসাতে-বসাতে সন্দীপ বলল, "আমরা সবাই ভাল। আপনার ভক্ত-হনুমানটি তো একজোড়া নতুন তাস কিনে বসে আছে কবে তার মামাদাদু এসে তাদের ম্যাজিক শেখাবে।"

"কোথায় সে?"

"এবার তার ক্লাস টেন হল। নতুন ক্লাসে উঠেছে। নতুন বই কেনা হয়েছে মহা উত্তেজিত। দাঁড়ান ডাকছি।"

ডাকার আগেই ভক্ত-হনুমান হাজির, "তুমি এসেছ মামাদাদু? তুমি আমাকে সেদিন যে দুটো খেলা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলে সে দুটো দেখিয়ে আমি তো সারা স্কুলে নাম করে ফেলেছি। আজ আরও দুটো শিখিয়ে দিয়ে যেতে হবে, নইলে আর আমার মান

থাকছে না।"

"নিশ্চয় শিখিয়ে দেব। তোমার দিদা কোথায়? তাকে ডাকো আগে।"

বিকাশমামা সন্দীপের আত্মীয়-মামা কিন্তু নিজের মামার মতোই। হৈমন্তী দেবী নিজের ভাইয়ের সঙ্গে এই ভাইয়ের কোনও তফাত করেন না। বরং এই ভাইয়ের সঙ্গে বেশি দেখাশুনো হয় বলে সম্পর্কও নিকটতর। ইনি থাকেন কলকাতা থেকে দু'ঘণ্টা দূরের পথ লক্ষ্মীগঙ্গাপুর। টানা বাসে চলে আসেন। সপ্তাহে দু'দিন তো আসেনই আবার বিপদে-আপদেও বুদ্ধি-পরামর্শ নিতে ছুটে আসেন। এবার এলেন প্রায় সতেরো আঠারো দিন বাদে।

হৈমন্তী দেবী এসে বলেন, "কী রে কী হয়েছিল তোর? এতদিন আসিসনি কেন? আমি তো ভাবছিলাম আমিই চলে যাই অন্তুকে নিয়ে।"

বিকাশমামা বললেন, "গেলে না কেন? খুব ভাল হত। বড় অশান্তি চলছে বাড়িতে।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"আমাদের নীলকান্তমণির আংটিটা হারিয়ে গেছে।"

"সে কী!" হৈমন্তী দেবী চমকে গেলেন, "তোদের দুশো বছরের পুরনো আংটি, চোদ্দপুরুষ ধরে তোরা এই নীলা ব্যবহার করে আসছিস, কী দামি পাথর। এই হীরে এখন তুই পাবি কোথায়? কেমন করে হারাল?"

"সেটাই তো রহস্য। তোমার বাড়িতে যেদিন শেষ এলাম......"

"সেদিন তো তোর আঙুলে ছিল ওটা। সবাই দেখল—কত বড় একটা মারবেলের মতো হীরে—কী ঝিলিক দিচ্ছিল।"

দুঃখিত স্বরে বিকাশমামা বললেন, "মিউজিয়াম থেকে লোক এসেছিল ওটা নেবার জন্য, একটা সাংঘাতিক দামের অফার দিয়েছিল ওটা নেবার জন্য, কিন্তু ওটার দাম তো টাকায় হয় না? ওটা ধারণ করলে আমরা তার চেয়ে অনেক বড় সৌভাগ্যকে ধরে রাখতে পারি। সব-সময় ব্যবহার করি না। নানা কারণে কিছুদিন যাবৎ ওটা ধারণ করছিলাম—গেল! আর যেতে-যেতেই দুটি দুর্ঘটনা—"

"কী?"

"বম্বেতে ছেলের একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। ঈশ্বরের দয়ায় প্রাণে বেঁচেছে, হয়ওনি কিছু, তবে সাত দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। আবার এদিকে সেই রাত্রেই শুভ্র একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরল। জামা ছেঁড়া হাতে রক্ত খেলার মাঠ থেকে কারা ডেকে নিয়ে গিয়ে নির্জন রাস্তায় খুব মেরেছে। তোমার ভ্রাতৃবধূ তো প্রায় শয্যা নিয়েছেন। তুমি একবার যাবে আমার ওখানে? তুমি দু-একদিন থেকে এলে বাড়ির আবহাওয়াটা অন্তত একটু হালকা হবে।"

হৈমন্তী বললেন, "নিশ্চয়ই যাব। তুই পুলিশে খবর দিয়েছিস তো?"

"যা করার সব করেছি, কর্তাদের দরজায় ঘুরে-ঘুরে পায়ের দড়িও ছিঁড়ে ফেলেছি, কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

"তুই সীতেশকে চিনিস? তোর জামাইবাবুর বন্ধুর ছেলে, সীতেশ বর্মণ!"

"ঠিক মনে পড়ছে না।"

"ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে বেশ হোমরা-চোমরা লোক। হঠাৎ হঠাৎ আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আচ্ছা, দাঁড়া, আমি তাকে একটা ফোন করি।"

করলেন, পেলেনও। কিন্তু তখনই কলকাতার বাইরে কোথায় কোন্ ষড়যন্ত্রমামলার আসামিকে ধরতে যাচ্ছে বলে দু'দিন বাদে আসবে বলল।

লক্ষ্মীগঙ্গাপুর জায়গাটা খুব সুন্দর। একেবারে গঙ্গার ধারে। বিকাশমামার বাড়িটাও খুব সুন্দর। একতলা, ছোট বাড়ি, এটা তিনি পরিবার থেকে আলাদা হয়ে নিজে করে নিয়েছেন। পূর্বপুরুষেরা কিঞ্চিৎ তালুকমুলুকের অধিকারী ছিল বলেই এদের খেতাব তালুকদার। এখন আর বিশেষ কিছু নেই। যে যার করে-কম্মেই খায়। বাড়িঘর, জমিজমাও সব ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। বিকাশ তালুকদার ব্যবসা করেন। ব্যক্তিগতভাবে বেশ সচ্ছল। একটিমাত্র ছেলে, সেও বেশ উপযুক্ত, বম্বেতে থাকে। বাড়িতে এখন তিনি, তাঁর স্ত্রী আর তাঁর ভাগ্নে শুভ্র ছাড়া কেউ নেই। শুভ্র জন্ম থেকেই মামা-মামির কাছে মানুষ হয়েছে। শুভ্র পেটে থাকতেই তার বাবা মারা যায়, মা মারা যায় তার যখন তিন বছর বয়েস। মামা-মামিই তার মা-বাবা। মামা-মামিরও সে নয়নমণি। তাঁদের নিঃসঙ্গ জীবনের অবলম্বন।

হৈমন্তী দেবী পরের দিন সকালে উঠেই চলে এসেছেন এখানে। অন্তুও সঙ্গে এসেছে। অন্তু এখন ছোট নেই। রীতিমত ক্লাস টেনের ছাত্র, প্রায় ছ'ফুট লম্বা। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, দেখতে সুন্দর। ঠিক ছিল, বন্ধুদের সঙ্গে দিঘা যাবে দু'দিনের জন্য। কিন্তু তা না গিয়ে দিদা বলামাত্রই চলে এল এখানে। দিদা বলামাত্রই এল বলে যে সে এখন আগের মতোই দিদা ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখে তা নয়। এখন তার অন্য জীবন, অন্য মন, অন্য আড্ডা। এখন আর গোয়েন্দা-গল্পের পোকা নেই, অনেক জরুরি বই পড়ে ফেলেছে। একটি হাতে-লেখা পত্রিকা বার করেছে, যার নাম 'নতুন তোরণ'। একটা গল্পও লিখেছে। তবু যে এল তার কারণ কয়েকটা ম্যাজিক শেখা তার বিশেষ দরকার। নীলা চুরি যাবার ব্যাপারটাও কৌতূহলোদ্দীপক।

ঠাট্টা করে মামাদাদু বললেন, "এই যে আমাদের খুদে ডিটেকটিভটি এসে গেছে, আর ভয় নেই। শুভ্র, বাড়িটাড়ি ভাল করে ঘুরিয়ে দেখাও, ঠিক বার করে দেবে।"

এ-কথায় অন্তু লজ্জিত হল। ছেলেবেলায় কবে কী করেছে, তাই নিয়ে এখনও সবাই কেবল ঠাট্টা করে।

শুভ্রদার সঙ্গে সব সে ঘুরে দেখতে বেরোল ঠিকই, কিন্তু বাড়িটা ঘুরে দেখতে নয়, পাড়াটা। গঙ্গার ধারে গিয়ে বটগাছ তলায় বসতে ভীষণ ভাল লাগল।

শুভ্র ফুটবল খেলায় বেশ পটু, অন্তু যা একদম পারে না। সেজন্য সে বরাবরই শুভ্রদার ভক্ত। শুভ্রদার চেয়ে পাঁচ-ছ'বছরের বড়, সদ্য-সদ্য বারো ক্লাস পাশ করেছে। স্থানীয় কলেজেই এখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র।

উদার গলায় শুভ্র বলল, "গঙ্গার জলের দিকে তাকালেই আমার কী ইচ্ছে করে জানিস?"

"কী?"

"মনে হয় একডুবে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে একেবারে সেখানে চলে যাই।"

'অন্তু ভাবল শুভ্রদা বুঝি মৃত্যুর কথা বলছে। হেসে বলল, "এত দুঃখ তোমার কী যে একেবারে সেইখানে চলে যাবে?"

শুভ্র বলল, "দুঃখ না হোক, সুখই-বা কী! বাড়ির যা হাল হয়েছে আংটি হারিয়ে!"

"সে তো হবেই। ওরকম একটা দুষ্প্রাপ্য নীলা। তার ওপরে কতকালের পুরনো স্মৃতি। আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে।"

"আমারও তো হয়েছে, তা নয়। আমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আমেরিকা যেতে চাই। এখানকার কোনও কিছুই আমার ভাল্লাগে না।"

"ও, তুমি আমেরিকা যেতে চাও? আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম। বেশ তো এখন তো ওখানে যাওয়া খুব সহজ।"

"সহজ, না? টাকাটা কে দেবে চাঁদু?"

"স্যাট দিলে না কেন? ভাল করে পাশ করলে হয়তো একটা স্কলারশিপ পেয়ে যেতে। বাদবাকি খরচ মামাদাদু দিতেন।"

"আমি পাব স্কলারশিপ?" হাহা-হিহি, হাসতে-হাসতে মরে গেল শুভ্র, "আমি ক'বার ফেল করেছি জানিস? তবু মামণি আর মামাবাবু আমাকে পড়াবেই পড়াবে। বলে বি. এ.-টা অন্তত পাশ কর, নইলে তো কোনও চাকরিই পাবি না। আমি যেন চাকরির জন্য অস্থির। চাকরি করে কেউ কখনও বড়লোক হয় না?"

অন্তু প্রসঙ্গ বদলে বলল, "পুলিশ কী বলে? পাথরটা ওরা বার করতে পারবে? তোমার কী মনে হয়?"

"দূর, দূর, ওরা কি সব-কিছু পারে নাকি? কোনওদিন শুনেছিস? অত সহজ নয়। সেদিন পুলিশের লোকজন এসে কত রঙ্গ দেখাল। এদিকে কাজ হল না কিছুই।"

"কাল তো সীতেশ বর্মণ আসবেন।"

'আরে, আসে, আসুক। সব বর্মণকেই আমার দেখা আছে। পাথরটা হেভি দামি। মিউজিয়াম পিস। মিউজিয়ামের লোক এক লক্ষ টাকায় কিনতে চায়। মামাবাবুটা এমন বোকা, বলে যে টাকা দিয়ে আমার কী হবে? আরে বাবা, টাকা দিয়ে কী না হবে শুনি? টাকা দিয়েই তো সব হয়? বাড়ি হয়, গাড়ি হয়, সুন্দরী বউ হয়, ইচ্ছে করলেই আমেরিকা যাওয়া যায়..."

অন্তু হেসে ফেলল, "তোমার খুব আমেরিকা যাবার শখ না?"

"দারুণ। জানিস ওখানে গেলে কতো ফূর্তি, কত মজা, কত টাকা, কত নাইট ক্লাব। আঃ একবার যদি যেতে পারি না—ওই আংটি আঙুলে আটকে বসে কী হবে? মামাবাবুর পরে মামাবাবুর ছেলে পাবে এই তো?"

অন্তু বলল, "তা কেন, তোমাকেও দিতে পারেন, তুমিও তো ছেলে। মামিদিদা বোধ হয় বাবলুদার চেয়ে তোমাকেই বেশি ভালবাসেন।"

"পাগল! আরে বাবা, ছেলে আর ভাগনে কখনও সমান হয়। তার উপরে বংশ? বংশানুক্রমে তো আসতে হবে ওটাকে।

"মামিদিদা ভাবছেন ওই নীলাটা হারিয়েছে বলেই তুমি সেদিন মার খেয়েছ।"

"ধুত, যত সব বাজে সংস্কার।"

"তবে এতদিন কখনও মার খেলে না, সেদিন খেলে কেন?"

"চেষ্টা চলেছে অনেকদিন থেকে, বুঝলি? সুযোগ পায়নি। সেদিন সদ্য-সদ্য জিতেছি--গুণ্ডাগুলো ধরে ফেলল। মাঝখান থেকে সুন্দর জামাটা আমার ছিঁড়ে গেল। কী সুন্দর বেলকুঁড়ি বোতাম ছিল, একেবারে জবাফুল রঙের সিলকের জামা, কত দাম। এই সেদিন জন্মদিনে মামণি করিয়ে দিলেন।"

'মাত্র তো একটা বোতামই ছিঁড়ে পড়ে গেছে, পকেটটাই মাত্র ছিঁড়েছে। বুক-পকেটে দরকার কী তোমার? ওটা ঠিক সারিয়ে নিতে পারবে। চলো, এবার বাড়ি যাই, সন্ধ্যে হল।"

"চলো।"

দু'জনেই উঠে হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে।

পরের দিন রোববার। বেলা দশটা নাগাদ এসে পৌঁছে গেল সীতেশ। ছুটির দিনে এই আউটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। হৈমন্তী একটা চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন, "কলকাতা থেকে মাত্র দু'ঘণ্টার রাস্তা, গঙ্গা একেবারে বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যায়, এখানে এসেই একটা দিন কাটিয়ে যাও, খুব ভাল লাগবে। এটা আমার ভাইয়ের বাড়ি। এখানে এসে যে খাবে সে-কথা না লিখলেও চলে। তোমার জন্য ইলিশ মাছের পাতুরি আর চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্না করব আমি, যা তুমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসো। আর যে জরুরি কথাটা তোমাকে বলব, সেটা এখানে এলে জানতে পারবে।"লক্ষ্মীগঙ্গাপুরে পৌঁছে সীতেশ চিঠিটায় আর একবার চোখ বুলোল, ডিরেকশন দেখে নিল। তারপর তার ফিয়েট গাড়ি এসে থামল বিশাল তালুকদারের বাড়ির দরজায়।

বলাই বাহুল্য, কাকিমার হাতের পছন্দসই রান্না খেয়ে খুবই খুশি হল। বাড়ির লোকজনদেরও খুব ভাল লাগল। তারপর আসল কথাটা শুনল। বিকাশবাবু বললেন, "পুলিশের লোক দু'দিন এসে ঘুরে-ফিরে দেখে গেছে সব।"

হৈমন্তী বললেন, "তুমি যদি তোমার অফিসারদের একটু মনোযোগ দিতে বলো, আমার মনে হয় তাতে অনেক বেশি কাজ হবে।"

চিন্তা করে সমীর বলল, "আচ্ছা, মিউজিয়ামের ভদ্রলোক যখন পাথরটার বিষয়ে দাম বলছিলেন তখন কি ঘরে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল?"

বিকাশ বললেন, "না বোধ হয়। শুভ্র কলেজে চলে গেছে আর পঞ্চানন তো সে-সময়ে রান্নাঘরে ছিল।"

"পঞ্চানন কে?"

"আমার মা-বাবার আমলের পুরনো রান্নার লোক।"

"সে ছাড়া আপনাদের আর কোনও কাজের লোক আছে?"

"আছে। ঠিকে। আকাশীর মা। সুড়িপাড়া বস্তিতে থাকে।"

"কত দূর?"

"খুব দূর নয়। জায়গাটাই বা কতটুকু।"

"ওর কে আছে?"

"স্বামী নেই। মেয়ে-জামাই আছে, তারাও ওই বস্তিতেই থাকে।"

"যখন দেখলেন আংটিটা নেই, আপনার স্ত্রী তখন বাড়ি ছিলেন না?"

"না।"

"ভাগ্নেও নয়?"

"না।"

"ওরা ফিরলেন কখন?"

"স্ত্রী আটটার সময় ফিরলেন। শুভ্র সাড়ে ন'টায়।"

"কখন বেরিয়েছিলেন ওঁরা?"

"শুভ্র বেরিয়েছিল সাড়ে তিনটেতে। ওদের ক্লাবে সেদিন একটা টি-পার্টি ছিল। স্ত্রী বেরিয়েছিলেন তার খানিক বাদে, ওঁর এক বন্ধুর বাড়ি।"

"তারপর?"

"ওরা বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে আমি শুয়ে পড়েছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। উঠে দেখি প্রায় অন্ধকার সাতটা, সাড়ে সাতটা নাগাদ আমার এক জায়গায় যাবার ছিল। দৌড়ে চান করতে গেলাম। যাবার আগে খাবার টেবিলের ওপর ঘড়িটা আর আংটিটা খুলে রেখে গেলাম। আপনি তো খাবার ঘরটা দেখলেন সঙ্গেই বাথরুম। আর একটা দরজা আছে পাশে পিছনের উঠোনে যাবার জন্য। সেখানে টিউবওয়েল আছে, ওরা বাসনটোসন মাজে। উঁচু দেওয়ালে ঘেরা। দরজা বন্ধ ছিল। জানালাটা খোলা ছিল।"

এই সময় বিকাশ তালুকদারের স্ত্রী ঊষা বললেন, "আমাদের কাজের লোকেরা কিন্তু খুব ভাল। ওদের আমরা সন্দেহ করি না। তা ছাড়া পঞ্চানন আংটি হারাবার চারদিন আগে দেশে গেছে। আকাশীর মা ওসব খেয়াল-টেয়াল করে না।"

শুভ্র বলল, "না মামণি, আকাশীর মা কিন্তু বেশ চালাক। যেদিন থেকে মিউজিয়ামের লোক এসে আংটিটার দাম বলে গেছে, আর তোমরা তাই নিয়ে কথা বলেছ, আকাশীর মা কিন্তু বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনেছে।"

সমীর বলল, "যাই হোক, ভাববেন না, আমি যথাসাধ্য করব। কোনওরকম ক্লু পাওয়া গেলে ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঠিক লোকটিকে ধরে ফেলতে পারে। তা যখন পায়নি পুলিশকে তখন যতটুকু পেলাম ততটুকু ধরেই এগোতে হবে।"

তাই হল। গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে আসা হল পঞ্চাননকে। আকাশী মাকেও ধরা হল। শেষে বস্তি তোলপাড় করে সেখানেই ধরা পড়ল চোর। বাতাসীর নিতাইচরণ। নিতান্ত গো-বেচারা ভালমানুষ ছাড়া আর কিছুই যাকে মনে হয় না। তার ঘর সার্চ করে চোরাই কারবারের অনেক প্রমাণ মিলল। বিকাশ তালুকদারের বাড়ির একটি বড় রুপোর থালাও পাওয়া গেল। তাদের শিগগিরই এই বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে চলে যাবার কথা ছিল। চলে গেলে আর ধরা যেত না। প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করতে চায়নি, বলেছে এসব জিনিস যে কী করে কখন ঘরে এল সে জানে না। এসবের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। শেষে মারতে-মারতে যখন মুখ দিয়ে রক্ত বার করে ফেলল তখন চিৎকার করে বলল, "হ্যাঁ, আমি চোর। আমি চোর। আমাকে মেরে ফেলো!" শুধু আংটিটা কী করেছে সেটা কিছুতেই বলছে না। পাগলের ভান করছে।

ঊষা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। শেষে নিতাই? যাকে তিনি চূড়ান্ত ভালমানুষ বলে জানেন। যার কাছে থেকে তিনি প্রত্যহ সবচেয়ে টাটকা, সবচেয়ে শস্তা সবজি রাখেন!

অন্তু হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটে এল, "দিদা, তুমি এক্ষুণি সমীরকাকাকে ফোন করো, বলো, কোন প্রমাণ না পেয়ে এভাবে কাউকে মারা কখনওই উচিত নয়। এরকম আইন নেই।" সে কাঁপছিল।

তার অবস্থা দেখে হৈমন্তী দেবী ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, ঠিক আছে চল, আমরা এক্ষুণি কলকাতা চলে যাই, ওখানে গিয়ে ফোন করি।"

শুভ্র অন্তুকে জড়িয়ে ধরল, "তুই এরকম করছিস কেন? কী হয়েছে তোর?"

"না, না, এ হতে পারে না, হতে পারে না।" প্রবলবেগে মাথা নাড়ল সে।

হৈমন্তীর ইঙ্গিতে শুভ্র তাকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। শান্ত করতে চেষ্টা করে বলল, "অন্যায় করলে তো তাকে সাজা পেতেই হবে অন্তু, নিজের মুখে স্বীকার করেছে সে চোর, তার ঘর থেকে তার প্রমাণ বেরিয়েছে।"

"মিথ্যে কথা। সাজানো কথা। সে চোর সে ওকে এভাবে চোর সাজিয়েছে।"

"তবে কে চোর?"

"শুভ্রদা, আমি তোমাকে ভালবাসি।" অন্তুর গলা ভেঙে গেল।

শুভ্র বলল, "সেটা কি নতুন কথা? আমিও তো তোকে ভালবাসি।"

"সেজন্যেই বলছি, হয়েছে হয়েছে, বিনা অপরাধে মানুষগুলোকে আর তুমি শাস্তি দিও না। মার খেতে খেতে লোকটা পাগল হয়ে গেল। এখনও তুমি চুপ করে থাকবে?"

"মানে! শুভ্র ছিটকে উঠে দাঁড়াল।"

অন্তু বলল, "শোনো শুভ্রদা, আমি বলব আমি খুঁজে পেয়েছি, কেউ কিছু জানবে না।"

"কী বলতে চাইছিস তুই?"

"তুমি তা বুঝেছ।"

"তার মানে তুই আমাকে চোর বলছিস?" শুভ্র দাঁতে দাঁতে পিষল, বড়-বড় নিশ্বাস নিল, তার ফরসা রং লাল টকটকে হয়ে গেল।

শুভ্র তেমনই স্বরে বলল, "তুমি ওটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি যেভাবে পারি তোমাকে রক্ষা করব। আমার দিদা সব ঠিক করে দেবেন।"

"কী প্রমাণ তুই পেয়েছিস যে, এরকম একটা ভয়ঙ্কর গর্হিত অপবাদ দিয়ে আমাকে অপমান করছিস?"

"কী বলবি তুই? পাজি ছেলে, তোর এত বড় স্পর্ধা।"

"আমি প্রমাণ পেয়েছি।"

"কি প্রমাণ পেয়েছিস তুই?"

"আমি তোমাদের বাড়িটা খুব ভাল করে একদিন খুঁজেছি। তিনটে জিনিস চোখে পড়েছে আমার। এক, তোমাদের খাবার ঘরের জানালার তলার নর্দমার মধ্যে একটা বাঁকানো লোহা, যেরকম বাঁকানো লোহা দিয়ে কয়লার উনুন খোঁচায়। দুই, উঠোনের

ঘেরাও করা উঁচু দেওয়ালের মাথায় কোণের দিকে একটা পেরেকের মাথার সঙ্গে প্রায় মিশে, বৃষ্টিকে ভিজে নেতিয়ে আটকে-থাকা এইটুকু একটা লালা র'সিলকের টুকরো। তিন, ঠিক তার নীচেই মাটিতে কাদায় মাখামাখি হয়ে থাকা একটা ছোট বেলকুঁড়ি বোতাম।"

"এই তোর প্রমাণ?"

"হ্যাঁ, এই আমার প্রমাণ। আর আমার আন্দাজ এবং দিন কতক ধরে তোমাকে স্টাডি করা।"

"কী স্টাডি করেছিস তুই আমাকে? জানিস তোর এই মিথ্যে কথা বলার জন্য আমি লোক লাগিয়ে মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দিতে পারি?'"

"না, পারো না। আমি বলছি । মামাদাদু যখন তাঁর ঘড়ি, আংটি খুলে খাবার টেবিলের উপর রেখে বাথরুমে গেলেন, তুমি তক্ষুনি ফিরে এসে পিছনের দেওয়াল টপকে বাড়ি ঢুকলে। তুমি লেখাপড়া কর না এবং নানারকম বাজে সংসর্গে মেশো বলে মামাদাদুর কড়া অর্ডার ছিল ছ'টার মধ্যে খেলাধুলো সেরে বাড়ি এসে তোমাকে পড়তে বসতে হবে। তুমি প্রায়ই এরকম দেরি করে এসে দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢোকো। পিছনের দরজাটা সাধারণত খোলাই থাকে, নিঃশব্দে ঢুকে নিজের ঘরে গিয়ে ভাল ছেলের মতো বই মুখে বসে থাকো। মামিদিদাও তোমাকে এ-বিষয়ে আশকারা দেন মামার বকুনি থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু সেদিনও তাই করেছিলে। তুমি ভাবোনি দরজাটা বন্ধ থাকবে, মামিদিদার বদলে মামাদাদু বাড়িতে থাকবেন। তাই দরজায় টোকা না দিয়ে জানালায় উঁকি মারলে। উঁকি মেরেই আংটিটা চোখে পড়ল তোমার।

"তার আগে পর্যন্ত কিছুই ভাবোনি, কিন্তু আংটি দেখেই তোমার মনে হল এই তো তোমার আমেরিকা যাবার পাথেয়। এখন যদি নিয়ে পালাতে পারি কে ধরবে আমাকে? সঙ্গে-সঙ্গে হাত বাড়ালে, হাতে পেলে না, ওই কয়লার উনুন খোঁচাটা দিয়ে টেনে নিলে। তারপর ওটা নর্দমার মধ্যে ফেলে দিয়ে যখন আবার তাড়াহুড়ো করে দেওয়াল টপকাতে যাচ্ছ, তখনই পেরেকটায় লেগে তোমার জন্মদিনের র'সিলকের নতুন জামাটা বুকের কাছে ছিঁড়ে গিয়ে একটি টুকরো লেগে রইল সেখানেই, আর বোতামটা পড়ে গেল নীচে।"

"শুভ্র স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "আর ওই যে নিতাইয়ের বাড়িতে সব চোরাই মাল পাওয়া গেল, রুপোর থালা পাওয়া গেল, তার কী হবে?"

"আমি সেটা নিয়ে ভাবিনি। কিন্তু বুঝতে পেরেছি ওটা নিজেকে রক্ষা করবার জন্য তোমারই কৌশল। তুমি তো সত্যি ক্রিমিনাল নও। চুরি তো তোমার পেশা নয়। হঠাৎ একটা হয়ে গেছে, তারপর আর সামলাতে পারছ না।"

সহসা দু'হাতে মুখ ঢাকল শুভ্র সরু-মোটা গলায় কেঁদে ফেলে বলল, তুই আমাকে বাঁচা অন্তু, সত্যিই আমি আর পারছি না। ওই নীলা আমাকে প্রতি মুহূর্তে মেরে ফেলছে। আমি ওটা চাই না চাই না।"

প্যান্টের কোমরে হাত ঢুকিয়ে কোন লুকানো জায়গা থেকে সে বার করে আনল নীলার আংটিটা।

হত্যার পরের ঘটনা

বিমল মিত্র

মা-জননীরা, আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। গল্প লেখা আমার নেশা। আবার পেশাও বটে। কিন্তু তা বলে আমি আপনাদের কখনও গল্প শোনানোর নাম করে মিথ্যে কথা শোনাতে পারি না। সে-কাজ আমার দ্বারা হয় না। প্রতিদিন লেখবার আগে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র তেত্রিশ কোটি দেবতা আর মাতা বসুমতীকে সাক্ষী রেখে আমি লিখতে শুরু করি, যাঁরা শোনেন, তাঁরা কেউ ভাল বলেন, প্রশংসা করেন, আবার কেউ নিন্দে করেন। তা নিন্দে করুনগে, তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই।

আমি আপনাদের গল্প শুনিয়ে খালাস। নিজের বিবেকের কাছে আমি খাঁটি। এই আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। এর চেয়ে বেশি সুখ আমি চাই না আপনারা বিশ্বাস করুন, আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি, আপনাদের আমি ভক্তি করি। মায়ের জাতির ওপর আমার বিশ্বাসের অন্ত নেই।

এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু এ-গল্পের পক্ষে অপরিহার্য। এটুকু না বললে আপনারা আমাকে ভুল বুঝতে পারেন। তাই বলছি, এবার আপনারা গল্পটা শুনুন।

ছোট গল্পের আগে নায়ক-নায়িকারা বা পাত্র-পাত্রীর নাম বলা দরকার। কিন্তু এ গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম আমি প্রথমে জানতাম না। শুধু আমি নয়, আমার সঙ্গে যত লোক সেদিন ভবানীপুর থানায় ছিল, কেউই জানত না।

ভবানীপুর থানার দারোগাও বার বার মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করেছিল—আপনার নাম কী?

মহিলাটি কিছুই উত্তর দেন নি। চুপ করে ছিলেন শুধু।

—বলুন, আপনার নাম কী?

—আপনি কোথায় থাকেন?

আপনার স্বামীর নাম কী?

কোন কথারই উত্তর সেদিন দেননি মহিলাটি।

ভবানীপুর থানা তখন মানুষের ভিড়ে ভেঙে পড়েছে। দু'নম্বর বাসে যত লোক ছিল, প্রায় সবাই তখন এসে থানার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। যারা ভেতরে ঢুকতে পারেনি, তারা বাইরে থেকে উঁকি মারবার চেষ্টা করছে। পুলিশ কন্‌স্টেবলরা অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছে না আর।

—এখানে কী হয়েছে মশাই?

রাস্তায় বেকার লোকের অভাব নেই কলকাতা শহরে। উত্তেজনার খোরাক চাই সকলের। রাস্তায় বেড়াতে কোথাও কিছু মানুষের ভিড় দেখলেই উঁকি মেরে দেখি। কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে খুশি হই।

pathagar.net

—কী হয়েছে মশাই এখানে? ভিড় কিসের?

—কে জানে মশাই, আমিও আপনার মত, কিছুই বুঝতে পারছি না।

পাশ থেকে একজন বললে, চোর ধরেছে বাসে—

—চোর?

—হ্যাঁ মশাই, শুনছি নাকি মেয়েমানুষ চোর।

মেয়েমানুষ চোর কথাটা বারুদের মত হঠাৎ যেন বাতাসকে বিষাক্ত করে দিলো। যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের কানে কথাটা যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের দেখাদেখি আরো কয়েকজন। যারা জরুরি কাছে বেরিয়েছি, তারা কাজ পণ্ড করে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করলো।

কয়েকটা কনস্টেবল তখন একেবারে থানার সামনে রুল উঠিয়ে হেঁকে এল—ভাগো, ভিড় হঠাও—

কিন্তু কে আর শুনছে তাদের কথা। যারা ভেতরে ঢুকেছে একেবারে মহিলাটির কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, তাদেরই বেশি সুবিধে। তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মহিলাটিকে। অনেকক্ষণ থেকেই দেখে আসছে। সেই যখন বৌবাজারে দু'নম্বর বাসে উঠেছিল। লেডিজ সীটে বসেছিল। অবশ্য তখন এমন করে তার দিকে নজর করবার সুযোগ আসেনি। অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও কোনও মহিলার মুখের দিকে ক্যাট-ক্যাট করে চেয়ে থাকা যায় না। চাওয়া উচিতও নয়। অমন কত মেয়ে বাসে উঠছে, বাস থেকে নামছে কে আর তার হিসেব রাখছে।

—আপনি কোথা থেকে বাসে উঠেছিলেন?

ডবল-ডেকার বাসের একতলায় ঢুকেই দু'পাশে লম্বা লেডিজ সীট। একজন লেডী ওঠে তো আর একজন নামে। কখনও বাসে চাপাচাপি ভিড়। পুরুষেরা প্যাসেজের ওপর, পা-দানিতে সিঁড়ির ধাপে ধাপে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে দোল খাচ্ছে, ধাক্কা খাচ্ছে, ঝুলছে। তখন হয়তো লেডিজ-সীটের ওপর একটি মেয়ে সব জায়গায়টা জুড়ে বসে আছে। সবাই পকেট সামলাচ্ছে, জামা-কাপড় জুতো বাঁচাচ্ছে। তার ওপর অফিসের ছুটির সময়। সে-সময়ে কারো জ্ঞান ছিল না কোনও দিকে। এক-একটা স্টপেজ এসেছে আর যেন মল্লযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কারো হাতে ছাতা, কারো পুঁটুলি, কারো ফাইল। জামা ছিঁড়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। সে সময় লেডিজ-সীটের দিকে নজর দেবার সময় ছিল না।

—আপনি ঠিক জানেন এটা আপনার এটাচি কেস?

মনে আছে এক ভদ্রলোক উঠেছিলেন ঠিক বোধ হয় মেডিক্যাল কলেজের সামনে স্টপেজ থেকে। ট্রাউজার—ওপন-ব্রেস্ট কোট পরা ছিল। খুব জরুরি কাজেই বোধ হয় যাচ্ছিলেন। হাতে ছিল একটা এটাচি কেস। বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে বললেন—মশাই একটু সরে যাবেন—

কে আর সরে যাবে। কে আর অন্য লোকের দুঃখ বোঝে। কার এত মাথাব্যথা।

কিন্তু তারই মধ্যে ভদ্রলোক এক হাতে এটাচি কেস আর এক হাতে হ্যাণ্ডেলটা ধরে একটা পা পা-দানিতে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন কোনমতে। তারপর ঝুলতে ঝুলতে চলতে গিয়ে হাতটা একটু ব্যথা হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। তাড়া সেই কারণেই? সকলেরই তো জরুরী কাজ। সকলেই তো কাজ করতে ছুটেছে। কেউ বাড়ী যাবে, কেউ আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, কেউ হাসপাতালে যাবে নানান ঝঞ্ঝাটে সবাই জ্বলছে। কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

তবু মনে আছে, ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত পা-দানি পেরিয়ে প্যাসেজ, প্যাসেজ থেকে একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। তারপর একটা লেডিজ-সীট খালি দেখে হাতের বোঝাটা খালি করবার জন্যে এটাচি কেসটা সেখানে এককোণে রেখে দিয়েছিলেন। এ ঘটনা কেউ দেখেছে, অনেকে দেখেওনি।

আজকের দিনে কারোর এমন সময় নেই যে সব দিকে চোখ মেলে সব কিছু দেখবে। আর তাছাড়া বাসের মধ্যে কেউ কাউকে চেনে না। কে কার পাশে বসলো, তা দেখবারও সময় নেই। শুধু কোথায় কোন্ সীটটা খালি হলো কিম্বা খালি হতে পারে, সেই দিকেই নজর। একটা সীট খালি হবার সূচনা হলেও দশজনে হাঁ হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কে আগে বসতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলে। সেই পাইকপাড়া থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত এই-ই হচ্ছে প্রতিটি বাসের ভেতরের ইতিহাস। ভেতরের প্রাত্যহিক মর্মান্তিক ইতিহাস।

ইন্সপেক্টর বললেন—তারপর?

যে ভদ্রলোক গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করে এসেছেন, তিনি বললেন—তারপর এলগিন রোডের কাছে আসতেই এক ভদ্রলোক তাড়াহুড়ো করে সকলকে ঠেলেঠুলে চিৎকার করে বললেন, বাঁধকে—বাঁধকে—

বাস তখনও ভালো করে বাঁধেওনি। ভদ্রলোক বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন।

আর ভালো করে থামবার আগেই কণ্ডাক্টর আবার বেল বাজিয়ে দিয়েছে, আর সামনে ট্রাফিক সিগন্যাল-ল্যাম্প গ্রীন ছিল, ড্রাইভারও স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে।

—তারপর?

তখন আমার খেয়াল হলো ভদ্রলোক তো এটাচি কেসটা ফেলে গেলেন। এই ট্রাউজার আর ওপন্-ব্রেস্ট কোট পরা ভদ্রলোকই তো মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে এটাচি কেসটা নিয়ে উঠেছিলেন, অতি কষ্টে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে শেষকালে ভেতরে ঢুকে ওই খালি লেডিজ—সীটটার ওপর এটাচি কেসটা রেখেছিলেন।

কথাটা কণ্ডাক্টরকে বলতেই সেও ঘণ্টা দিলে।

সবাই মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলুম—ও মশাই, আপনার এটাচি কেস ফেলে গেলেন, ও মশাই, শুনছেন—

ভদ্রলোক তখন কোথায় রাস্তায় নেমে কোন দিকে গেছেন, তার আর পাত্তা নেই। আর বাসটাও তখন পুরোস্পীডে এগিয়ে চলেছে। সবাই মিলে আলোচনা করা হলো ওটাকে বাসের ডিপোতে গিয়ে জমা দেওয়া ভালো। যদি বাড়ি গিয়ে মনে পড়ে তাহলেও একবার খবর নিতে পারেন বাস-অফিসে।

—কণ্ডাক্টর, ওটা ডিপোতে জমা দিয়ে দেবেন। আহা! দামী জিনিস হয়তো ভদ্রলোক ফেলে গেছেন। কিন্তু এটাচি কেসটা নিতে যেতেই মহিলাটি কেমন বিরক্ত হলো।

বললেন—এটা তো আমার—

—আপনার?

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ, আমার, এটা আমার জিনিস—

কণ্ডাক্টর প্রথমে একটু কিন্তু-কিন্তু করেছিল। বেশ ধোপ দুরস্ত মহিলা। গলায় সরু সোনার চেন-হার রয়েছে, হাতে সোনার বালা রয়েছে। ছাপা শাড়ি, লং স্লিভ ব্লাউজ, ডোনাট খোঁপা। যেমন অন্য মেয়েদের থাকে, সেই রকমই। কোনও তফাৎ নেই। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মহিলা। বেশ ছিমছাম গড়ন। বয়েস ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে। কেমন যেন বেশ একটা মিষ্টি মাধুর্য মুখের আদলে।

কণ্ডাক্টর হাত বাড়িয়েও হাতটা গুটিয়ে নিলে। মহিলা ততক্ষণে এটাচি কেসটা নিজের কোলে তুলে নিয়েছে।

কিন্তু বাসের মধ্যে দু-একজন জাঁদরেল প্যাসেঞ্জারও থাকে। তারা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। তারা সব সময় দুর্বলের পক্ষে। তারা ভয়ত্রাতা, পতি পাবন।

—আপনার কী রকম? ওটা তো ভদ্রলোক ফেলে গেলেন। আমি তো নিজের চোখে দেখেছি।

বাস সুদ্ধ লোক এতক্ষণে সচেতন হয়ে উঠেছে। সবাই চেয়ে দেখল মহিলাটির দিকে। সকলের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে উঠেছে মহিলাটি।

—আপনি দেখেছেন। হ্যাঁ, মশাই, আমি নিজের চোখে দেখেছি। মেডিক্যাল কলেজের সামনে ভদ্রলোক উঠলেন হাতে এটাচি কেসটা নিয়ে, শেষকালে কোথাও রাখবার জায়গা না পেয়ে ওই খালি জায়গায় রেখে দিলেন।

আর একজন পাশ থেকে বললেন, না, না, মশাই, আমিও দেখেছি, ভদ্রলোকের

হাতে এটাচি কেসটা ছিল।

—আহা, এতক্ষণ বোধহয় সে ভদ্রলোক বাড়িতে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন।

—মশাই, বাসে এ-রকম কত লোক কত কী ফেলে যান।

উপদেশ দেবার লোকেরও অভাব হয় না। কণ্ডাক্টরকে একজন বললে, আপনি কারো কথা শুনবেন না মশাই, আপনি ডিপোতে গিয়ে ওটা জমা দেবেন—

কণ্ডাক্টর মহিলাটির দিকে আবার হাত বাড়িয়ে দিলে—দিন, এটাচি কেসটা দিন—

—এটা আমার।

—আমার মানে?—আমার মানে আমার।

এতক্ষণ যারা কোন কিছুতেই মাথা ঘামায় না, সেই শান্তশিষ্ট শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোক দলও মুখ ঘোরাল এবার।

—আপনার জিনিস বললেই হল। আমরা দেখলুম অন্য এক ভদ্রলোক এটাচি কেস নিয়ে ওখানে রেখে দিলেন, আর আপনি বলছেন আপনার? আপনার বললেই আমরা ছেড়ে দেব?

বেশ গরম হয়ে উঠল ভেতরে। ড্রাইভার তখন ফুল-ফোর্সে গাড়ি চালিয়েছে। কণ্ডাক্টরের টিকিট কাটা ঘুচে গেল।

—আপনি জিনিসটা দেবেন কিনা বলুন?

মহিলাটি গম্ভীর গলায় বললে, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।

—কথা বলতে আপনাকে কে বলেছে? জিনিসটা দিয়ে চুপ করে থাকুন।

অন্য লেডিজ-সীটে যে সব মহিলারা বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও ব্যাপারটা সংক্রামিত হয়ে গেছে ততক্ষণে। একজন বুড়ি মতন মহিলা বললেন, কেন বাবা, তোমরা অমন করে বলছ? কেউ কি কারো জিনিস এমন করে নিতে পারে?

—নিতে পারে কিনা সে আমরা জানি। যা জানেন না, তা নিয়ে আপনি কথা বলতে আসবেন না।

আর একজন মাঝ-বয়েসী মহিলা ওপাশে বসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনারা কেন ওঁকে অমন করে বলছেন? মেয়েদের সম্মান রেখে কথা বলতে পারেন না।

আপনি আর এর মধ্যে কথা বলতে আসবেন না মা, আমরা যথেষ্ট সম্মান রেখে কথা বলছি।

এটাচি কেসটা হাতে নিয়ে ভদ্রমহিলা এবারে উঠল। স্টপেজ এসেছে একটা। একেবারে নেমে চলে যাবার চেষ্টা।

কণ্ডাক্টর, যেতে দেবেন না ওঁকে।

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

মহিলাটি বললে, আমি নামব এখানে, সরুন।

—নেমে যাবেন মানে। এটাচি কেসটা দিয়ে নেমে যান।

ভদ্রমহিলা তবু নামবার উদ্যোগ করছে। কয়েকজন সামনে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল। বললে, জিনিস চুরি করে নেমে যেতে পারবেন না।

ভদ্রমহিলা বললে, জানেন, আপনাদের পুলিশ ডেকে অ্যারেস্ট করাতে পারি।

ওপাশ থেকে এক ভদ্রলোক বললে, আঃ আপনারা যেতে দিন না ওকে। কেন রাস্তা আটকাচ্ছেন?

সে কথায় কান দিলে না কেউ। বললে, পুলিশের ভয় দেখাবেন না, তাতে আপনিই বিপদে পড়বেন—

একজন বললে, চলুন ওঁকে ধরে নিয়ে থানায় চলুন সব হিল্লে হয়ে যাবে।

কথাটা তুলতেই হৈহৈ করে উঠল সবাই। বাস ছেড়ে দিচ্ছিল। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে। সবাই নামল। ভদ্রমহিলা নামল। বাসসুদ্ধ লোকই নামল। কিছু বাইরের লোকও জুটল। সামনেই ভবানীপুর থানা। ভবানীপুর থানাতেই নিয়ে চলুন মশাই। মুখোমুখি ফয়সালা হয়ে যাক।

—তারপর?

ইন্সপেক্টর এতক্ষণ কোনও কথারই সঠিক জবাব পান নি। আবার বললেন, এঁরা সবাই দেখেছেন, এক ভদ্রলোক এটাচি কেস নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে উঠেছেন, আর আপনি বলছেন আপনার?

চারিদিকে ভিড়ের মধ্যে তুমুল হৈ চৈ চলছে।

কনস্টেবল কয়েকজন ভিড় সরিয়ে ঘর খালি করার চেষ্টা করলে। কিন্তু কে বাইরে যাবে? এমন মুখরোচক দৃশ্য দেখতে পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নাকি? তারা রুল উঠিয়ে চাগিয়ে এল—হাটো, বাহার যাও সব—হাট্ যাও—

—কথার জবাব দিন। চুপ করে আছেন কেন?

ভদ্রমহিলা বললে, আপনি বিশ্বাস করুন, ঐ এটাচি কেস আমার—

—আপনি কোথা থেকে উঠেছিলেন?

—বৌবাজার থেকে।

—যে ভদ্রলোক হাতে এটাচি কেসটা নিয়ে উঠেছিলেন, তিনি কি আপনার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন এটা?

মহিলাটি বললে, তিনি রাখতে দেবেন কেন? তাঁর জিনিস হলে তিনি তো যাবার সময় এটা নিয়ে যেতেন। এটা তো আমার।

—আপনার বাড়ি কোথায়?

—ভবানীপুরে রামময় রোডে।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, বৌবাজার আমার বোনের বাড়ি আমি সেখান থেকেই আসছি।

—এ এটাচি কেসের মধ্যে কী জিনিস আছে।

ভদ্রমহিলা বললে, আমার শাড়ি একটা আর টাকা কিছু আছে।

—কত টাকা আছে?

ভদ্রমহিলা বললেন, তা মনে নেই।

—মনে করার চেষ্টা করুন না। নিজের টাকা রেখে দিয়েছেন আর কত টাকা আছে মনে করতে পারছেন না?

ভদ্রমহিলা বললে, না।

—চাবি। এর চাবি আছে আপনার কাছে?

ভদ্রমহিলা বললে, না।

—সে কী? নিজের এটাচি কেস, আর নিজের কাছে এর চাবি নেই?

ভদ্রমহিলা বললে, আমার বোনের বাড়িতে ভুলে চাবিটা ফেলে এসেছি।

—আপনার বোনের বাড়িতে টেলিফোন আছে?

ভদ্রমহিলা বললে, না।

ইন্সপেক্টর হুঁশিয়ার লোক। বল্‌লেন, তাতে ক্ষতি নেই, আমার কাছে মাস্টার কী আছে তা দিয়ে সব খোলা যাবে।

বলে তিনি এক কনস্টেবলকে মাস্টার কী'র গোছটা আনতে বললেন। এক মিনিট ধৈর্য পরীক্ষা। কিন্তু সকলের মনে হল, সেই এক মিনিটই যেন কল্পকালে রূপান্তরিত হয়ে গেল সেদিন, সেই ভবানীপুর পুলিশ স্টেশনের ভেতর। আর এটাচি কেসটা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে বিংশশতাব্দীর সমস্ত পাপ, সমস্ত লজ্জা সমস্ত কলঙ্ক যেন এক চাবির মোচড়ে হাঁ করে উঠল।

আশেপাশের ভিড়ের মানুষ তখন উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

ভদ্রমহিলা আর থাকতে পারলেন না। যেন ভেঙে পড়ল। বললে, এটাচি কেস আমার নয়, আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম, বিশ্বাস করুন, এ আমার নয়, আমি এর বিন্দু বিসর্গও জানি না।

বলতে বলতে ভদ্রমহিলা সেই অবস্থাতেই চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

—তারপর?

মা-জননীরা, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সত্য বই মিথ্যে জানি না। আমি প্রতিদিন লেখার আগে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র তেত্রিশ কোটি দেবতা, মাতাবসুমতীকে সাক্ষী রেখে কলম ধরি। লেখা আমার নেশা, আবার পেশাও বটে। কিন্তু তা বলে গল্প শোনানোর নাম করে কখনও আমি আপনাদের মিথ্যে কথা বলতে পারিনি। আপনারা আমার শ্রদ্ধার পাত্রী, আপনারা আমার ভক্তির পাত্রী। আপনাদের মর্যাদাহানি আমার কল্পনার বাইরে। আমি আপনাদের আমার অন্তরে শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান জানাই।

যারা শুনছিল এতক্ষণ তারা অধৈর্য্য হয়ে উঠল।

বললে, ওসব কথা থাক, তারপর কী হল বলুন? এটাচি কেসের ভেতর কী ছিল?

সে কথাই তো বলছি। যুগ যুগ ধরে সাহিত্য মানুষের কল্যাণ বোধকেই জাগ্রত করেছে, সাহিত্য জাতির মনের মুকুর...

—ও সব কথা থাক, এটাচি কেসের মধ্যে কী পাওয়া গেল বলুন শীগ্‌গির?

—একটা ছোট একদিনের মরা ছেলে।

সমস্ত লোক তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

—কিন্তু সেদিন যারা সেই থানার মধ্যে ছিল তাদের সকলেরই মনে হয়েছিল ও যেন মরা ছেলে নয় মানুষের ধর্ম মানুষের কীর্তিকে কেউ যেন খুন করে রেখে গেছে একটা এটাচি কেসের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আত্মার গলা টিপে কেউ যেন ওখানে হত্যা করে ঐ রকম করে তাঁর সৎকার করতে চেয়েছে।

pathagar.net

কফিন রহস্য

দেবল দেববর্মা

।। এক ।।

পুজোর ছুটিতে গোয়া যাওয়ার ঠিক হতেই প্রলয় নেচে উঠল। তার বাবা বললেন—'সামনের বছর পরীক্ষা। তাই এই বছরটা বেড়িয়ে নাও। বাট মাইণ্ড দ্যাট আগামী বছর আর কোনো কথা নয়। শুধু পড়া আর পড়া।'

প্রলয় বলল—'তাহলে কলকাতায় সুশান্তকে একটা চিঠি লিখি বাবা? ওকেও সঙ্গে নিলে হয় না?'

তার মা বলল—'চিঠি লিখতে দোষ নেই। দিদি-জামাইবাবুর যদি অমত না থাকে তাহলে সুশান্ত চলে আসবে। আহা! বেচারী এতদূরে যাবার সুযোগ হয়তো চট করে পাবে না।'

প্রলয়ের বাবা বললেন—'তাহলে দু-চার লাইন আমাকেই লিখতে হয়। নইলে শুধু প্রলয়ের কথায় সুশান্তকে পাঠিয়ে দিতে তোমার জামাইবাবু হয়তো আপত্তি করবেন।'

'তা ঠিক।' প্রলয়ের মা সায় দিল। বলল—'সেবার সেই নাগরাজনের সঙ্গে কেরালাতে

গিয়ে তোমার ছেলে যা কাণ্ড করেছিল! সব শুনে জামাইবাবু শুধু গম্ভীর হয়ে গেলেন। সুশান্তর সঙ্গে তিন দিন নাকি বাক্যালাপ করেননি। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দিদিকে বললেন, ছেলে যে ঘরে ফিরেছে এই তোমার ভাগ্যি। নইলে একটা বিপদ ঘটলে আশ্চর্য হবার মতো কোনো কারণ ছিল না।'

প্রলয় বলল—'এতে গম্ভীর হবার কী আছে? আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে একটা স্মাগলারের দলকে ধরিয়ে দিতে পেরেছি। তার জন্য গভর্মেণ্ট থেকে আমাদের পুরস্কার দিয়েছিল। সেটা কম হলো নাকি?'

রাত্তিরে প্রলয় চিঠি লিখল—

প্রিয় সুশান্ত,

তোমাকে একটা দারুণ খবর দিচ্ছি। পুজোর ছুটিতে বাবা হঠাৎ গোয়া যাবার প্ল্যান করেছেন। শুনে অব্দি আমার যা উত্তেজনা হচ্ছে! তোকে সঙ্গে নেবার কথা বলতেই মা-বাবা দুজনেই রাজী। সেই মর্মে মেসোমশাইকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে। বাবা নিজেই লিখবেন। ইতিমধ্যে তুই মাসিকে বলে কয়ে আগেই রাজী করিয়ে নিবি। যাতে মেসোমশায় আর অমত করতে না পারেন। তারপর সোজা চলে আয়। অক্টোবর মাসের ষোল তারিখে রওনা হবো। লক্ষ্মীপুজোর একদিন পরে। তার আগেই তুই সশরীরে হাজির হবি। সেই আশায় দিন গুনছি।

আজকের কাগজে একটা অদ্ভুত খবর পড়েছিস? গোয়া থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে রঙ্গনাথপুরম গ্রামের এক প্রাচীন শিবমন্দির থেকে অষ্টধাতু নির্মিত প্রায় পনের কিলো ওজনের এক নটরাজ মূর্তি খোয়া গেছে। সংবাদে প্রকাশ যে মূর্তিটি পাঁচ ফুট উঁচু এবং মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের সময় নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এটি গুজরাট থেকে গোয়ায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশের অনুমান যে, বিদেশে পাচারের উদ্দেশ্য নিয়ে একদল আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারবারী এই মূর্তিটিকে অপহরণ করেছে।

আমার কী ভয় হয় জানিস? শেষ পর্যন্ত এই অপহৃত মূর্তিটার সঙ্গে আমাদের ভাগ্য না জড়িয়ে যায়। আর তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ। বাবা জানতে পারলে আমাকে আস্ত রাখবেন না। তল্পিতল্পা গুটিয়ে গোয়া ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য করবেন।

তুই এলেই কথা হবে। কবে রওনা হচ্ছিস জানাবি। ভালবাসা—

ইতি

প্রলয়

।। দুই ।।

রওনা হবার ঠিক আগের দিন বিকেলে সুশান্ত এসে পৌঁছল।

পরদিন বোম্বাই মেলে ওরা রওনা হলো। এ সি স্লিপারে রিজার্ভেশান করা ছিল। প্রলয়ের বাবা রেলে কাজ করেন। সেই সুবাদে তাদের ফ্রি-পাশ। শুধু সুশান্তর জন্যে একটা টিকিট নিতে হয়েছে। তাও রেলের লোক বলে যোগাড় করতে অসুবিধে হয়নি।

মাঝপথে দুটো রাত্তির। বোম্বাই মেল সগর্জনে ছুটছে। স্টেশন, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বাজার হুস করে পেরিয়ে এল। কয়েকটা বড় স্টেশনে ট্রেন থামল। ফের দৌড়, দৌড়। দুটো রাত্তির কাটিয়ে পরদিন সকালে গাড়ি ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে থামল।

সুশান্ত বলল—'বোম্বাইতে আমরা একদিন থাকব, তাই না?'

'হ্যাঁ', প্রলয় মাথা হেলিয়ে সায় দিল। বলল—'গোয়া যেতে হলে বোম্বাই না এসে উপায় নেই। তাই একটা দিন থাকতেই হচ্ছে।'

ব্যাখ্যা করে প্রলয়ের বাবা বললেন—'এখান থেকে গোয়া যাওয়ার তিন রকম উপায় হতে পারে। প্রথমটা স্থলপথ। বোম্বাই থেকে গোয়া লাক্সারি কোচ যায়-আসে। অবশ্য রেলপথেও যাওয়া চলে। কিন্তু মাঝপথে ট্রেন বদল, ঝঞ্ঝাট অনেক। দ্বিতীয়টি জলপথ। বোম্বাই বন্দর থেকে গোয়াগামী স্টীমার আছে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার রাস্তা। তৃতীয় পন্থাটি হলো বিমান। বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট থেকে গোয়ার প্লেন ছাড়ে। সেই বিমান আবার যাত্রী নিয়ে ফিরে আসে।'

বোম্বাই থেকে প্লেন ছাড়ল বেলা একটা নাগাদ। দুটো বাজবার অনেক আগেই বিমান রানওয়ের মাটি স্পর্শ করল। ডাবোলিম এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে তারা একটা ট্যাক্সিতে উঠল। তিরিশ কিমি রাস্তা। ভাড়া হাঁকল দেড়শ টাকা।

পানাজির ট্যুরিস্ট হস্টেলে ঘর বুক করা ছিল। মাণ্ডবী নদীর ঠিক পাশেই ছ'তলা বাড়ি। নদী আর ট্যুরিস্ট হস্টেলের মাঝখানে কালো পিচের রাজপথ এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে।

ঘরের সামনে প্রশস্ত ব্যালকনি। সেখানে দাঁড়িয়ে সুশান্ত আর প্রলয় মাণ্ডবী নদীর দিকে তাকিয়েছিল। নদী খুব প্রশস্ত নয়। অথচ গভীর বলেই মনে হয়। খেয়া নৌকোর মতো দুটো স্টীমার শত শত যাত্রীকে পারাপারে সাহায্য করছে।

প্রলয়ের বাবা বললেন—'আমি নিচে নেমে ট্যুরিস্ট বাসের টিকিট কেটে আনি। যদি পাই তাহলে কাল সকালেই নর্থ গোয়া ট্যুরে বেরিয়ে পড়ব।'

ট্যুরিস্ট হস্টেলের দেওয়া একটা তোয়ালে হাতে নিয়ে প্রলয়ের মা বাথরুমে গেলেন।

চারতলায় পাশাপাশি দুখানা ঘর। একখানা ঘরে প্রলয় আর সুশান্ত। পাশের কামরা তার মা-বাবার জন্য নির্দিষ্ট আছে। নিজেদের ঘরে ঢুকে প্রলয় বলল—'এখানকার কাগজে সেই খবরটা আবার ছেপেছে।'

'কোন খবরটা?' সুশান্ত প্রশ্ন করল।

ঈষৎ গম্ভীর গলায় প্রলয় বলল—'সেই যে রঙ্গনাথপুরম্ গ্রামের অষ্টধাতু নির্মিত প্রায় পনের কিলো ওজনের নটরাজ মূর্তি চুরি যাওয়ার ঘটনা।'

'তুমি কোথায় দেখলে?'

প্রলয় জবাব দিল—'বাবা যখন রিসেপশান কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে খাতায় নাম-ধাম লিখছিলেন তখন এক ভদ্রলোককে কাগজ পড়তে দেখলাম। প্রথম পাতাতেই অপহৃত সেই নটরাজ মূর্তির ছবি। পুলিশ সন্দেহ করছে মূর্তিটা এখনও গোয়াতেই রয়েছে। বিদেশে পাচার হয়নি।'

সুশান্ত বলল—'পনের কিলো ওজনের অষ্টধাতুর মূর্তি। চট করে কোথাও পাঠানো কঠিন। কারো না কারো চোখে পড়বে।'

'মূর্তিটা ভারি সুন্দর।' প্রলয় বলল—'ছবি দেখেই মন ভরে যায়। তাহলে আসল জিনিসটা কেমন হবে বুঝতেই পারছ।'

'তোমার কি মনে হয় মূর্তিটা এখনও বিদেশে পাচার হয়নি?'

'সেটাই স্বাভাবিক। পনের কিলো ওজনের এত বড় একটা মূর্তি পাচার করতে হলে ঝঞ্ঝাট আছে। প্লেনে নিয়ে গেলে কাস্টমস্ চেকিং-এ ধরা পড়তে বাধ্য। এ ছাড়া জলপথ, মানে জাহাজেও পাঠানো যায়। কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা। শুল্ক বিভাগের অফিসাররা ছেড়ে কথা কইবে না।'

সুশান্ত বলল—'যাক গে। তুমি যেন আবার ওই নিয়ে মাথা ঘামিও না। গোয়া বেড়াতে এসেছ। ট্যুর শেষ হলেই ভালো ছেলের মতো ঘরে ফিরে যাবে। নইলে মেসোমশায় এমন বেঁকে বসবেন যে বেড়ানোটাই ভণ্ডুল হতে পারে।'

চোখ টিপে প্রলয় বলল—'তুমি একটু দাঁড়াও। রাস্তার ওপারে একটা ম্যাগাজিনের স্টল রয়েছে। চট করে আজকের নিউজ পেপারটা কিনে আনি।'

মিনিট চার-পাঁচ বাদেই সে ফিরে এল। হাতে একটা খবরের কাগজ-গোয়া নিউজ।

প্রলয় বলল—'এই দেখ সেই নটরাজ মূর্তির ছবি। কী আর্টিস্টিক কাজ লক্ষ্য করেছ? দীর্ঘকাল ধরে শিল্পী এটি তৈরি করেছেন। একদা মহম্মদ ঘোরীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মূর্তিটিকে রঘুনাথপুরমে সরিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না।'

সুশান্ত জিজ্ঞেস করল—'কাগজে এই অপহরণের বিষয়ে কী লিখেছে?'

প্রলয় বলল—'রঘুনাথপুরমের মন্দির থেকে মূর্তিটা চুরি যায় ৩রা অক্টোবর। অর্থাৎ পনের-ষোল দিন আগে। সেদিন হঠাৎ ইলেকট্রিক লাইনের গণ্ডগোলের জন্য রাত নটা থেকে প্রায় সমস্ত রাত্তির গ্রামে কারেন্ট ছিল না। এ ছাড়া মন্দিরের তিনজন সিকিউরিটি গার্ডের মধ্যে দুজন ছুটিতে ছিল। তৃতীয় ব্যক্তি রাত একটার পর ঘুমিয়ে পড়ে। যখন তার ঘুম ভাঙে তার আগেই মূর্তিটি অপহৃত হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ গ্রামের দুজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। নানা জিজ্ঞাসাবাদের পরও মূর্তির কোনো হদিস মেলেনি। পুলিশের অনুমান নটরাজ মূর্তিটি বিদেশে পাচার করার মতলব নিয়ে গায়েব করা হয়েছে। সম্ভবত ভিনদেশে এখনও সেটি চালান হয়নি।'

'সন্দেহবশে পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছিল তাদের ছেড়ে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, তবে পুলিশের ধারণা গঞ্জালেশ নামে এক কুখ্যাত চোরাচালান-কারবারী মূর্তি চুরির সঙ্গে জড়িত। কাগজের সাত পৃষ্ঠায় গঞ্জালেশের একটা ছবিও ছাপা হয়েছে।'

'কই দেখি?' সুশান্ত কাগজের পাতায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ফের চোখ তুলে বলল—'লোকটাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি?'

'না', প্রলয় ঈষৎ হেসে জবাব দিল। 'কাগজে তার দুটো কারণ লিখেছে। প্রথমত, গঞ্জালেশের কাছে এমন কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে যার থেকে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে ঘটনার রাত্তিরে সে বোম্বাইতে ছিল। দ্বিতীয়ত, গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় লোকটা গোয়া হাইকোর্ট থেকে আগাম বেইল নিয়ে বসে আছে।'

ইতিমধ্যে প্রলয়ের বাবা ফিরে এসে ঘোষণা করলেন নর্থ গোয়া, সাউথ গোয়া ট্যুরের টিকিট তিনি পেয়েছেন। আগামীকাল নর্থ গোয়া এবং পরদিন সাউথ গোয়া বেড়াতে যাওয়া হবে।

প্রলয় বলল—'তোমরা একটু জিরিয়ে নাও। আমি আর সুশান্ত চট করে বাজারটা ঘুরে

আসি।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে তার মা বলল—'বাজারে গেলে বিস্কুটের একটা বড় প্যাকেট নিয়ে আসবি। সকাল-বিকেল চায়ের সঙ্গে খাওয়া হবে।'

বাজারে ঢুকে দুজনে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াল। হঠাৎ একটা দোকানের দিকে নজর পড়তেই প্রলয় ভুরু তুলে তাকাল।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করল—'কী দেখছ অত মনোযোগ দিয়ে?'

'দোকানে কী বিক্রি হয় লক্ষ্য করেছ?' প্রলয় পাল্টা প্রশ্ন করল।

সুশান্ত ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল—'তাই তো! ওগুলো কী? দেখে তো মনে হয় লম্বা কাঠের বাক্স, যেমন সেতার কিংবা গীটারের জন্য লাগে।

মুচকি হেসে প্রলয় বলল—'আমার অনুমান ওগুলো কফিন। ডেড বডি নিয়ে যাওয়া হয়।'

'কফিন!' সুশান্ত অস্ফুটে বলল, 'গোয়াতে এমনি কফিন বিক্রি হয়?'

'বারে!' প্রলয় অপাঙ্গে একপলক সুশান্তকে দেখল, বলল—'এ দেশে পর্তুগীজরা অনেকদিন রাজত্ব করে গেছে। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কম নয়। সুতরাং কফিনের চাহিদা আছে।'

সুশান্ত বলল—'চল এবার, বিস্কুট কিনে ট্যুরিস্ট হস্টেলে ফেরা যাক। কিন্তু তার আগে একবার কফিনের দোকানটা ভালো করে দেখে আসি।'

'কফিনের দোকানে আবার কী দেখবে?' সুশান্ত বিরক্তি জানাল। বলল—'যত উদ্ভুটে শখ তোমার।'

হাসতে হাসতে প্রলয় এগিয়ে গেল। পিছনে সুশান্ত। কফিনের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সব কিছু লক্ষ্য করছিল। একজন ছোকরা কর্মচারী কাছে আসতেই সে জিজ্ঞেস করল—'কফিন এখানেই তৈরি হয় বুঝি?'

ছোকরা ইংরেজি জানে। ঈষৎ হেসে জবাব দিল—'ইয়েস, ফ্যাক্টরি ইজ বিহাইণ্ড।'

সুশান্ত মন্তব্য করল—'আবার ফ্যাক্টরিও দেখবে নাকি?'

'আরে না-না।' প্রলয় জবাব দিল। তারপর কী মনে হতে একটা কফিনের ডালা খুলে বলল—'এটা যেন একটু বেশি গভীর।'

'ইয়েস।' ছোকরা পূর্বের মতো হাসল—বলল—'ওটা স্পেশাল অর্ডার। ডিজাইনটা ভদ্রলোক নিজে করে দিয়েছেন।'

কফিনটা আরো কয়েকবার পরীক্ষা করে প্রলয় ঈষৎ গম্ভীর হলো। সেই কর্মচারীকে লক্ষ্য করে শুধলো—'কফিনটা কবে ডেলিভারি নেবে জানেন?'

'হ্যাঁ, দুদিন বাদে। আজ সকালে ভদ্রলোক এসে তাই বলে গেছেন। ডেলিভারি নিতে উনি গাড়ি নিয়ে আসবেন।'

সুশান্তর কাঁধে একটা হাত রেখে প্রলয় শুধু বলল—'চল, ট্যুরিস্ট হস্টেলে ফেরা যাক।'

ফেরার সময় সুশান্ত জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, কফিনের ডালাটা খুলে তুমি কি অত দেখছিলে?'

'না, তেমন কিছু নয়।' প্রলয়ের কণ্ঠস্বর ঠিক প্রাঞ্জল শোনাল না। অনেকক্ষণ পরে সে বলল—'আসলে আমার মনে একটা খটকা লেগেছে।'

'খটকা আবার কি?' সুশান্ত ভুরু তুলে তাকাল।

'ধৈর্য ধর।' প্রলয় হেসে বলল—'সবুরে মেওয়া ফলে।'

নর্থ গোয়া আর সাউথ গোয়া ট্যুর শেষ হলো। পরের দিন সমস্ত দুপুর প্রলয় টানা ঘুমিয়ে কাটাল। বিকেল চারটে নাগাদ বিছানা থেকে নেমে মুখ হাত ধুয়ে সে বেরোবার জন্য তৈরি হলো। সুশান্তকে ডেকে বলল—'জামাকাপড় বদলে নাও। এখুনি আমাদের বেরোতে হবে।'

'কোথায়?'

'সেই কফিনের দোকানে।'

সুশান্ত ভ্রূ কুঁচকে শুধলো—'কী ব্যাপার বল দিকি? ওই কফিনের দোকানটা তোমাকে এত টানছে কেন?'

'বারে! তুমি এরই মধ্যে ভুলে গেলে? দুদিন বাদে মানে আজই সেই কফিনটা ডেলিভারি নেবার কথা।'

কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে প্রলয় বেরিয়ে পড়ল। সুশান্ত সঙ্গে। তার মা বলল—'সন্ধ্যের আগেই ফিরে এস কিন্তু। অজানা-অচেনা জায়গা। এত ঘোরাঘুরির দরকারটা কি?'

মাণ্ডবী নদীর তীর ধরে দুজনে হাঁটতে শুরু করল। বাজারের পিছনে সেই কফিনের দোকানটায় পৌঁছতে পনের মিনিটও লাগল না। আগের দিনের সেই ছোকরা আজও বসে। প্রলয়কে দেখেই চিনতে পারল।

একগাল হেসে বলল—'কফিনটা তো ডেলিভারি নিয়ে গেছে।'

'কখন?'

'আজ সকালে। একটা কভার ভ্যানে তুলে নিয়ে চলে গেল।'

ব্যাগ থেকে সেই পুরনো গোয়া নিউজ পত্রিকাটি বের করে প্রলয় দ্রুত সাতের পাতায় চোখ রাখল। গঞ্জালেশের ছবিটা দেখিয়ে ছোকরাকে জিজ্ঞেস করল—কফিনটা যে ডেলিভারি নিয়ে গেল তাকে দেখতে কেমন? এই ছবির মতো?'

কাগজে ছাপা ছবিটার দিকে একপলক তাকিয়ে ছোকরা বলে উঠল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই লোকটাই তো কফিনের অর্ডার দিতে এসেছিল। আবার আজ সকালে ডেলিভারি নিয়ে গেল।'

সুশান্ত বলল—'ওর ঠিকানা নিশ্চয় এদের খাতায় লেখা আছে।'

'থাকার কথা।' প্রলয় চিন্তিত মুখে বলল—'কিন্তু ঠিকানাটা যে সত্যি তাই বা কে জোর গলায় বলতে পারে?'

কফিনের দোকান থেকে গঞ্জালেশের ঠিকানাটা সংগ্রহ করে প্রলয় বেরিয়ে এল। সুশান্তকে বলল—'আমার সন্দেহটা যে অমূলক নয় তা এখন বেশ বুঝতে পারছি।'

'তুমি কি বলতে চাও?' সুশান্ত শুধলো।

প্রলয় বলল—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই কফিনের মধ্যে একটা রহস্য লুকিয়ে আছে।'

'কী যে বল। সুশান্ত নাস্তিকের মতো নেতিবাচক ভঙ্গিতে তাকাল। বলল—'তুমি নিজেও জানো গোয়াতে খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অনেক। তাই মৃতদেহ কবরখানায় নিয়ে যেতে কফিনের প্রয়োজন হয়। গঞ্জালেশ সেই কারণেই এটা অর্ডার দিয়ে ডেলিভারি নিয়েছে। এর মধ্যে আবার রহস্য কোথায়?'

রাস্তার ধারে তিন-চারটে মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে। গোয়াতে এরা ট্যাক্সির মতো প্যাসেঞ্জার নেয়। শহরের মধ্যে যে কোনো জায়গায় যেতে তিন টাকা ভাড়া। প্রলয় একটা মোটর বাইকের পিছনে বসে সুশান্তকে অন্য একটায় উঠতে নির্দেশ দিল। গঞ্জালেশের ঠিকানাটা বলতেই মিনিট সাত-আট বাদে একটা গলির মুখে মোটর বাইক এসে থামল। চালক বলল—'বাড়িটা গলির ভিতরে। একটু এগিয়ে খুঁজে নিতে হবে।'

আট-দশটা বাড়ি ছাড়িয়ে নির্দিষ্ট গৃহের সামনে তারা এসে পৌঁছল। হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। একটা কভার ভ্যান সামনে দাঁড়িয়ে। সুশান্ত চাপা গলায় বলল—'এই ভ্যানটাতে করেই কফিনটা নিয়ে এসেছে।'

'ঠিকানাটা তাহলে ভুল দেয়নি।' প্রলয় দাঁতে দাঁত চিপে কথা কইল।

'কফিনটা নিশ্চয় ভেতরে রেখেছে।'

'সম্ভবত।'

'গঞ্জালেশের খোঁজ করবে নাকি?' সুশান্ত ফিসফিস করল।

প্রলয় কোনো জবাব দেবার আগেই বাড়ির দরজা খুলে গঞ্জালেশ বেরিয়ে এল। এক মাথা চুল, ঈষৎ লালচে। ঋজু, শক্তসমর্থ গড়ন। বয়স চল্লিশের মতো। খুব লম্বা কিংবা বেঁটেও নয়। মাঝারি উচ্চতা। পরনে একটা জিনসের প্যান্ট। গায়ে আকাশী নীল রঙের জামা।

pathagar.net

তাদের দুজনের মুখের ওপর বায়সের মতো একঝলক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

প্রলয় বলল—'আমরা ওকে ফলো করব।'

গঞ্জালেশ পিছন ফিরে তাকাল না, সম্ভবত তার তাড়া ছিল। অথবা অল্পবয়সী দুটো ছেলেকে সে ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। বড় রাস্তার ওপর একটা মোটর সাইকেলের পিছনে উঠে সে রওনা দিল। প্রলয় প্রায় দৌড়ে এসে অপেক্ষমাণ একটা অটো রিকশাতে উঠে বসল। পিছু পিছু সুশান্তও। অটো রিকশাটা স্টার্ট নিতেই প্রলয় ইংরেজীতে বলল—'ওই মোটর সাইকেলটাকে ফলো করুন। যেভাবে হোক ওর নাগালের মধ্যে পৌঁছতে হবে।'

প্রচণ্ড বেগে মোটর সাইকেলটা ছুটছে। তার পিছনে অটো রিকশাটা যেন প্রাণের দায়ে দৌড়ুচ্ছে। ভাগ্যিস ওর গন্তব্যস্থল বেশি দূরে নয়। নইলে অটো রিকশার সাধ্য কি যে মোটর বাইকটার সঙ্গে পাল্লা দেয়? মিনিট চার-পাঁচ বাদেই মোটর সাইকেলটা সমুদ্রের কাছে একটা ছোট বাজার গোছের জায়গায় এসে থামল। প্রলয়ের নির্দেশ মতো অটো রিকশাটা একটু দূরেই গতিহীন হলো। দূর থেকে দুজনেই লক্ষ্য করল মোটর সাইকেল থেকে নেমে গঞ্জালেশ একটা দোকানের ভিতরে ঢুকল।

প্রায় বিড়ালের মতো সন্তর্পণে লঘু পা ফেলে দুই বন্ধু সেই দোকানটার কাছে এসে দাঁড়াল। সামনে সাইনবোর্ডে নাম লেখা—পি আর জয়চন্দ্রন অ্যাণ্ড কোং। এক্সপোর্টার্স অব

সী ফুড অ্যাণ্ড আদার জেনারেল মার্কেণ্ডাইজ।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করল—'জেনারেল মার্কেণ্ডাইজ কথাটার অর্থ কি?'

'ওর মানে হলো সাধারণ দ্রব্যসামগ্রী। অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত মাল এর আওতায় আসতে পারে।'

'গঞ্জালেশ এখানে কেন এসেছে?'

'সেটা বলা কঠিন।' প্রলয় জবাব দিল। ঈষৎ হেসে ফের যোগ করল—'হয়তো কোনো রপ্তানীর ব্যাপারেই মালিকের সঙ্গে শলাপরামর্শ হবে।'

সুশান্ত বলল—'গঞ্জালেশের পিছনে এমনি ছুটোছুটি করে কী লাভ?'

'লাভ-লোকসানের হিসেব কি এত তাড়াতাড়ি হয়? তোকে তো সেদিন বলেছি সবুরে মেওয়া ফলে।' প্রলয় হাসল।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে গঞ্জালেশ সেই দোকানটা থেকে বেরিয়ে এলো। প্রলয় আর সুশান্ত তখন উল্টোমুখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। এক নজর ওদের লক্ষ্য করে গঞ্জালেশের মনে বোধহয় সন্দেহ দানা বাঁধল। তাই সে ক্রুদ্ধভাবে গটগট করে পা ফেলে সোজা প্রলয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। কুৎসিত মুখভঙ্গি করে শুধলো—'এই তোমরা কে?'

আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রলয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল—'ট্যুরিস্ট।'

'কোথা থেকে এসেছ?'

'ওয়েস্ট বেঙ্গল।'

'এখানে কি দরকার?'

'কিছু না।' প্রলয় নির্বিকার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। বলল—'একটা অটোতে চেপে চলে এলাম সমুদ্র দেখতে।'

'কিন্তু একটু আগেই যেন তোমাদের অন্য জায়গায় দেখলাম।

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রলয় একটা থিয়েটারী ঢঙ করল। বলল—'এই কদিনে নর্থ গোয়া, সাউথ গোয়া আরো কত জায়গা ঘুরে এলাম।'

'হুম্।' গঞ্জালেশ কী যেন ভাবল। পরক্ষণেই একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুতপায়ে সে অন্যদিকে চলে গেল।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করল—'এখন কি করবে তাহলে?'

প্রলয় কোনো জবাব দেবার আগেই দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি প্রায় তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। মুখ তুলে আগন্তুককে সে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করল। পরনে ফুলপ্যাণ্ট। গায়ে সাদা জামা। পরিষ্কার ইংরেজীতে সে প্রশ্ন করল—'ওই লোকটা তোমাকে কী বলছিল?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে প্রলয় জবাব দিল—'তেমন কিছু নয়। মানে জিজ্ঞেস করছিল আমরা কে? কোথা থেকে এসেছি ইত্যাদি।'

জবাবে লোকটা কিন্তু সন্তুষ্ট হয়নি। সে বলল—'কিন্তু আমার যেন মনে হলো গঞ্জালেশ তোমাদের ওপর বেদম চটে গিয়েছে।'

ভুরু তুলে প্রলয় প্রশ্ন করল—'আপনি কে জানতে পারি?'

'যদি বলি গঞ্জালেশের লোক? তোমাদের ওয়াচ করছি।' সে কেমন অদ্ভুত হাসল।

প্রলয় মাথা নাড়ল। বলল—'উহুঁ। আপনি গঞ্জালেশের লোক নন। বরং তার প্রতিপক্ষ।

pathagar.net

সম্ভবত ওর ওপর নজর রাখছেন।'

আগন্তুক সহাস্যে তার পিঠ চাপড়ে বলল—'রাইট। তোমার সঠিক ধারণা করবার ক্ষমতা আছে।' তারপর পকেট থেকে একটা লাল কার্ড বের করে বলল—'এই দেখ। আমি হলাম অ্যান্টি স্মাগলিং স্কোয়াডের অফিসার। আর গঞ্জালেশ এই অঞ্চলের এক কুখ্যাত স্মাগলার। ওর গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়।'

'গঞ্জালেশ কিন্তু চোরাচালানের কাজ দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে আপনার স্কোয়াডকে কথা দেখিয়ে।' বলেই সে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করল।

এই ধরনের মন্তব্যে যে কোনো অফিসারের চটে ওঠার কথা। বিশেষ করে সেটা বালখিল্যদের মুখে শুনলে। কিন্তু আগন্তুক আদৌ চটল না। বরং হাসল। বলল—'আমার মনে হচ্ছে গঞ্জালেশের গতিবিধি সম্বন্ধে তুমি কিছু জান।'

'আজ্ঞে এখনও সেটা অনুমান। প্রমাণ কিছু পাইনি।'

'গঞ্জালেশ বোধহয় তাই তোমাদের ওপর চোটপাট করছিল?'

প্রলয় মুচকি হাসল। বলল—'কারো গোপন খবর জানবার চেষ্টা করলে সে নিশ্চয় চটে যাবে।'

'নাহ্।' অফিসার হেসে বলল—'তুমি দেখছি বেশ ইনটেলিজেন্ট ছেলে। আচ্ছা, কাল দশটা নাগাদ একবার আমাদের অফিসে আসতে পারবে?'

'কেন? গঞ্জালেশের সম্বন্ধে আমার যা অনুমান সেটা জানতে চান?'

'ধর তাই।'

প্রলয় এক মুহূর্ত চিন্তা করল, বলল—'বেশ, যেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু একটা শর্ত।'

'কি শর্ত?'

'আমার অনুমানকে ভিত্তি করে যদি কোনো অ্যাকশন হয় তাহলে সেই অপারেশনে আমাদের সঙ্গে নিতে হবে।'

'অফ কোর্স। এতে অমত করবার কী আছে? অপারেশন হলে তোমরা নিশ্চয় সঙ্গী হবে।

অফিসার চলে গেলে প্রলয় পা টিপে টিপে পি. আর. জয়চন্দ্রন অ্যাণ্ড কোং-এর দরজায় উঁকি দিল। ভিতরে টেবিল-চেয়ারে বসে সাত-আট জন লোক মনোযোগ সহকারে কাজ করছে। একটি মেয়ে মেশিনে খটাখট শব্দ তুলে কী যেন টাইপ করছিল। পনের-ষোল বছরের একটি ছেলে হঠাৎ দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে প্রলয়ের মুখের দিকে তাকাল। কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করল—'তুমি কে? কাকে চাই?'

এক গাল হেসে প্রলয় ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করল। বলল—'আমরা ট্যুরিস্ট। ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি। আজ বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ এদিকে চলে এলাম।'

'তা গোয়া কেমন লাগছে?'

'চমৎকার। বীচগুলো এত সুন্দর! ভ্যাগাটর, আনজুনা, কালানগুটে আর কোলডা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বন্ধুত্বটা জমে উঠল।

প্রলয় জিজ্ঞেস করল—'তোমাদের এই কোম্পানি এক্সপোর্টের কাজ করে, তাই না?'

pathagar.net

'হ্যাঁ। কত জিনিস যে রপ্তানি হয় তা শুনলে অবাক হয়ে যাবে।'

'কি রকম?'

'যেমন ধর কফিন। এই তো সামনের শনিবার ভাস্কো পোর্ট থেকে তিরিশটা কফিন বিদেশে চালান যাবে।'

'তিরিশটা কফিন?' বিস্ময়ে প্রলয় চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলল।

'এতে অবাক হবার কী আছে?' ছেলেটি হেসে ফেলল। বলল—'গত বছর নভেম্বর মাসে বাহান্নটা কফিন রপ্তানী হয়েছিল।'

'শনিবার তিরিশটা কফিন কোথায় পাঠান হবে?'

'হংকং। সেখান থেকে আবার অন্যত্রও যেতে পারে।'

ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রলয় আর সুশান্ত একটা অটো রিকশাতে উঠল। গাড়ি স্টার্ট নিতেই চালককে নির্দেশ দিল—'পানাজি ট্যুরিস্ট হস্টেল।'

পরদিন সকালে প্রলয় আর সুশান্ত আলবুকার্ক স্ট্রীটে সেই অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

লোকটি তাদের আপ্যায়ন করে বলল—'আরে এস এস। তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করে আছি।'

প্রলয় আর সুশান্ত দুটো চেয়ার দখল করে বসল।

অফিসার জিজ্ঞেস করল—'গঞ্জালেশ যে চোরাচালানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তুমি সেটা কেমন করে জানলে?'

এটা অনুমান। তাছাড়া এ কথা তো কাগজেই লিখেছে। আপনি গত সোমবারের গোয়া নিউজ পড়েননি। পেপারে গঞ্জালেশের ছবি বেরিয়েছে।'

অফিসার মাথা নাড়ল। বলল—'উঁহুঁ। তুমি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ। আমার ধারণা তোমার কাছে অন্য কোনো খবর আছে।'

প্রলয় চাপা গলায় বলল—'ঠিক খবর নয়। তবে একটা অনুমানের কথা বলতে পারি।' এক মুহূর্ত থেমে ফের যোগ করল—'বোধহয় সেটা অভ্রান্ত।'

'তাই নাকি?' অফিসার উৎসাহিত হলো। শুধলো—'অনুমানটা কি?'

'ঈষৎ হেসে প্রলয় আগের মতো চাপা গলায় সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে দিল। বলল—'শনিবার ভাস্কো পোর্ট থেকে কোন জাহাজ হংকং যাত্রা করবে সেটা এখনই জানা দরকার।'

'শনিবার মানে কাল। তাহলে এখনই খোঁজ নিতে হয়।' বিলম্ব না করে অফিসার টেলিফোনে ডায়াল করল। গোয়ানীজ ভাষায় দু-চার মিনিট কথা হলো। তারপর টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে সে বলল—'এস. এস. মিৎসুবিশি। শনিবার রাত্তির দশটায় হংকং যাত্রা করবে।'

অফিসার ফের বলল—'কার্গো অর্থাৎ মালপত্র শিপমেন্টের কাজ সারাদিন ধরেই চলে। তবু আমি আন্দাজ করছি কফিনগুলো সন্ধ্যের আগে পোর্টে এসে পৌঁছবে না। শেষ মুহূর্তে ওগুলো জাহাজে তোলার চেষ্টা করবে। তাছাড়া চোরাচালানের কাজ রাতের অন্ধকারে হাসিল করতেই সুবিধে।'

প্রলয় আর সুশান্ত নীরবে শুনছিল।

অফিসার তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—'ভাস্কো পোর্টে তোমরা কাল বিকেল নাগাদ আসতে পারবে?'

তা পারি, 'প্রলয় জবাব দিল। বলল—'কিন্তু আপনাকে পাব কোথায়?'

'পোর্টের কাস্টমস চেকিং সেন্টারে এসে আমার নাম বলবে মিঃ ভার্গিস—অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, অ্যান্টি স্মাগলিং স্কোয়াড। তাহলেই খোঁজ পাবে।'

অফিসারের ঘর থেকে বেরিয়ে সুশান্ত জিজ্ঞেস করল—'কাল বিকেলে ভাস্কো পোর্টে যাবে?'

'অবশ্য। মিঃ ভার্গিসের সঙ্গে তাই কথা তো হলো?'

সমুদ্রের বুকে বিকেলের ছায়া পড়েছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে পশ্চিমে।

মিঃ ভার্গিসকে বেশ চিন্তিত দেখাল। চেয়ারে বসে নিবিষ্টমনে কী যেন ভাবছে। প্রলয় আর সুশান্তকে ঘরে ঢুকতে দেখে হাল্কা হাসবার চেষ্টা করে বলল—'কফিনগুলো এখনও এসে পৌঁছয়নি।'

নিচের ঠোঁটটা ঈষৎ কামড়ে প্রলয় মন্তব্য করল—'আপনি তো বললেন, সন্ধ্যের পর হয়তো পোর্টে এসে পৌঁছবে।'

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার কিছু পরেই মিঃ ভার্গিসের টেলিফোনটা বেজে উঠল। 'একটা ট্রাক বোঝাই তিরিশটা কফিন শিপমেন্টের জন্য এসে পৌঁছেছে।'

রিসিভারে মুখ রেখে ভার্গিস জিজ্ঞেস করলেন—'কাস্টমস্ আর সিকিওরিটি চেকিং শুরু হয়েছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো গণ্ডগোল ধরা পড়েনি।'

ভার্গিস ফের জিজ্ঞেস করল—'শিপিং এজেন্টের লোক ছাড়া কোম্পানির তরফের আর কেউ এসেছে?

'হ্যাঁ। এক্সপোর্টারের দুজন লোক সঙ্গে আছে।'

'আই সী!' বলেই রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভার্গিস তখুনি জিপে উঠে বসল। সঙ্গে সিকিওরিটি। প্রলয় আর সুশান্ত গাড়ির ভিতরে।

ভার্গিস বলল—'চেকিং-এ কিছু না পাওয়া গেলে কফিনগুলো শিপমেন্ট করতে দিতে হবে। আটক রাখবার কোনো উপায় নেই।'

প্রলয় বলল—'শুধু একটা কফিন ভালো করে পরীক্ষা করলেই চলবে। তার গায়ে ছোট্ট একটি চীনা অক্ষর লেখা আছে।'

'আশ্চর্য! তুমি চীনা অক্ষরও পড়তে পারো নাকি?'

'সামান্য।' প্রলয় সলজ্জ হাসল। বলল—'অক্ষরটা দেখেই আমার প্রথম সন্দেহ হলো যে কফিনটা চীনা অধ্যুষিত কোনো অঞ্চলে রপ্তানী হতে পারে।'

তখনও চেকিং শেষ হয়নি। ডালা খুলে কফিনগুলোর পরীক্ষা চলছে। ভার্গিস এসে প্রলয়কে কী ইঙ্গিত করতেই সে কফিনগুলির পর্যবেক্ষণে লেগে গেল।

তারপর টোকা মেরে একটা কফিনকে চিহ্নিত করতেই স্কোয়াডের লোকেরা সেটা

pathagar.net

সরিয়ে নিয়ে গেল।

বিলম্ব না করে প্রলয় বলল—'কফিনের ভিতর কাঠের একটা পাতলা পার্টিশন দিয়ে দু-ভাগ করা হয়েছে। জোরে ধাক্কা দিলেই একটা ফাঁপা আওয়াজ শুনতে পাবেন।'

ভার্গিস হুকুম করল—'পার্টিশানটা সরিয়ে ফেল।'

প্রলয় বলল—'তার আগে ওই এক্সপোর্টারের লোক দুটোকে ডেকে আনুন পরীক্ষাটা ওদের সামনে হলেই তো ভালো।'

লোক দুটো গা-ঢাকা দেবার মতলবে ছিল। কিন্তু সিকিওরিটি চেকিং-এর গেট পেরিয়ে যেতে পারেনি। তাদের ধরে আনতেই ভার্গিসের কানের কাছে মুখ নামিয়ে প্রলয় ফিসফিস করল—'একজনের যেন ছদ্মবেশ বলে মনে হচ্ছে।'

কালো গোঁফ জোড়ায় টান দিতেই সেটা দিব্যি উঠে এলো। পরচুলাও আলগা-ধরা পড়ে গঞ্জালেশ হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সিকিওরিটির লোকেরা জবরদস্ত শক্তিমান। কয়েক সেকেণ্ড ধস্তাধস্তির পর গঞ্জালেশকে তারা সম্পূর্ণ কব্জা করে ফেলল।

আসল রহস্যটা ফাঁস হলো কাঠের পার্টিশানটা সরিয়ে ফেলার পর। কফিনের ভিতরে উঁকি দিয়ে ভার্গিস্ সহর্ষে চিৎকার করে উঠল। শুধু ভার্গিস নয়—সিকিওরিটির গেট ভেঙে সমস্ত পোর্টই প্রায় উঠে এসেছে। আশ্চর্য! কফিনের ভিতর কোনো মৃতদেহ নেই। তাহলে কী ওটা? প্রলয় বলল—এই তো সেই রঙ্গ-নাথপুরম্ গ্রামের অপহৃত নটরাজ মূর্তি, আজ রাত্তিরে বিদেশে পাচার হচ্ছিল।

সকলেই ঝুঁকে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, পার্টিশানের আড়ালে পনের কিলো ওজনের অষ্টধাতু নির্মিত নটরাজ মূর্তি পরম প্রশান্তিতে শায়িত রয়েছে।

প্রলয় আরো বলল—'অষ্টধাতুর নটরাজ মূর্তিটা বিদেশে পাচার করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। পনের কিলো ওজন। শেষ পর্যন্ত এই সুযোগটা গঞ্জালেশের হাতে এসে গেল। কফিনের ভিতর পাতলা পার্টিশন করে নটরাজ মূর্তিটা চালান দেবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিল।'

মাণ্ডবী নদীর পাশ দিয়ে গাড়ি চলেছে, পানাজি, মাপুসা, ডোনা পাওলা, পোর্ট ভাস্কো, মায়েম লেক, বম্ জেসাস ব্যাসিলিকা সব পিছনে পড়ে রইল।

ভার্গিস নিজে ড্রাইভ করে ওদের ডাবোলিম এয়ার পোর্টে সী অফ করতে যাচ্ছে। প্রলয়ের বাবা বললেন—'ছেলেটার এই দোষ। রহস্যের গন্ধ পেলেই পাগল। শেষ পর্যন্ত গোয়া বেড়াতে এসে এই কাণ্ডটি বাধিয়ে বসবে আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'ভাগ্যিস এসেছিল।' আড়চোখে প্রলয়ের দিকে তাকিয়ে ভার্গিস মন্তব্য করল। বলল—'তাই তো নটরাজ মূর্তিটা এদেশেই রয়ে গেল। প্রলয় আর সুশান্ত বাগড়া না দিলে এতক্ষণে নীল সমুদ্রে কতদূর পাড়ি দিত কে জানে?'

হত্যাকারী কে?

পাঁচকড়ি দে

হায়, পরদিন প্রভাতের সেই ঘটনার সেই লোমহর্ষক ঘটনার, সেই ভয়ঙ্করী স্মৃতির হাত হইতে আমি কি মরিয়াও অব্যাহতি পাইব? তখন বেলা ঠিক দশটা। এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম তাহার মুখ বিবর্ণ, এবং দৃষ্টি উন্মাদের মত। মুখ চোখের ভাবে যেন একটা কোন ভীষণতার ছায়া লাগিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়মুষ্টিতে আমার জামাটা ধরিয়া এমন একটা টান দিল, আর একটু হইলে বা জামাটা অধিক দিনের পুরাতন হইলে তাহাতেই সেটা একেবারে ছিঁড়িয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ ব্যাকুলকণ্ঠে কেবল বলিতে লাগিল, "যোগেশদা, সর্বনাশ হয়েছে যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে—একেবারে খুন, আর উপায় নাই। যোগেশদা, কি হবে—তুমি চল—শীঘ্র ওঠো—এমন খুনে সে--'

আমি বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। সেই মুহূর্তে একটা অনিবার্য বিমূঢ়তা আসিয়া আমার মস্তিষ্ক এমন পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া বসিল যে, আমি নরেন্দ্রর কথা

কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে একান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হয়েছে নরেন, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

দেখিলাম, নরেন্দ্রনাথের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "সর্বনাশ হয়েছে যোগেশদা! লীলা নাই—শশিভূষণ কাল রাত্রে লীলাকে খুন করিয়াছে, পুলিশের লোক শশিভূষণকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।" আর শুনিতে পাইলাম না, বজ্রাহতের ন্যায় সেইখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়িয়া গেলাম। যখন কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইলাম, দেখি, নরেন্দ্রনাথ পাশে বসিয়া আমার চোখে মুখে জলের ছিটা দিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে বলিলাম, "আর কিছু করিতে হইবে না। সহসা এ ভয়ানক কথাটা শুনিয়াই—যাক্, তুমি বলিতেছিলে না শশিভূষণকে পুলিশের লোক গ্রেপ্তার করিয়াছে?"

নরেন্দ্রনাথ কহিল, "তাহাকে অনেকক্ষণ চালান দিয়াছে, চালান দিতে শশিভূষণের উপরে বড় একটা জোর-জবরদস্তি করিতে হয় না ; সে একটা আপত্তিও করে নাই—নিজেই ধরা দিয়াছে। হয় ত শশিভূষণের তখনও নেশার ঝোঁক ছিল। যাই হোক, তুমি একবার চল যোগেশদা, এমন সময়ে তোমার একবার যাওয়া খুবই দরকার, যদি কোন একটা উপায় হয়।"

আমি কম্পিত-কণ্ঠে, কম্পিত-হৃদয়ে এবং কম্পিত-কলেবরে ভীতি-বিহ্বলের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায়? লীলাকে দেখিতে? দাঁড়াও—দাঁড়াও—নরেন, আমায় একটু প্রকৃতিস্থ হইতে দাও—আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বুকের ভিতরে যেন কি হইতেছে।"

আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আমার মনের অবস্থা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিল। আমার কথায় সম্মত হইল, কিন্তু সে একান্ত অধীরভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া আমি আর বড় বিলম্ব করিলাম না—তখনই বাহির হইলাম।

যথাসময়ে আমার শশিভূষণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, এ কাহিনীর মধ্যে একান্ত উল্লেখযোগ্য হইলেও, তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই হত্যা শশিভূষণের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সেই যে দোষী, সে সম্বন্ধে আর কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গত রাত্রে উদ্যানমধ্যে আমার সহিত শশিভূষণের যে সকল কথা হইয়াছিল, একজন দাসী তাহা শুনিয়াছে, সে নিজের জবানবন্দীতে আমাদের মুখনিঃসৃত প্রত্যেক কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। প্রাতঃকালে লীলার মৃতদেহ বিছানার পাশে পড়িয়া ছিল এবং তাহার বক্ষে একখানি ছুরিকা আমূল প্রোথিত ছিল ; সে ছুরিকাখানি শশিভূষণের নিজেরই ছুরি। অনেকেই সেই ছুরিখানি তাহার বৈঠকখানা ঘরে অনেকবার দেখিয়াছে। সে রকম ধরনের প্রকাণ্ড ছুরি সে গ্রামের মধ্যে আর কাহারও ছিল না। শশিভূষণের বিরুদ্ধে আরও একটা বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, গতরাত্রে শয়নকালে তাহাদিগের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একটা অত্যধিক বাক্-বিতণ্ডা হইয়াছিল এবং শশিভূষণ তাহাকে অত্যধিক প্রহার করিয়াছিল। লীলার কপালে একটা মুষ্ট্যাঘাতের চিহ্নও ছিল। ডাক্তারী পরীক্ষায় এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, মৃত্যুর দুই-এক ঘণ্টা পূর্বে তাহাকে আঘাত করা হইয়াছিল।

এ সকল প্রতিপাদ্য প্রমাণ সত্ত্বেও সে যে স্ত্রীহন্তা, তাহা শশিভূষণ স্বীকার করিতে সম্মত নহে। সে অবিচলিতভাবে এখনও বলিতেছে, সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাহাকে ফাঁসিই দাও—মার—কাট, যা ইচ্ছা তাই কর—সেজন্য সে কিছুমাত্র দুঃখিত নহে। শশিভূষণ সর্বসমক্ষে এখনও স্বীকার করিতেছে যে, তাহার পত্নীর প্রতি সে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিত, মদের খেয়ালই তাহার একমাত্র কারণ, নতুবা সে তাহার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিত ; এক্ষণে লীলাকে হারাইয়া তাহার জীবন একান্ত দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। জীবন ধারণে তাহার তিলমাত্র ইচ্ছা নাই! শশিভূষণের এ সকল কথা কতদূর সত্য, তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি আমার তখন ছিল না। আরও শুনিলাম, আমার সহিত একবার দেখা করিবার তাহার বড়ই আগ্রহ। যে কেহ তাহার সহিত দেখা করিতে যাইত, তাহাকেই সে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত, আমি যেন একবার যাইয়া তাহার সহিত দেখা করি। শশিভূষণের সহিত দেখা করিবার আমার ততটা ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু তাহার এইরূপ বারংবার আগ্রহ প্রকাশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একদিন আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

নিজের হাজত ঘরে আমাকে উপস্থিত দেখিয়া শশিভূষণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল ; এবাং আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে বলিয়া—আরও আমার সহিত যে সমুদয় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া, বারংবার আমার নিকটে অশ্রুসংরুদ্ধকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তারপর বলিল, "ভাই যোগেশ, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে ; কিন্তু অভাগিনী লীলা কি এমন নরকের কীটকে কখনো ক্ষমা করিবে? আমি আজ আমার পাপের ফল পাইলাম। ধর্মের বিচার অব্যাহত—আজ না হউক, দুদিন পরে নিশ্চয়ই সকলকে স্বকৃত পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করিতে হইবে ; কেহই তাহার হাত এড়াইতে পারে না। আমি লীলার প্রতি যে সকল নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, বোধ করি কোন কঠোর রাক্ষসেও তাহা পারে না। যোগেশ, আজ সকলেই বিশ্বাস করিয়াছে, আমি লীলার হত্যাকারী। তুমিও যে এমন বিশ্বাস কর নাই তাহাও নহে। জগতের সকলেরই মনে আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই ধারণা, এই বিশ্বাস চিরন্তন অটুট এবং অটল থাকিয়া যাক্—বরং তাহাতে আমি সুখী ; কিন্তু তুমি—যোগেশ, তুমি যেন আর সকলের মত তাহা করিয়ো না, এই কথা বলিবার জন্যই আমি তোমার সহিত দেখা করিতে এত উৎসুক হইয়াছিলাম। আমি ধর্মবিচ্যুত, মনুষ্যত্ব বিবর্জিত, শয়তানের মোহমন্ত্রপ্রণোদিত, জগতের অকল্যাণের পূর্ণ প্রতিমূর্তি—আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? ভাই যোগেশ—এ জগতে এমন একজন থাক্, সে যেন জানে, আমি একটা মহাপাপী ছিলাম বটে, কিন্তু স্ত্রীহন্তা নই।" বলিতে বলিতে শশিভূষণের কণ্ঠ কম্পিত এবং বাকরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে দুই হাতে মুখ চাপিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

বলিতে কি, তাহার সেই সকরুণ অবস্থা তখন আমার মর্মভেদ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক করিয়া তাহার পর আমি তাহাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শশিভূষণ, এ পর্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তুমি অকপটে সব আমাকে বল ; কোন কথা গোপন করিতে চেষ্টামাত্রও করিয়ো না—যদি এ দুঃসময়ে আমি তোমার কোন উপকারে আসিতে পারি।"

শশিভূষণ বলিল, "আমি প্রভাতে উঠিয়া প্রথমে দেখিলাম, লীলা রক্তাক্ত হইয়া আমার

বিছানার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। ধরিয়া তুলিতে গেলাম—দেখিলাম, দেহে প্রাণ নাই। দেখিয়াই আমার বুকে রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। বুঝিলাম, লীলা এ পিশাচকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিলে আর তাহাকে ফিরিয়া পাইব না—পাইবার নহে। বলিতে কি, যোগেশ! প্রথমে আমার বোধ হইল, মদের ঝোঁকে আমিই তাকে রাত্রে হত্যা করিয়াছি। তাহার পর যখন দেখিলাম, আমারই ছুরিখানা লীলার বুকে তখনও আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে, তখন আমার সে ভ্রম দূর হইল। আমার এখন বেশ মনে পড়িতেছে, ছুরিখানি আমার বৈঠকখানায় যেখানে থাকিত, সেখানে ছুরিখানি কাল রাত্রে দেখিতে পাই নাই, পরে খুঁজিয়াও কোথাও পাওয়া গেল না। আমি সে কথা তখনই লীলাকেও বলিয়াছিলাম। সেজন্য মনে একটু সন্দেহ হইতেছে ; নতুবা এখনও আমার মনে বিশ্বাস, কাণ্ডজ্ঞানহীন আমিই লীলার হত্যাকারী ; কিন্তু সেই ছুরিখানি—যোগেশ আর একটা কথা আছে, আমার বোধ হয়—ঠিক বলিতে পারি না—যদি—যদি—"

শশিভূষণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া নিজেও যেন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। সে ভাব তখনই সাম্‌লাইয়া আমি তাহাকে বলিলাম, "কথা কহিতে এখন সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? তুমি যা জান বা বোধ কর, আমাকে স্পষ্ট বল।"

শশিভূষণ বলিল, "লীলার বুকে ছুরি বসাতে পারে, একজন ছাড়া তাহার এমন ভয়ানক শত্রু আর কেহ নাই। তাহারই উপরে আমার কিছু সন্দেহ—" আমি অত্যধিক ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে সে। তাহার নাম প্রকাশ কর নাই কেন?"

শশিভূষণ অনুচ্চ স্বরে বলিল, "তুমি তাহাকে জান, আমি মোক্ষদার কথা বলিতেছি। যেদিন আমার বিবাহ হইয়াছে, সেইদিন হইতে মোক্ষদাও ভিন্ন মূর্তি ধরিয়াছে। কি একটা হতাশায় সে যেন একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। অনেকবার সে আমাকে শাসিত করিয়া বলিয়াছে 'ইহার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে—আমি যে-সে মেয়ে নই—তবে আমার নাম মোক্ষদা। এক বাণে কেমন করিয়া দুটা পাখি মারিতে হয় আমার হইতেই তাহা একদিন তুমি দেখিতে পাইবে।" শশিভূষণ আবার দুই হাতে দুই চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি অতিশয় চকিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, "অসম্ভব! তাহা কি কখনও হয়?"

অনুতাপদগ্ধ রোরুদ্যমান শশিভূষণ বলিল, "তাহা না হইলেও, আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি, লীলার প্রকৃত হত্যাকারী কে, যাহাতে তুমি সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পার, সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিবে। তাহার পর মুখ হইতে হাত নামাইয়া, তাহার অশ্রুসিক্ত করুণ দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল, "ভাই যোগেশ, তুমি মনে করিতেছ, আমার নিজের জন্য তোমাকে আমি এমনি অনুরোধ করিতেছি—তাহা ঠিক নয়, আমার ফাঁসি হউক বা না হউক সেজন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি, একদিন ত সকলকেই মরিতে হইবে—তা দুইদিন আগে আর পরে ; কিন্তু যোগেশ, যখনই মনে হয় যে লীলার হত্যাকারী তাহার এ নৃশংসতার কোন প্রতিফল পাইবে না—"

বলিতে বলিতে শশিভূষণের অশ্রুমগ্ন দৃষ্টি সহসা মেঘকৃষ্ণ রাত্রে তীব্র বিদ্যুৎগ্নির ন্যায় ঝলসিয়া উঠিল এবং এমন দৃঢ়রূপে সে নিজের হাত নিজেই মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিল যে, হাতের কব্জিতে নখরগুলো বিদ্ধ হইয়া রক্তপাত হইতে লাগিল।

যদিও আমি শশিভূষণকে অতিশয় ঘৃণার চোখে দেখিতাম, কিন্তু এখন তাহাতে নিদারুণ অনুতপ্ত এবং মর্মাহত দেখিয়া আমার সে ভাব মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। শোকার্ত শশিভূষণের সেই কাতরতায় আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম "শশিভূষণ, যেমন করিয়া পারি, তোমার নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিব। এখন হইতেই আমি ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।" এইরূপ প্রতিশ্রুতির পর আমি তাহার নিকট হইতে সেদিন বিদায় লইলাম।

একজন পুরাতন পাকা নামজাদা গোয়েন্দা বলিয়া বৃদ্ধ অক্ষয়কুমারের নাম ডাক যশ খুব। আমি এখন তাঁহারই সাহায্য গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলাম। সেইদিনই বৈকালে আমি অক্ষয়বাবুর বাড়িতে গেলাম।

বৃদ্ধ তখন বাহিরের ঘরে তাঁহার কিঞ্চিদধিক পঞ্চমবর্ষীয় পৌত্রটিকে জানুপরি বসাইয়া ঘোটকারোহণ শিক্ষা দিতেছিলেন। আমাকে দ্বারসমীপাগত দেখিয়া অক্ষয়বাবু তখনকার মত সেই শিক্ষা-কার্যটা স্থগিত রাখিলেন এবং আমাকে উপবেশন করিতে বলিয়া, রামা ভৃত্যকে শীঘ্র এক ছিলিম তামাকের জন্য হুকুম করিলেন। বলা বাহুল্য, অতি সত্বর হুকুম তামিল হইল।

তাহার পর বৃদ্ধ ধূমপানে মনোনিবেশ করিয়া, একটির পর একটি করিয়া ধীরে ধীরে আমার সকল পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরে আমি শশিভূষণ সংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম এবং স্বীকার করিলাম, শশিভূষণকে নির্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিলে আমি তাঁহাকে একহাজার টাকা পুরস্কার দিব।

অক্ষয়বাবু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমার কথাগুলি শুনিলেন। শুনিয়া অনেকক্ষণ করতললগ্নশীর্ষ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আমাকে কিছুই বলিলেন না, বা কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। তাঁহাকে সেইরূপ অত্যন্ত চিন্তিতের ন্যায় নীরবে থাকিতে দেখিয়া শেষে আমি বলিলাম, "কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে বলুন, আমার মনের স্থিরতা নাই—হয়ত ঘটনাটা একটানা বলিয়া যাইতে ভুল করিয়া থাকিব, সেইজন্য বোধহয়, আপনি কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন।"

"না, গোলযোগ কিছু ঘটে নাই।" হুঁকা রাখিয়া, অক্ষয়বাবু বলিলেন, "আমি বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। সেজন্য কথা হইতেছে না ; তবে কি জানেন, কাজটা বড় সহজ নয় ; সহজ না হইলেও যাহাতে সহজ করিয়া আনিতে পারি, সেজন্য চেষ্টা করিব। তার আগে আপনাকে একটি বিষয়ে আমার কাছে স্বীকৃত হইতে হইবে, আর আমার দুইটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর করিবেন।"

আমি বলিলাম, "দুইটি কেন—আপনার যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, জিজ্ঞাসা করুন, আমি এখনই উত্তর দিব। তবে কোন্ বিষয়ে আমাকে স্বীকৃত হইতে হইবে, তাহা পূর্বে না বলিলে, আমি কি করিয়া বুঝিতে পারিব যে, আমার দ্বারা তাহা সম্ভবপর কি না। আমার দ্বারা যদি সে কাজ হইতে পারে, এমন আপনি বোধ করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমার অন্যমত নাই জানিবেন।" "সে কথা মন্দ নয়।" বলিয়া অক্ষয়বাবু একটু ইতস্তত করিলেন। তাহার পর বলিলেন আমি যে বিষয়ে আপনাকে স্বীকৃত হইতে বলিতেছি, তাহা এমন বিশেষ কিছু নহে, আপনি মনে করিলেই তাহা পারেন ; আজ

কালকার যে বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে সেটা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা নহে। আপনি যে হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাহিতেছেন, সেইটে এমন একটা লেখাপড়া করিয়া যে কোন একজন ভদ্রলোকের নিকটে আপনাকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে যে, পরে যদি আমি কৃতকার্য হইতে পারি, সে টাকা আমিই তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। আপনার কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না।" আমি। আমি সম্মত আছি ; ইহাতে আমার অমত কিছুই নাই। এখন আপনার দুইটি প্রশ্ন কি বলুন। অক্ষয়। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই—ঠিক কথা বলিবেন, গোপন করিলে কোন কাজই হইবে না—শশিভূষণ যে নির্দোষ, এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন? আমি। নিশ্চয়ই। আমি তাহার দুশ্চরিত্রের জন্য তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি। যদি তাহাকে এই হত্যাপরাধ দোষী বলিয়া আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে তাহার মুক্তির জন্য একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করা দূরে থাক্, তখনই আমার হাত কাটিয়া ফেলিয়া দিতাম।

অক্ষয়। বটে! তার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—আপনি কি কেবল শশিভূষণ যাহাতে নিরপরাধ বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তাহাই চাহেন ; না যাহাতে স্ত্রীর হত্যাকারীও সেই সঙ্গে ধরা পড়ে, তাহাও আমাকে করিতে হইবে?

আমি। ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার এ প্রশ্নের ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

অক্ষয়। ইহাতে না বুঝিতে পারিবার কিছুই নাই ; একটু ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। এই আমিই আপনাকে বুঝাইয়া বলিতেছি ; কথাটা কি জানেন প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরা বড় সহজ কাজ নহে। এবং আমি মনে করিলেই সে আসিয়া ধরা দিবে না ; বড় শক্ত কাজ—কোন নিরপরাধ লোকের স্বপক্ষে কয়েকটা প্রমাণ সংগ্রহ করা সে তুলনায় অনেক সহজ। তাঁহার কথায় আমার একটু হাসি আসিল। আমি বলিলাম, "বুঝিয়াছি, আমি যে হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহা শশিভূষণকে নিরপরাধ সপ্রমাণ করিবারই পারিশ্রমিকের যোগ্য বিবেচনা করেন ; কিন্তু আমার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উহার বেশি আর উঠিতে পারিব না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি হত্যাকারীকেই ধরুন বা শশীভূষণকেই উদ্ধার করুন, আপনি ঐ হাজার টাকা পাইবেন।'

অক্ষয়বাবু বলিলেন, "তা বেশ, পরে এই সব লইয়া একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিবার অপেক্ষায় আগে হইতে একটা ঠিকঠাক বন্দোবস্ত করিয়া রাখা ভাল। যাক্ আপনাকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই।"

ইহার চারদিন পরে একদিন অক্ষয়বাবু নিজেই আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। সেদিন যেন তাঁহাকে কেমন একটু রুষ্টভাবযুক্ত দেখিলাম। আমি কোন কথা বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, "যা মনে করা যায়, তা ঠিক হয় না-কে জানে মহাশয়, টাকার লোভ দেখাইয়া আপনি এমন একটা ঝঞ্ঝাট কাজে এই বুড়োটারই ঘাড়ে চাপাইবেন।"

বলিতে বলিতে অক্ষয়বাবু উঠিলেন ক্ষিপ্রহস্তে পথের দিক্‌কার একটি জানলা সশব্দে খুলিয়া ফেলিলেন এবং জানলার সম্মুখভাগে ঝুঁকিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন।

নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল এবং দৃষ্টির সম্মুখে সর্ষপকুসুম নামক বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র ক্ষুদ্র গোলকগুলি নৃত্য করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্ষণপরে দুইটি লোক সে ঘরে প্রবেশ করিল। একজনকে দেখিবামাত্র পুলিশ কর্মচারী বলিয়া চিনিতে পারিলাম ; আর তাহার পাশের লোকটি সেই-ই—গত রাতে যে বালিগঞ্জের পথ হইতে আমার বাড়ি পর্যন্ত আমার অনুসরণে আসিয়াছিল!

সেই লোকটিরই প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া অক্ষয়বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এই লোকটিকে চিনিতে পারেন?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, যখন আমি আপনার বাগান হইতে বাড়ি ফিরিতেছিলাম, তখন এই লোকটি আমার বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিল ; কিন্তু তাহার পূর্বে ইহাকে আর কখনও দেখি নাই।"

অক্ষয়বাবু বলিলেন, "না দেখিবারই কথা। আমারই আদেশে এই লোক আপনার অনুসরণ করিয়াছিল।" এই বলিয়া তিনি বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবাগতদ্বয়কে বলিলেন, "তোমাদের ওয়ারেণ্ট বাহির কর, ইহারই নাম যোগেশবাবু—ইনিই লীলার হত্যাকারী।"

কথাটা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় আমি সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া দশ হাত পশ্চাতে হটিয়া গেলাম এবং তেমন মধ্যাহ্নরৌদ্রোজ্জ্বল দিবালোকেও উন্মীলিত চক্ষে চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। এই বিশ্বজগতের সমুদয় শব্দ কোলাহল আমার কর্ণমূলে যুগপৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। গাঢ়তর—গাঢ়তর—গাঢ়তর অন্ধকারে চারিদিক ব্যাপিয়া ফেলিল। কতক্ষণ পরে জানিনা—প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, অয়কঙ্কনে আমার হস্তদ্বয় শোভিত এবং সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। অক্ষয়বাবু বলিতেছেন, "যোগেশবাবু, আপনার জন্য আমি দুঃখিত হইলাম। কি করিব? কর্তব্য আমাদিগের সর্বাগ্রে! আপনি জানিয়া-শুনিয়াও এইমাত্র মোক্ষদার স্কন্ধে নিজের অপরাধটা চাপাইতেছিলেন? তাহাতে আপনাকে বড় ভাল লোক বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, যেদিন আপনি আমার সহিত প্রথম দেখা করেন, সেইদিন আপনার মুখে হত্যাবৃত্তান্ত শুনিবার সময়েই আমি কোন সূত্রে আসল ঘটনাটা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেইজন্যই আপনার দেওয়া পুরস্কারের হাজার টাকা একটি দস্তুরমত লেখাপড়া করিয়া কোন ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় জমা রাখিতে বলি। আপনিও তাহা রাখিয়াছেন। আর আপনিও জানেন, শুধু হাত কখন কাহারও মুখে ওঠে না। সে যাহাই হউক, ইহাতেই আপনার হৃদয়ে একটা মহৎ উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ আপনার ঘোরতর শত্রু হইলেও সে যে নিরপরাধ, তাহা আপনি অন্তরে জানিতেন। আপনার অপরাধে যে তাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাবিয়া আপনার যথেষ্ট অনুতাপ হইতেই এই হাজার টাকা পুরস্কারের সৃষ্টি। এখন দুই-চারটি প্রমাণ দেখাইয়া দিলে, আপনি যে একটা অবিবেচকের হাতে কেসটা দেন নাই, সে সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ থাকিবে না। যেদিন লীলা খুন হয়, সেইদিন রাত দশটার সময়ে বাগানে আপনার সঙ্গে শশিভূষণের খুব একটা রাগারাগি হয়। এবং তাহাকে খুন করিবেন বলিয়া আপনি উচ্চকণ্ঠে শাসাইয়াছিলেন। অবশ্যই আপনার সেই উচ্চকণ্ঠের শাসনগুলি সেই সময়ে শশিভূষণ ছাড়া আরও দুই-একজনের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। ইহার কিছুক্ষণ পরে শশিভূষণ তাহার ছুরি চুরির কথা জানিতে পারে। শশিভূষণকে না বলিয়া সেই ছুরিখানা আপনি লইয়াছিলেন। আপনার এই 'না-বলিয়া ছুরিগ্রহণ' সম্বন্ধে আমি দুই একটা প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছি। সেদিন শশিভূষণের তীক্ষ্ণতর কটূক্তিতে আপনার রক্ত নিরতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আপনি বাড়িতে ফিরিয়াও

নিজেকে কিছুতেই সামলাইতে পারেন নাই ; আপনি শশিভূষণকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুনরায় তাহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন এবং আপনার মাথায় হঠাৎ কি একটা প্ল্যান্ উদ্ভব হওয়ায়, আসিয়াই বৈঠকখানা ঘর হইতে ছুরিখানা 'না-বলিয়া-হস্তগত-করা' নামক পাপে লিপ্ত হইয়া আসেন। তখন একজন পরিচারিকা আপনাকে দেখিয়াছিল। আপনি ভদ্রলোক, সে ছোটলোক—সুতরাং তখন সে আপনার উপরে এরূপ একটা গর্হিত সন্দেহ করিতে পারে নাই। এদিকে যখন এইরূপ দুই-একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আরম্ভ ও সমাপ্ত হইয়া গেল, তখনও শশিভূষণ সেই বৈঠকখানার ছাদে বসিয়া মদ খাইতেছিল। উদ্যানে আপনাদের সেই বাক্‌বিতণ্ডার পরে আপনি যখন চলিয়া গেলেন—কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে শশিভূষণের একটা বড় অস্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত হয় এবং সেই অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিবার জন্য সে আবার বৈঠকখানার ছাদে উঠিয়া মদ্যপান আরম্ভ করিয়া দেয়। মদেই লোকটার মাথা খাইয়া দিয়াছিল। যতটা পারিল; বসিয়া বসিয়া খাইল। তাহার পর বাকিটা বোতলের মুখে ছিপি আঁটিয়া যখন বৈঠকখানা ঘরের আলমারিতে রাখিতে যায়—তখন দেখে আলমারি খোলা রহিয়াছে এবং ছুরিখানা সেখানে নাই। দেখিয়া প্রথমে একটু চিন্তিত হইল। তাহার পর দু-একবার এদিক-ওদিক খুঁজিয়া না পাইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল এবং লীলাকে ছুরির সহসা অদৃশ্য হওয়ার কথা বলিল। ঐ সময়ে তাহার শয়ন-গৃহের পার্শ্বস্থ গলিপথে মোক্ষদা কোন লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। মোক্ষদাকে আমি সে লোকের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলে তাহাকে সে চেনে না, পূর্বে কখনও দেখে নাই। তখন আমি একটা কৌশল করিয়া আপনাকে তাহার সম্মুখে নিয়া যাই ; আপনি তাহার মুখে তখন যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা ভান মাত্র, আমিই তাহাকে এইরূপ একটা অভিনয় দেখাইতে শিখাইয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক, মোক্ষদা আপনাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারে। তখন রহস্যটা অনেক পরিষ্কার হইয়া আসিল। তাহা হলেও কেবল মোক্ষদার কথায়। আমি বিশ্বাস করি নাই—সেটা ডিটেক্‌টিভদিগের স্বধর্মও নহে। আর যাহা হউক, সেই প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী পদচিহ্নগুলি মিলাইয়া দেখিবার একটা সুযোগ সেই সঙ্গে ঠিক করিয়া লই। সেইজন্য আপনাকে আমার বাগানবাড়িতে লইয়া যাই। বাগানবাড়িতে গিয়া হল ঘরে যাইতে সবেমাত্র-বিলাতীমাটি-দেওয়া সোপানে নগ্নপদে অতি সন্তর্পণে উঠিতে হয়। তাহাতে সেই সদ্যমার্জিত বিলাতীমাটিতে আপনার পায়ের যে দাগ পড়ে, আমি সেইগুলির সহিত ছাপে তোলা যাই গলিপথের দাগগুলি মিলাইয়া বুঝিতে পারি—সকলই এক পায়ের চিহ্ন এবং সেই পা মহাশয়েরই।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের হস্তবিমর্ষণ করিতে করিতে অতি উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, "মোক্ষদা বেটি ভারি চালাক, ভারি বুদ্ধিমতী—সাবাস মেয়ে যা হোক—যতদূর ফিচেল হতে হয়। কি জানেন ; যোগেশবাবু, তাহা হইলেও আমি মোক্ষদার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি নাই। আপনাদের সহিত সাক্ষাৎকালে সে যদি আমার কথা আপনাকে বলিয়া দিয়া থাকে যে, আমি আপনাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি ; অথবা আপনি কৌশলে তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইয়া আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া থাকেন, এই আশঙ্কা করিয়া আমি এই লোককে তখন আপনার বাড়ি পর্যন্ত আপনার অনুসরণ করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলাম। আপনি বাড়িতে যান, কি আর কোথাও যান—কি করেন, আপনার মুখের ভাব কি রকম, এই সব লক্ষ্য করিতে

বলিয়া দিয়াছিলাম। যখন আপনি বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, এই লোক তাহার পর আপনার বাড়ির সম্মুখে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিলেন, অপেক্ষা করিয়া যখন আর আপনাকে বাহিরে আসিতে দেখিল না—তখন নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল। তাহার পর আপনার নামে আজ ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া আমার কর্তব্য নিষ্পন্ন করিলাম। বলিতে কি, অনেক খুনের কেস্ আমার হাতে আসিয়াছে, তাহার মধ্যে একটা ছাড়া এমন অদ্ভুত কোনটাই নয়। যাহা হউক, এখন বুঝিলেন, শশিভূষণ নিরপরাধ এবং হত্যাকারী কে?

আর কি বলিবার আছে? হে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান! এ দুর্ভাগার হৃদয়ের কথা তুমি সব জান, প্রভু যাহাকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসিতাম, তাহাকে একজন নৃশংসের হাতে এইরূপ উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয়ে কি বিষের দহন আরম্ভ হইয়াছিল, তুমি সব জান প্রভু! সেদিন যদি আমার সেই ভুল নাই হইত, যদি আমি ঠিক শশিভূষণকে হত্যা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, সুখে মরিতে পারিতাম। লীলাকে একজন নররাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া মনে করিতে পারিতাম, আমার মৃত্যুতে একটা কাজ হইল। মানুষ যাহা মনে করে, তাহার কিছু হয় না। সেই সর্বশক্তিমানের অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র বিশ্ব সমভাবে শাসিত হইতেছে, সেখানে মানুষ আর মানুষের কি বিচার করিবে? তাঁহার এমনই রচনা কৌশল—পাপী নিজের হাতেই স্বকৃত পাপের দণ্ডবিধান করিয়া থাকে। দুগ্ধপোষ্য অপরিস্ফুটবাক্ শিশু ব্যাঘ্র-কবলিত হইলে যেমন সে প্রথমে নিজের বিপদ বুঝিতে পারে না, বরং সেই যতক্ষণ ব্যাঘ্র কর্তৃক কোনরূপের পীড়িত না হয়, ততক্ষণ তাহার উল্লম্ফন, ভীষণোজ্জ্বল চক্ষু এবং দীর্ঘ লাঙ্গুলান্দোলনে বরং সেই শিশুর বিরলদন্ত মুখে, নধর অধরপুট দিয়া কল্লোলিত শুভ্রহাস্যস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। হায়! স্বপ্নাবিষ্ট আমারও তেমনি এই দুঃখ-দারিদ্র্য ভীষণ শোক-তাপপূর্ণ, বিপদ সঙ্কুল কঠিন সংসারের বক্ষ শায়িত হইয়া কোন্ মোহে অবিশ্রাম হাস্য-তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকি! তাহার পর যখন কোন অপ্রতিহত দুর্দান্ত আঘাতে স্বপ্ন ভাঙিয়া যায় এবং মোহ ছুটিয়া যায়, তখন নিরবলম্বন এবং আশা ভরসা শূন্য হইয়া, হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠি।

যোগেশের এই মর্ম্মস্পর্শী আত্মকাহিনী যখন শেষ হইল—তখন চকিতে চাহিয়া দেখি বহির্জগত প্রভাতের কোমল আলোকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে! আমি তাহার কাহিনীতে এমনি মগ্ন এবং তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, এ সব কিছুই জানিতে পারি নাই। আমি তাড়াতাড়ি আর একটি চুরুট ধরাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। এমন সময়ে একজন প্রহরী সশব্দে কারদ্বার উন্মোচন করিয়া ফাঁসির আসামী হতভাগ্য যোগেশচন্দ্রের শেষ আহার্য হস্তে আমাদের সম্মুখীন হইল। তাঁহার একঘণ্টা পরে সকলই ফুরাইল—যোগেশচন্দ্রের নাম এ জগতের জীবিত মনুষ্যের তালিকা হইতে চিরকালের জন্য মুছিয়া গেল। হতভাগ্য ফাঁসি-কাষ্ঠে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। পাঠক! আমি আজ বত্রিশ বৎসর এই জেলখানায় কাজ করিতেছি ; কিন্তু এমন শোচনীয় ব্যাপার আমার আমলে কখনও ঘটে নাই। সেইদিন হইতে যেন নিজের ও নিজের কারাধ্যক্ষ পদটার উপরে আমার একটি বিজাতীয় ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। আশা করি, পতিত-পাবন ঈশ্বর, ভ্রান্ত পতিত যোগেশচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করিবেন।—জনৈক কারাধ্যক্ষ।

আকাশে মৃত্যুর ফাঁদ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর সিক্রেট লাইনে হঠাৎ এক জরুরী গোপন বার্তা এলো।

—বীপ্...বীপ্...বীপ্...বন্ধু রাষ্ট্র 'এক্স'-এর গোয়েন্দা বিভাগ থেকে জানাচ্ছি ভারতীয় বিভাগকে...বীপ্...বীপ্...

—বীপ্...বীপ্...বীপ্...একটু আগেই আমাদের কাছে খবরটা এসেছে—কলকাতা থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার যে বিমানটির আজ ভুবনেশ্বর, বোম্বাই ছুঁয়ে প্যারিস যাবার কথা, যার যাত্রী ভারতের একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, সেটিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জনাকয়েক উগ্রপন্থী এজেন্ট বোম্বাই পৌঁছবার আগেই ছিনতাই করার চেষ্টা করবে......ওরা বিমানটি ধ্বংসও করে দিতে পারে...ওভার...

বার্তা রেকর্ডিং শেষ হলো। তারপরই ভারতের গোয়েন্দা ব্যুরোর দপ্তরে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধের তৎপরতা।

গোয়েন্দা ব্যুরোর প্রধান মিঃ জয়ন্ত রামানুজম তক্ষুণি যোগাযোগ করলেন দমদম এয়ারপোর্ট অথরিটির সঙ্গে, কিন্তু সেখানকার চীফ মিঃ চন্দন সোম জানালেন এয়ার ইণ্ডিয়ার সেই বিশেষ বিমানটি একশজন যাত্রী, তার মধ্যে পার্লামেন্টের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং সাংবাদিককে নিয়ে মিনিট দশেক আগেই দমদম ছেড়ে আকাশে উড়ে গেছে।

শুনে ঠোঁট কামড়ে কয়েক সেকেণ্ড ভাবলেন মিঃ রামানুজম, তারপর বললেন, প্লেন তো একবার ভুবনেশ্বরে নামবে, তাই না!

—হ্যাঁ স্যার, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাবে। দুজন যাত্রী উঠবে সেখান থেকে। তারপর......

—গুড গড! মিঃ রামানুজম, মিঃ সোমের কথা শেষ হবার আগেই বলেন, এক্ষুণি প্লেনের চীফ পাইলটকে নির্দেশ পাঠান, যান্ত্রিক গণ্ডগোলের অজুহাতে প্লেনটিকে যেন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভুবনেশ্বর এয়ার-ফিল্ডেই আটকে রাখা হয়।

॥ দুই ॥

ঝনঝন শব্দে উঠলো রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজের টেবিলে রাখা লাল রঙের টেলিফোন যন্ত্রটা।

এটা মেঘনাদের একটা আলাদা লাইন। এটার নম্বর সাধারণে জানে না। কখনও-সখনও সরকারী দপ্তর থেকে মেঘনাদকে বিশেষ কোনো বার্তা পাঠাবার দরকার হলে এটা বেজে ওঠে।

মেঘনাদ কিন্তু রিসিভার কানে দিয়ে 'হ্যালো' বলে কয়েক সেকেণ্ড ওপক্ষের কথা শুনেই কেমন টানটান হয়ে বসলো। ওর মুখে শুধু একটা কথাই শুনলাম, ইয়েস, মিঃ রামানুজম। আপনি সব ব্যবস্থা তৈরি রাখুন। আমি ঠিক কুড়ি মিনিটের মধ্যে দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাব। বলেই লাইনটা কেটে দিল।

আমি জিজ্ঞেস করতে গেলাম, ব্যাপার কি, হঠাৎ...

মেঘনাদের দু'চোখের দৃষ্টি এ সময়ে অসম্ভব ধারাল হয়ে উঠেছে। ওর এ ভঙ্গি আমার চেনা। আমাকে কথাও বলতে না দিয়ে বললো, ঠিক তিন মিনিট সময় দিচ্ছি অর্ণব, এর মধ্যে তৈরি হয়ে নে।

॥ তিন ॥

ভুবনেশ্বর এয়ার-ফিল্ডে এয়ার ইণ্ডিয়ার নির্দিষ্ট বিমানটি দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানান হয়েছে বিমানটি দমদম থেকে আকাশে ওড়ার পর বিমানে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে। এখন সেটাই সারান হচ্ছে।

এ বিমানের যাত্রীরা কেউই খুব সাধারণ মানের মানুষ নন। বিশেষতঃ বিমানে রয়েছেন কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের একজন প্রভাবশালী নেতা, তাঁর সঙ্গে কিছু সাঙ্গোপাঙ্গো এবং সাংবাদিক। যাত্রাপথে এভাবে বাধা পড়ায় ওঁরা সবাই বেশ অসন্তুষ্ট। তবে এয়ার-

হোস্টেস মিস যমুনা খুবই ধৈর্যের সঙ্গে যাত্রীদের শান্ত রাখার চেষ্টা করছেন।

এরই মধ্যে বিমানের দরজা খুলে উঠে এল দুজন নতুন যাত্রী।

দু'জনেই বয়সে যুবক। একজনের মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। অন্যজনের চোখে চাপা গগল্‌স। একজন মিঃ বিনোদ সাকসেনা, অন্যজন মিঃ অনন্ত রথ। এয়ার-হোস্টেস মিস যমুনা মিষ্টি হেসে দু'জনকেই অভ্যর্থনা জানালেন। আগন্তুকরাও মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জানাল। এই দু'জন যাত্রীরই এখান থেকে বিমানে ওঠার কথা ছিল।

এর পরই বিমানের ককপিট থেকে ঘোষণা শোনা গেল ঃ

এ্যাটেনশান প্লীজ। আমাদের বিমান এক্ষুণি উড়তে শুরু করবে। যাত্রীরা অনুগ্রহ করে সীট-বেল্ট বেঁধে আসনে বসুন। কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতের জন্য বিমানটিকে অনেকটা বাড়তি সময় রাখতে হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত।'

॥ চার ॥

বিমানের ভেতরের দৃশ্য শান্ত। যাত্রীরা যে যার চিন্তায় ব্যস্ত, বিমানের মধ্যেই পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্যটির ইন্টারভু নিচ্ছেন কলকাতার এক প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিক। এয়ার-হোস্টেস মিস যমুনা যাত্রীদের সুখসুবিধা বিধানে খুবই তৎপর।

পেছনের দুটি সীটে পাশাপাশি বসেছিল ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্ট থেকে ওঠা দুই যাত্রী।

হঠাৎ ওরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি বিনোদ সাকসেনা পা বাড়াল প্লেনের টয়লেটের দিকে, আর চাপা গগল্‌স্ পরা অনন্ত রথ এগিয়ে চললো সামনে ককপিটের কাছে।

ব্যাপারটা প্রথমে খেয়াল করেনি। মিস যমুনার নজর পড়লো যখন অনন্ত রথ ককপিটের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

মিস যমুনা পেছন থেকে ডাকেন, মিঃ রথ, প্লীজ ভেতরে ঢুকবেন না। ককপিটের ভেতরে ঢোকাটা বেআইনি...

কিন্তু মিস যমুনার কথা শেষ হবার আগেই অনন্ত রথ একবার দুর্বোধ্য হাসি হেসে পেছনে ফিরে তাকিয়েই ককপিটের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ককপিটের কন্ট্রোল প্যানেলে বসে চীফ পাইলট ক্যাপটেন জেকব চেরিয়ান তখন একমনে বিমানটি চালনা করছেন, একই সঙ্গে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছেন গ্রাউণ্ড কন্ট্রোলের সঙ্গে।

হঠাৎ এ কি হলো!

ক্যাপটেন জেকব চেরিয়ান তাঁর ঘাড়ের কাছে একটা ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ অনুভব করলেন। সেই সঙ্গে একটা হিমশীতল কণ্ঠস্বর, এই প্লেন এখন আমাদের দখলে, এখন থেকে আমি যেমনভাবে বলবো, প্লেনটাকে ঠিক সেইভাবে নিয়ে চলুন।

উঁহু, পিছু ফেরার চেষ্টা করবেন না।

সহকারী পাইলট মিঃ রাজারামও পিছু ফিরতে গিয়ে বাধা পেলেন। আড়চোখে

তাকিয়ে দেখলেন দুহাতে দুটো রিভালবার তাক করে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। এর মধ্যে ডান হাতের রিভলবারটা ক্যাপটেন চেরিয়ানের ঘাড়ের পেছনে ঠেকান আর বাঁ হাতটা ফেরান রয়েছে রাজারামের দিকে।

ওদিকে বিমানের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে নাটকের দৃশ্য।

বিনোদ সাকসেনা নামে যুবকটি কখন যে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসেছে কেউ লক্ষ্য করেনি। বিমানের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাঁধে একটা ঝোলা, আর এক হাতে একটা ধাতব যন্ত্র। যুবকটি চিৎকার করে বললো, আপনারা যে যেখানে যেভাবে আছেন, সেইভাবে বসে থাকুন। আমার সঙ্গের এই ব্যাগ দেখছেন। এর মধ্যে বিস্ফোরক আছে। আর আমার হাতে রয়েছে অপারেটিং সুইচ। আমরা দেশের এক জঙ্গী গোষ্ঠীর আত্মঘাতী দলের সদস্য। কেউ কোনো চালাকির চেষ্টা করলেই আমি এই ফিউসান সুইচ পুশ করবো। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটবে। সমস্ত বিমানটা উড়ে যাবে। মনে রাখবেন এখন এই বিমান আমাদের দখলে। আমরা এই প্লেন হাইজ্যাক করেছি।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা, তারপরই এক অস্পষ্ট ভীত গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত বিমানটির মধ্যে। অকস্মাৎ এমন ঘটনা ঘটবে কেউ ভাবতেই পারেনি।

—তোমরা কি চাও? বিমানের আরোহী একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলো।

—এই দেশের সরকারের কাছে আমাদের কয়েকটি দাবি আছে। আমরা ঠিক সময় আমাদের দাবি পেশ করবো। সরকার মেনে নিলে সবাই ছাড়া পাবেন। নইলে সবাই একসঙ্গে মরবো। হাইজ্যাকের হাতের বিস্ফোরক ফিউজে হাত রেখে বললো।

মাঝখানের সীটে বসে ভ্যাক করে কেঁদে ফেললেন এক ভদ্রমহিলা।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এক ধমকে থামিয়ে দিল হাইজ্যাকার বিনোদ সাকসেনা। নিষ্ঠুর শীতল কণ্ঠস্বরে বললো, ফালতু কান্নাকাটি আমার একদম পছন্দ নয়।

এর পর আর কেউ টুঁ শব্দটি করার সাহস পেল না। শিশুরাও কেমন হতচকিত হয়ে পড়েছে! সবাই বুঝলো দুই দস্যু এই বিমানকে পুরোপুরি হাইজ্যাক করে নিয়ে চলেছে।

ওদিকে বিমান তখন নির্দিষ্ট পথের অনেক বাইরে সরে গেছে। ছিনতাইকারী রথ বিমানটিকে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত শহর যোধপুরের দিকে চালনা করতে হুমকি দিয়েছে। ছিনতাইকারীদের মতলব বিমানটিকে যোধপুর বিমানক্ষেত্রে নামিয়ে সরকারের সঙ্গে দর কষাকষি করা।

বিমান এখন যোধপুর বিমানবন্দরের মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। আর হাইজ্যাকের নির্দেশ মেনে চীফ পাইলট ক্যাপটেন জেকব চেরিয়ান যোধপুর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগও করেছেন।

অনুমতি পাওয়ার পর বিমানটি যোধপুর বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করলো। বিমানবন্দরের ঘড়িতে তখন দুপুর ঠিক তিনটে।

ক্যাপটেন চেরিয়ানকে রথ হুকুম দিল, আমাদের দাবিগুলো জানিয়ে দিন। দু ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে এ দেশে আমাদের নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিতে হবে এবং পঞ্চাশ কোটি ডলার ক্যাশ আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে, তারপর আমাদের ইচ্ছেমতো জায়গায় প্লেনটাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের নামিয়ে

দিতে হবে। আমাদের এইসব দাবি যদি পূরণ না হয় তবে দুঘণ্টা বাদে এ বিমান আমরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেব। সবাই একসঙ্গে মরবো।

ভয়ঙ্কর সব শর্ত। তবু চীফ পাইলট চেরিয়ানকে বেতার মারফৎ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিমানদস্যুদের দাবির কথা জানাতেই হলো।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই যোধপুর বিমানবন্দরের 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের সদস্যরা সমবেত হলো বিমানবন্দরের এমারজেন্সি অপারেশন রুমে। ইতিমধ্যেই ওখানে উড়ে এসেছেন ভারতীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর প্রধান মিঃ রামানুজম। ছিনতাইকারীদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবার দায়িত্বটা ওর ওপরই ন্যস্ত করা হলো।

মিঃ রামানুজম ছাড়াও এখানে হাজির হয়েছে এসব ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভারতীয় কমাণ্ডোবাহিনীর কয়েকজন।

এইভাবেই সময় কেটে চলেছে—সেকেণ্ড...মিনিট...ঘণ্টা...

হাইজ্যাকারদের কথামতো দুঘণ্টা অতিক্রান্ত হতে আর দেরি নেই। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে সমস্যার কোনো সমাধানই বেরুলোনা।

ঠিক এমনই সময়ে—

মিস যমুনা একটা ছোট্ট কাগজের চিরকুট এনে দিল বিনোদ সাকসেনার কাছে। চিরকুটটা পাঠিয়েছে তৃতীয় সারির সীটে বসে থাকা এক ব্যক্তি।

বিনোদ সাকসেনা খুব সাবধানে বাঁ হাতে চিরকুটটা তুলে নিল। তাতে শুধু একটা কথাই ইংরাজিতে লেখা ঃ

'জরুরী গোপন কথা বলতে চাই। আমাদের দু'পক্ষের একই স্বার্থ।'

চিরকুটের লেখাটা পড়ে প্রেরকের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল বিমানদস্যু বিনোদ সাকসেনা।

এর মানে কি? ফাঁদে ফেলার কোনো কায়দা নয় তো?

॥ পাঁচ ॥

বিমানদস্যু বিনোদ সাকসেনা বেশ কিছুক্ষণ সময় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে চিরকুটপ্রেরকের দিকে।

বিমানের তৃতীয় সারিতে বসা লোকটার চওড়া টাইপের চেহারা। চোখ দুটো ভেতরে ঢোকা। চুল উস্কোখুস্কো। পুরু ঠোঁটে ঝুলে রয়েছে এক রহস্যময় চাপা হাসি।

বিনোদ তার বিস্ফোরকের স্যুইচে বাঁ হাতটা রেখে ডান হাতে পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে, তারপর লোকটাকে ইঙ্গিতে ডাকে।

লোকটা এবার সীট ছেড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। বিনোদ সাকসেনা অবাক হয়ে দেখলো লোকটার একটা পা কাঠের। এমন লোক তার কাছে কি চাইতে পারে?

তবু সতর্কভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো বিনোদ সাকসেনা।

লোকটা একটা পা টেনে টেনে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর অকস্মাৎ তার

pathagar.net

কাঠের পায়ের ফোকর থেকে একটা ছোট্ট স্বয়ংক্রিয় সাব মেশিনগান বার করে হাতে তুলে নিল।

বিমানদস্যু সাকসেনা চমকে উঠলো, তারপর হাতের রিভলবারের ট্রিগারে হাত ছুঁয়ে চিৎকার করে উঠলো, হুঁশিয়ার!

খোঁড়া লোকটাকে কিন্তু এতটুকু বিচলিত মনে হলো না। অস্ত্র হাতে নিয়েই সে একটা বিচিত্র হাসি হাসলো, তারপর বললো, আমার নাম শেখ আবদুল। আমরা দুপক্ষ একসঙ্গে কাজ করতে চাই।

—তার মানে? লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করলো বিনোদ সাকসেনা।

—মানেটা আমার কাছেও ঠিক পরিষ্কার নয়। শেখ আবদুল বললো, এ প্লেন আমাদের হাইজ্যাক করার কথা ছিল। কিন্তু তোমরা হঠাৎ এসে সব গোলমাল করে দিলে।

—অদ্ভুত ব্যাপার! এখন তাহলে কি করতে চাও?

—আমরা কাজটা একসঙ্গে করতে পারি। শেখ আবদুল বললো।

কি ভাবে? রিভালবারের নলটা স্থির রেখে বিনোদের প্রশ্ন।

—খুব সহজে। তোমাদের দাবির সঙ্গে আমাদের দুটো দাবি যোগ করে দাও। ব্যস্।

—কিন্তু তোমরা যে চালাকি করছ না তার গ্যারাণ্টি কি?

—গ্যারাণ্টি আমার হাতের এই অস্ত্র। বলে অদ্ভুতভাবে হাসলো শেখ আবদুল।

—হুঁ! কয়েক সেকেণ্ড তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো প্রথম কক্ষের হাইজ্যাকার, তারপর বললো, কোন গ্রুপ, কি তোমাদের দাবি?

—আমরা কোন গ্রুপ তা তোমার জানার দরকার নেই দোস্ত, শুধু এইটুকু জানলেই চলবে আমাদের দেশের সিক্রেট গোয়েন্দা সংস্থার অন্তত দশজন উচ্চপদস্থ এজেন্টকে এ দেশের সরকার এখানকার বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করে রেখেছে। আমরা সেই দশজন এজেন্টের মুক্তি চাই। তারা তাদের ইচ্ছেমতো জায়গায় চলে যাবে।

শুনতে শুনতে এবার হা-হা-করে হেসে উঠল বিনোদ সাকসেনা, তারপর বললো, তা বিমানটি কি তুমি একাই হাইজ্যাক করবে ঠিক করেছিলে?

আমায় তেমনি উজবুক মনে হচ্ছে নাকি? বলেই দুবার তুড়ি বাজাল শেখ আবদুল।

সঙ্গে সঙ্গে বিমানের যাত্রীদের মধ্যে থেকে দুজন যুবক উঠে এল।

আবদুল তার কাঠের পায়ের বিচিত্র ফোকর থেকে আরও দুটো অস্ত্র বার করে ওদের হাতে তুলে দিয়ে বললো, এরা আমার শাগরেদ হামিদ আর কাল্লু।

ওরা যখন কথা বলছিল, প্লেনের অন্য যাত্রীরা ভ্যাবাচাকা খাওয়া অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছিল একই বিমানে দু'দল হাইজ্যাকারের মিলিত হওয়ার দৃশ্য। বিমান ছিনতাই-এর ইতিহাসে এমন নজির বোধহয় আগে কখনও দেখা যায়নি।

এবার দ্বিতীয় দলের নেতা শেখ আবদুল বিমানযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে হুমকি দিল, কেউ কোনোরকম ঝামেলা করার চেষ্টা করলে গুলি করে মারবো। এ দেশের সরকার আমাদের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তোমরা সবাই আমাদের বন্দী।

শেখ আবদুল এবার তার দুই সঙ্গী হামিদ আর কাল্লুর দিকে তাকিয়ে কঠোর কণ্ঠে বললো, এ্যাই, তোরা এখানে গার্ড থাক, বেচাল দেখলেই খতম করে দিবি।

—ইয়েস, বস্। হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ওরা পাহারায় রইলো।

দু-দলের দুই হাইজ্যাকার একসঙ্গে ককপিটের ভেতরে ঢুকলো।

॥ ছয় ॥

ককপিটের মধ্যে শেষ আবদুল আর বিনোদ সাকসেনা যখন গিয়ে দাঁড়ালো, তখন সেখানকার আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

দু'পক্ষের মধ্যে চলেছে হরদম দর কষাকষি। অনন্ত রথ বিমানদস্যুদের পক্ষ থেকে দাবি জানাচ্ছে, অপর দিকে যোধপুর ওয়ারপোর্ট এমারজেন্সি অপারেশন রুমে বসে সরকারের পক্ষ থেকে দর কষাকষি করছেন মিঃ জয়ন্ত রামানুজম।

ইতিমধ্যে দিনের আলো কমে আসতে শুরু করেছে। শীতের বেলা ছোট, অন্ধকার নামতে দেরি হয় না।

এই অবস্থার মধ্যে ককপিটে পা দিল হাইজ্যাকারদের দ্বিতীয় পক্ষ।

দ্বিতীয় দলের নেতা আবদুল জানালো, আগের তিন শর্তের সঙ্গে তার নতুন একটা দাবি মানতে হবে।

তার সে দাবি হলো, ভারতের এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা এজেন্সির যে দশজন এজেন্টকে এ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আটক করা হয়েছে তাদের সবাইকে একসঙ্গে মুক্তি দিতে হবে। তারপর তাদের ইচ্ছামতো জায়গায় চলে যেতে দিতে হবে।

বেতার মারফৎ কর্কশ কণ্ঠে আবদুল বললো, এ শর্ত যদি না মানা হয় তবে আগের শর্ত মানলেও কেউ রক্ষা পাবে না। আরও দুঘণ্টা সময় দেওয়া হলো। এর মধ্যে দাবি পুরণ না হলে, সময় শেষ হবার পর থেকে এক একজন করে যাত্রীকে গুলি করে বিমানের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। তবে সবার আগে খুন করা হবে এ দেশের পার্লামেন্টের যে অতি সম্মানিত ব্যক্তিটি বিমানে আছে তাকে।

ভয়ঙ্কর হুমকি। কিন্তু এতটুকু বিচলিত মনে হলো না মিঃ জয়ন্ত রামানুজমকে। খুবই ধীরস্থিরভাবে এই ভয়ঙ্কর বিমানদস্যুর সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

এক ঘণ্টা এইভাবেই কেটে গেল। দুপক্ষের ওপরই দারুণ স্নায়ুর চাপ।

সরকারের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্বটা তখন পুরোপুরিই চলে গেছে দ্বিতীয় হাইজ্যাকারদের নেতা শেখ আবদুলের ওপর।

কিন্তু মনে হচ্ছে সে ক্রমেই ধৈর্য হারাতে শুরু করেছে। ক্ষণে ক্ষণেই চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে উঠছে।

অন্য দুই বিমানদস্যু পাথরের মূর্তির মতো শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে শেখ আবদুলের দুপাশে। দেখে মনে হয় ওরা ওদের নেতৃত্বের রাশ তুলে দিয়েছে দ্বিতীয় দলের হাতেই।

অপরপক্ষে মিঃ রামানুজমের এতটুকু স্নায়ুদৌর্বল্য এযাবৎ টের পাওয়া যায়নি। তিনি কথা বলছেন ধীরে ধীরে। মেপে মেপে।

ওদিকে—

এসবের বাইরে চলেছে আর এক অপারেশনের প্রস্তুতি।

কিছুক্ষণ আগেই উগ্রপন্থী মোকাবিলায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন কমাণ্ডো সতর্ক পদক্ষেপে বিমানটির পেটের নিচে গিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের পরনে বিশেষ বুলেট প্রুফ জ্যাকেট। কেবলমাত্র চোখ ছাড়া সারা শরীর ঢাকা। প্রত্যেকের হাতে সাব-মেশিনগান। ওদের ওপর নির্দেশ আছে, ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র ওরা বিমানের ভেতরে ঝটতি ঢুকে পড়বে।

এদিকে অন্ধকার গাঢ় হতে শুরু করেছে। ওরা একসময় সুকৌশলে বিমানের গায়ে মজবুত হালকা মই লাগিয়ে তাতে একে একে পা রেখে দাঁড়ায়।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল।

আর তারপরই চিৎকার করে উঠলো আবদুল, ব্যস। অনেক আলোচনা হয়েছে। আর কোনো দর কষাকষি নয়। বলতে বলতে সঙ্গী দস্যু বিনোদ সাকসেনার দিকে তাকায়, তুমি কি বল? এদের সঙ্গে আর কথা বলে কোনো লাভ আছে?

—ঠিক বলেছ দোস্ত। সাকসেনা তাকে সমর্থন করে, আমাদের দেওয়া সময় কেটে গেছে। আলোচনার কোনো ফল হয়নি। এবার আমরা আমাদের পথ বেছে নেব।

বিমানদস্যুরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, কন্ট্রোলে বসে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল।

অনন্ত রথ বললো, এর পর এ বিমান ধ্বংস হয়ে গেলে আমরা কেউ দায়ী থাকবো না।

বিনোদ সাকসেনা তার বিস্ফোরকভর্তি ব্যাগে হাত দিয়ে বললো, মারবো এবং মরবো, এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই তো আমরা এসেছি। আর আমরা মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেব আমাদের দাবি পূরণের জন্য।

—ঠিক বলেছ দোস্ত। এরপর তুমি তোমার ফিউসান স্যুইচে চাপ দেবে। বিস্ফোরণে উড়ে যাবে সমস্ত বিমানটা...বলতে বলতে শেখ আবদুলের কণ্ঠস্বরও কাঁপতে লাগলো।

—শোন...শোন আবদুল...আমরা আরও আলোচনা করতে চাই, বেতার মারফৎ মিঃ রামানুজমের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—নেহি নেহি...আভি কাউণ্ট ডাউন শুরু হো গিয়া। এখন শুধু একটাই কথা বলার আছে তোমাদের—আমাদের সব দাবি মানতে তোমরা রাজী কিনা?

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিন মিনিট কেটে গেল।

—আর মাত্র দু মিনিট। বিনোদ সাকসেনা হুমকি দিল।

ওদিকে বিমানের বাইরে লাগানো মইয়ের ধাপিতে পা রেখে অন্ধকারে মিশে থাকা কমাণ্ডোরা তাঁদের অধিনায়কের নির্দেশ পেল—অ্যাকশান।

সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল।

বিমানের পেছনের দরজাটা এক ঝটকায় খুলে উগ্রপন্থী মোকাবিলায় বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত কমাণ্ডো দলটি ঢুকে পড়লো বিমানের ভেতরে।

ট্যা... রা... রা... ট্... রা... রা...ট......!

কমাণ্ডোদের সাব-মেশিনগান থেকে ছুটে আসা উড়ন্ত গুলি নিপুণ কায়দায় অব্যর্থ

লক্ষ্যে দুই বিমানদস্যুর হাত থেকে ফেলে দিল তাদের অস্ত্রগুলো। তারপর এক লাফে পেছন থেকে এসে ওদের চেপে ধরলো ওরা। ওরা নির্দেশ পেয়েছে বিমানদস্যুদের প্রাণে না মেরে গ্রেফতার করতে হবে, কারণ ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ এদের কাছ থেকেই জানতে পারবে অনেক জরুরী তথ্য।

কিন্তু বিমানদস্যুদের চেপে ধরলেও তাদের কণ্ঠস্বর তো রোধ করা গেল না। ওরা পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগলো, বস্, ওরা ঢুকে পড়েছে। আমাদের ধরে ফেলেছে।

ককপিটের মধ্যে গুলি আর চিৎকারের শব্দ ঠিকই পৌঁছেছে।

দ্বিতীয় হাইজ্যাকার দলের সর্দার শেখ আবদুলের এবার পাগলের মতো অবস্থা। ক্রোধ আর উত্তেজনায় তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, এত সাহস তোমরা পেলে কি করে? কিন্তু এত সহজে আমাদের কব্জা করা যাবে না। বলতে বলতেই শেখ আবদুল তাঁর হাতের রিভলবারের নলটা চেপে ধরলো বিমানের চীফ পাইলট জেকব চেরিয়ানের মাথার পেছনে। এরপর সে প্রথম হাইজ্যাকার দলের বিনোদ সাকসেনার দিকে তাকিয়ে বললো, দোস্ত, আমি দশ গুনছি। এর মধ্যে যদি আক্রমণকারীরা আমার দুজন সঙ্গীকে ছেড়ে বিমান থেকে না নেমে যায়, তুমি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এ বিমান উড়িয়ে দেবে। আমরা সবাই একসঙ্গে মরবো।

চরম সংকট ঘনীভূত, রীতিমতো শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি।

আবদুল মুহূর্তে গুনতে শুরু করে—

এক... দুই... তিন... পাঁচ... সাত... নয়...

না, দশ পর্যন্ত আর গোনা হলো না। তার আগেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটে গেল—

দ্বিতীয় হাইজ্যাকার দলের সর্দার শেখ আবদুলের মাথার খুলিতে রিভলবার ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে অন্য দলের বিমানদস্যু বিনোদ সাকসেনা। শুধু কি তাই, তার সঙ্গী অনন্ত রথ এক চকিত ঘুঁষি আবদুলের হাতের রিভলবারটি ছিটকে ফেলে দেয়। তারপর আবদুল কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিনোদ সাকসেনার ক্যারাটের এক মোক্ষম প্যাঁচ তাকে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলে।

—বিনোদ সাকসেনা! বেইমান! ওই অবস্থার মধ্যেও জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে গর্জায় বিমানদস্যু শেখ আবদুল।

—উঁহু, আর ও নাম নয়। ওটা আজকের এই বিমান-ছিনতাই নাটকে আমার অভিনীত চরিত্রটির নাম মাত্র। বিনোদ সাকসেনা তার মুখের ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটা টেনে খুলতে খুলতে বলে, আমার আসল নাম মেঘনাদ ভরদ্বাজ। এক নিপাট বাঙালী রহস্যভেদী। আর আমার এই সঙ্গীটিও কোনো বিমানদস্যু নয়। আমারই বন্ধু এবং সহকারী অর্ণব সেন। ওর অভিনয়টাও ভালই উতরে গেছে, কি বলো দোস্ত?

শুনতে শুনতে শেখ আবদুল এখন দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠলো তা বোঝার সাধ্য কারুর নেই।

ওদিকে বেচারযন্ত্র মারফৎ কন্ট্রোল রুম থেকে বিমানদস্যুদের ঐ নাটকের সবটুকুই শুনতে পাচ্ছিলেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।

বেতারযন্ত্রে এবার গমগম করে বেজে উঠলো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা। অধিকর্তা মিঃ জয়ন্ত রামানুজমের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর, ওয়েল ডান মিঃ মেঘনাদ ভরদ্বাজ এণ্ড মিঃ অর্ণব সেন। আপনাদের অপারেশন সাকসেসফুল। দেশের জন্য আপনারা আজ যা করলেন তার তুলনা নেই। আপনাদের সাহস আর বুদ্ধির জন্য দেশ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেল।

আমি অর্ণব সেন বলছি

সারাদিন বিমান ছিনতাই-এর যে নাটকটা হয়ে গেল, তার আসল ব্যাপারটা আশা করি বোঝা গেছে।

তবু দু-চার কথায় বলে নিই।

ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরো যখন এয়ার ইণ্ডিয়ার বিশেষ বিমানটিতে বিদেশী রাষ্ট্রের হাইজ্যাকারদের অস্তিত্বের কথা জানলো তখন বিমান আকাশে উড়তে শুরু করেছে। এ অবস্থায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সামনে তিনটে পথ খোলা ছিল—হয় প্লেনটিকে তক্ষুণি ফিরিয়ে এনে যাত্রা বাতিল করা, ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্টে নামিয়ে যাত্রীদের তল্লাশি নেওয়া অথবা মাঝপথে বিমানের মধ্যে নিজস্ব লোক ঢুকিয়ে নতুন রকম কোন অপারেশন চালান।

এক্ষেত্রে মিঃ জয়ন্ত রামানুজম তৃতীয় পথটাই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, প্লেন থামিয়ে তল্লাশি চালাবার উপক্রম করলেই যাত্রী সেজে লুকিয়ে থাকা বিমানদস্যুরা মরিয়া আক্রমণ চালিয়ে বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

তৃতীয় পথটাই কার্যকরী মনে হয়েছিল মিঃ রামানুজমের। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর তরফ থেকে মেঘনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে মেঘনাদই পরিকল্পনাটা বাতলেছিল। পরিকল্পনাটা কি ছিল তা তো দেখা গেল। মোদ্দা কথা, আসল বিমানদস্যুরা বিমানটাকে ছিনতাই করার আগে আমরাই ওটা ছিনতাই-এর নাটক করে বিমানদস্যুদের খুঁজে বার করলাম। তারপর যথাসময়ে তাদের ফাঁদে ফেলে জীবিত অবস্থায় গ্রেফতার করলাম। অর্থাৎ সেদিন বিদেশী রাষ্ট্রের এজেন্টরা ভারতের আকাশে যে মৃত্যুর ফাঁদ রচনা করেছিল, সেই ফাঁদে তাদেরই ধরা পড়তে হলো। মেঘনাদের কথা আলাদা, কিন্তু, এ নাটকে আমিও যে শেষ অবধি এত ভাল অভিনয় করতে পারবো তা ভাবতে পারিনি।

ঝারোয়ার জঙ্গলে

মহাশ্বেতা দেবী

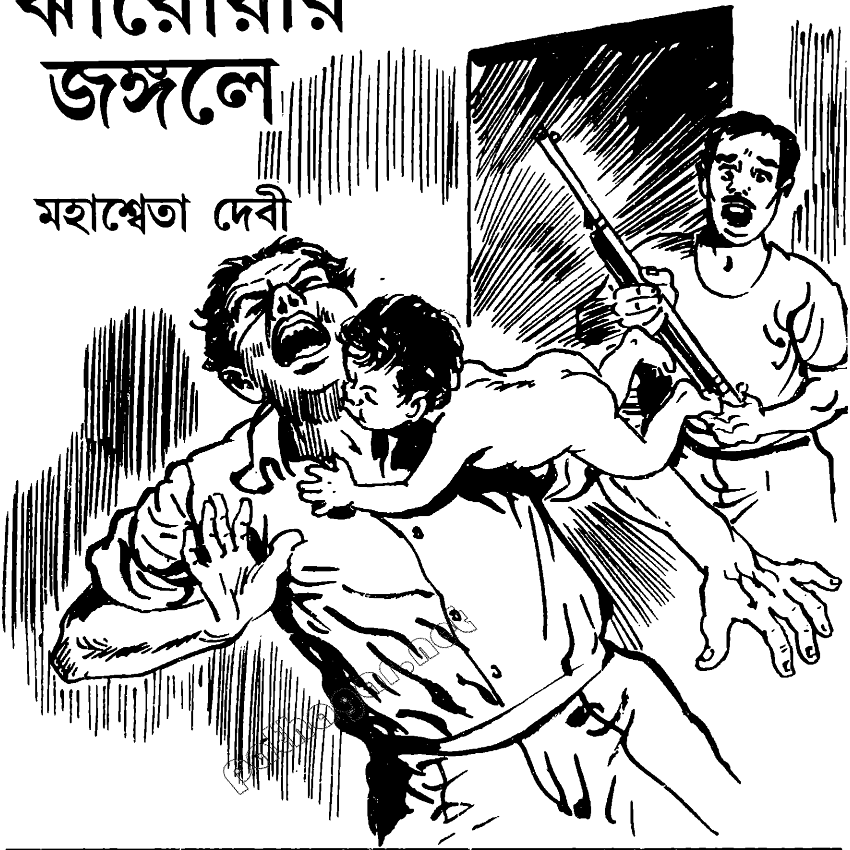

মইনু, সোনাম আর তাতা এখনো জানে না ওদের সেই ঝারোয়া জঙ্গলের অভিজ্ঞতাটা সত্যি, না মিথ্যে না স্বপ্ন। অথচ এ কথাও সত্যি যে ওরা চারজন ঢুকেছিল জঙ্গলে। বাদল আর কোনদিনই ফেরেনি।

বাদলের জেদেই ঝারোয়া যায় ওরা। নইলে ঝারোয়ার নাম ওরা শোনেই নি কোনোদিন। বাদলের কাকা পালামৌয়ের এক জঙ্গলে কাঠ কাটবার ঠিকাদার। এ বছর মার্চ মাসে বাদল ওঁর সঙ্গে কাজে লাগবে। স্কুল থেকেই চারজন বেজায় বন্ধু। মইনু আর তাতা সবে ব্যাঙ্কে ঢুকেছে। সোনাম ওর বাবার খবরের কাগজের আপিসে ঢুকবে এবার।

বাদলই বরাবর বেজায় ছটফটে আর খেয়ালী। স্বাস্থ্যটা ওর রীতিমত ভালো। দেখলে বাঙালী ছেলে মনে হয় না। বাদলের উৎসাহে ওরা সাইকেলে ভারতবর্ষ ঘুরেছে। হিমালয়ে উঠেছে কয়েকবার।

বাদলের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। কি সে ক্ষমতা, কয়েকটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে।

"তরুণ দল" ক্লাবের সঙ্গে সেবার ওরা গঙ্গোত্রীর কাছে এক গ্লেসিয়ারের গতিপথ দেখতে গিয়েছিল। যেখানে বেস্‌ক্যাম্প করার কথা, বাদল বলল, এখানে নয়। এখানে ভীষণ দুর্ঘটনা হবে।

দলের নেতা মোহনবাবু চলে গেলেন। তিনি একজন পাকা পর্বতারোহী। সঙ্গে আছে তিনজন অভিজ্ঞ শেরপা। তাঁরা বুঝছেন না, বাদল বেশি বুঝছে?

বাদল বলতে গেলে তাঁকে অমান্য করেই বন্ধুদের নিয়ে ফিরে গেল তাঁবুতে। আর সেই রাতে চাঁদের আলোয় যখন ধুয়ে দিচ্ছে বরফের আঙিনা, অপ্রত্যাশিত বরফের ধস্ নেমে মোহনবাবুদের বেস্‌ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন করে দিল।

ঠিক এমনি ঘটে আগ্রায় তাজমহল দেখতে গিয়ে। হঠাৎ বাদল বলল, এক্ষুণি চল্ এখান থেকে। কিছু একটা ঘটবে। থাকলে জড়িয়ে পড়ব।

ওদের খুব কাছে বসে নিথর হয়ে তাজমহল দেখছিল একটি যুবক। তার মত নিবিষ্ট হয়ে তাজমহল সেদিন আর কেউ দেখেনি।

ওরা তো চলে এল। তার আধঘণ্টা বাদেই না কি দুজন লোক এসে যুবকটিকে লক্ষ্য করে দুমদাম গুলি ছোঁড়ে। যুবকটিও প্রস্তুত ছিল। দু পক্ষের সে লড়াইয়ে যুবকটি মরল। কয়েকজন ভ্রমণার্থী জখম হল।

বাদল আগে থেকে অশুভ কিছুর আঁচ পেত। মইনু, সোনাম আর তাতা তো তা স্বচক্ষে দেখেছে। ঝারোয়াতে গিয়ে কি হল?

সব যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়।

মার্চে কাজে লাগবে বাদল। খুব উত্তেজিত। জঙ্গলে ঘুরবে, কত রকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে। বাদলই বলল, তোরাও চল্, কয়েকদিন থেকে চলে আয়।

শিকার করা যাবে?

যাঃ, শিকার করা বারণ। পাখি টাখি মারতে পারবি।

আর এক আধটা হরিণ—

থাকব কোথায়?

কাকার বাংলোতে। কাকা বিয়ে করল না ঃ সারা জীবন কাটাল জঙ্গলে জঙ্গলে। এক সময়ে বর্মায় হাতি ধরত। চল্ না, গল্প করবে জমিয়ে।

বাদলের কাকা থাকার জন্যে জায়গা বেছেছেন বটে। ট্রেন থেকে নামো কোমাণ্ডি নামে একটা জঙ্গল স্টেশনে। তারপর কাকার জীপে চল্লিশ মাইল ভিতরে চলো। সুমা নামের একটা জায়গা। সুমা নদী পাথরে পাথরে নেচে বয়ে গেছে এঁকেবেঁকে। কাকার বাংলোর চারদিকে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া।

এক সময়ে এখানে বক্সাইটের খনির কাজ শুরু হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর কাজও হয়। তারপর খনির কাজ কেন যেন বন্ধ হয়ে যায়। খনির কাজের জন্যে তৈরি রাস্তাগুলো এখনো আছে। সেই পথেই কাঠবাহী ট্রাক চলে যায় ডালটনগঞ্জ।

দেখা গেল কাকা সংক্ষেপে জবাব দেন।

কাঁটা তারের বেড়া দিয়েছ কাকা?

হাতি আসে।

pathagar.net

বেড়া উপড়ে ফেলতে পারে না?

পারে, ফেলে না। প্রখর বুদ্ধি রাখে।

মার্চ মাসেই বিকেল নাগাদ বেশ ঠাণ্ডা, সন্ধ্যে থেকে শীত শীত।

বনতিতিরের রোস্ট আর চাপাটি খাওয়া হল। কফি খেয়ে কাকার মেজাজ যেন একটু খুশি হল।

তোরা তো এলি, কিন্তু সময়টা ভাল যাচ্ছে না। ভালো জঙ্গলটাতেই কাজকর্ম বন্ধ, কি যে হবে।

কেন? কাজকর্ম বন্ধ কেন?

কি যে বলি, নিজেই বুঝছি না।

বল না, বল না।

ওই পাহাড়টার ওপ্যারে ঝারোয়ার জঙ্গল। কখনো হাত পড়ে নি, ভালো ভালো শালগাছ অঢেল।

কাকা কাহিনীটা বললেন, জঙ্গলটা জমা নেয় এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। নেয় খুব অদ্ভুত কারণে। নির্জনে থাকবে বলে নেয়।

একটা বাড়ি বানায়। বউ নিয়ে আসে। জানা যায় ওদের একটি বাচ্চাও জন্মায়। সপ্তাহে সপ্তাহে ধীলন হাটে আসত সওদা করতে।

হঠাৎ পর পর কয়েক সপ্তাহ তার দেখা নেই।

অবশেষে এক অবিশ্বাস্য খবর আসে কাকার কাছে। ধীলনের জীপ গাড়িটা রাস্তায় পড়ে আছে। আর ধীলনের মৃতদেহ পড়ে আছে তার বাড়িতে। বউ আর বাচ্চা উধাও।

কাকা তো গেলেন। তিনি দেখলেন ধীলন তার বারান্দায় পড়ে আছে। তার মুখে চোখে অবিশ্বাস্য আতঙ্কের ছাপ। ঘরের মধ্যে পড়ে আছে বিশাল গ্রেট ডেন কুকুরটা। ধীলন বা কুকুর, দুটো মৃতদেহেই এক ফোঁটাও রক্ত নেই। ধীলন কাগজের মত সাদা।

বউ বা বাচ্চার কোন খোঁজ নেই।

খোলামেলা বাড়িতে মৃতদেহ পড়ে আছে। হায়েনা বা শিয়াল টানাটানি করেনি।

কাকার জঙ্গলকুলিরা বলল, এ কোনো পিশাচদানোর কাণ্ড।

আর তাদের কাছেই কাকা জানতে পারলেন। ধীলন বিয়ে করেছিল একটি মেয়েকে, যার কোনো কুলুজিকুষ্ঠি সে জানত না। জঙ্গলের মধ্যে একা একা মেয়েটিকে ঘুরতে দেখে সে নিয়ে আসে ও বিয়ে করে। গজাড় জঙ্গলে একা একা কি কোনো মানুষের মেয়ে ঘোরে?

কাকা সে কথায় কান দেন নি একেবারে। জঙ্গলে কাজ করতে হলে অত ভিতু হলে চলে না। আর এ কথা তিনি জানেন যে কুলিদের বেজায় বিশ্বাস ভুতপ্রেত, দেওপিশাচে। তিনি ধীলনকে দাহ করান, কুকুরটিকে কবর দেওয়ান। বাড়িটা বন্ধ করে চলে আসেন জীপটা নিয়ে।

তারপর জঙ্গল আপিসের সহায়তায় ধীলনের কে আছে, না আছে খোঁজ নেন। অবশেষে রাঁচি থেকে এল ভার্মা নামে একটি ছেলে। ধীলন তার মামা। ভার্মা বলল, আমি ওখানে বাস করব না। বাড়িতে যা আছে তা জীপে চাপিয়ে নিয়ে রাঁচি চলে যাব।

ভার্মার সঙ্গে তার এক বন্ধুও এসেছিল। কোনো জঙ্গলকুলি ওদের সঙ্গে গেল না। তারা সাফ বলে দিল। জানোয়ারের ভয় করি না। যেখানে জানোয়ার অব্দি ঢোকে না, সেখানে কে যাবে?

কাকা তাঁর হেড কুলিকে ধমকালেন। হেড কুলির নাম দাসাইন ওরাওঁ। সে বলল, বাবু! আমরা তো যাবই না। ওই বাবুও যেন না যায়।

ভার্মা সে সব কথা উড়িয়ে দিল। ভার্মার কাছেই কাকা ওই জঙ্গলটা ইজারা নিলেন। আদিম অরণ্য, বড় বড় শাল গাছ, প্রত্যেকটা গাছ খুব দামে বিকোবে। ভার্মা যাবার দিন হাটেও দেখা হল। ভার্মা বলল, কাল সকালে একবার আসবেন। একটু চা বানিয়ে আনলে তো কথাই নেই।

সেই শেষ দেখা। পরদিন সকালে থার্মস্ ভর্তি চা নিয়ে ঝারোয়ার জঙ্গলে হাজির হয়ে কাকা দেখেন ভার্মা এবং তার বন্ধু ঘরের মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে। দুজনেই মৃত, দুজনের চোখ অবিশ্বাস্য আতঙ্কে বিস্ফারিত দুজনের শরীরই রক্তশূন্য।

ছেলেরা বলল, তারপর?

দুজনের গলাতেই ছোট ছোট পাংচারের দাগ ছিল।

তার মানে কি?

জানি না। পুলিশ এখনো খোঁজ চালাচ্ছে। কিন্তু কোনো কিনারা হয়নি। শুধু ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। কেউ যাচ্ছে না ওখানে গাছ কাটতে।

পুলিস যাচ্ছে না?

কয়েকবার গেছে। সেও এক রহস্য।

কি রকম?

বাড়িটা পুলিস বন্ধ করে তালা মেরে আসছে। পরে গিয়ে বাড়ি খোলা পাচ্ছে। সব ঝকঝকে তকতকে। কে বলবে যে বাড়িতে মানুষ থাকে না।

তার মানে কি?

কোনো মানুষ আছে এর পেছনে। আমার তাই বিশ্বাস। হাজার সত্তর শাল গাছ, করম গাছ, তেঁতুল গাছ, লাখ লাখ টাকার জঙ্গল তো। কেউ আতঙ্ক সৃজন করছে।

কাকা খুব মুষড়ে পড়েছেন মনে হল। ঝারোয়ার জঙ্গলের ওপর খুব ভরসা করেছিলেন।

বাদল বলল, তুমি ভাবছ কেন? আমরা চারজন আছি, বন্দুক নিয়ে যাব ওখানে। সব রহস্য ফরসা হয়ে যাবে।

পরদিন দাসাইন ওরাওঁ ওদের নিয়ে গেল চিপা ফরেস্টে। সেখানে একটা গাছ কাটা চলছে। দাসাইন খুব আত্মসম্মানী ভারভারিক্কি লোক। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে ও, হাতে রাখে ছড়ি। দাসাইন বলল, তোরা যাস না ঝারোয়া।

কেন? সেখানে কি আছে?

বোস্, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই, চায় লা।

ওভারসিয়ারের তাঁবুর কাছে একটা লোক কেটলিতে চা বানাচ্ছে, বিড়ি বেচছে। কাটা গাছের উপর বসল ওরা। দাসাইন বলল, বাবু অনেকদূর বুঝে। সবটা বুঝে না।

দাসাইনের গল্পটা জঙ্গলে বসে মনে হয়েছিল গল্প, আর শহরে বসে মইনু, তাতা ও সোনামের আজ মনে হয় সত্যি। কেন এমন হয়?

গল্পটা এই রকম—

আদি অন্ত কাল আগে যখন পৃথিবী তৈরি হচ্ছিল, তখন বড় দেবতার সঙ্গে অসুরদের বউরা যুদ্ধ করতে যায়। বড় দেবতা শূন্য থেকে বউগুলোকে নিচে ফেলে দেন। তারাই হয়ে গেল পাহাড়। পাহাড়ের কোল দিয়ে ক্রমে বনও গজাল। আর একথাও সত্যি যে নানারকম মানুষ এসে সব জঙ্গল, সব মাটির দখল নিয়েছে।

তবু বনের কোনো কোনো জায়গা থাকে সংরক্ষিত। মানুষ সব দখল করছে বলে পাহাড় জঙ্গলের আত্মারা মানুষের উপর ক্ষেপেই থাকে। কেননা তাদের বসত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তখন তারা কোনো কোনো জায়গায় এসে ডেরা বাঁধে।

ঝারোয়ার জঙ্গল তেমনি এক জায়গা। এ কথা বাবু মানে না, বুঝে না! এ কথা কখনো বাবু ভেবে দেখল না যে ধীলন যেখানে ঘর করল, সেখানে গাছে পাখি বসে না, কোনো জানোয়ার ঢোকে না বাড়ির ভিতর? আর ধীলনও ভেবে দেখল না, জঙ্গলের মধ্যে একটা মেয়ে কোথা থেকে এল, বিয়ে করে বসল। অবশ্য ধীলন কিছু করতে পারতও না। যখনি ওখানে বাড়ি করেছে, তখনি ও মরেছে। যখনি মেয়েটিকে দেখেছে, তখন তো ওর উপর শাপ লেগে গেছে।

ও তো মেয়ে নয়। মানুষের উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্যে কখন মেয়ে সেজে, কখন হরিণ বা ময়ূর সেজে মানুষকে ভুলায়। তারপর মানুষের রক্ত চুষে শেষ করে ফেলে রেখে চলে যায়।

কেন?—সোনাম বলল।

কেন শোধ নেবে না? মানুষ গাছ কেটে, পাহাড়ের পাথর চালান দিয়ে জঙ্গলের রক্ত চুষে নিচ্ছে না?

তোমাদের কিছু হয়নি তো?

দাসাইন শান্ত সুন্দর হাসল। বলল, আমরা তো জঙ্গলকে মারছি না বাবু, পাহাড় জঙ্গল শেষ করে টাকা জমাচ্ছি না। আমাদের মারবে কেন? আমরা জঙ্গলের সন্তান। জঙ্গলের দেওদেওতার নিয়ম মেনে চলি। ওদের রাগ বাইরের মানুষের উপর। আমরা যাচ্ছি জঙ্গল দিয়ে। ধর্ কেন, জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পথের উপর একটা ডাল ভেঙে পড়ল। বা' নেই, বাতাস নেই, ডাল পড়ল কেন? তখনি জানলাম আর যাওয়া নিষেধ। আর যাব না, ফিরে আসব।

তাতা বলল, বাড়ি পরিষ্কার রাখছে কে?

যে ধীলনকে খেয়েছে, সে।

কেন?

কেন?

আরো খেতে চায় আরো মানুষ চায়।

পুলিশকে কিছু করে নি কেন?

কে জানে?

পুলিশকে যে কিছু করে নি, তাতেই মইনুরা নিঃসংশয় হয় যে এ কোনো মানুষের কারসাজি। তখনি বাদল ঠিক করে যে ওই বাড়িতে গিয়ে ওরা থাকবে।

কাকা বারণ করলেন।

পুলিশ অফিসার বারণ করলেন।

বারণ না করে, "যাও" বললে ওদের উৎসাহ ফুরাত। বারণ করার ফলে যা ছিল উৎসাহ, তা হয়ে গেল জেদ। চার চারটে জোয়ান ছেলে। সাঁতার কাটতে, স্কুটার চালাতে, পাহাড়ে উঠতে সবাই পটু। রাইফেল ক্লাবে চারজনই একসঙ্গে ঢুকেছিল। অল্পবিস্তর বন্দুক চালাতে সবাই জানে। বাদলের তো লাইসেনস্‌ও আছে। জঙ্গলের কাজে আসার আগেই সে লাইসেনস্‌ নিয়েছে। মইনু কারাটে, তাতা আর সোনাম জুডোও শিখেছে।

পুলিশ অফিসার সুজা সিং বললেন, ঠিক আছে। পাহাড়ের এপারে সুমাতে আমি রইলাম আজ। অনেক দিন বাদে জমিয়ে তাস খেলা যাবে।

কাকার বাংলোয় রয়ে গেলেন সুজা সিং। আর ওরা যখন গেল বিকেলে, তখন বার বার বলে দিলেন, পাহাড়ে নির্জনে শব্দ বহুদূর যায়। এই হুইস্‌ল্‌টা রাখুন। কিছু বিপদ বুঝলেই বাজাবেন। আমরা চলে যাব।

দাসাইন ওদের কিছুদূর এগিয়ে দিল আর মাথা নাড়তে নাড়তে, বক বক করতে করতে ফিরে গেল।

সুমা থেকে ঝারোয়া, মাঝে একটি পাহাড়। পাহাড়টা খুবই নিচু। যাবার পথ পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাহাড় ঘিরে। ধীলনের বাংলোটিতে ওরা যখন পৌঁছয় তখন বিকেল। কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে ওরা আশপাশটা দেখতে বেরোল। বাদল বলল, যত সব গাঁজাখুরি কথা। ওই তো হরিণ দৌড়ে গেল, কাঠবিড়ালি ছুটছে। ভূতুড়ে জঙ্গল না হাতি!

মইনু, সোনাম আর তাতা অবশ্য কোনো হরিণ বা কাঠবিড়ালি দেখেনি। কিন্তু বাদল তো দেখেছে?

সন্ধ্যে ঘনাতে ওরা ফিরে এল। বাদল বলল, এত বড় বড় শাল গাছ, ওঃ। কত দাম বলতো?

লাখ লাখ টাকা।

তাহলে?

তুই লক্ষপতি হচ্ছিস।

নাঃ, বেজায় বড়লোক হওয়াটা আর ঠেকানো গেল না দেখছি। কি আর করি বল্‌।

আমাদের মাঝে মধ্যে দিয়ে দিস।

বাংলোতে আলো জ্বলছে। তাই দেখেই ওরা অবাক হয় একটু। বারান্দায় পেট্রোম্যাক্স, ঘরে পেট্রোম্যাক্স, কে জ্বালল? আরেকটু এগিয়ে আসতে জবাব মিলল। বারান্দায় বসে আছে একটি মেয়ে। তার কোলে একটি বাচ্চা।

ওদের দেখে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল বাচ্চাটিকে শুইয়ে রেখে। তারপর হাত জোড় করে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ছেলেরা যত না অবাক, তত বিব্রত, আবার আশ্বস্তও। মইনু বলল, থামুন, থামুন। কাঁদবেন না। আপনি, আপনি ধীলনের বউ?

হ্যাঁ বাবুজী। এ তো আমারই বাংলো।

কোথায় ছিলেন?

কোথায় থাকব? জঙ্গল দিয়ে আমাদের গাঁয়ে পালিয়ে ছিলাম। পুলিস যে বড্ড ঝামেলা করে। কি বলে কিছু বুঝি না। আমি কি জানি যে স্বামী মরে যাবেন? উনি পরব পূজা পছন্দ করেন না। ঝগড়া করে আমি বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাই। তারপর যা যা হল...গাঁয়ে আমায় থাকতে দেয় না। বলে, বাবুকে বিয়ে করেছিলি। সেখানে যা। এখানে এলে পুলিস তাড়া করে।

আপনিই ঘরদোর সাফ করেন?

হ্যাঁ বাবুজী। কে করবে?

ঘর খোলেন কি করে?

এই যে, মাসটার চাবি দিয়ে? এ চাবিগুলো দিয়ে সব তালা খোলা যায়। বাচ্চাটার বড় অসুখ। কেবল শুকিয়ে যাচ্ছে, কিছু খেতে চায় না। তাই এসে বসে আছি। ভেবেছি সকাল হলে নিজে যাব পুলিস সাহেবের কাছে। বলব, আমাকে যা বলো তাই করব, বাচ্চাটাকে হাসপাতালে দিয়ে দাও। জংলী মানুষ আমি, কিছু বুঝি না। স্বামী সব বুঝতেন, সব দেখে শুনে রাখতেন। বাবুজী! রাতটুকু থাকব?

ছি ছি সে কি কথা! আপনি বাচ্চাকে নিয়ে ঘরে থাকুন। আমরা ওই ঘরে থাকব। সকালে আমরাই আপনাকে নিয়ে যাব।

মেয়েটি বাচ্চাকে শুইয়ে এল। সেই ওদের খাবার সাজিয়ে দিল প্লেটে। কাকা খাবার সঙ্গে দিয়েছিলেন। অনেক পীড়াপীড়িতেও নিজে কিছু খেল না। কথা বলল অনেক। ধীলনের ভাগ্নে ভার্মাকে কে মেরেছিল তা ও জানে না। ও তো ভয়ের চোটে আসতই না। গ্রামের লোকরা থাকতে দিল না বলে যাওয়া আসা করছে।

বসার ঘরে ওরা শুয়ে পড়ে। ঘুম কি আসতে চায়? এখন তো ঝারোয়ার বাংলোর রহস্যের সব সমাধানই মিলেছে। মেয়েটির গল্পের মধ্যে যে সব ফাঁকফোকর আছে তা ওদের এখন কিছু কানে বাজছে না। মেয়েটির চাউনি এত কাতর, গলার স্বর এমন কান্নায় ভরা!

হঠাৎ মেয়েটি কেঁদে উঠেছিল। ছুটে এসেছিল। বাবুজী, বাবুজী! মেয়ে আমার নেতিয়ে পড়ছে কেন? একটু দেখ না গো? এমন রাতে আমি কি করি, কোথায় যাই?

ধড়ফড় করে ওরা উঠে যায়, ছুটে যায়। সত্যিই, বাচ্চাটা তিন-চার মাসের বাচ্চাটা যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বাদল সামনে ছিল, পাগলিনীর মতো বাচ্চার মা বাদলের হাত ধরে টানতে থাকে।

এসো বাবুজী, গায়ে হাত দিয়ে দেখ, বলো আমার মেয়ে বেঁচে আছে।

হতভম্ব বাদল এগিয়ে যায় কাছে। আর যে বাচ্চাটা মরার মত পড়েছিল এতক্ষণ, সে হঠাৎ খলখল করে হেসে বিছানা ছেড়ে যেন ভেসে উঠে আসে, বাদলের গলায় মুখ লাগায়, চুষতে থাকে কি যেন। বাদলের গলার স্বর আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখ হয়

বিস্ফারিত। মইনুরা একপা নড়তে পারে না। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে। মেয়েটি বাদলকে ধরে থাকে আর একেবারে মমতাময় মানুষী মায়ের গলায় বলতে থাকে, খেয়ে নে সোনা, খেয়ে নে মণি, খেয়ে নে...

সোনাম এই ভয়ঙ্করতার অভিশাপ কাটিয়ে বাদলের রাইফেলটা এনে পরপর গুলি করেছিল মেয়েটির উপর। মেয়েটি একটুকু নড়ে নি। বাচ্চাটাকে ও একসময়ে কোলে নিয়ে নেয়, বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বাদল পড়ে যায়।

রাইফেলের শব্দে সুজা সিং ও কাকা এসে পড়েন। তারপর সব অস্পষ্ট। ধোঁয়াটে, গোলমেলে। ওদের চারজনকেই হাসপাতাল নিতে হয়। বাদল অবশ্য জীবিত ছিল না।

তারপর ওরা একদিন ফিরে আসে।

ঝারোয়ার জঙ্গলের নাম ওরা কখনো করে না। কিন্তু খুব ছোট শিশু দেখলে ওর ভীষণ ভয় পায় আজও। জীবনেও এ আতঙ্ক ওদের কাটবে না।

ঝারোয়ার জঙ্গলে এরপর আর কেউ ঢোকেনি!

একটি নারী হত্যাকাণ্ডের কিনারা

pathagar.net

পঞ্চানন ঘোষাল

এই অখ্যাতা নারীটি ছিল কলকাতা মহানগরীর জনৈকা বারবণিতা। এই সহায়-সম্বলহীনা রূপজীবিনী নারীর জীবনকে অমূল্য জীবন বলা যায় না। সাধারণ মানুষের চোখে রাজপথে গাড়ী-চাপা বেওয়ারিশ কুকুরের মৃত্যু ও আততায়ীর অস্ত্রে ঘৃণ্য পল্লীতে এই দেহ ব্যবসায়িনী নারীর মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রভেদ না থাকারই কথা। এই জন্য তার অপমৃত্যুর করুণ কাহিনী এই শহরের নাগরিকদের মধ্যে কোনও আলোড়ন আনেনি। এ তদন্তকারী অফিসাররা ছাড়া এই মৃত্যু নিয়ে অন্য কারু মাথা ঘামাবার কথা নয়। কিন্তু সমাজের এমন কয়টি মানুষ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে যে, পরবর্তীকালে এই মামলার জন্যে বহু লোকেরই মাথা ঘামাতে হয়। প্রকৃতপক্ষে বিচারের সময় এই অখ্যাতা নিহতা নারী প্রখ্যাতা হয়ে উঠে। উপরন্তু এই ঘটনার সঙ্গে অপর একটি নারীর ভাগ্য জড়িয়ে থাকায় শহরের এই খুনটি নিয়ে চাঞ্চল্যেরই সৃষ্টি হয়।

১৯৩২ সালের উত্তর কোলকাতার কোনও এক বেশ্যাপল্লীতে এই নিদারুণ খুনটি সঙঘটিত হয়। এই সময় অন্য একটি মামলার তদন্ত ব্যাপদেশে আমাকে শহরের বাইরে

যেতে হয়েছিল। হাওড়া স্টেশন হতে সোজা থানায় ফিরে শুনলাম যে, সরকারী অফিসাররা জনৈকা নারীর অপমৃত্যু সম্পর্কীয় ঘটনার তদন্তে বার হয়ে গিয়েছেন। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ শারদীয়া উৎসব আগত প্রায়। এই সময় পয়সার প্রয়োজন মানুষের বেশি থাকে। এই জন্য অত্যাচারী সুবিধে মত বেশ্যা নারীদের বাড়ীতে প্রথম হানা দেয়। এজন্য আমি আমাদের এলাকাধীন বেশ্যাপল্লীগুলিতে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থাও করেছি। এতৎ সত্ত্বেও সেখানে কেউ খুন হলে তা আমাদের লজ্জার বিষয়। আমি চিন্তিত মনে থানার জাবেদা খাতা (জেনারেল ডাইরি) টেনে নিয়ে সেটা পড়তে শুরু করলাম। তদন্তে বার হবার আগে সহকারীরা এতে একটা প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এই প্রাথমিক সংবাদের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো—

"অমুক রাস্তার ১২ নং কুঠির নিচের তলার সারদাসুন্দরী বাড়িওলীর ভৃত্য ফাগুয়া কাহার এসে সংবাদ দিলে যে, তাদের বাড়ি দ্বিতলের একটি ঘরে সুখুরাণী নামে এক নারী বাস করে। সাধারণত সে প্রতিদিন সকাল সাত ঘটিকার মধ্যে ঘর হতে বার হয়ে আসে। কিন্তু এইদিন বেলা এগারোটাতেও সে দরজা খুলে বাইরে আসে নি। বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা তাকে ডাকাডাকি করে, তারা দরজায় ধাক্কাধাক্কিও করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘরের ভিতর থেকে সুখুরাণী ঘরের বাইরে আসেনি। এমন কি, এতো ডাকাডাকিতেও সে কোন সাড়াশব্দ পর্যন্ত দেয় না এই ব্যাপার ঐ বাড়ীর বাড়িওয়ালী-মাকে জানানো হলে তার আদেশমত সংবাদদাতা এই ঘটনাটি পুলিশে জানাবার জন্যে থানায় এসেছে।"

থানার জাবেদা খাতাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে আমি দেখলাম যে, উহার প্রথম 'থাকে' উপরোক্ত সংবাদটি লিপিবদ্ধ করে উহার দ্বিতীয় 'থাকে' জনৈক সহকারী অফিসার লিখে রেখে ছিলেন, 'এই খাতার ১নং থাকে বর্ণিত সংবাদের জন্য আমরা বহির্গত হলাম।' এই সংবাদটি দ্রুতগতিতে পড়ে নিয়ে আমি ভাবছিলাম, কি রে বাবা। খুন নয় তো! ঠিক সেই সময় সহকারীরা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে থানায় ফিরে এলেন। এঁদের হাসিমুখে থানাতে ফিরতে দেখে আমি আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হে মার্ডার, না সুইসাইড।'

'কখন ফিরলেন স্যার?'—আমাকে দেখে জনৈক সহকারী খুশি মনে উত্তর করলেন, 'একে আপনি উপস্থিত নেই, তার ওপর এই ঝামেলা। আমরা একটু ভয় পেয়ে গিছলুম। যাক্, এখন দেখা যাচ্ছে এটা একটা সামান্য ব্যাপার—এ পিওর কেস অব সুইসাইড। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কেন আত্মহত্যা করলো তা জানা গেলো না।'

'যাক্ স্যার! মেয়েটা ভালোয় ভালোয় নিজেই সরে পড়লো', প্রথম সহকারীর কথাটা শেষ হওয়া মাত্র দ্বিতীয় সহকারী বলে উঠলেন, 'তা' না হলেও যে আরও কতো কচি মাথা চিবিয়ে খেতো, তা কে জানে।'

'তাতো ভাই বুঝলাম।' আমি নারাজি ভাবে ঘাড় নেড়ে সহকারীর এই উক্তির প্রত্যুত্তরে বললাম, 'কিন্তু তোমাদের বন্ধুরা নিজেদের কচি মাথাগুলো ওদের বাড়ী পর্যন্ত ব'য়ে নিয়েই বা যায় কেন?'

এমনি হাস্য-পরিহাসের মধ্যে আমার সহকারী জেনারেল ডাইরিতে এই আত্মহত্যার তদন্ত সম্পর্কে রিপোর্টটি লেখা শেষ করেছে, এমন সময় আমাদের বড় সাহেব

রায়বাহাদুর প্রভাতনাথ মুখার্জি টেলিফোনে আমাকে খোঁজ করে বসলেন। টেলিফোনে আমার গলা শুনে তিনি আশ্বস্ত হয়ে উঠলেন, 'আরে, তুমি কলকাতায় ফিরেছো। বেশ বেশ, তা'হলে ভালোই হল। এইমাত্র খবর পেলাম যে অমুক পাড়ার একটা মেয়েকে মরা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তোমার অফিসাররা শুনলাম ওটা আত্মহত্যা বলে রায় দিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার মনে হয় ওটা সুইসাইড না'ও হতে পারে। তুমি এখুনি নিজে সেখানে গিয়ে দেখো ওটা সত্যই সুইসাইড, না মার্ডার।'

টেলিফোনটির হ্যাণ্ডেল যথাস্থানে ন্যস্ত করে আমি একবার মাত্র ভাবলাম, আগের ট্রেনটা ফেইল করে পরের ট্রেনে এলেই হতো। অন্তত দু'ঘণ্টা লেটে শহরে পৌঁছুলে এতো হাঙ্গামা আর পোয়াতে হতো না। পুরা একদিন ট্রেনের ঝাঁকুনি খেতে খেতে কোলকাতায় পৌঁছিয়েছি। বিশ্রামের লালসায় সারা দেহটা এমনিতেই এলিয়ে পড়তে চায়। মনের জোরে দেহটা চাঙ্গা করে নিয়ে আমি সহকারীর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলাম। ততক্ষণে সহকারী তাঁর রিপোর্ট লেখালেখির কাজ শেষ করে ফেলেছেন। আমি তাঁর হাত থেকে ডাইরি বইটা টেনে নিয়ে সেটা পড়তে শুরু করে দিলাম। তিনি তাঁর বিস্তৃত রিপোর্টে ঘটনাস্থলের কয়েক ব্যক্তির বিবৃতির সহিত নিজেরও একটা নাতিদীর্ঘ বিবৃতি সংযুক্ত করেছেন। এই সম্পর্কে তদন্তকারী সহকারীর বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, ঐ নারীর ঘরটির দুয়ার ভিতর হতে বন্ধ করা হয়েছে। এই ঘর হতে বার হয়ে আসবার মাত্র ঐ একটাই দরজা ছিল। এ দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে আমি বুঝতে পারি যে, ভিতর হতে অর্গল বন্ধ করা হয়েছে। অগত্যা জোর করে দরজা ভেঙে আমাদের ঐ ঘরে ঢুকতে হয়। দুইজন স্থানীয় সাক্ষী সঙ্গে ঐ ঘরে ঢুকে আমরা দেখলাম যে এক নারী রক্তাপ্লুত অবস্থায় তার বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শায়িত। এই মেয়েটির বয়স অনুমানে বিশ বৎসর মনে হলো। তার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গড়ন বেশ গোলগাল, নিটোল। মৃত্যুর পরও তার মুখটা ঢলঢলে কচি কচি মনে হয়। তার গলার উপরাংশে একটা গভীর ক্ষত দেখলাম। এই ক্ষত হতে রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠে দেওয়ালে এসে পড়েছে। সারা বিছানাটা রক্তের ছাপ লেগে কালো হয়ে গেছে। অর্ধমুষ্ঠিবদ্ধ হাত দুটি এলিয়ে দিয়ে সে যেন ঘুমুচ্ছে। ভালো করে চেয়ে দেখলাম যে, তার চক্ষুর পাতা অর্ধনিমীলিত অবস্থায় রয়েছে! একটা ধারালো রক্তমাখা দোধারা ছুরি তার হাতের কাছে পড়ে আছে। কিন্তু উহা তার হাতের নাগালের বাইরে দেখা যায়। সম্ভবত প্রাণহীন দেহ মাটিতে পড়ার কালে উহা তার হাত হতে ছিটকে পড়ে। এই ঘরের এই একমাত্র দরজা ছাড়া রাস্তার দিকে দুটা মাত্র জানালা দু'টার পাল্লা খোলা ছিল। ঘরের মধ্যে কোনও বাক্স ড্রয়ার ভাঙা দেখা যায়নি,—" ইত্যাদি।

আমি বার দুই-চার সহকারী বিবৃতিটির উপর ত্বরিত গতিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। এই সব প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—হুঁ' বুঝলাম। কিন্তু এটা সুইসাইড ছাড়া আর কিছুই নয়, তা তুমি বুঝছো কি করে? হঠাৎ তুমি এই ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে এলে কেন? এটা একটা মার্ডার কেসও

তো হতে পারে?

উঃ—না না স্যার! এ কিছুতেই মার্ডার কেস হতে পারে না। মেয়েটা প্রেমে-ট্রেমে পড়ে বা জ্বালাযন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছে। ওর ঘরের দরজাটা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। আমরা সকলের সম্মুখে সেটা ভেঙে ঘরে ঢুকি। ওর ঘরের জানালায় মোটা মোটা গরাদ রয়েছে। এদিকে একমাত্র এই মেয়েটা ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী তার ঘরে ছিল না। সে সুরক্ষিত অবস্থায় তার ঘরে শুয়ে ছিল। বাইরে থেকে কারু পক্ষে রাত্রে তার ঘরে ঢোকা অসম্ভব। এই অবস্থায় কে আর তাকে খুন করতে আসবে?

প্রঃ—আরে থামো থামো। প্রেম-ট্রেম ওরা কেনা-বেচা করে। এজন্য ওসবের বালাই ওদের নেই। এখন বাকি রইল জ্বালা-যন্ত্রণার প্রশ্ন। কিন্তু মানুষের নাম মহাশয়, যা সওয়ানো যায় তাই সয়। দুঃখকষ্ট ওদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। এজন্য এসব তীব্র ভাবে তাদের অনুভূত না হওয়ারই কথা। তবে শেষের দিকে তুমি যা বললে তা ভেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তুমি ভালো করে জেনেছো তো, ঐ ঘর হতে কোনও অর্থ বা অলঙ্কারাদি উপহৃত হয়নি?

উঃ—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ঐ ঘরের প্রতিটি বাক্স, তোরঙ্গ ও আলমারী, মায় ড্রেসিং টেবিলে ড্রয়ারগুলো পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখেছি যে, সেগুলোর একটাও ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়নি। এইসব দ্রব্যের বহির্দেশে কোনও যন্ত্রের আঘাত আমি দেখি নি। ওগুলো বাইরে থেকে খোলাও যায়নি। ওর প্রত্যেকটি বাক্স-আদি চাবি বন্ধ ছিল। আপনি স্যার এই অবস্থায় এটা খুন মনে করেছেন কেন?

প্রঃ--তোমাদের সব কিছুই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। ওর আঁচলে একটা চাবির কথা কি তোমরা কেউ ভেবেছো? তার সেই চাবির গোছা কি যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে? প্রথমত এই সব মেয়ের ঘরে দোধারা ছুরি থাকার কথা নয়। এরপর তার চাবির গোছা না পাওয়া গেলে চিন্তার বিষয়। বদ লোকেরা কখনো কখনো এদের ঘরে এলেও তাদের হাতিয়ার তারা সেখানে ফেলে যাবে না। উঁহু, আমার যেন কি রকম সন্দেহ হয়। লাস কি তোমরা মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছো।

আমরা এইবার থানা হতে বার হয়ে দুর্ধর্ষ মল্লিকবাবুর গুণধর পৌত্রের শ্বশুরালয়ে এসে উপস্থিত হলাম। এঁদের বাটীর বর্তমান আবহাওয়া মল্লিক বাবুদের বাটীর মত সাবেকী নয়। অতি আধুনিকতার আবর্তনে এই বাড়ীর ছোট-বড় সকলে এরা হাবুডুবু। এখানে এসে প্রথমে আমরা ঐ মল্লিক বাবুর গুণধর পৌত্রটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। তাঁর বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

'আমার নাম বাবু অমুক মল্লিক, পিতার নাম অমুক মল্লিক। পাঞ্জাবী বংশোদ্ভব হলেও ছয় পুরুষ আমরা বাংলা প্রবাসী। আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমাদের উত্তরাধিকারিত্ব এই প্রদেশে প্রচলিত দায়—ভাগের বদলে মিতাক্ষর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জন্মের সাথে আমরা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হই। পিতা কর্তৃক ত্যাজ্য পুত্র হওয়ার ভয় না থাকায় সহজে তাদের সাথে কলহে লিপ্ত হয়ে—এদেশে ভাই ভাই-এর মত পিতা ও তৎ পিতার সাথে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে আমরা সক্ষম। এই সুবিধা থাকায় দুষ্ট পিতা বা পিতামহ সম্পত্তি নষ্ট করলে আমরা বাধা দিতে পারি। এদেশের পিতাদের মত

পৈতৃক সম্পত্তি খুইয়ে সন্তানদের এরা পথে বসাতে পারে না। এই জন্য আমার পিতামহের সাথে দেওয়ানি মামলা করে সম্পত্তির জন্য পার্টিসন সুটে আমাকে লিপ্ত হতে হয়েছে। এই বিষয়ে আমাদের উভয়েরই অভিযোগ যে, আমরা পরস্পরের প্রপিতামহের আমলের পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিচ্ছি। আজ্ঞে হাঁ! আপনি এই বিষয়ে ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পেরেছেন। আমরা ধনী বংশীয় হওয়ায় বাল্যকালে আমাদের বিবাহ হয়। ঠাকুরদার ষোলো বৎসর বয়সে আমার পিতার জন্ম হয়। আমার স্বর্গত পিতার আঠারো বৎসর বয়সে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতামহ ও আমার বয়সের মধ্যে এজন্য ব্যবধান স্বভাবতঃই খুব বেশি নয়। আমাদের মত এইরূপ বহু ধনী পরিবার এইভাবে বহু পুরুষ একত্রে বসবাস করতে পেরেছে। এইবার আমাকে আর কি জিজ্ঞাসা আপনি করতে চান তো বলুন।'

ভদ্রলোকের এই বিবৃতি হতে ভারতীয় ধনিক সমাজের এক নতুন দিকের আমি সন্ধান পেলাম। আমার এখন মনে হয় যে নরনারীর বিবাহের বয়স বেঁধে দিলেও বহু সামাজিক অপরাধের অবসান হতে পারে। অন্যথায় পিতা ও পুত্রের মধ্যেও মমতার বদলে পিঠোপিঠি ভ্রাতৃসুলভ ঈর্ষার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নয়। এই একটি কারণে পৌত্রের বর্তমানেও মল্লিকবাবু পুনরায় দার পরিগ্রহ করে তাদের সোনার সংসারে মামলা ঢুকাতে পেরেছেন। এই মামলার সংশ্লিষ্ট ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে অন্য কয়েকটি নর-নারীর জীবনের ব্যর্থতার পিছনেও দেখা যায় এই বয়সের নীতিবিহীন তারতম্য। হায়! আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র এই বিষয় আর ভাববে কবে? এই ক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারি যে বয়সের সান্নিধ্য হেতু এদের পরস্পরের দুর্বলতা জ্ঞাত হতে পেরেছে। এজন্য ওরা পরস্পরকে পরস্পরের প্রাপ্য সম্মান দিতে পারে নি। নিজেদের চরিত্র সুধরে নেবার বয়স অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই এদের পুত্রপৌত্রেরা সাবালক হয়ে ওঠে। তাই এদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান না হয়ে উহা আরও জটিলতর হয়ে উঠে।

এইবার আমি এই ধনী ঘরের যুবকটিকে এই মামলার তদন্তের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন করি। আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তিনি যথাযথ ভাবে দিয়ে যান। আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। এই সকল প্রশ্নোত্তর হতে এই খুনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝা যায়।

প্রঃ—হুম! আপনার স্বর্গত পিতার বিষয় আমি উত্থাপন করবো না। আমি শুধু আপনার ও আপনার ঠাকুরদার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবো। আপনার ঠাকুরদার মত আপনি এ-পাত ও-পাত না করে একনিষ্ঠতার পক্ষপাতী। এটা আপনার চেহারা দেখে ও কথাবার্তা শুনে ধারণা করেছি। আপনার স্ত্রী বড় বনেদী ঘর হতে আপনাদের ঘরে এসেছেন। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে, তিনি সুন্দরী ও গুণবতী। আপনার ও আপনার ঠাকুরদার গাত্রবর্ণ দেখে বুঝা যায় যে, প্রেম করে বিবাহের রেওয়াজ আপনাদের পরিবারে নেই, এইজন্যে প্রতি পুরুষের ঘরে সুন্দরী বউ এসেছে। তা না হলে আপনাদের গায়ের রঙ এত ফর্সা দেখা যেতো না। কিন্তু আপনি এর পর—নারীর প্রণয়াভিলাষী হলেন কেন? এই সংবাদ আমরা পূর্ব হতে সংগ্রহ করেছি, অতএব উহা গোপন করে লাভ নেই। এখন বলুন তার কবল হতে মুক্ত হয়ে হঠাৎ ফিরে এলেন কোন্ কারণে?

উঃ—মশাই, তাহলে আপনাদের নিকট সংসারের সকল বিষয় খুলেও বলতে হয়। আমার স্ত্রীকে আমি যে ভালবাসি তা ঠিক। তার রূপে ও গুণে আমি মুগ্ধ। কিন্তু সে গান গাইতে পারে না, অথচ গান আমি বড়ো ভালবাসি। এই গান হচ্ছে আমাদের একটা বংশানুক্রমিক নেশা। এই চর্চা আমাদের অধিক অধঃপতন হতে রক্ষা করে। কিন্তু নারীর সুললিত কণ্ঠে গান শোনার ঝামেলাই আমার কাল হলো। তা না হলে এতো ব্যথা আমাকে দেবার ঐ শয়তানীর ক্ষমতা হতো না। আমার স্ত্রী কিছুতেই গান শিখতে রাজি না হওয়ায় আমি ওর ঘরে গিয়ে পড়ি। পরে তারই দ্বারা বারে বারে অপমানিত হয়ে আমি বাড়ি ফিরি। আমার গুণবতী স্ত্রী আমার মন বুঝে গোপনে গান শিখতে থাকে। এখন তিনি সুগায়িকার মধ্যে গণ্য হয়েছেন। এখন আমি একান্তরূপে আমার এই সাধ্বী স্ত্রীর অনুগত ভর্তা। আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আর কোনও দুঃখ বা অভিযোগ আমার এখন নেই। পরিবর্তিত অবস্থাতে পিতামহের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত কন্টেস্ট করতে আমার মন চাইলো না। এইজন্য এই মামলা ইচ্ছা করে তাঁকে আমি জিতবার সুযোগ করে দিলাম।

প্রঃ—কয়েকটি বিষয়ে ঐ কুলটা নারীর প্রতি আপনার ভুল ধারণা আছে। আমরা তদন্তে জেনেছি যে আপনাকে সে অঢেল ভালবাসতো। তবু আপনার ও আপনার স্ত্রীর হিতার্থে আপনার মোহ দূর করার জন্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আপনার সাথে ভদ্র ব্যবহার করেছে। একথা যারা জানে না তারা তা মানে না। কিন্তু আমরা তা জানি, তাই-তা আমরা মানি।

উঃ—স্যার! এ সব কুলটা নারীদের ছলা-কলার অভাব নেই। সে যাই হোক্ এখন আমি আর ওকে ভালবাসি না। তাই বোধ হয় এতে স্পষ্ট করে আজ তা আমি বুঝতে পারছি। ঐ নারী আমাকে বহু আশা দিয়ে পরে অপমান করে ঘর হতে তাড়িয়ে দেয়। আমি মোহের ঝোঁকে আমাদের পূর্বপুরুষের স্পর্শধন্য কয়েকটা পারিবারিক গহনা তাকে সাময়িক ভাবে পরতে দিই। কিন্তু ঐ গহনার চতুর্গুণ মূল্যের বিনিময়ে ও সে ওগুলো আমাকে ফিরত দেয়। স্বর্গত ঠাকুমা বলতেন যে ঐ গহনা বংশের বাইরের কেউ ছোঁয়া মাত্র সে নিহত হবে। আমি জানি যে আমার সতী সাধ্বী ঠাকুমার ভবিষ্যদ্‌বাণী বৃথা হবে না। এখনও পর্যন্ত লজ্জায় এ কথা আপন স্ত্রীকেও আমি জানাতে পারছি না। আমার ইচ্ছে হয় ওকে খুন করে ওগুলো উদ্ধার করে নিয়ে আসি। তবু ভালো আমার এই কীর্তিকলাপ আমার দুর্দান্ত ঠাকুরদা এখনও জানতে পারেন নি। এ সব গুহ্য তত্ত্ব তিনি জানলে এতো দিন গুণ্ডা নিয়োগ করে তিনি আমাকে নিহত করতেন। এগুলি দয়া করে ওর খপ্পর হতে আপনারা গোপনে উদ্ধার করতে পারেন কি? এজন্য আমি দশ বিশ হাজার টাকা খরচ করতে রাজি আছি। দেখুন আপনারা তা যদি—

এই যুবকের কথাবার্তায় বোঝা যায় যে বংশ পরম্পরায় খুনের নেশা এঁদের এখনও যায় নি। পূর্বপুরুষরা হয়তো সাক্ষাৎ ভাবে বহু ব্যক্তিকে খুন করেছেন। এখন ওঁরা তাতে ব্যক্তিগত ভাবে অপারগ থাকার অপরের দ্বারা এই কার্য করিতে থাকেন। কিন্তু এই বিষয়ে এঁর ধুরন্ধর পিতামহকে বাদ দিলে সন্দেহ করার মত অন্য কোনও মানুষ নেই। তবে এই যুবকের কথা-বার্তা শুনে বুঝা যায় যে তিনি নিয়মিত সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন না। এইজন্য তিনি তখনও জানতে পারেন নি যে তাঁর স্বর্গত ঠাকুরমাতার এতৎসম্পর্কিত

ভবিষ্যদ্‌বাণী ইতিমধ্যে ফলে গিয়েছে এবং তাঁর পূর্ব প্রেমিকা ঐ হতভাগিনী নারী ইতিমধ্যেই নিহতা হয়েছে।

এই ভদ্রলোকের দিকটা যা জানবার তা জানা শেষ হয়েছে। এখন এঁর স্ত্রীর একটি বিবৃতি গ্রহণের প্রয়োজন। আমি এই সম্পর্কে প্রস্তাব দেওয়া মাত্র দাদাবাবু নামধেয় এই যুবকটি মুখ বাঁকালেন। এতো আধুনিক আবহাওয়ার মধ্যে এসেও সাবেকী প্রথা তাঁর মনকে আজও আহত করে। অথচ এর অবর্তমানে আমাকে তাঁর বিবৃতি নিতে হবে। অগত্যা এঁর স্ত্রীর ভ্রাতার উপস্থিতিতে এঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ঠিক হলো। কিন্তু এই যুবকের স্ত্রীর রক্তে ইতিমধ্যে আধুনিকতা জেঁকে বসেছে। তা' না হলে গান শিখে রেডিও পর্যন্ত তিনি ধাওয়া করতে পারতেন না। ভদ্রমহিলা ধীর-স্থির চিত্তে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি এই বিষয়ে ঠিক বলেছেন। সন্তান জন্মের সাথে সাথে তাদের প্রতি মায়ের অপত্য স্নেহ আসে। কিন্তু তাদের প্রতি ঐ জাতীয় স্নেহ বয়স্ক পিতার মধ্যে শুধু দেখা যায়। এই বয়স আমার তরুণ বয়সে আমার স্বর্গত শ্বশুর ও এখনও পর্যন্ত জীবিত দা-শ্বশুরের আসে নি। তাই তাঁদের স্ব-স্ব সন্তানদের প্রতি কর্তব্য কাজে তাঁদের কোন অবহেলা দেখিনি। কিন্তু হৃদয়হীন কর্তব্যের শেষ দশা বোধ করি ভালো হয় না। বর্তমান মামলা মকদ্দমার মূলে আছে এই। এইবার আমি আমার নিজের বিষয় বলবো। আমি বি. এ ক্লাশ পর্যন্ত কলেজে পড়েছি। কিন্তু বিবাহের সময় এই বিষয় আমাদের গোপন করে যেতে হয়। আমি মাত্র মামুলি লেখাপড়া বাড়িতে করেছি—এইরূপ একটা মিথ্যা না বললে আমার এই সাবেকী ধনী পরিবারের বন্ধু হওয়া সম্ভব হতো না। আমাদের বিবাহের পর কিন্তু আমাদের সময় ভালোই অতিবাহিত হয়। কিন্তু হঠাৎ এই সময় আমার স্বামীর সাবেকী পারিবারিক বার টান শুরু হয়। এতো সাবধানে থেকে এতো চেষ্টা করেও আমি তাকে ধরে রাখতে পারি না। ওঁর গায়ের বস্ত্রের ও চুলের গন্ধ হতে আমার সন্দেহ হতে থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে স্বামীকে জানালে তিনি বেপরোয়া হবেন। শিক্ষিতা হওয়ায় এই সত্যটুকু আমার জানা ছিল। আমি কৌশলে তাঁকে ঘরমুখো করবার চেষ্টা করি। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমার মতো এক দরদী নারীর কবলে পড়েন। একদিন সহ্য করতে না পেরে আমি বিষ পানে অচৈতন্য হয়ে পড়ি। এই ঘটনা শ্বশুর কুলের বিরোধী ধনকুবেররা ঘটা করে এক সংবাদপত্রে তুলে দেয়। এর দ্বারা আমাদের পরিবারকে—বেইজ্জত করা তাদের উদ্দেশ্য। এই শত্রুতা আমাকে একদিন পুনরুজ্জীবিত করে দিলে। ঐ দরদী নারী এই সংবাদপত্রটি পড়ার পর এক বালক মারফৎ গোপনে আমাকে একটি ব্যক্তিগত পত্র পাঠায়। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় মামলা বাধায় আমাকে পিত্রালয়ে চলে আসতে হয়। এইখানে ঐ মহিমাময়ী নারী আমার সাথে দেখা করে আমার ঐ স্বামীর দুর্বলতার কারণ জানায়। আমি এই মহিলার গান রেডিওতে বহুবার শুনেছি। তার প্রস্তাব মাত্র আমি তার কাছে গান শিখতে রাজি হই। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন অসীম ধৈর্যের সাথে সে আমাকে গান শিখিয়েছে। স্বামীর মন জয় করার জন্যে দুইটি গান সে আমাকে ভালো করে শেখায়। সুর, তাল, লয়ের নিগূঢ় অর্থ না বুঝেও শুধু অভ্যাস অনুকরণ করে করে গান দুটো হুবহু ওরই মত আমি গাইতে শিখি। এরপর ওরই

চেষ্টায় একদিন আমার ভাই ও ওর সাথে একটি গান রেডিওতে গেয়ে আসি। এরপর হতে ধীরে ধীরে আমার স্বামীর বার টান কমে। আমি এতো গান জানি বুঝে তিনি অবাক হয়ে যান। কিন্তু আমি যে উচ্চশিক্ষিতা তা তিনি তখনও জানেন না। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি এই বিষয় ঠিকই বুঝেছেন। আমি বি. এ পর্যন্ত পড়লেও আমার স্বামী ম্যাট্রিক পাশ। কিন্তু ঘর-সংসার ও রান্না-বান্নার কাজে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন কোথায়? তবে স্বামীকে ঠিক পথে চালানোর জন্যে এর প্রয়োজন আছে সত্য। ঐ নারীকে আমাদের সাবেকী গহনা উপহারের বিষয় ঐ নারী আমাকে বলে। তার সাথে পরামর্শ করে গোপনে ওগুলো আমাদের পারিবারিক আলমারীতে রাখা আমরা স্থির করি। আমার অসুবিধে এই যে, আমার সাথে যে তার আলাপ আছে তা স্বামীকে জানাতে পারি না। ঐ কুলটা নারীর সাথে ঘরের বৌ-এর আলাপ আছে শুনলে আমার স্বামী তা বরদাস্ত করতেন না। আজ্ঞে হ্যাঁ। সত্যি। আমার ঐ স্নেহময়ী দিদি আমাকে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু স্বামীর মত আমি এই উপকারী বান্ধবীকে ঘৃণা করি না। তাকে আমি বাংলার এক শ্রেষ্ঠা নারীরূপে ভক্তি করে থাকি। আজ্ঞে আমার স্বামীর সংবাদপত্র পড়া অভ্যাস নেই। কিন্তু সংবাদপত্র পড়া আমার দৈনন্দিন কর্ম। তাই ঐ নিদারুণ নারী-হত্যার সংবাদটি আমি কাগজে পড়েছি। এর জন্য দুই রাত্রি আমি কেঁদে বিছানা ভাসিয়েছি। হঠাৎ তার মৃত্যু না হলে ঐ গহনা এতদিনে আমরা নিশ্চয়ই ফিরে পেতুম। ঐ গহনাগুলো না পেলে আমার স্বামী ও দাদাশ্বশুরের বিবাদ কোনও দিন মিটবে না। কিন্তু এগুলো ফিরে পাওয়া মাত্র এই বিবাদ ক্ষণিকের মধ্যে মিটে যাবে। ওর সাথে আমাদের পূর্ব পুরুষদের আশীর্বাদ মিশানো আছে। উচ্চশিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও এই সংস্কার আমারও মনে বদ্ধমূল। আপন সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার পর আমার স্বামীরও মনে এজন্য এতটুকুও শান্তি নেই। আমার ভয়, এতে তিনি আত্মহত্যা না করে বসেন। এখন আপনারা—'

এই ভদ্রমহিলা উচ্চশিক্ষিতা হলেও তিনি একজন ভারতীয় নারী। মূলতঃ তিনি তাঁদের পারিবারিক সংস্কার আঁকড়ে ধরে থাকার পক্ষপাতী। এই কারণে যে কোনও সংস্কারে বিশ্বাসী পরিবারের মধ্যে তিনি সগৌরবে স্থান করে নিতে পারেন। এই ভদ্রমহিলার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসে। তাঁর এই দীর্ঘ বিবৃতিটি করার পর তাঁকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। এই সুশিক্ষিত ভদ্রমহিলা তার যথাযথ উত্তরও দিয়েছেন। আমাদের এই প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আপনি শুনেছেন যে আপনার দাদাশ্বশুর মল্লিক বাবু প্রৌঢ় বয়সে জনৈকা বালিকাকে বিবাহ করেছেন। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে কৌতূহল হয়। আপনারা কি তাঁর ঐ বালিকা বধূটিকে আপনাদের সাবেকী স্থান দেবেন?

উঃ—বাংলা দেশে একটি বিখ্যাত সাধকের উক্তি আছে—'যদ্যপি আমার গুরু শুড়ী বাড়ী যায়, তথাপি আমার তিনি প্রাণের গোঁসায়।' এই দিক হতে বিচার করলে তাঁর সমালোচনাতে আমাদের অধিকার নেই। ঠাকুরবাড়ি তাঁর এই বয়সে সেবা যত্নের জন্য কাঙ্গাল হয়ে ওঠেন। এদের মধ্যে কলহ না হওয়া পর্যন্ত আমি ওঁকে সেবা-যত্ন করতাম। এ কথা ঠিক যে এই বয়সে তাঁর যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা দরকার। ঐ বালিকা তাঁকে সেবা যত্ন দ্বারা মুগ্ধ না করলে ঐ অঘটন ঘটতো না। ঠাকুরবাবু মোহ দূর হওয়ার পর ঐ

অবলা বালাকে পরিহার করলে আমি অধিক দুঃখিত হবো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমাদের ধনদৌলত আছে। এখন এর কিছুটা অর্জন করার গৌরব অধিক। পৈতৃক সম্পত্তিভোগী মানুষদের আমি পরভুক পরগাছা মনে করি!

প্রঃ—আচ্ছা। রেডিও অফিসে ঐ মৃতা নারীর পরিচিত এক কর্তা ব্যক্তি আছেন। আপনি তো সম্প্রতি পোগ্রাম পেয়ে ওখানে যাতায়াত করতেন। এঁর সম্বন্ধে মৃতা দিদির কাছে কোনও কিছু শুনেছিলেন? এটুকু মনে করে এ বিষয়ে আপনি জানালে আমাদের উপকার হয়।

উঃ—আজ্ঞে। রেডিও অফিসে ঐ কর্মকর্তাটিকে আমি বহুবার দিদির সাথে দেখেছি। তাই ভদ্রলোককে বলে কয়ে আমার মৃতা দিদি রেডিওর পোগ্রাম আমার পক্ষে যোগাড় করে। তা' না হলে আমার মত কাঁচা নতুন আর্টিস্ট ওখানে এতো শীঘ্র পাত্তা পাবে কেন? আমি এইটুকু শুধু জানি যে তিনি ঐ দিদিকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন।

প্রঃ—আমার আসল প্রশ্নের আপনি কোনও উত্তর দিলেন না। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, ঐ ভদ্রলোকের স্বভাব চরিত্র কিরূপ? আর তাঁর সাথে আপনার ঐ দিদির সম্পর্কটা কি ছিল? এইটুকু জানতে পারলে এই নারী খুন সম্পর্কিত তদন্তের পথে আমরা অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে পারি। আমাদের আশা এই যে এ সম্বন্ধে আপনি যথেষ্ট আলোকপাত করবেন।

উঃ—এ ভদ্রলোকের সাধারণ স্বভাব-চরিত্র প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর ও দিদির পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। এতে ঐ ভদ্রলোকের অন্যায় হলেও দিদির কোন অন্যায় নেই। আমি এই উভয় ব্যক্তির এই দুর্বলতাকে ভগবানের নির্দেশ মনে করতাম। এর কারণ দিদির কাছে তার বিগত দিনের জীবনী আমি শুনেছি।

সাক্ষী পরস্পরের মুখে শুনা কাহিনী হতে আমি যা এত দিন অনুমান করেছি, এক্ষণে এই ভদ্রমহিলার মুখে তা সত্যরূপে শুনে পুরোপুরি মেনে নিতে পারলাম। এই ব্যাপারে এই ভদ্রমহিলার একটি দ্বিতীয় বিবৃতি আমাকে লিপিবদ্ধ করতে হয়। এ বিবৃতির একটি সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'আজ্ঞে! ঐ ভদ্রলোকের সহিত বাল্যকালে মৃতা দিদির বিবাহ হয়। কিন্তু জোর করে ছোট মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দেওয়াতে মন বিক্ষুব্ধ হয়। উনি বাসর ঘর হতে উঠে বাইরে যাওয়ার অছিলায় উধাও হয়ে যান। ভদ্রলোক লেখাপড়া বেশি শেখেন নি। কিন্তু এখনও এমন দুটি বিভাগ আছে যেখানে লেখাপড়া না করলেও উন্নতি করা যায়। এই দুইটি বিভাগ হচ্ছে যথাক্রমে পুলিশ ও রেডিও বিভাগ। ভদ্রলোক পালিয়ে দিল্লী চলে গিয়ে রেডিওতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি তাঁর মনোমত এক বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করেন। এরপর তাঁর এই বিভাগে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হতে থাকে। সম্প্রতি কালে দিল্লী হতে এই শহরের স্টেশনে তিনি বদলী হয়েছেন। মেয়েদের চোখ পুরুষ অপেক্ষা বহুগুণে সতর্ক। তাই শেষ পর্যন্ত উনি দিদিকে চেনেন নি, কিন্তু মৃতা দিদি ঠিক প্রথম দিনই তাঁকে চিনতে পারেন। এর শেষে বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করে ক্ষুণ্ণ মনে আমি এই হারানো মানুষ ক'টির জীবন সম্বন্ধে ভাবছিলাম। নতুন ধাঁচের গহনার প্রাবল্য পুরানো গহনাগুলি গেঁইয়া পদবাচ্য হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গিয়েছে যে, সেই পুরানো গহনা আবার আপন

গৌরবে ফিরেছে। এমন কি, তারা ঐ সময় এই নতুনদের অপাঙ্‌ক্তেয় করে তুলেছে। এক সময় দেখা যায় যে, মানুষ কমবয়েসী কনেকে পছন্দ না করে বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণে পক্ষপাতী হয়েছে। আবার কয়েক বছর পরে দেখি যে বয়স্কা বধূর জন্য খোঁজাখুঁজি করেছে। ঐ মৃতা নারীর ভাগ্যে যে সময় তার বিবাহ হয় তখন যুবকদের বয়স্কা বধূদের [কন্যা] উপর ঝোঁক পড়ে, কিন্তু আজ তাঁর এই পূর্ব মত হয়তো পরিত্যক্ত হয়েছে। তাঁর এই দ্বিতীয়া স্ত্রী হতে নিশ্চয়ই তিনি এখন শান্তি পান না। তা তিনি পেলে এমনভাবে বারমুখো হতেন না।

এই সকল সাক্ষী-সাক্ষিণীর বিবৃতির মূল্য এই মামলাতে বেশি নয়। কাল থেকে আমাদের পুরানো চোর ও পেশাদারী খুনেদের পিছনে ধাওয়া করতে হবে। তাই এদিকের আলতু-ফালতু কাজ আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। আমরা আর এখানে কালক্ষেপ না করে রেডিও অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। রেডিও অফিসে এসে ঐ কর্মকর্তাটিকে খুঁজে বার করি। আমরা তাঁর নিরালা ঘরে বসে তাঁর একটি বিবৃতি গ্রহণ করি। এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'সত্যি! আমার দু'দুবার বিবাহ হয়েছে। কিন্তু এ বিষয় আপনারা জানেন কি করে? প্রথম বিবাহের বিষয় আমার ভাসা ভাসা মনে পড়ে। আমার প্রথমা স্ত্রী এখন কোথায় তা জানি না। তাঁর সাথে বিবাহ হলেও কুশণ্ডিকা হয় নি। আজ্ঞে। আমার পারিবারিক সম্পর্ক এখন মর্মান্তিক কিন্তু এতো শতো আপনি জানেন কি করে। এক বয়স্কা শিক্ষয়িত্রীকে আমি বিবাহ করেছি। ছোট কন্যাকে বউ করে নিজেদের ভাবধারা দিয়ে নিজেদের মত করে নেওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বয়স্কা কন্যারা বাইরের বেনো জলের মত নিজস্ব চিত্ত প্রস্তুতি সমেত পরের ঘরে ঢুকে সেখানকার শান্তি নষ্ট করে। এই ভুল শুধরাবার কোনও উপায় নেই। সত্যি! একটা গহনা ক'দিন আগে পার্শেল যোগে পেয়েছি। ওর ভিতর এইরূপ লেখা ছিল—'এটা আশীর্বাদের দিন তোমার মা আমাকে দেন।' কিন্তু উহাতে প্রেরকের কোনও নাম-ঠিকানা নেই। এই উপলক্ষ্য করে আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে আজও কলহ হয়েছে। আজ্ঞে। একি আশ্চর্য বিষয় আপনি অবতারণা করলেন। আপনারা পুলিশ হলেও দৈবজ্ঞ হন কি করে? ঐ লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতজ্ঞা মহিলার উপর আমার দুর্বলতা কেন আমি সংগ্রহ করলাম তা জানি। তার সংযমশীল হাসির প্রতিটি কণিকা যেন ফুল হয়ে ঝরে পড়ে। আমার মনে হতো সে-ই বুঝি কতো যুগের আমার আপনার লোক। এই কয়েকদিন সে রেডিও অফিসে আসে নি। এটি একটা সামান্য ঘটনা হলেও এজন্যে আমার মন বারে বারে উতলা হয়। আমার মনে হয় তার কোনও শক্ত অসুখ বিসুখ হলো। তবে ঐ মহিলার সাথে আমার যা কিছু সম্পর্ক তা মানসিক। ঐ কঠিন চরিত্রা নারীর সাথে আমার দৈহিক সম্পর্ক ঘটে নি। আমার রেডিও-জীবনের অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারি যে কোন কিছু ঘটা বা না ঘটা নারীদের উপর একান্তরূপে নির্ভর করে। কিন্তু আমার বলতে বাধা নেই যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ বিষয়ে সে এতটুকুও দায়ী ছিল না।'

রেডিও অফিসের এই কর্মকর্তার বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করার পর তাঁকে তাঁর সংসার সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করি। তিনি এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর

দেন। তাঁর সাথে কথাবার্তাতে আমি বুঝি যে তাঁর জীবনে একই সাথে দুটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমি অবাক হয়ে ভাবি যে এই দুইটি দুর্ঘটনা তাঁর মত একজন সৎলোককেও এক সাথে সইতে হলো। আমাদের এতদ্‌সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—আপনার বর্তমান পারিবারিক অশান্তির বিষয় শুনে আমরা সত্যই দুঃখিত। আপনার গৃহের শান্তি অটুট থাকলে আপনার প্রতিভার আরও বিকাশ ঘটতো। এখন আপনি আমাকে বলুন যে, এই শহরের এক ধনী মল্লিকবাবুর এক কর্মচারী আপনার বাটীতে এত যাতায়াত করেন কেন? আমরা শুনেছি যে মল্লিকবাবু তাঁর এক ভগ্নীকে নামে মাত্র বিবাহ করেছেন। এই ধরনের ব্যক্তিদের সাথে আপনার স্ত্রীও বাইরে বেরোন। ওঁদের সাথে আপনাদের সম্পর্কটা একটু খুলে বললে ভালো হয়।

উঃ—ওহো! এইবার আমি বুঝতে পারছি যে সেই সব বিষয় আপনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমার বান্ধবী রেডিওর লব্ধ প্রতিষ্ঠ গায়িকা অমুকার নিকট হতে আপনারা এ সব শুনেছেন। উনি এ লোকটি সম্বন্ধে কয়বার মৌখিকভাবে আমাকে সাবধান করেছিলেন। লোকটা এমনিই ত বাড়িতে এসে এটা ওটা ফাই-ফরমাজ খাটে। আমাদের স্বামী স্ত্রীকে লোকটা খুব ভক্তি করে। আমাদের সাথে ওর কোনও স্বার্থের সম্পর্ক নেই। আজকে আমার স্ত্রী ওকে নিয়ে সকালে একটু মার্কেটে বেরিয়েছেন। কিন্তু এত বেলা পর্যন্ত ওরা ফিরলো না! তাই একটু দুশ্চিন্তাতে আছি এই যা—

প্রঃ—আমাদের খবর এই যে, আপনাদের স্বার্থহীন ঐ সেবকটি এই কয়দিনে আপনার সর্বনাশ সাধনের পথে বহু দূর পর্যন্ত এগিয়েছেন। আপনার সাথে আপনার এ বান্ধবীর মেলা-মেশার বিষয় তিনি আপনার স্ত্রীকে নিয়মিত জানিয়ে থাকেন। এইভাবে আপনার স্ত্রীর বিষাক্ত মন আপনার প্রতি তিনি আরও বিষিয়ে দিয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে, তাঁরা দু'জনে এ বাড়িতে আর নাও ফিরতে পারেন।

'আজ্ঞে! আপনারা ইতিমধ্যে দেখছি আমাদের সম্বন্ধে বহু সংবাদ সংগ্রহ করেছেন।' ভদ্রলোক অমুক বাবু একটু ম্লান হাসি হেসে উত্তর দিলেন, 'কিন্তু আপনার শেষোক্ত আশঙ্কাটি অমূলক। এত শীঘ্র উনি আমার ঘাড় হতে নিশ্চয়ই নামবেন না। তবে আমাদের ঐ বশংবদ লোকটি ওঁর বাহন মাত্র। আরও বড় খুঁটিতে ওঁর ভাগ্য বাঁধা। ওঁর যা করবার তা উনি বাড়িতে থেকে করতে চান। অমুকা দেবীর সাথে ওর নাম উঠাবেন না। এতে অমুকা দেবীর মর্যাদার হানি হতে পারে। যে করেই হোক আমাদের ঘরের সকল কথা যখন আপনারা জেনেছেন তখন লজ্জার খাতিরে এই বিষয়ে আপনাদের কাছে কোনও কিছু আর গোপন করলাম না। তবে আমার ঐ বান্ধবীর মতে এই সব যা কিছু তার দোষ তা সাময়িক। একটু সাবধানে এই সব সামান্য দোষ তার সেরে যাবে। আমার ঐ বান্ধবী কিন্তু সত্যই আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষিনী বান্ধবী।'

'হুম! আমি বুঝতে পারি যে আপনি অন্তরের সাথে ঐ মহিলাকে ভালবেসেছিলেন, আমি একটু ভেবে ভদ্রলোককে বললাম, 'তাহলে একটা দারুণ দুঃসংবাদ আপনাকে দিতে হয়। আপনার বান্ধবী ঐ ভদ্রমহিলা আর এ জগতে বেঁচে নেই। তিনি কোনও এক শত্রু কর্তৃক নিহত হয়েছেন। এতদ্‌ব্যতিরেকে আরও একটি তদন্তলব্ধ সত্য সমাচার আপনাকে

জানিয়ে দিই। ঐ মৃতা ভদ্রমহিলাই একদিন আপনার প্রথমা স্ত্রী ছিলেন। এটুকু আপনি না জানলেও আপনার বান্ধবীমন্যা ঐ প্রথমা স্ত্রীর তা জানা ছিল।'

আমার মুখ হতে এই দুঃসংবাদটি নির্গত হওয়া মাত্র—'এ্যাঁ! এই বলে তিনি একবার মাত্র চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। এরপর হঠাৎ একটা খট খট ধড়াম আওয়াজ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। সম্মুখের চেয়ারে এই ভদ্রলোককে আর দেখা যায় না। ঐ চেয়ার সমেত ভদ্রলোক এই খাস কামরায় ঢুকে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই ভদ্রলোক উঠে পড়ে ইশারায় সকলকে সরে যেতে বলেন। হঠাৎ মাথা ঘুরে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন, এখন তাঁর প্রেসার ভালো আছে—এই কথা কটি তাঁর মুখে শুনে জনতা শান্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করে। আমি স্তব্ধ হয়ে ভাবি, এই ভদ্রলোককে এবার আমি কি বলবো। কিন্তু আমাকে কোনও কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে ঐ ভদ্রলোকই আমার সাথে প্রথমে কথা কইলেন।

'স্যার! আশা করি তার মৃতদেহ আপনাদের পুলিশ-মর্গে এখনও রক্ষিত আছে', ভদ্রলোক এবার একটু শান্ত হয়ে আমাদের বললেন, 'আমার এই ধারণা সত্য হলে ঐ মৃতদেহ সৎকারের ভার যেন আমাকে দেওয়া হয়। আমার এই প্রথমা স্ত্রীর সৎকার ও শ্রাদ্ধের আমিই বোধ হয় একমাত্র অধিকারী। তার এই শেষ কার্য সমাধা করা আমার একটি পবিত্র কর্তব্য কর্ম। ভদ্রলোককে এই আকিঞ্চন মৃতা নারী জেনে যেতে পারে নি। সে বেঁচে থাকলে এই ইচ্ছা এঁর থাকতো কিনা বলা শক্ত। ভদ্রমহিলা বেঁচে থেকে যা পান নি, মরে তা তিনি পেয়ে গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে মৃতদেহ তখনও মর্গের বরফ-ঘরে রক্ষিত আছে।

pathagar.net

গোয়েন্দা কে?

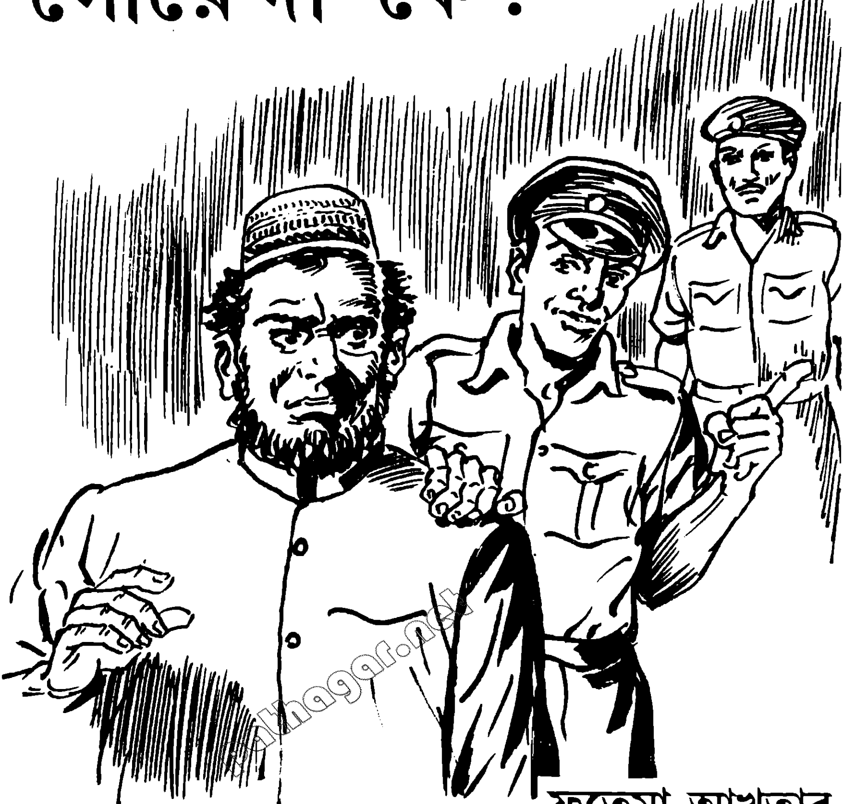

ফতেমা আখতার

প্রথম যে কে দেখতে পেয়েছে তা এখন আর কেউ স্বীকার করতে চায় না। দশ বারোটা বাড়ী নিয়ে একটা পাড়া সেই পাড়ায় থাকতো আলম মিঞা। একদিন সকালে তাকে দেখা গেল বিরাট চাতালের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মুখের একদিক কেউ বুঝি থেতলে দিয়েছে। রক্তে রক্তারক্তি মাথার কাছে জমাট বেঁধে আছে। চারিদিকে ভীড়ে ভীড়, সবার চোখ প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসছে, মুখ হাঁ হয়ে আছে, সামান্য দূরে বটগাছের নীচে কিছু সংখ্যক বয়স্ক লোকের জটলা—এই সর্বনাশটা কেমন করে হলো, কে এই ভাবে ছ্যামড়া টাকে শেষ করল। দেশে আর ভাল লোকের স্থান নাই...আরো কত কি, পুলিশের গাড়ী এসেই সবাইকে হটিয়ে দিল, টুপি মাথায় লম্বা লোকটিকে দেখে ইন্‌স্‌পেক্টর বলেই মনে হলো, হাতে লাঠি কোমরে রিভলবার। লাঠিটা উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কে প্রথম দেখেছে? ওপাশ থেকে কারো মুখ থেকে টু শব্দটি নেই। সকলেই বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে পুলিশের দিকে।—কি হলো জবাব দিচ্ছ না কেন। ওর বাবা মা কোথায়? তবুও কোন সাড়া শব্দ নেই। দেখে মনে হবে এরা কোনদিন কথাই বলতে শেখেনি! ধমক

দিয়ে আবারও বলল—কি হলো চুপ করে আছ কেন? জবাব দাও। ভীত বিহ্বল জনতার মধ্য থেকে একজন প্রবীণ পাশে দণ্ডায়মান একটি মহিলাকে বলল—আলমের মাকে ডাইক্যা দে। পুকুরের ধারে আছড়ে আছড়ে পড়ছিল, আলমের মা একমাত্র সন্তান, বুকের ধন, কে তাকে এমন ভাবে মারলো। কি করেছিলো—তার ছেলে? সকাল বেলায় চারটি মুখে দিয়ে মাঠে যায়, ফেরে সেই বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে সন্ধ্যে। দুপুরে একবার আলমের মা যায়, ছেলেকে খাবার দিতে। কার সাধ্য আলমের মাকে নিয়ে আসে ; একটু পরেই ভ্যানে করে সেখানে উপস্থিত হলো যে ব্যক্তি তাকে দেখে পুলিশের বড়বাবু হন্তদন্ত হয়ে সামান্য এগিয়ে এসে বলল—স্যার আপনি? আপনি খবর পেলেন কি ভাবে? কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না আগত অতিথি। ভ্যান থেকে নেমে সটান চলে এলেন মৃতদেহের সামনে, হাঁটুমুড়ে বসে অনেকক্ষণ কি যেন দেখলেন। চারিদিকে আশ্চর্য শান্ত এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে যারা জটলা করছিল তারাও ভীড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে গলা বেঁকিয়ে দেখতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর আগত অতিথি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলল, বাঁচাতে পারলাম না লোকটাকে। যাই হোক, ইন্সপেক্টার আপনি আমার সাথে চলুন...কোথায় স্যার? বিরক্ত হলেন আগত অতিথি—এই আপনাদের দোষ কাজের আগে হাজার প্রশ্ন ; আমতা আমতা করে থানার বড়বাবু বলল—মানে স্যার চলুন গাড়ীতে যেতে যেতে বলছি।

দুজন কনেষ্টবলকে মৃতদেহের সামনে নিযুক্ত রেখে বাকি সবাই জীপে উঠে পড়লেন।—এই ছেলেটি খুন হবে আমি জানতাম। আফশোস হচ্ছে বাঁচাতে পারলাম না। হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। আমরা এখন যাচ্ছি শহরের খ্যাতি নামা এক ব্যবসায়ীকে ধরতে। থানার বড়বাবু মিন মিন গলায় জিজ্ঞাসা করল—স্যার আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?—কে স্যার।—মনসুর আলী খান। থানার বড় দারোগার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এলো—সে কি স্যার, আপনি কি বলছেন? আমি ঠিকই বলছি, গরীব চাষীদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে জমি আদায় করাই ওর কাজ। কত যে গরীব চাষী এর শিকার হয়েছে, গুনে শেষ করা যাবে না। হাই অথরিটি থেকে আমাকে তদন্ত করতে পাঠিয়েছে, আমি অনেক কষ্টে মনসুর আলী খানের বাড়ীতে চাকরের কাজ যোগাড় করেছিলাম আমি আড়াল থেকে সব শুনছিলাম। মাত্র পাঁচশত টাকার বিনিময়ে ওর ঐ জমিটা নিয়ে নিতে চায় ঐ পিচাশটা। প্রথমে কথা কাটাকাটি তারপর হুমকি। অবশ্য আমি সব টেপ করে রেখেছি। আমি ভাবতেও পারিনি, ঐ সময়ের মধ্যেই ঐ নর পিচাশটা তার পোষা কুকুরদের ইঙ্গিত করবে ওর কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে শেষ করে দেওয়ার জন্য। কথা বলতে বলতে ওরা চলে এলো 'হ্যাপী ভিলায়' বিরাট বড় বাংলো, মনসুর আলী খান, সবে মাত্র গাড়ীতে উঠেছেন, গাড়ী ছাড়ার আগেই থানার বড়বাবু আর চারজন কনেষ্টবল অ্যারেষ্ট করলেন শহরের নামী ব্যবসায়ীকে। ভ্যানে সবাই উঠে পড়ল, শুধু দাঁড়িয়ে রইল এই ঘটনার তদন্তকারী থানার বড়বাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—স্যার আপনি যাবেন না? মৃদু হেসে তদন্তকারী বললেন—না, আপনারা চলে যান। ভ্যান চলতে শুরু করলে এক কনষ্টেবল বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্যার উনি কে? ওয়ার্ল্ড ফেমাস ডিটেকটিভ মিঃ কে ডি খান।

কে যেন

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

ঘটনাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি।

সব শুনেছিল সব জানত বলবীর সিং আগে থেকেই। তবু কেন যে কারো কথা মেনে নেয়নি, প্রত্যক্ষদর্শীদের কোন বিবরণ বিশ্বাস করতে পারেনি—তা নিজেও বোধহয় ভেবে দেখেনি একটি বারও। দেখলে একটা নিদারুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হত না কখনো। হয়তো রক্ত জল করা ভয়ংকরের হাতছানির কবলে গিয়ে পড়তে হত না।

পড়তে হল বলবীর সিং-এর নিজেরই গোঁয়ার্তুমির জন্য। কিন্তু তখন নিরুপায়। বিভীষিকার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে আটকে পড়েছিল সে। বেরুবার পথ খুঁজে পায়নি কোন দিক দিয়েই। বেরুতে চেষ্টা করেছে, পালাতে চেষ্টা করেছে, মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছে। পারেনি সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তার। বাঁচবার জন্য প্রাণপণে খুঁজেছে কত না। এক পা পিছু হটতে গিয়ে মৃত্যুর গহ্বরের দিকেই এগিয়ে গেছে আরো পা পা।

নিয়তির আকর্ষণের মতো একটা অশুভ আকর্ষণ যে ধীরে ধীরে খেলিয়ে নিয়ে আসছিল নিজের খপ্পরে ফেলবার জন্য—প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি মোটে। ভয়ত্রাস

মনের কোণে উঁকি মারেনি একবারও। আঠারো বছরের বলিষ্ঠ তরুণ বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই চলেছে। হাসিখুসি মানুষটা সঙ্গীদের সঙ্গে হাসি-মস্করা করতে করতে চলেছে পাহাড়ী পথ মাড়িয়ে চড়াইয়ে উঠে উড়ছে রাইয়ে নেমে। সময় সময় আত্ম-প্রত্যয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে সারা মুখখানায়।

গভীর খাদের ধার দিয়ে নির্ভীক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। আবার কখনো বন্ধুদের হাত ধরে টানাটানি করছে তাকে অনুসরণ করে চলতে। খাদের দিকে তাকিয়ে সভয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে বন্ধুরা। একটু ঊনিশ-বিশ হলে, পা ফস্‌কে গেলে রক্ষে নেই আর। কোন্ অতল তলে যে তলিয়ে যাবে তার হদিস পাবে না আর জীবনে কেউ। বন্ধুদের অনেকে বলবীরের কাছ থেকে ছুটে পালায় দূরে—অনেক দূরে।

হো হো করে হেসে ওঠে বলবীর সিং। কেঁপে ওঠে ওর দীর্ঘ দেহ। কেঁপে ওঠে পাহাড়-বন। কাঁপন ধরে কাছের বন্ধুদের বুকের তলায় তলায়। হাসিটা ভালো লাগছে না একদম। বিচ্ছিরি রকমের। হাসি দেখে মানুষের হাসি পায়, কিন্তু এ হাসিতে একটা কান্নার সুর বেজে উঠেছে তাদের কানে।

পথের ভয় মনের ভয় ঘোচাবার জন্য যে হঠকারিতা করছে সে, যে আত্মম্ভরিতা দেখাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, মানুষটা বুঝি কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। আরো হ'য়ে উঠেছে তার আচার-ব্যবহারে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। একটা উন্মত্ত ভাব পেয়ে বসেছে ওকে। এই উন্মত্ততাই তাদের ভয় সরাতে ভয় ধরাচ্ছে বেশী করে। গুরুজনদের আদেশ নির্দেশ অগ্রাহ্য করছে। যে রাস্তায় পা বাড়াতে নিষেধ, জঙ্গল খাদের যে দিক দিয়ে যেতে একেবারে বারণ—ইচ্ছে করেই ও সেই রাস্তায় সে দিক দিয়েই যাচ্ছে। এ জিদের ফলাফল ভালো হবে না। হতে পারে না জানা কথাই। তবু অবাঞ্ছিত অলক্ষণকে ডেকে আনবার জন্য ও যেন খুব তৎপর হয়ে উঠছে।

অদৃশ্যলোকের এক আজানা দুর্দান্তমন দারুণ প্রভাব বিস্তার করছে বুঝি বলবীর সিং-এর মনের ওপর। কেমন ঠেকছে ওকে। পরিচিতদের কাছে ও অপরিচিত। অন্য দুনিয়ার অন্য মানুষ। বন্ধুদের চোখে ক্রমে মূর্তিমান ত্রাস হয়ে উঠতে লাগল বলবীর সিং।

যে ক'জন কাছে ছিল, তাদের অভয় দিতে গিয়ে অতি দুঃসাহসী ভাব দেখাতে গিয়ে কাল হল বলবীর সিং-এর। নানা অজুহাত দেখিয়ে এক এক করে সরে গেল তারা। অন্য পথ ধরল। পিতৃদত্ত জীবনটা তারা বেঘোরে খোয়াতে পারবে না।

সকলকে চলে যেতে দেখে বলবীর সিং ফেটে পড়ল রাগে। ফর্সা লোকের মুখখানা দিয়ে রক্ত ফেটে বেরোয় আর কি! বিকৃত স্বরে চিৎকার করে বলে উঠল—যে ভয়ের জন্য তোরা সব পালাচ্ছিস সেই ভয়েই ধরবে তোদের দেখিস। বুকে হাত চাপড়েছিল।—এ বান্দা তোদের আগেই গাঁয়ে ফিরে যাবে বহাল তবিয়তে। যত সব ডরপোক—ভীতুর দল।

ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে চলার মোড় ঘুরিয়ে দিল বলবীর সিং। আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগল। যারা ছেড়েছে ওকে তাদের যেন হাড় পাঁজরা মাড়িয়ে দলে পিষে-দিয়ে চলতে লাগল।

মনে উদ্ধত ভাবটা পেয়ে বসলে দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকে না। ঘোলাটে ধোঁয়াটে হয়ে যায়।

বিভ্রান্তির মোহে আচ্ছন্ন মনে তখন ভুল দেখা ভুল পথে চলা ভুল বোঝা সবই ঠিক ঠিক মনে হয়। বলবীর সিং-এর হয়েছিল তাই। সে যা কিছু ভাবছে ঠিক। যা কিছু বুঝছে ঠিক। যে পথে চলেছে সে পথটাও ঠিক।

এই মনগড়া সব ঠিকই বেঠিক হয়ে গেছল বলবীর সিং-এর শেষ পর্যন্ত।

দুপুর রোদ্দুরের প্রখর তেজটা কমেছে তখন। বিকেলের ছায়া স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা মিঠে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বলবীর সিং-এর মনে মুখে খুশির আমেজ। একা চলার মুক্তিস্বাদ জীবনে পেয়েছে এই প্রথম। এই প্রথম যেন নতুন আনন্দের দুনিয়ায়। একবারও মনে হচ্ছে না সে একা। মনে হচ্ছে সে অনেক। একাই একশো।

পাহাড়-বনের জন্তু-জানোয়ার গাছ-গাছালির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। আমগাছটার তলায় ঝরণার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল খানিক। তরতরিয়ে চলেছে ঝরণার ফটিক জল। ঝরণার ধার ধরে পাহাড় বেয়ে বেয়ে তরতরিয়ে নামতে লাগল সেও। জলে ভর্তি ডোবাটার কাছে এসে হাঁটু মুখে বসে পড়ল। দু'হাতে আঁচলে আঁচলে জল তুলে মাথায় মুখে দিতে লাগল। খেতে লাগল।

হাসছে বলবীর সিং। জল খাবার সঙ্গে সঙ্গে নাকি মাথা টলে। গা ঝিম ঝিম করে। চোখে ধোঁয়া দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। হুঁশ ফিরে আসে না আর কখনো কারো। সব ভুল। সব মিথ্যে। ভয় দেখানো স্রেফ। এ-জলে মৃত্যুবিষ নেই। তার প্রমাণ বলবীর সিং বেঁচে রয়েছে। পায়ের চাপে শুকনো ডালপালা ভেঙ্গে যাওয়ার মড়মড় আওয়াজে তাকাল সে ফার্ণ গোল্ডেন-রড গাছগুলোর দিকে। হয়তো কোন বন্ধু তাকে নিয়ে কৌতুক করবার জন্য এইভাবে শব্দ করছে। তাকে ছেড়ে দিয়েও গাছের আড়ালে ছায়ার মত অনুসরণ করছে।

ভুল ভাঙল। গাছগুলোর কাছে এসে ফাঁকে চোখ রেখে রেখে কোন লোককে দেখতে পেল না সে। দেখতে পেল কেবল মখমল-মসৃণ শিং নাড়তে নাড়তে পশ্চিম দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে একটা শম্বর। শম্বরটা যে খুব ভয় পেয়েছে, ওর আকাশ ফাটানো চিৎকারে তা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। ওর চিৎকারের সঙ্গে নীলরাঙা ম্যাগপাই পাখি দুটোও গলা মিলিয়ে ভয় ধরানো চিৎকার করছে।

এদের এ-ভাবের চিৎকারের পিছনে দৌড়ানোর পেছনে, ওড়ার পেছনে যে একটা সত্যি ভয়ের কারণ আত্মগোপন করে থাকে, পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা ভালো রকমেই জানে বলবীর সিং। অন্য সময় হলে সে-ও ভয় পেত। আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় খুঁজতে দৌড়াদৌড়ি করত দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। সে জানে, এই দৌড়াদৌড়ির ফলেই অনেকে বাঁচতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছে। আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও একই দশায় পড়তে হয়েছে কাউকে কাউকে।

এসব জানা সত্ত্বেও, শম্বর-ম্যাগপাই-এর অলক্ষুণে চিৎকার শুনেও ঘাবড়াল না বলবীর সিং। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে নির্দ্বিধায় চলতে শুরু করে দিল আবার। একটা অজানা অফুরন্ত আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে তার ভেতরে। সে বীর। নামে যেমন প্রকৃতিতেও তেমন। এই থকগাঁয়-এর মধ্যে তার সমকক্ষ নেই আর কেউ।

মনে মনেই নিজের গর্ব-অহঙ্কারের তারিফ করতে করতে বলবীর সিং-এর বুকখানা

pathagar.net

ফুলে দশহাত হয়ে উঠতে লাগল যেন। নিজেকে খুব আশ্চর্য ঠেকল ওর। কেমন করে কোন্ যাদুমন্ত্রের প্রভাবে হঠাৎ এরকম হয়ে গেল ও। আগেকার মনটা অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে একেবারে। মনে হচ্ছে সে সকলের চেয়ে জ্ঞানী। সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান। ভয় ডর তার জন্য নয়। দুর্বলদের জন্য, অজ্ঞানীদের জন্য।

ইচ্ছে করেই কাঁটা ঝোপের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে দেখতে চলতে লাগল বলবীর সিং। কোন কিছু লক্ষ্যে পড়ে কি না। খারাপ কিছু পড়ছে না ওর চোখে। খারাপের ভিতর সৌন্দর্যের পসরাই দেখছে ও।

মাথার ওপর ম্যাগপাই পাখি দুটো একনাগাড়ে উড়তে উড়তে চলেছে। শম্বরটা ওপাশ দিয়ে ওর সামনে এসে পড়ে আবার দৌড়তে শুরু করল প্রাণপণে। এরা সাধারণতঃ হিংস্র প্রাণঘাতী বাঘ বা অন্য জন্তুর আবির্ভাবেই এই রকম করে থাকে। এসব জানা-কথা বলবীর সিং-এর মনের কোণ থেকে মুছে গেছে একেবারে। মৃত্যুর হয়তো মাদকতা আছে একটা। ম্যাগপাই-এর নীলরঙে বলবীর সিং-এর চোখে নেশা লাগছে। তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। দু'চোখে ঘুম নামছে বুঝি।

এইভাবে আচ্ছন্নের মতো কতক্ষণ চলেছিল, কতক্ষণ কেটেছিল, তার কোন খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল একটা হিমেল বাতাসের ঝাপ্‌টা লেগে গেল সর্বশরীরে। সচেতন হয়ে উঠল বলবীর সিং। দু'হাতের তালু ঘষে ঘষে গরম করতে লাগল। বুকের তলায় রক্তটা বুঝি জমাট বেঁধে যাবে এক্ষুনি। সর্বাঙ্গে রক্ত চলাচলের জন্য পাহাড়ের ফাটল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দৌড়তে লাগল।

হঠাৎ পুব দিকে তাকিয়েই যেন কেমন হয়ে গেল বলবীর সিং। নেপাল পাহাড়ের পেছনে সূর্য ঢলে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে না। রক্ত লালে লাল হয়ে উঠেছে আকাশটা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটু। যতখানি দৃষ্টি যায় চক্কর দিয়ে এল দু'চোখ।

ভয় ধরছে ভেতরে। দিশেহারা হয়ে পড়েছে। গাঁও-ডেরায় ফেরবার পথ থেকে একদম অন্য পথে সরে এসেছে। সঙ্গীদের সঙ্গ ছেড়ে বেকুবি করেছে বেশ বুঝতে পারছে। এতক্ষণ যেন একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। স্বাভাবিক মানুষে ফিরে এসেছে আবার বলবীর সিং। জন-মানবশূন্য পাহাড় বনভূমিতে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রমাদ গুনছে। কি করবে, কোথায় যাবে, কোথায় আশ্রয় পাবে ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছে না।

অলক্ষ্যে থেকে একটা অশুভ ছায়া যখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে তখন মানুষের অনুভূতি একটা অজানা আশঙ্কার আঁচ পায়। কেন পায় তা কেউ জানে না। কিন্তু তবু পায়। এক্ষত্রে বলবীর সিংও সেই আঁচ পেতে লাগল বুঝি। মৃত্যুর বিভীষিকা অনুভূতির স্তরে স্তরে জেঁকে বসতে লাগল তার। বেরুবার সময় মা-বাবার ফিরতে বারণ করার কথাগুলো বারবার কানে বাজতে লাগল। দেরী হলে ফিরো না। সঙ্গীদের কাছ ছাড়া হবে না মোটে। যে-ই বেপরোয়া হয়েছে, তারই বিপদ ঘটেছে। অনেক সময় অনেককে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে—

মায়ের সজল দু'চোখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে কেবল বলবীর সিং-এর।

বাড়িতে ফেরবার পথ দেখতে পাচ্ছে না চোখের সামনে। যেখান থেকে আসছিল,

সেই টনকপুকুরে বাজারে ফিরে যাবারও পথ দেখতে পাচ্ছে না। পেলেও কোন জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব নয় সন্ধ্যের আগে। সন্ধ্যে নামছে। অন্ধকারে যেন আলোর ক্ষীণ রেখা দেখতে পেল বলবীর সিং। পূর্ণিমা হয়ে গেছে সবে দু'দিন আগে। চাঁদ উঠবে খানিক পরে। জ্যোৎস্না ঝরে পড়বে আকাশ থেকে। পাহাড়ী ছেলের পাথুরে রাস্তায় চলতে অসুবিধে হবে না। জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে চলতে পারবে।

কিছুক্ষণ পর সামান্য একটু ক্ষয়া চাঁদ উঠল আকাশে। খুব সচেতন হয়ে চলছে বলবীর সিং। বাঁচবার আকুলি বিকুলিই তাকে ঠেলে ঠেলে চালাচ্ছে। বলবীর সিং তার ভীতসন্ত্রস্ত মন আর ক্লান্ত দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারছে না আর।

জাম বনটাকে পাশ কাটাতে গিয়ে আচমকা ও কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল স্পষ্ট। চমকে উঠল মুহূর্তে—কি যে হয়ে গেল কিছু বুঝে উঠতে পারল না। প্রাণভয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সামনের দিকে।

বেশ বুঝতে পারছে, জাম বনের আড়ালে তার পা ফেলার সমান তালে তালে পা ফেলে তাকে অনুসরণ করে দৌড়চ্ছে অন্যজন। সময় সময় মনে হচ্ছে যেন একখন নয়, আরো কেউ কেউ আছে। একসঙ্গে অনেকের পায়ের শব্দ। এত পায়ের শব্দের কথা শোনেনি, এখানের ভয়াবহ কাহিনী শোনার সময়। হয়তো মনের ভ্রম। ভয় থেকে উৎপত্তি। একটু একটু করে সাহস ফিরে পাচ্ছে আবার। বোধহয় শোনা কথাই সন্ধ্যে নামতে মনের কানে প্রতিশব্দ হয়ে বেজে উঠছে নিজেরই পায়ের শব্দ। এইভাবেই মনের চোখে এবার শোনা কথারই অনেক রূপ দেখতে পাবে। পূর্ণমাত্রায় মনের সাহস বজায় রাখতে এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে বলবীর সিং পথ চলতে লাগল।

খানিক যেতে না যেতেই আবার একটা ধাক্কা খেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না প্রথমে। দু'হাতে চোখ রগড়ে নিল বার বার। না, মনের ভুল নয়, চোখের ভুল নয়। যা দেখেছে সত্যি। তবে এ দেখা যে একেবারে দ্বিধাসংশয় মুক্ত তা নয়। যাকে দেখছে, সে শরীরী না অশরীরী—কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছে। জায়গাটা সম্বন্ধে বহু রকমের ঘটনা অনেকেরই কানে কানে হেঁটে বেড়ায় প্রায় সব সময়। সম্পূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েও অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই মাটিতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে কেউ কেউ। ওদের অতৃপ্ত আত্মাই আসে নাকি এখানে। ঘুরে বেড়ায় নাকি পাহাড়ের চুড়োয়, খাদে, বনে-জঙ্গলে গাছের ছায়ায় ছায়ায়।

এসব মেনে নেয়নি কোনদিন বলবীর সিং। বিশ্বাস করে নি। কিন্তু এই মুহূর্তের পরিবেশ পরিস্থিতিতে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। সাহসের ভিতে বিশ্বাসের ফাটল ধরছে।

জাম বনটা পেরিয়ে এসেছে। এদিকটা বেশ ফাঁকা। একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের ব্যবধান অনেকখানি। গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে রেখে চলতে গিয়ে ছায়ামূর্তিটা বালিমাটির বুকে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে অন্য গাছের গুঁড়ির আড়ালে এসে পৌঁছচ্ছে। বুকটা কেঁপে উঠল বলবীর সিং-এর। এ যেন শিকারীর শিকার ধরবার প্রস্তুতি চলছে। ছায়ামূর্তি তাকে নজরবন্দী করে রেখেছে বেশ বুঝতে পারছে।

অশরীরী নয়, ও শরীরী। অশরীরীদের কুলুজিতে একটা গাছ থেকে আর একটার ব্যবধান পূরণ করতে দেরী লাগে না একটুও। চোখের পলক পড়ার আগেই কার্য সমাধা

হয়ে যায়। কিন্তু এখানে হামাগুড়ি দিয়ে পূরণ করতে হচ্ছে। এ ছায়ামূর্তি নির্ঘাত মানুষ চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, মিশ-কালো বীভৎস দর্শন মানুষটা শেষ গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। এরপর আর গাছ নেই খানিক দূর পর্যন্ত। হয়তো মাথায় নতুন কিছু মতলব আঁটছে বলেই তার চলার পথে অনুসরণ করছে না আর।

করবে না যে এমন কোন কথা নেই। হঠাৎ ঝাঁপিয়েও পড়তে পারে তার ওপর। পড়লে সেও ছেড়ে কথা কইবে না যত শক্তিই ধরুক না কেন লোকটা, মস্ত সুবিধে—একা। ওকে ঘায়েল করতে অসুবিধে হবে না কোন। ঠাকুরদার রক্ত বয়ে যাচ্ছে বলবীর সিং-এর ধমনীতে, শিরা-উপশিরায়। জঙ্গলে বাঘের খপ্পরে পড়ে গেছল একবার ঠাকুর্দা। তার মতো সঙ্গীরা পালিয়ে গেছল ওকে ছেড়েও। বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়বার মুখেই ধারালো টাঙি নিয়ে আক্রমণ করেছিল ঠাকুর্দা। শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দার হাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়েছিল বাঘটার।

যাকে দেখল, সে এদেশের নয়। রঙে চেহারায়ই মালুম হচ্ছে গুজব—কিছুদিন হল এসেছে এখানে। একজনকে দেখলেও—শুনেছে, আরো নাকি অন্য অন্য লোক আছে এদের দলের চারিদিকে ছড়ানো। লোকগুলো বাঘের চেয়ে নাকি হিংস্র। দেরী হলে তবুও বাঘকে মারতে পারা যায়। কিন্তু এদের ব্যাপারে কেউ কিছুই করতে পারছে না। বছর খানেক ধরে ওদের ধরবার জন্য চেষ্টা চলছে দারুণভাবে। সমস্ত ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ওরা পথিকের সর্বস্ব লুঠ করে নেয় মওকা বুঝে। কেউ বাধা দিলে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

ও হেন দুর্বৃত্তদের হাত থেকে ধন-প্রাণ বাঁচবার জন্যই কতকগুলো এলাকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব এলাকার ধারে কাছে লোকের কথায় অবিশ্বাস করার ফল হাতে হাতে ফলতে বসেছে। তার প্রমাণ সাক্ষাৎ যমদূত দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছতলায়।

মির্জাই-এর তলায় কোমরের কাছে হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে নিল ভালো করে। কোমরে জড়ানো টাকার থলিটা পাক দিয়ে শক্ত করে ঠিক বাঁধা আছে। ডানদিকে ভোজালিটাও ঠিক আছে। ভোজালিটার ওপর হাত রেখে চলছে। এ-পথে এ-সময় এটাই একমাত্র সম্বল।

চোখ কান বুদ্ধি সজাগ রেখেই চলছে বলবীর সিং। চতুর্দিকে তাকাচ্ছে। বিশেষ করে পেছনে। লোকটা এখনো দাঁড়িয়েই আছে একভাবে। কিন্তু এর মুখটা ঘুরছে ফিরছে তার চলার গতির সঙ্গে সঙ্গে।

ম্যাগপাই পাখি দুটো এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে। আচমকা এসে মাথার ওপর দিয়ে চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বিকৃত স্বর পাহাড় বনভূমি কাঁপিয়ে তুলে দু'কানের পরদা ফাটিয়ে দিল যেন। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে মানুষটা। ছুটে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ডানপাশ ফিরতেই বুক টিপ টিপ করে উঠল আরো। প্রথম জনের মতো ওই রকম চেহারায় আর একজনও ছুটে আসছে ওদিক থেকে।

বুঝতে আর বাকি রইল না বলবীর সিং-এর—বিকৃত স্বরের চিৎকারটা কিসের ইঙ্গিত। একজন শিকারী আর একজনকে কাছে ডাকল। শিকার ফাঁদে পড়ে গেছে। ফাঁদ থেকে

pathagar.net

যাতে বেরুতে না পারে—ভালোভাবে শব্দ করে আটকে ফেলতে হবে ঘিরে ফেলে।

সম্মুখ সমরে একজনের সঙ্গে লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল বলবীর সিং। এখন দেখছে দুজন। আরো কাছে কিনা, তাই বা কে জানে। এখানে যদি হারিয়ে যায় বলবীর সিং—কেউ কোন দিন জানতেও পারবে না কি করে কোন্ খানে হারাল সে।

জানছে এ মরণফাঁদ থেকে উদ্ধার হবার কোন উপায় নেই আর তার তবুও খাপ থেকে ভোজালিটা বার করে নিল তাড়াতাড়ি। টনকপুর বাজারে বাদাম-কমলালেবু বিক্রির টাকার থলিটায় হাত বুলিয়ে নিল একবার তাকে শেষ না করে কোমর থেকে খুলে নিতে পারবে না ওরা এটা। জীবন থাকতে সে এটা নিতে দেবেনা ওদের কিছুতেই। এইটাকা থেকেই তাদের পরিবারের জীবন চলে। এ টাকা মায়ের জীবন, ভাই-বোনদের—সবার।

দাঁড়িয়ে পড়ল বলবীর সিং। লোক দুটো তার কাছ বরাবর এসে থমকে গেল। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ইঙ্গিতে কি যেন নীরবে বলল একজন আর একজনকে। তারপর যে ভাবে ওরা এসেছিল সেইভাবেই ছুটতে ছুটতে চলে গেল আবার সেই পথ ধরেই।

দেখছে বলবীর সিং ডাইনে বাঁয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। চলে যাচ্ছে ওরা দু'জনে দু'দিকে। ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। শিকারকে গ্রাসের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে চলে যাওয়া কেমন করে সম্ভব? বলবীর সিং নিজের ডান হাতের শক্ত মুঠোয় ধরা ভোজালিটার দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় বেশ চক্ চক্ করছে। এতে ভয় পেয়ে চলে যাবার কারণ নেই ওদের, ওদের দুজনের হাতের ভোজালিও তার লক্ষ্য এড়ায়নি। এর চেয়ে ঢের বেশী বড়। ঢের বেশী চকচকে। হঠাৎ নিচের দিকে নজর পড়তেই শিউরে উঠল বলবীর সিং। পায়ের তলায় দু'পাশে আর এক মৃত্যু-ফাঁদ—গভীর খাদ। চৌকোনা পাথরটার একটা কোণের সামান্য অংশ পাহাড়ের একটা দিকে ঠেকে আছে মাত্র। বাকি তিন দিক ফাঁকা। শূন্যে ঝুলছে। এই জন্যেই শিকার ছেড়ে চলে গেছে শিকারীরা। শিকার ধরতে গিয়ে তাদের নিজেদের হারবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। দুর্বৃত্ত হয়েও নিজেদের প্রাণের মমতা থেকে এক পাও সরেনি ওরা। অপরের প্রাণ নেওয়া যাদের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার, নিজের প্রাণ দেবার সময় তারাই আবার অতি ভীরু।

এবারে বাঁচবার পথ খুঁজে পেয়েছে বলবীর সিং। এই খাদের ধার দিয়ে দিয়ে খপ্পর থেকে বেরুবার চেষ্টা করবে সে। বেরুতে পারবে নিশ্চয়ই যেখানে যেখানে খাদ, সেখান দিয়েই চলবে। অতি সন্তর্পণে বসে বসেই পাথরটা থেকে নেমে পড়ল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে চলতে শুরু করল আবার।

চলছে তো চলছেই। এবার কারো পায়ের শব্দ পাওয়া যাবে না কোন দিক থেকেই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ওকে ছেড়েছে দুর্বৃত্তরা তাহলে সত্যিই।

অনেকটা পথ এসে গেছে। ম্যাগপাই পাখি দুটো আবার মাথার ওপর দিয়ে দিয়ে চিৎকার করতে করতে চলে গেল। দুর্বৃত্তরা ছেড়েছে তাকে কিন্তু এরা তো কিছুতেই ছাড়ছে না। এখানে আসার শুরু থেকেই মাঝে মাঝে ওই দুটো তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে। হঠাৎ হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভাব হচ্ছে কে জানে? চিৎকার করে যেন একটা বিপদের সংকেতই জানিয়ে যাচ্ছে। এ ধারণাটা এর আগে হয়নি। কিন্তু

মহা আশ্চর্য, এখন তোলপাড়া করছে ভিতরে। একটা আশ্রয় একটা বিশ্বাসী মানুষকে পাবার জন্য বড্ড ছটফট করছে মন। ছুটতে ইচ্ছে করছে খুব। ছুটছে ছুটছে ছুটছে। সামনে কুঁড়ে ঘর দেখে ধরে প্রাণ এল যেন। লোকালয়ের কাছে এসে পড়েছে এবার। আর ভয় নেই।

কুঁড়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আধ ভেজানো দরজার পাল্লায় টোকা মেরে আওয়াজ করল। কোন সাড়া পেল না ভেতর থেকে। আস্তে আস্তে ঠেলতে খুলে গেল দরজা। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে দক্ষিণদিকের ভাঙা জানালা দিয়ে। ঘরের মাঝখানে চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার। ঘরে কেউ নেই। এটা একটা পোড়ো ঘর। ভেতরে ঢুকলে বলবীর সিং। অবসন্ন হয়ে পড়েছে খুব। রাতের মতো নিজেকে লুকিয়ে রাখবার, মাথা গোঁজবার যে একটা জায়গা পেয়ে গেছে—এটাই মস্ত ভাগ্যের জোর তার।

ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জানলার দিকে গিয়ে বসল—একটু বিশ্রাম করবার জন্য। রাতে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বৃথা পথ খুঁজে হয়রান হওয়ার চেয়ে এই আশ্রয়টুকু যথেষ্ট নিরাপদ। সকালে রাস্তা খুঁজে বার করা সহজ হবে।

ঘুমে দু'চোখ ঢুলে আসছে বলবীর সিং-এর, মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তাঁর করুণার জন্য—আশ্রয় মিলিয়ে দেবার জন্য। ঈশ্বরের স্মরণে বাধা পড়ল, ঘুম মাথায় উঠল পিঠে মাথায় গরম নিঃশ্বাস পড়তে।

পেছন ফিরে তাকাল। জানালার ভাঙা খুপীটায় একটা ছোট্ট মুখ আটকে রয়েছে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে ন'দশ বছরের ছেলের মুখ ওটা। ছেলেটার সর্বশরীর দেখে মনে হয় ও খুব হাঁপাচ্ছে। মুখ দিয়ে নাক দিয়ে জোর নিশ্বাস নিচ্ছে ছাড়ছে। বাইরের থেকে ভাঙা খুপীটায় মুখটায় বলবীর সিংকে এক দৃষ্টে দেখছে। চোখের জল পড়ছে না।

boiharanet

ছেলেটাকে দেখে খুব আনন্দ হল বলবীর সিং-এর। মানুষের মুখ দেখতে চেয়ে ছিল। প্রকৃত মানুষের মুখ দেখতে পেয়েছে সে। এ যেন ঈশ্বর প্রেরিত দেবশিশু। চোখ পড়তে ফিক্ করে হাসল ছেলেটি। বলল—তুমি কি ভয় পেয়েছ?

ঘাড় নাড়ল বলবীর সিং—না পায়নি।

হেসে উঠল জোরে ছেলেটি, তোমার সঙ্গে আছে কেউ?

আবার ঘাড় নাড়ল বলবীর সিং—না কেউ নেই।

আমি কি তোমার কোনও সাহায্য করতে পারি?

কচি গলায় ভরসা দেওয়ার কথা শুনে ছেলেটাকে সাক্ষাত ঈশ্বর ভেবে বসল বলবীর সিং। তাকে উদ্ধার করতে এসেছেন স্বয়ং।

নিজের বিপদের কথা জানাল বলবীর সিং ছেলেটিকে। অনুরোধ করল তাকে উদ্ধার করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে। ছেলেটি এদিক ওদিক তাকাল। কি যেন দেখল কি দেখে হাসল। তারপর হাসিমুখেই ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে। লোক নিয়ে এসে নিয়ে যাচ্ছি তোমায়।

দৌড়ে চলে গেল ছেলেটি। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে দু'জন লোক! কারা এল, তাদের দেখে কাঁপুনি শুরু হল ভেতরে। এরা বলবীর সিং-এর অজানা অচেনা নয়। ভেবেছিল, ওরা পালিয়ে গেছে, তাকে ছেড়েছে।

তার ধারণা ভুল। পালানোটা ওদের মস্ত কৌশল। শিকারের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে তাকে খেলিয়ে খেলিয়ে নিজের কঠিন ফাঁদে আটকে ফেলা।

এবার এদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যু তার। বাঁচার কোন আশা নেই। সব দিক দিয়েই নিরুপায় সে। বাচ্চাটি দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে। দেবশিশুর মুখোশ পরা সাক্ষাৎ দানব ও। মানুষ শিকারী দুটোর মতো ওর হাতের ভোজালিটা তাক করা রয়েছে তার দিকে। ওদের চর বাচ্চাটা, এখন দিনের আলোর মত সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে তার কাছে। পোড়ো ঘরটায় আসবার আগে অবধি এতখানি পথ নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে অনুসরণ করে চলেছিল দুর্বৃত্তরা তাকে।

অনেককে এইভাবে সকলের অগোচরে গুম খুন করেছে ওরা। এদের একজনকেও শেষ করে মারতে পারে যদি সে, তাহলে তার অনেক পুণ্যি। মরেও শান্তি।

যে রকম তৈরি ওরা, সামনা সামনি আক্রমণ প্রতিরোধ করা মুশকিল। ভোজালিটা বার করেই ওদের সামনে থেকে কোণের দিকে সরে গেল।

মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল বুঝতে পারল না। বোঝবার আগেই সব ঘটে গেল।

কোণটায় সরে যাওয়া মাত্র সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। পায়ের তলার নরম মাটি ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠে সজোরে ওপর দিকে ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে দিল মেঝেয়।

বলবীর সিং-এর পড়ে যাওয়ার সুযোগ নিতে চেষ্টা করল সঙ্গে সঙ্গে দুর্বৃত্তদের একজন। ভোজালি উঁচিয়ে এগিয়ে এলো। ঝাঁপিয়ে পড়বে। পড়া হল না। আর্তনাদ করে নিজেই মাটিতেই লুটিয়ে পড়ল। বলবীর সিং-এর স্নায়ু অবশ হয়ে গেছে। হাত পা দেহের কোন অঙ্গই নড়ছে না। চেষ্টা করেও তুলতে পারছে না চোখের পলক পড়ছে না চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখছে।

মেঝেয় পা রাখেনি সে। রেখেছিল বিষাক্ত পাহাড়ী হ্যামাড্রায়াড সাপের দেহের ওপর। সাপটার সুখ নিদ্রা ভেঙে যেতে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে উঠেছিল। বিরাট লম্বা সাপটা ভীষণ হয়ে উঠেছিল। অসংখ্য নিশ্বাসের গর্জন গর্জেছিল। সবার মতো ফণা বিস্তার করে চেরা লকলকে লাল জিভ বার করে দাঁড়িয়ে উঠেছিল মানুষ প্রমাণ। বলবীর সিংকে মরণ ছোবল মারবার মুখে মানুষ শিকারীর প্রথম জন সামনে এসে পড়ায় বিষাক্ত ছোবল বসিয়ে দিয়েছিল ওর পিঠেই।

দ্বিতীয় জন আর ছেলেটা প্রাণভয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছল বলবীর সিংকে ছেড়ে। বলবীর সিংকে ওরা ছাড়লেও হ্যামাড্রায়াড ওদের পিছু ছাড়ল না। বিদ্যুৎ গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওদের পিছু পিছু।

এরপর আর কিছু জানে না সে। কিভাবে রাত কেটেছে—ঘুমিয়ে না একটা আচ্ছন্ন অবস্থায়—তার কিছুই মনে নেই একেবারে।

ভোরের আলো যখন চোখে এসে পড়ল, তখন সচেতন হয়ে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল রাতের বিভীষিকা, মনে পড়ল এক এক করে সব। শিউরে উঠল সামনেই দুর্বৃত্তটার মৃতদেহ দেখে। ওর সারা অঙ্গ নীলে নীল হয়ে গেছে।

উদয় সূর্যের আলো লেগে যেন দেহমন স্নায়ু সতেজ সবল হয়ে উঠল আবার

বলবীর সিং-এর। উঠে দাঁড়াল। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল কুঁড়ে ঘর থেকে। ফিরে যাবে বাবা-মার কাছে আবার। কুমায়ুন রেজিমেন্টের অবসর-প্রাপ্ত হাবিলদার বলবীর সিং-এর মুখে তার নিজের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি। একটা বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে নতুন করে উপস্থিত হল আর একটা।

গায়ের মির্জাইটা খুলে ফেলে বলবীর সিং দেখাল। জানাল, আঠারো বছরের বয়েসের জীবন তার যেন বিস্ময়কর—অক্ষত দেহে বেঁচেছে, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও শত্রুপক্ষের গোলাবৃষ্টির মধ্যে যেখানে তার দলের একজনও ফেরেনি—সেখানে আশ্চর্যভাবে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছে সে।

মুখার্জী ভিলায় খুন

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাইভেট ডিটেকটিভ জটিলেশ্বর খাস্তগীর সবে ভোরবেলার প্রথম চায়ে চুমুক দিয়েছেন, টেলিফোনের রিং বেজে উঠল। গতকাল গভীর রাত অবধি মুখার্জী ভিলার সেই খুনের ঘটনা নিয়ে ওঁকে অনেক দৌড় ঝাঁপ করতে হয়েছে, ভেবেছিলেন আজ সারাটি দিন একটু বিশ্রাম নেবেন, কিন্তু ফোনটা বেজে উঠতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, কে রে বাবা! এত সকালে আবার কে ফোন করে।—রিসিভার ধরলেন, হ্যালো

উত্তর এলো, স্যার, আমি সাতকড়ি! পাখিটার খোঁজ পাওয়া গেছে স্যার।

পাখি! মাথাটা কেমন ভারী হয়ে আছে, কেমন একটু আমতা আমতা করলেন জটিলেশ্বর। পাখি? কেমন পাখি?

—সেই যে মুখার্জী ভিলায় খাঁচা থেকে উড়ে পালিয়ে ছিল স্যার। দুধরাজ পাখি! আপনি যার খোঁজ করতে বলেছিলেন।

এবার সব কিছু চোখের ওপর ভেসে উঠল জটিলেশ্বরের। হ্যাঁ, এই পাখিটাকেই দরকার। মুখার্জী ভিলার ভেতরে যখন খুনের ঘটনা ঘটে, তখন ঐ পাখিটাই একমাত্র

চাক্ষুষ সব ঘটনা দেখেছিল। ওকেই সাক্ষী মানতে হবে। জটিলেশ্বর এবার একটু উত্তেজিত বোধ করলেন। পেয়েছ! কোথায় পেলে?

সাতকড়ি বলল, এখনো স্যার ধরা পড়েনি। তবে চিড়িয়াখানার জঙ্গলে ওটা ঘোরাঘুরি করছে। এই মাত্র রামমূর্তি সাহেব খবর পাঠিয়েছেন স্যার।

—ঘোরাঘুরি করছে! ধরতে বলো নি?

—বলেছি স্যার। ওঁরা লোকও লাগিয়েছেন। ধরা পড়লেই আমাদের জানাবে স্যার।

জটিলেশ্বর এক মুহূর্ত কি ভাবলেন। গতকাল রক্তমাখা ডেডবডিটার পাশে ঐ খাঁচাটা দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল জটিলেশ্বরের।

মুখার্জীসাহেব তখন ডেডবডি থেকে খানিকটা দূরে একটা টুলের ওপর স্থির হয়ে বসেছিলেন। জটিলেশ্বর এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি পাখি পোষেন?

মুখার্জী সাহেব চোখ তুলে তাকিয়ে ছিলেন, দেখতেই তো পাচ্ছেন খাঁচা রয়েছে।

—কি পাখি?

মুখার্জীসাহেব বলেছিলেন, রেয়ার ভ্যারাইটি। দুধরাজ।

—দুধরাজ! কি রকম পাখি? জটিলেশ্বর ও রকম কোন পাখির নাম কোনদিন শোনেন নি। প্রশ্ন করলেন, কি রকম দেখতে? একটু দেখাতে পারেন?

মুখার্জীসাহেব তেরছা চোখে একবার তাকালেন, কি করে দেখাব, দেখছেন তো খাঁচা শূন্য। পাখিটা উড়ে গেছে।

জটিলেশ্বর বুঝতে পারছিলেন, মুখার্জীসাহেব এমনিতেই খুব ভেঙে পড়েছেন, তার উপর পাখির কথাতে এখন বিরক্তই হচ্ছেন। কিন্তু জটিলেশ্বরের ঐ পাখিটাকেই দরকার।

বললেন, পাখিটা সম্পর্কে একটু কিছু বলুন না দয়া করে।

মুখার্জীসাহেব উঠে দাঁড়ালেন, উত্তেজনায় একটু এপাশ ওপাশ করলেন, তারপর জটিলেশ্বরের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি জানতে চান, বলুন?

—পাখিটা কিনেছিলেন নিশ্চয়ই? কোথা থেকে কিনলেন?

মুখার্জীসাহেব বললেন, কিনি নি। লোক লাগিয়ে সুন্দরবন থেকে আনিয়েছিলাম। সুন্দরবনে এখনো ওরকম দুধরাজ, রক্তরাজ, ভীমরাজ পাখিদের মাঝে মাঝে দেখা যায়। বেশ পয়সা খরচ হয়েছিল আমার ওরকম একটা পাখিকে আনাতে।

—নিশ্চয়ই পাখিটার কোন বিশেষত্ব আছে?

মুখার্জীসাহেব গম্ভীর হলেন, তা নিশ্চয়ই আছে, নইলে আর আনাব কেন? পাখিটা খুব অল্পতেই কথা শিখতে পারে। অনেক কথা শিখিয়েছিলাম ওকে।

জটিলেশ্বর খুব উৎসাহ পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, টেপ করেন নি?

—না।

—ওর কোন ছবি নেই আপনার?

মুখার্জীসাহেব বললেন, অ্যালবাম ঘাঁটলে পেতেও পারেন।

—কি কি কথা শিখিয়ে ছিলেন, দুটো একটা বলুন না মিস্টার মুখার্জী?

মুখার্জীসাহেব আবার টুলের ওপর গিয়ে বসলেন, কি শিখিয়েছিলাম, শুনবেন? এমন কিছুই না, সাধারণ কিছু কথা, 'মলিনা, কথা কও।' 'রাগ করো না, মলিনা।'

—মলিনা, মানে আপনার স্ত্রী। যিনি খুন হয়েছেন?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। মুখার্জীসাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

জটিলেশ্বরের বুকের ভেতর উত্তেজনা থরথর করে উঠল, পাখিটাকে একবার হাতের কাছে পেলেই যেন অনেক রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। যে ভাবেই হোক পাখিটাকে চাইই।

মলিনাদেবীর দেহটাকে আর একবার পরীক্ষা করে নিলেন জটিলেশ্বর। দুটো গুলির চিহ্ন রয়েছে ওর গায়ে। একটা বুকের বাঁ পাশে ঢুকে গেছে। আর একটা কাঁধের একপাশ লেগে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। সন্দেহ নেই এই গুলিটাই মলিনাদেবীর কাঁধ ছুয়ে সটান পেছনের ওই খাঁচাটাকে আঘাত করেছিল। আর তাইতে খাঁচার জাল কেটে গিয়ে খানিকটা জায়গা ফাঁক হয়ে রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে দুধরাজ পালিয়েছে।

আততায়ী মলিনাদেবীর খুন করার সময় ঐ পাখিটার কথা একদম খেয়াল করে নি। খেয়াল করার কথাও নয়। সামান্য তো একটা পাখি, সে কি ক্ষতি করবে।

মুখার্জীসাহেবের অ্যালবাম থেকে পাখির ছবিটাকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন জটিলেশ্বর। তারপর সেই ছবি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন জুলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে। নাম করা জুলজিস্ট প্রতুলবাবুর সঙ্গে দুধরাজ সম্পর্কে অনেক আলোচনা সারলেন। প্রতুলবাবু যা বললেন, তাতে উৎসাহ পাওয়ারই কথা। দুধরাজ পাখির কথা শুনে প্রতুলবাবু খুব আশ্চর্যই হয়েছিলেন। সে কী মশাই, কলকাতা শহরে কেউ দুধরাজ পাখি পোষে জানতুম নাতো! যিনি পোষেন তিনি যে খুব রসিক তাতে সন্দেহ নেই। জানেন, এই পাখির স্মরণশক্তি খুব বেশি। তেমন কিছু উত্তেজক ঘটনা ঘটলে ও সাড়া দেবেই।

জটিলেশ্বর আর উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পারেন নি, তার মানে, এই পাখিটার সামনেই যে হত্যাকাণ্ড হল, পাখিটা নিশ্চয়ই সে ব্যাপারেও কোন প্রতিক্রিয়া করেছিল?

—করাই তো স্বাভাবিক। হেসেছিলেন প্রতুলবাবু! সাধে আপনাকে সবাই নাম করা ডিটেকটিভ বলে, ঠিক পয়েণ্টটা আপনি বেছে নিয়েছেন। কিন্তু কি জানেন, পাখিটা সত্যি সত্যি দুধরাজ কিনা, সেটা আগে ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। কলকাতা শহরে কোন দুধরাজ পাখি আছে বলে কিন্তু আমাদের জানা নেই।

—চিড়িয়াখানায়?

—না, ওখানেও নেই। আমাদের এখানে অবশ্য দুটো স্পেসিমেন আছে, কিন্তু তা জীবন্ত নয়। একটু থেমে প্রতুলবাবু বলেছিলেন, দুধরাজ পাখিই যদি হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য মনে তো হয় মার্ডারার খুঁজে বার করতে কিছুটা সাহায্য আপনি পেতেও পারেন। তবে হ্যাঁ, পাখিটার যদি সন্ধান পান, দয়া করে আমাদেরও একটু খবর দেবেন।

জটিলেশ্বর প্রতুলবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন থানায়। থানা কি ভাবছে একটু জানা দরকার।

থানায় গিয়ে নির্মলবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই নির্মলবাবু একগাল হাসলেন, আসুন জটিলদা। মুখার্জী ভিলা দেখে এলেন? চা না কফি?

খিদেও পেয়েছিল জটিলেশ্বরের। বললেন, শুধু চা কফিতে হবে না কিছু সলিড খেতে হবে। শিককাবাব বা স্যাণ্ডউইচ আনান দেখি।

—তথাস্তু! নির্মলবাবু রঘুকে খাবার আনতে পাঠিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বুঝতে পারছেন কেসটা? আমার তো মনে হয়, সেই নেপালী দারোয়ানের কীর্তি ওটা।

—নেপালী দারোয়ান! মানে ভক্ত সিং? কিন্তু মুখার্জীসাহেবই তো বললেন, গতকাল সকালে লোকটা সাতদিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

—হ্যাঁ, ঐ তো চাল। দেশে যাওয়ার নাম করে হয়তো কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। ওর দেশে ও গেছে কিনা তা আমরা খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছি।

নির্মলবাবুর কাছে পাখিটার কথা ভুলেও উচ্চারণ করলেন না জটিলেশ্বর। থানার লোকগুলি সব মোটা মাথায় চিন্তা করে। ওদের যদি আসল পথটা দেখিয়েও দেওয়া যায়, তা হলেও ওরা সব কিছু ভণ্ডুল করে ফেলবে। মৃদু একটু হাসলেন জটিলেশ্বর।

—আপনিও কি জটিলদা, ওই ভক্ত সিংকেই সন্দেহ করছেন?

জটিলেশ্বর বললেন, এত সহজেই এই কালপ্রিটকে পাওয়া যায় মশাই। খুন যখন হয়, যে খুন করে অনেক ভাবনা চিন্তা করেই করে।

—হঠাৎ মাথা গরম করেও তো কেউ খুন করতে পারে।

—তা পারে। তবে এ খুনের পেছনে অনেক কারসাজি আছে বলেই আমার ধারণা।

কেন, কেন!

রঘু খাবার নিয়ে এল। জটিলেশ্বরের আর দেরি সইছিল না। স্যাণ্ডউইচ তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন। প্রথম কথা বাড়িতে কে কে থাকেন?

নির্মলবাবু বললেন, মুখার্জীসাহেব আর গিন্নী। গিন্নীই তো খুন হলেন, এছাড়া মালি, চাকর দুটো, রাঁধুনি একজন। আর ওদের সেই নেপালী দারোয়ান ভক্ত সিং।

—ভক্ত সিং না হয় কাল ছুটি নিয়ে চলে গেছে। বাকি যারা তাদের স্টেটমেণ্ট নিয়েছেন?

—নিয়েছি বৈকি।

—তারা কি কাউকে সন্দেহের কথা জানিয়েছে?

নির্মলবাবু হাসলেন, অত সহজে কি কেউ এসব ব্যাপারে মুখ খোলে জটিলদা। সবাই এখন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যই স্টেটমেণ্ট দেবে। তবে কালই ওদের থানায় এনে রুলের গুঁতো দিয়ে কথা বার করার চেষ্টা করব। দেখি কতদূর কি করতে পারি।

—কাল কেন? আজই নয় কেন? জটিলেশ্বর প্রশ্ন করলেন।

—আজ আর সময় কোথায় বলুন। দশ ঝামেলায় দম বেরিয়ে যাচ্ছে জটিলদা। তা ছাড়া কাল দুপুরের মধ্যেই পোস্ট মর্টমের রিপোর্টটাও পেয়ে যাব।

কফির কাপটা সরিয়ে রাখলেন জটিলেশ্বর। চলি আজ। সেই কোন সকালে বেরিয়েছি। এবার সোজা বাড়ি ফিরব। চলি, গুড নাইট।

দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাবার মুখে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন জটিলেশ্বর, ঐ ভক্ত সিংয়ের খবর পেলে কিন্তু দাদা, সঙ্গে সঙ্গে একটা রিং করবেন। লোকটা ছুটি নেওয়ার বারো ঘণ্টার মধ্যেই এরকম ঘটনা ঘটবে, সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক।

সকালে সাতকড়ি পাখিটার খবর জানাতে জটিলেশ্বর আবার তৈরি হয়ে নিলেন।

pathagar.net

সাতকড়িকে ফোনে চলে আসতে বলে উনি দুধরাজ পাখির ছবিটা নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাবলেন, পাখিটা খুনের সময় ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিল, কিন্তু খুনিকে সে শনাক্ত করবে কি ভাবে! একটু ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা। পাখি তো আর নিজের ইচ্ছে মতো কথা বলতে পারবে না। ওকে মুখার্জী সাহেব বা বাড়ির লোকজন যা শিখিয়েছে তাই বড় জোর ও বলতে পারে। তাতে আততায়ীকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি ভাবে!

কিন্তু এখন আর পিছিয়ে আসারও সময় নেই। জটিলেশ্বর ঘরের ভেতর দুবার একবার উত্তেজনায় পায়চারি করলেন। এমন সময় গাড়ি নিয়ে হাজির হল সাতকড়ি। স্যার, চলুন পাখিটা নাকি ধরা পড়েছে।

—ধরা পড়েছে! বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন জটিলেশ্বর।

—হ্যাঁ স্যার। আমি ঠিক বেরুতে যাব, এমন সময় চিড়িয়াখানা থেকে রামমূর্তি জানাল, ধরা পড়েছে। ওকে একটা খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছে।

—ঠিক বলছ সাতকড়ি? কি লাক আমাদের। চল চল। শিগগির চল।

সোজা চিড়িয়াখানার দিকে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল ড্রাইভার। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চিড়িয়াখানায় চলে এল ওরা।

রামমূর্তি গেটেই অপেক্ষা করছিলেন ওদের জন্য। গাড়িটা দেখেই এগিয়ে গেলেন, আসুন জটিলদা, আসুন, নিয়ে যান আপনার পাখি!

—খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে বুঝি? তা হোক। তবু আপনারা ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হল। পাখিটার ভীষণ দরকার। আপনাদের কি বলে যে ধন্যবাদ দেব।

—আরে না, না, এ আবার ধন্যবাদ দেবার কি হল। আসুন, বহাল তবিয়তে পাখিটাকে রেখেছি।

ছোট্ট একটা খাঁচায় দুধরঙের ছোট্ট একটা পাখি। ভারী সুন্দর দেখতে। খাঁচার গায়ে হাত রাখলেন জটিলেশ্বর। পাখিটাকে আদর করতে ইচ্ছে করছিল ওর। আদর করলে পাখি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, অন্তত প্রতুলবাবুর কথা মতো পাখিটার শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু কোনরকম প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ল না জটিলেশ্বরের। ব্যাগ থেকে দুধরাজের ছবিটা বার করলেন, হাঁ অবিকল মিল। এটা যে দুধরাজই সন্দেহ নেই!

সাতকড়ি বলল, স্যার, এটাই যে মুখার্জীসাহেব পুষতেন এমন তো নাও হতে পারে!

—কি রকম?

—হয়তো এটা অন্য কোন দুধরাজ। মুখার্জী ভিলারটা পালিয়ে গেছে কোথাও।

—অসম্ভব, হতে পারে না। এ পাখি কদাচিৎ চোখে পড়ে। কি বলুন মিস্টার রামমূর্তি, কখনো দেখেছেন এ পাখি?

রামমূর্তি স্বীকার করলেন, পশুপাখি নিয়েই ওদের কারবার কিন্তু এই দুধরাজ ওর প্রথম দেখলেন।

জটিলেশ্বর বললেন, আসল হোক, নকল হোক, চল এবার সোজা মুখার্জী ভিলায় যেতে হবে! ও বাড়ির লোকেরাই বলতে পারবে এটা ওদেরই পাখি কি না।

গাড়ি মুখার্জী ভিলার দিকে ছুটল। পাখির খাঁচাটা যত্ন করে ধরে রাখলেন জটিলেশ্বর!

দু'একবার পাখিটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেন, 'মলিনা, কথা কও!' নাহ্ পাখিটা যেন বোবা। কথা-ফথা কোনদিন ওকে শেখান হয়েছে বলেই মনে হয় না।

মুখার্জী ভিলার সামনে গাড়িটা যখন এসে দাঁড়াল ঘড়িতে তখন বেলা বারোটা।

দূর থেকে বাগানের মালি এগিয়ে এল। স্যার—

জটিলেশ্বর শুধোলেন, সাহেব কোথায়? তোমাদের দুধরাজ আমি নিয়ে এসেছি।

ততক্ষণে বাড়ির চাকর দুটোও এগিয়ে এসেছে। সাহেব তো বেরিয়েছেন হুজুর।

—বেরিয়েছেন? কোথায়?

—কিছু বলে যান নি স্যার। তবে এখনি ফিরে আসবেন বলে গেছেন!

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন জটিলেশ্বর। ঠিক আছে, চল, পাখিটা যেখানে থাকত সেখানে চল। পাখিটাকে চিনতে পারছ তো?

তিনজনেই এক সঙ্গে উত্তর দিল, হ্যাঁ, স্যার। এটাই আমাদের খাঁচায় ছিল।

ওরা মুখার্জী ভিলায় এসে ঢুকে পড়ল। সেই হলঘরের মতো জায়গায়, যেখানে মলিনাদেবীর বডিটা পড়েছিল সেখানে চলে এল ওরা।

জটিলেশ্বর পাখিটাকে তার নিজের জায়গায় বসিয়ে দিলেন। তারপর মালির দিকে তাকালেন, তোমাদের পাখি তো কথা বলতো?

—হ্যাঁ স্যার।

—দেখ না, আবার কথা বলতে পারে কিনা।

বুড়ো মালি খাঁচার কাছে এগিয়ে গেল। ডাকল দুধরাজ? পাখিটা কেমন পালকের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে বসে আছে। সত্যি সত্যি কথা বলা যেন ভুলেই গেছে।

—দুধরাজ! আবার ডাকল মালি।

—এবারও উত্তর এল না।

চাকরদের মধ্যে একজন টুসটুসে পাকা একটা লঙ্কা এনে পাখিটাকে খেতে দিল। ওকি রে? খাবি না? না, পাখিটার যেন রুচিও নেই।

হতাশ হয়ে পড়েছিলেন জটিলেশ্বর। এত করে পাখিটাকে ধরা হল, কিন্তু—

সাতকড়ি বলল, স্যার, সব বাজে কথা। পাখি কথা বলে না হাতি।

জটিলেশ্বর খাঁচা থেকে খানিকটা দূরে একটা টুলের ওপর বসলেন। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন পাখিটার দিকে। কে বলবে, এই পাখিকেই কথা শেখান হয়েছিল।

ওদিকে দরজার পাশে তখন রাঁধুনীকে দেখা যেতেই জটিলেশ্বর ডাকলেন, কে ওখানে? এদিকে এস।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাঁধুনী এসে ঘরে ঢুকল।

—তুমি রান্না কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমাদের এই পাখি কথা বলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বলাও দেখি।

—মহিলাটি এগিয়ে গেল খাঁচার কাছে, দুধরাজ।

আশ্চর্য! চমকে উঠলেন জটিলেশ্বর। পাখিও উত্তর করল, দুধরাজ।

—কথা কও।

পাখিও আবৃত্তি করল, কথা কও।

অবিকল মানুষের গলা। পাখিটার দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারলেন না জটিলেশ্বর।

রাঁধুনী এবার পিছিয়ে এল। জটিলেশ্বর বললেন, ঠিক আছে তুমি ওপাশে বস। আবার মালির দিকে তাকালেন, কি হল তুমি আবার চেষ্টা কর মালি? কথা বলাও।

মালি এগিয়ে যাচ্ছিল খাঁচার দিকে, এমন সময় বাইরে মোটরের শব্দ পাওয়া যেতেই সবাই চমকে উঠল, হ্যাঁ মুখার্জী সাহেবই ফিরলেন বোধহয়।

মালি এগিয়ে গিয়ে নরমভাবে ডাকল, দুধরাজ!

উত্তর এল, দুধরাজ।

—তবে যে তখন চুপ করে ছিলি? মালি আবার দু পা পিছিয়ে এল।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মুখার্জীসাহেব। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই নাটকীয় ঘটনাটা ঘটে গেল। দুধরাজ ছটফট করে লাফিয়ে উঠল খাঁচার মধ্যে, 'মেরো না, মেরো না, গুরুম।'

—হ্যাঁ পাখিটাই কঁকিয়ে উঠেছে, মেরো না, মেরো না, গুরুম।'

—দুধরাজ! চিৎকার করে উঠলেন মুখার্জীসাহেব। জটিলেশ্বর লক্ষ্য করলেন, মুখার্জীসাহেবের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। আর পাখিটাও ভয়ে খাঁচার ওপাশে গিয়ে এইটুকুন হয়ে গেছে। কী ভীষণ ভয় পেলে তবে ওরকম হতে পারে কেউ।

—কোথায় পেলেন এ পাখি! দাঁতে দাঁত চেপে জটিলেশ্বরকে প্রশ্ন করলেন মুখার্জীসাহেব।

জটিলেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন, এখন থানায় চলুন। সেখানেই জানতে পারবেন, কিভাবে দুধরাজকে আবার পাওয়া গেল।

—আপনি কি বলতে চান?

—না না, ওদিকে না। চলুন। বাইরে আমাদের গাড়ি রয়েছে, সে দিকে চলুন।

রিভালবারটা দু আঙুলে শক্ত করে চেপে মুখার্জীসাহেবের পিঠের উপর ঠেকিয়ে রাখলেন জটিলেশ্বর। পালাবার চেষ্টা করলে কি হবে বুঝতে পারছেন, চলুন বলছি।

মাথা নিচু করে মুখার্জীসাহেব বেরিয়ে এলেন বাইরে। জটিলেশ্বরের নির্দেশ মতো উঠে বসলেন গাড়িতে।

হীরের মুকুট উদ্ধার

তপতী চক্রবর্তী

আমাদের আড্ডায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু ছিল ভূতের গল্প। ভূতের গল্প ভাল বলতে পারতেন চৌধুরী মশাই। তিনি কেবল শনিবার দিন আসতেন।—আরে, এসো, এসো নবারুণ। সলজ্জ হেসে বললাম, আমার একটু দেরী হয়ে গেছে—

—হবার তো কথাই। সারাদিন যা চলেছে। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা আর গরম পেঁয়াজী ভর্তি প্লেট নিয়ে নীলরতনের ভৃত্য রামদীন এল। চৌধুরী মশাই শুরু করলেন, বছর দশ আগের ঘটনা। কয়েকটা ব্যাপারে মোটা টাকার লোকসান হয়ে আমার অবস্থা খারাপ। মাথায় ঋণের বোঝা নিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। শুধু ভাবনা নিয়ে বসে থাকা আমার স্বভাব নয়।

একটা চরম দুঃসাহসের কাজ সেরে ফেললাম দুম্ করে। আমার পিতামহের আমলে গৃহদেবতার মাথায় একটা সোনার মুকুট ছিল, সেটা আমার এক ধনী বন্ধু উৎপলের কাছে রেখে পরিবর্তে টাকা ধার চাইলাম। এমনও বললাম সুদ হিসেবে নয়, ধর তোমারই টাকা খাটছে, তারই একটা লভ্যাংশ আমার টাকা শোধ করার সময় ধার দেব। উৎপল

বলল, ছাড় তো ওসব কথা। জানই তো আমি কুঁড়ে। বাপ ঠাকুর্দা যা রেখে গেছে এখনও তাতে আমার চলে যাবেই। বিপদে তোমায় সাহায্য করব—এর আবার শর্ত কি! শুনে আমার মনে খুবই আনন্দ হল। টাকাটা একটু বেশী যদি দাও। না তা হবে না, এইবছর অজন্মা যাচ্ছে।

যাই হোক টাকা নিয়ে আমি চলে এলাম। ঘড়ির কাঁটার যেমন বিশ্রাম নেই, ঠিক তেমনই—যদি খাটতে পারতাম, এই কথাই শুধু মনে হোত। সুদিনের মুখ দেখলাম। যেমন কথা দিয়েছিলাম সেই মত টাকা নিয়ে উৎপলের কাছে গেলাম। সে বললো, যাক, তুমি এসে গেছ। আমার জিনিসটা? সে আর বলতে, উৎপল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে অন্দরমহলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে এনে দিল আমার বাঞ্ছিত বস্তু। টাকা গুণে নিয়ে সে বলল, ঠিক আছে।

তারপর—। আশ্চর্য! শুধু আশ্চর্য নয় অদ্ভুত। সেইদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম মিশকালো রঙ—যমদূতের মত ষণ্ডা চেহারার একটা লোক সিন্দুক ভেঙে সেগুলো চুরি করছে। তার মুখটা সেই বন্ধুর মত অবিকল। মনের সব খুশী ম্লান করে দিল। বাকী রাতটুকু ঘুম এল না। কি সে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে সময়টুকু কাটলো। সকাল হতে জুলেয়ারকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সব পাথরগুলো খাঁটী তো? তিনি দেখে শুনে বললেন, পাথরগুলো সব ঝুটো। বিলিতি কাঁচ। আমি মাথা ঘুরে পড়েই যেতাম। জুয়েলার অমৃতবাবু বললেন, আমাকে আপনি না জানিয়ে কেন লেন-দেন করলেন? আমি নিষ্প্রাণ জড়দেহে প্রাপ্ত হয়েছি। অনেকটা সময় কাটলো ধাক্কা সামলাতে। মনে মনে ঠিক করলাম আমার উকিল বন্ধু শঙ্করের শরণাপন্ন হব। তাকে সমস্ত কথা সবিস্তারে বললাম তার বাড়ীতে গিয়ে। আমি কি করতে পারি বল? সে বললো, তুমি অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে? তিনি অত বড় ধনী লোক। তোমার কথা লোকে বিশ্বাস করবে? কিছুদিন আগে তুমি যে লালবাতি জ্বেলে বসেছিলে একথা সকলে জানে। হিংসেয় বদনাম দিচ্ছ না তাই বা কে জানে। তাহলে কি প্রতিকার হবে না? উনি যে নিয়েছে সেটা প্রমাণ করতে হবে। জিনিসটা আদায় করতে হলে অনেক কাঠ খড় চাই। একটু হতাশ হলাম। তুমিই বল কি করি? শঙ্কর একটু চিন্তামগ্ন হল। কিছুক্ষণ পর বলল, একটা ফন্দি মাথায় এসেছে। কি? উত্তেজনায় আমার গলা কাঁপছে।

তোমার হাতের আংটিটা কি পাথর? রক্তমুখী নীলা না। কত দাম হবে পাথরটার? শঙ্করের এই কথা শুনে বুঝতে পারলাম না হঠাৎ আংটির পাথরের মূল্য কোন্ কাজে লাগবে? ছ'রতি ওজনের পাথর। 'তোমায় দু'চার দিনের জন্য ওটা কাছ ছাড়া করতে হবে, পারবে না? না, ওটা কাছছাড়া করতে নেই। আমার একটা হীরের আংটি আছে এই দামেরই—।

ঠিক আছে, সেটাতেই হবে। শঙ্কর বললে, তোমার সে মহাজন মহাশয়ের কাছে যা পাও টাকার বিনিময়ে তোমার হীরের আংটিটা বাঁধা রাখতে হবে। অভিনয় যেন নিখুঁত হয়। বলবে, আচমকা টাকার দরকার বেশী না হলেও সামান্য হাজার দুই টাকার জন্য ঠেকে গিয়েছে একান্তই। আরো এ কথাটা অবশ্যই বলবে বেশী টাকার দরকার হলে মুকুটটাই রাখতে হত আবার। এখন সামান্যতেই চলে যাবে। তারপর?

তারপর দেখতেই পাবে, শঙ্কর হাসলো। শঙ্করের কথামত সেই মহাজন বন্ধু উৎপলের কাছে গেলাম আংটি নিয়ে। হীরেটার উজ্জ্বলতা চোখে লাগে। বেশ কিছুক্ষণ সে আংটিটার দিকে চেয়ে রইলো, বললে, আবার টাকার দরকার? অভিনয় ত্রুটিহীন করার চেষ্টা করে বললাম, হঠাৎ এমন মুশকিলে পড়ে গেছি ভাই। সে তো বুঝতেই পারছি। তোমার তো বেশ চলছিল।

তা চলছিল, কিন্তু এখন নগদ টাকা একেবারে নেই। হু। দু হাজার চাই? উপস্থিত ওতেই হবে।

বেশ, দিচ্ছি। বলে উৎপল একটু উৎসুক ভাব ফুটিয়ে তুললো মুখে। তোমার গৃহদেবতার মুকুট পরানো হয়েছে।

নিশ্চয়ই—এটা ভাল দিন দেখে পরিয়েছি। খুব ভালো, খুব ভালো।

টাকা নিয়ে চলে এলাম। শঙ্করের সঙ্গে দেখা করে বললাম সাক্ষাৎকারের বিবরণ। সব শুনে সে বললে, ঠিক আছে। এবার যা করবার করছি। কি করবে? পরে বলবো। তুমি আগামী কাল এসো।

পরদিন গেলাম। আগ্রহভরে বলি, কতদূর শঙ্কর? শঙ্কর বিজয়ীর মত হাসলো। জাল পেতেছি। কিছু ধরা পড়লো?

নিশ্চয়ই, বলে ধোঁয়াটে হাসলো। অধৈর্য হয়ে পড়লাম, তুমি খুলে বলো। ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর! বাঁধ বাঁধ বুক—কবি বলেছেন।

ভাই শঙ্কর—। বুঝেছি তোমার খুব রাগ হচ্ছে আমার উপর। শঙ্কর উচ্চ হেসে বলে, শোন, জালে বিখ্যাত এক জুয়েলার ধরা পড়েছে। এরই মারফৎ চোরাবাজারী, লেনদেন তোমার মান্যবর বন্ধু করে থাকেন। তার বাড়ীতেই তোমার আংটির হীরে চলে গিয়েছে। তার বদলে অন্য পাথর লাগানো হয়েছে তোমার আংটিতে। লোক রেখেছিলাম তার বাড়ীতে নজর রাখার জন্য। কেমন দেখতে এবং কে কে সেখানে যায় তার একট তালিকা সে আমায় দিয়েছে। এ জেনে কি করবে? আমি হতাশ হয়ে পড়ি। এই জুয়েলারটিকে ছলে বলে কৌশলে আমাদের দলে টেনে আনতে হবে। যদি জুয়েলার রাজী না হয়? যাতে হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। যদি তোমার কোন বিপদ—

তা হবার সম্ভাবনা আছে। তা বলে ভয়ে বসে থাকলে চলবে না। শঙ্কর কঠোর কণ্ঠে বললে, সমাজের শত্রুদের উচ্ছেদ করার জন্যই আমার পুলিশের চাকরী নেওয়া। শত্রু আমার অনেক। চোর ছ্যাঁচোর খুনী গুণ্ডাদের চেয়ে এই সব গভীর জলের মাছেরা কত ভয়ানক। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বুঝি শঙ্কর বললে, তোমার মুকুটের ঘটনা আমায় বলেছ বলেই এক ভীষণ শত্রুঘাঁটির সন্ধান পেয়ে গেলাম। নইলে সকলের চোখের সামনে দিনের পর দিন উনি ফলাও কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন কেমন বংশগত মর্যাদার আড়াল দিয়ে। শঙ্করের কাছ থেকে ভাবনা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরলাম।

তারপর দুদিন কেটে গেছে। শঙ্কর শব্দহীন, তার দেখা পর্যন্ত পেলাম না। সেদিন রাত্রে আকাশ ভেঙে জল নামলো।

চৌধুরী মশাই থামলেন। একটা নতুন চুরুট ধরালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি জানলা পথে বাইরের ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির মাঝে যেন রহস্যের সন্ধান করছে।

চৌধুরী মশাই আবার শুরু করলেন, সেদিন রাতেও এমনি দুর্যোগ। অনেক রাত্রে একটানা দুম্‌দুম্ দরজায় কার ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লাম। দরজা না খুলে জিজ্ঞেস করলাম, কে? সাড়া এলো পরিচিত কণ্ঠে, আমি শঙ্কর।

দরজা খুললাম। বারান্দার অন্ধকারে একটা লম্বাচওড়া ছায়ামূর্তি। বর্ষাতিতে সর্বাঙ্গ ঢাকা। মাথায় বর্ষারোধক টুপিটা সামনের দিকে হেলানো। কেবল চোখ দুটো যেন জ্বলছে। তোমার ঘুম ভাঙালাম। শঙ্কর হাসলো, বেশ ঘুমুচ্ছিলে আরামে না? তা ঘুমোবার মতই রাত বটে। একটু লজ্জিতভাবে বললাম, ভিতরে এসো।

না, সময় নেই। ভরাট গম্ভীর কণ্ঠ। এই নক্সাটা দিচ্ছি। গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর সমরবাবুকে নিশ্চয়ই চেন। তাঁর হাতে এখুনি এটা পৌঁছে দেবে। বলবে নক্সায় পরিষ্কারভাবে পথের নির্দেশ দেওয়া আছে। সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তারা যেন যেতে বিলম্ব না করে আমি সেখানেই যাচ্ছি। তুমি অবশ্যই যাবে। বললাম, এখনি যাচ্ছি।

চাপা হাসির সঙ্গে শঙ্কর বললে, চললাম, সেখানে আমায় দেখতে পাবে। দেরী করো না। বলেই সে হন্ হন্ করে চলে গেল।

সমরবাবু নক্সা দেখে বললেন, শঙ্কর গত দুদিন ধরে ডুব দিয়ে এই করেছে। এই বর্ষায় আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে বি. টি. রোড ধরে পুলিশের গাড়ী ছুটে চললো। ডানলপ ব্রিজ পার হয়ে গেল। আকাশের দুর্যোগ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। সমরবাবু নক্সার নির্দেশমত গাড়ী থামাতে নির্দেশ দিলেন। সকলে নামলাম একটা বিরাট আকারের আদ্দিকালের পোড়ো বাড়ির সামনে। চারদিকে ঝোপজঙ্গল। কোনো ধনী খেয়ালী লোকের শখের সাজানো বাগানের এই পরিণতি। কিন্তু শঙ্কর কই? মরচে পড়া লোহার ফটক খোলাই ছিল। কয়েকজন সিপাইকে যথাযথ ঠাঁই রক্ষার নির্দেশ দিয়ে জনকয়েক সঙ্গী নিয়ে সমরবাবু এগোলেন। আসুন চৌধুরী মশাই দেখি ব্যাপারটা। শঙ্করের সাড়া নেই কেন? এখনো কি পৌঁছয় নি! বললাম, চলুন দেখা যাক। বাড়ীটা দেখে লোক নেই বলে তো মনে হয় না। হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া শন্ শন্ করে উঠল মানুষের কথা বলার মত। যেন পাশ দিয়ে শঙ্কর বলছে আমি এসেছি তোমরা এগোও। চমকে উঠলাম। স্বপ্ন দেখছি! শঙ্কর কই! না, ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি দেখছি। বর্ষা রাতের ঘুমের নেশা সহজে ছাড়ে না। সমরবাবু খানিকটা এগিয়ে ততক্ষণে সদরে পৌঁছে গেছেন। চাপা গলায় বললেন, দরজা খোলাই দেখছি। ভেতরে ঢুকবেন? জিজ্ঞেস করি। নিশ্চয়ই। কেন, আপনার ভয় করছে? তা হলে গাড়ীতে—। আহত কণ্ঠে বললাম, আমায় এত ভীরু মনে করেন? না, না ছিঃ! সমরবাবু লজ্জিতভাব প্রকাশ করলেন।

ভেতরে ঢুকলাম সকলে। চাপ চাপ অন্ধকার। ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। বাইরে থেকে যতবড় দেখায় তার চেয়ে মস্ত বড় বাড়ি। একটা বড় চৌকো উঠোনকে কেন্দ্র করে সারি সারি ঘর। দরজা জানলা বন্ধ। চামচিকে উড়ছে। টর্চের আলোয় চকিতে সবকিছু দেখে নিয়ে সমরবাবু বললেন, সব ঘরগুলো তল্লাস করবো। কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারি কিছু ডালা বন্ধ করার শব্দ হল। সমরবাবু জিহ্বার আওয়াজ করলেন সতর্কতার সঙ্গে, দোতলার দিক থেকে এলো, না? তাই মনে হচ্ছে।

চলুন দেখি—।

একজন সিপাইকে নিচে রেখে আমরা দোতলার সিঁড়ির দিকে গেলাম। সিঁড়িতে উঠছি, কানের কাছে চারদিকে স্পষ্ট কেউ বলছে, কোণের ঘরে দক্ষিণের—ভয় পেলাম। ভুতুড়ে বাড়ি নিশ্চয়ই। কিছু বললাম না কাউকে। শব্দহীন পদক্ষেপে উপরে উঠলাম। দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটায় যেন কিছু নড়াচড়ার শব্দ, ক্ষীণ আলোর আভাষ। সমরবাবুর পিছনেই আমি। দরজার পাল্লা ভেজানো। একটুখানি ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, ষণ্ডামার্কা জনাচারেক লোক একটা নড়বড়ে কাঠের বাক্স তোলবার চেষ্টা করছে। একজন কেউ বললে, বাগানে গর্ত করে পুঁতে দে। গলার আওয়াজটা ঠিক যেন উৎপলের মত। হুড়মুড়িয়ে সকলে ঘরে ঢুকে পড়লাম। হাত তুলে দাঁড়া সব শয়তানগুলো। সমরবাবুর কর্কশ কণ্ঠের আদেশ। সার্জেন্ট, কেউ নড়লেই গুলি করবে।

হাতকড়া পর্ব শেষ হল। লোকগুলোর সব মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখ। এখানকার সন্ধান কে দিল পুলিশকে? উৎপলের তখনও ফোঁসফোঁসানি। চোপরাও। সমরবাবু হাঁকলেন, জমাদার বাক্স খোল—।

দুত্তোর, পেরেক আঁটা। একটা কিছু খোলবার মত—সমরবাবু ইতস্ততঃ দৃষ্টিচালনা করে বললেন, ঐ যে একটা শাবল—ওটা দিয়ে ভেঙে ফেল।

শাবলের চাপ দিতেই মড়মড় করে ডালাটা খুলে গেল। সমরবাবুর জোরালো টর্চের আলো পড়তেই শিউরে লাফিয়ে উঠলাম। একটা মুণ্ডুহীন দেহ। আর মুণ্ডুটাও হয়েছে বীভৎসতার ভীষণতম এক নমুনার মত। সেটা শঙ্করের। আমি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখলাম মাথার কাছে সমরবাবু ও দুজন পুলিশ। আমি চারিদিকে তাকালাম। বুঝতে পেরে সমরবাবু বললেন, ওদের সব থানাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর এই নিন আপনার আসল মুকুট।

সবাই মিলে জিপে উঠলাম। হারানো মুকুট উদ্ধার হলেও শঙ্করকে মুকুটের জন্য প্রাণ দিতে হল।

রায় ভিলার অভিশপ্ত নীলা

উজ্জ্বল মল্লিক

॥ ১ ॥

গভীর রাত। আপ বম্বে মেলে ভায়া এলাহাবাদ ছুটে চলেছে তীব্র গতিতে। শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। ফার্স্ট ক্লাশ কুপেতে আমি অর্থাৎ ঝুমুর দত্ত আর আমার পিসতুতো দাদা প্রাইভেট ডিটেকটিভ রকিদা এবার চলেছি জব্বলপুরের পথে।

ঠিক জব্বলপুর নয়। ওখানে নেমে যেতে হবে ভেড়াঘাট। মার্বেল রকের ধারে। রায় ভিলার মালিক রণবীর রায়ের লোক এসে আমাদের নিয়ে যাবে ওদের এস্টেটে।

মার্বেল রক। মানে শাদা মার্বেলের পাহাড়। নাম শুনেছি অনেকবার। এবার চাক্ষুষ দর্শন হবে ভেবে আনন্দে মনটা হয়ে উঠেছে উচ্ছল।

হঠাৎ ঘুমটা গেল ভেঙে। কেউ যেন অতি সন্তর্পণে দরজায় টোকা দিচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক তাই।

আবার শব্দ। ঠক ঠক।

রকিদার দিকে তাকালাম। ওপরের বাঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্তমনে মনে হল।

আমার কি দরজাটা খোলা উচিত হবে? ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। ঠিক তখনই শুনলাম রকিদার গলা। 'ঝুমি দাঁড়া। আমি খুলছি।'

'আরে তুমি কখন উঠলে?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম।

'তোরই সঙ্গে আমারও ঘুমটা ভেঙে গেছে। চুপ করে শুয়ে শুধু তোর সাহসটা দেখছিলাম।' বলে মুচকি হাসল রকিদা।

নিচে নেমে এবার দরজাটা আস্তে করে খুলে একপাশে করে দিল রকিদা। লাঠি হাতে এক বুড়ো ভদ্রলোক একরকম আমাদের ঠেলেই ভেতরে ঢুকে পড়লেন। ভদ্রলোকের চুলগুলো একদম সাদা। দাড়িটাও সাদা। পরনেও সাদা পাঞ্জাবী আর পায়জামা। ভদ্রলোক ঢুকে নিজেই দরজাটা টেনে বন্ধ করলেন। তারপর বললেন, 'এমন মাঝরাতে আপনাদের বিরক্ত করার জন্য সত্যিই খুব দুঃখিত মিস্টার সেন। কিন্তু এ ছাড়া আর আমার উপায় ছিল না।' বলেই বসে পড়লেন।

'আমাকে আপনি চেনেন নাকি?' প্রশ্ন করল রকিদা।

'হ্যাঁ, অনেকের মতোই আপনাকে আমি চিনি। আর এই কি ঝুমি?'

পাল্টা প্রশ্নের জবাবে রকিদা বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু এত রাতে আমাদের কুপে ঢুকলেন কেন?'

একটু থেমে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা তো রায় ভিলায় যাচ্ছেন?'

'সবই তো জানেন দেখছি। কি পরিচয় আপনার?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করল রকিদা।

'পরিচয় আমার যথাসময়ে পাবেন। শুধু জেনে রাখুন আমার নাম পরমেশ্বর রায়। রায় এস্টেটের সম্পত্তিতে আমারও অধিকার আছে একথা আপনাকে একটু জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করলাম। যেখানে যাচ্ছেন সে জায়গাটাও বিশেষ সুবিধার নয়। যে কোনও সময় কিন্তু প্রাণ বিপন্ন হতে পারে।' এতগুলো কথা বলার পর ভদ্রলোক হঠাৎই উঠে পড়ে বললেন, 'যাই, পরে আবার আসব' বলেই ভদ্রলোক হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

রকিদাও হাই তুলতে তুলতে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে, 'নে ঝুমি এবার ঘুমিয়ে পড়।'

'লোকটা তো সকালেও আসতে পারত রকিদা।' বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলাম আমি।

'নিশাচরেরা রাতেই আসে।' উত্তর দিল রকিদা।

সারা রাত আর ভালো করে ঘুম হলো না। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। জানালাটা খুলে কাচটা নামিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলাম রায় এস্টেটের কথা।

এবার ফিরে যাচ্ছি একটু পূর্বের ঘটনায়।

গত রবিবার সকালে রকিদার বাড়িতে বসে ব্রেকফাস্ট করছিলাম। হঠাৎই কলিং বেলটা বেজে উঠল। একজন পিওন ধরনের লোককে দরজা খুলে দেখতে পেলাম। রকিদাও আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা রকিদার হাতে একটা খাম দিয়ে

Pathagar.net

ভাঙা বাংলায় বলেছিল, 'সেন সাব্। হামি হরদেও সিং। জব্বলপুরের রায় এস্টেটের মালিক রণবীর রায়ের কাছ হতে আসছি। হামাকে তুরন্ত ফিরে যেতে হবে। চিঠিতে সব কিছু লিখা আছে, নমস্তে'—বলে চলে গেল।

রকিদা খামটা ভালো করে দেখে বলেছিল খুবই বিত্তবান লোকের চিঠি ঝুমি। মনে হচ্ছে এবারও ভালোই রোজগার হবে।

চিঠিতে লেখা ছিল—

মহাশয়,

আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। আমি আপনার সাহায্য চাই। কিছুদিন পূর্বে আমার স্ত্রী লতিকা রান্না করার সময় স্টোভ ফেটে মারা যায়। ওর হাতে আমাদের পারিবারিক একটা আংটি ছিল। খুবই পয়মন্ত আংটি। রক্তমুখী নীলা। কেউ কেউ বা বলত অভিশপ্ত। কিন্তু যাই হোক এ আংটি ধারণের পর থেকেই আমার ব্যবসার প্রচুর উন্নতি হয়। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর ঐ আংটি খুঁজে পাচ্ছি না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে আংটি আমাদের বাড়ি অর্থাৎ রায় ভিলাতেই আছে। সেইজন্যই আমি আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আমার চিঠি পাবার পর যত শীঘ্র সম্ভব আপনি আমাদের বাড়ি চলে আসুন। এখানকার সমস্ত খরচা আমি দেব। আপনি যেদিন আসবেন আমায় চিঠিতে জানাবেন। আমার লোক গিয়ে আপনাদের স্টেশন থেকে নিয়ে আসবে। কবে আসছেন জানাবেন। নমস্কার নেবেন। ইতি

রণবীর রায়
রায় এস্টেট
ভেড়াঘাট, জব্বলপুর।

pathagar.net

আবার ফিরে আসি ট্রেনের কামরায়। এলাহাবাদ এল সকাল সাড়ে এগারোটার সময়। এলাহাবাদে আমাদের লাঞ্চ দিয়ে গেল। ভাত খেয়ে হাত ধুতে যাচ্ছি দরজা খুলে—করিডোরে আবার দেখা হল সেই বৃদ্ধের সঙ্গে। বললেন, 'জব্বলপুরে আর গেলাম না। এলাহাবাদে একটা কাজ আছে। তবে যথাসময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।' তারপর প্লাটফর্মে নেমে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

জব্বলপুর পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। স্টেশনে নেমে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি—তখনই দেখলাম এক ভদ্রলোক হেসে রকিদার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, হ্যাণ্ডশেক করার জন্য। 'মিস্টার সেন, আমি নিমাই ভদ্র। আপনাদের রায় ভিলায় নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আপনি কি ওখানেই থাকেন?' প্রশ্ন করল রকিদা।

'হ্যাঁ। আমি ওখানকার ম্যানেজার কাম ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড বলতে পারেন।'

স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। আমরা তিনজনেই সামনে বসলাম। ড্রাইভারের সীটে বসলেন নিমাইবাবু। উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ পেরিয়ে রায় ভিলায় পৌঁছতে এক ঘণ্টার বেশি লাগল না। কয়েক একর পাঁচিল ঘেরা জমির গেটে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে 'রায় এস্টেট'। গেটে দারোয়ান ছিল। বাইরে জীপের হর্ন বাজানোর শব্দে দারোয়ান গেট খুলে দিল। লাল সুরকির রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল জীপ।

এক পাশে একটা কারখানা। 'ওটাই আমাদের কারখানা।' আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন নিমাইবাবু।

গাড়ি গিয়ে থামল পুরোনো দোতলা একটা বাড়ির সামনে। সাদা মার্বেল পাথরে কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে রায়ভিলা।

ওপরের বারান্দায় মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। নিমাইবাবু বললেন, 'রণবীরবাবু। স্ত্রী মৃত্যুর পর বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন।'

'আসুন ওপরে উঠে আসুন।' ভরাট গলায় বলে উঠলেন রণবীরবাবু।

পুরোনো দিনের বাড়ি। দোতলায় উঠেই দেখলাম রণবীরবাবু এগিয়ে আসছেন। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের নিচেই হবে। মাঝারি গায়ের রঙ। চুলগুলো অল্প পাকা। দেখে মনে হয় পত্নীর শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

'ট্রেনে কোনও কষ্ট হয়নি তো?' কথা বললেন রণবীরবাবু।

'না না কষ্ট কেন হবে। বেশ তো ভালোই লাগল। এমন একটা বেড়াবার জায়গায় আসতে পারা তো আমাদের সৌভাগ্য।' রকিদার কথায় মৃদু হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'আজ বিশ্রাম করুন। রামু মালপত্র আপনাদের ঘরে তুলে দিচ্ছে। রাতে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল সব কথা বলব।'

'ঠিক আছে', বলে আমি আর রকিদা আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছলাম। দিনের বেলা বুঝতে পারিনি। রাত বাড়ার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে ঠাণ্ডা বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর রামু এসে বলল, 'বাবু আপনাদের ডিনার রেডি হয়ে গেছে।'

খাবার খেয়ে শুতে চলে এলাম বিছানায়। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লাম।

pathagar.net

।। ২।।

দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দূর থেকে মার্বেল রক দেখা যাচ্ছে। কাল সন্ধ্যেবেলায় ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। রকিদাও ঘুম থেকে উঠে কখন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখতে পাইনি। রকিদাই আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ঝুমি আজ রাতে পূর্ণিমার আলোয় আমরা বোটিং করতে যাব। পূর্ণিমার আলোয় তাজমহল দেখা সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে মার্বেল রক দেখার এ সুযোগ আর হাতছাড়া করছি না।'

'তাই নাকি সে তো খুব ভাল হবে।' বলে ফেললাম আমি।

রণবীরবাবু কাছাকাছিই ছিলেন কোথাও। আমাদের কথা শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসে বললেন, 'কিচ্ছু ভাববেন না। আমাদের নিজস্ব বোটে আপনাদের ঘুরিয়ে আনব। এখন রেডি হয়ে নিন। নিচের বাগানে বসে চা খেতে খেতে কথা হবে।'

মুখ হাত ধুয়ে নিচে নেমে এলাম। রণবীরবাবু আগে থেকেই বসে ছিলেন। আমরা যেতেই রামু এসে আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। খেতে খেতে রণবীরবাবু শুরু করলেন তার বক্তব্য।

'আমার ঠাকুরদা রায়বাহাদুর রামেশ্বর রায় সুদূর বাংলাদেশ থেকে এইখানে এসে স্টোনের ব্যবসা শুরু করেন। এস্টেটের ঐ পাশে আমাদের কারখানা'—বলে আঙুল তুলে

দেখালেন।

'হ্যাঁ, গতকাল আসবার সময় আপনার ম্যানেজারবাবু আমাদের দেখিয়েছেন।' রকিদা বলল।

হঠাৎ দূর থেকে একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখলাম দারোয়ান রায় এস্টেটের দরজা খুলে দিচ্ছে। আর ভিতরে প্রবেশ করছে একটা জীপ। 'মনে হচ্ছে পুলিশের জীপ'—প্রশ্ন করলাম আমি।

হ্যাঁ ঠিক বলেছ।' রণবীরবাবু বললেন। জীপটা রায় ভিলার সামনে এসে থেমে গেল। ভেতর থেকে নামল একজন সুদর্শন পুলিশ অফিসার।

'আসুন মিস্টার ভার্গব।' বলে উঠলেন রণবীরবাবু।

'আমি কিন্তু এসেছি মিস্টার সেনের কাছে।' পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন মিস্টার ভার্গব।

'কলকাতার পুলিশের অফিসার ভাদুরী হালদার চিঠিতে আপনার কথা লিখে জানিয়েছেন। আমি স্থানীয় থানার ও. সি.।

আপনি এত ভালো বাংলা শিখলেন কি করে?' প্রশ্ন করল রকিদা।'

আমি কলকাতায় বহুদিন ছিলাম। ওখানকার কলেজেই পড়াশুনো করেছি।' উত্তর দিলেন মিস্টার ভার্গব।

'ভালই হল মিস্টার ভার্গব। আমি একবার লতিকা দেবীর রান্নাঘরটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। যদি ওখানে হারানো আংটিটা পাওয়া যায়। আপনি থাকলে ভালোই হবে। কি বলেন রণবীরবাবু?'

'হ্যাঁ, তখন থেকেই তো রান্নাঘর বন্ধ রেখেছি। আর খুলতে পারিনি।' রকিদার কথার উত্তর দিতে গিয়ে রণবীরবাবুর গলাটা কান্নায় ধরে এল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আসুন সবাই।'

বাড়িটার এক কোণে রান্নাঘর। বাইরে থেকে তালা বন্ধ।

রণবীরবাবু তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। আমরাও তাঁর পিছন পিছন এগিয়ে গেলাম। ভিতরে প্রবেশ করতেই বদ্ধঘরের একটা চাপা গন্ধ নাকে এসে লাগল। চতুর্দিকে একটা ধুলোর আস্তরণ পড়ে গেছে। রান্নাঘরের চারদিকের দেওয়াল কিন্তু সুন্দর টালি দিয়ে সাজানো। টেবিলের ওপর স্টোভটা এখনও বসানো রয়েছে। একটা গোল প্লাস্টিকের বাটির মধ্যে বিভিন্ন রান্নার মশলা সাজানো রয়েছে। শুধু হলুদের বাটিটা উল্টে পড়ে গেছে। হলুদ লাগা চামচটা মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

'বিস্ফোরণের সময় লতিকাদেবী বোধহয় রান্নায় হলুদ মেশাচ্ছিলেন। তাই না রকিদা?' আমার প্রশ্নের উত্তরে রকিদা শুধু বলল 'গুড'।

'এই সমস্ত জিনিসে বোধহয় লতিকাদেবীর মৃত্যুর পর আর হাত দেওয়া হয়নি?' প্রশ্ন করল রকিদা।

'না' তারপর থেকে আমি আর এই ঘরই খুলিনি। উত্তর দিলেন রণবীরবাবু।

রকিদা ঘরের চারিদিক ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'কি আশ্চর্য্য, আপনি তো বলেছেন স্টোভ ফেটে লতিকাদেবীর মৃত্যু হয়েছে?'

রণবীরবাবু বললেন, হ্যাঁ তাই তো জানি। বিকট একটা শব্দ শুনে আমি আর নিমাইবাবু ছুটে আসি। অনেকটা বোমা ফাটার মতো শব্দ। ঘরে এসে দেখলাম লতিকা ঘরের মেঝেতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মুখটা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। মাথার পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে। তাড়াতাড়ি দুজনে ধরে ওকে জীপে করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। পথেই ওর জ্ঞান হারিয়ে যায়। সেই জ্ঞান আর ফেরেনি। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্যই লতিকাদেবীর মৃত্যু হয়েছে বলে ডাক্তার রিপোর্ট দেন।'

'মিস্টার ভার্গব, আমি এই সমস্ত জিনিসগুলোকে একবার ফরেনসিকে বিশ্লেষণ করাতে চাই।' রকিদা বলল।

'ঠিক আছে মিস্টার সেন, কয়েক দিনের মধ্যেই আমি আপনাকে রিপোর্ট দিয়ে যাব।' মিস্টার ভার্গব জানালেন। তারপর টুকিটাকি সমস্ত জিনিসগুলো একটা ব্যাগে ভরে ফিরে গেলেন।

।। ৩ ।।

রায় ভিলার নিজস্ব বোট 'চলন্তিকা'য় চেপে পূর্ণিমার রাতে আমরা দেখতে বেরিয়েছি মার্বেল রকের সৌন্দর্য। একটু আগেই রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। সকলেরই গায়ে গরম জামা-কাপড় রয়েছে। তাও বেশ শীত করছিল। তবে শীতটা উপভোগ করতে বেশ ভালোই লাগছে। রণবীরবাবু নিজেই বোট চালাচ্ছেন। দূর থেকে রায় ভিলার ছাতের আলোটা দেখা যাচ্ছে। আঁকা-বাঁকা পথে বোট চলেছে। দু'ধারে মার্বেল রক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝখান দিয়ে কুলু কুলু ধ্বনিতে বয়ে যাচ্ছে নর্মদা নদী।

মার্বেল রক কিন্তু মার্বেল পাথরের মতো সাদা নয়। ঈষৎ হলুদ রঙের। পূর্ণিমার আলোয় এক অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে। গতকাল দূর থেকে দেখে মার্বেল রকের এই সৌন্দর্যর কিছুই বুঝতে পারিনি। পাহাড়ের মাথায় প্রকৃতির তৈরি গাড়ি, হাতি ইত্যাদি দেখাতে দেখাতে রণবীরবাবু বললেন, 'লতিকার বড়ই প্রিয় ছিল এই জায়গা। প্রতি পূর্ণিমার রাতে আমরা এখানে বোটিং করতে আসতাম। আজ নিজেকে বড়ই একা লাগছে।' বলতে বলতে বড়ই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন রণবীরবাবু।

প্রসঙ্গ বদলাতে রকিদা এবার জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা নিমাইবাবু আপনার কত দিনের বন্ধু?'

'একদম ছোটবেলার বলতে পারেন। আমাদের সমস্ত উত্থান পতন ওঁর দেখা। খুবই সৎ লোক। বছর খানেক আগে আমাদের ম্যানেজার মারা যান হঠাৎই। তারপর থেকেই উনি দেখাশুনা করেন। উনি আমাদের এখানেই থাকা খাওয়া করেন।'

'ওনাকে কি আপনি মাইনে দেন?'

'হ্যাঁ, তা কিছু দিই বটে। তবে ভদ্রলোকের টাকা পয়সার কোনও লোভই নেই। রক্তমুখী নীলা হারিয়ে যাবার পর কি বলব মাঝে মাঝেই আমার ব্যবসায় লোকসান হতে শুরু হয়। কয়েক মাস ওনাকে মাইনেও দিতে পারিনি। উনিও কিন্তু কিছু চাননি।'

'আপনার ব্যবসা এখন কেমন চলছে?'

'এখন মন্দাই যাচ্ছে বলতে পারেন। নীলাটা হারাবার পর মনের জোরও কমে

গেছে।'

'নিমাইবাবুকে কি আপনিই চাকরি দিয়েছিলেন? নাকি ইনিই আপনার কাছে কাজ চেয়েছিলেন?'

'আসলে ম্যানেজারবাবুর মৃত্যুর পর চতুর্দিকে ঠিক চোখ রাখতে না পারায় ইনি নিজেই এসে আমায় বললেন, আমিই তো তোমরা ব্যবসা দেখাশুনো করতে পারি। মাইনে যা হয় দিও। ছোটবেলার বন্ধু। কথা ফেলতে পারিনি। রাজি হয়ে যাই।'

'উনি আগে কোথায় চাকরি করতেন?'

'উনি এখানকার এক নামকরা কলেজে অধ্যাপনা করতেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দেন।'

'আচ্ছা নীলা চুরির ব্যাপারে আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?'

'দেখুন নীলা যে চুরিই গেছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। তবে আমার এক দূর সম্পর্কের শালা আছে সে প্রায়ই লতিকার কাছে আসত টাকার জন্য। নানা রকমের বদ নেশাও আছে ছেলেটির। লতিকাও তাই আর ওকে টাকা দিতে চাইত না। এই নিয়ে দু-একদিন ঘরের ভিতর ঝগড়া হতেও শুনেছি।'

'লতিকাদেবীকে এ নিয়ে কিছু জিগ্যেস করেননি?'

'আজ্ঞে না। আমি ওর মধ্যে মাথা গলাতে চাইনি।'

'কিছু মনে করবেন না। একটা প্রশ্ন করছি, লতিকাদেবী নিমাইবাবুকে কি চোখে দেখতেন?'

'ঠিক নিজের ভাই-এর মতো।' হেসে উত্তর দিলেন রণবীরবাবু। এও বললেন যে নিমাইবাবুও ওনাকে দিদির মতো শ্রদ্ধা করত। প্রতি ভাইফোঁটায় ফোঁটা নিতে যেতেন। এমন কি মারা যাবার দিনও দিদির হাতে খিচুড়ি খেতে চেয়েছিলেন।

'লতিকা দেবীর ভাই কোথায় থাকে? একবার ওর সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'হ্যাঁ যাবে। সকালে যখন ধূমাধার জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে যাব, তখন ওর বাড়িতে যাব। ও ওদিকেই থাকে।'

দেখতে দেখতে 'চলন্তিকা' আবার ঘাটে ফিরে এল। মার্বেল রক দেখে বাড়ি ফিরে এলাম রাত সাড়ে বারটার সময়। দারোয়ান দরজা খুলে দিল। নিচে থেকে দেখলাম নিমাইবাবুর ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

'উনি কি এখনও জেগে থাকেন?' প্রশ্ন করল রকিদা।

'হ্যাঁ, প্রফেসার ছিলেন। পড়াশুনো করতে ভালোবাসেন। রাতে শুতে যেতে একটু দেরিই করেন।'

'গুড নাইট' বলে চলে গেলেন রণবীরবাবু। একটু পরে নিমাইবাবুর ঘরেও আলো নিভে গেল।

বোটিং করে আসার পর কেন জানি না খুব ক্লান্ত লাগছিল। দুজনে অন্ধকারে কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ দূর থেকে টর্চের একটা আলো যেন রায়ভিলার আশেপাশে ঘুরছে বলে মনে হল। রকিদার দিকে তাকালাম। রকিদাও এক মনে আলোর দিকে দেখছে। এইবার

দেখতে পেলাম। টর্চ হাতে কেউ একজন রায় ভিলার বাগানে হেঁটে যাচ্ছে।

রকিদা আমায় বলল, 'ঝুমি তুই ঘর বন্ধ করে থাক। আমি ফিরে এলে আস্তে করে খুলে দিবি। ভয় পাবি না। আমি দেখে আসি লোকটা কে?'

আমি দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে বসে ঘামতে লাগলাম এই শীতের রাতেও।

ঘণ্টাখানেক পরে রকিদা ফিরে এল। মনে এক রাশ চিন্তা। ফিরেই বলল, 'নে এবার ঘুমিয়ে পড়। লোকটা আর কেউ নয়। পরমেশ্বর রায়। রায় ভিলার আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়। উদ্দেশ্যটা বের করতে হবে।'

কাল আবার কি ঘটবে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

।। ৪ ।।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে মার্বেল রকের সৌন্দর্য দেখার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ পেছনে থেকে ডাক শুনলাম, 'কি খবর ঝুমি, কাল কেমন ঘুরলে?'

নিমাইবাবুকে দেখে বললাম, 'আরে আপনি দেখছি রাতেও দেরিতে ঘুমোন আর সকালে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন।'

হ্যাঁ বোন, আমি 'Late to bed and early to rise' নীতিতে বিশ্বাসী। জীবনের এতটা সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে নষ্ট করতে চাই না।' বলে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

'ভদ্রলোক তো খুব শিক্ষিত', তাই না রকিদা।

হ্যাঁ। সব বিষয়েই পণ্ডিত। Jack of all trades বুঝতে পারলি।'

হেসে ফেললাম আমি।

একটু পর রামু এসে বলল, 'বাবুদের ব্রেকফাস্ট রেডি হয়েছে।'

আমরা খেতে গেলাম। রণবীরবাবুও আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন। তারপর বললেন চলুন এবার বেরনো যাক।

ধুমাধার জলপ্রপাতের গর্জন আমরা দূর থেকে শুনতে পেলাম। কাছে গিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। এটাকে ঠিক জলপ্রপাত বলা চলে না। পুরো নর্মদা নদীটাই এখানে হঠাৎ পাহাড়ের মাথা থেকে নিচে আছড়ে পড়ছে। মার্বেল রকের শুরুও এখান থেকেই মনে হল। দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে গেছলাম। রণবীরবাবু এবার বললেন, 'চলুন যাই, এবার ঐ শালা দীপক বেটার কাছে।' সরু রাস্তা বেঁকে চলে গেছে। ভেতরে একটা ছোট গ্রাম। একটা চালাঘরের সামনে এসে রণবীরবাবু থামলেন। বাইরের একটা দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে আছে একটা লোক। বয়স বছর তিরিশ হবে। রণবীরবাবুই ডেকে ঘুম থেকে তুললেন। ঢুলুঢুলু চোখে ঘুম থেকে উঠে জিগ্যেস করল 'কি ব্যাপার? হঠাৎ আমার বস্তিতে আসা কেন?'

'এরা কলকাতা থেকে এসেছেন। বেড়াতে বেড়াতে এদিকে চলে এলাম।'

'ও নমস্কার।' বলে দীপকবাবু সোজা তাকাল রকিদার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে নানা সন্দেহ। চেহারাটা লোফারের মতো। চোখ দুটো ভেতরে ঢুকে গেছে। চোয়ালটাও

ঢোকা।

'আপনি লতিকাদেবীর ভাই?' প্রশ্ন করল রকিদা।

'হ্যাঁ, তবে নিজের নয়। ওনার এক দূর সম্পর্কের কাকার ছেলে আমি। এখানে পড়াশুনা করতে এসেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারলাম না। তাই এখানে থেকে ব্যবসা শুরু করলাম। মার্বেল রকে নৌকা বিহার করার জন্য যে সিঁড়ি দিয়ে ঘাটের দিকে নামা হয়, তার ডানদিকেই আমার দোকান। নানা ধরনের সফ্ট স্টোনের পুতুল বিক্রি করি। আমার চলে যায় কোনও রকমে। সংসার এখনও করিনি। করার ইচ্ছেও নেই। কিছুদিন আগে শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলতে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে বসেছি। তার ওপর দিদিকেও হারালাম।'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে হঠাৎ একদম চুপ করে গেলেন দীপকবাবু।

'যদি কিছু মনে না করেন দীপকবাবু আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই? দিদির ব্যাপারে।'

'ও বুঝেছি—আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন গোয়েন্দাগিরি করতে। কিন্তু পারবেন কি ঐ নীলা উদ্ধার করতে। ওটা অভিশপ্ত। হারিয়ে গেছে ভালোই হয়েছে'—বলে উঠলেন দীপকবাবু।

'দেখাই যাক না চেষ্টা করে। আপনি আমায় কি এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন? তাহলে রবিবার বিকেলে চায়ের একটা পার্টি দিচ্ছি আমি। রণবীরবাবুর বাড়িতে। আসবেন কিন্তু। কিছু নতুন খবর শোনাব।'

'নিশ্চয়ই যাব'—বললেন দীপকবাবু।

'অদ্ভুত লোক।' বললাম আমি।

'ঠিক বলেছ।' রণবীরবাবু উত্তর দিল। ফিরতে ফিরতে বেলা হয়ে গেল। বাড়িতে এসে দেখলাম রামু আর নিমাইবাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। যেতেই বললেন, 'পুলিশ অফিসার মিস্টার ভার্গব আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

কাছে যেতেই, মিস্টার ভার্গব রকিদাকে নিয়ে একটু দূরে সরে গেলেন। তারপর অনেকক্ষণ দুজনে কি কথা হল জানি না। এক সময় মিস্টার ভার্গব চলে গেলেন। ওপরে ওঠার সময় একবার নিমাইবাবুর ঘরে রকিদা হঠাৎ ঢুকে পড়ল। পেছনে পেছনে এলাম আমিও। নিমাইবাবু ঘরে ছিলেন না। বাথরুমে গেছলেন। পাঞ্জাবিটা বিছানায় পড়ে আছে। ঘরদোর একদম অগোছালো। সিগারেটের একটা প্যাকেট বিছানায় পড়ে আছে।

'কি আশ্চর্য্য—নিমাইবাবু সিগারেট খান। অথচ জব্বলপুর থেকে ভেড়াঘাট আসার পথে ওনাকে একটাও সিগারেট খেতে দেখিনি।' সিগারেটের প্যাকেটটা একবার হাতে তুলে রেখে দিল রকিদা। তারপর বলল, 'যথেষ্ট দামী সিগারেট। বুঝলি ঝুমি, ভদ্রলোক ৫৫৫ সিগারেট খান। দামি সিগারেট বলে সকলকে এড়িয়ে একা একা খান।'

একটু পরে নিমাইবাবু ফিরলেন। আমাদের দেখে লজ্জা পেয়ে বললেন, 'কখন এসেছেন ঘরে, দেখতে পাইনি।'

'এই তো এইমাত্র এলাম। আপনাকে একটু বিরক্ত করব।'

সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে ভরতে ভরতে নিমাইবাবু বললেন, 'বলুন না কি

বলবেন?'

'আপনার ঘরে তো নানা ধরনের বই দেখছি। Medical Science, Chemistry ছাড়াও দর্শন শাস্ত্রেও আপনার পড়াশুনো রয়েছে দেখছি।'

'হ্যাঁ আমি বিভিন্ন বিষয় পড়তে ভালোবাসি।'

'আপনি কোন কলেজে অধ্যাপনা করতেন?'

'আজ্ঞে এখানকার রয়্যাল কলেজের অধ্যাপক ছিলাম।'

'আচ্ছা রণবীরবাবুর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা স্বরে উত্তর দিলেন নিমাইবাবু, 'ভালো নয়।'

'কেন?'

'ইদানীং রণবীরবাবুর ব্যবসা ভালো না চলায় উনি প্রায়ই লতিকাদেবীর গয়না বন্ধক রেখে টাকা যোগাড় করতেন। এই নিয়েও ওদের প্রায়ই ঝগড়া হোত। এমন কি মৃত্যুর আগের দিন রাতেও ওদের তুমুল ঝগড়া হয়। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় লতিকাদেবী কি আত্মহত্যা করলেন?'

'আর লতিকাদেবীর ভাই সম্পর্কে কি জানেন?'

'হ্যাঁ ওনার একজন ভাই আছে বটে, যে দিদির কাছে প্রায়ই আসত টাকার জন্য। দুদিক থেকে টাকার চাপে লতিকাদেবী খুব কাহিল হয়ে পড়েছিলেন?'

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যে ঐ আংটি লতিকাদেবী ভাইকে দিয়েছিলেন?

রকিদার প্রশ্নের উত্তরে নিমাইবাবু কি যেন একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'হতেও পারে। তবে ঐ আংটি তো লতিকাদেবী কখনও কাছছাড়া করতেন না। দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে যাবার পথে হাত থেকে খুলেও গিয়ে থাকতে পারে। কারণ তখন আমাদের কারোরই আংটির দিকে নজর ছিল না। পরে জানতে পারলাম রক্ত নীলা হারিয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে' বলে রকিদা উঠে বলল, আর আপনাকে বিরক্ত করব না। তবে রবিবার বিকেলে কিন্তু থাকবেন। কিছু নতুন তথ্য দিতে পারব।'

উঠে এলাম আমরা। রকিদা বলল, 'আজ রাতে আমি বাইরে খাব, বুঝলি ঝুমি। মিস্টার ভার্গবের বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে তুই খেয়ে শুয়ে পড়বি। কিন্তু ঘুমোবি না। রাতে ফিরলে আমায় দরজা খুলে দিবি। আজ একবার রয়্যাল কলেজে যেতে হবে। আর যেখান থেকে রণবীরবাবু শুনলাম টাকা ধার করতেন সেখানেও যাব।

।। ৫ ।।

বিকেলবেলা রণবীরবাবুর ড্রইংরুমে আমরা সবাই জড় হয়েছি। আমরা মানে আমি, রকিদা, রণবীরবাবু, নিমাইবাবু, দীপকবাবু, আর বাড়ির চাকর রামু। রকিদার মুখে শুনেছি মিস্টার ভার্গবও আসবেন। ভাবতে ভাবতেই মিস্টার ভার্গবের জীপ এসে হাজির হল।

'রকিদা বলে উঠল, আসুন মিস্টার ভার্গব। আপনার জন্যই সকলে অপেক্ষা করছি।'

এবার শুরু করল রকিদা, শুনুন সবাই। আজ আমি এমন একটা খবর শোনাবো যাতে সকলেই আপনারা অবাক হয়ে যাবেন।'

'কি খবর?' প্রশ্ন করলেন রণবীরবাবু।

'রকিদার ঘোষণায় সবাই একটু নড়ে চড়ে বসল। একজনের কিন্তু একটু পরিবর্তন দেখলাম না। শুধু পকেটের ওপর হাতটা একবার বুলিয়ে নিল। লোকটি আর কেউ নয়। মরীয়া প্রকৃতির দীপকবাবু। এবার রকিদা শুরু করল—

'আমরা শুনেছি লতিকাদেবী খিচুড়ি বানাতে রান্নাঘরে ঢুকেছিলেন মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে। তারপরই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। সবাই ছুটে এসে দেখেন লতিকাদেবী রান্নাঘরে শুয়ে পড়ে ছটফট করছেন। এরপর হসপিটালে তাঁর মৃত্যু হয়। পথেই তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন। সে জ্ঞান আর ফেরেনি। সবাই জানতেন যে স্টোভ ফেটে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কেউ খেয়াল করলেন না যে স্টোভ যেমন ছিল, তেমনই আছে। পুরো অক্ষত অবস্থায়।'

'তাহলে লতিকার কিসে মৃত্যু হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করলেন রণবীরবাবু।

'লতিকা দেবীকে খুন করা হয়েছে একটি বিস্ফোরকের সাহায্যে। যার নাম 'পিকরিক অ্যাসিড'। এটি দেখতে হলুদের গুঁড়োর মতো। কেউ ঠাণ্ডা মাথায় এটিকে হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। ফরেনসিক রিপোর্টে তাই পাওয়া গেছে। আগুনের কাছে আনলে এটিতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে খুনি এটা ভালো করেই জানত। লতিকাদেবী কিছুই বুঝতে পারেননি। রান্নায় হলুদ মেশাতে গেছলেন অন্যদিনের মতোই। আগুনের কাছে যেতেই ঘটে বিস্ফোরণ।'

লতিকাদেবীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কিন্তু একটি মানুষের লোভ। সামান্য লোভের জন্য মানুষ যে কত নিচে নামতে পারে লতিকা দেবীর মৃত্যু তারই প্রমাণ।

রায় ভিলার এই ঐশ্বর্যের মূলে আছে একটি আংটি। সেটা হল রক্তমুখী নীলা। যা লতিকাদেবীর হাতে সর্বক্ষণ থাকত। ঐ আংটি পরলেই বড়লোক হতে পারব এই আশায় অনেকেই ঐ আংটি লতিকাদেবীর কাছে চাইত। দীপকবাবু আপনিও তো কয়েকবার চেয়েছিলেন? তাই না?'

'হ্যাঁ, তবে দিদি তা দেয়নি। তবে বিশ্বাস করুন তার জন্য দিদিকে আমি খুন করিনি। নেহাতই বড়লোক হবার বাসনায় কিছুদিনের জন্য আংটিটা ওনার কাছে ধার চেয়েছিলাম।' দীপকবাবু বলে উঠলেন।

আবার কথা শুরু করল রকিদা—'আংটিটা হাতাবার জন্য খুনি প্রথমে লতিকাদেবীকে মোটা টাকার অফার দেয়। তাতেও উনি রাজি হননি। ওদিকে এ সমস্ত কথা রণবীরবাবুকে জানানো হলে তাকেও খুন করা হবে বলে শাসানো হয়। ভয়ে লতিকাদেবী কাউকে কিছু বলতেন না। এদিকে আংটির লোভ প্রবল হয়ে ওঠায় খুনি এবার অন্য পথ ধরে। রসায়ন শাস্ত্রে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। বাড়ির যে কোনও জায়গায় যাবার অবাধ অধিকার ছিল তাঁর। তাই রান্নাঘরে ঢুকে 'পিকরিক অ্যাসিড' হলুদের মধ্যে মিশিয়ে আসতে খুনির কোনও অসুবিধাই হয়নি! আর জ্ঞানহীন লতিকাদেবীর হাত থেকে আংটিটাও খুলে ফেলেছিল খুব সহজেই।'

'এইবার রণবীরবাবু বলুন, আপনার তো একজন কাকা আছেন। যার কথা আমায় সম্পূর্ণ চেপে গেছেন। যে কিন্তু সব সময়ই আপনাদের রায় ভিলার আশেপাশেই নজর রাখে। লতিকাদেবীর এই আংটির আসল মালিক কিন্তু তিনি তাই না?'

মাথা নিচু করে রণবীরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ এই আংটি আসলে আমার কাকা পরমেশ্বর রায়ের। উনি ছিলেন অবিবাহিত। ঘর ছেড়ে প্রায়ই চলে যেতেন কোথায় কেউ জানত না। কয়েক বছর পর পর হঠাৎ এসে আবির্ভাব হতেন। আমার বাবা রামকিঙ্কর রায় একদিন ওনার ঐ আংটিটা চাওয়ায় উনি এটা দিয়ে বলেছিলেন, 'দিতে পারি কিন্তু একটা শর্তে। যখন চাইব ফেরত দিতে হবে। বাবা রাজি হয়ে যান। আংটি ধারণ করার পর আমাদের শুরু হয় চরম উন্নতি। ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। প্রচুর অর্থের মুখ দেখি আমরা। তারপর বাবার মৃত্যুর পর আমি ধারণ করেছিলাম ঐ আংটি। কিন্তু তারপরই শুরু হয় ব্যবসার ক্ষতি। একে একে সব কিছু হারাতে থাকি। তখন বাধ্য হয়ে একদিন একজন নামকরা জ্যোতিষীর কাছে যাই। তিনি দেখে বলেন, এই নীলা তোর সহ্য হবে না, এটা তুই তোর স্ত্রীকে ধারণ করতে বলবি। কি আশ্চর্য তারপর থেকেই কিন্তু আবার উন্নতি হতে শুরু করে। এর মধ্যে বহু বছর পর একদিন কাকা হঠাৎ ফিরে আসেন। আমার কাছে আংটি ফেরত চান। আমি দিতে অস্বীকার করি। উনি বলেন, যতই অর্থের মুখ দেখ না কেন, এই অভিশপ্ত আংটিতে কখনও পুত্র, কন্যার মুখ দেখবে না। এরপর কাকা চলে যান। তবে তাঁর কথাটাও কিন্তু সত্যি হয়েছে। আমার কোনও পুত্র বা কন্যা লাভ হয়নি।

'আপনার আংটি যে হারিয়ে গেছে, সে খবর কিন্তু কাকা পেয়ে গেছেন এবং বাড়ির আশেপাশেই গা ঢাকা দিয়ে আপনাদের ওপর নজর রাখছেন' রকিদা বলে উঠল।

'তাহলে আজ উনি আসছেন না কেন?' প্রশ্ন করল রণবীরবাবু।

'হ্যাঁ সেটা ভাববার আছে।' তবে তার আগে একটা সিগারেট খাওয়া দরকার। অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে পড়েছি। বলেই এগিয়ে গেল নিমাইবাবুর কাছে। আপনার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা আমায় দিন তো।'

'এই নিন' বলে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে রকিদার দিকে এগিয়ে দিলেন নিমাইবাবু।

'না, না একটাতে হবে না। আমরা অনেকেই খাব। বলেই রকিদা এক ঝটকায় পুরো প্যাকেটটা নিমাইবাবুর হাত থেকে নিয়ে নিল।'

'করছেন কি'—রাগ করেই বলে উঠলেন নিমাইবাবু।

'কিছুই না নিমাইবাবু। সেদিন খিচুড়ি খাওয়ার সখ তো আপনারই হয়েছিল তাই না? আপনারই অনুরোধে লতিকাদেবী খিচুড়ি বানাতে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি?'

'কারণ আপনি জানতেন যে খিচুড়িতে হলুদ লাগে বেশ কিছুটা। তাই ওর মধ্যে পিকরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিয়েছিলেন। কলেজে বিস্ফোরক বানানোর জন্য অনেক আগেই আপনাকে চাকরি ছাড়তে হয়েছিল। এ সবই আমি জানতে পেরেছি। বিস্ফোরণের পরই লতিকাদেবীর হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়েছিলেন সবার অলক্ষ্যে। এবার এও জানতেন যে নীলা নিজের কাছে না রাখলে কোনও কাজই হবে না। তাই অনেক বুদ্ধি করে আংটি থেকে পাথরটা খুলে রেখে দিলেন এইখানে। আর সর্বক্ষণ তা পকেটে ভরে রাখতেন। কিন্তু এত করেও পারলেন না। ধরা পড়ে গেলেন। আসলে নীলা

কারো সয়, কারো সয় না। বলে একটা সিগারেট বের করে সবার সামনে মশলাটা বের করতে শুরু করল রকিদা। একটু পরেই মেঝেতে ঠক করে কি যেন একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে রকিদা বলল, দেখুন তো রণবীরবাবু, এই আপনাদের রক্তমুখী নীলা কিনা?'

'হ্যাঁ এটাই তো।' বলে উঠল রণবীরবাবু।

সবাই নীলা দেখতে ব্যস্ত। হঠাৎ দরজার দিকে এক পা এক পা করে পিছু হঠতে লাগল নিমাইবাবু। হাতে একটা রিভলবার। 'কেউ এগোলেই গুলি চালাব।' বলে দরজার কাছে চলে এলেন ক্রমশ। ঠিক তখনই পেছন থেকে এক বৃদ্ধ তার হাতের লাঠি দিয়ে নিমাইবাবুর পা-টা টেনে ধরল। আর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি। ছুটে এসে মিস্টার ভার্গব বললেন, 'নদের নিমাই, এবার হাত দুটো ওপরে তোলো তো বাছা।'

মাথা নিচু করে হাত তুললো নিমাইবাবু।

'এবার একে আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম মিস্টার ভার্গব। কোর্টে এর অপরাধ প্রমাণ করার ভার আপনাকে দিলাম।' রকিদা হেসে বলল।

আর বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরলেন রণবীরবাবু। বললেন, 'কাকা আমায় ক্ষমা কর। এই নাও তোমার নীলা। এ তো আমার সইবে না। তোমায় ফেরত দিলাম। আর একটা অনুরোধ এখন থেকে শুধু রায় এস্টেটেরই নয়, আমাদের পুরো সংসারের ম্যানেজারের দায়িত্বও তোমাকে দিলাম।'

'সাবাশ গোয়েন্দা ভাই। আমি অনেকক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। বলেছিলাম না ঠিক সময়ে আসব।' রকিদার দিকে ফিরে বলে উঠলেন বৃদ্ধ অর্থাৎ ট্রেনে দেখা আমাদের সেই পরমেশ্বর রায়।

'কলকাতায় যাবার আগে তুমি, ঝুমি আর আমি কয়েকদিন খাজুরাহো ঘুরে আসি বুঝলে রকি।'

'ঠিক আছে আপনাদের যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা আমিই করে দেব।'

রণবীরবাবুর কথায় সবাই রাজি হয়ে গেলাম।

গিরিধারী-রহস্য

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

বালিগঞ্জের যে অংশটা নতুন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই একধারে বাগানওয়ালা একখানা বাড়ি। ফটকের উপরে পিতলের ফলকে ইংরাজিতে লেখা—সতীনাথ মল্লিক, প্রাইভেট্ ডিটেকটিভ।

সকাল সাতটা। সতীনাথবাবু আরাম-কেদারায় শুইয়া খবরের কাগজ উল্টাইতেছেন। আজ প্রায় ৫/৭ দিন পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়াছেন—এ কদিন কি একটা কাজে এক অজ-পাড়াগাঁয়ে তাঁহাকে কাটাইতে হইয়াছে। সভ্য জগৎ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন সে দেশ, এ ক'দিনে একবারের জন্যও কোনো খবরের কাগজের সঙ্গে তাঁহার মোলাকাত হয় নাই।

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ একটা খবরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। খবরটি এই রকম ঃ

"আজ তিন দিন হইয়া গেল বিখ্যাত ধনী মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গিরিধারীলাল ঠুনঠুনিয়ার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। পুলিসের সমস্ত চেষ্টাই কি বিফল হইল? গত দুই মাসের মধ্যে এরূপ আরও দুইটি বড় বড় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু আসামী

আজও ধরা পড়ে নাই। শ্রীযুক্ত গিরিধারীলাল যেভাবে নিখোঁজ হইয়াছেন তাহাতে এ ব্যাপারটিকেও অনুরূপ রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড বলিয়া লোকে স্বভাবতঃই সন্দেহ করিবে। এ রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিবে না।"

খবরটি পড়া শেষ হইলে সতীনাথ বাবু চোখ তুলিলেন। সামনের চেয়ারে যে লোকটি বসিয়াছিল তাহার নাম চন্দ্রকান্ত। ছোকরা খুব উৎসাহী। তাহার বড় ইচ্ছা সতীনাথ বাবু তাহাকে সহকারী করিয়া লইয়া বড় বড় রহস্যের তদন্তে সঙ্গে রাখেন ; সেই উদ্দেশ্যে সে প্রায় রোজই এখানে হাজিরা দেয়। সতীনাথবাবু কহিলেন, "গিরিধারী? নামটা যেন খুব চেনা চেনা লাগছে—কে বল তো?"

চন্দ্রকান্ত উৎসাহের সঙ্গে বলিল, "হ্যাঁ স্যার, ব্যাঙ্ক অব্ কুভেরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যার্! তা ছাড়া আরও অনেকগুলি বড় বড় ব্যবসার সঙ্গেও এঁর যোগ আছে স্যার্! ঠুনঠুন-চাকী কোম্পানীর সিনিয়ার পার্টনারও তো উনিই। এই কেস্‌টা নিয়ে, স্যার্, শহরে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে।"

"ওঃ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কোথাকার লোক বল তো?"

"আদি বাড়ি ছিল স্যার্, কনোজে না যোধপুরে—কিন্তু এখন খাঁটি বাঙালি বনে গেছিলেন স্যার্! চেহারা, চালচলন—সব স্যার্, বাঙালির মতো ছিল। এমন দাড়ি স্যার্, কোনো মাড়োয়ারীর কোনোদিন দেখিনি। আপনি নিন্ না স্যার্, কেসটা হাতে।"

"তা কি হয় হে? গায়ে পড়ে এসব ব্যাপারে কি মাথা গলানো যায়?"

সতীনাথবাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সতীনাথ বাবু রিসিভারটা তুলিয়া লইয়া কহিলেন "হ্যালো।"

অপর দিক হইতে নারীকণ্ঠে সাড়া আসিল—"আমি প্যারীনগর থেকে বলছি। হ্যাঁ, মিসেস ঠুনঠুনিয়া। আপনি কি মিস্টার মল্লিক? কাগজে মিঃ ঠুনঠুনিয়ার খবর দেখেছেন বোধ হয়? আজ দুদিন থেকে আপনার খোঁজ করছি। আপনার হাতে ভার দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। তারপর আমার কপাল। না, না, পুলিশের লোক আপনাকে সঙ্গে পেলে খুশিই হবেন। তা হলে আপনি এখনই রওনা হবেন তো? মাত্র দু-ঘণ্টার পথ। স্টেশনে লোক রাখব। নমস্কার।"

সতীনাথবাবু রিসিভার রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার কথাই রাখতে হল চন্দ্রকান্ত! গিরিধারী-রহস্য উদ্ধার-কার্যে ওঁরা আমার সাহায্য চান। এখনই রওনা হতে হবে। চল, তুমি আমার সঙ্গে চল।"

চন্দ্রকান্ত পুলকে বিগলিত হইয়া কহিল, "এক্ষুণি স্যার্। দু-মিনিটে তৈরি হয়ে নিচ্ছি স্যার্।"

প্যারীনগর কলিকাতা হইতে ট্রেনে মাত্র দু-ঘণ্টার পথ। কিছুদিন যাবত গিরিধারীলাল এইখানেই এক বিরাট বাড়ি হাঁকাইয়া বাস করিতেছিলেন। পাড়াগাঁ হইলেও জায়গাটায় শহরের প্রায় সব সুবিধাই আছে। অধিকন্তু বিরাট বাগান-পুকুর ইত্যাদি থাকায় স্থানটি আরও লোভনীয়।

সতীনাথবাবু পৌঁছিতেই মিসেস ঠুনঠুনিয়া নিজে আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। চন্দ্রকান্ত মিথ্যা বলে নাই, পোশাক-আশাক, চালচলন—সর্ববিষয়ে ইহারা হাল ফ্যাসানের বাঙালি

পরিবার বনিয়া গিয়াছেন। গিরিধারী-জায়ার সঙ্গে আরও দুটি ভদ্রলোককে দেখা গেল, ইঁহাদের একজন মিস্টার অধিরথ চাকী—ঠুনঠুন-চাকী কোম্পানীর পার্টনার, অপর জন স্থানীয় দারোগা অবিনাশবাবু। মিনিট কয়েক আলোচনার পর সতীনাথবাবু ইঁহাদের কাছ হইতে যে যে তথ্য আবিষ্কার করিলেন তাহা এই ঃ

৩রা জুন শনিবার বৈকাল পর্যন্ত গিরিধারীলাল প্যারীনগরে নিজের বাড়িতেই ছিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যা সাতটায় তাঁহার কাছে কলিকাতা হইতে জয়রাম নন্দীর আসিবার কথা ছিল। বিকাল প্রায় ছটার সময় গিরিধারীলাল বাড়ি হইতে পদব্রজে বাহির হন। যাইবার সময় বলিয়া যান তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরিবেন। ইতিমধ্যে জয়রামবাবু আসিলে তাঁহাকে যেন তাঁহার লাইব্রেরী ঘরে বসিতে দেওয়া হয়। সেই যে তিনি বাহির হন আর ফেরেন নাই। সাতটার কিছু আগে জয়রামবাবু আসেন, এবং কর্তার কথামতো লাইব্রেরী ঘরে তাঁহাকে বসিতে দেওয়া হয়। প্রায় সাড়ে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে তিনি চলিয়া যান।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত গিরিধারীলাল বাড়ি না ফেরায় তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য লোক বাহির হয় এবং পুলিসে খবর দেওয়া হয়। প্যারীনগরের আশেপাশে তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হয় কিন্তু কোনো সন্ধান মেলে না। কাছাকাছি একটিই স্টেশন। স্টেশনের সকলেই গিরিধারীলালকে ভালো করিয়া চেনে, কাজেই ট্রেনে করিয়া যে তিনি কোথাও যান নাই তাহা নিশ্চিত। মোটরকারও গ্যারেজেই রহিয়াছে। ভাড়াটে গাড়ি বা ট্যাক্সি প্যারীনগরে বেশি পাওয়া যায় না। আর যদি সেরূপ কোনো গাড়িতে তিনি গিয়াও থাকিতেন তাহা হইলেও এতক্ষণে গাড়োয়ান বা ড্রাইভার নিশ্চয় সে খবর জানাইত। কারণ এই অন্তর্ধানের ব্যাপার ঐ তল্লাটের কাহারও জানিতে বাকি নাই। মিসেস ঠুনঠুনিয়া তাঁহার স্বামীর সন্ধানের জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। হাঁটাপথেও বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয়—যাইবার কোনো সঙ্গত কারণও পাওয়া যায় না। আর একটা ব্যাপারে বিষয়টি সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। বাড়ি হইতে মাইল খানেক দূরে একটা ছোট মতো বিল আছে। তাহারই ধারে গিরিধারীলালের একটি ধুতি ও একটি পাঞ্জাবী পাওয়া গিয়াছে। তিনি কি তবে আত্মহত্যা করিলেন? না কেহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া বিলে ফেলিয়া দিল? কিন্তু তা যদি হইবে তবে আজ তিন দিন পরে মৃতদেহ জলে ভাসিয়া উঠিবার কথা। কিন্তু সেরূপ কিছু হয় নাই। বিলের মধ্যে জাল ফেলিয়াও কিছু পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু সবচেয়ে বড় ঘটনা আবিষ্কার করা হইয়াছে আরও পরে, রবিবার বিকালে। শনিবার ঐ ঘটনার পর কেহ অন্য দিকে মন দেয় নাই, কিন্তু রবিবার বিকালে দেখা যায় লাইব্রেরী ঘরের কোণে যে লোহার সিন্দুকটি থাকিত তাহার কপাট ভাঙা এবং ভিতরের যা কিছু মূল্যবান সামগ্রী সব অদৃশ্য হইয়াছে। ব্যাঙ্ক অব্ কুভেরের অনেক জরুরি দলিলপত্র ও নগদ লাখ খানেক টাকা এবং মিসেস ঠুনঠুনিয়ার অনেকগুলি মূল্যবান হীরা-জহরতের অলংকার ঐ সিন্দুকে ছিল। বছরখানেক হইল গিরিধারীলালের দামী দামী হীরা-জহরৎ সংগ্রহের কেমন যেন একটা ঝোঁক চাপিয়াছিল। গত বছর ঠিক এই সময়ে মাস কয়েকের জন্য তিনি কাশ্মীর, বোম্বাই, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ান। দেশভ্রমণ করিয়া তাঁহার একটু জাঁকজমকের দিকে নজর আসে। তারপর হইতে প্রতি মাসেই তিনি কিছু না কিছু মূল্যবান অলংকার তাঁহার স্ত্রীর জন্য কিনিতেন।

সেগুলির সবই এই সিন্দুকে ছিল এবং সবই লোপাট হইয়াছে। শনিবার সন্ধ্যাবেলা বাড়ির ঝি মোক্ষদা নাকি একটি অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তিকে বাগান হইতে লাইব্রেরী ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়াছিল। ঐ ঘরে তখন জয়রাম নন্দী বসিয়াছিলেন।

সমস্ত শুনিয়া সতীনাথবাবু মিনিট খানেক চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন, তারপর অবিনাশবাবুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, এই জয়রামবাবুটি কে তা জানা গেছে?"

"হ্যাঁ, ইনি একজন শেয়ারের দালাল। বেশ পয়সাওয়ালা লোক। মহীশূরের কাছে কোথায় নাকি একটা বড় সোনার খনি বেরিয়েছে, তারই শেয়ার বিক্রি সম্বন্ধে কথাবার্তার জন্য নাকি এঁকে ডাকা হয়েছিল।"

"কিন্তু এঁর ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক নয় কি? মোক্ষদা ঝি যে লোকটিকে সন্ধ্যাবেলা দেখেছিল বলছে তার সম্বন্ধে এঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন নিশ্চয়ই?"

"হাঁ, যতদূর মনে হয় ইনিই সেই লোক। প্রথমটা তো স্রেফ অস্বীকারই করেছিলেন। তারপর চেপে ধরতে স্বীকার করেন যে মিনিট কয়েকের জন্য তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে গিয়েছিলেন। কিছু দূরে এক থোকা গোলাপ দেখে লোভ সামলাতে পারেননি, ফুলটা তুলে আনবার জন্য একবার উঠেছিলেন।"

"বেশ কবি লোক দেখছি। শেয়ারের দালালি করেও এসব দিকে মরচে পড়েনি।"

ঘরের সবাই মৃদু হাসিল। অবিনাশবাবুও হাসিয়া কহিলেন, "শুধু কবি নয়, চেহারাও বেশ সৌখীন ; লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, গোঁফ নাকের নিচে সিকি ইঞ্চিটাক রেখে দু'পাশ সযত্নে কামানো, ইত্যাদি। যাক কবিটিকে আমরা নজরবন্দী রেখেছি। দরকার হলেই গ্রেপ্তার করব।"

আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্নাদির পর সতীনাথবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—কোনো নূতন তথ্য পাইলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে টেলিফোনে জানান হয়।

পরদিন। সতীনাথবাবু একটা জরুরি চিঠি লিখতে ব্যস্ত, সামনে বসিয়া চন্দ্রকান্ত পেয়ালার পর পেয়ালা চা নিঃশেষ করিতেছে, এমন সময় সশব্দে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

অবিনাশবাবু ফোন করিতেছেন, একটা বড় রকম নতুন খবর আছে। গিরিধারীলাল আঙুলে সব সময়ে একটা বড় আংটি ব্যবহার করিতেন, তাহার ভিতর দিকটায় তাঁহার নাম খোদাই করা ছিল। শনিবার রাত্রে সেই আংটিটি অদ্ভুত ভাবে রতনলাল নামে এক দাগী আসামীর কাছে পাওয়া গিয়াছে। লোকটা মাতাল অবস্থায় রাস্তার এক পাহারাওয়ালাকে ধরিয়া মারপিট করে। থানায় লইয়া তল্লাসী করায় তাহার কাছে ঐ আংটিটা পাওয়া যায়। আংটি পাওয়া সম্বন্ধে সে যে গল্প ফাঁদিয়াছে তাহাও বেশ মজার। শনিবার বিকালে সে নাকি প্যারীনগর হইতে সাত মাইল দূরে গোলাবাড়ির হাটে গিয়াছিল। হাটে দু' পয়সা কামাইয়া সে হাঁটিয়া প্যারীনগর স্টেশনে যাইতেছিল। পথে বিশ্রাম করিবার জন্য একটা গাছের আড়ালে খানিকক্ষণের জন্য বসে। এমন সময় একটি আধাবয়সী ভদ্রলোককে সে আসিতে দেখে। ভদ্রলোককে দেখিয়া বেশ সৌখীন মনে হয়। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, নাকের নিচে সামান্য একটু গোঁফ, বাকীটা কামানো। রাস্তা তখন একেবারে ফাঁকা।

রতনলাল যেখানে বসিয়াছিল সে জায়গাটাও রাস্তা হইতে চোখে পড়ে না। ভদ্রলোক সেইখানে আসিয়া থামেন। তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া কি একটা জিনিস দূরে মাঠের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যান। ভদ্রলোক চলিয়া যাইতে রতনলাল কৌতূহলের বশে ফেলিয়া দেওয়া জিনিসটির খোঁজ করে—এবং অবাক হইয়া দেখে সেটি আর কিছু নয়—এই আংটিটি। বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে তাহার একটু বেশি রকম স্ফূর্তি আসে এবং তাহা ভালো করিয়া জমাইবার জন্য সে শহরে আসিয়াই এক পেট মদ খাইয়া ফেলে। তার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহা তো আগেই বলিয়াছি।

সতীনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, এই রতনলাল লোকটির আগেকার ইতিহাস কি বলছিলেন? দাগী আসামী বলছিলেন না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। গত বছর ঠিক এই সময়ে সে এক ভদ্রলোকের পকেট মেরে ধরা পড়ে, ফলে তিন মাস জেল খাটতে হয়। তারপর থেকেই পুলিস তাকে চিনে রেখেছে।"

"হুঁ। আচ্ছা অবিনাশবাবু, আমাকে দয়া করে আর একটা খবর জেনে দেবেন?"

"নিশ্চয়, সম্ভব হলে অবশ্যই দেব।"

"দয়া করে খবর নিয়ে আমাকে জানাবেন গিরিধারীলাল কি রাত্রে একা ঘরে শুতেন? আর একা শুলে কত দিন থেকে শুতেন? আর চশমা কি তিনি অল্প বয়স থেকেই ব্যবহার করতেন? হ্যাঁ, শুধু এই খবরটুকু।"

সতীনাথবাবু টেলিফোন রাখিয়া দিয়া চন্দ্রকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি হে চন্দর, কিছু আঁচ করতে পারলে।"

"আজ্ঞে স্যার্, বারো আনা ঠিক হয়ে গেছে। এখন স্যার্, জায়গাটা আর একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারলেই মনে হয় ক্লু' পেয়ে যাব। স্যার্, আজ একবার যাবেন প্যারীনগর?"

"বেশ তো, ঘুরে এস না। তুমি গেলেই চলবে। আমার একটু কাজ আছে।"

চন্দ্রকান্ত শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা স্যার্, আমিই যাব।"

কয়েক ঘণ্টা পরে অবিনাশবাবু আবার ফোন করিলেন। গিরিধারীলাল রাত্রে একা ঘরেই শুইতেন, গত বছর সেই যে তিনি তিন মাসের জন্য দেশভ্রমণে গিয়াছিলেন তাহার পর হইতেই। ঐ সময় তাঁহার বয়স চল্লিশ পার হওয়া ডাক্তারের পরামর্শ মতো চশমার ব্যবহার সুরু হয়। আগে তাঁহার চোখ ভালোই ছিল।

টেলিফোন রাখিয়া দিয়া সতীনাথবাবু আপন মনে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বিশেষ চিন্তামগ্ন বলিয়া মনে হইল।

সন্ধ্যাবেলা চন্দ্রকান্ত আসিয়া কহিল, "স্যার্, সব ঠিক হয়ে গেছে। যা ভেবেছিলাম তাই। বিলের পাশে স্যার্, একটা মস্ত ইটের পাঁজা রয়েছে।"

সে দম লইবার জন্য একটু থামিলে সতীনাথবাবু কহিলেন, "কি ঠিক হল?"

"সব স্যার্ ঐ জয়রাম নন্দীর কাজ। সবগুলো প্রমাণই ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে।"

"কি রকম?"

"ধরুন না স্যার্, প্রথমত সিন্দুক ভাঙা ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ তারই কাজ তা প্রায় প্রমাণ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, স্যার্ সে মিছে কথা বলে নিজেকে এড়াবার চেষ্টা

করেছিল, কিন্তু ধরা পড়ায় উপায় না দেখে শেষে স্বীকার করে। তৃতীয়ত, স্যার্, সে-ই যে গিরিধারীলালকে খুন করেছে রতনলালের এজাহার বিশ্বাস করলে তাও প্রমাণিত হয়। এমন কি গিরিধারীলালের আংটিটাও, স্যার্, রতনলাল তার কাছ থেকেই পায়। আর রতন যদি মিছে কথাই বলবে স্যার্, তবে জয়রামবাবুর অমন হুবহু বর্ণনা সে দিল কেমন করে? সে তো স্যার্, আগে তাঁকে দেখেনি।"

"কিন্তু খুন করে থাকলে মৃতদেহটার কি হল? সেটা তো অমন সহজে লুকিয়ে ফেলা সম্ভব নয়!"

"তাই দেখতেই তো আজ গিয়েছিলাম স্যার্! বললাম না, বিলের পাশে রয়েছে ইট পোড়াবার পাঁজা। বেমালুম লাশটা তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। শুধু আংটিটা স্যার্ আগেই খুলে নিয়েছিল, কারণ ওটা হয়তো তার মধ্যে থাকলেও ঠিকমতো গলত না এবং ঐ থেকেই স্যার্, হয়তো ওকে ধরা পড়ে যেতে হত। তাই বুদ্ধিমানের মতো পথে এসে নিরিবিলি একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে স্যার্! ঘুঘু লোক সন্দেহ নেই।"

সতীনাথবাবু একটি সিগারেট ধরাইয়া কহিলেন, "আমার কিন্তু তোমার সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না চন্দর! জয়রাম, আর যাই হোক, এ ব্যাপারে বোধ হয় নির্দোষ। সে তো আর জানত না যে গিরিধারীলাল তার সঙ্গে সাতটায় দেখা করবে বলে সময় ঠিক করে ছটায় বেরিয়ে যাবে! তাছাড়া যে ঘরে সিন্দুক আছে সে ঘরেই যে তাকে বসতে দেওয়া হল সেও তো ঘটনাচক্রে। আর লোহার সিন্দুক ভাঙা তো চারটিখানিক কথা নয়। যন্ত্রপাতি ছাড়া তা অসম্ভব। জয়রাম অত যন্ত্রপাতি ঘাড়ে করে নিশ্চয়ই আনেনি। আর মিথ্যে কথা বলা? যখন ও শুনল যে গিরিধারীলালকে হত্যা করা হয়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে এবং বিলের ধারে তার ধুতি পাঞ্জাবী পাওয়া গেছে তখন স্বভাবতঃই সে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে নিজেকে পাছে বিব্রত হতে হয় সেইজন্য দুটো-একটা মিথ্যে কথা তার পক্ষে বলা খুব আশ্চর্য নয়। আর এগুলো যদি তার দ্বারা না হয়ে থাকে তবে গিরিধারীকে খুন করতে যাওয়ারও তার পক্ষে কোনো কারণ নেই। দু-জনের মধ্যে, আর যাই থাক্, এ রকম শত্রুতা ছিল বলে শোনা যায়নি। যাই হোক্, আমার মাথায়ও একটা 'সমাধান' আসছে। ঠিক কিনা ২/১ দিনের মধ্যেই টের পাব। ভালো কথা, ব্যাঙ্ক অব কুভেরে তোমার কোনো টাকা-পয়সা জমা নেই তো? থাকলে সকালেই তা তুলে নিও, আর বন্ধুবান্ধবদেরও ঐ রকম পরামর্শ দিও।"

দুইদিন পরের কথা। ভোর হইতেই চন্দ্রকান্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে সতীনাথবাবুর বাড়িতে হাজির। "স্যার্, ভাগ্যিস আপনার কথা মতো টাকা তুলে ফেলেছিলাম। এই দেখুন স্যার্ আজকের কাগজ—ব্যাঙ্ক অব্ কুভের ফেল হয়েছে। কি করে বুঝেছিলেন স্যার্? আপনি কি দেবতা?"

"হ্যাঁ হে, দেবতা—ঠিক দেবতা নই, অপদেবতা। এক কাজ কর ; প্যারীনগরে অবিনাশবাবুকে একটা ফোন কর তো! গিরিধারীলালকে পাওয়া গেছে। সে মরেনি। মিসেস ঠুনঠুনিয়াকে একবার কলকাতায় আনতে হবে তাকে সনাক্ত করতে। তিনি ছাড়া বোধহয় আর কেউ তাকে চিনতে পারবে না। আর মিস্টার চাকীকেও যেন একটা খবর দেওয়া হয়। বেচারা নিশ্চয়ই বড় মুষড়ে পড়েছে—এত বড় ব্যবসা!"

চন্দ্রকান্ত ফোন শেষ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "ব্যাপারটা, স্যার্, খুলে বলুন। আমার যে আর সবুর সইছে না!"

সতীনাথবাবু ধীরে ধীরে সিগারেটে একটি দীর্ঘ টান দিলেন। তারপর একটু থামিয়া কহিলেন, "রহস্য বড় জটিল হে! আচ্ছা শোন। তিনি সুরু করিলেন।

"তদন্ত করতে গিয়ে তোমার মতো আমারও প্রথমেই জয়রামের ওপরই একটা সন্দেহ আসে। কিন্তু তা যে ঠিক নয় একটু খুঁটিয়ে দেখবার পরই তা ধরা পড়ল। তার বিপক্ষে যুক্তি তোমাকে আগেই জানিয়েছি। সমস্ত ব্যাপারটা দেখে আমার সন্দেহ হল ব্যাপারটা আগাগোড়া সাজান নয় তো, এবং আমাদের গিরিধারীলালের এর মধ্যে কোনো হাত নেই তো? দুটো খবর আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান বলে মনে হয়। প্রথম--গিরিধারীলালের এত বড় ব্যবসা ফেলে তিন মাসের জন্য দেশভ্রমণ এবং দ্বিতীয়—ফিরে এসেই ক্রমাগত মূল্যবান হীরা-জহরত কেনার বাতিক।

"যাই হোক, সমস্ত ব্যাপার না শুনে আমি তখন কোনো মতামত প্রকাশ করতে পারিনি। গিরিধারীলালকে যে কেউ খুন করেনি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। খুন করার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না—খুন করতে পারে এমন লোকের কথাও কারো জানা নেই। মৃতদেহের তো পাত্তা নেইই অথচ বিলের ধারে কাপড়-পাঞ্জাবী পাওয়া থেকে ব্যাপারটাকে এমনভাবে দাঁড় করান হয়েছে যাতে এটাকে হত্যা বলে মনে হয়। রতনলাল পকেটমার—একটা আংটির জন্য কেউ লোক খুন করে না—করলেও মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলা অত অল্প সময়ে সহজ নয়। ইঁটের পাঁজার কথা বলছ, কিন্তু ভুলে যাচ্ছ এটা বর্ষাকাল। বর্ষাকালে কেউ ইঁট পোড়ায় না—কাজেই ও পাঁজায় নিশ্চয়ই আগুন ছিল না।

"খুন যদি না হয়ে থাকে তবে কি আমেরিকার গুণ্ডাদের মতো কেউ ওকে কিড্‌ন্যাপ করল? কিন্তু কারা করবে? করলে তারা মুক্তিপণ চাইছে না কেন? না, তাও নয়, গিরিধারীলাল নিজেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে।

"লোহার সিন্দুকে যেসব জিনিস তার ফর্দ শুনে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। সব মূল্যবান জিনিস যেন হাতের কাছে পরপর সাজিয়ে রাখা হয়েছিল--দরকার হলেই নিয়ে সরে পড়া যায়। হীরা-জহরৎ কেনার বাতিকও কেন হয়েছিল এর থেকে সহজে আন্দাজ করা গেল। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা যাতে চট করে সরানো যায় সেজন্য তা দিয়ে আগেই যতটা সম্ভব মূল্যবান অলঙ্কার কিনে ফেলা হয়েছিল। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর--অপরের চোখ এড়িয়ে অনেকদিন পর্যন্ত এসব চালানো সম্ভব হয়েছে। যখন ব্যাঙ্কের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এইবার ধরা পড়তেই হবে তখনই সরবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সিন্দুক ভেঙে সে দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাবার জন্যই জয়রামবাবুকে ডাকা হয়। নইলে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সময় নির্দিষ্ট করে ঠিক তার একটু আগেই বাইরে যাবার প্রয়োজন হবে কেন? আর জয়রামবাবুকে বসবার ঘরে না বসিয়ে লাইব্রেরী-ঘরে, যেখানে সিন্দুক রয়েছে, সেই ঘরেই বা বসতে দেওয়া হবে কেন? সিন্দুক আগেই ভাঙা হয়েছিল কিন্তু কোনো কৌশলে তা গোপন রাখা হয়। আর বাড়ির কর্তা নিজে নিজের সিন্দুক ভাঙবে এ তো আর কেউ স্বপ্নেও ভাবতে বা বিশ্বাস করতে পারবে না! সিন্দুকের মালপত্র কোনো নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

"এইবার পালাবার পালা। এত বড় একটা ধনী লোক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলে সোরগোল বড় কম হবে না—আর এত লোকের টাকা নিয়ে ভেগে পড়বার পর ধরা

পড়লে শাস্তিটাও যে সহজ হবে না তা গিরিধারীলালের জানতে বাকি ছিল না। কাজেই এই পালাবার ষড়যন্ত্র তাকে অনেক আগে থেকেই করতে হয়েছিল। তাই গত বছর তিন মাসের ছুটি নিয়ে বাইরে বেরোবার দরকার হয়ে পড়ল। আসলে কিন্তু গিরিধারীলাল কোথাও যায়নি, ছিল কলকাতাতেই—ছদ্মবেশে। অমন খাসা দাড়ি, তা সে কামিয়ে ফেলল। গোঁফও সেই সঙ্গে গেল, চুল ছেঁটে ছোট ছোট করা হল, এমন কি মোটা ভ্রূ জোড়াও কামাতে সে বাকি রাখল না—ফলে তার চেহারা গেল একেবারে বদলে।

"তার পর সেই ছদ্মবেশী গিরিধারীলাল যখন রতনলাল নাম নিয়ে জনৈক ভদ্রলোকের পকেট মেরে তিন মাসের জন্য শ্রীঘরে গেল এবং সেই সঙ্গে দাগী আসামীর খাতায় নাম লেখাল তখন তার অতি বড় শত্রুও বোধ হয় তা শুনলে বিশ্বাস করতে পারত না। কিন্তু গিরিধারীলাল ভবিষ্যতের পানে চেয়ে এ অপমানও সহ্য করল। কারণ ভবিষ্যতে এই রতনলাল হয়েই তাকে বাঁচতে হবে।

"তিন মাস পরে রতনলাল জেল থেকে খালাস পেল। তখন তাকে আবার গিরিধারীলাল সাজতে হবে। কিন্তু ক্ষুরের হাতে যা বিসর্জন দিয়েছে তিন মাসেই তা গজাবার কথা নয়। ফলে তাকে নকল দাড়ি-গোঁফ, নকল ভ্রূ ইত্যাদির শরণ নিতে হল। নকল দাড়িগোঁফ নিয়ে, আর যাই করা যাক না কেন, রাত্রে তা এঁটে ঘুমান বড় সহজ নয়, এবং যে কোনো মুহূর্তে তা সরে গিয়ে বিপদে ফেলতে পারে। তাই গিরিধারীলাল "দেশভ্রমণ" থেকে ফিরে আলাদা ঘরে একা শোবার ব্যবস্থা করল,—স্ত্রীও যাতে তার কীর্তির কথা না জানতে পারে।

"তারপর চলল আটঘাট বাঁধার পালা। ব্যাঙ্ক অব কুভেরের আর্থিক অবস্থা দিন দিন কাহিল হতে সুরু করল, ঠুনঠুন-চাকী কোম্পানীর অবস্থাও হল তাই। গিরিধারীলালই ছিল ব্যবসার প্রধান কর্তা—কাজেই এত বড় ব্যাপারটা কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। তারপর একদিন সময় বুঝে শ্রীমান গা-ঢাকা দিলেন। নকল দাড়ি-গোঁফ-ভ্রূ ফেলে দিয়ে, তাকে খুন করা হয়েছে এই রকম গোটাকয়েক চিহ্ন রেখে, সে আবার রতন লাল সাজল এবং ইচ্ছে করে মাতালের অভিনয় করে পাহারাওয়ালাকে মারপিট করে থানায় হাজির হল ; তারপর গিরিধারীলালের আংটি দাখিল করে এক রগরগে গল্প ফেঁদে দিন কয়েকের জন্য আবার শ্রীঘরে ঢুকল। সে জানত যে খুন হওয়ার ভাঁওতা দু-দিন পরেই ধরা পড়বে—ব্যাঙ্ক ফেল হবার পর সমস্ত রহস্যই জানাজানি হয়ে যাবে এবং পুলিস তার খোঁজে দুনিয়া চষে বেড়াবে। এ রকম ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হচ্ছে জেলের ভিতরটা—যেখানে লুকোবার কথা পুলিস স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। তারপর হপ্তা কয়েক জেলে কাটিয়ে যখন সে বেরিয়ে আসবে তখন তাকে পায় কে? বাকী জীবনটা রতনলাল হয়ে প্রচুর সঞ্চিত অর্থ নিয়েই সে কাটিয়ে দিতে পারবে। আর স্ত্রী-পরিবার? এইসব পাপিষ্ঠদের কাছে কি ও সব কোমল প্রবৃত্তির কোনো দাম আছে?"

গল্প শেষ করিয়া সতীনাথবাবু আর একটা সিগারেট ধরাইলেন। চন্দ্রকান্ত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।

সেইদিনই বিকাল বেলা অবিনাশবাবুর নিকট হইতে খবর আসিল—মিসেস ঠুনঠুনিয়া জেলে আসিয়া রতনলালকে তাঁহার স্বামী গিরিধারীলাল বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন।

মরণের মুখে

অজেয় রায়

।। এক ।।

সকাল দশটা নাগাদ ভবানী প্রেসের সামনে সাইকেল থেকে নামল দীপক। একবার ঢুঁ মেরে যাই সম্পাদকের ঘরে।

ভবানী প্রেসের এক কোণে সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তার ছোট্ট অফিসঘর। দীপক দরজা ঠেলে মুখ বাড়াতেই সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি যথারীতি গমগমে গলায় আহ্বান জানালেন—'এস দীপক।'

দীপক ঢুকল। কুঞ্জবাবুর সামনে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন চেয়ারে। ছোটখাটো চেহারা। ফর্সা রং। মানুষটিকে দেখেছে দীপক, তবে পরিচয় নেই। কুঞ্জবিহারী বললেন দীপককে, 'কি কোনো ইন্টারেস্টিং নিউজ আছে? কয়েক হপ্তা মোটে ভালো স্টোরি যাচ্ছে না। সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়।'

দীপক চেয়ারে বসতে বসতে মিনমিন করে—'নাঃ তেমন কিছু নেই। শুধু ওই হনুমানের বিয়ে দেখা।'

'কি রকম!' নড়েচড়ে বসেন কুঞ্জবিহারী।

'গত শুক্রবার মানে তিন দিন আগে নানুরের কাছে একটা বিয়ে ছিল। কি সব স্ত্রী-আচার হচ্ছিল সকালে। হঠাৎ কোত্থেকে একটা গোদা হনুমান একদম ঘাড়ের কাছে পাঁচিলে বসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে ব্যাপার। ভয় পেয়ে সব মেয়েরা মায় কনেসুদ্ধু মারে ছুট। ছেলেরা লাঠিসোটা দেখিয়ে হনুটাকে তাড়ায়। কিন্তু সে বেটা নাছোড়বান্দা। ওইসব অনুষ্ঠান যেখানেই হয় ঠিক গিয়ে উঁকি দেয়। শেষে লোকে হাল ছেড়ে দেয়। থাকুকগে। ওকে আর ডিসটার্ব করে না। হনুমানটাও কোনো গোলমাল করে না। খুঁটিয়ে দেখে সব। বিকেলে ওকে কিছু কলা-মূলো দেওয়া হয় খেতে। হাজার হোক নেমন্তন্নবাড়ি। তাই দিয়ে তৃপ্তিসহ ভোজ সেরে হনুটা বিদায় নেয়। লোকে বলছে ও নাকি আশীর্বাদ করে গেছে। বর-কনের মঙ্গল হবে। এই নিয়ে খুব গুজব ছড়াচ্ছে। কাল খবর নিতে গিছলাম নানুরে।

কুঞ্জবিহারী তাঁর ঝাঁটার মতন গোঁফজোড়া নাচিয়ে বললেন, 'হুম্, ইন্টারেস্টিং। একটা স্টোরি করে দাও। দেখচ, অন্য জীবদের মানুষ সম্বন্ধে কেমন কৌতূহল!'

সম্পাদকের সামনে বসা ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'কেন থাকবে না মশাই? মানুষের যখন অন্য জীবজন্তু নিয়ে এত মাথাব্যথা। ওঃ, কত রকম মানুষ যে হয়! এই তো ক'দিন আগে একজনের সঙ্গে আলাপ হলো। ভদ্রলোকের শখ হচ্ছে সাপ। দিনরাত সাপুড়েদের কাছে ঘুরঘুর করেন। আবার সাপ পোষেন। উদ্ভট খেয়াল। ইস্ সাপ মশাই আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। এই নিয়ে আবার কেউ রিসার্চ করে! এর চাইতে নানুরের ওই হনুমান ভালো।'

'তিনি কোথায় থাকেন? কি নাম?' কৌতূহলী দীপকের প্রশ্ন।

ভদ্রলোক দীপকের দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করতে কুঞ্জবাবু বললেন—'আলাপ করিয়ে দিই। এঁর নাম বগলাচরণ দত্ত। আর এ হচ্ছে দীপক রায়। বঙ্গবার্তার একজন রিপোর্টার।' দীপক ও বগলাচরণ পরস্পরকে নমস্কার জানায়। তারপর বগলাচরণ বলেন—

'সেই ভদ্রলোক থাকেন সিয়েনের কাছে। বীরভূমের লোক নন। বাইরের লোক। সিয়েনের কাছে একটা বাসা ভাড়া করে রয়েছেন কিছুদিন। সাপ আর সাপুড়ের খোঁজে বীরভূমের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গোটা পশ্চিমবঙ্গেই নাকি ঘুরছেন। এই উদ্দেশ্যে। নাম বললেন—হরিবাবু। হরিহর নাগ। নাগ বংশীয় কিনা, তাই বোধহয় সর্পকুলের ওপর এত টান।' খিকখিক করে হাসেন বগলাচরণ।

'কি, হরি নাগের একটা ইন্টারভিউ নেবে নাকি?' সম্পাদকের মন্তব্য।

'তাই ভাবছি', দীপক মাথা ঝাঁকায়।

'বেশ, লেগে যাও।' সম্পাদক উৎসাহ দিলেন, 'ইন্টারেস্টিং কিছু পেতেও পার।'

সম্পাদকের কথাগুলো মনে রেখে দীপক বিদায় নেয়।

।। দুই ।।

হরিহর নাগ যে বাসায় থাকেন সেটা গ্রামের এক প্রান্তে। বহু পুরনো দোতলা পাকাবাড়ি। বাড়ির চারধারে অনেকখানি এলাকা। এখন বড় বড় গাছ আর ঝোপজঙ্গলে

ভরা। পুকুরটা মজে গেছে। একসময় ধনী সরকার পরিবারের বাস ছিল বাড়িটায়। তবে এখন গোটা বাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে প্রায় বছরভোর। পরিবারের সবাই প্রায় গ্রাম ছেড়েছে। চাষের জমিও প্রায় সমস্ত বিক্রি করে দিয়েছে। শুধু প্রাচীন গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ জীর্ণ বাড়িটা টিকে আছে কোনোরকমে। সরকারদের একটি পরিবার এখনো আছে বটে ভিটে আগলে কিন্তু তারা থাকে পুরনো বাড়ি থেকে খানিক তফাতে। মাটির বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে। পুরনো বাড়িখানার যা দশা, কোনদিন না ভেঙে পড়ে ছাদ। তাছাড়া এতকাল ফাঁকা পড়ে থাকায় ভুতুড়ে বলেও কিঞ্চিৎ বদনাম হয়েছে সরকার বাড়ির। হরিবাবু সরকারদের এই পাকাবাড়ির নিচের তলায় কয়েকটা ঘর নিয়েছেন নামমাত্র ভাড়ায়। সাফসুফ করে থাকছেন। ওঁর ভূত বা সাপখোপের ভয় নেই। একদম একা থাকেন না অবিশ্যি। কালুয়া বলে একটি লোক থাকে সঙ্গে। কালুয়া জাতে সাপুড়ে। ওর বাড়ি নাকি বীরভূমেই। লাভপুরে। হরিবাবুর সঙ্গে এসেছে। সে হরিবাবুর কাজকম্ম করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘোরেও। সাপুড়ে বলেই কালুয়ার সাপ সম্পর্কে ভয়ডর নেই। নইলে যে সাপ পোষে তার সঙ্গে অন্য লোক কেউ থাকত না।

হরিবাবু সম্বন্ধে এসব জানল দীপক গ্রামের লোকের মুখে। বঙ্গবার্তা দপ্তরে হরিহর নাগের কথা শোনার কয়েকদিন বাদে এক দুপুরে সে হাজির হয় হরিবাবুর বাসায়। হরিবাবু তখন বাড়িতে ছিলেন না। কেউ ছিল না বাসায়। ঘর তালা বন্ধ। দীপক ফিরে যায়নি। এই অবসরে সে গ্রামে ঘুরে হরিবাবু এবং সরকার বাড়ি সম্বন্ধে কিছু খবর যোগাড় করল। তবে গাঁয়ের লোকের হাবভাব দেখে তার একটা সন্দেহ হলো যে এই আগন্তুককে গাঁয়ের লোক বিশেষ পছন্দ করে না। হয়তো বা হরিবাবুর উদ্ভট খেয়ালের কারণে। গ্রামের মান্যগণ্যরা বেশ একটা অবজ্ঞা ও বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করল হরিবাবু সম্পর্কে। তবে সোজাসুজি কোনো বদনাম দিল না কেউ। হরিবাবুর চেয়ে হরিবাবুর সঙ্গী কালুয়া সম্পর্কেই মনে হলো গাঁয়ের অপছন্দ বেশি। কারণটা ঠিক করতে পারে না দীপক।

হরিবাবু ফিরলেন বিকেলে।

বগলাচরণের মুখে যা বর্ণনা শুনেছিল তাই মিলিয়ে হরিবাবুকে আন্দাজ করে দীপক। লম্বা রোগা। পাকানো শরীর। বয়স বছর চল্লিশ। লম্বাটে মুখ। রোদে পোড়া শ্যামবর্ণ। খাড়া নাক। চাপা ঠোঁট। রগের চুল একটু পাক ধরেছে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। পায়ে রবারের জুতো। কাঁধে একটা চটের ব্যাগ।

গ্রীষ্মের পড়ন্ত বেলায় মেঠো পথ বেয়ে বড় বড় পা ফেলে এলেন ভদ্রলোক। তাঁর বেশ খানিকটা পেছনে আসছিল আর একজন। লোকটির কাঁধে একটা বড়সড় থলে।

ভদ্রলোক সরকার বাড়ির জঙ্গুলে এলাকায় ঢোকার মুখে দীপক এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কার। আপনি কি শ্রীহরিহর নাগ?'

ভদ্রলোক থমকে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আপনি নাকি সাপ নিয়ে রিসার্চ করছেন?'

'আপনি?' হরিহরবাবু ভুরু কোঁচকান।

'আমার নাম দীপক রায়। রিপোর্টার।'

'কোন কাগজ?'

'সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তা।'

'বঙ্গবার্তা? কোথা থেকে বেরোয়?'

'বোলপুর। আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই।'

'আমার কথা শুনলেন কোত্থেকে?'

'শুনেছি', রহস্যময় হাসে দীপক, 'রিপোর্টারদের চোখ-কান খোলা রাখতে হয়।'

হরিহরবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, 'রিসার্চ গবেষণা অত বড় ব্যাপার আমি করি না। সাপ নিয়ে সামান্য কিছু স্টাডি করছি। জীবজন্তু নিয়ে আমার চিরকালই আগ্রহ। আপাতত সাপ নিয়ে পড়েছি। হুঁ, যদি সাবজেক্টটায় আরও সময় দিতে পারি, নতুন কিছু পাই, ইচ্ছে আছে একটা বই লিখব। শুধু সাপ নিয়ে নয়, সাপুড়েদের নিয়েও।'

'আপাতত যা জেনেছেন তাই নিয়ে বলুন কিছু।'

হরিহর রুক্ষস্বরে বললেন, 'মাপ করবেন। প্রেসকে এখন আমি ইন্টারভিউ দেব না। এই বিষয়ে অনেক পণ্ডিত আছেন। ভুলভাল কিছু বলে ফেললে এক্সপার্টরা আমার বাকি রাখবেন না। সমালোচনা করে তুলো ধুনে দেবেন। আমি শখ করে এই নিয়ে মেতেছি। এখুনি সিরিয়াস ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

হরিহর সোজাসুজি ইন্টারভিউ দিতে নারাজ বুঝে দীপক কথা ঘোরায়।

'আপনি কলকাতায় থাকেন?'

'না। ব্যারাকপুরে। চব্বিশ পরগনা।'

'চাকরিতে ছুটি নিয়ে এই শখ মেটান বুঝি?'

'চাকরি করি না। ব্যবসা করি। মাঝে মাঝে ব্যবসা থেকে ছুটি নিয়ে শখ মেটাই।'

'আপনি কি সাপ পোষেন?'

'ঠিক পোষ মানাবার চেষ্টা করি না। তবে কিছুদিন রাখি নিজের কাছে।'

'কেন?'

'তাদের ধরন-ধারণ স্টাডি করি বন্ধ ঘরে ছেড়ে দিয়ে।'

'বিষাক্ত সাপ?'

'হুঁ।'

'আপনি সেই ঘরেই থাকেন?'

'থাকি কখনো কখনো।'

'ডেঞ্জারাস। যদি কামড়ে দেয়?'

'অবশ্যই বিষ বের করা সাপ। তাই কামড়ালেও মরি না।'

'আপনি সাপ ধরতে পারেন?'

'না।'

'সাপ পান কোত্থেকে?'

'কিনি সাপুড়েদের থেকে।'

'বিষদাঁত কামাতে পারেন?'

'না।'

pathagar.net

'তাহলে?'

'কখনো সাপুড়েরা কামিয়ে দেয়। কখনো কালুয়া কামায়।'

'কালুয়া মানে আপনার ওই সঙ্গী?'

'হুঁ। ওর খবরও পেয়েছেন দেখছি। কালুয়া জাতে সাপুড়ে। সাপ ধরতে পারে। বিষ ঝাড়তে পারে। তাই এ কাজে ওকে নিয়ে ঘুরি।'

কালুয়া নামে হরিহরবাবুর সঙ্গীটি খানিক তফাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ লক্ষ্য করেছিল দীপককে। তারপর হরিবাবু ইঙ্গিত করতেই সে ধীরপায়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে যায়।

কালুয়ার চেহারা বা ধরন-ধারণ বেশ অদ্ভুত। ঘোর কালো রং। মাথায় ঝাঁকড়া বাদামী চুল। পুরুষ্টু পাকানো গোঁফ। মাঝারি লম্বা। দারুণ গাঁট্টাগোট্টা। মুখ ভাবলেশহীন কঠিন। খুদে খুদে তীক্ষ্ণ চোখ। গায়ে ধুতি ও হাতাওলা গেঞ্জি। খালি পা।

'আচ্ছা সাপগুলো কিনে কিছুদিন রেখে মানে অবসার্ভ করে তারপর কি করেন? বিক্রি করে দেন?'

'না। বিক্রি করি না। ছেড়ে দিই।'

'এ্যাঁ! মানে?'

'হ্যাঁ, ছেড়ে দিই। তাদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দিই। ঝোপেঝাড়ে মাঠে ছেড়ে দিই।'

দীপক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

হরিহরবাবু বলেন, 'দেখুন আমি একজন অ্যানিমাল লাভার। জীবজন্তুকে বন্দী করে রাখা আমি অন্যায় বলে মনে করি। তারা ভারি কষ্ট পায়। ভাবুন তো জেলে আটকে রাখলে মানুষের কত বড় শাস্তি! যথেষ্ট আরামে রাখলেও। তবু বাধ্য হয়ে আমরা চিড়িয়াখানা বানাই। আর সাপুড়েরা যে সাপগুলোকে রাখে ঝাঁপির মধ্যে সারাক্ষণ, কি কষ্ট তাদের! মোটে নড়াচড়া করতে পারে না। এটা আইন করে বন্ধ করা উচিত। কিন্তু তাহলে আবার সাপুড়েরা ভাতে মরবে। উভয়ই সমস্যা।'

দীপক পুলকিত হয় হরিহরবাবুর কথায়। সে নিজেও জীবজন্তু খুব ভালোবাসে। বন্দী প্রাণী দেখলে কষ্ট পায়। তাই হরিবাবুর ব্যথা সে বোঝে না। বলে, 'ঠিকই বলেছেন।'

হরিহরবাবু উৎসাহিত হয়ে আরও বলেন, 'দেখুন সাপুড়েদের ঝাঁপিতে দিনের পর দিন জড়সড় হয়ে থেকে সাপেদের আয়ু কমে যায়। বেশিদিন বাঁচে না বেচারিরা। অনেক সময় বন্দী মৃতপ্রায় সাপকে সাপুড়ে নিজেই ছেড়ে দেয়। তবে সে বড় শেষ সময়ে। আমি তার আগেই কিনে নিই খানিক তাজা সাপ। কয়েকদিন নিজের কাছে রেখে স্টাডি করে ছেড়ে দিই তাদের। যাতে তারা আরও বেশ কিছুকাল বাঁচতে পারে। দুটো উদ্দেশ্যই সফল হয়। আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যেটুকু করা যায় আর কি।'

'সদ্য ধরা একদম তাজা সাপ কিনে ছাড়লে তো আরও ভালো হয়।' দীপক প্রস্তাব দেয়।

'ভালো হয় ঠিকই। তবে সেরকম সাপের দাম খুব চড়া। সাপুড়েরা সহজে বিক্রি করতে চায় না। খেলা দেখায়। বিষ বিক্রি করে—তাই বাধ্য হয়ে একটু পুরনো সাপ

কিনি।'

হরিহর নাগ সম্বন্ধে দীপকের শ্রদ্ধা হলো। ভদ্রলোকের বাইরের আবরণ রুক্ষ হলেও সত্যি জীবপ্রেমী। গ্রামের লোক এঁকে অপছন্দ করে কেন? হয়তো ভদ্রঘরের ব্যক্তির সাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি পছন্দ নয়। আর একটা কারণ হতে পারে, হরিহরবাবুর সঙ্গী কালুয়া। ওর হাবভাব দীপকেরও ভালো লাগেনি।

দীপক ভাবল যে হরিবাবু ইন্টারভিউ না দিলেও ওঁর সম্বন্ধে নিউজ ছাপলে তো আটকাতে পারেন না। সে অধিকার আছে সাংবাদিকের। অতএব হরিহরের গতিবিধি কাজ ইত্যাদির খোঁজ আরও নিয়ে সে খবর ছাপবে বঙ্গবার্তায়। আশেপাশের গ্রামের লোক আর সাপুড়েদের থেকে শুনতে হবে হরিহরবাবুর সম্পর্কে।

।। তিন ।।

দিন সাতেকের মধ্যে দীপক হরিহর নাগের বিষয়ে বেশ কিছু খবর পেল। বিচিত্র সব খবর।

নানান গ্রামের সাপুড়েরা জানাল যে হরিহরবাবু তাদের কাছে অনেক কিছু জানতে আসেন বটে। সাপুড়েদের জীবনযাত্রা। সাপ নিয়ে তাদের বিশ্বাস, পালাপার্বণ। সাপেদের রকমসকম। খাতায় লিখে নেন কি সব। প্রায়ই সাপ কেনেন। তবে ছোট সাপ কেনেন না। বড় বড় সাইজের সাপ কেনেন। বিষধর বা নির্বিষ যে কোনো সাপ। সাপ কেনা নিয়ে বড্ড দরাদরি করেন। কেনেন যথাসম্ভব কম দামে। ফলে পুরনো নির্জীব সাপই মেলে বেশি।

শুনে খারাপ লাগল দীপকের। হরিহরবাবু দীপককে যা বলেছিলেন তার সঙ্গে মিলছে না যে কাজের ধারা। এতে হরিহরের সাপ কেনার প্রধান উদ্দেশ্যটাই যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের কি অর্থের অভাব? অথবা কিপ্টে স্বভাব?

হরিহর যে গ্রামে বাসা বেঁধেছেন সেখানে খোঁজ করেও বিচলিত হয় দীপক। গাঁয়ের বেশির ভাগ লোক এই আগন্তুকের ওপর মহাখাপ্পা হয়ে উঠেছে।

অন্য জায়গা থেকে সাপ এনে এই গাঁয়ে ছাড়বে—এইসব বদ খেয়াল চলবে না। গাঁয়ে বিষাক্ত সাপের অভাব নেই। প্রতি বছরই দু'একজন কামড় খায় বিষধরের। মারাও যায় কেউ কেউ। তার ওপর এই বাড়তি উপদ্রব কেন? গ্রামের লোক এই নিয়ে হরিহরকে ধমকেছে।

হরিহর নাকি বুঝিয়েছেন তাদের। তিনি এই গাঁয়ে বাইরে থেকে আনা সাপ কখনো ছাড়বেন না। সেগুলি ছেড়ে দেবেন গ্রামের সীমানা থেকে অনেক দূরে। গ্রামের লোক কিন্তু বিশ্বাস করেনি তাঁর কথায়।

ওই গ্রামের লোকের আর একটা ক্ষোভ কালুয়াকে নিয়ে। বেপরোয়া ধরনের লোকটা গাঁয়ের কাউকে যেন গ্রাহ্য করে না। ইতিমধ্যে ওর সঙ্গে গাঁয়ের লোকের ছোটখাটো খিটিমিটি হয়ে গেছে। কালুয়ার গতিবিধি অতি সন্দেহজনক। রাতবিরেতে নিঃশব্দে কোথায় যায় আসে? লোকটা যে সুবিধের নয় তার প্রমাণ মিলেছে। এখানকার থানা থেকে পুলিশ এসে কালুয়ার খোঁজখবর নিয়ে গেছে। জানা গেছে লোকটা নাকি

লাভপুরে বছরখানেক আগে একটা ডাকাতির কেসে ফেঁসেছিল। বরাতজোরে প্রমাণ অভাবে সেবার ছাড়া পায়। তবে মারপিটের অভিযোগে বারকয়েক অল্পকালের জন্য জেল খেটেছে। বোলপুর থানা ওর ওপর তাই নজর রেখেছে। এমন একটি কুখ্যাত সঙ্গী জোটালেন কেন হরিবাবু? গ্রামের লোক মনিব-ভৃত্য উভয়ের ওপরই সতর্ক চোখ রাখছে। বেচাল দেখলেই তাদের তাড়িয়ে ছাড়বে।

ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয় দীপক। বেইজ্জত না হন। ওঁকে সাবধান করে দিলে হয়।

দাসপুর গিয়েছিল দীপক এক বন্ধুর কাছে। কথায় কথায় বন্ধুটি বলল, 'কাল এক কাণ্ড হয়েছে। হরিহর নামে এক ভদ্রলোক এসেছেন এ তল্লাটে। নাম শুনেছিস?'

'হ্যাঁ, শুনেছি। কেন?'

'হরিহরবাবু নাকি সাপ পোষেন। সাপ নিয়ে রিসার্চ করেন।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'ওঁর একটা চাকর আছে কালুয়া নামে। কাল যা ঘটেছে, গাঁয়ের লোক কালুয়ার ওপর সাঙ্ঘাতিক চটে গেছে।'

'কেন?'

'কালুয়াটা ঘোষদের আমবাগান থেকে একটা মস্ত ঢ্যামনা সাপ ধরে নিয়ে গেছে লুকিয়ে।

'এ্যাঁ, ঢ্যামনা ধরল কি করে! যা ছোটে!'

'সাপটা ব্যাঙ-ট্যাঙ কিছু খেয়ে নির্জীব হয়ে পড়েছিল। নড়তে পারছিল না। সেই সুযোগে ধরেছে। আমবাগানটা গ্রামের সীমানায়। কালুয়া ওর ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল দুপুরে। তখন ধরে। একটা বাগাল ছেলে আগেই দেখেছিল সাপটা খাবার গিলে পড়ে আছে বাগানে। ছেলেটা দূর থেকে দেখে, কালুয়া ওখানে বসে কি জানি করল। তারপর চলে গেল। একটু বাদে বাগালটা গিয়ে দেখে সাপটা নেই। নির্ঘাৎ কালুয়ার কীর্তি। ওর মনিবকে দেবে।'

বন্ধুটি উত্তেজিতভাবে বলে 'ঢ্যামনা সাপ চাষীর উপকারী জীব। ধেড়ে ইঁদুর খায় প্রচুর। ধেড়ে ইঁদুর কত ধান খেয়ে লোকসান করে চাষীর। গাঁয়ের লোক পারতপক্ষে ঢ্যামনা সাপ মারে না।'

'হরিবাবুও মারবেন না। উনি সাপ এনে কিছুদিন রেখে অবসার্ভ করেন। তারপর ছেড়ে দেন।' দীপক ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে।

বন্ধুটি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, 'ওঃ, এ গাঁয়ের সাপ অন্য কোথাও ছাড়লে আমাদের লাভ? গ্রামের লোক ঠিক করেছে কালুয়া ফের এখানে এলে ওর ঠ্যাং ভেঙে দেবে।'

দীপকের মনে নানান প্রশ্ন ঘোরে। ব্যাপারগুলো কেমন গোলমেলে?

সিয়েনের কাছেই জমির সাপুড়ের বাড়ি। জমিরের সঙ্গে দীপকের বহুদিনের চেনা। জমিরের ছেলের অসুখে খুব সাহায্য করেছিল দীপক। দশ বছরের মরমর ছেলেকে বোলপুর হাসপাতালে ভর্তি করতে এনে জমির তখন দিশেহারা। দীপক চটপট রোগীকে

pathagar.net

হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে। টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করে জমিরকে। ক্রমে ছেলেটি সুস্থ হয়ে ওঠে।

অনেকদিন বাদে দীপককে দেখে জমির ভারি খুশি। চা খাওয়ায়। এটা সেটা কথার পর দীপক জিজ্ঞেস করে, 'হরিহর নাগকে চেন?'

'আজ্ঞে চেনা হয়েছে।'

'তার কাছে সাপ বিক্রি করেছ?'

'করিছি বাবু।'

'কি কি সাপ?'

'সে হরেক রকম।'

'উনি কি সাপ পোষেন?'

'হ, তাই বলেন।'

'তুমি গেছ ওর বাসায়?'

'আজ্ঞে গেছি।'

'হরিহরবাবুর চাকর কালুয়া লোকটা কেমন?'

দীপক লক্ষ্য করে যে জমির থতমত খায়। মুখে ত্রস্ত ভাব। সে জবাব দেয় না সঙ্গে সঙ্গে। খানিক চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'জানি না ঠিক।'

দীপক বলল, 'ভাবছি এখন একবার হরিহরবাবুর বাসায় যাব। কেমনভাবে সাপ রাখেন, কি কি করেন দেখব। যাবে নাকি সঙ্গে?'

জমির কাঁচুমাচুভাবে বলে, 'আজ একটু কাজ আছে।' তারপর সে ইতস্তত করে বলে, 'ওসব জিনিস দেখার দরকার কি? মা মনসার বাহন। ওদের মতিগতি বোঝা দায়। বড় মেজাজী জীব। শেষে বিপদ-আপদ'—বলতে বলতে সে হঠাৎ থেমে যায়।

'দূর, বিপদ আবার কি? যাক, চলি এখন।' দীপক রওনা দেয়।

।। চার ।।

বেলা দুপুর। হরিহর নাগের বাসায় পৌঁছে দীপক দেখল যে বাড়ি বন্ধ। দরজায় তালা ঝুলছে। সে ঘরগুলোর দরজা জানালার কপাট ঠেলে ভেতরে উঁকি মারার চেষ্টা করতে লাগল। একটা ছোট ঘরের জানালা দেখল আধখোলা। সে ঘরের মধ্যে নজর করে।

ভিতরে আলো নেই। তবে বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। তারই ফলে ভিতরটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। ঘরে টাঙানো দড়িতে কি যেন ঝুলছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে দীপক। একটা বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসে ঘর থেকে।

দীপক পরীক্ষা করে প্রতিটি জানলা দরজা। নাঃ, কোনোটাই খুলতে পারা যায় না। সে ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর খানিক দূরে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে বসে।

চারপাশে ঘন গাছগাছালি থাকায় সরকার বাড়িটা বাইরে থেকে ভালো দেখা যায় না। দীপকের পিছনে একটা ভাঙা গোয়ালঘর, সামনে কুলঝোপ। সাবধানে সে দেখে নেয় চারধার। জায়গাটা সাপখোপের আড্ডা। বাগান ভেদ করে বাসায় ঢোকার পথটা রইল

তার নজরে। আশা করল তাকে কেউ দেখতে পাবে না।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি দীপককে। কালুয়া ফিরল। সে ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। তারপরই একটা ছোট থলি হাতে বেরিয়ে গেল গ্রামের দিকে। মনে হলো কিছু কিনতে গেল দোকানে। দরজায় তালা দিল না। শিকল তুলে দিল। অর্থাৎ এখুনি ফিরবে।

দীপক কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে। হরিহরের দেখা নেই। তিনি বোধহয় পরে ফিরবেন। আলাদা বেরিয়েছেন। কালুয়া ফেরার আগে সময়টুকু কাজে লাগাই। হয়তো এমন সুযোগ আর মিলবে না।

দীপক শিকল খুলে বাসায় ঢুকল। এঘর ওঘর করে ঢুকল গিয়ে সেই ঘরটায়। দড়িতে ঝোলানো বস্তুটি পরীক্ষা করল। বিশ্রী গন্ধটায় গা গুলিয়ে উঠছে। তাকে রাখা অনেকগুলো ছোটবড় সাপের ঝাঁপি। একটা বাঁশের লাঠি খাড়া করা রয়েছে দেয়ালে। সেটা হাতে নেয়। এবার তার চোখে পড়ে ঘরের এক কোণে দুটো কাঠের প্যাকিং বাক্স। এক একটা হাত দেড়েক লম্বা, হাতখানেক চওড়া। তাদের ওপর কাঠের আলগা তক্তা চাপিয়ে ঢাকা দেওয়া।

ডান হাতে লাঠিটা দৃঢ় মুষ্টিতে পাকড়ে বাঁ হাতে একটা বাক্সের ডালা তুলেই চমকে যায় দীপক। ও, এই ব্যাপার! সে তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছিল।

পিছনে খুট করে আওয়াজ হতেই দীপক চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় লাঠি বাগিয়ে। কালুয়া ফিরেছে নিশ্চয়।

কিন্তু যে দৃশ্য দেখল, কাঠ হয়ে গেল সে।

কালুয়া নয়। স্বয়ং হরিহর নাগ দাঁড়িয়ে দরজায়। তাঁর হাতে উদ্যত পিস্তল। কঠোর মুখ। চোখে তীব্র রাগ।

'লাঠিটা ফেল', কঠিন কণ্ঠে আদেশ করেন হরিহর, 'নইলে গুলি করব! সাইলেন্সার লাগানো আছে রিভলবারে। কেউ শুনতে পাবে না। তারপর লাশ পুঁতে দেব মাটিতে।'

দীপক লাঠি ফেলে দেয়। হরিহরের হিংস্র মূর্তি দেখে বিশ্বাস করে যে, ও যা বলছে তা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

'এবার পেছনে ফের।' আদেশ হয়।

দীপককে ইতস্তত করতে দেখে খুব ঠাণ্ডাভাবে হরিহর রিভলবার তাক করেন ওর কপাল লক্ষ্য করে।

নিরুপায় দীপক পিছন ফেরে।

'কালুয়া, ওকে বেঁধে ফেল্।' হরিহরের কণ্ঠে হুকুম হয়।

সঙ্গে সঙ্গে দুটো প্রচণ্ড বলশালী থাবা দীপকের হাত দুটো টেনে পেছনে এনে দড়ি জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলে। তারপরই তাকে ল্যাং মেরে মেঝেতে শুইয়ে দেয় কালুয়া। এবার বাঁধে তার পা।

'একদম চুপ। পালাবার চেষ্টা করলেই মরবে।' হরিহর দীপকের বুকের ওপর রিভলবার তাক করে শাসায়।

দীপকের হাত-পা বাঁধা হলে কালুয়া দীপককে মেঝেতে শুইয়ে রেখে বেরিয়ে যায়।

pathagar.net

দ্রুত ফিরে আসে। ফিরেই সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে। দীপকের নাকটা জোরে টিপে ধরে দু আঙুলে। নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হয়ে দীপক হাঁ করতেই কালুয়া তার মুখের মধ্যে ঠেসে দেয় একদলা ন্যাকড়া। দীপকের দমবন্ধ হবার যোগাড়। সে ছটফট করে। কালুয়া নাক ছেড়ে দেয় বটে, তবে ঝটপট নিপুণ হাতে ওর মুখ বেঁধে ফেলে গামছা জড়িয়ে। দীপকের আর টুঁ শব্দ করার উপায় থাকে না। কাতর চোখে দেখে। বোঝে না এদের মতলবটা কি?

'কালুয়া, আমাদের কোনো বিষওলা সাপ আছে?' হরিহরের প্রশ্ন।

'আছে। একটা কেলে গোখরোর বিষ জমেছে দাঁতে।'

'ভেরি গুড। দু-একটা এমন থাকা দরকার। কাজে লাগে।'

এবার দীপকের উদ্দেশে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে ক্রুর হেসে বললেন হরিহর, 'কিহে ইয়ংম্যান। রিপোর্টারি ছেড়ে ডিটেকটিভগিরি ধরলে কেন? এ গ্রেট ফুল। বড্ড বেশি জেনে ফেলেছ। তাই মরবে। নাগের লেজে পা দিয়েছ। ছোবল খেতেই হবে, উপায় নেই।'

তিনি এবার কালুয়াকে বললেন, 'শোন্, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি এখুনি। বাসে বোলপুর শহরে যাব। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে রাতে ওখানেই কাটাব কোনো হোটেলে। সকালে ফিরব। আমি চলে যাবার খানিক বাদে তুই গোখরোটাকে ছেড়ে দিবি এই ঘরে। তারপর বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিবি। এরপর বাইরে থাকবি। উঠোনে ঘুরবি, কাজকম্ম করবি, দু-একবার গ্রামের ভেতরে যাবি। ফাঁকে ফাঁকে এসে লক্ষ্য করবি সাপটা একে কামড়াল কিনা। ছেলেটা অক্কা পেলে লাশ রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসবি যতটা সম্ভব দূরে ধানক্ষেতে। সাবধান, কেউ যেন না দেখতে পায়। ফেলার আগে এর বাঁধন-টাধন সব খুলে দিবি। দেখে যেন মনে হয় আলপথে সাপে কেটে মরেছে।

লাশ ফেলে এসে তুইও বেরিয়ে যাবি। ফিরবি একদম ভোরে। হ্যাঁ, কালই সব মাল পাচার করে ফেলতে হবে। সন্দেহ করে সার্চ করলে যেন কোনো প্রমাণ না পায়। সাপটা কামড়াতে বেশ দেরি করলে জানলা দিয়ে ঢিল মেরে উসকে দিবি। তবে তাড়া নেই। এখন চারটেও বাজেনি। ঢের সময় আছে।' নির্দেশগুলো দৃঢ় স্পষ্ট ভাষায় জারি করে দীপকের দিকে আর দৃকপাত মাত্র না করে বেরিয়ে গেলেন হরিহর নাগ। কালুয়াও সঙ্গে গেল।

কালুয়া ফিরে এল মিনিট দশেক বাদে। সে তাক থেকে একটা ঝাঁপি নামিয়ে মাটিতে রাখল। তারপর ঝাঁপির ডালা তুলে একটু ফাঁক রেখে চট করে পিছিয়ে গেল।

কালো কুচকুচে এক সাপের মাথা সেই ফাঁকটুকু দিয়ে ডালা ঠেলে বেরুতে শুরু করে। তার মুখ থেকে লকলকে চেরা জিভ বেরুচ্ছে আর ঢুকছে। কালুয়া দ্রুতপায়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজার কপাট বন্ধ করে। বাইরে শিকল তোলার শব্দ হয়।

ধীরে ধীরে বেরোয় সাপটা। অন্তত হাত চারেক লম্বা, তেমনি মোটা। চকচকে নিকষকালো দেহ। সেটা চলতে শুরু করে।

দীপক একেবারে কাঠ। সে জানে যে সাপ খাদ্যবস্তু ছাড়া অন্য প্রাণীকে নেহাত ভয়

না পেলে অথবা বিরক্ত না করলে আক্রমণ করে না। দীপক বুকের ওঠানামা, শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ও গতি কমিয়ে আনে প্রাণপণে। যতক্ষণ এইভাবে বাঁচা যায়।

হাত পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় দীপক কিছুটা কাত হয়ে শোয়া। তার পায়ের দিকে দরজা। সাপের ঝাঁপিটা সামনে। খোলা জানালাটা পিঠের দিকে।

সাপটা একবার ঘাড় তুলে দেখে নেয়। অতঃপর ধীরেসুস্থে এঁকেবেঁকে চলে দেয়াল ঘেঁষে। বোধহয় ও কোনো ফুটোর সন্ধান করছে বেরিয়ে পালাবার ধান্দায়। দীপকের অস্তিত্ব হয়তো টের পায়নি। অথবা বিপজ্জনক মনে হয়নি এখনো। সারা ঘরে চক্কর দিতে থাকে সাপটা।

দীপক আড়চোখে নজর রাখছে সাপটাকে। কখনো সেটা তার কাছাকাছি চলে আসছে। কখনো দূরে। ইচ্ছে করে নয়, স্বাভাবিক আতঙ্কেই অবশ হয়ে যাচ্ছে দীপকের দেহমন। সাপ'টা যখন তার পিছন দিকে যাচ্ছে তখন যে কি অসহনীয় অবস্থা! প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা এই বুঝি ছোবল খেলাম। স্পর্শ পাব কোনো হিমশীতল সরীসৃপ দেহের। কোথায় ওটা? নড়াচড়া বা মুখ ঘুরিয়ে দেখার উপায় নেই। একইভাবে স্থির হয়ে থাকে সে।

জানলাটা দিয়ে আলো ঢুকছে। মাঝে মাঝে ছায়া পড়ছে ঘরে। কেউ নিশ্চয়ই জানলায় দাঁড়াচ্ছে রোদের পথ আগলে। আবার সরে যায় ছায়া। কালুয়া লক্ষ্য রাখছে সাপটা দীপককে ছোবল দিল কিনা।

দীপকের মনে ভেসে ওঠে অনেক প্রিয়জনের মুখ বাবা-মা দাদা-বৌদি। ভাইপো ছোটন। ভাইঝি ঝুমা। আরও কতজনের। ঘরে থাকলে বৌদি এই সময় তাকে চা খেতে ডাকত। দাসুর রেস্টুরেন্টের আড্ডায় একটু পরে এক এক করে বন্ধুরা জুটতে শুরু করবে। চা খেয়ে দীপকও হাজির হতো। বঙ্গবার্তা অফিসে কুঞ্জবাবু টেবিলে ঝুঁকে সম্পাদকীয় লিখছেন। হয়তো আশা করছেন দীপককে।

কেউ কি কল্পনাও করতে পারবে দীপক এখন কোথায়? নিশ্চিত মরণের মুখে কি যন্ত্রণাময় ভবিতব্যের প্রতীক্ষায় রয়েছে সে। সময় বুঝি আর এগোয় না। কতক্ষণ কেটেছে? পনেরো মিনিট? আধ ঘণ্টা? দীপকের বোধ হচ্ছে যেন কয়েক ঘণ্টা।

মনের চাপ অসহ্য হয়ে ওঠে এক এক সময়। সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত ঘুরছে চারপাশে। রয়েসয়ে খেলাচ্ছে যেন উৎকট উল্লাসে। এর চেয়ে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক ভবলীলা। দিক ছোবল। আর সহ্য হয় না।

আবার একটা মরিয়া চিন্তা মাথায় খেলে। এভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সঁপে দিই কেন মৃত্যুর কবলে? শেষ চেষ্টা করা যাক। হঠাৎ যদি বাঁধা জোড় পায়ের নিচে চেপে ধরতে পারি সাপটার মাথা! থেঁতলে পিষে দিই ওর মুণ্ডটা। যদি ফস্কাই মরব। সে তো এমনিতেই এড়ানো যাবে না। কিন্তু যদি সফল হই, তখন হাত-পায়ের বাঁধন খোলা অসম্ভব হবে না। জানলার গরাদ ভেঙে বেরুব। লাঠিটা রয়েছে ঘরে। কালুয়া বাধা দিলে মোকাবিলা করা যাবে। মোট কথা, এই একমাত্র উপায়। কালুয়ার কাছে নিশ্চয় পিস্তল নেই। সাপটার অজান্তে ধীরে, অতি ধীরে উঠে দাঁড়াতে হবে। তারপর সাপটা কাছে আসার অপেক্ষা। নির্ভুল নিশানায় লাফিয়ে পড়তে হবে ওর মাথায়। দীপকের সমস্ত স্নায়ু

টান টান। ইঞ্চি ইঞ্চি করে সে মাথা তুলতে থাকে মেঝে থেকে।

সহসা বাইরে একটা আওয়াজ হলো জোরে। কি ব্যাপার? দীপক স্থির হয়ে যায়।

একটু বাদে দরজায় শব্দ হয়। শিকল খুলছে কেউ। পলকে সাপটা দরজা লক্ষ্য করে ফণা ধরে স্প্রিংয়ের মতন খাড়া হয়ে ওঠে। দীপক তৎক্ষণাৎ মেঝেয় শুয়ে ফের নিথর হয়। নির্ঘাৎ কালুয়া এসেছে।

।। পাঁচ ।।

দরজার কপাট খুলে যায়। যে মুখটা উঁকি দিল, তাকে দেখে দীপক থ। কালুয়া নয়। জমির। তার হাতে লম্বা লাঠি। সতর্ক চোখে জমির সাপটাকে নজর করে। এক পা ঢোকে ঘরে। ক্রুদ্ধ বিষধর সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে তেড়ে যায় জমিরকে। মুহূর্তে লাঠির ঘা পড়ে সাপটার ঘাড়ে। ছিটকে যায় সাপটা। পরপর আরও কয়েক ঘা প্রচণ্ড আঘাতে জমির শেষ করে দেয় সাপটাকে। জমিরের পিছনে আরও একজন ঢোকে ঘরে। বসির। জমিরের ভাই।

জমির চটপট দীপকের হাত-পা-মুখের বাঁধন খুলে দেয়। আকুল স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'সাপটা কি কেটেছে?'

'না।' দীপক মাথা নাড়ে।

'ওঃ, বাঁচলাম', আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে জমির, 'ভাবছিলাম বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

দীপক উঠে বসে হাঁপায়। অবিশ্বাস্য চোখে দেখে মৃত সাপটা। কি যে ঘটে গেল ঠিক ঠাহর হয় না। তারপর প্রশ্ন করে জমিরকে, 'তুমি এখানে?'

'আপনি চলে যাবার পর খেয়াল হলো, আপনাকে যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি। এরা দুষ্টু লোক। যদি বিপদে পড়েন? তাই বসিরকে সঙ্গে নিয়ে এলাম আপনার পিছু পিছু। দূর থেকে দেখলাম, আপনি সরকার বাড়ির বাগানে ঢুকলেন। কালুয়া এল। হরিবাবু এলেন। হরিবাবু বেরিয়ে গেলেন। কালুয়া ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু আপনার দেখা নেই। বাড়ি থেকে বেরুবার তো একটাই পথ। দু'জনে গিয়ে বাগানে লুকোলাম। দেখলাম কালুয়া থেকে থেকে একটা জানলা দিয়ে দেখছে ভেতরে। সন্দ হলো। কালুয়া একবার গাঁয়ের দিকে যেতেই গিয়ে উঁকি দিলাম ওই জানলায়। দেখলাম আপনি মেঝেতে পড়ে আছেন মরার মতন আর সাপটা ঘুরছে। ভয়ে হিম হয়ে গেল বুক। বসিরের সঙ্গে যুক্তি করলাম। একটু বাদে কালুয়া ফিরল। ওকে পেছন থেকে এক ঘা দিয়ে পেড়ে ফেলে বেঁধে ফেললাম। তারপর ঢুকলাম এই ঘরে।'

'ওই বাক্সটা দেখ।' দীপক একটা কাঠের বাক্স দেখায়। ডালা খোলা বাক্সে ঝুঁকে দেখে জমির নীরবে মাথা ঝাঁকায়।

'ওই বাক্সটা খোল।' দ্বিতীয় কাঠের বাক্সটা দেখায় দীপক। সে নিজেও ওঠে।

জমির বাক্সের চাপাটা তুলতেই দীপক দেখে অন্য বাক্সটার মতো এটাও প্রায় ভর্তি সাপের চামড়ায়। নুন মাখানো শুকনো চামড়া। আঁশটে বোটকা গন্ধ ঠেলে ওঠে বাক্স থেকে।

দুটো বাক্স এবং ঘরে দড়িতে টাঙানো মস্ত একটা সাপের চামড়া দেখিয়ে দীপক

জিজ্ঞেস করল জমিরকে, 'তুমি জানতে এরা সাপ মেরে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়?'

'জানতাম বাবু।'

'বলনি কেন? সাপের চামড়ার ব্যবসা বেআইনি, জানতে না? সাপের দামী চামড়ার লোভে গাদা গাদা সাপ মারা হচ্ছিল। অনেক জাতের সাপ শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সরকার তাই আইন করেছে সাপ মেরে চামড়া বিক্রি নিষিদ্ধ।'

জমির কাঁচুমাচুভাবে বলে, 'আজ্ঞে জানতাম। বলতে পারিনি ভয়ে।'

'কিসের ভয়?'

'একদিন এখানে হঠাৎ এসে দেখি পেছনের উঠোনে দড়িতে অনেকগুলো সাপের চামড়া শুকোচ্ছে। বুঝতে পারি, এই এদের ব্যবসা। চলে আসার আগেই কালুয়ার চোখে পড়ে যাই। ও শাসায়, কাউকে বললে আমায় খুন করবে। লোকটা সাংঘাতিক। তাই ভয়ে মুখ বুজে থাকি। আমি ছাড়া বোধহয় আর কেউ টের পায়নি। তবে বাবু আমি অকৃতজ্ঞ নই। আপনার বিপদ বুঝে আর স্থির থাকতে পারিনি।'

হাতে-পায়ে বাঁধনের জায়গাগুলো টনটন করছে। ম্যাসেজ করে আড়ষ্টতা কমিয়ে দীপক বাইরে আসে। বারান্দায় একটা খুঁটিতে কালুয়া মোক্ষম করে বাঁধা। তার মাথার পিছনে এক জায়গায় রক্ত গড়াচ্ছে। লোকটার চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে হিংস্র রাগে।

শান্ত সুশীল জমিরেরও দেখা গেল ভিন্ন মূর্তি। দাঁত কিড়মিড় করে চাপা গর্জন ছাড়ে, 'বসির, একটা বিষে টইটম্বুর কালনাগ নিয়ে আয় দিকি। শয়তানটার গায়ে ছেড়েদি। সাপের বিষে মৃত্যু কেমন আরাম টের পাক।'

'থাক, থাক', দীপক থামায়, 'এস।'

খানিক তফাতে গিয়ে দীপক বলল, 'কালুয়া যেমন আছে থাক। এক্ষুণি বোলপুর যেতে হবে। থানায়। জমির, তুমি আমার সঙ্গে চল। বসির এখানে কালুয়াকে পাহারা দিক। বাস, লরি, প্রাইভেট কার যা পারি ধরে চলে যাব। টের পেলেই হরি নাগ পালাবেন। উনিই আসল শয়তান। আজ রাতের মধ্যে দুটোকে অ্যারেস্ট করানো চাই।'

বাস রাস্তায় পৌঁছে দীপক দেখল যে বাস-স্পটে হরিহর নেই। অর্থাৎ উনি বোলপুর রওনা হয়ে গেছেন। যাক, নিশ্চিন্তি।

দুদিন বাদে।

সকালে বঙ্গবার্তা অফিসে হাজির হলো দীপক।

কুঞ্জবিহারী চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দীপকের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'কনগ্রাচুলেশনস।' তিনি উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'খানিক আগে থানার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হলো। উনি বললেন, কলকাতায় হরি নাগের গুদাম সার্চ করে প্রচুর সাপের চামড়া পাওয়া গেছে। দেশে-বিদেশে চালান দিতেন গোপনে। এই কারবারে প্রচুর টাকা কামাতেন। ওঁর বিজনেস-পার্টনারকেও ধরেছে পুলিশ। এই লোভীগুলোর জন্যে কত প্রাণী যে লোপ পেতে বসেছে! এদের শাস্তি আরও কঠোর হওয়া উচিত।'

দীপক বসতে, কুঞ্জবাবু প্রশ্ন করলেন, 'বল তো বাপু, কি ভাবে সন্দেহ করলে কেসটা? সেদিন তোমায় টায়ার্ড দেখে ডিটেলস জিজ্ঞেস করিনি।'

দীপক বলল, 'গ্রামের লোকের কথায়। শুধু বুড়ো আর বড় সাপ কেনেন। এদিকে

হরিহর নাগ মুখে বলেন অন্যরকম। বড় ঢ্যামনা সাপের অর্ডার দেন সাপুড়েদের। সাপ নিয়ে রিসার্চ করছেন আর নির্বিষ ঢ্যামনা সাপ সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকের সেন্টিমেন্ট জানেন না? স্ট্রেঞ্জ! আবার কালুয়ার মতো দাগী গুণ্ডাকে সঙ্গী জুটিয়েছেন! খটকা লাগল। ভাবলাম, ওঁর সম্বন্ধে আরও খোঁজ নিই।

ওই গাঁয়ের পোস্টমাস্টার আমার চেনা। তাকে বলে রাখলাম, হরিহর কোনো চিঠি পোস্ট করলে, কোথায় পাঠাচ্ছেন ঠিকানাটা টুকে রাখতে। তিন দিন বাদে ঠিকানা পেলাম। তাই দেখে চলে গেলাম কলকাতায়। ট্যাংরা অঞ্চলে। নাগ কোম্পানির অফিস-গুদাম বের করলাম। দেখি চামড়ার ব্যবসা। সন্দেহটা বাড়ল। তখন হানা দিলাম ওর ডেরায়। ভানে এ্যানিমাল লাভার। কি ধূর্ত।'

'খুব বেঁচে গেছ। লোকটা ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল', কুঞ্জবিহারী মন্তব্য করেন।

রুবাইয়ের রূপকথা

নবনীতা দেবসেন

রুবাইয়ের বাবাও অফিসে চলে যান, মাও কলেজে চলে যান, বেচারী রুবাই সারাটা দিন বাড়িতে একলা। একলা ঠিক নয়—গীতাদিদি আছে, তবুও একলা। দুপুরে স্কুলবাস তাকে নামিয়ে দিয়ে যায়—গীতাদিদি হেসে তাকে দরজা খুলে দেয়, স্নানের ব্যবস্থা করে দেয়। আগে স্নান করিয়ে দিত, এখন রুবাই নিজে নিজে স্নান করে। আগে গীতাদিদি খাইয়েও দিত। এখন রুবাই নিজের হাতেই খায়। ইলিশমাছ কি কৈমাছ কি ট্যাংরামাছ থাকলে গীতাদিদি কাঁটা বেছে দেয়, যদিও রুবাই সেটাও নিজেই পারে। গীতাদিদিই ভরসা পায় না। রুবাইয়ের খাওয়া হলে, গীতাদিদি নিজে খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সে ঘুম কুম্ভকর্ণের ঘুম। একেবারে সেই যখন মা কলেজ থেকে আসবেন তখন ঘুম ভাঙবে। রুবাই একা একা বসে বসে ছোটবেলাতে মনে মনে কতরকমের গপ্পো বানাতো। নানারকম সুন্দর সুন্দর গপ্পো। আর মা কলেজ থেকে ফিরলেই তাঁকে শোনাতো। "মা জানো, আজ না জানলা দিয়ে একটা ছোট্ট এত্তোটুকুনি পরী এসেছিলো, ঠিক একটা বড়োসড়ো মশার মতো দেখতে—আমি তো মশা ভেবে মেরেই ফেলতাম, হঠাৎ দেখি

মাথায় মুকুট, হাতে একটা জাদুর কাঠি—”

—“তাই নাকি, রুবাই? তারপর? তারপর পরী কী বললো?” মা একমুখ হেসে রুবাইকে কোলে তুলে নিতেন। একটু বড়ো হবার পরে রূপকথা বানানোর খেলাটা বন্ধ হয়ে গেছে রুবাইয়ের। ঐ যে মা মুচকি হাসতেন। সেই হাসিটায় পরে ওর কেমন লজ্জা করতো। তাছাড়া বাবা খুব খ্যাপাতেন। গীতাদিদি তো ফ্যাক্‌ফ্যাক্ করে কেবলই হাসতো। গীতাদিদিকে গপ্পোগুলো বলাই যেতো না কোনোদিন। বাবাকেও না। শুধু মা-ই যা শুনতেন চোখ বড়ো বড়ো করে।

এখন রুবাই একটু বড়ো। এখনও ওর দুপুরগুলো কাটতে চায় না। সামনের বছর, সেভেন থেকে দুপুরে ক্লাস হবে। বাব্বাঃ বাঁচা যাবে। এখন ওই দুপুরগুলো নিয়েই যতো মুশকিল। কখনও হোমওয়ার্ক করে, কখনও বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়, চোখ দিয়ে একটা কাককে ফলো করে খানিকক্ষণ যতক্ষণ না সে উড়ে হারিয়ে যায়, একবার টিভি খোলে, যাচ্ছেতাই সব প্রোগ্রাম হয়। একবার রেডিও খোলে, একবার টেপ চালায়, একবার ‘লেগো’ নিয়ে বসে, একবার গল্পের বই নিয়ে শোয়। আর এক একদিন ভাবে, ছাদে গেলে কেমন হয়? ভবানীপুরে দাদুদিম্মার বাড়িটা তিনতলা। তার মস্ত ছাদ আছে। ছাদে চিলেকোঠা বলে একটা আশ্চর্য ঘর আছে, যাতে কী যে নেই তা কেউ জানে না! ভাঙা পিয়ানো থেকে আরম্ভ করে শিলনোড়া, পেতলের ফুলদানি, কুকুরের চেন—খালি শিশি বোতল, খবরের কাগজ, পুরনো চিঠিপত্রের বাক্সো, ট্রাঙ্ক, সুটকেস সবকিছু। ওই ঘরের দরজায় মরচে ধরা একটা তালা ঝোলে। চাবি দিম্মার আঁচলে বাঁধা রিংয়ে। মাঝে মাঝে ঘরটা খুলে এটাওটা বের করা হয়, ঢোকানো হয়। ঘরভর্তি শুধু আরশোলা আর টিকটিকিদের সংসার। মা বলেন, ইঁদুরও নিশ্চয় আছে। কিন্তু দিম্মা বলেন, না না, ইঁদুর নেই। আর দাদু বলেন, ইঁদুর নয় বাঘ বেরুবে একদিন ঐ ঘর থেকে। রুবাইদের এ বাড়িটা দশতলা। এ বাড়ির ছাদের দরজায় বিরাট দুটো তালা মারা থাকে। কেউ কোনোদিন ছাদে যায় না। ছাদটা থেকেও নেই। না পারা যায় ঘুড়ি ওড়াতে, না পারে ওখানে গীতাদিদি কাচা কাপড় শুকোতে দিতে।

দাদুদিম্মার ছাদে রোজ কতো রঙিন পতাকার মতো কাপড় শুকোয়। মাঝে মাঝে দিম্মার দেওয়া বড়িও শুকোয়, জাল ঢাকনির তলায়। আর ঐ ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো হয়। বড়মামু ছোটমামুর সঙ্গে জুটে রুবাইও কম ঘুড়ি উড়িয়েছে ওই ছাদে? নিজে নিজে কিন্তু রুবাই এখনো শেখেনি কী করে হুট্ করে আকাশে ঘুড়িটাকে পাঠিয়ে দিতে হয় ; কী করেই বা লাটাইটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘুড়ির ওড়াউড়ি, ওঠা নামা, কন্ট্রোল করতে হয়। বড়মামু ছোটমামু তো অনেক বড়ো। একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে, আরেকজন কলেজে পড়ছে—তবুও ওরা এখনও ঘুড়ি ওড়ায়। ওরা ঘুড়ি-এক্সপার্ট। শুধু ওই ছাদটা ছিল বলেই না এক্সপার্ট হতে পেরেছে? রুবাই ঘুড়ি ওড়ানো শিখবেই বা কী করে? প্র্যাকটিস করবে কোথায়? তাদের কি ছাদ বলে কিছু আছে? আছে অবশ্য একটা ছাদ। কিন্তু রুবাইয়ের তাতে লাভ নেই। দোবেকাকুর মেয়ের ‘ভাত’ হয়েছিল ওখানে মস্ত শামিয়ানা টাঙিয়ে। শানুদার বৌভাতও হয়েছিল ঐখানে মস্ত ম্যারাপ বেঁধে। কী ভালোই আইসক্রিমটা খাইয়েছিল! তখনই দেখা গিয়েছিল, রুবাইদেরও ছাদ আছে। খুব সুন্দর, বিশাল বড়ো,

তেপান্তরের মাঠের মতো ছোটোবড়ো অনেকগুলো ছাদ, আবার নানারকম ব্রিজ দিয়ে দিয়ে জোড়া। খেলবার পক্ষে আদর্শ জায়গা। অথচ সেই ছাদে কিনা বারোমাস তালা দেওয়া থাকে। কারুর ওঠা চলবে না। রুবাই রোজই ভাবে একবার চুপিচুপি ছাদে চলে যাবে। যদি একদিন কেউ তালাটা ভুলে খুলে রাখে? অসম্ভব তো নয়? মা তো একদিন গডরেজ আলমারিতে চাবির থোলে ঝুলিয়ে রেখে কলেজে চলে গিয়েছিলেন—দুপুরবেলা গীতাদিদি রুবাইকে দেখালো। বিকেলে মা ফিরলে, রুবাই মাকে দেখালো। মা তক্ষুণি তাড়াতাড়ি আলমারি খুলে কী সব দেখলেন, তারপর খুব খুশি হয়ে গীতাদিদিকে দশটাকা দিলেন। গীতাদিদি দশটাকা পেয়ে কেমন একটা বিচ্ছিরি মুখ করে রান্নাঘরে চলে গেল। ভাবতে ভাবতে রুবাই দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে লিফ্‌টের সামনে দাঁড়ালো। ছাদে কি এখন লিফ্‌টে করে উঠবে? না হেঁটে হেঁটে? মোটে তো একটা তলা। রুবাই ভাবলো হেঁটেই ওঠা সহজ। এখন দুপুর, লিফ্‌ট কতক্ষণে আসবে কে জানে? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ছুটতে ছুটতে রুবাই ছাদের সিঁড়িতে। একটা বাঁক ঘুরেই হঠাৎ রুবাই শুনতে পেলো ওপরে কারা কথা বলছে।

দুপুরবেলা ছাদের সিঁড়িতে আবার কারা কথা বলবে? রুবাই কী ভেবে ঐখানেই থেমে গেল। দুটো গলা। একটু পরেই রুবাই বুঝলো একটা গলা ওদেরই বিলডিংয়ের সিকিউরিটি ম্যান গণেশ সিং-এর, আরেকটা গলা চেনা নয়। দুজনেই খুব আস্তে আস্তে কথা বলছে বটে তবু নিচে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে সব। অচেনা গলার লোকটা বলছে—"এটা তোমার অন্যায় কিন্তু! পাঁচই যথেষ্ট। তুমি দশ চাইছো কী বলে? মালটা শুধু রাখা হয়েছে ছাদে, এটুকুই তো কেবল? এর জন্য দশ হাজার? তুমি কি উন্মাদ হয়েছো?" গণেশ সিং বলছে—"আমি তাহলে পুলিশকে খবর দিয়ে দিই", ছাদে কন্ট্রাব্যাণ্ড মাল আছে? দশ হাজার ছাড়ো, নইলে মালও তুমি পাবে না। চাবি আমি খুলবোই না।"

অচেনা লোকটা বলছে—"চাবি না খুলে কি প্রাণটা হারাবে বাপধন? আমরা যে-মালের কারবার করি, তাতে তোমার মতন দুচারটে কাঁচামালকে টুকটাক সরিয়ে দেওয়া কোনো ব্যাপারই নয়। বুঝলি গণ্‌শ্যা? সময় থাকতে নরম হ। পাঁচ দিচ্ছি তুই চাবি খোল্। নইলে—"

গণেশ সিং-এর গলা এবার খুব কঠিন হলো। "—নইলে কী করবি? ছুরি বের করছিস? কর না, এই যে আমারও ছুরি আছে। উপরন্তু এই দ্যাখ কোমরে রিভলবারটা নিয়ে ঘোরা একটা বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। লাইসেন্সড্ মাল—তোর ওপরেই পরীক্ষাটা তবে হয়ে যাক। কী বলিস ভোলা? তোকে মারলেও কিন্তু আমাকে কেউ ধরবে না—আমি সিকিউরিটি!"

—"দোরটা খুলবি? নাকি?"

—"দশ।"

—"ছয়।"

—"দশ।"

"ছয় তো অনেক টাকা রে? রাজী হয়ে যা।"

"দশ। বেশি ক্যাসনি ভোলা।"

—"আর আমিই যদি বলে দিই? এখানকার সিকিউরিটি অফিসার ছাদে কন্ট্রাব্যাণ্ড লুকিয়ে রাখে। দেখুক পুলিশ ছাদের দোর খুলে! প্যাকেট ভর্তি ভর্তি মাল সব ওর। শালা বিলডিং সুদ্দু ছেলেদের মাল সাপ্লাই দিয়ে দিয়ে নষ্ট করে দিচ্চে।"

—"যা না বল্ না। পুলিশ বোকা নাকী রে? তোকে ধরবে না বুঝি?"

—"ফোনে বলবো। গড়িয়াহাট থানার নয়া ওসি কড়া লোক। দেবে ঠেসে। চোদ্দ বছর বনবাস।"

—"আমাকে ধরলেই তোমার নামটি আমিই বলে দেবো মাস্টার। বলবো আমার নয়, মালপত্তর সব তোমার—কী মাল আমি মোটে জানিই না—শুধু রেখেছি তোমার জন্যে—"

—'রেখেছো কেন? বন্ধ ছাদে অন্যের মাল রাখা উচিত বুঝি। আইনে বলে? আমায় ধরলে তোকেও ধরবে।"

—"দ্যাখো মাস্টার, বেশি ভ্যানর ভ্যানর কোরো না, পাঁচে মাল তুমি পাবে না। ছাড়ো দশ। দরজা খুলে দিচ্ছি। নইলে কাল মাদকদ্রব্য বিরোধী দিবস আছে, আজই আমি ফোনে থানাকে বলবো। আমি বলবো আমি একজন পুরনো ড্রাগ-অ্যাডিক্ট। নিজেও সেরে উঠতে চাই, অন্যদেরও সারাতে চাই—তাই থানায় খবর দিচ্চি—তুমিই আমার সাপ্লায়ার ছিলে—"

রুবাইয়ের সারা গায়ে কাঁটা দিলো—ড্রাগ-অ্যাডিক্ট শব্দটার মানে রুবাই জানে। বিষাক্ত নেশা করে যারা। টিভিতে বিজ্ঞাপনও দেখেছে। এ নেশায় মানুষ উচ্ছন্নে যায়। এরা তবে ড্রাগ লুকিয়ে রেখেছে ছাদে? ড্রাগের ব্যবসা করে! রুবাই দৌড়ে নিচে পালিয়ে এলো। বেল টিপতে গীতাদিদি ঘুম চোখে উঠে এসে রুবাইকে দেখে অবাক। "সেকি, রুবাই? তুমি আবার কখন বেরুলে? কোথায় গিয়েছিলে আমাকে কিচ্ছু না বলে কয়ে?" গীতাদিদি চোখ গোল গোল করে বকতে বকতে দরজা বন্ধ করে। রুবাই বলে, "গীতাদিদি! চুপ করো তো? আমার একটা দরকারি কাজ ছিলো—" দৌড়ে ঘরের ভেতরে ফোনের কাছে যায় রুবাই। ডিরেক্টরি তুলে দেখে, এই তো পুলিশের নম্বর। পুলিশ, আগুন, অ্যাম্বুলেন্স। রুবাই পুলিশের নম্বরটা ঘোরায়। ভয়ে উত্তেজনায় তার হাত থরথর কাঁপছে। বুক ধড়ফড় করছে। আড় চোখে দেখলো গীতাদিদি আবার গিয়ে ফ্যানের নিচে শুয়ে পড়েছে। চোখের ঘুম কাটেনি তাই বেশিক্ষণ বকেনি। গীতাদি মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। তবুও রুবাই এ ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। থাক—গীতাদির এসব না শোনাই ভালো। নম্বর তো ঘোরাই, কী জানি কী হয়? ওই তো রিং হচ্ছে। এইবার ঃ—"হ্যালো। লালবাজার? আমি বারো নম্বর বিশ্বনাথ স্ট্রীট থেকে বলছি। শুনুন, আমাদের বাড়ির ছাদে অনেক প্যাকেট ড্রাগ, কন্ট্রাব্যাণ্ড মাদকদ্রব্য জমা আছে। ড্রাগ আর কি! সিকিউরিটি ম্যান গণেশ সিং আর তার বন্ধু 'মাস্টার ভোলা' দুজনে মিলে এগুলো রেখেছে। তারা এখন দুজনেই এ বাড়ির ছাদের সিঁড়িতে ছোরাছুরি নিয়ে ঝগড়া করছে—ধরতে চাইলে আপনারা এক্ষুণি চলে আসুন। বারো নম্বর বিশ্বানাথ স্ট্রীটের এ বাড়িটা মাল্টিস্টোরিড। "বি-ব্লকের" ছাদের সিঁড়িতে এক্ষুণি অনেক পুলিশ পাঠান। এটা গড়িয়াহাট থানার আনডারে। বুঝেছেন? বারো নম্বর বিশ্বনাথ স্ট্রীট, বি ব্লক, ছাদের সিঁড়ি", বলেই ফোনটা রেখে দেয় রুবাই। তার এতই ভয় করছে, যে মনে হচ্ছে পাঁজরা

ফেটে বোধহয় হৃৎপিণ্ডটা ছিট্‌কে বাইরে বেরিয়ে চলে আসবে। ফোন রেখেই বুকে বালিশ চাপা দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে রুবাই। চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকে পুলিশরা এখন কী করবে? লালবাজারের লোকরা তার কথা বিশ্বাস করে পুলিশ পাঠাবে কি? রুবাই তো ছোটো ছেলে, ফোনে তার গলা শুনে তাকে সবাই মেয়ে ভাবে, এখনও ছেলে বলেই চিনতে পারে না, তার কথা কি পুলিশ শুনবে? ছোটো ছেলেরা পুলিশে এসব খবর দেয় কি? তাছাড়া পুলিশ তো জানেই না কে খবরটা দিল। ইয়ার্কি ঠাট্টা ভাবলো না তো? মিছে কথা ভাবে যদি? আর ফোন নম্বর থেকে পুলিশ যদি জানতে পারে রুবাইই ফোন করেছিল? যদি রুবাইকেই ধরে নিয়ে যায়? ভয়ে রুবাইয়ের কান্না পেয়ে গেল। কী দরকার ছিল পুলিশকে ঘাঁটাবার? পুলিশ-টুলিশকে ভীষণ ভয় করে রুবাই। কিন্তু ড্রাগের নেশা যে ভীষণ খারাপ ব্যাপার। জীবন একেবারে নষ্ট করে দেয়। ইস্কুলের সামনে ফুচকা খাওয়াও বারণ হয়ে গেছে রুবাইয়ের। তার ভেতরেও নাকি ড্রাগ পুরে দিচ্ছিল খারাপ লোকেরা। এই নেশা, ড্রাগ অজগর সাপের মতন, মানুষকে জড়িয়ে ধরে কঙ্কাল বানিয়ে দেয়। রাস্তায় বড় বড় ছবি দেখেছে এ বিষয়ে রুবাই। মা বুঝিয়ে বলেছেন। ভাবতে ভাবতে ভয়ে উদ্বেগে রুবাই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ দরজায় ধাপর ধাঁই ধাক্কায় ঘুম ভাঙলো। মা ধাক্কা দিচ্ছেন।

—"কি রে? দরজা বন্ধ করে ঘুম আবার কী? দরজা খোল্—" রুবাই দরজা খুলেই বুঝলো সবাই খুব উত্তেজিত। গীতাদিদির চোখমুখে উত্তেজনা যেন ফেটে পড়ছে। বাব্বা। একদিন ভুল করে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে রুবাই—তাতেই এই?

মা বললেন—"জানিস রুবাই? কী সব ভয়ানক কাণ্ড? আমি তো ঢুকতেই পাই না! এ বাড়ি আজ পুলিশ রেইড করেছিল। নারকটিক্‌স স্কোয়াড।"

—"পুলিশ?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, পুলিশ! সিকিউরিটি ম্যান গণেশ সিংকে অ্যারেস্ট করেছে। ছাদে নাকি অনেক ড্রাগের প্যাকেট লুকিয়ে রেখেছিল—কী সব্বোনেশে লোক!"

—"সত্যি? কখন?" রুবাই উত্তেজনায় আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলেছে।

—"এই তো একটু আগেই ওদের ধরে নিয়ে গেলে পুলিশের গাড়ি করে। এ বাড়ি থেকেই একটি মেয়ে নাকি খবর দিয়েছিল লালবাজারে। খবর পেয়েই পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে আর ছাদের সিঁড়ি থেকে গণেশ সিংকে আর তার এক শাগরেদকে ধরেছে। ছাদ থেকে ড্রাগের প্যাকেটগুলোও উদ্ধার করেছে। পুলিশ মেয়েটাকে কত খুঁজলো, কিন্তু কেউই বলতে পারছে না খবরটা ঠিক কে দিয়েছে। খুবই ভালো কাজ করেছে কিন্তু মেয়েটি। খুব সাহসের কাজও করেছে। কিন্তু সে খবরটা পেলো কেমন করে কে জানে?" তোয়ালে নিয়ে এবার মা গা ধুতে বাথরুমে ঢুকছেন। রুবাই ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজলো।

এক্ষুণি মাকে যদি সবকথা রুবাই বলে দেয়—ছাদে যাওয়া থেকে ফোন করা অবধি—মা কি বিশ্বাস করবেন? যদি বলে, "কোনো মেয়ে নয় মা, আমিই ফোন করেছিলুম। দুপুরবেলা আমি ছাদে—" নাঃ। থাক।

যদি মা, তেমনি মুচকি হাসেন? যদি মা ভাবেন রুবাই সেই ছোটবেলার মতোই

রূপকথার গপ্পো বানিয়ে বলছে? সে খুব কষ্টের হবে। থাক, এত বড়ো ঘটনাটা রুবাইয়ের একলার জন্যেই জমা থাক। রুবাই মাকে ছেড়ে দিল।

গীতাদিদি দুধের গেলাস নিয়ে এসে চোখ পাকিলে বলল—"আর কোনোদিন দুপুরবেলাতে তুমি অম্‌নি লুকিয়ে বেরুবে না!—আজ কী গণ্ডগোল! ডাকাতগুলো এই ঘরের পাশেই, সিঁড়িতে!—এখনও ওখানে মানুষ গিজগিজ করছে—তুমি যদি ওর মধ্যে গিয়ে পড়তে? পুলিশে ডাকাতে আজ গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হতে হতে বেঁচে গেছে। কী কেলেংকারিই না হতে পারতো! দুজনের কাছেই গোলা-গুলি ছিল, ছোরা-ছুরি ছিল—ওরে বাবারে"—গীতাদিদি শিউরে ওঠে। রুবাই দুধের গেলাসে মুখ ডোবালো।

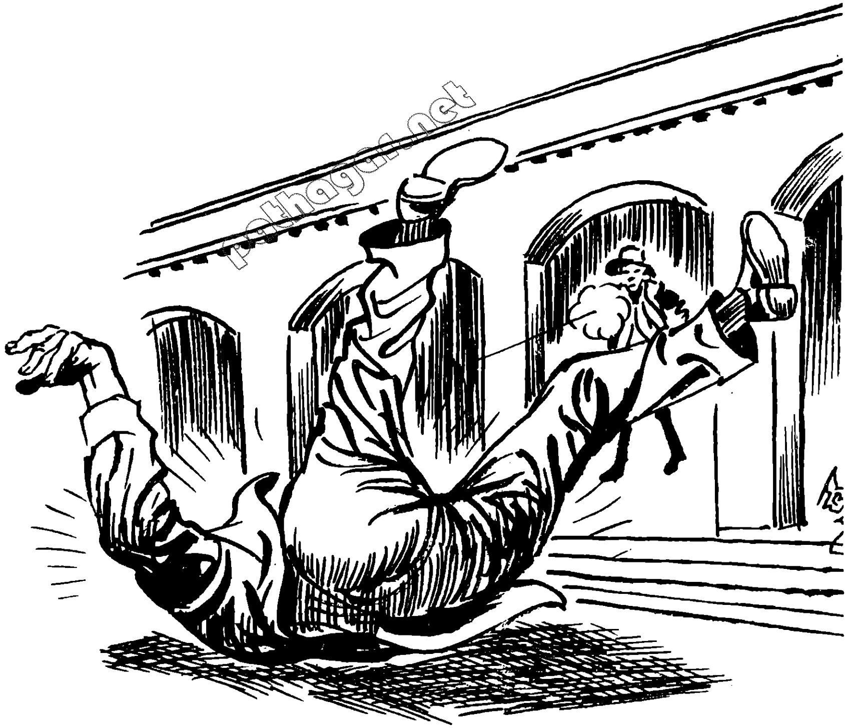
pathagar.net

চোর

সমরজিৎ কর

রীতিমত তাজ্জব ব্যাপার।

শেষ পর্যন্ত আমাকেও গোয়েন্দাগিরি করতে হবে, এমন কথা আমি কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম? আর তাও কিনা মাছের জন্য। এখন হাসব কি কাঁদব এই তো অবস্থা। তারপর কেঁচো খুঁড়তে সাপ!

ঘটনাটা ঘটেছিল গত শ্রাবণ মাসে। হ্যাঁ, পরিষ্কার মনে আছে রবিবার। সকালের দিকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। কালো জমাটি মেঘ চিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, আর তার সঙ্গে যা বাজের আওয়াজ, ভয় হচ্ছিল ঐ শব্দে ঘরবাড়িগুলি না হুড়মুড়িয়ে পড়ে। কলকাতা ভেসে যায় আর কি! তখন ন'টা।

দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল।

মনে মনে ভাবলাম, কে এল রে বাবা! এই বর্ষায় কার আবার পথে বের হওয়ার শখ হ'ল। খানিকটা বিরক্তও যে হলাম না সেকথা বলব না ; কারণ গতকাল রাতের দিকে যে পরীক্ষাটি আমি শুরু করেছিলাম, ভেবেছিলাম আর একটু পরেই তা নিয়ে

আবার কাজ করা দরকার। এরই মধ্যে এটি নিয়ে যথেষ্ট শোরগোলও পড়ে গেছে। কৃত্রিম উপায়ে বাতাসের গতিপথ কিভাবে পাল্টে দেওয়া যায়, এটাই ছিল আমার গবেষণার বিষয়। আমার মনে হয়েছে, ব্যাপারটা খুব জটিল হবে না।

ঘণ্টা বাজল আরও কয়েকবার।

কচিকে ডেকে বললাম, দেখ তো কে এল?

কচি বছর আঠারোর ছোকরা। কিছুদিন স্কুলে পড়াশুনা করেছিল। বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় চাকরি করতে এসেছিল এবং শেষ পর্যন্ত আমারই বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে। প্রথম প্রথম কেমন ভেজা বেড়ালের মতই মনে হয়েছিল ওকে। কিন্তু কলকাতায় পা দেবার এক বছরের মধ্যেই ছোকরার উন্নতি ঘটে গেল। দু' কানের পাশ দিয়ে লম্বা জুলফি, ঘাড় ঢাকা চুল, আমার পুরনো প্যাণ্টগুলোকে দরজি দিয়ে চোঙা করে নিয়েছে—বুঝতেই পারছ, বেশি বর্ণনা দিয়ে আর কি হবে? তবে খুব বুদ্ধিমান ছেলে। আমার একক সংসারের পুরো দায়িত্বটি ও নিয়ে নিয়েছে এবং বলতে হবে, আমি তোফাই আছি। কচি আমাকে স্যার বলে ডাকে।

আমার কথায় কচিও যেন খানিকটা বিরক্ত হ'ল।

এই শেয়াল-কুকুরে ভেজা জলে আবার কে এল রে বাবা! গজগজ করতে করতে ও দরজা খুলতে গেল। আর তার কয়েক সেকেণ্ড পরেই ঘরে এসে ঢুকল অপরিচিত এক আগন্তুক। মণ তিনেক ওজন হবে, সেই অনুপাতে লম্বা-চওড়া। টকটকে ফরসা। গায়ে একটি বর্ষাতি, তার নিচে দিয়ে কালো প্যাণ্টের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে। পরিষ্কার বুঝলাম বাঙালী নন। হাবভাবে মনে হ'ল খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সারা মুখে বেশ একটা উদ্বেগ ভাব। আগে ওঁকে কখনও দেখিনি।

কচি ওঁর গায়ের থেকে বর্ষাতিটি খুলে নিয়ে চলে গেলে দেখা গেল ওঁর গায়ে রয়েল বেঙ্গল রঙের একটা জামা। কোনো রকম ভূমিকা না করে বললাম, আপনি—?

হামি কি মিঃ বসুর সঙ্গে কথা বলছি?—ওঁর পাল্টা প্রশ্ন।

হ্যাঁ, আমিই সুরজিৎ বসু।—আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।—আপনি বসুন।

লোকটা যে সম্ভ্রান্ত তা ওঁর আদব-কায়দা দেখেই মনে হয়েছিল।

ধন্যবাদ! একটু ম্লান হাসি হেসে তিনি আমার সামনের চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, হামি আশা করতে পারিনি, আপনাকে এত সহজে পেয়ে যাব। হামার নাম ব্রিজলাল সুখারিয়া। হামার দোস্ত মিঃ রাবিন মিত্র আপনাকে একটি খত্ ভেজেছেন।

বলেই বুক পকেট থেকে একটি সাদা খাম আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

এবার আমার আরও বিস্ময়ের পালা।—রবিন মানে পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের—

হাঁ, হাঁ, ঐ ভার্সিটিরই তো উনি হচ্ছেন অধ্যাপক—আমার মুখের কথা লুফে নিয়েই কথা বললেন তিনি।

রবিন কি আবার কলকাতায় এসেছে? আমার মনে বিস্ময়! কারণ দিন-তিনেক হ'ল সে বোম্বাই-এ চলে গেছে। সেখানে দিন-সাতেক থেকে পুনার কাজে যোগ দেবার কথা।

রবিনের দেওয়া খামটি খুলে ফেললাম।

রবিন লিখেছে, ভাই সুরজিৎ, পত্রবাহক শ্রীব্রিজলাল সুখারিয়া কোটিপতি। কিন্তু

কোনো একটি কারণে ওঁর মান-সম্মান প্রায় যেতে বসেছে। ব্যাপারটা ওঁর কাছেই শুনবে, কারণ ওসব কথা চিঠিতে লেখা নিরাপদ মনে করলাম না। ওঁর সমস্ত ঘটনা আমার কাছেও কেমন যেন হেঁয়ালির মত মনে হয়েছিল। তবে নিজের চোখে সমস্ত কিছু দেখার পর আর উড়িয়ে দিতে পারিনি। তুমি বিজ্ঞানী, এর আগে নানা রকম জটিল পরিস্থিতির ফয়সালা করেছ। আশা করি ওঁকে সাহায্য করবে। সুখারিয়া আমার বিশিষ্ট বন্ধু।—ইতি রবিন।

—কি ব্যাপার, বলুন তো? এবার শুধু বিস্মিতই নই, কৌতূহলীও হয়ে উঠলাম।

—কি বলব, স্যার? হামার নাফা ছোড়ে দিন, এবার হামার ইজ্জৎ যাবে। হামি রূপিয়ার পরোয়া করি না, লেকিন শেষ পর্যন্ত পরদেশী আদমি কি ভাববে বলুন তো? সেটার ফায়সালা করবার জন্যেই তো হামি বোম্বাই থেকে এত দূর ছুটে এলাম।—ব্রিজলালের কণ্ঠে হেঁয়ালি।

—মাফ করবেন, মিঃ সুখারিয়া। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, রবিনের চিঠি পড়ে তো কোনো কিছু আঁচ করা গেল না। আপনিও।...

—মাছ, স্যার, মাছ। মছলি যাকে বোলা হয়। মহাভারতের রাজা নহুসের হাতের কাটা মছলি যেমন জ্যান্ত হয়ে জলে পালিয়ে যেত, হামারও অবস্থা এখন তাই। নিজের আঁখে দেখছি টন টন মাছ সমুদ্রের ঢেউ-এর ওপর খেল-কুঁদ করছে। সারডিন আছে, স্যামন আছে, আরও বহুৎ বহুৎ। কিন্তু কী বলব স্যার, হামার জাহাজটা যেই ওদের সামনে গেল, জাল ফেলার জন্য তৈরি হ'ল, ব্যস। মাছগুলির এক-একটি হয়ে গেল যেন পাঁখি। শালারা—সে কি বলব আপনাকে, নিজের আঁখে না পঁহচানলে বিসওয়াস কোই করবে না। সব মাছ জলের উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল। পারলে যেন উড়ে যায়। এমন ঝাঁকে ঝাঁকে হাওয়ার মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে ঠেলে—ব্যস। সব হাওয়া। একঠো পোনা ভি মিলল না—!

কচি এসে ধূমায়িত চা রেখে গেল দু' কাপ। ছেলেটাকে এই কারণেই আমার ভাল লাগে। কোন্ সময়ে কি করা দরকার, ওকে বলে দিতে হয় না।

কিন্তু কি বলতে চান সুখারিয়া? সকাল বেলা এমন শ্রাবণের বর্ষার দিনে কি অমন মাছ মাছ করছেন তিনি? রবিনটাও এমন গবেট, কিছু যে পরিষ্কার করে লিখবে তা কি হবার জো আছে ছাই!

সুখারিয়া এক নাগাড়ে বলে যেতে লাগলেন—বলব কি স্যার, দশ লাখ রূপেয়ার কনট্রাক্ট। এক মাসে হামাকে সাপ্লাই দিতে হবে। এবারে নতুন টেণ্ডার ধরেছি জাম্বিয়া সরকারের কাছ থেকে। আগে তো এ কারবার ছিল মেটা সাহেবের। কি কারণে জাম্বিয়া সরকার খুব রেগে গেল। ব্যস। মেটা সাহেবের সঙ্গে ওদের কনট্রাক্ট ক্যান্সিল। অমনি ধরে নিলাম হামি। হামার তিনখানা মাছ ধরার জাহাজ আছে। আরব সাগরের বহুৎ দূর পর্যন্ত ওদের নিয়ে হামি টহল দিয়েছি কতবার। মাছ ধরার ব্যবসা হামার বাপ-দাদাদের। ভাবলাম নসিবটা ভাল। একটা বড় দাঁও পাওয়া গেল। মাছের ঝাঁকভি দেখলাম। জাল ফেলা হ'ল। কিন্তু তার আগেই সব হাওয়া। মাছের একটা আঁশভি মিলল না।

লোকটা পাগলই হয়ে গেছেন যেন। কথা থামাতে চান না। অথচ যা বলছেন মাথা-

মুণ্ডু ছাই কিছুই কি ঢুকছে মাথায়? শুধু এটুকু বুঝলাম, ভদ্রলোক যথেষ্ট ধনী, ওঁর মাছের বিরাট কারবার এবং সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে নিশ্চয় কোনো ফ্যাসাদ হয়েছে।

আমি বললাম, আপনার ব্যাপারটাকে খুব আজগুবী বলে মনে হচ্ছে, মিঃ সুখারিয়া। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কিভাবে আপনাকে সাহায্য করব।

—সে কোথা বোলবেন না, স্যার। হাপনিই হামাকে বাঁচাতে পারেন। হাপনার দোস্ত রাবিনবাবু হামারভি দোস্ত। হাওয়া নিয়ে আপনার কারবার শুনেছি হামি। সমুদ্রের জোল নিয়ে বহুৎ নাম কিনেছেন। হাপনাকে একবার দেখতে হোবে, জোলের কোনো দোষ হ'ল কি না। হাপনার কৈ অসুবিধা হোবে না, স্যার। হাওয়াই জাহাজের টিকিটভি খরিদ করে এনেছি। ফ্লাইট দুপহর এক বাজে মে হ্যায়। না করবেন না, হামার সঙ্গে যেতেই হোবে আপনাকে। টাকার কথা ভাবছি না স্যার, যদি এক মাসের মধ্যে জাম্বিয়ায় আমি মাছ ভেজতে না পারি, হামার ইজ্জৎ থাকবে না, ভবিষ্যতে হামার ব্যবসার ভি দারুণ লোকসান হবে।

বুঝলাম সুখারিয়ার সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে। বিশেষ করে রবিনের অনুরোধ উপেক্ষা করা চলে না।

হাতে ঘণ্টা দেড়েক সময়। তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হ'ল। দমদম থেকে একটি ক্যারাভেনে চড়ে বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে গিয়ে পৌঁছলাম। রবিনের সঙ্গে সেখানেই দেখা হয়ে গেল। ব্রিজলাল, রবিন এবং আমি প্রাইভেট কারে বোম্বাই শহরের দিকে রওনা হলাম। সব ব্যবস্থা ব্রিজলালের।

পথে চলতে চলতে রবিন সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিল। বলল, আমি জানতাম, তুমি আসবে সুরজিৎ। সমস্ত কিছু আমার কাছে ভৌতিক ধোঁয়ার মত মনে হচ্ছে। সমুদ্রের স্রোত নিয়ে তো তুমি অনেক গবেষণা করেছো, তাই ভাবলাম, হয়ত তুমিই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। মাছের বড় বড় ঝাঁক চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর জাহাজের সামনে পড়লেই সব ছুট। এ তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না আমরা।

মেরিন ড্রাইভের সুবিখ্যাত নটরাজ হোটেলে রবিন এবং আমাকে পৌঁছে দিয়ে ব্রিজলাল চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, রাত আটটা নাগাদ তিনি আসবেন এবং আজ রাতেই একবার চেষ্টা করে দেখবেন।

আমি বললাম, সেই ভাল। এ পর্যন্ত যা শুনেছি তাতে সমস্ত কিছুই গোলকধাঁধা বলে মনে হয়েছে। নিজে চোখে দেখার পর হয়ত কিছুটা বোঝা যাবে।

সুখারিয়া চলে যাওয়ার পর রবিনকে জিজ্ঞেস করলাম, রাতেই কি তাহলে তোমরা মাছ ধরতে যাবে? মানে—

রবিন বলল, ব্রিজলালের সব ব্যবস্থা খুবই আধুনিক। গেলেই বুঝবে, রাতেই মাছ ধরার যত সুবিধে।

ব্রিজলাল ঠিক ঘড়ি দেখে রাত আটটায় এলেন। এবার তাঁর মুখে সকালের মত কোনো উদ্বেগ ছিল না। বরং যথেষ্ট উৎসাহী এবং গম্ভীর বলেই মনে হ'ল।

বললেন, হাপনাদের সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে, মিঃ বাসু। ইণ্ডিয়া গেটের কাছে লাঞ্চ রেডি। কিছুক্ষণ আগে হামার লস্কররা খবর দিয়েছে এখান থেকে পশ্চিম দিকে

একটা ভারী মাছের ঝাঁক দেখা গেছে। ওরা ধীরে ধীরে উত্তর বরাবর ভেসে চলেছে। হামার মাছ ধরার দু'খানা জাহাজকে হুকুম দিয়ে দিয়েছি। উত্তর দিকে সরে এসে ওদের সামনে থেকে জাল ফেলতে। কোনোই অসুবিধে হবে না। দরিয়া থেকে এখন ওয়ারলেসে জানিয়েছে মিঃ আপ্তেজি।

আমরা প্রস্তুতই ছিলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ইণ্ডিয়া গেটের কাছে পৌঁছতেই একটি লোক এসে ব্রিজলালকে নমস্কার করে বলল, প্রস্তুত। মাছের ঝাঁক আগের মতই এগিয়ে যাচ্ছে। মাছ ধরা জাহাজ দুটি এখান থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে রয়েছে। আমরা ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে যাব।

সাবাস কাদের আলি! ব্রিজলাল ওর পিঠের উপর একটা মৃদু করাঘাত করলেন।

আমরা এসে উঠলাম ছোট্ট একটি মোটর-বোটে। হ্যাঁ, চোখ আছে বটে ব্রিজলালের। অত্যন্ত পরিপাটি করে সাজানো এই মোটর-বোটটিতে সমস্ত রকমের আধুনিক ব্যবস্থা চোখে পড়ল। এমন কি, রেডারও ছিল তার মধ্যে। তীব্র সার্চলাইট ফেলে দ্রুতবেগে আরব সাগরের বুকের উপর দিয়ে আমরা ছুটে চললাম। ছোটা নয়, যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছি আমরা, ঘণ্টায় পঁচিশ-তিরিশ মাইলের কম তো নয়ই। কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

দেড় ঘণ্টা নয়, তার আগেই আমরা ব্রিজলালের জাহাজের সন্ধান পেলাম। জ্বলন্ত জোনাকির মত তারা ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে।

ব্রিজলাল বেতারে ওদের জানালেন, আপাততঃ তারা যেন আর না এগোয়। তিনি গিয়ে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করবেন।

এর পর আমাদের ছোট্ট বোটটি জাহাজে গিয়ে ভিড়ল।

ঝোলানো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে আমরা তিনজনই উঠে গেলাম। তারপর সরাসরি গিয়ে হাজির হলাম পাইলটের ঘরে। অন্যান্য কয়েকজন অফিসারও ততক্ষণে সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। ব্রিজলালকে দেখে ওঁরা অভিবাদন জানালেও কোনো কথা বললেন না। অবস্থাটা এমন, দরিয়ার বুকে এই কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে যেন প্রচণ্ড এক নৌযুদ্ধ। ব্রিজলালকে আমার কাছে তখন একজন সাহসী নেতার মতই মনে হচ্ছিল।

উঃ, কী বলব! মাছ ধরার ব্যাপারে যে এমন সব ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ব্রিজলালের জাহাজে না গেলে যেন কল্পনাই করা যেত না। ডেকের মৃদু আলোয় দেখলাম, নাইনলের তৈরী জাল থরে থরে সাজানো রয়েছে। পাইলট ক্যাবিনের ছাদের উপর ছোট একটি রেডার, এপাশ ওপাশ ঘুরে-ফিরে সমুদ্রের বুকে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। শুনলাম, মাছ ধরার পর তাদের আঁশ ছাড়িয়ে টিনের কৌটায় প্যাক করার একটা খুদে কারখানাও আছে ডেকের নিচে। মানে, ডকে গিয়ে যখন জাহাজ ভিড়বে তখন বাক্স করে শুধু মাছের কৌটো ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না। এই দলে রয়েছেন রসায়নবিদ্, যিনি মাছগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারটা দেখে থাকেন ; আছেন ইঞ্জিনিয়ার, রেডিও অপারেটার। এক কথায় সব নিখুঁত ব্যবস্থা।

পৌঁছানোর মিনিট তিনেক পরেই ওয়ারলেসের সংকেত শোনা গেল।

মিঃ আপ্তেজি কথা বললেন, থ্রি থ্রি টু জিরো, ওভার।

—ওভার, থ্রি থ্রি টু জিরো। গঞ্জালেশ স্পিকিং। গঞ্জালেস স্পিকিং ওভার। ওপারের কথা।

—থ্রি থ্রি টু জিরো। খবর কি? ওভার?

—পোজিশন রাইট। স্পিড ফোর। ওভার?

—ওভার। ধন্যবাদ!

সত্যিই নৌযুদ্ধের মত ব্যাপার। ব্রিজলাল বললেন, আমাদের পাইলট গঞ্জালেস ছোট্ট মোটর-বোট নিয়ে মাছের ঝাঁকের পাশ বরাবর ঝাঁকটির গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখে এগিয়ে আসছে। ও জানাল, ওরা আগের মতই একই দিকে এগোচ্ছে। তার গতিবেগ কমিয়েছে। ঘণ্টায় প্রায় চার মাইল। আমাদের থেকে ঝাঁকটি আর মাত্র আট মাইল দূরে আছে।

শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। ব্রিজলাল এখন পুরো ব্যবস্থাটির দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। তাঁকে সেনাপতির মতই মনে হচ্ছিল। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। প্রত্যেকের সঙ্গেই একটি করে ট্রানজিস্টর বেতার যন্ত্র ছিল। জাহাজের এক জায়গা থেকে আর এক-জায়গায় কথা বলার সময় ঐ যন্ত্রটির সাহায্য তাঁরা নিচ্ছিলেন।

—মিঃ বাসু, রবিনবাবু, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। আমরা ওয়াচ্ টাওয়ার থেকে দেখব।

ব্রিজলাল আর সমস্ত লোকদের বিভিন্ন দায়িত্বের কথা বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের নিয়ে পাইলট কেবিনের ছাদের উপরের ওয়াচ্ টাওয়ারে এলেন। এটি একটি ছোট্ট ঘর। তিন পাশে বড় বড় ফ্লাশ লাইন বসানো। প্রত্যেকটিই কার্ব আর্ক ল্যাম্প। টাওয়ার রুমে এসেই ভাল করে সব কিছু বলে দিলেন এবং শেষ বারের মত মাল্লাদের জাল সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন।

pathagar.net

বলতে ভুলে গেছি, আমাদের পাশে পাশে আরও জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা কাটল উদ্বেলিত দুর্ভাবনায়, অনিশ্চিত এক আশঙ্কায়।

আবার ওয়ারলেসের সিগন্যাল।

—থ্রি থ্রি টু জিরো। থ্রি থ্রি টু জিরো। বি স্পিকিং। কথা বললেন ব্রিজলাল।

—স্পিড এইট। ওভার।

—ওভার।

রেডিওর ডায়েলের লাল আলো জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্রিজলাল কি সব সাংকেতিক বার্তা পাঠালেন। আমাদের বললেন, ঝাঁকটা এবার জোর এগিয়ে আসছে। ঘণ্টায় আট মাইল বেগে।

ব্রিজলালের নির্দেশে টেকনিসিয়ানরা জাল খুলতে শুরু করল। দেখলাম পাশের জাহাজের সঙ্গে জালের এক প্রান্ত জোড়া। ঐ জাহাজটি এবার আমাদের জাহাজ থেকে ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে বিরাট জাল ছড়িয়ে পড়তে লাগল জলের উপর। এমনি করে জাল ফেলা চলতে লাগল প্রায় এক ঘণ্টা ধরে। দ্বিতীয় জাহাজটি ততক্ষণে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে সরে গেছে।

হাতঘড়ি দেখলেন ব্রিজলাল। তারপর একই সঙ্গে সামনের দুটি ফ্লাশ লাইট জ্বেলে

দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে যা দেখলাম, না দেখলে তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। সাগরের ঢেউ-এর সঙ্গে ভেসে আসছে হাজার লক্ষ রুপোলি মাছ। ঢেউ-এর তালে তালে তারা নাচছে। ঢেউগুলি যখনই উঁচু হয়ে উঠছিল, ফ্লাস লাইটের তীব্র আলোয় মনে হতে লাগল যেন বড় বড় রুপোর চাঁই গড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

ব্রিজলাল বললেন, মিঃ বাসু, ওরা প্রায় এসে গেছে। আর মাত্র তিনশ' গজ দূরে হবে। দেখা যাক কি হয়।

রবিন এবং আমি দু'জনেই অভিভূত। মৃদু হেসে উদ্বেলিত মনে একবার চাইলাম ব্রিজলালের দিকে। তারপর আবার সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম।

ব্রিজলাল দুই জাহাজেরই পাইলটদের নির্দেশ দিলেন মাছের ঝাঁকটিকে ঘিরে ফেলতে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ দুটি ঝাঁকের দু'পাশে জালটিকে অর্ধবলয়ের মতো করে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। ততক্ষণে দ্বিতীয় জাহাজ থেকেও দুটি ফ্লাশ লাইট জ্বালিয়ে ফেলা হয়েছে ঝাঁকটির ওপর। রুদ্ধশ্বাস আমাদের।

মাত্র মিনিট দশেকের মধ্যেই ঝাঁকটি প্রায় একশ' গজের মধ্যে এসে পড়ল। আর সেই সঙ্গেই—। হ্যাঁ। ব্রিজলাল যা আশঙ্কা করেছিলেন, মুহূর্তের মধ্যে তা ঘটে গেল। হঠাৎ দাপাদাপির শব্দ। তারপরই রীতিমত ভৌতিক কাণ্ড যাকে বলে। সেই শান্ত ঝাঁকে নেমে এল যেন অশান্তের ঝড়। হুড়মুড় করে সমস্ত মাছ পেছনে লাফ দিতে শুরু করল। উঃ, কী বিরাট এক-একটা মাছ! উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম তারা লাফিয়ে একটি একটি শূন্যে উঠে আসছে। তারপরই ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে। যেন ভূত দেখে ভয় পেয়ে কে কোথায় কত শীগ্‌গির পালাতে পারে তারই চেষ্টা। এমন কি, মাত্র মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সব খতম। একটি মাছকেও আর আশেপাশে খুঁজে পাওয়া গেল না।

আমরা স্তম্ভিত। সমস্ত চিন্তা তালগোল পাকানোর মতো অবস্থা। সমুদ্রের মাঝে মাছের ঝাঁক এর আগেও আমি দেখেছি। হয়ত এত বড় নয়, তবু লক্ষ্য করেছি ঝাঁক যখন দেখা যায় শান্তশিষ্টের মতোই তারা ভাসে। অনেক সময় জাহাজ বা মোটর-বোটের আশেপাশে এমনভাবে তারা ঘোরা-ফেরা করে যে, ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে তাদের দু'চারটে ধরে নেওয়া শক্ত হয় না। অথচ এখানে কি এমন ঘটল যাতে করে মুঠোর মধ্যে এসেও ওরা অমনভাবে পালিয়ে গেল? সত্যি কথা বলতে কি, ব্রিজলালের দিকে যেন চাওয়া যায় না। বেচারা উদ্যোগী মানুষ। কিন্তু এমন পরাজয় তিনি কোনোদিনই কল্পনা করতে পারেননি।

রবিন বলল, বুঝলে কিছু?

—কিছুই না। আপাততঃ গোলক-ধাঁধা দেখছি। বললাম আমি।

—কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে, ভাই।

—দেখা যাক, আগে ভোর হোক। সমুদ্র-বিজ্ঞানী হিসেবে যতটা সম্ভব চেষ্টা করব।

ব্রিজলাল লাফিয়ে উঠে করুণভাবে আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, চেষ্টা নয় মিঃ বাসু, এর একটা বিহিত আপনাকে করতেই হবে। বাপের জন্মে এমন ভুতুড়ে কাণ্ড কখনও আমি দেখিনি।

ঠিক এই সময়ে গভীর সমুদ্রের বুকে বেশ কিছুটা দূরে একটা লাল রঙের আলো

চোখে পড়ল। ওয়াচ্ টাওয়ারের উপর দাঁড়িয়ে যখন কথাবার্তা বলছিলাম তখন রবিন এবং ব্রিজলাল বেশ খানিকটা বিমর্ষ হয়েছিলেন বলে ব্যাপারটা ওঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। আমিও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো চেষ্টা করলাম না। সমুদ্রের উপর সম্ভবতঃ কোনো নৌকা বা বয়া থেকে ঐ আলো আসছে। হয়ত কোনো মোটর-বোটও হতে পারে। এটাও লক্ষ্য করলাম, কিছুক্ষণ পরে লাল আলোটা সবুজ হয়ে গেল।

আলোর এমন রং পাল্টানো দেখেই মনের ভেতর কেন জানি না, একটা খটকা লাগল। এবারও ভাবলাম নিশ্চয় সমুদ্রের উপর দিয়ে কোনো মোটর-বোট যাচ্ছে। তারই সিগন্যাল ওটা। কিন্তু তখন ঘুণাক্ষরেও কি বুঝতে পেরেছিলাম, মাছের সেই আজগুবী কাণ্ডকারখানার সমস্ত কিছুই ঐ আলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে?

ঐ আলোই যে যত সব বিপত্তির কারণ পরদিনই সেটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল এবং আমাদের এই অভিযানের পুরো সাফল্য আমরা পেয়ে গেলাম তৃতীয় দিনে। হ্যাঁ, তবে তার আগে দুর্ভাবনা এবং তালগোলের গোলক-ধাঁধার জট খুলতে কী দারুণভাবে যে আমরা হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলাম তা বলে ওঠা সম্ভব নয়।

সেই রাত্রেই ব্রিজলাল, রবিন, মেরিন ইঞ্জিনীয়ার মিঃ কাকাসাহেব এবং আমি একটি গোপন বৈঠকে বসলাম। মাছের ঝাঁকের এই বিচিত্র ব্যবহারের ব্যাপারে যত রকমের তথ্য খাড়া করা যেতে পারে সবই একে একে আমরা পর্যালোচনা করতে লাগলাম।

বললাম, অনেক সময় বাতাসের গতিও মাছের ঝাঁককে খানিকটা উত্তেজিত করতে পারে। হয়ত ঝাঁকটি যখন জাহাজের কাছে এসে হাজির হয়, ঠিক সেই সময় সামনে থেকে একটা দমকা বাতাস ঐ ঝাঁকের বড় বড় মাছের পিঠের কাঁটার উপর লেগে মাছগুলিকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে। একথা তো আপনারা সকলেই জানেন বড় বড় মাছ অনেক সময় জলের উপর ভেসে চলে, তাই ওদের পিঠের কাঁটাও জলের উপরে থাকতে পারে। তবে এক্ষেত্রে এমনটি হওয়া অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এ ধরনের ব্যাপার চীন বা জাপান উপসাগরে সম্ভব, যেখানে মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ো হাওয়া বয়ে থাকে। আবার এমনও হতে পারে যে, স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে মাছের ঝাঁক এগিয়ে আসছিল, জাহাজের কাছে এসে স্রোতটি অন্য দিক থেকে আসা অপর একটি স্রোতের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ফলে, ঐ স্রোতের গতিপথ পালটে যায়। যেখানে দুটি স্রোত মিলিত হয়, সেখানে খানিকটা ঘূর্ণিও সৃষ্টি হতে পারে। ফলে, মাছগুলি হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে অমন দাপাদাপি করে এবং পরে ঘুরে যাওয়া স্রোত ধরে ওরা ফিরে যায়। এছাড়া এটাও হওয়া অস্বাভাবিক নয়, মাছের ঝাঁকের নীচে খুব বড় আকারের কোনো হাঙর বা ঐ জাতীয় হিংস্র মাছ সাঁতার কেটে আসছিল। জাহাজের কাছে এসে সম্ভবতঃ ওরা হঠাৎ গভীর জল থেকে উপরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করে। হয়ত তাড়াও করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে মাছের ঝাঁক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এক নাগাড়ে অনেক তথ্যই বলে গেলাম। প্রত্যেকটি কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সকলে।

অবশেষে আমি বললাম, আজকের মতো জাহাজ এখানেই থাকুক। আমরা কাল জলে নেমে কিছু পরীক্ষা করব।

তাই করা হল। পরদিন একটি মোটর-বোটে চড়ে ব্রিজলাল, রবিন, মিঃ কাকাসাহেব এবং আমি শুরু করলাম গবেষণার কাজ। সারাদিন চলল আরব সাগরের বুকে মাইলের পর মাইল বিচরণ। হিমসিম খাবার মতো অবস্থা। কিন্তু বাতাস বা ভিন্নমুখী কোনো স্রোতের সন্ধানই পাওয়া গেল না। ব্রিজলালকে বললাম, এবার দেখতে হবে হিংস্র কোনো মাছ এমন কোনো কাণ্ড ঘটাচ্ছে কি না।

ব্রিজলাল বলল, কাল রাতের দিকে সেটা করা যেতে পারে মিঃ বাসু। কারণ, নতুন ঝাঁকের সন্ধান এত তাড়াতাড়ি পাওয়া সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে আগামী সাত দিন কোনো ঝাঁকই চোখে পড়বে না। আপনার কথামত আমি আমার পাইলটদের নতুন ঝাঁকের সন্ধান করতে বলছি। খবর পেলেই কাজ শুরু করা যাবে।

পরদিন সকালে ব্রিজলাল, রবিন এবং কাকাসাহেবকে নিয়ে হাওয়ার গতি এবং স্রোতের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু করলাম। এর জন্যে মাইলের পর মাইল চক্রাকারে ঘুরে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় দেখে নিতে হল। কিন্তু তেমন কোনো ঘটনা চোখে পড়ল না, যাতে করে বলা যায় কেন ঐ মাছের ঝাঁক পালিয়ে গিয়েছিল। অতএব হাতে মাত্র একটি কারণের ব্যাপারই অনুসন্ধানের জন্যে রইল। কোনো শিকারী মাছ ঝাঁকের মধ্যে উৎপাত করছে কি না আপাততঃ দেখে নেওয়া দরকার।

ব্রিজলালের কথাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। সেদিন সূর্যাস্তের মধ্যেও নতুন কোনো মাছের ঝাঁক খুঁজে পাওয়া গেল না। পরদিনও না। খানিকটা চিন্তিতই হলাম আমরা। সৌভাগ্য, তৃতীয় দিনে বেতার-বার্তা এল অনুসন্ধানকারী দলের কাছ থেকে। হ্যাঁ, দেখা গেছে একটি ঝাঁক। যেখানে মূল জাহাজটি দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি ঝাঁক পশ্চিম দিক বরাবর ভেসে চলেছে।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজলাল তাঁর সমস্ত দলবলকে যথাযথ উপদেশ দিলেন। দ্বিতীয় জাহাজটি এসে ভিড়ল আমাদের পাশে। তারপর দ্রুত আমরা মাছের ঝাঁকের দিকে অগ্রসর হলাম। এবারও ঠিক হল, আমরা সরাসরি পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাব। তারপর মাছের ঝাঁক বরাবর সম্মুখ থেকে এসে জাল ফেলব।

তবে এবার একটা নতুন মতলব মাথায় এল। ব্রিজলালকে বললাম, মিঃ সুখারিয়া, আপনারা যখন সম্মুখ থেকে ঝাঁকের দিকে এগিয়ে আসবেন তার আগে কাকাসাহেবকে নিয়ে আমি একটি মোটর-বোটে গঞ্জালেসের কাছে গিয়ে হাজির হবো। আমার ইচ্ছে, মাছের ঝাঁকের পাশে পাশে আমরা এগিয়ে আসব এবং বিশেষ ধরনের শব্দ-তরঙ্গ নিক্ষেপ করে ওদের মতিগতি দেখে নেবো। একমাত্র আমার সংকেত পেলেই আপনারা জাল ফেলবেন এবং যা যা করণীয় করবেন।

রবিন বলল, তুমি কি ব্যাপার-স্যাপার কিছু ধরতে পেরেছ?

—না, এখনও পারিনি। আপাততঃ শুধু পরীক্ষা করে দেখতে চাই সত্যিই কোনো শিকারী মাছ ওদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে কি না। এমনও হতে পারে, ঝাঁক কাছে আসার পর জাহাজের তীব্র আলো চোখে পড়ায় শিকারী মাছগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারপর ভয় পেয়ে পিছু হঠতে থাকে। ওদের ছটফটানিতে ভয় পেয়ে আর সমস্ত মাছও সেই সঙ্গে পালিয়ে যায়।—বললাম আমি।

—এটা হওয়া অসম্ভব নয়। কিছু কিছু মাছ উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে পারে না, সেটা আমি জানি। আবার অনেক মাছ আছে যারা আলোর সামনে ভিড় করে। আপনি তো জানেন মিঃ বাসু, জাপানে মাছ-ধরুয়ারা রঙিন আলো জ্বেলে অনেক সময় কাচের দিকে কোনো কোনো মাছকে প্রলুব্ধ করে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে।—ব্রিজলাল কথা বললেন।

—আমি জানি মিঃ সুখারিয়া। আমার উত্তর।

আমাদের ভাগ্য ভালো। ঐ দিন সন্ধ্যের মধ্যেই আমাদের জাহাজ ঠিক পোজিশন নিয়ে নতুন মাছের ঝাঁকটির দিকে এগুতে লাগল।

রাত তখন ন'টা হবে। আরব সাগরের বুকে নেমে এসেছে অমাবস্যার অন্ধকার। তবে আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল। পাশাপাশি জাহাজ দুটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। মিঃ গঞ্জালেস এরই মধ্যে নতুন মাছের ঝাঁকটি সম্পর্কে সমস্ত খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওরা আসছে। ধীরে ধীরে শান্ত ভঙ্গীতে এগিয়ে আসছে পশ্চিম দিকে। না, কোনো চাঞ্চল্য তাদের মধ্যে এখনও দেখেননি গঞ্জালেস। গতিবেগ ঘণ্টায় তিন মাইলের মতো।

ব্রিজলাল বললেন, ঝাঁকটি প্রায় মাইল দশেক দূরে আছে। মিঃ বাসু, আপনি কি এখনই কাজ শুরু করবেন?

—আমার মনে হচ্ছে, এটাই সময়। আপনি জাহাজ নিয়ে খুব আস্তে আস্তে এগোন। হ্যাঁ, জাল ফেলার কাজও শুরু করতে পারেন। আমি এক্ষুণি কাকাসাহেবকে নিয়ে দরিয়ায় নেমে পড়তে চাই। —বললাম আমি।

বিশেষ একটি মোটর-বোট প্রস্তুতই ছিল। আগে থেকে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম তাতে আমরা প্রস্তুত করেই রেখেছিলাম। কাকাসাহেব এবং আমি বোটে গিয়ে উঠলাম। জাহাজের মেট ধীরে ধীরে দড়ির সাহায্যে বোটটিকে সমুদ্রের জলে নামিয়ে দিল। ওপর থেকে ব্রিজলাল এবং রবিন বলল, গুড লাক।

আমরা অপেক্ষা না করে দ্রুত গঞ্জালেসের বোটের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম।

কাকাসাহেব গঞ্জালেসের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি মৃদু হেসে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলাম—কি রকম বুঝলেন, মিঃ গঞ্জালেস?

—আপাততঃ সব তো ঠিকই দেখছি। এখন তো কিছু বোঝা যাবে না। —বললেন গঞ্জালেস।

দুটি মোটর-বোট সন্তর্পণে ঠিক মাছের ঝাঁকটির পাশ বরাবর এগোতে লাগল। একটা মৃদু আলো ফেললেন গঞ্জালেস জলের উপর।

অদ্ভুত! অপূর্ব! রাতের অন্ধকারে হাজার লক্ষ মাছ, বিচিত্র তাদের চেহারা! ছোট, বড়, রুপালি বা রঙিন। প্রকৃতির বুকে ওরা নিশ্চিন্ত। স্বচ্ছন্দ ওদের গতি। ওরা দল বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে লেজ গুটিয়ে খেলা করছে দুই-একটি বড় মাছের আশেপাশে খুদে খুদে মাছ। ওরা সম্ভবতঃ বাচ্চা। মায়ের সঙ্গে খেলতে খেলতে চলেছে। কোনো কোনো মাছ এর ওর গায়ের ওপর পড়ে দুষ্টুমি করছে। অপূর্ব! নিজের চোখে না দেখলে যেন বিশ্বাস করা যায় না।

হাতের শব্দগ্রাহী যন্ত্রটির থালার মতো মুখটা মেলে ধরলাম জলের উপর।

কাকাসাহেবকে বললাম, আপনি আলট্রাসোনিক-এর যন্ত্রটা চালিয়ে দিন। আসল ব্যাপার হল জলের মধ্যে দিয়ে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের ঐ শব্দ আমরা জলের মধ্যে পাঠাব। তারা মাছের গায়ে গিয়ে পড়বে। তারপর প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসে যখন ঠিকরে পড়বে গ্রাহক থালার উপর, বৈদ্যুতিক যন্ত্র সেই শব্দ ধরে মাছগুলির আকার বা আয়তন সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে দেবে। তবে এমন ধরনের শব্দ নিক্ষেপ করতে হবে যাতে মাছগুলিও না বিরক্ত হয়।

তাই করা হল। কিন্তু হাঙ্গর বা ঐ ধরনের কোনো শিকারী মাছেরই সন্ধান পাওয়া গেল না।

প্রায় হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলাম এদিক-সেদিক। ইতিমধ্যে ব্রিজলাল ঠিক আগেরই মতো অর্ধবৃত্তাকারভাবে দুই জাহাজের সাহায্যে জাল ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন। ওঁদের দূরত্ব আর মাত্র আধ মাইল। অথচ কিছুই বুঝতে পারলাম না। বিচলিত, ত্রস্ত আমরা। আজও কি আমরা পরাজিত হবো? এত কষ্ট কি নিষ্ফল হয়ে যাবে?

হঠাৎ!

হ্যাঁ, আকস্মিকই বলতে হবে। মাছের ঝাঁকের প্রায় মাইল খানেক দূরে সমুদ্রের বুকে ফুটে উঠল ছোট্ট একফালি সবুজ আলো। আলোটি যেন জলের উপর ভাসছে। কিন্তু কৈ, এতক্ষণ তো আশেপাশে কোনো আলো ছিল না! যদি কোনো মোটর-বোট বা ছোটখাটো জাহাজও ভেসে আসতে থাকে তাহলে অনেক আগে থেকেই তো তাকে দেখা যেত।

তাই বলছি, এটাকে আমরা আকস্মিক ঘটনাই বলব। এত ছোট কোনো আলো এর আগে কারো চোখেই পড়েনি। আলোটিকে দেখিয়ে গঞ্জালেসকে বললাম, কি ব্যাপার, আপনাদের আরও কোনো বোট কি ঐদিক দিয়ে ঝাঁকের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে?

গঞ্জালেস এবং কাকাসাহেব উভয়েই চমকে উঠলেন আমার কথায়।—কি বলছেন স্যার!

—ঐ সবুজ আলোটা একবার দেখুন তো।

—না, এমন আলো তো এর আগে আমার চোখে পড়েনি। একমাত্র আমি মাছের উপর নজর রেখেই চলেছি। আর কারুর তো দেখা পাওয়ার কথা নয়। গঞ্জালেস বিস্মিত।

—এর আগের দিনও কিন্তু ঐ রকম একটি আলো আমি দেখেছিলাম।—আমার কণ্ঠে কৌতূহল।

—কি বলছেন স্যার!

—অন্য কারুর বোট নয় তো?

—অসম্ভব! তাহলে ব্রিজলাল সাহেব আমাদের সিগন্যাল দিতেন। বললেন কাকাসাহেব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজলালকে বেতারে আলোটির উপর নজর দিতে বললাম। বললাম, দেখুন ওটা কোনো বোটের আলো কি না। যদি বোটই হয়। তাহলে ওরা কারা

জিজ্ঞেস করুন। আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।

ব্রিজলাল মিনিট দুয়েক পরই জানালেন, ওরা কোনো সাড়া দিচ্ছে না। কে জানে হয়তো কোনো প্রমোদভ্রমণকারীও হতে পারে। সঙ্গে বেতারযন্ত্র নেই। ব্রিজলাল যেন ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বের সঙ্গে দেখলেন না ; বরং বললেন, আমরা প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি মিঃ বাসু। দূরত্ব আর মাত্র ষাট গজ। আপনি কি মনে করেন—

ঠিক এই সময়েই রহস্যের ইঙ্গিতটি আমি পেয়ে গেলাম।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম দূরের সেই সবুজ আলোটি নিভে গেল, পরিবর্তে একটি লাল আলো জ্বলে উঠেছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শব্দ-তরঙ্গ গ্রাহক সেই থালার উপর ঠিকরে এসে পড়ল অদ্ভুত ধরনের অত্যন্ত শক্তিশালী আলট্রাসোনিক।

—কি ব্যাপার?—চমকে উঠলো গঞ্জালেস এবং কাকাসাহেব।

—মানে? এ আবার কি ভৌতিক ব্যাপার? সমুদ্রের বুকে এমন কোনো শব্দ-তরঙ্গ আমরা তো নিক্ষেপ করিনি? দাঁড়ান। মিঃ কাকাসাহেব, আপনি থালাটি ভালো করে ধরুন। বলেই মুহূর্তে থালাটি তাঁর হাতে দিয়ে যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে এর আগে আমরা শব্দ-তরঙ্গ মেপে নিচ্ছিলাম তার সাহায্যে ঐ শব্দের স্বরূপটি বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম। দেখলাম ব্রিজলাল যে জাহাজটিতে রয়েছেন সেদিক থেকেই ঐ শব্দ ভেসে আসছে। এবং এসে পড়ছে মাছের ঝাঁকের সামনের সারিতে।

গঞ্জালেসকে বললাম, আপনি ঝাঁকটির উপর আলো ফেলুন তো মশায়।

হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। সত্যিই মাছের ঝাঁকে কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য। ওরা যেন ভয় পেয়েছে, এই রকম ভাব।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজলালকে বললাম, দাঁড়ান। জাহাজ নিয়ে আর এক গজও এগোবেন না। পেয়ে গেছি। সম্ভবতঃ এর পেছনে একটা বদমায়েশের দল কাজ করে চলেছে। মাছের ঝাঁক এখনও পর্যন্ত এগোচ্ছে। তবে ওরা সন্ত্রস্ত। পারলে একটু একটু করে আপনারা পিছিয়ে যান, কুইক্! আপনি সমুদ্রের বুকের আলোর উপর নজর রাখুন।

কাকাসাহেবকে নিয়ে শব্দ-গ্রাহক থালাটির ঐ ভৌতিক শব্দ লক্ষ্য করে জাহাজের দিকে এগিয়ে গেলাম।

পাওয়া গেল। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে যে এত বড় ভৌতিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সেকথা কি কিছু আগেও ভাবতে পেরেছিলাম?

শব্দ লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত আমরা গিয়ে হাজির হলাম জাহাজের সামনের ডগার দিকে—উঃ! প্রচণ্ড শব্দ! আলট্রাসোনিক! তাই আমাদের কান তাকে শুনতে পায় না। কিন্তু যন্ত্রে তার উপস্থিতি ধরা পড়ল। জাহাজের সামনের দিকটা জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে সেখান থেকেই সেই শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে মাছের ঝাঁকের দিকে। বেশী না, তীব্র আলো ফেলতেই দেখলাম, সত্যিই জাহাজের ডগায় জলের ফুট তিনেক নীচে কি যেন একটি বস্তু লাগানো রয়েছে। মুহূর্তে একজন মাল্লা ডুব দিয়ে বেশ খানিকটা কসরত্ করে সেটি তুলে আনল। দেখলাম ছোট্ট একটি চৌকো বাক্স। তার সম্মুখের দিকটা মাইকের মতো। সেটা হাল্কা এক ধরনের পাত দিয়ে জাহাজের গায়ে জোড়া ছিল।

বাক্সটা নিয়ে আমরা জাহাজে উঠে এসে তার ডালা খুলে নিতেই—

তাই ব—লু—ন।—আমার কণ্ঠে বিস্ময়।

আর সকলে হাঁ হয়ে গেছেন।

কিছুক্ষণ কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

আলট্রাসোনিক প্রোজেকটার। অত্যন্ত শক্তিশালী এই যন্ত্র বেতারের সাহায্যে চালু করে বিশেষ ধরনের অতিকম্পনশীল শব্দ নিক্ষেপ করা হচ্ছিল ঐ মাছের ঝাঁকে। ঝাঁকটি যখনই কাছে আসে শব্দের প্রচণ্ড কম্পন তাদের চঞ্চল করে তোলে। ওরা ভয় পায়। তারপর দাপাদাপি করে পালিয়ে যায়। বুঝলেন মশায়? উত্তেজনায় আমি তখন কাঁপছি।

—কিন্তু বেতারের সাহায্যে কারা যন্ত্রটি চালু করছে?—ব্রিজলালের যেন কণ্ঠরোধ হওয়ার মতো অবস্থা।

—তাই তো! মুহূর্তে সমস্ত কিছু আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তবু নিজেকে শক্ত রেখে বললাম, খুব হুঁশিয়ার! উত্তেজিত হবেন না আপনারা। চোর আমাদের কাছেই আছে এবং এক্ষুণি আমরা ধরে ফেলব। দোহাই আপনাদের, বেশি হৈ-চৈ করবেন না।

বলেই জাহাজের চীফ পাইলটকে বললাম, আপনি জাহাজটি ধীরে ধীরে পেছনের দিকে সরিয়ে নিয়ে যান, যেন মাছের ঝাঁকের উপর এসে না পড়ে।

তারপর ব্রিজলাল, রবিন, কাকাসাহেবকে নিয়ে নিচে অপেক্ষমাণ মোটর-লঞ্চে এসে তার পাইলটকে বললাম, ঐ যে দূরে লাল বাতিটি দেখছেন, তাড়াতাড়ি ঐ দিকে চলুন।

আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কালো জল ভেঙে পাখার মতো যেন উড়ে চলতে লাগল বোটটি। তখনও দেখলাম সেই বোটটি স্থির হয়ে যেন মাছের ঝাঁক থেকে মাইল খানেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু না। শেষ পর্যন্ত আমাদের মতলব খাটল না। লাল আলো নিভে গেল যেন হঠাৎ। তারপর তীব্র একটা সার্চলাইট। আমরাও সার্চলাইট জ্বাললাম। পরিষ্কার দেখলাম ছোট্ট সাদা একটি বোট ছুটে পূর্ব দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। ব্রিজলাল ব্যাপার দেখে যেন ক্ষেপে উঠলেন। সারেং-এর হাত থেকে স্টিয়ারিং কেড়ে নিয়ে পুরোদমে তিনি আমাদের বোটটি চালিয়ে দিলেন অজ্ঞাত ঐ বোটের দিকে। প্রচণ্ড গতিতে চলেছি আমরা। ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ মাইল। আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সামনের বোটটিও সমানে এগিয়ে চলেছে।

তবে বেশি দূর যেতে হল না। মাইল পাঁচেক এগোতেই আমাদের সার্চলাইটে শান্ত সমুদ্রের বুকে পরিষ্কার ফুটে উঠল আস্ত একটি জাহাজ। যেন ভূতের মতো সেটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সমস্ত আলো নেভানো থাকায় দূর থেকে দেখা সম্ভব হয়নি। আগের বোটটি মুহূর্তে ওর পাশে গিয়ে ভিড়ল। দেখতে দেখতে সেটিকে তুলে নেওয়া হল তার ডেকে। ততক্ষণে আমরাও কাছাকাছি এসে গেছি। আমাদের সার্চলাইট গিয়ে পড়ল জাহাজটির গায়ে।

—নাউ আই আনডারস্ট্যাণ্ড! ত্রিভন্দ্রম! গম্ভীর অথচ অস্ফুট কণ্ঠে কথা বললেন ব্রিজলাল।

—ত্রিভন্দ্রম? হ্যাঁ। জাহাজটির নাম তো ত্রিভন্দ্রম দেখছি। বলল রবিন।

—মিঃ মেটার শয়তানি, এবার বুঝলাম।—কথা ক'টি বলেই উত্তেজিত ব্রিজলাল বসে পড়লেন।

—মিঃ মেটা? জাম্বিয়ার কনট্রাক্টটা হারিয়ে তাহলে এইভাবে সে আপনাকে জব্দ করতে চেয়েছিল?

—তাই তো দেখছি। উঃ—কী দারুণ ষড়যন্ত্র! তাহলে দিন পনেরো আগে আমার জাহাজটি যখন ডকে মেরামত হচ্ছিল শয়তানটা তখনই কাউকে পয়সা খাইয়ে ঐ যন্ত্রটিকে জাহাজের গায়ে আটকে দিয়েছিল, বুঝতে পারছি। ধন্যবাদ! ধন্যবাদ আপনাকে বোস সাহেব! এমন শয়তানি আমার মাথায় কখনও আসেনি। আপনাকে কি ভাবে যে—

আমি বললাম, আপনি শান্ত হন, মিঃ সুখারিয়া। বিপদ কেটে গেছে। জানলেন সবই। তবে আইন অনুযায়ী তো ওর কিছুই করতে পারবেন না। ভবিষ্যতে সাবধানে চলবেন। আসলে ঐ বোটেই ছিল ঐ শব্দ-যন্ত্র চালু করার বেচার-যন্ত্র। এতদিন এইভাবেই ওরা কাজ করেছে। মেটা নজর রাখত আপনার জাহাজের গতিবিধির উপর। মাছ ধরার সময় হলে বোটে করে ওর সাকরেদরা সব পণ্ড করে দিয়ে জাহাজে চম্পট দিত।

—এখন সবই বুঝতে পারছি। ব্রিজলালের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

সুখের কথা, যথাসময়ে এরপরই আমরা জাহাজে ফিরে গেলাম এবং বলা বাহুল্য, এবারকার শিকার আমাদের হাতছাড়া হল না। মাছের ঝাঁকটিকে বাঁচিয়ে ব্রিজলালের জাহাজ অবস্থান করছিল এবং আমরা গিয়েই তাদের ফাঁদে ফেললাম। প্রথম ক্ষেপেই কয়েক হাজার মণ মাছ সংগ্রহ করতে পেরে ব্রিজলাল যে অনেকটা ভরসা পেয়েছেন, তাঁর চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারলাম।

pathagar.net

বিগ্রহ প্রহেলিকা

অদ্রীশ বর্ধন

ডক্টর করঞ্জাক্ষ কাঞ্জিলাল তাঁর দানবিক ছাতি চিতিয়ে বললেন, আমি বাজে কথা বলার মানুষ নই। দু'হাজার আটাশ সালের ছাব্বিশে অক্টোবর এই পৃথিবী সাংঘাতিকভাবে জখম হবেই—খুনে গ্রহাণু আসছে তেড়ে।

সুসংবাদটা যেদিন ঘোষণা করলেন ডক্টর করঞ্জাক্ষ কাঞ্জিলাল, সেদিনটা ছিল দুটো কারণে গুরুত্বপূর্ণ। দু'দুটো জন্মদিন একই দিনে পড়ে গেছে। ডক্টর কাঞ্জিলাল বাহাত্তর বছরে পা দিলেন, জন্ম নিল ১৯৯৮ সালটাও।

সেই সুবাদে অনেককেই নেমন্তন্ন করেছেন তাঁর দার্জিলিঙের অট্টালিকায়। ছেলে আর ছেলের বউ, মেয়ে আর মেয়ের বরকে আনিয়েছেন আমেরিকা থেকে—নিজের খরচে। যমজ ছেলেমেয়ে, জন্ম মাত্র তিরিশ মিনিটের ব্যবধানে—আগে ছেলে, তারপর মেয়ে। দুজনকেই দেখতে এক রকম। তাদের বিয়েও দেওয়া হয়েছে যমজ ভাইবোনের সঙ্গে একই দিনে। সেই দিনটাও আজকের দিন। তিনি নিজেও বিয়ে করেছিলেন এই একই দিনে—মানে, পয়লা জানুয়ারি। কাজেই, ইংরেজি নতুন বছরের জন্মদিন মানেই তাঁর কাছে

উৎসবের দিন।

ডক্টর কাঞ্জিলালের খুব কাছের বন্ধু ত্রিলোচন সমাদ্দার বলে উঠলেন, এ যেন দেখছি ত্র্যহস্পর্শ যোগ। আজকের দিনে কি সুসমাচারই দিলে, করঞ্জাক্ষ।

করঞ্জাক্ষ বললেন, দোব না কেন? আমি তো দু'হাজার আটাশ সাল পর্যন্ত বেঁচে থাকব না। থাকবে এই অপোগণ্ড দুটো—ছেলে আর মেয়েকে দেখিয়ে, ভাগ্যিস ছেলের নাম বিগ্রহ আর মেয়ের নাম গ্রহাণু রেখেছিলেন। ওরাই দেখবে গ্রহাণু নামক বিগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর কলিশনের লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।

ত্রিলোচন বললেন করঞ্জাক্ষের পঁয়ষট্টি বছরের স্ত্রী ত্রিনয়না কাঞ্জিলালকে, বউদি, ছেলেমেয়ের নামটি দিয়েছিলেন খাসা। বিগ্রহ আর গ্রহাণু। এইমাত্র যে সন্দেশটি পরিবেশন করে গেল আপনার স্বামীদেবতা, সেটাও কি আপনার ত্রিনয়ন দিয়ে দেখা?

চওড়া বুক চিতিয়ে গুরু গুরু নিনাদে বললেন করঞ্জাক্ষ, ফুল ক্রেডিট আমার, আমার ভার্যার নয়। আমার কমপিউটেশন হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট। ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাসট্রনমিক্যাল সোসাইটি এখনও তো আন্দাজে বুলেটিন ছাড়ছে। আর হ্যাঁ, ত্রিনয়ন যদি থাকে তো আমার আছে। অনেক ভেবেচিন্তেই ছেলের নাম বিগ্রহ আর মেয়ের নাম গ্রহাণু রেখেছিলাম। গ্রহাণুপুঞ্জ নিয়ে গবেষণা করছি তো তখন থেকেই। বিগ্রহ জাদুঘর প্রতিষ্ঠাও করেছিলাম তো ওই বছরেই। মনে পড়ে? খুঁজেপেতে তোমাকেও এনে ওখানকার কিউরেটর বানিয়ে দিয়েছি। দুনিয়া চুঁড়ে কত বিগ্রহ যোগাড় করেছি সে হিসেব তো তুমি জানো। পৃথিবীতে এমন জাদুঘর আর আছে? নেই।

ত্রিলোচন তাঁর পাকাচুলো মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, বিগ্রহ সংগ্রহের ব্যায়রামও তো কারও নেই।

কটমট করে ত্রিলোচনের দিকে তাকিয়ে রইলেন করঞ্জাক্ষ। দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, খুনে-গ্রহাণুটা তোমার মাথায় আছড়ে পড়লে খুব খুশি হতাম। কিন্তু তুমি তো তার আগেই টিকিট কাটবে।

গ্রহ থেকে বিগ্রহ যার নাম দেওয়া হয়েছে, সুদর্শন সেই পুত্র এবার বললে, ওর চাইতেও বড় গ্রহাণু সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে পৃথিবীকে ধাক্কা মেরেছিল, এক ধাক্কাতেই ডাইনোসরদের বংশলোপ করেছিল, অন্য সব প্রাণীদেরও বারো আনা খতম হয়েছিল কিন্তু পৃথিবী পটল তোলেনি। একটু দম নিয়ে, সেই গ্রহাণুটা ছিল দশ থেকে ষোল কিলোমিটার ব্যাসের। দু'হাজার আটাশ সালের গ্রহাণুটার ব্যাস মোটে এক মাইল। মিষ্টি মিষ্টি করে বিদ্বান বাপের সঙ্গে কথার লড়াই চালিয়ে গেল মিষ্টি চেহারার ছেলে বিগ্রহ।

খেপে গেলেন করঞ্জাক্ষ। গরিলার মতন বুক চাপড়ে বললেন, বড্ড কম জানিস। ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাসট্রনমিক্যাল সোসাইটির বুলেটিন পড়ে কপচাচ্ছিস। ওরা তো আন্দাজি হিসেবে বলেছে, ধাক্কা লাগতেও পারে—নাও লাগতে পারে। আমার কমপিউটেশন বলছে, ধাক্কা লাগবেই। কোথায় লাগবে জানিস? খাস কলকাতায় অথবা বঙ্গোপসাগরে। জল উঠে এসে ডুবিয়ে দেবে হিমালয়ের সানুদেশ।

ত্রিনয়না বললেন, আর বোকো না। খাবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মেয়ে গ্রহাণু বললে, দারুণ খোশবাই ছেড়েছে, মা। তবে নটা তো এখনও বাজেনি।

বাবার গালগল্প একটু শুনতে দাও।

গনগনে চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে করঞ্জাক্ষ বললেন, আমেরিকায় থেকে তুই খুব ডেঁপো হয়ে গেছিস। থাক, আমেরিকাতেই থাক। বাবা বিগ্রহ, তুমিও থাকো আমেরিকায়। আমি অক্কা পেলে বুড়ি মা-টাকে নিয়ে গিয়ে কাছে রেখো। কারণ আছে, কারণ আছে, কারণ আছে।

শেষ শব্দ-যুগল তিন-তিনবার এমন নাটকীয় ছন্দে উচ্চারণ করে গেলেন করঞ্জাক্ষ যে, ঘরসুদ্ধু লোক প্যাট প্যাট করে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

একমাত্র তিনিই হিরো-হিরো কায়দায় দাঁড়িয়েছিলেন দেওয়ালের দিকে পিঠ করে, যে দেওয়ালে ঝুলছে মস্ত একটা মোনালিসার ছবি। বাকি সবাই বসে রয়েছে তাঁর সামনে। আজ যে করঞ্জাক্ষ কাঞ্জিলালের বাহাত্তরতম জন্মদিন—হিরো তো হবেনই।

শুধু ত্রিলোচন বললেন, তোমাকে বাহাত্তরে পেয়েছে করঞ্জাক্ষ। এসটেট ফেলে রেখে বউদি আমেরিকায় পগাড়পার হবে কোন দুঃখে? দেখাশুনো করতে হবে না?

এসটেটের কিছু থাকলে তো দেখাশুনো করবে, বেশ হেঁয়ালি-হেঁয়ালি গলায় সপেটা বললেন করঞ্জাক্ষ।

তার মানে? এবার দেখা গেল পুত্র বিগ্রহের মেরুদণ্ড সিধে হয়ে গেছে। চোখ দুটোতেও আর আয়েসী আয়েসী ভাব নেই।

করঞ্জাক্ষ তাঁর আজানুলম্বিত (গেরিলাদের হাতের মতন) দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রেখে বললেন দ্রিমি-দ্রিমি স্বরে, মানে অতি সরল। বিগ্রহ-জাদুঘরের বিগ্রহ যোগাড় করতে কোটি কোটি টাকা উড়িয়েছি। গ্রহ-গ্রহাণু নিয়ে আমেরিকার তাবড় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের খরচে গবেষণা চালাতে গিয়ে কোটি কোটি টাকা ড্রেন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। লক্ষ কোটি টাকার মালিকদের কাছে আমার রয়াল এসটেট বাঁধা পড়ে আছে একটাই শর্তে—আমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পর তারা সব দখল করবে, তার আগে কিসসু বলবে না—।

ও মাই গড! করুণ কান্নার গলায় বললেন ত্রিলোচন।

সরি, মাই ফ্রেণ্ড। করঞ্জাক্ষ তিলমাত্র 'সরি' হয়েছেন বলে মনে হলো না। তোমার আফ্রিকা অভিযানের জন্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সরিয়ে রেখেছিলাম, তাও আর দেওয়া যাবে না। তবে বিগ্রহ-জাদুঘরের সবেতন কিউরেটর থাকতে আমৃত্যু—কেউ তোমাকে ঘাঁটাবে না।

ঘরে ছুঁচ পড়লেও টুং করে আওয়াজ শোনা যাবে, এমনি নৈঃশব্দ।

খুশি হলেন করঞ্জাক্ষ। বিশাল বপুতে একটা হিল্লোল তুললেন। ভোক্যাল কর্ডে যেন দামামা বাজিয়ে বললেন, তবে হ্যাঁ, এক্কেবারে পথে বসিয়ে যাচ্ছি না কাউকেই। সেবার চায়না গিয়ে প্রাচীন রাজবংশের একটা হীরের পেনড্যান্ট পেয়েছিলাম। চোরাই পেনড্যান্ট। সতেরোটা দুর্লভ হলুদ হীরে দিয়ে গড়া পেনড্যান্ট। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না, তাই হীরের পেনড্যান্টের গপ্পো আমার বউকেও শোনাইনি। কিনে এনে এই বাড়িতেই রেখে দিয়েছি। দর যাচাইও করেছি। বর্তমান দাম শুনলে চক্ষু চড়কগাছ হতে পারে। মাত্র তিরিশ কোটি রজতমুদ্রা।

শুনেই দম আটকে এল ঘরসুদ্ধ লোকের। হৃষ্টচিত্তে তা অবলোকন করলেন করঞ্জাক্ষ।

বললেন, আমি পটল তুললে পেনড্যান্ট বেচে কে কত টাকা নেবে, তার ফর্দ করে রেখে দিয়েছি পেনড্যান্টের পাশে। এইবার দেখাচ্ছি পেনড্যান্ট।

বলে, অ্যাবাউট টার্ন করলেন করঞ্জাক্ষ। এখন তিনি মোনালিসার ছবির দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছেন। পেরেক থেকে মোনালিসা না খুলেই বাঁ হাতে টেনে উঠিয়ে ধরলেন। মোনালিসার আড়ালে দেওয়ালে রয়েছে ইস্পাতের সিন্দুক। উনি বিশাল বুক-পিঠ দিয়ে তা আড়াল করে দাঁড়িয়ে, ডান হাতে খুটুর খুটুর করলেন। সিন্দুকের ডালা কব্জার ওপর ঘুরিয়ে খুললেন। ভেতর থেকে একটা বস্তু বের করে ঝাড়বাতির তলায় আঙুলে ঝুলিয়ে রেখে বললেন, চীনের রাজবাড়ি থেকে লুঠ হওয়া ঐতিহাসিক পেনড্যান্ট।

লক্ষ রোশনাই ঠিকরে গেল সতেরোটা হলুদ হীরের গা থেকে। সবাই এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। সবারই চোখে হীরে জ্বলছে। মিন মিন করে বিগ্রহ বললে, ব্যাঙ্ক লকারে রাখলে ভাল হতো।

জবাব না দিয়ে, ঘুরে গিয়ে পেনড্যান্ট সিন্দুকের ভেতর রেখে ডালা বন্ধ করে দিয়ে খুটখাট করলেন করঞ্জাক্ষ। চওড়া বুক-পিঠ দিয়ে আড়াল করে রাখলেন সিন্দুক। মোনালিসাকে যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় বললেন, নম্বরি লক। কম্বিনেশন আমি ছাড়া কেউ জানে না।

খেয়েদেয়ে একতলার ডাইনিং হল থেকে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ করে করে দোতলার চাতালে উঠে ডানদিকের শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন করঞ্জাক্ষ। বাকি সবাই রইল ডাইনিং হলেই—চুপচাপ। গুলতানির মুডও নেই কারুর।

একটু পরেই একই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যে-যার ঘরে চলে গেল একজন ছাড়া সব্বাই। সবশেষে উঠলেন ত্রিনয়না। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলেই তো হলো না, বাড়ির গিন্নির তারপরেও অনেক কাজ থাকে। তিনি আস্তে আস্তে দোতলার চাতালে উঠে ডানদিকের শোবার ঘরে ঢুকলেন। পরমুহূর্তেই ছিটকে বেরিয়ে এসে চিল-চিৎকারে বাড়ি মাথায় করলেন।

তুড়ি মারতে যেটুকু সময় যায়, তার মধ্যেই সবাই বেরিয়ে এল যে-যার ঘর ছেড়ে। বেশ বোঝা গেল, কারো চোখেই ঘুম ছিল না।

ত্রিনয়না তখন আস্তে আস্তে চাতালে লুটিয়ে পড়তে পড়তে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, মরে গেছে।

জ্যা মুক্ত তীরের মতন ঘরের মধ্যে ছিটকে গেল শুধু বিগ্রহ। দেখল, ডক্টর করঞ্জাক্ষ কাঞ্জিলাল বিছানায় নেই—মেঝেতে চিৎ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। একটা রুপোর বাঁটওলা ছোরার পুরো ফলা বুকের বাঁ দিকে ঢুকে রয়েছে, মিশর থেকে এই ছোরা এনেছিলেন করঞ্জাক্ষ, রাখতেন শোবার ঘরের ছোট টেবিলে।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে ডাইনিং হলের নিচু টেবিলে রাখা টেলিফোন রিসিভার তুলে নিয়ে সটাসট বোতাম টিপে গেলেন ত্রিলোচন। বললেন, পুলিশ? এখানে একটা খুন হয়েছে। ডাক্তার নিয়ে চলে আসুন।

পুলিশ ইন্সপেক্টরের সামনে বসেছিল ধুতি-পাঞ্জাবি পরা গায়ে শাল জড়ানো এক সুদর্শন পুরুষ। ইন্সপেক্টর মণিচন্দ্র মোহান্ত তার দিকে তাকিয়ে রেগেমেগে বললে, কী আশ্চর্য! তুমি কি ল্যাজে বেঁধে উৎপাত টেনে আনো?

উৎপাতটা কি ধরনের? প্রশ্ন করল সুদর্শন পুরুষ।

মার্ডার।

তুষারপাত শুরু হয়েছিল সন্ধ্যে থেকেই।

কাঞ্জিলাল অট্টালিকার সদর দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল দুটি মূর্তি। গ্রহাণু আর তার বর চঞ্চলকুমার। গায়ক। আমেরিকার সেটেলড।

তুষারপাতে সাদা করে দিয়েছে বাগান ফটক পর্যন্ত। দুজনে দরজা থেকে একটু এগিয়ে দাঁড়াল বাগানের রাস্তায়।

চঞ্চলকুমার বললে, একি গেরোয় পড়লাম রে, বাবা!

গ্রহাণু সামনের দিকে তাকিয়ে বললে, দেখেছো?

কী?

ফটক থেকে দরজা পর্যন্ত বরফে কারও পায়ের ছাপ নেই।

সে তো দেখাই যাচ্ছে।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি বলে শুধু আমাদের দুজনের পায়ের ছাপ পড়েছে বরফে।

তাতে কি হলো?

খুনী বাইরে থেকে আসেনি, বাড়িতেই আছে।

ওরে বাবা!

চলো, বাড়িটায় একপাক মেরে আসি।

দুজনে পাক দিয়ে এল গোটা বাড়ি। বরফে শুধু ওদের দুজনের পায়ের ছাপ পড়ল। ওরা ঢুকে গেল বাড়িতে।

পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়ালো ফটকের সামনে। হেডলাইটের আলোয় ঝকঝক করছে তুষারপাতে সাদা বাগানের পথ।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সুদর্শন পুরুষ সাদা শালটা গায়ে বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে বললে, খুনী বাইরে থেকে আসেনি। বাগানে পায়ের ছাপ পড়েনি।

খেঁকিয়ে বললে ইন্সপেক্টর, কুইক মার্চ।

সদর দরজার সামনে এসে দেখা গেল, দুজনের পদচিহ্ন দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে গেছে, আবার ওপাশ দিয়ে এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে।

পদচিহ্ন অনুসরণ করে, গোটা বাড়ি পরিক্রমা করে, সদর দরজার সামনে ফিরে এল দুজনে।

বললে সুদর্শন পুরুষ, খুনী বাড়ির ভেতরেই আছে।

pathagar.net

দোতলার বেডরুমে ঢুকে চিৎপটাং করঞ্জাক্ষের বুকে বাঁধা ছোরার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুদর্শন পুরুষ বললে, ছোরা মারা হয়েছিল বিছানায়। মরার আগে যেটুকু জ্ঞান ছিল তার মধ্যেই বিছানা ছেড়ে নেমে এসেছিলেন। কেন? ইতিউতি তাকিয়ে মেঝে থেকে একটা রাইটিং প্যাড তুলে নিয়ে বললে, এইজন্যে।

সাদা কাগজে অতি কষ্টে লেখা শুধু একটা শব্দ—বিগ্রহ।

বললে সুদর্শন পুরুষ, মরবার আগে খুনীর নাম লিখে দিয়ে গেছেন। বিগ্রহ কার নাম?

একতলার ডাইনিং হলে টেবিলে বসে আছে সবাই।

বাঘের চোখে বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে বললে ইন্সপেক্টর মণিকান্ত মোহান্ত, আপনি খুন করেছেন নিজের বাবাকে?

না, শক্ত ঠোঁটে ছোট্ট জবাব বিগ্রহর।

মণিকান্ত হাঁ করেছিল ফেটে পড়বার জন্যে, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, সুদর্শন পুরুষ, গোড়া থেকে সব শোনা যাক।

সব শোনবার পর সুদর্শন পুরুষ বললে চঞ্চলকুমারকে, শ্বশুর খুন হয়েছে জেনেও সস্ত্রীক বেড়ানোর শখ হলো?

চঞ্চলকুমার নিরুত্তর। ঠোঁট কাঁপছে। গ্রহাণু শক্ত গলায় বললে, খুনী বাইরে থেকে এসেছে কিনা দেখতে বেরিয়ে ছিলাম।

আপনার কাকে খুনী বলে মনে হয়? তিনি তো এই ঘরেই আছেন।

গ্রহাণু নীরব।

কে আবার, খেঁকিয়ে উঠল ইন্সপেক্টর, রাইটিং প্যাডে যার নাম লেখা হয়েছে—সে।

মণিকান্ত, নরম গলায় বললে সুদর্শন পুরুষ, বিগ্রহ নিজেই বলেছিল পেনড্যান্ট যেন ব্যাঙ্ক লকারে থাকে। সে তো নম্বর কম্বিনেশন জানতে চায়নি। ডক্টর কাঞ্জিলালের কিন্তু ইচ্ছা ছিল, পেনড্যান্ট বেচে সবাই শেয়ার নিক। হঠাৎ মৃত্যু এসে যাওয়ায় উনি নম্বর কম্বিনেশন জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—এখন আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।

অ্যাবসার্ড! উনি লিখেছেন খুনীর নাম—বিগ্রহ।

উনি বলতে চেয়েছেন, বিগ্রহ জানে নম্বর কম্বিনেশন।

হকচকিয়ে গেল বিগ্রহ, আমাকে তো বলে যাননি।

ধমকেছিলেন ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাসট্রনমিক্যাল সোসাইটির বুলেটিন পড়ে কপচানোর জন্যে।

মুখ লম্বা হয়ে গেল বিগ্রহর।

বলে গেল সুদর্শন পুরুষ, বুলেটিনে কোনও নম্বর ছিল?

চোখ ছোট হলো বিগ্রহর—বড় হয়ে গেল পরক্ষণেই, হ্যাঁ, ছিল। খুনে গ্রহাণুর নম্বরি নাম।

কি নম্বর?

1997 X F11,

নাকের নিচে সরু গোঁফে তর্জনী বুলিয়ে নিয়ে সুদর্শন পুরুষ বললে, ইংরেজি বর্ণমালায় X-এর জায়গা কত নম্বর? আমিই বলছি—24.F-এর জায়গা কত নম্বরে? 6। তাহলে, 1997 X F11 শুধু সংখ্যায় লিখলে হয়, 199724611। মণিকান্ত, অ্যাম আই কারেক্ট?

গোমড়া মুখে বললে ইন্সপেক্টর, গড নোজ।

লেট আস ট্রাই, বলেই মোনালিসার ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুদর্শন পুরুষ। পেরেক থেকে ছবি নামিয়ে রাখল মেঝেতে। দেখা গেল, ইস্পাতের সিন্দুক। করঞ্জাক্ষ চওড়া বুক-পিঠ দিয়ে আড়াল করে রাখায় এতক্ষণ যা দেখা যায়নি এখন তা দেখা যাচ্ছে। ঠিক মাঝখানে ইঞ্চি ছয়েক ব্যাসের বেশ উঁচু মোটা চাকতি। তাকে ঘিরে আরও দুটো চাকতি। প্রথমটার কিনারায় 1 থেকে 0 পর্যন্ত সংখ্যা লেখা। দ্বিতীয় চাকতির মাথায় একটা খাঁজ। সংখ্যার চাকতি ঘুরিয়ে ওই খাঁজে মিলোতে হবে।

তাই করে গেল সুদর্শন পুরুষ। সংখ্যা-চাকতি ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। 199724611 মেলাল বাইরের চাকতির খাঁজের সঙ্গে। মাঝের মোটা উঁচু 'নব' ধরে মারল টান।

পাল্লা খুলল না।

pathagar.net

বিগ্রহকে বললে সুদর্শন পুরুষ, বুলেটিনে আর কোনও সংখ্যা ছিল?

বলবার জন্যেই তৈরি হয়ে ছিল বিগ্রহ, 108—

কিসের সংখ্যা?

108 গ্রহাণুর লিস্ট বানানো হয়েছে—তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেও পড়তে পারে পৃথিবীর ওপর। নজর রাখা হয়েছে তাদের ওপর।

108 সংখ্যাটি বুলেটিনের কোন জায়গায় ছিল? মানে, 1997 X F11-এর আগে, না, পরে?

আগে।

তাহলে আগে 108, তারপরে 199724611, বলতে বলতে সিন্দুকের দিকে ফিরে সংখ্যা-চাকতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খাঁজের সঙ্গে মিলিয়ে গেল সুদর্শন পুরুষ। খচ-খচ-খচ করে তিনটে শব্দ ভেসে এল সিন্দুকের ভেতর থেকে।

মোটা 'নব' ধরে টান মারতেই ঘুরে গেল পাল্লা কব্জার ওপর।

ভেতরে একটা কুঠরি। শূন্য। পেনড্যান্ট নেই।

কপালের ঘাম মুছে পাল্লা বন্ধ করে দিল সুদর্শন পুরুষ। ফের টানলেও আর খুলল না।

'নব'-এর নিচে নজর গেল এতক্ষণে। সিন্দুক-নির্মাতার নাম-ধাম লেখা প্লেট লাগানো রয়েছে সেখানে। দামও লেখা রয়েছে তলায়—

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল সুদর্শন পুরুষ। তারপর ঘুরে দাঁড়াল ত্রিনয়না কাঞ্জিলালের দিকে। বললে, ডবল দাম দিয়ে কিনেছেন দেখছি।

ত্রিনয়না বললেন, আমিও তাই বলেছিলাম। এই সিন্দুক এর অর্ধেক দামে পাওয়া যায়। শুনে উনি হেসেছিলেন।

ডবল দামটা তাহলে জেনেশুনেই দিয়েছেন ডবল চেম্বারের জন্যে। বহু সিন্দুকে তাই থাকে—চেম্বারের মধ্যে চেম্বার। দেখা যাক।

বলে চেয়ে রইল বিগ্রহের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগল, একমাত্র পুত্র। তার নাম লিখে গেলেন মরবার আগে। উনি পেনড্যান্ট দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ছেলেকে। সব বাবা তাই চায়। বিগ্রহ...বিগ্রহ...বিগ্রহ। ইংরেজি বানান কী?

BIGRAHA—

আবার সরু গোঁফে তর্জনী বুলিয়ে নিয়ে থেমে থেমে বলে গেল সুদর্শন পুরুষ, ইংরেজি বর্ণমালায় এদের স্থানের সংখ্যা যথাক্রমে 29718181...। ঘুরে সিন্দুকের দিকে, সংখ্যা-চাকতি ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 29718181-কে মেলাল বাইরের চাকতির খাঁজের সঙ্গে। টান মারল 'নব' ধরে...গোটা নব-টাই খুলে এল হাতে।

'নবে'র তলায়, পাল্লার পেছন-পিঠে একটা চৌকোনা খুপরি। তার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে সতেরোটা হলুদ হীরের পেনড্যান্ট। তলায় একটা লিস্ট—শেয়ার পাবে যারা তাদের নাম।

pathagar.net

পেনড্যান্টের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ত্রিলোচনের দিকে হীরক-কঠিন চাহনি নিক্ষেপ করল সুদর্শন পুরুষ, ত্রিলোচনবাবু, আমি জানি আপনিই বন্ধুহত্যা করেছেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা থেকে বঞ্চিত হওয়ায়।

আপনি বাতুল, চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন বৃদ্ধ ত্রিলোচন।

সুদর্শন পুরুষের চোখে এখন বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে, কণ্ঠে ডম্বরু বাজছে, আপনিই ডেডবডি না দেখেই টেলিফোনে বলেছিলেন, এখানে একটা খুন হয়েছে। যিনি খুন হয়েছেন, তাঁর স্ত্রী কিন্তু ডেডবডি দেখে শুধু বলেছিলেন, মরে গেছে। দু'নম্বর ক্লু—একই সঙ্গে খুনীর নাম আর পেনড্যান্টের হদিস বলে গেছেন নিহত ব্যক্তি।

নিষ্ঠুর হেসে বললেন ত্রিলোচন, উনি শুধু লিখে গেছেন, বিগ্রহ—

মুখের কথা ছিনিয়ে বললে সুদর্শন পুরুষ, বিগ্রহ-জাদুঘরের প্রথম শব্দটা বিগ্রহ, যেখানকার কিউরেটর আপনি।

এবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ত্রিলোচনের।

কণ্ঠের দুন্দুভি-ধ্বনি অব্যাহত রেখে বলে গেল সুদর্শন পুরুষ, পুলিশ জানে কি করে স্বীকারোক্তি বের করতে হয়। তখন বলবেন, না, এখন বলবেন?

হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি, শুষ্ক জবাব ত্রিলোচনের, কিন্তু আপনি কে?

ইন্দ্রনাথ রুদ্র—প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

জলের তলায়

pathagar.net

অনীশ দেব

জিটি রোডের ধারে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ চোখে পড়তেই সুশীল মাঝি বললেন, "ওই গাছতলায় গাড়ি থামান।" আমি তাঁর কথামতো কাজ করলাম। টার্বো-প্রপ জিপটাকে ম্যাগনেটিক ব্রেক কষে চোখের পলকে দাঁড় করিয়ে দিলাম। তারপর জিপ থেকে নেমে সাইরেন অফ করে দিলাম। ড্যাশবোর্ডের মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে কোড নম্বর বলে কম্পিউটার-লক করে দিলাম গাড়িটাকে।

সুশীল মাঝিও নামলেন গাড়ি থেকে। পরনের ধুতিটা সামলে নিয়ে বললেন, "আসুন, রত্নেশ্বরবাবু, ওই বাঁশবনটা পেরোলেই সেই পুকুর।"

আমি পকেট থেকে কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটের একটা পৃষ্ঠা বের করলাম। এই রিপোর্টটাই গতকাল এসেছে আমার কাছে। বড় রহস্যময় ঘটনা। জলের তলায় কী এমন ঘটনা ঘটল যাতে...

সুশীলবাবু আমচকা বললেন, "রত্নেশ্বরবাবু, এই সেই মরণ-পুকুর, প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো।"

বড় রাস্তা ছেড়ে ঘাসে-ছাওয়া উঁচু-নিচু টিবি পেরিয়ে আমরা বেশ-কিছুটা পথ এসেছি। চারদিকে নানান গাছপালা—বাঁশবন, আগাছার ঝোপ, আর কয়েকটা অশথ গাছ মাথা-চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে। তারই ফাঁক দিয়ে ছোট-ছোট পায়ে-চলা পথ। সে-রকমই দুটো পথ মাটির ঢাল বেয়ে নেমে গেছে বহু প্রাচীন ভাঙাচোরা ঘাটের দিকে।

পুকুরটা খুব বেশি বড় নয়। বড়জোর বিঘেখানেক হবে। চেহারাটা না-গোল, না-চৌকো। এই গরমের সময় জল যতটা শুকিয়ে যাওয়ার কথা ততটা শুকোয়নি। জলের রং সবুজ। আর চারদিকেই আগাছার ঝাড় নেমে গেছে একেবারে জলের কিনারা পর্যন্ত। এককথায় নোংরা ডোবাও বলা চলে।

পুকুরের একটাই মাত্র ঘাট। ঘাট বলতে কতকগুলো কাত হয়ে পড়া ইটের চাঙড়। সেখানে একজন মহিলা বসে কাপড় কাচছেন। আর-একজন পুরুষ ঘাটে বসে মগ দিয়ে জল তুলে স্নান করছেন।

ঘাট যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে ঢালের মুখে বাঁ দিকে একটা প্রকাণ্ড কাকতাড়ুয়া। তার বুকে একটুকরো জং-ধরা টিনের পাতের ওপরে কাঁচা হাতে লেখা ঃ বিপদ।

আমাদের দেখে পুরুষমানুষটি স্নান থামিয়ে নমস্কার করলেন সুশীলবাবুকে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, সুশীল মাঝি এখানকার অঞ্চল-প্রধান। আর মহিলাটি তাড়াহুড়ো করে কাচাকাচি সেরে উঠে চলে গেলেন।

প্রথম মানুষটি গামছা দিয়ে গা মুছতে-মুছতে ওপরে উঠে এলেন। আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। সুশীলবাবু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে আমি একটা আইডেন্টিফিকেশন কার্ড বের করে আগন্তুককে দেখালাম। বললাম, "আমার নাম রত্নেশ্বর রায়। গভর্মেন্টের প্যারানরমাল ফেনোমেনা অ্যানালিসিস উইং থেকে আসছি। গতকালের ঘটনা নিশ্চয়ই জানেন? তার রিপোর্ট পৌঁছেছে আমাদের ডিপার্টমেন্টে। আমি সেটাই তলিয়ে দেখতে এসেছি।"

ভদ্রলোক আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুনলেন না। সুশীলবাবুর দিকে ফিরে উত্তেজিতভাবে বললেন, "ওসব তদন্তে-ফদন্তে কিস্যু হবে না, সুশীলদা। এ-পুকুরের জলের তলায় অপদেবতা আছে, অভিশাপ আছে।'

সুশীলবাবু তাঁকে শান্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, "আহা, নৃপেন, তুমি থামো। ওঁকে ঠিকমতো কাজ করতে দাও।"

নৃপেনবাবু একবার আমার দিকে দেখলেন, তারপর আবার তাকালেন সুশীল মাঝির দিকে। তারপর চাপা গলায় বললেন, "এই পুকুর আমার বাপকে খেয়েছিল। সে-ঘটনা যারা স্বচক্ষে দেখেছিল তারা বলেছে জলের তলা থেকে কোনও দানো বাপের পা ধরে টেনে নিয়েছিল। কালকের ব্যাপারটাও তাই।"

এ-কথা বলে নৃপেনবাবু কীসব বিড়বিড় করতে-করতে চলে গেলেন। তাঁকে আমি কী করে বোঝাব, এই একবিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনার কোনও স্থান নেই। আর জনসাধারণের মন থেকে মিথ্যে ভয় ও কুসংস্কার তাড়ানোর জন্যই সরকার তৈরি করেছে 'প্যারানরমাল ফেনোমেনা অ্যানালিসিস উইং'। কোনওরকম 'অলৌকিক' ঘটনার হদিস

পেলেই আমাদের দফতর সেখানে বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে দেয়। তারপর তন্ন-তন্ন করে তদন্ত করে বের করে সেই ঘটনার 'অলৌকিকত্বের' কারণ। এ-বিষয়ে আবার নানান বিভাগ আছে। যেমন, জল, যানবাহন, বাড়ি, মাঠ, আকাশ—এই সব। অর্থাৎ, 'অলৌকিক' ঘটনা কোথায় ঘটছে সেই বুঝে উপযুক্ত বিভাগের লোক পাঠানো হয়। আমি জল-বিভাগের লোক। এবং বিশেষজ্ঞ।

রিপোর্টটা আমার হাতেই ছিল। সেটায় আর-একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। নৃপেনবাবুর বাবা যখন মারা যান, তখন কোনও শোরগোল হয়নি। আমাদের ডিপার্টমেন্টেও কোনও খবর পৌঁছয়নি। কিন্তু গতকালের ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা। গতকাল এই পুকুরে ডুবে মারা গেছেন বিখ্যাত সাঁতারু চিরদীপ দাস। গত ২০০৪ সালের ওলিম্পিকে সাঁতারে যিনি দু'দুটো সোনা জিতেছেন, একটা ১০০ মিটারে, আর একটা ২০০ মিটারে। সাঁতারে ভারতের একমাত্র সোনা-বিজয়ী।

রিপোর্ট ছাড়া বাকি গল্পটুকু আমি জিপে আসতে-আসতে সুশীলবাবুর মুখেই শুনেছি। এই গাঁয়ে চিরদীপ দাসের আদি বাড়ি। গত বিশ বছর ধরে এখানে ওঁরা কেউই থাকতেন না। তবে মাঝে-মাঝে কেউ-কেউ গাঁয়ের বাতাস গায়ে মাখতে আসতেন। যেমন, গত পরশু চিরদীপ একা এসেছিলেন। কোন্ ছোটবেলায় গাঁ ছেড়ে চলে যাবার পর এই তাঁর প্রথম আসা। এবং এই শেষ।

বেশ বুঝতে পারছি ঘটনাটা কী ঘটেছিল। গাঁয়ে এসে এই পুকুরের অভিশাপের গল্প নিশ্চয়ই চিরদীপের কানে গিয়েছিল। তখন ওলিম্পিক-সাঁতারু চিরদীপ সেটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর অভিশাপের ব্যাপারটা যে ভিত্তিহীন, উদ্ভট কল্পনা, সেটা প্রমাণ করতে চিরদীপ এই পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ব্যাপারটা দেখার জন্য প্রচুর লোক পুকুড়পাড়ে জড়ো হয়েছিল। আর তাদের চোখের সামনেই খাবি খেতে খেতে তলিয়ে গেছেন ওলিম্পিকে সোনা-বিজয়ী সাঁতারু চিরদীপ দাস। সুশীলবাবুও নিজের চোখেই দেখেছেন চিরদীপের মৃত্যু।

আমি বুঝতে পারলাম, সুশীলবাবু আমাকে লক্ষ্য করছেন। বোধহয় উনি আঁচ করেছেন আমি কী ভাবছি। একটু পরেই ওঁর কথায় তার প্রমাণ পেলাম।

আমাদের গায়ে চড়া রোদ লাগছিল। সুশীলবাবু আমাকে আলতো করে একটা গাছের ছায়ায় টেনে নিলেন। হাত বুলিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, "চিরদীপকে নিয়ে এ-পর্যন্ত মোট পাঁচজন হল। মানে আমার জীবনে। তার আগে আরও কত গেছে কে জানে। সকলকে সাবধান করার জন্য এই বিপদের নোটিস আজ প্রায় বারো বছর ধরে লাগানো আছে। আমরা কি এ-পুকুরে স্নান করি না? করি। তবে ওই ঘাটে বসে মগ, বালতি, কি বাটি দিয়ে। ওই নৃপেনকে যেমন দেখলেন।"

আমি পুকুরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সুশীল মাঝিকে দেখলাম। বললাম, "চিরদীপকে তো আপনি মরতে দেখেছেন। আপনার কি মনে হয়েছিল যে, তাঁকে কেউ জলের তলা থেকে টেনে নিচ্ছে?"

সুশীলবাবু মাথার কাঁচাপাকা চুলে হাত চালালেন। বার-দুয়েক গাল চুলকে বললেন, "হতে পারে। ভাল করে বুঝতে পারিনি। তবে চিরদীপ ভীষণ আঁকুপাঁকু করে হাত-পা

ছুঁড়ছিল। চিৎকারও করছিল 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে। কিন্তু কে বাঁচাবে বলুন!"

সুশীলবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, "দেখুন, আপনি যদি এর একটা সমাধান করতে পারেন। অতগুলো লোকের চোখের সামনে জোয়ান ছেলেটা মারা গেল, অথচ আমরা কিছু করতে পারলাম না।"

পুকুরের পাড় ঘেঁষে প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ করে বেশ কয়েকটা হাঁস ঘুরঘুর করছিল। লক্ষ করলাম, ওরা মোটেই জলে নামছে না। বরং ডাঙা থেকে ঠোঁট বাড়িয়ে, জলের কিনারা থেকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এ-পুকুরে হাঁস নামে না?"

সুশীল মাঝি বললেন, "নাঃ। ওরা তো আর আমাদের মতো নয়। ওরা বিপদের গন্ধ পায়।"

আমি অবাক হয়ে পুকুরের সবুজ জল দেখতে লাগলাম। রোদের ছোঁয়া লেগে জল ঝিকমিক করছে। এলোমেলো বাতাসে জলে ছোট-ছোট ঢেউয়ের শিরা ফুটে উঠছে। দেখে কে বলবে, এই পুকুর অন্তত পাঁচজনের প্রাণ নিয়েছে।

রিপোর্টটা পকেটে রেখে আমি একটা বড়সড় মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিলাম। কিছু না ভেবেই ছুড়ে মারলাম পুকুরের শান্ত জলে। ঝুপ করে একটা শব্দ হল। তারপর ঢেউ উঠল। গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে।

আমি পকেট থেকে দুটো স্টেরিলাইজড পলিথিন ব্যাগ বের করলাম। জলের নমুনা নিতে হবে এতে। তারপর নিয়মমাফিক বিশ্লেষণ করতে হবে ল্যাবরেটারিতে। কিছু পাওয়া যাক আর না যাক, এটাই তদন্তের প্রাথমিক নিয়ম।

ভাঙা ঘাটে নেমে ঝুঁকে পড়ে জল সংগ্রহ করতে লাগলাম। সুশীলবাবুও আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। উনি যে বেশ কৌতূহল নিয়ে আমার কাজকর্ম লক্ষ্য করছেন তা বেশ বুঝতে পারছি। জল নেওয়া হয়ে গেলে ব্যাগ দুটো এক বিশেষ ধরনের আঠা 'ইনস্ট্যাফিক্স' দিয়ে সিল করলাম। এই আঠা সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দেয়। জোড়ায় কোনও ফাঁক থাকে না। সুশীলবাবুকে প্রশ্ন করলাম, "আগের চারজনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল তো?"

সুশীলবাবু কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, পাওয়া গিয়েছিল। প্রায় আড়াই-তিন দিন পরে লাশ পাওয়া গিয়েছিল তো?"

সুশীলবাবু কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।"

আড়াই-তিন দিন! একটু অবাক হলাম। সময়টা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু কেন? জলের তলার অপদেবতা কি লাশ আগলে বসে থাকে? হাসি পেল আমার। তবে সেটা বাইরে প্রকাশ না করে আবার প্রশ্ন করলাম, "লাশ পরীক্ষা করে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি?"

"না। শুধু কয়েকটা ঘা-এর মতো দেখা গিয়েছিল। নৃপেনের বাবার লাশ তো পুলিশ-মর্গে নিয়ে কাটা-ছেঁড়াও করেছিল, কিন্তু রিপোর্টে কিছু পাওয়া যায়নি বলেই শুনেছি।"

আমি মনে মনে একটা হিসেব কষছিলাম। দেড়শো বছরের পুরনো পুকুর। জলজ আগাছায় ভর্তি। হাঁস এই পুকুরে নামে না। লাশ ভেসে ওঠে অনেক দেরিতে। তা হলে

কি...?

"আচ্ছা, সুশীলবাবু, এ-পুকুরে মাছ-টাছ নেই।" সুশীল মাঝিকে প্রশ্নটা করে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। আমার হিসেব যদি এক কণাও সত্যি হয়, তা হলে উত্তরটা বোধহয় আমি জানি।

সুশীলবাবু বললেন, "আছে খুব সামান্যই। তবে বেশিরভাগ কই, মাগুর, শোল, এইসব মাছ।"

বুঝলাম, উনি ঠিকই বলেছেন। এই সব মাছের দুটো শ্বাস-অঙ্গ আছে। বেঁচে থাকার জন্য বাতাস থেকেও এরা অক্সিজেন নেয়। শুধু জলের ওপরে নির্ভর করে এই সব মাছ বাঁচতে পারে না।

আমি ঘড়ি দেখলাম। ডিপার্টমেন্টাল টিমের আসার সময় হয়ে গেছে। আমার বুক-পকেটে রাখা খুদে ওয়ারলেস ট্রান্সমিটারের বিপার বেজে উঠল। ওটা বের করে নিয়ে কথা বললাম। ওরা আর বিশ কিলোমিটার দূরে রয়েছে। ওরা এসে পড়লেই এখানে তুলকালাম শুরু হবে। জলে জাল ফেলবে। চিরদীপ দাসের লাশ উদ্ধার করবে। তখন কি একই সঙ্গে পাওয়া যাবে কোনও আশ্চর্য জলচর প্রাণী? মনে হয় না। ওরা হয়তো জলে ডুবুরি নামাবে। তারপর রকমারি যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপজোখের পরীক্ষা শুরু করবে।

কিন্তু ওরা এসে পুকুর তোলপাড় করার আগে একটা ঝুঁকি কি আমি নিতে পারি না? সেটাই হবে আমার চরম পরীক্ষা। আর তার ফলাফল হবে চরম প্রমাণ। কেমন একটা জেদ চেপে বসল মাথায়। পলিথিন ব্যাগ দুটো নিয়ে জিপের দিকে রওনা হলাম। সুশীলবাবুকে বললাম, "এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।"

জলের নমুনা রেখে আমি যখন ফিরে এলাম সুশীলবাবু আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "কী ব্যাপার, রত্নেশ্বরবাবু?"

ওঁর অবাক হওয়ারই কথা। কারণ এখন আমার পরনে সাঁতারের পোশাক। চোখে ডুবুরি-চশমা। কোমরে ইস্পাতের আংটার সঙ্গে লাগানো নাইলন-দড়ি। আর তার পাশেই ফিতেয় বাঁধা খাটো ছুরি।

নাইলন-দড়ির খোলা দিকটা সুশীলবাবুর হাতে দিয়ে বললাম, "শক্ত করে ধরে রাখুন। আমি পুকুরে নামছি। যদি কোনও বিপদ হয় চিৎকার করে উঠব। আর সঙ্গে-সঙ্গে আপনি দড়ি টেনে আমাকে ঘাটে তুলবেন। কী, পারবেন তো?"

সুশীলবাবুর বয়স্ক-মুখে একটা প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠল। বললেন, "পারব মানে, আমাকে পারতেই হবে!"

আমরা দুজনে ঘাটের কাছে নেমে গেলাম। সুশীলবাবু দড়িটা হাতে কয়েক পাক পেঁচিয়ে একটা ইটের চাঙড়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। আর আমি "কোনও ভয় নেই" বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মরণ-পুকুরের সবুজ জলে।

ওলিম্পিকে সোনা পাইনি বটে, তবে সাঁতারে আমি ছেলেমানুষ নই। জলে পড়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে আমি চমকে গেলাম। কিছুতেই শরীরটাকে আমি ভাসিয়ে রাখতে পারছি না। শুধু হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়িই সার। আমাকে ঘিরে মরণ-পুকুরের জল ছিটকে

উঠছে চারদিকে। ভাল করে ঠাহর করে দেখলাম। না, আমার পা ধরে কেউ টানছে না। তবুও আমি তলিয়ে যাচ্ছি।

সুশীলবাবু চিৎকার করে উঠলেন। দূরে টার্বো-প্রপ জিপের শব্দ শোনা গেল। দলবল এসে গেছে। কিন্তু আমি চেষ্টা করেও মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বের করতে পারছি না। শুধু প্রাণপণে বাতাস টানতে চাইছি। সুশীলবাবু আবার চিৎকার করে উঠলেন। টের পেলাম নাইলন-দড়িটা উনি প্রাণপণে টানছেন। আমার চোখের সামনে অসংখ্য জলের কুচি রোদ চিকচিক করে উঠছে। ভাল করে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বুকের মধ্যে কেউ যেন হাপর চালাচ্ছে।

জ্ঞান ফিরতেই দেখি অনেকগুলো মুখ আমার মুখের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে। সুশীলবাবু ছাড়া অন্যান্য মুখগুলোকে চিনতে পারলাম। ওরা আমার, ডিপার্টমেন্টের লোক। আমি উঠে বসলাম। সুশীলবাবু বললেন, "কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো?"

আমি কষ্ট করে হেসে তাঁকে বললাম, "না, ঠিক আছি।"

তারপর আমাদের দলের ফার্স্ট অফিসার শর্মাকে লক্ষ করে নির্দেশ দিলাম, "রুটিন ইনভেস্টিগেশান আর অ্যানালিসিসগুলো করে ফেলুন। তবে মনে হয় ব্যাপারটা আমি ধরতে পেরেছি। আপনি ইন্সট্রুমেন্ট বক্স থেকে ডিজিটাল ডেন্সিমিটারটা শুধু আমাকে দিন।"

শর্মা সকলকে কাজে লেগে পড়তে বলল। তারপর চটপট উঠে গেল যন্ত্রটা জিপ থেকে নিয়ে আসতে।

আমি সুশীলবাবুকে ধন্যবাদ জানালাম। উনি দড়ি টেনে ঘাটে না তুললে আমার অবস্থাও হত চিরদীপ দাসের মতো। ওঁকে সঙ্গে নিয়ে বড় রাস্তার দিকে এগোলাম। যেতে যেতে বললাম, "সুশীলবাবু, দেড়শো বছরের পুরনো এই পুকুরের তলায় কোনও প্রাণীও নেই, কোনও অপদেবতাও নেই। আর অভিশাপের ব্যাপারটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।"

উনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তা হলে?"

শর্মা মিনিয়েচার ডেন্সিমিটারটা আমার হাতে দিয়ে গেল। আমি ওকে বললাম, "পনেরো মিনিট পর-পর আমাকে প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেবেন, হেডকোয়াটার্সে ট্রান্সমিট করব। আমি গাড়িতেই আছি।"

পুকুর নিয়ে আমার আর কৌতূহল নেই। কারণ উত্তরটা আমার নিশ্চিতভাবে জানা হয়ে গেছে। ডেন্সিমিটারের পরীক্ষাটা শুধু অকাট্য প্রমাণ পাওয়ার জন্য।

জিপের কাছে গিয়ে একটা পলিথিন ব্যাগ খুলে খানিকটা জল ডিজিটাল ডেন্সিমিটারের ভলিয়্যুম চেম্বারে ঢেলে দিলাম। তারপর সুইচ অন করতেই ডিসপ্লে প্যানেলে একটা সংখ্যা ফুটে উঠল : ০.৮০

অকাট্য প্রমাণ। আমি হেসে উঠলাম। সুশীলবাবু ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখতে লাগলেন। আমি মিটারের সুইচ অফ করে তাঁকে বললাম, "সুশীলবাবু, এই পুকুরের জলের ঘনত্ব স্বাভাবিক জলের ঘনত্বের চেয়ে অনেক কম। তাই..."

আমাকে বাধা দিয়ে সুশীল মাঝি বললেন, "ঘনত্ব মানে?"

আমি এক সেকেণ্ড ভেবে বললাম, "মানে বলতে পারেন, স্বাভাবিক জলের চেয়ে এই পুকুরের জল পাতলা। যেমন ধরুন, অনেকটা কেরোসিন তেলের মতো। তাই এই জলে সাঁতার কেটে ভেসে থাকা অসম্ভব। এমনকী, হাঁসেরাও পারে না। সেইজন্যই ওরা এই পুকুরের জলে নামে না। আর মানুষের মৃতদেহও ভেসে ওঠে অনেক দেরিতে—অনেক বেশি ফুলে-ফেঁপে ওঠার পর। চিরদীপ দাস একই কারণে এই পুকুরে তলিয়ে গেছে। যেমন আমিও তলিয়ে যাচ্ছিলাম।"

কতগুলো রহস্যময় দুর্ঘটনার কী সহজ এবং নিষ্ঠুর উত্তর! ঘনত্বের শতকরা কুড়ি ভাগ তফাত কী অদ্ভুতভাবেই না বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে!

সুশীল মাঝি জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু জলটা পাতলা হল কেমন করে, রত্নেশ্বরবাবু?"

আমি চুপ করে রইলাম। সেটা তো আমারও প্রশ্ন। জিওল মাছ ছাড়া অন্য মাছ এ-পুকুরে বিশেষ নেই। হয়তো দেড়শো বছরে এই জলের সঙ্গে মিছে গেছে এমন কোনও জৈব রাসায়নিক তরল যার ঘনত্ব জলের চেয়ে অনেক কম। বলা যায় না, এই পুকুরের জলে হয়তো রয়েছে এমন সব জলজ উদ্ভিদ, যা পচে-গলে তৈরি হয়েছে কোনও হাইড্রোকার্বন যৌগ। তারপর তা থেকে এসেছে কোনও জৈব রাসায়নিক—ক্রমাগত জলে মিশে গিয়ে সেই রাসায়নিকই হয়তো কমিয়ে দিয়েছে এই পুকুরের জলের ঘনত্ব। আর একই সঙ্গে জিওল মাছ ছাড়া অন্যান্য মাছ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এত সব সম্ভাবনার কথা না বলে সুশীলবাবুকে ছোট্ট জবাব দিলাম, "পুকুরের জলের নমুনা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করলেই সেই কারণটা হয়তো জানা যাবে।"

এমন সময় পুকুরের দিক থেকে একটা হইচই কানে এল। বোধহয় চিরদীপ দাসের মৃতদেহটা ওরা খুঁজে পেয়েছে।

নীলার আংটি

pathagar.net

সঙ্কর্ষণ রায়

লোকটাকে অফিসে যাওয়ার পথে রোজই দেখতাম। যাদুঘরের পেছনে লাল বাড়িতে জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সদর দপ্তরে আমার অফিস। যাদুঘরের সামনে চৌরঙ্গি রোড, উত্তর দিকে সদর স্ট্রিট চৌরঙ্গি থেকে বেরিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে চলে গিয়েছে। সদর স্ট্রিটের ওপরে যাদুঘরের অফিস এবং আমাদের অফিসের প্রবেশপথ। এই প্রবেশপথের লোহার গেটের বাইরে ফুটপাথের ওপরে লোকটি তার পোষা কুকুরকে নিয়ে থাকত। চটের স্তূপের ওপরে তার ও তার কুকুরের ছেঁড়া ময়লা বিছানা, বিছানার পাশে দুটি ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের থালা ও গেলাশের পাশ কাটিয়ে যেতাম রোজ।

শাম্মিকে নিয়ে এই আমার সংসার, লোকটি একদিন আমাকে বললে, শাম্মি ও আমি দুজনে এখানেই থাকি। শাম্মি ছাড়া এ দুনিয়ায় কেউ নেই আমার।

রান্না-বান্না করতে তো দেখি না তোমাকে, আমি বললাম। খাও কি?

সাহেব-বাড়ির খাবার। সামনের ঐ তিনতলা বাড়িতে তিনটি সাহেব-পরিবার থাকে, তা ছাড়া আশেপাশে অনেক সাহেব-মেম আছে, ওপাশের ডাস্টবিনের মধ্যে ওরা যা

ফেলে দেয়, তা থেকে যা পাই তা দিয়ে আমাদের দুজনের পেট ভরে যায়। মাঝে মাঝে খুব ভাল খাবারও পাই। সামনের বাড়ির নিচের তলায় যে বুড়ি-মেমসাহেব থাকেন, তিনি মাঝে মাঝে তাঁর রান্নাঘরের বাড়তি খাবার আমাদের এনে দেন। তখন রীতিমতো ভোজ হয় আমাদের...

সেদিন এই বুড়ি লরা অরচার্ডকে দেখলাম সসপ্যানে করে চাওমিন ও মাংস নিয়ে এসে লোকটার অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ঢেলে দিতে।

একা তুমি খেও না। লোকটার থালায় খাবার ঢালতে ঢালতে লরা বললেন, শাম্মিকে খাইয়ে তবে খাবে তুমি। বুঝলে সামাদ আলি?

হ্যাঁ মেমসাহেব, সামাদ জবাব দিল। ওকে খাইয়ে তবে আমি খাই। আচ্ছা মেমসাহেব, এত সব খাবার আমাদের দিয়ে দিচ্ছ, তোমরা খাবে না?

আমি আর কত খাব বল? ভাই সিরিল আমাকে বলেনি যে তার বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল, রাত্রে বাড়ি ফিরে কিছুই খায়নি। ভাল কথা, কাল রাত্রে জোর বৃষ্টি হয়েছিল, তোমরা আমাদের বিল্ডিংয়ের গাড়ি-বারান্দার নিচে তো যাওনি! এখানে বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজছিলে বুঝি! দেখ সামাদ আলি, তোমার বৃষ্টিতে ভিজলে ভাল লাগে তো ভেজো যত খুশি, কিন্তু শাম্মিকে কষ্ট দেওয়া চলবে না।

শাম্মিকে কষ্ট দেব কি, সে তো বৃষ্টি শুরু হতেই যাদুঘরের অফিসের বারান্দার তলায় গিয়ে হাজির হলো। ওর পেছনে পেছনে আমিও গেলাম ওখানে।

লরা চলে যেতে সামাদ বললে, বড় ভালমানুষ এই বুড়ি মেমসাহেব, গরিবদের ওপরে বড় দয়া ওনার। তবে আমার চেয়ে আমার কুকুরের ওপরেই ওনার দরদ বেশি। ওনার ভাই কিন্তু আমাদের একদম সহ্য করতে পারে না। লোকটা অবশ্য মেমসাহেবের নিজের ভাই নয়, তিনকুলে কেউ নেই বলে বুড়ি নিজের কাছে এনে রেখেছেন।

সেদিন দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে সামাদ ও শাম্মির পাশ কাটিয়ে তড়িঘড়ি অফিসের দিকে যাচ্ছি, উত্তেজিত পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ করে ছুটতে ছুটতে এল সামাদ আলি।

সাহেব, ও সাহেব! উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকল সামাদ, একটু দাঁড়ান...

ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সামাদ আলি বললে, এই দেখুন স্যার, ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁজে বের করতে গিয়ে কি পেয়ে গিয়েছি...

বলে ডান হাতের মুঠো খুলে সামাদ আমাকে যা দেখাল তা আমার চোখ দুটি ধাঁধিয়ে দেয়। সোনার আংটিতে বসানো বিরল শ্রেণীর রক্তমুখী নীলা।

কোথায় পেলে এটা? আমি প্রশ্ন করি।

ডাস্টবিনের মধ্যে। সামাদ আলি জবাব দিল। খুবই দামী পাথর, তাই না স্যার?

দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ডাস্টবিনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া জিনিসকে খাঁটি বলে মেনে নেওয়া শক্ত।

তার মানে আপনি বলতে চান এই সোনা ও পাথর দুইই ঝুটো?

আমি কিছুই বলতে চাই নে, আমাদের টেস্টিং ল্যাবোরেটারিতে আছেন ডক্টর পরাঞ্জপে, যা বলার তিনিই বলবেন পরীক্ষা করে। চল আমার সঙ্গে...

সামাদ আলির সঙ্গে শাম্মিও চলল।

এই সেই আংটি! আংটিটা দেখামাত্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন ডক্টর পরাঞ্জপে। পরশুদিন এটা নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন মিস লরা অরচার্ড। খাঁটি নীলা। কিন্তু এটা আপনার হাতে এল কি করে?

আমার হাতে নয়, এসেছে সামাদ আলির হাতে, আমি জবাব দিলাম। সামাদ আলি ডাস্টবিন থেকে এটা কুড়িয়ে পেয়েছে।

না, সামাদ আলি মিস লরা অরচার্ডকে খুন করে এই আংটিটা তাঁর আঙুল থেকে খুলে নিয়েছে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁর ভাই সিরিল তাঁকে বিছানায় মৃত অবস্থায় দেখতে পায় ও পুলিশে খবর দেয়। লরার ফ্ল্যাটে থানার ওসি তাঁর দলবল ও ফোরেনসিক এক্সপার্টকে নিয়ে তদন্ত করছেন, খবর দিচ্ছি তাঁকে...

খবর পেয়েই এলেন থানার ওসি তিনজন সশস্ত্র পুলিশ কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে। যাকে বলে 'বমালসুদ্ধ গ্রেপ্তার' তা-ই করলেন তিনি।

দু'হাতে হাতকড়া পরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকে সামাদ আলি। কাঁদতে কাঁদতে বলে, বিশ্বাস করুন দারোগাসাহেব, খুন আমি করিনি। মাকে আমি খুব ছোটবেলায় হারিয়েছি, তাঁকে আমার মনেও পড়ে না, লরা মেমসাহেব আমার মায়ের মতো ছিলেন। মায়ের মতো কি, মায়ের চেয়েও বেশি। আমি ও শাম্মি রোজ তাঁর দেওয়া ভাল ভাল খাবার খেয়েছি, কাল রীতিমতো বিরিয়ানি খাইয়েছেন আমাদের। এই আংটি আমি ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। এই সাহেব সাক্ষী। বলে সে আমার দিকে তাকাল।

ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পেয়েই ছুটতে ছুটতে এসেছিল সামাদ আলি আমার কাছে, আমি বললাম। তার ডান হাতের মুঠো খুলে দেখিয়েছিল আমাকে।

আপনি কি ওকে ওটা ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে নিতে দেখেছেন? আমার মুখের ওপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে পুলিশ ওসি ইদ্রিস খাঁ প্রশ্ন করেন।

না। আমি জবাব দিলাম।

রীতিমতো চালাক লোক এই সামাদ আলি। দেখ সামাদ, ঐ সাহেবের চোখে ধুলো দিতে পারলেও, আমার মতো দুঁদে দারোগাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। মেমসাহেবকে খুন করে তাঁর নীলা-বসানো আংটিটা ডাস্টবিনে লুকিয়ে রেখে ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁজে বের করার ভান করে আংটিটা বের করে এই সাহেবকে দেখিয়েছিলে।

একটা কথা মিস্টার খাঁ, ডক্টর পরাঞ্জপে বললেন। আংটির জন্যই মিস অরচার্ডকে খুন করা হয়েছে একথা ধরে নিচ্ছেন কেন! সামান্য একটা আংটির জন্য খুন একথা কি ভাবা যায়! আংটি-চোরের পক্ষে ঘুমন্ত মিস অরচার্ডের হাতের আঙুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া এমন কোনো কঠিন কাজ নয়।

আংটির জন্য খুনের কথা সিরিল বলেছিল আমাকে, ইদ্রিস খাঁ বললেন। আংটি-চোর মিস অরচার্ডের শোবার ঘরে ঢুকতেই তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন। তাঁর চিৎকার শুনে ঘরে ঢুকে সিরিল দেখল তার দিদি মরে পড়ে আছেন এবং তাঁর আঙুলে নীলার আংটিটা নেই। সে মনে করে যে মিস অরচার্ডের চিৎকার থামাতেই চোর তাঁর গলা টিপে ধরেছিল। এই খুনী চোরকে হাতেনাতে ধরতে পেরে আমি খুশী।

হুজুর আমি চোর নই, খুনী নই, ফোঁপাতে ফোঁপাতে সামাদ আলি বললে। বিশ্বাস

করুন হুজুর, ডাস্টবিনে আংটিটা খাবার খুঁজতে গিয়ে পেয়েছি।

আংটিটা ধরা পড়ে গিয়ে তুমি যে চোর, তার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। তুমি খুনী কিনা তার প্রমাণও হয়ে যাবে এখনই। চল আমাদের সঙ্গে।

সামাদ আলিকে ধরে বেঁধে মিস অরচার্ডের ফ্ল্যাটে নিয়ে যান ইদ্রিস খাঁ ও তাঁর পুলিশ বাহিনী। ইদ্রিস খাঁয়ের নির্দেশমতো আমিও যাই তাঁদের সঙ্গে।

মিস অরচার্ডের মৃতদেহের ওপরে ঝুঁকে পড়ে তাঁর গলায় খুনীর আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করছিলেন ডক্টর কল্যাণ বসুর ফরেনসিক ল্যাবোরেটারির বিজ্ঞানী সুবীর সিংহ। সামাদ আলিকে তাঁর দিকে এগিয়ে ইদ্রিশ খাঁ বললেন, খুনীকে ধরে নিয়ে এসেছি ডক্টর সিন্‌হা। মিস অরচার্ডের গলায় এরই হাতের আঙুলের ছাপ আছে বলে সন্দেহ করি। পরীক্ষা করে দেখুন।

আমাদের অনুসরণ করে মিস অরচার্ডের শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছিল শাম্মিও। মিস অরচার্ডের মৃতদেহের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে তাঁর শিয়রে বসে কাঁদতে থাকা সিরিলের গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুরু করে।

সামাদের এই নোংরা কুকুরটা এখানে কেন? সিরিল বিরক্তি মাখানো কণ্ঠে বললে, ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিন মিস্টার খান।

পুলিশ বাহিনীর তাড়া খেয়েও সিরিলের গায়ের গন্ধ শুঁকতে থাকে শাম্মি এবং উত্তেজিতভাবে ঘেউ ঘেউ করে যায়।

মিস্টার খান! উঠে দাঁড়িয়ে সুবীর সিংহ বললেন, আমি এই লোকটির হাতের ছাপ নেব, দয়া করে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।

সিরিল স্মিথ তো মিস অরচার্ডের ভাই! ইদ্রিস খাঁ অবাক হয়ে তাকালেন সুবীরের মুখের দিকে। তাঁর হাতের ছাপ নেবেন কি মশাই!

মিস অরচার্ডের মৃতদেহে এই কুকুরটি ঐ লোকটার গায়ের গন্ধের হদিস পাচ্ছে। ভাই হলেই কি সন্দেহের বাইরে হবে!

পলায়মান সিরিলকে চেপে ধরে পুলিশ বাহিনীর দু'জন, সুবীর সিংহ তার হাতের ছাপ নিয়ে যা করণীয় করতে থাকেন।

পেয়েছি! খানিকক্ষণ বাদে সুবীর সিংহ বলে উঠলেন।

কি পেয়েছেন? ইদ্রিস খাঁয়ের প্রশ্ন।

খুনীর হদিস। সিরিল স্মিথই খুনী।

নীলার আংটি নয়, লরার টাকার লোভে সিরিল তাঁকে খুন করেছিল। লরার উইল অনুযায়ী তাঁর যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর সিরিলের পাওয়ার কথা।

আচ্ছা সিরিল, কেন তুমি নীলার আংটিটা ফেলে দিলে। ইদ্রিস খাঁ সিরিলকে গ্রেপ্তার করতে করতে প্রশ্ন করলেন। এমন একটা চোখ ঝলসানো পাথর! ডক্টর পরাঞ্জপে বলছিলেন, হীরের চেয়েও দামি...

অপয়া পাথর, সিরিল বললে। খুন হওয়ার আগের দিনই দিদিকে ওটা উপহার দিয়েছিলেন মিয়ানমার থেকে আসা তাঁর এক বন্ধু। ওটা পরেছিলেন বলেই খুন হলেন। কাজেই দিদি খুন হতেই আমার প্রথম কাজ হলো ওটাকে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দেওয়া।

সাধু দেবকুমারের আজব কাহিনী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মহাসাধু দেবকুমার তখনও সাধুসন্ত কোনওটাই নন। কিছুদিন হল বিয়ে-শাদি সেরে নববধূসহ মধুযামিনী করতে বেরিয়েছেন। চাকরি-বাকরি কিছুই করেন না। দাদাবৌদির হোটেলে সবলে আছেন। সবলে কথাটার পিছনে কিছু বলবান উপাখ্যান আছে।

তিরিশের মধ্যে বয়েস। বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা। পেশীপুষ্ট। পরোপকারী যুবা। যে-কোনও ঝামেলায় মহড়া নিতে সদাআগুয়ান। আখড়ায় ফি-দিন কুস্তি লড়েন। ছোরাখেলা, লাঠিখেলা—সবেতেই নং ১। এমনকী কয়েকবার মহাপরাক্রমশালী দারা সিংকেও চিত করেছেন। জুনিয়র বকসিং-এ পর পর দু বছর চ্যাম্পিয়নও ছিলেন। তবে, এগুলোর মধ্যে তো আর দোষের কিছু ছিল না। দোষ একটিই। তা হল, প্রতিদিন এক-আধটি ঘটনা বাধানো। আর সে ঘটনাগুলির নায়ক স্বয়ং দেবকুমার। এক ঘুষিতে কারো চোয়াল খুলে গেল, কারো বা একপাটি দাঁত খসে পড়ল টগর ফুলের মতো। প্রত্যেকটা খবর কানে আসত আর দাদা বেধড়ক পিটতেন। দেবকুমার মাথা নিচু করে জানাতেন, লোকটা খারাপ বা ওরা এককাট্টা হয়ে বুড়ো পুরুতমশাইকে শেষ করে দিচ্ছিল। আমি দেখতে

পেয়ে...

কথা শেষ হয় না। খিলের বাড়ি পিঠে আরো উপর্যুপরি নেমে আসে। দেশের ভাল করার দায়িত্ব তোমায় কে দিয়েছে? সমাজশাসক! কে আমার রবিনহুড এলেন!

এভাবেই বছরের পর বছর তিতিবিরক্ত হতে-হতে দাদাবৌদি দেবকুমারের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন। ভাবলেন, বদল হবে। হলও তাই। ওঁদের প্রেস্ক্রিপশন সমূহ কার্যকর হল। এছাড়াও হাতে কিছু থোক টাকা দিয়ে বললেন, যে-কোনও একটা ব্যবসা করো। খাবে বাড়িতেই। তবে, তোমার হাত খরচ আজ থেকে বন্ধ। মাসে দু'জনের টুকিটাকি খরচ চালিয়ে নিতে হবে। আমি দিতে পারি, কিন্তু, দেব না। স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করো। বয়েস হয়েছে।

পিতৃতুল্য দাদার কথা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নিলেন দেবকুমার। কলেজ স্ট্রিটে একটা বই-এর দোকান করলেন। মূলধন ছাড়াও অন্যতম প্রধান সম্পদ ছিল সততা। দিনে-দিনে একটা চলনসহ জীবন কাটাবার ব্যবস্থা হল। দেবকুমার সদাসুখী, নিয়তপ্রফুল্ল। বউকেও তেমন করে গড়ে নিলেন।

কিন্তু, আমাদের গপ্পো এহেন দেবকুমারের সাধু হওয়া নিয়ে।

ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে দেবকুমার ও দেবকুমারীর দিন কেটে যাচ্ছিল। খুব-একটা তেল-তেল ফুল-ফুল দিন না কাটলেও, কেটে যাচ্ছিল।

দেবকুমারের তখন মাথাভর্তি জটা। একগাল কাপালিক-দাড়ি। পরণে গেরুয়া রঙে ছোপানো কুর্তা আর লুঙ্গি। পায়ে খড়ম। হাতে একটা বেলকাঠের সাদাটে লাঠি। পাহাড়-টিলায় ওঠার জন্যে। কমণ্ডলু নেই। সাধু তো আর নন।

দেবকুমারীকে গৌহাটিতে এক বন্ধুর বাড়ি রেখে আগরতলায় এসেছেন। উঠেছেনও এক বন্ধুর বাড়ি। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বাসে-ট্রাকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন জলে-জঙ্গলে। মনের আনন্দে। সেই বন্ধুর জিপে চড়ে গোটা এলাকা তোলপাড় করে দিচ্ছিলেন।

কিন্তু সেই গেরুয়া রং, সেই জটাজুট তাঁকে ইতিমধ্যেই দ্রষ্টব্য করে তুলেছিল। খুবই স্বাভাবিক। কেউ ভাবছিল, তিনি সন্ন্যাসী। কেউ ভাবছিল মঠমন্দিরের সন্ত। কেউ বা ভাবছিল কোনও বিশেষ সংঘপ্রতিষ্ঠানের বাবাজি। গুরুঠাকুর। কিন্তু, তেমন কেউ, তখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে ঘেঁষেনি।

শুধু একটি ঘটনা, তাঁকে একদিনে মোহন্ত সাধু বানিয়ে দিল। সে গপ্পেই আসছি।

তেমন কোনও কথা ছিল না, হঠাৎই দেবকুমার ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন। তখন ভরদুপুর। রোদ্দুরে চাঁদি ফেটে যাচ্ছে। পায়ে সেই খড়ম, তেমনি গেরুয়া পরণে। হাতে লাঠিটি শুধু নেই। কাঁধে এক আজানুলম্বিত কাঁধ-ব্যাগ।

দেবকুমার হেঁটে চলেছেন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে। বন্ধু আজ দুদিন যাবৎ কাজে বাইরে। সুতরাং, একা দেবকুমার, কী আর করেন, মন্দিরদর্শনে চললেন।

বিশাল সেই রাজার মন্দির। বহু পুরনো। চণ্ডীমণ্ডপ পেরিয়ে বিশালাকার এক বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভ্রূকুটি করলেন বুঝি। মা মা করে দু'বার বজ্রকণ্ঠ ধ্বনির পর হাঁটু মুড়ে বসলেন। গড় করলেন। যখন উঠলেন, তাঁর দুই চোখ জবালাল। হয়তো রোদ্দুর লেগে এই রক্তাভা। কিন্তু, দেবকুমারের মনের ভিতর কী এক অনাস্বাদিত

তোলপাড় হতে থাকল, যার মানে তিনি কখনও খুঁজে পাননি।

বৃদ্ধ রাজপুরোহিত সামনে এসে দাঁড়ালে দেবকুমার এক বিচিত্র স্বরে তাঁকে আদেশ দিলেন, "দরজা খুলে দাও। মা আমাকে ডেকেছেন। তাই এসেছি। আজ বিশ বছর বাদে মা আমাকে ডেকেছেন।"

পুরোহিত বললেন, "নিয়ম নেই। রাজার আদেশেও এই বন্ধ দরজা এখন আর খুলবে না। অসম্ভব।"

সেই লোহার বলটু লাগানো বিশাল দারুদরজার দিকে মুখ করে দেবকুমার বসেই রইলেন। ঠিক কতক্ষণ ছিলেন, খেয়াল নেই।

ইতিমধ্যে মন্দিরচত্বরে যে দু-চারজন ছিলেন, কৌতূহলবশবর্তী কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন। দেবকুমারের কোনোদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি চোখ মুছে মার উদ্দেশে ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন, তোর ডাক শুনে এলাম আর তুই দরজা বন্ধ করে নিদ্রা যাচ্ছিস। এ কেমন ব্যবহার মা? ছেলের প্রতি এ কী মায়ের ব্যবহার? ঠিক আছে, আমি ফিরে যাচ্ছি। বহু বছর বাদে তোর ডাকে ফিরে এসেছিলাম। ফিরেই যাচ্ছি। আর কোনও দিন দেখা হবে না। যেমন ত্যাজ্যপুত্র ছিলাম, তেমনই ত্যাজ্য হয়ে ফিরে চললাম।

"সে যে কী ঘোর লেগেছিল, আজ অবধি তার কোনও ব্যাখ্যা পাইনি। সে কি গেরুয়ার ঘোর! জানি না।"

স্বাভাবিক দেবকুমার সেদিনের সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা বলতে-বলতে শিউরে ওঠেন। দুটি হাত সামনে বাড়িয়ে দেখান কেমন রোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

তারপর বড় বড় লোহার দুটো তালার ফাঁকে দু লাইন খসখস করে 'মা কি এমন ব্যবহার করতে পারে ছেলের প্রতি? চললাম'—লিখে দুটো তালার ফাঁকে চিরকুটটা গুঁজে দিলুম। দিয়েই পিছন ফিরেছি—অমনি ঐ দুই ভারী দরজা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে খুলে গেল।

"সেই ফাঁকা দরজা দিয়ে মন্দিরস্থ ভয়ংকর কালোর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে ফেললাম। প্রচণ্ড ভয় করতে লাগল। এ কী হল? এমন তো চাইনি!

"আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণ-পূজারী আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগল। 'আমার অন্যায় হয়েছে, ঘাট হয়েছে। আমি তোমায় চিনতে পারিনি বাবা।"

"উনি তো সাষ্টাঙ্গ, ওঁর সঙ্গে আশেপাশে যারাই ছিল, সবাই পায়ে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এর এই প্রার্থনা, ওর ওই—শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। প্রত্যেককে বরাভয় দিয়ে, যেভাবে এসেছিলাম, তার চেয়ে অন্যভাবে পালিয়ে বাঁচলাম।

"কিন্তু, বাঁচা কি যায়? তখন তো ধরা পড়ে গেছি। প্রায় সবাই পিছু নিয়েছে। অলৌকিক এক বাবার কথা গোটা শহরে রটে গেছে আগুনের মতো। আমার ঐ বন্ধুর বাড়ি তখন বাবার আশ্রম। লাইন করে সবাই বিপদভঞ্জন বাবার সামনে।

"আর আমারও মুখ দিয়ে অমোঘ সমাধান বেরিয়ে আসছে। কী বলছি কোনও খেয়াল নেই।

"এই করে দুদিন কাটলে, আমার বন্ধু সপরিবারে এসে যখন গভীর রাতে আমার সামনে করজোড়ে বসল, আমার চেতনা ফিরল।

"বললুম, গোপেন্দু কাল ভোরের ফ্লাইটেই যাবার ব্যবস্থা করো। নইলে তোমারও বাস উঠবে এখান থেকে এবং আমারও গায়ের চামড়া গায়ে থাকবে না। ভক্তেরা চামড়া খুলে নেবে।

আমরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি, "ব্যাপারটা হল কী করে? অবিশ্বাস্য!"

দেবকুমার ভাসতে-ভাসতে কুটো ধরার মতো বললেন, "মনে হয় ঠিকমতো তালা লাগান হয়নি। তালার ফাঁকে চিরকুট ঢোকাতে গিয়ে দরজায় চাপ পড়ে থাকবে।

"ভোরবেলা জন্মের মতো গেরুয়া ছেড়ে প্লেনে উঠলাম।"

বুবাই

আশিস সান্যাল

রঙ্‌পো! কী সুন্দর নামটি। চারদিকে সারি-সারি তুঁতে রঙের পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে লেপ্‌টে থাকা ঝাপসা মেঘ—কখনও ঝমঝম, কখনও টুপটাপ। পুবের কিনার ঘেঁষে ছুটে চলা তিস্তার অবিরাম ফোঁসফোঁস। অনেক দূর পর্যন্ত বাতাসে ভেসে যায় সেই শব্দ। অদ্ভুত ভাল লেগে গিয়েছিল জায়গাটা বুবাইয়ের।

মাত্র কয়েক ঘর মানুষর বসতি। দূরে পাহাড়ের গায়েও রয়েছে ছড়ানো-ছেটানো কয়েকটা বস্তি। কয়েকটা ছোট দোকানঘর নিয়ে গড়ে উঠেছে বাজার। বুধবার ও শনিবার হাট বসে। সেদিন অনেক দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। তা ছাড়া অন্যদিন সামান্য কিছু কেনাকাটা করে কাছাকাছি পাহাড়ি বস্তির মানুষরা।

তবে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক আসা-যাওয়ার পথে যখন যাত্রীবোঝাই বাস এসে থামে এখানে, তখন বেশ ভিড় জমে যায় দোকানে-দোকানে। চায়ের দোকানে তো রীতিমত লাইন পড়ে যায়। মালবাহী লরিকেও থামতে হয় এখানে কিছুক্ষণের জন্য। তখন লরির লোকেরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। যারা টেম্পো বা প্রাইভেট গাড়িতে

যাওয়া-আসা করে, তাদেরও কিছুক্ষণ থামতে হয় এখানে। সব মিলিয়ে বেশ জমজমাট জায়গাটা।

আসলে জায়গাটা সিকিম থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রবেশপথ। সিকিমের শেষ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জনস্থান। তাই রয়েছে চেকপোস্ট। সারাক্ষণ টহল দেয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। আবগারি দফতরের অফিসাররা সর্বদাই তৎপর।

বুবাই এসেছে তার মামার বাড়ি বেড়াতে। এই তার প্রথম মামার বাড়ি আসা। মামা ও মামিমা বহুবার আসার জন্য লিখেছেন। কিন্তু কিছুতেই আসা হচ্ছিল না। হয় স্কুলের পরীক্ষা, নয়তো নিয়ে আসার লোকের অভাব। এবার একটা সুযোগ হয়ে গেল। বাবার এক বন্ধু যাচ্ছিলেন গ্যাংটক, বিশেষ দরকারে। বাবার অনুরোধে রাজি হয়ে গেলেন তিনি। মামাকে চিঠি লিখে সব জানিয়ে রেখেছিলেন বাবা। তাই কোনও অসুবিধেই হয়নি। বাস থেকে নামতেই মামা প্রায় ছুটে এলেন।

"বুবাই না?"

"হ্যাঁ।"

"সকাল থেকে আমি অপেক্ষা করে আছি। আজ বাস আসতে বেশ দেরি হয়েছে।"

বাবার বন্ধু বুবাইকে মামার হাতে তুলে দিয়ে যেন স্বস্তি পেলেন। ফেরার পথে এখানে দু'দিন থেকে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার গিয়ে বসেছিলেন বাসে। মামার হাত ধরে বুবাই এসে উঠেছিল বাড়িতে।

প্রায় একবিঘে জমি নিয়ে মামার বাড়ি। তিনটি বড়-বড় চারচালা বিশাল টিনের ঘর। ঘরগুলির দেওয়াল অবশ্য ইটের। মেঝে সিমেন্ট করা। ঘরের আসবাবপত্র সব আধুনিক। টিভি, ফ্রিজ, টেলিফোন—সবই আছে বাড়িতে। দেশভাগের পর নানা জায়গায় ভাগ্যান্বেষণে ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এখানেই আস্তানা গেড়েছেন মামা। শুরু করেছিলেন একটা ছোটকাটো কাঠের ব্যবসা দিয়ে। সে প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগের কথা। এখন সেই কাঠের ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে রঙ্‌পোর এখন তিনিই সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি।

এত বড় বাড়িতে লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। মামা-মামিমা ছাড়া রয়েছে একজন সারাক্ষণের কাজের লোক। এ ছাড়া বাইরের দিকের বড় ঘরটায় রাতে ঘুমোতে আসে একটি ভুটিয়া ছেলে। দিনে সে কাজ করে মামার কাঠের দোকানে। একটা হোটেলের সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত আছে খাওয়া দাওয়ার। রাতে প্রায়ই বাড়িতে ফেরে অনেক দেরিতে। ফিরেই ট্রানজিস্টারে জোরে হিন্দি গান চালায়। মামার একমাত্র সন্তান সুনীল থাকে আমেরিকায়। ভাল চাকরি করে সেখানে। কোনওদিন দেশে ফিরবে কি না সন্দেহ! মামা-মামিমার সব থেকেও যেন কিছু নেই। সবকিছুই কেমন যেন একঘেয়ে।

এই একঘেয়ে জীবনযাত্রার মধ্যে বুবাই আসাতে যেন কিছুটা বৈচিত্র্যের সঞ্চার হল। মামিমা প্রায় সব সময় ব্যস্ত থাকেন বুবাইকে নিয়ে। মামাও ফিরে আসেন দোকান থেকে তাড়াতাড়ি। সবাই মিলে গল্প-গুজব করেন অনেক রাত পর্যন্ত।

এভাবে বেশ কয়েক দিন কেটে গেল বুবাইয়ের। এখন মাঝেমাঝে বিকেলের দিকে বেড়াতে যায় এদিক-ওদিক। তিস্তার পাড়ে বসে দেখে দূরের পাহাড়চূড়ায় মেঘের

এলোমেলো বিচরণ। সেদিনও বিকেলে তিস্তার পাড়ে বসে ছিল বুবাই। আকাশটা ছিল সেদিন ঝকঝকে পরিষ্কার। পড়ন্ত বেলার সোনালি রোদ্দুর তিস্তার বুকে ছিটকে পড়ে চিকচিক করছিল।

কেমন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল বুবাই। খেয়ালই ছিল না, কখন আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেছে চারদিক। কখন আকাশ সাঁতার-ক্লান্ত পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে ভরে গিয়েছিল। যখন খেয়াল হল, তখন আকাশে মিটমিট করে জ্বলতে শুরু করেছে অজস্র তারা।

দ্রুত বাড়ির দিকে পা বাড়াল বুবাই। একটা পাহাড়ি গলিপথ অতিক্রম করে সবে বড় রাস্তায় পা দেবে, ঠিক তখনই একটা আর্ত চিৎকারে সে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু একবারই, তারপর আবার সব নিশ্চুপ। কিছুই সঠিক বুঝতে পারছিল না বুবাই। শব্দটা যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে বুবাই এগিয়ে চলল।

কিছুদূর পাহাড়ি গলিপথ ধরে এগিয়ে চলার পর একটা ছোট কুঁড়ে দেখতে পেল বুবাই। চুপিচুপি গিয়ে দাঁড়াল সেই কুঁড়ের সামনে। ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে বুবাই প্রায় শিউরে উঠল। ঘরের কোণে একটা নড়বড়ে টেবিলের ওপর মিটমিট করে জ্বলছে একটা তেলের বাতি। তার আবছা আলোয় দেখতে পেল বুবাই, ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে একটা রক্তাক্ত লাশ। তাকে ঘিরে বসে আছে পাঁচ-ছ'জন লোক। প্রত্যেকের হাতেই রিভলভার। সঠিক কিছু বুঝবার আগেই বুবাই শুনতে পেল একজন বলছে, "দিলাম শেষ করে। নইলে ফিরে গিয়ে সব জানিয়ে দিত পুলিশকে।"

"ঠিকই করেছিস। ওকে ছাড়া রুমটেক বৌদ্ধমন্দির থেকে মূর্তিটা সরানো ছিল অসম্ভব।"

"মূর্তিটার কত দাম হবে?"

"দশ লাখ তো বটেই।"

"দশ লাখ!"

"আশ্চর্য হচ্ছিস ? জানিস মূর্তিটা কবেকার? ত্রয়োদশ শতকের তৈরি বিখ্যাত বৌদ্ধমূর্তি, নাম মৈত্রেয়। তিব্বতি শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত। পুরো ব্রোঞ্জের। পৃথিবীর দুর্লভ শিল্পকলার অন্যতম।"

"এই লোকটাকে ম্যানেজ করেছিলে কীভাবে?"

"সে অনেক কথা। প্রায় ছ' মাস ধরে ঘুরেছি ওর পেছন-পেছন। বৌদ্ধমন্দিরের গোপন গুহাপথে ছিল ওর অবাধ যাতায়াত। লামারা সব বিশ্বাস করতেন ওকে।"

"তারপর?"

"একদিন কথায়-কথায় লোকটা আমাকে জানাল, তার লাখ-দুই টাকার দরকার। লাসায় যেতে হবে তাকে। সেখানে কয়েকটা অমূল্য পুঁথির সন্ধান পেয়েছে সে। তখনই বললাম, যে টাকাটার ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যদি মৈত্রের-মূর্তিটা আমার হাতে তুলে দেয়।"

"লোকটা টোপ খেল?"

"না, ঠিক তা নয়।"

"তবে?"

"লোকটা চেয়েছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারতে। টাকাটাও নেবে অথচ মূর্তিটা হাতছাড়া করবে না।"

"কীভাবে?"

"খুব সহজ অঙ্ক। বৌদ্ধদর্শন ও শিল্পসাহিত্য নিয়ে গবেষণার সুবাদে মন্দিরের সবকিছু জানা ছিল তার। বৌদ্ধ পুরোহিতরাও সম্মান করতেন তাকে। মূর্তিটা সরানো তার পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু সে চেয়েছিল চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে। তাই মনে-মনে একটা ফন্দি এঁটেছিল। ঠিক করেছিল, রাতের অন্ধকারে গুহার গোপন পথ দিয়ে মূর্তিটা সরিয়ে এনে আমার হাতে তুলে দেবে। আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়েই গা-ঢাকা দেবে রাতের অন্ধকারে। তারপর রুমটেক থেকে গাড়িতে মূর্তিটা নিয়ে যখন আমি রঙ্‌পোর দিকে রওনা হব, ঠিক তখনই লোকজন নিয়ে ও ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। মূর্তিটা উদ্ধার করে নিয়ে যাবে মন্দিরে। বিনিময়ে মিলবে প্রচুর বখশিশ।"

"তার মানে, লোকটা বেশ মতলববাজ!"

"নিশ্চয়ই! তবে আমার সঙ্গে চালাকি! আমি ওর অভিসন্ধি বুঝতে পারলাম। সঙ্গে-সঙ্গে শিলিগুড়িতে খবর পাঠালাম তোদের কাছে, গাড়ি নিয়ে রাত দুটোয় রুমটেক বাসস্টপে অপেক্ষা করতে।"

"অমাবস্যার রাত। তার ওপর আকাশটা ছিল ঘন মেঘে ঢাকা। সারা রুমটেক জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল গভীর নীরবতা। সারাক্ষণ চলছিল বৃষ্টির টুপটাপ। কালো রঙের রেইন কোট জড়িয়ে আমি অপেক্ষা করছিলাম রুমটেক বৌদ্ধমন্দিরের বাইরের দরজায়। এক সময় লক্ষ করলাম, মন্দিরের পেছন দিক থেকে একটা মৃদু আলো এগিয়ে আসছে এদিকেই। রাস্তার পাশে একটা বড় গাছের আড়ালে আমি গা-ঢাকা দিলাম। লোকটা কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে এগিয়ে গেল নির্দিষ্ট জায়গার দিকে। এই তো সুযোগ! আমি পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। টুঁ শব্দ করবার আগেই ওষুধমাখা রুমাল চেপে ধরলাম ওর মুখে। কয়েক মিনিট। তারপর নিয়ে এলাম ঘাড়ে করে বাসস্টপে। পরের ঘটনা তো সবই তোদের জানা।"

"কিন্তু লোকটাকে ওখানে খতম না করে এখানে করলে কেন?"

"সবাই জানবে, রুমটেক বৌদ্ধ মঠের মৈত্রেয়-মূর্তিটা চুরি করে পালিয়েছে এই লোকটি। ওখানে লাশটা ফেলে রাখলে সবাই ভাবত, বাধা দিতে গিয়ে ও প্রাণ হারিয়েছে। ওর পায়ের জুতোজোড়া এবং নোটবুকটি ফেলে রেখে এসেছি মন্দিরের সামনের পথটায়।

কিছুক্ষণ সবাই কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেল। যেন পরবর্তী কাজের প্রস্তুতি। এর পর কীভাবে চলতে হবে, তা নিয়ে সবাই ভাবিত। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনার পর আবার সেই লোকটিই বলতে শুরু করল, "আজ রাতের মধ্যেই কিন্তু পাচার করতে হবে মূর্তিটা।"

"সব ঠিক করে রেখেছি।"

"শাবাশ! এখন সব কিছু নিখুঁত হওয়া চাই।"

"সে ভাবতে হবে না আপনাকে।" বলল দলের আর-এক পাণ্ডা, "দিনের বেলায় পাহাড়ি পথে গিয়ে দেখে এসেছি সব। চেকপোস্টের সামনে দিয়ে তো আর যাওয়া যাবে না। সিকিম-পুলিশ ওত পেতে বসে আছে।"

"কাল রাতেই পেরিয়ে গেলে হত চেকপোস্টটা।"

"সে আর এখন ভেবে কী হবে? গাড়িটাই সব ভেস্তে দিল।"

"সত্যি, গাড়িটা যে মাঝপথে এখাবে বিগড়ে যাবে, তা ভাবতে পারিনি।"

"এখন আর সেসব ভেবে কী লাভ! কী করতে হবে, তাই বলো।"

"বিপদের আশঙ্কা রয়েছে প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। ভরত বাহাদুরকে আমি সকালেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। চেকপোস্টের ওপাশে শিলিগুড়ির দিকে যে প্রথম মাইলস্টোনটি রয়েছে, তার ধার ঘেঁষে রয়েছে একটা ঝরনা। বেশ ঝোপঝাড় রয়েছে সেখানে। সেখানে গাড়ি নিয়ে ঘুপটি মেরে সে রাত বারোটায় অপেক্ষা করবে তোদের জন্য।"

"তার মানে রাত বারোটার মধ্যে আমাদের পৌঁছতে হবে সেখানে?"

"ঠিক ধরেছিস।"

"মূর্তিটা ভরত বাহাদুরের হাতে তুলে দিলেই তো কাজ শেষ।"

"না, না। তোদের যেতে হবে ভরত বাহাদুরের সঙ্গে ধর্মনগর পর্যন্ত।"

"হ্যাঁ, নেপালের ধর্মনগর। সেখানে থাকবে প্রতাপ রানা। তার হাতে তুলে দিতে হবে মূর্তিটা।"

"কীভাবে চিনব তাকে?"

"ভরত বাহাদুর চেনে। মূর্তিটা তুলে দিয়ে তোরা চলে আসবি শিলিগুড়ির সেই হোটেলটায়। আমি অপেক্ষা করব তোদের জন্য। সেখানেই তোদের বখশিশ মিটিয়ে দেব।"

"তা হলে রওনা হওয়া যাক।"

কথা শেষ হতে-না-হতেই লোকগুলি তৈরী হতে আরম্ভ করল। মাথায় টুপি ও গায়ে কালো রঙের রেইনকোট চাপাল সবাই। হাতে টর্চ। পিঠে ছোট বোঝা।

বুবাই সব দেখেশুনে কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে, দেশের একটা অমূল্য শিল্পসম্পদ বিদেশে পাচার হতে চলেছে। রুখতে হবে এই অপচেষ্টা। কিন্তু কীভাবে? থানায় যাবে? কিন্তু কোন দিকে? মামা নিশ্চয়ই জানেন। মামাকে গিয়েই বলা যাক সব কথা।

পেছন ফিরে সবে দৌড় দিতে যাবে বুবাই, ঠিক এমন সময় কে যেন তার ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। পড়ে গেল বুবাই। তার মনে হচ্ছিল, যেন শরীরের হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে। তাকিয়ে দেখে, এক বিশাল চেহারার তিব্বতি লামা তার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রায় ধমকের সুরে তিনি বলে ওঠেন, "কী করছিলি এখানে?"

বুবাই আমতা-আমতা করতে থাকে। লোকটা আরও গলা চড়িয়ে বলল, "বেশি চালাকি করলে কিন্তু এক্কেবারে শেষ করে দেব।"

"বাড়ি ফিরছিলাম। পথ ভুল করে এদিকে এসে পড়েছি। এখানে নতুন এসেছি

কিনা!”

এর মধ্যে কুঁড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে দু-তিনজন। সবাই বুবাইকে নানা জেরা শুরু করে দিল। বুবাই বুঝতে পারে, চুপ করে থাকলে রক্ষে নেই। যেন কিছুই সে জানে না, এভাবে কথার উত্তর দিতে লাগল। তিব্বতি লামা অন্যদের লক্ষ করে বললেন, “ওকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।”

“ঠিক বলেছেন।”

“হাত-পা-মুখ বেঁধে সঙ্গে নিয়ে চলো। পরে দেখা যাবে কী করা যায়।”

“কিন্তু?”

“কিন্তু কী?”

“এই দুর্গমপাহাড়ি পথে আর-একটা বোঝা বাড়ানো কি ঠিক হবে?’

“তা হলে হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রাখো ঘরে। রাতে বুনো জন্তু-জানোয়ারেরা শেষ করে দিয়ে যাবে। আর যদি না-ও করে, তা হলেও ক্ষতি নেই। সকাল হওয়ার আগেই আমরা পুলিশের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে চলে যাব।”

লোকটার কথা শেষ হতে-না-হতেই সবাই মিলে বুবাইকে ধরে নিয়ে গেল কুঁড়ের ভেতর। তারপর মোটা দড়ি দিয়ে ওর শরীর কষে বাঁধল ওরা। একটা পুরনো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল মুখ। তারপর মূর্তির বাক্সটা নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এদিকে তখন চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে ঘন অন্ধকার। মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়ায় কুঁড়ের ভাঙা দরজা জানলা খড়খড় করে উঠছিল। ভয় আর আশঙ্কায় শিউরে উঠছিল সমস্ত শরীর।

এক সময় সে দেখতে পেল টর্চ জ্বালিয়ে কয়েকজন লোক এগিয়ে আসছে এদিকেই। তবে কি তাকে খতম করার জন্য ওই লোকগুলো ফিরে আসছে? অবশ হয়ে আসছে সব কিছু। কিন্তু না, হঠাৎ সে শুনতে পেল কে যেন ডাকছে তার নাম ধরে। পরিচিত স্বর। মামা উৎকণ্ঠা জড়িয়ে বলছেন তাঁর ভুটিয়া ছেলেটিকে, “কী কুক্ষণেই যে ওকে আসতে লিখেছিলাম এখানে, এখন কিছু ঘটলে কী উত্তর দেব ওর বাবা-মাকে!”

“এত ঘাবড়াবেন না। এখানেই আছে কোথাও।” সান্ত্বনা দিয়ে বলল ভুটিয়া ছেলেটি।

এবার বুবাই সাহস ফিরে পেল। মরিয়া হয়ে মুখের বাঁধনটা একটা বাঁশের সঙ্গে লাগিয়ে হ্যাঁচকা টান মারল। খুলে গেল মুখের বাঁধন। চিৎকার করে সে ডেকে উঠল, “মামা...আ...আ...।”

তার আর্ত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হল বাতাসে। মামা, ভুটিয়া ছেলেটি ও আরও দু’জন প্রায় দৌড়ে এলেন সেখানে। টর্চের আলো ফেলে ঢুকলেন সেই কুঁড়ের মধ্যে। হাত-পায়ের বাঁধন খুলে বুবাইকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে।

বুবাইয়ের কাছ থেকে সব শুনে ভুটিয়া ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন চেকপোস্টের দিকে। বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য রেখে গেলেন কয়েকজনকে।

পরের দিন সকালের জলখাবার খেতে বসেছে বুবাই, এমন সময় একটা জিপ এসে থামল বাড়ির সামনে। সিকিম পুলিশের ইউনির্ফম পরা একজন মামাকে এসে বললেন, “আপনার ভাগ্নেকে নিয়ে একবার চলুন আমার সঙ্গে। বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন।”

"কেন, কিছু হয়েছে নাকি'?'

"চলুন না। সব দেখতে পাবেন।"

বুবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে তৈরি হয়ে নিল। মামা ও বুবাই গিয়ে বসল জিপে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপ এসে থামল চেকপোস্টে। ঘরে ঢুকতেই বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই আপনার ভাগ্নে বুবাই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

এবার বুবাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দ্যাখো তো বুবাই, এদের চিনতে পারো কি না!"

"হ্যাঁ, ওই তো কাল রাতের সেই লোকগুলো!"

"এই বাক্সটা?"

"ওর মধ্যে রয়েছে মূর্তিটা। কিন্তু আসল লোকটা কোথায়?"

"শিলিগুড়ির কোনও হোটেলে আছে। ভয় নেই, ঠিক ধরা পড়বে। তার নামধাম সব জানা হয়ে গেছে। লোকটা এক নম্বরের ক্রিমিনাল।"

সামনের টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। বড়বাবু কার সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠল একটা তৃপ্তির হাসি। ফোনটা নামিয়ে রেখে বললেন, "ধরা পড়েছে। সন্ধ্যের দিকে আবার একটু বিরক্ত করব তোমাকে। দেখে যেয়ো লোকটাকে।"

কিছুক্ষণ সেখানে থেকে তারা বাড়ির পথে পা বাড়াল। মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ তখন ছড়িয়ে পড়েছে রঙপোর পাহাড়ে। এত বড় একটা পাচারকারি দলকে ধরতে তার অবদানও যে কম নয়, এ-কথা ভাবতে গিয়ে একটা অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করল বুবাই।

pathagar.net

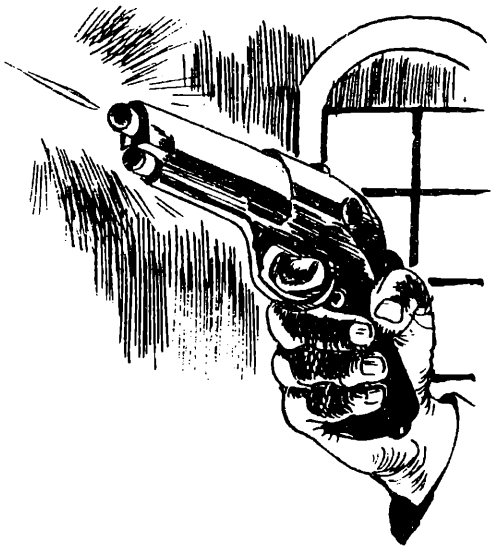

একটি টিকিটের সূত্রে

শিবায়ন ঘোষ

pathagar.net

শেষ পর্যন্ত রবি পুলিশে চাকরি পেল। অথচ চাকরির আগে পর্যন্ত ও বলত, "পুলিশের চাকরিতে আমি নেই, ভাই। দরকার হলে কালুমুদির দোকানের দাঁড়িপাল্লায় বসে তেল, নুন, ডাল, পোস্ত, চিনি মাপতেও রাজি আছি।"

এই বাল্যবন্ধুটার স্বভাবচরিত্র আমাদের আদ্যোপান্ত জানা। একে খুব নরম মনের ছেলে, মজবুত শরীর-স্বাস্থ্য নিয়েও কেমন যেন কুঁকড়ে থাকে, তার ওপর ওর বাবা স্কুলের শিক্ষক। কাজেই ওর স্বপ্ন থাকতেই পারে, অধ্যাপনা করার। অথচ হল উলটো। দেখা গেল, এক ঝকঝকে শরতের সকালে রবি হুট করে কলকাতায় চলল পুলিশের চাকরি করতে।

আমরা তো, যাকে বলে, একদম হাঁ হয়ে গেলাম।

বছর ছয়েক পরে ফিরে এসে রবি অন্যরকম ভাষায় বলতে শুরু করল, "আসলে কী জানিস, বাঁচার জন্যে একটা কিছু তো করতে হবেই, একটু তো লেখাপড়া শিখেছি। নিছক কালুমুদির দোকানে তো আর বসতে পারি না, তাই।"

আমরা মজা করে বলতাম, "শেষে না আবার খুন দেখে মূর্ছা যাস, দেখিস। তুই তো আবার ভয় পেয়ে কুঁকড়ে কেন্নো হয়ে যাস।"

কথাটা বোধ হয় রবির গায়ে লাগল। ও বলল, "এখন আর আমি আগের রবি নেই। যে চাকরির যা শর্ত। আসলে আমাদের ট্রেনিংটা বড্ড কড়া। সাধারণ লোককেও পুলিশ করে দেয়। আর তা ছাড়া, খাকি পোশাকটার একটা মন্ত্রশক্তি আছে।"

"গায়ে চড়ালেই মেজাজ চড়ে, তাই না?"

বড় ভাল বলল কথাটা শিশির।

নৌকোর পাটাতনে বসে প্রতিদিনের মতো বিকেলের আড্ডা চলছিল আমাদের সবাই তো গ্রামছুট। পুজোর ছুটিতে এই যা কয়েকদিনের জন্য বন্ধুদের দেখাসাক্ষাৎ। তাও পুজোর ছুটির অনেক আগে থেকে বন্ধুদের মধ্যে চিঠি-চালাচালি হয়। শেষ অবধি দেখা যায় তবুও দু-একজন এসে পৌঁছয় না। যেমন, এবারে অনিমেষ এল না। গত বছর আমিও আসিনি।

তো পুজোয় এসে যে ক'দিন থাকি আমরা, রোজ বিকেলটা এই নদীর ধারে ছিপ নৌকোগুলির ওপরে বসে গল্পে-গানে কাটাই। সুখ, দুঃখ, চাকরিবাকরি নিয়ে কথাবার্তা হয়।

একমাত্র রবি ছাড়া আমরা বিশাল কেরানিকুলের এক-একজন। সেদিক থেকে আমাদের চোখে ওর চাকরির একটা আলাদা মেজাজ, তেজ, গাম্ভীর্য ও রহস্য আছে।

কথাটা আমিই তুললাম। বললাম, "আচ্ছা রবি, তোদের চাকরিতে তো অনেক রহস্য, রোমাঞ্চ, খুন, রাহাজানি, লুটতরাজ, ডাকাতি আছে?"

রবি চট করে কথাটা গায়ে মেখে নিয়ে বলল, "অনেক, অনেক। শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবি। এখন চাকরিটায় আমি বেশ মজা পাই। এমন এক-একটা ঘটনা ঘটে, শুনলে তোদের দমবন্ধ হয়ে যাবে। এই তো কয়েকদিন আগেই একটা অদ্ভুত খুনের তদন্ত করলাম।"

রবিকে এতক্ষণে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরে আমি নিজেকে নিজেই বাহবা দিচ্ছি। শিশির গল্পের গন্ধ পেয়ে চোখ নাচাল। পরিতোষ ও গৌতম টানটান হয়ে উঠে বসল।

"উঁহু, কাগজে লেখে বটে একটু আধটু—"

সেই মুখফোঁড় শিশির। আমার হাতের কড়া একটা চিমটি খেয়ে বলল, "দুঃখিত! সরি ফর ইন্টারাপশন।"

গৌতম উৎসাহ দিতে রবি বলল, "পুলিশ পারে না এমন কাজ নেই। হঠাৎ একটা তদন্তের ভার মাথায় চেপে বসলে প্রথমে একটু বিরক্তির বোঝা মনে হয়, কিন্তু এগোতে-এগোতে যখন অদ্ভুত একটা কিনারা পাওয়া যায়, তখন যে কত আনন্দ! শোন, আমার এই ছোট্ট চাকরি জীবনের সেরা একটা তদন্তের কথা বলি।

"এটা ধর অক্টোবর, সেটা হচ্ছে চোদ্দই আগস্ট। সারারাত ডিউটি করে ক্লান্ত, চোখ টেনে আসছে ঘুমে। থানায় ফিরে ভাবছি, কোয়ার্টারে গিয়ে স্নানটান করে একপ্রস্থ নাক ডাকিয়ে ঘুম দেব। ঠিক এমনই সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

"রিসিভার কানে দিয়ে চমকে উঠলাম।

"হ্যালো? হ্যাঁ, কী বলছেন? বুবু সেন? বুবু সেন খুন হয়েছেন? আশ্চর্য? কী নাম বললেন? হ্যাঁ, আপনার নাম? হ্যাঁ, ক্ষুর দিয়ে কাটা মনে হচ্ছে?'

"নামটা বলল না।

"চটপট বেরোতে হল। দু'জন কনস্টেবল নিয়ে জিপ ছুটল বুবু সেনের বাড়ি। কাছেই। ভাল কথা, বুবু সেন সম্বন্ধে তোদের দু-চার কথা বলা দরকার।

"বুবু সেন হচ্ছেন ওখানকার নামী ক্লাবের সেক্রেটারি, তার ওপর অত্যন্ত প্রভাবশালী যুবক। বুঝতেই পারছিস, কী কঠিন দায়িত্ব এসে পড়ল হুড়মুড় করে কাঁধের ওপরে। আমি ঠিক তাল পাচ্ছি না।"

পরিতোষের মধ্যে চাঞ্চল্য, পরের রহস্যের জন্য। গল্পের গন্ধ পেয়ে শিশির, গৌতম নড়েচড়ে বসল, আর আমি তো বলতে গেলে উদ্যোক্তা। বললাম, "তারপর?"

"হুঁ, তারপরটাই আসল।"

বলে, রবি যেন এই এখনই তদন্তে এসেছে এমনভাবে বলল, "বুবু সেনের ঘরের বাইরে অনেক লোক। কলেজ, স্কুলের ছেলেমেয়েরাও ভিড় করে আছে। জোর স্লোগান চলছে, 'বুবু সেনের খুনি। পাকড়াও এক্ষুণি' ইত্যাদি।

"এই সময় পুলিশের নুয়ে পড়লে চলে না। আমি বেশ কঠিন হয়ে আছি। ভিড় কাটিয়ে ঘরে ঢুকলাম। মেঝেতে পড়ে আছেন বুবু সেন। উপুড় হয়ে, গায়ে কোনও জামা নেই, পরনে পাজামা। হাত দুটি দু' দিকে ছড়ানো। আমার নির্দেশে এক কনস্টেবল দেহটা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে চিত করে দিতেই, বুকটা, কী বলব, ছ্যাঁত করে উঠল। ভীষণ, মর্মন্তুদ দৃশ্য। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। জমাট বেঁধে গেছে রক্ত। ইঞ্চি আটেক তো হবেই। ধারালো ছুরি দিয়ে আড়াআড়ি পেটের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চিরে দিয়েছে। কী নির্মম! মুখে বাঁধা বুবু সেনের পাশবালিশের ওয়াড়। বোঝা যায়, ছুরি মারার পরেও খুনি ওর ওপর প্রাণপণ শক্তিতে চেপে বসে ছিল, তেমন নড়াচড়া করতে দেয়নি। নইলে রক্তটা মেঝেতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। কাজ শেষ করে তবেই খুনি পালিয়েছে।

"বলিসনি, বলিসনি, আমার কেমন বমি-বমি পাচ্ছে, রক্ত আমি একদম চোখে দেখতে পারি না।"

গৌতম কথাটা বলামাত্র, পরিতোষ কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, "উঠে যা, তোর থেকে কাজ নেই। তবু তো গল্প শুনছিস, সত্যি-সত্যি হলে যে কী করতিস!"

খোঁচা খেয়ে গৌতম চুপ করে গেল।

রবি বলতে শুরু করল, "অর্থাৎ, একটা ব্যাপার নিয়ে আমাদের সন্দেহ রইল না। এটা বোঝা গেল যে, পরিষ্কার একটা খুন, এটা কোনও আত্মহত্যা নয়। তারপর তো যা হয়ে থাকে। ফরেনসিক রিপোর্টের জন্যে অনেক কিছু নেওয়া হল। লাশটা পাঠানো হল মর্গে। মর্গের গুমোটে মর্গের আর কী!"

রবির মধ্যে এখনও কবিতার চোরা ঢেউটা একটু-আধটু আছে, তা বোঝা গেল!

রবি খুব বেশি কফি খায় এখন। বোধ হয় টেনশনে থাকলেই বেশি খায়। ও কফির

কাপে চুমুক দিয়ে বলল, “শেষে মুশকিল হল তদন্তে। কোনওভাবেই খুনের কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। ওপর থেকে বারবার ফোন আসছে তদন্তের ফলাফল জানতে চেয়ে। আর ওখানকার আর-এক যুবক পলু মিত্তিরের নেতৃত্বে প্রায় রোজ রুটিনমাফিক থানা ঘেরাও হচ্ছে, বুবু সেনের হত্যাকারীকে ধরার জন্যে চাপ দিয়ে। চিন্তা কর, পুলিশের চাকরির কী সাঙঘাতিক হ্যাপা!”

বর্ষায় তখন নদীতে ইলিশ ধরা চলছে। আমাদের খুব কাছেই ইলিশের জালে অনেক ইলিশ আটকেছে দেখে, শিশির বলল, “দ্যাখ, দ্যাখ, কী সুন্দর সব ইলিশ, আঃ, ডিম আর তেল খেতে যা লাগবে না?”

শিশির কথার মধ্যে বড্ড কথা বলে। একটা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে, ও হঠাৎ করে আর-একটা প্রসঙ্গ এনে মূল সুরটাই কেটে দেয়।

রবিও হয়েছে তেমন! কোথায় হবে বাংলার অধ্যাপক, হয়ে বসল পুলিশ। সেও শিশিরের কথায় তাল দিয়ে বলল, “জলের রুপোলি আকাঙ্ক্ষা।”

আমি আর পরিতোষ আবার রবিকে কবিতার ভাবরাজ্য থেকে তদন্তের রাজ্যে টেনে আনলাম।

আমি বললাম, “তারপর কী হল, সেইটে বল। শেষপর্যন্ত ধরতে পারলি?”

“না ধরে উপায় আছে? তবে ভাগ্যের জোরে।”

“তোরা ভাগ্যটাগ্য মানিস?”

এটি পরিতোষের গলা। গলাটা আমারও হতে পারত। আসলে রবি একটু নাস্তিক গোছের। বন্ধুরা মজা করে বলি ‘হাফ-নাস্তিক’ ‘ওয়ান-থার্ড আস্তিক’—এইরকম। এমনিতে ভূত, ভগবান, ভাগ্য-ভবিষ্যৎ সেরকম মানে না, কিন্তু ঘোরতর বিপদে পড়লে বা আশঙ্কা করলে চুপিচুপি মন্দিরে গিয়ে গড় হয়ে আসে। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে শ্বেতবেড়েলার মূল-শেকড় ডান হাতের অনামিকায় পরে নেয়। স্বভাবতই যে বন্ধুর নাড়ি-নক্ষত্র আমাদের জানা আছে, তার সম্বন্ধে এরকম প্রশ্ন করা যেতেই পারে।

রবি কথাটার পাশ কাটাল। বলল, “ভাগ্য মানে ঠিক তোরা যে-ভাগ্য ভাবছিস, সেরকম নয়। তোদের বোঝার সুবিধে হবে বলে ভাগ্য কথাটা ব্যবহার করলাম।”

বলে, বেশ উত্তর দিতে পারা গেছে ভেবে নিজে একটু মুচকি-মুচকি হেসে নিল। এবং তারপর বলতে শুরু করল বাকি ঘটনাটা ঃ

অনেক খুনের ঘটনা পড়েছি বটে, কিন্তু এটি হচ্ছে একদম নতুন।

বুবু সেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল পলু মিত্তির। বুবু সেন সেক্রেটারি, তো পলু মিত্তির ক্যাশিয়ার। একজনকে ছাড়া অন্যের চলে না। দু'জনেই বেকার। দু'জনের মধ্যেই অদ্ভুত বনিবনা। বললে কিংবদন্তী মনে হবে।

দু'জনে হঠাৎ কী খেয়ালে লটারির টিকিট কাটল। কথা রইল, যার টিকিটেই লাগুক, দু'জনে আধাআধি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবে।

বিড়ালের ভাগ্যেও শিকে তো ছেঁড়ে, অতীতে তখনও নিশ্চয়ই ছিঁড়েছিল, অন্তত একবারও নইলে কথাটা চালু হত না। তো সেরকম কাকতলীয় ভাবে দেখা গেল, পলু মিত্তিরের টিকিটে লটারির প্রথম পুরস্কার পাঁচ লাখ টাকা লেগে গেল। ট্যাক্স ফ্যাক্স বাদ

দিয়েও লাখতিনেক থাকবে। অর্থাৎ পলু দেড় লাখ, বুবু সেন দেড় লাখ।

কী আনন্দ তখন দু'জনের। এতদিনের দীর্ঘ বেকারত্ব ঘুচল। দিনে অন্তত বার দশ-বারো শলাপরামর্শ হচ্ছে, কী করবে টাকা দিয়ে! পলু মিত্তির প্রস্তাব দিল, "স্রেফ ব্যবসা! ভাবছি, শিলিগুড়ির দিকে একটা কাপড়ের দোকান খুলব, পাইকারি। ওখানে আমার বড় মেসো থাকে। দোকান-টোকান পাওয়া কঠিন হবে না।"

"এই কয়টা টাকায় পাইকারি ব্যবসা? তোর মাথা খারাপ?"

বুবু সেন উৎসাহ দিচ্ছে না।

"আরে বাবা, মাথা আমার খুব সাফ। তিন লাখ টাকা মূলধন হিসেবে লগ্নি করলে, বড়বাজারে এমন ব্যবসায়ী আছে, তোকে দশ লাখ টাকার কাপড় দেবে। তিন লাখ ক্যাশ থাকলেও, আরও সাত লাখ বিশ্বাস কেনা যায়?"

চোখেমুখে আনন্দ ফুটে উঠল বুবু সেনের। বলল, "বেশ তো, তুই কাল-পরশুর মধ্যে শিলিগুড়ি রওনা হয়ে যা, আমি বড়বাজারে যোগাযোগ করছি।"

যেদিন এ-কথা হল, তার দিন দুয়েকের মধ্যেই খুন হয়ে গেলেন বুবু সেন, অর্থাৎ ওদের দুই প্রাণের বন্ধুর স্বপ্ন সত্যি হল না।

এমনকী কাজটা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল পর্যন্ত। নিউজলপাউগুড়ি রেল স্টেশনের পোস্ট অফিসের সিলমোহর নিয়ে বুবু সেনের নামে চিঠিও এল। তাতে লেখা ঃ

প্রিয় বুবু,

তোর কথামতো শিলিগুড়ির এদিকে এসে একটা ভাল দোকানের খোঁজ পেয়েছি, বড় মেসো খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। দোকানটা চলবে বলেই বিশ্বাস। তুই কথাবার্তা বলে পাকা ব্যবস্থা করে রাখিস। আমি দু-একদিনের মধ্যেই ফিরছি। ভাল থাকিস। ব্যস্ত আছি। শুভেচ্ছা।

পুলিশ যে পুলিশ, সেও আফসোস করল চিঠিটা পেয়ে। ইস্, দুটো বন্ধুর এত সুন্দর একটা স্বপ্ন এভাবে মাটি হয়ে গেল!

বাকি কথা শোনা যাক রবির নিজের মুখে, নিজের ভাষায়।

"আমি তখন উঠেপড়ে লেগেছি। ঘুম নেই, খাওয়া নেই। আর-সব ফাইল একপাশে করে বুবু সেনের কেস নিয়ে সময় কাটছে। একটাই প্রশ্ন। কে খুন করল? কে আততায়ী? উদ্দেশ্যই বা কী? বিশেষ করে পৃথিবীতে যার এখনও ভালমতো শত্রু তৈরি হওয়ার বয়স হয়নি?

"সঞ্জয় বসুকে ধরে আনা হল। গত বছর ক্লাবের নির্বাচনে বুবু সেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এ-বছর নির্বাচনের আগেই তাঁর পথের কাঁটা সাফ করতে তাঁর ছোরা নিয়ে ফুঁসে উঠতেই পারে।

"কিন্তু লাভ হল না। সঞ্জয় বসু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, 'এসব ভুল সন্দেহ দারোগাবাবু, হাজার হোক, বুবু তো আমারও বন্ধু, ক্লাস নাইন পর্যন্ত একই স্কুলে পড়েছি। ভেতরে আমাদের কখনও অমিল নেই। ওর জন্ডিস হলে আমিই ওর বিছানার কাছে রাত কাটিয়েছি।"

"টেলিফোন করেছিলেন কেন?"

"কাকে দারোগাবাবু?"

"চোপ! গলা চিনতে পারিনি ভাবছেন?"

"আমি টেলিফোন করিনি! নেভার। টেলিফোন--টেলিফোন--এসব কী বলছেন?"

"সঞ্জয় বসু প্রায় কেঁদেই ফেললেন। ছলছল চোখ, কাঁদো-কাঁদো মুখ। এমনকী, বুবু সেনের মা এবং বাবাও একযোগে জানালেন, 'সঞ্জু আমাদের ছেলের মতন, একে অপদস্থ করবেন না।"

"বেশ, আপনার কাকে সন্দেহ হয়?"

সঞ্জয় বসু চুপ করে থাকলেন।

"বলুন শিগগির?"

"কাউকেই না।" সঞ্জয় বসু খুব স্পষ্ট করে উত্তর দিলেন।

"মাথায় অবশ্য আমাদের অনেক নাম ছিল। তাদের প্রত্যেককেই জেরা করা হল। বিশেষ করে, নটরাজ টোবাকো ফ্যাক্টরির মালিক নিত্যগোপাল পালকে পাকড়ে আনা হল। লোকটার নাকি অনেক কাঁচা টাকা আছে। লোকমুখে প্রকাশ, পলু মিত্তির টিকিটে টাকা পাওয়ার পর কালো টাকাটাকে কিনতে চেয়েছিল। পলু রাজি ছিল, কিন্তু বুবু সেন আদর্শের প্রশ্ন তুলে নাকচ করে দেয়। তার পক্ষে রাগবশত কিছু করে থাকা সম্ভব।

"কিন্তু সেটিও মিস-ফায়ার। সেও শোনামাত্র ভয়ে যাকে বলে হকচকিয়ে গেল। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, 'এ অধমের কাজ আমাকে দিয়ে হতে পারবে না দারোগাবাবু। বুবু সেন আমাকে যে কাকাবাবু বলে ডাকত!'

অর্থাৎ সুবিধে হল না।

ইতিমধ্যে ফরেনসিক রিপোর্ট এল, জানা কথা, কী থাকতে পারে। চেনা পরিচিত কারও সম্বন্ধে কোনও হদিস মিলছে না।

"চোখে তখন আমার ঘুম নেই। রাতগুলি কাটছে যেন দিন।

"হঠাৎ একদিন দুপুরের পর, মানে খুনের দিন ছয়েকের মাথায় জেল সদর থেকে খবর এল, শিলিগুড়ি থেকে নাকি রেডিয়োগ্রামে বার্তা এসেছে, পলু মিত্তির সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে। প্রয়োজনে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হল, ওর বাড়ি সার্চ করতে।

"দ্যাখ, ঘটনা কোনদিকে গড়ায়। সার্চ করা হল প্রায় তখনই। কিন্তু কিছু নেই। নো ক্লু!"

"কিন্তু পলু মিত্তিরকে সার্চ করা হল কী ব্যাপারে?"

শিশির উৎসাহিত, আমিও। আমরা সবাই।

রবি রহস্য খেলিয়ে বলল, "আছে, আছে। রিজন হ্যাজ।"

বলেই ফের জানাল, "প্রথমেই যা করলাম, শুনলে অবাক হয়ে যাবি? হঠাৎ আমার মাথায় একটা খটকা লাগল। তখুনিই শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। জানালাম, 'হ্যালো, সার্চ তো বিফল হয়ে গেল। নো রেজাল্ট। আমাকে নিশিকান্তের ঠিকানাটা দিন।'

"লিখুন, কেয়ার অব সম্রাট সেলুন।'

"সম্রাট সেলুন?'

"ভাল শোনা যাচ্ছিল না, আমি আবার প্রশ্ন করলাম। 'সেলুন? মানে..."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চুল-দাড়ি কাটে যে সেলুনে!"

"ও-প্রান্তের উত্তর পাওয়ার পর, বাকি আর কিছু শুনিনি পর্যন্ত। সঙ্গে-সঙ্গে একাই জিপ হাঁকড়ে হাজির হলাম সম্রাট সেলুনে। নিশিকান্ত ধাড়া ওখানকার বয়স্ক কর্মচারী। কথামতো মেয়ের বিয়ের পাত্র দেখতে দিন কয়েক ছুটি নিয়ে মুর্শিদাবাদ গেছে।

"সেলুনের মালিককে জেরা করলাম। বললাম, 'বলতে পারেন, নিশিকান্ত ক'টা ক্ষুর ব্যবহার করত?'

"সেলুনের মালিক চোখ বড় করে বলল, 'দাঁড়ান দারোগাবাবু, এক মিনিট।'

"বলে, সেলুনের মালিক নয়ন পাত্র ডাক দিল, 'মদনা আছিস? হেই মদনা?'

"রোগামতো কমবয়সী একটা ছেলে এসে ভয়ে-ভয়ে নমস্কার করে দাঁড়াল।

"আমাকে কিছুই বলতে হল না, নয়ন পাত্রই বলল, 'নিশিকান্তর ক'টা ক্ষুর পাওয়া যাচ্ছে না?'

"নতুনটা।'

"আমি উঠছি নয়নবাবু। একটু কষ্ট দিলাম। পরে আপনাকে দরকার হতে পারে, আর হ্যাঁ, ওই ছেলেটিকে থাকতে বলবেন।'

"তা হলে তুই বলছিস, খুনটা নিশিকান্তই করেছে?'

"হান্ড্রেড পারসেন্ট। তোদের বোধহয় মনে আছে, প্রথম যখন টেলিফোনে বুবু সেনের খুনের খবর পাই, তখন ও-প্রান্তের লোকটি 'ক্ষুর দিয়ে কাটা হয়েছে' বলে সন্দেহ করেছিল।"

"হুঁ, তাই তো।"

গৌতম এককক্ষণে একটা কথা বলল।

পরিতোষ মজা করল, "বোবা কথা বলছে, আহা রে!"

শিশির পরিতোষকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "কিন্তু নিশিকান্ত যে খুন হয়েছে, কারণ কী?"

"দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব বঙ্গে। বলছি, অধৈর্য হোয়ো না।

"নিউজলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে সেদিন টিকিটের জোর চেকিং হচ্ছে দুর্নীতির নানা অভিযোগে।

"চেকারের হাতে টিকিট দিয়ে প্রায় গেট পেরিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সম্রাট সেলুনের বয়স্ক কর্মচারী নিশিকান্ত ধাড়া, চেকার খপ করে ওর হাত পাকড়ে ধরল। শুধু তাই নয়, সোজা শ্রীঘরে। টিকিটে বয়স লেখা ছাব্বিশ অথচ নিশিকান্তের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

"জেরার উত্তরে ফাঁস করে দেয়, সে আসলে পলু মিত্তিরের কাছ থেকে টিকিটটা নিয়েছিল।

"শিলিগুড়ি পুলিশের তখন আনন্দ অনেক। এই বুঝি জাল টিকিট-চক্রের খোঁজ পেয়েছে তারা। আর তখনই তো জেলা সদরে রেডিয়োগ্রামে খবর পাঠিয়ে পলু

pathagar.net

মিত্তিরের বাড়ি রেইড করতে বলল।"

রবি একটু থামতেই আমরা চারজন প্রায় সমস্বরে বললাম, "তারপর কী হল? খুনটা কে করেছে? পলু মিত্তির, না নিশিকান্ত?"

"ধীরে বৎস, ধীরে।"

একটু থেমে বলল রবি, "পলু মিত্তিরও তো প্রভাবশালী। তাকে গ্রেফতার করতে হলে পুলিশের নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। টিকিটটা একটা বড় সূত্র, কিন্তু একমাত্র নয়।"

"কেন, কেন?"

"পলু মিত্তির যে চিঠিটা লিখেছে শিলিগুড়ি থেকে। সেটিও একটা রেলেভেন্ট ডকুমেন্ট। একজন লোক মেটেরিয়াল টাইমে এখানে এবং শিলিগুড়িতে তো আর থাকতে পারে না। .

সবাই আমরা হকচকিয়ে গেলাম, তাও তো বটে! এটা একটা কথা।

শেষে রবিই বলল, "তো হ্যাঁ, পালটা রেডিয়োগ্রাম করে শিলিগুড়িতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পলু মিত্তিরের মেসোর সঙ্গে পলু মিত্তিরের দেখাই হয়নি। অর্থাৎ পলু মিত্তির কাছাকাছি কোথাও আত্মগোপন করে ছিল।

"আমি তখন সময় নষ্ট না করে, একদম বুকের কাছে রিভলভার তাক করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, "হুঁ, এতদিনে একজন আসল বন্ধু চেনা গেল।

"পলু মিত্তিরও খুব জনপ্রিয়। সেও অনেক লোককে ঘোল খাইয়েছে এ-পর্যন্ত। একটুও দমে গেল না, বাজের শব্দ বলে বোমার শব্দ উড়িয়ে দিতে পারে। পালটা ধমক দিয়ে বলল, 'এটা অন্যায়, নিছক সন্দেহবশত কাউকে গ্রেফতার করার অর্থ তার সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। নো মিস্টার দারোগা, কোর্টে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ফিরে এলে, ফলটা টের পাবেন।"

"ইয়েস, আই নো দ্যাট। আপাতত...।'

"রিভলভার তেমনই তাক করা, আমি চোখের মুদ্রায় জিপটা দেখালাম।"

"সত্যি চমকপ্রদ ব্যাপার।"

আবার সেই শিশিরের মন্তব্য। পরিতোষ ওকে একটু ধমকের সুরে বলল, "ফুট কাটবি না।"

রবি বেশ পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলল, "আরও কী আশ্চর্য দ্যাখ, নিশিকান্তকে সার্চ করে যা-যা পাওয়া গেল, তার তালিকাও করা হল। পুলিশ ওকে ডাকাতও ভেবেছিল।"

আমাদের প্রশ্ন করার আগেই বলল, "ঝকঝকে তাজা কারখানার মধ্যে ভরপুর প্রায় হাজার চব্বিশ টাকা পাওয়া গেল নিশিকান্তের কাছ থেকে।"

"রিয়েলি?"

এবার কিন্তু আমিই বলে ফেললাম।

"কোথাকার টাকা জানিস?"

"ব্যাঙ্ক-ডাকাতির?"

"সত্যি? তোরা হতাশ করলি, তোরা ওই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, লসাগু, গসাগু করগে যা। একটুও যদি খুপরিতে কিছু থাকে?"

রবি কার্যত আমাদের সবাইকে টাকার পাল্লায় ওজন করে ফেলল। তারপর বলল, "লটারির টাকা। পলু মিত্তিরের টাকার সিরিয়াল নম্বর আর নিশিকান্তের কাছে পাওয়া টাকার সিরিয়াল নম্বর ক্রম-অনুযায়ী। ব্যস, গ্রেট সাকসেস। পুলিশকে বোকা বানানোর জন্যে নিজের নামের টিকিটটা দিয়ে নিশিকান্তের মতো গবেটকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়েছে, আবার একটা চিঠিও লিখে দিয়েছে বুবু সেনের নামে। বেচারা নিশিকান্ত! কথামতো ট্রেন থেকে নেমেই চিঠিটা পোস্টও করেছিল, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে বিপদ ঘটাল।"

"তুই হলে কী করতিস?"

শিশির নয়, এবারে মৌনমুখর সেই গৌতম বলল।

"আমি হলে টিকিট না দিয়ে অন্য একটা ট্রেনে চেপে ঘুরে বেড়াতাম, পকেটে টাকা আছেই। কোনও এক কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার গিয়ে নামতাম।"

"চমৎকার ফন্দি করেছিল, যা হোক!"

"হুঁ, উদ্ভাবনী ক্ষমতা বটে! ভাল পথে লাগালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেত!"

যথাক্রমে শিশিরের এবং আমার কথা দুটোকে টেনে নিয়ে রবি বলল, "এমনি-এমনি কি আর হয়? গাড্ডায় পড়লে হয়। তখন মগজের কোষগুলো বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। আবার কী জানিস, কয়েকদিন আগে পলু মিত্তির বেশ আচ্ছা করে বাবু-ছাঁট দিয়ে এসেছে চুলে। কেটেছে ওই নিশিকান্ত বেচারার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, হাজার হোক বাবা তো!"

নদীর জল ভাটার টানে অনেক নীচে নেমে গেছে। নৌকো আটকে গেছে পলিতে। চাঁদের হালকা আলো পড়েছে জলে। এখন ডাঙায় উঠতে আমাদের চটিজুতো হাতে নিতে হবে।

যে-যার মতন পাড়ে উঠেছি, পরিতোষ প্রশ্ন করল, "সত্যি, এখন বল, চাকরিটা কেমন লাগছে?"

"ভেরি থ্রিলিং। কালকে আর-একটা ঘটনা বলব, সেটাও প্রায় এরই কাছাকাছি জটিল। পুলিশে ঢুকে এখন বুঝছি, এ-চাকরিতে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। একজন ক্রিমিন্যালের সন্ধান পেলে যে কেমন আনন্দ হয়, কী বলব? এখন তো আমি কোনও কঠিন তদন্ত পেলে খুব খুশি হই, বেশ খোরাক হয়। আগ বাড়িয়ে টেনে নিই হাতে। চাকরি বলিস, জীবন বলিস, চ্যালেঞ্জ, শুধু চ্যালেঞ্জ।"

আমার প্রথম মক্কেল

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আমার নাম উদ্দালক প্রধান। পরিচিত মহলে সবাই আমাকে ইউ পি বলে ডাকে। আমার বয়স এখন ত্রিশ। গত পাঁচ বছর ধরে বহু চেষ্টা করেও যখন মনের মতো চাকরি যোগাড় করতে পারলাম না, তখন আমি 'ইনভেস্টিগেশন গ্রুপ' নামে এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিটি খুলে বসলাম।

প্রশ্ন করতে পারেন এত কাজ থাকতে ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলতে গেলাম কেন? আমি ছোটবেলা থেকে একটু ডাকাবুকো প্রকৃতির। নিয়মিত ব্যায়াম করি। ক্যারাটে জানি। ভালো ফুটবল খেলি। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় স্পোর্টসে অনেক প্রাইজ পেয়েছি। সরকারি চাকরি করবো না ঠিক করেছিলাম। শেষে ঠিক করলাম স্বাধীনভাবে কিছু করবো। যাতে যথেষ্ট বুদ্ধি লাগে। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিল। শেষে আমার বোন ঋতু বলল, দাদা, একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলবি?

আমার তখনও পর্যন্ত খুব একটা আত্মবিশ্বাস ছিল না। গোয়েন্দা উপন্যাসে পড়ি শখের গোয়েন্দাদের নানা কথা। তারা কত সহজে স্রেফ বুদ্ধি খাটিয়ে কত রহস্যের জট

ছাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বাস্তব জগতে কি সত্যি এমন ঘটে! আমি শুনেছি প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি যারা চালায় তারা সবাই পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। আমার তো কোনো ট্রেনিংই নেই। কে আমায় কাজ দেবে?

কিন্তু ঋতু বলল, একবার লাক ট্রাই কর না দাদা। কাজ করতে করতেই অভিজ্ঞতা হবে। বাবাকে বলে বাইরের ঘরটা সাজিয়ে নে। ফোন তো রয়েছেই।

কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে পিস্তলের লাইসেন্স নিতে হবে। একটা পিস্তলের দাম কত জানিস? পনের-বিশ হাজার টাকা—

ঋতু ছাড়ার পাত্রী নয়। সে বলল, পিস্তল ছাড়াও গোয়েন্দাগিরি হয় দাদা। পিস্তলের চেয়ে যেটি আরও দরকারী সেটি সাহস ও বুদ্ধি ; সেটা তোর আছে তুই দুর্গা বলে নেমে পড় তো।

আমি বললাম, তোকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে হবে কিন্তু।

ঋতু বলল, ওরে বাবা, ওসব আমি পারব না। আমি বাড়ি বসে তোকে বড়জোর বুদ্ধি দিতে পারি।

এর দিন কয়েক পরেই আমি আনন্দবাজার ও স্টেটসম্যানে একটি বিজ্ঞাপন দিলাম। আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপনটি এই ঃ

আপনার যে কোনো সঙ্কটে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
দ্য ইনভেস্টিগেশন গ্রুপ
উদ্দালক প্রধান (ইউ. পি.)
প্রাইভেট ডিটেকটিভ।
১৯, বালিগঞ্জ টেরাস
কলকাতা ৭০০ ০১৯।
নিচে টেলিফোন নম্বর।

pathagar.net

বিজ্ঞাপনটি বেরুল এক রবিবার। তারপর থেকে আমি ও ঋতু উত্তেজনায় টান টান হয়ে টেলিফোনের সামনে বসে আছি। রবিবার সারাদিন গেল, সোমবার গেল, মঙ্গলবার গেল, একটা ফোনও এল না।

বাবা ঠাট্টা করে বললেন, ঘাবড়াস না যখন কলকাতা পুলিশ হাল ছেড়ে দেবে তখন মক্কেলরা তোর কাছে আসবে।

সত্যি সত্যি বোধহয় তাই হলো। বুধবার সকাল আটটা নাগাদ বিছানায় শুয়ে শুয়ে যোগব্যায়াম করছি, ঋতু কর্ডলেস ফোনটা আমার কাছে নিয়ে এসে বলল, দাদা ফোন—

কে? কে ফোন করেছে? আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

ঋতু ফোনের স্পিকারটা এক হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, বোধ হয় তোর প্রথম মক্কেল।

।। দুই ।।

আমি হ্যালো বলতেই ওপার থেকে আওয়াজ ভেসে এল, আমি কি মিঃ ইউ পি-এর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

আমি ইউ পি বলছি।

সুপ্রভাত। আমার নাম হোসেনুর রহমান।

আমি বেশ অবাক হয়ে বললাম, আপনি কি গোয়েন্দা প্রধান মিঃ হোসেনুর রহমান?

উত্তর হলো, ঠিক ধরেছেন, আমিই সেই—

আমি একটু থতমত খেয়ে বললাম, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি স্যার— আমার নির্ঘাৎ ধারণা হলো পুলিশের অনুমতি না নিয়ে দুম করে একটা গোয়েন্দা এজেন্সি খুলে বসে আমি একটা বেআইনি কাজ করে বসেছি। হয়তো সেই অপরাধেই—

হোসেনুর রহমান বললেন, আপনি কি এখন বাড়িতে আছেন? আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আমার মুখ দিয়ে ভাল করে কথা সরল না। বললাম, আসুন।

টেলিফোনের সুইচ বন্ধ করে ঋতুকে বললাম, আমার প্রথম মক্কেল গোয়েন্দা প্রধান হোসেনুর রহমান স্বয়ং। আর তিনি আসছেন আমায় গ্রেফতার করতে।

ঋতু বলল, ধেৎ, হতেই পারে না। ইচ্ছে মতো পেশা বেছে নেবার অধিকার সবারই আছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার ঋতু পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়ে। সুতরাং এসব ব্যাপার সে ভালো বোঝে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, হোসেনুর সাহেব এলে ঋতুকেই সামনে এগিয়ে দেব।

হোসেনুর সাহেবের জিপ কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাড়ির সামনে এসে থামল। আমি দরজা খুলে তাঁকে স্বাগত জানালাম। তাঁকে আমি সামনাসামনি কখনও দেখিনি। তবে টিভিতে প্রায়ই তাঁকে দেখি। সুতরাং তাঁর চেহারা, গলার স্বর আমার মুখস্থ।

আমার অপিস ঘরে সোফায় তাঁকে বসালাম। ঋতুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, আমার বোন ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ঋতু প্রধান।

হোসেনুর করমর্দন করে বললেন, তরুণ গোয়েন্দা ও তাঁর তরুণী অ্যাসিস্ট্যান্টকে দেখে আমি খুব প্রীত হলাম মিঃ ইউ পি। গোয়েন্দাগিরি শুধু আমাদের মতো উর্দিধারী পুলিশ অফিসারদের জন্যই নয়। প্রতিদিন কত ঘটনা ঘটছে, পুলিশ কেস আইনত পুলিশের এক্তিয়ারে আসে না। আমরা চাই, আপনাদের মতো আরও তরুণ ইনভেস্টিগেশনের কাজে এগিয়ে আসুন।

আমি একটু হাল্কা বোধ করতে লাগলাম। না, হোসেনুর আমায় গ্রেফতার করতে আসেননি। বরং আমার মক্কেল হতেই এসেছেন।

তিনি একটি বিচিত্র মামলা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন।

মামলাটি হলো খুনের। খুনের ওই কেসটি আমার ভাল করে জানা আছে। আজ থেকে মাস ছয়েক আগে খবরটি খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। হোসেনুর আমাকে পেপার ক্লিপিং দেওয়ায় আমার মনে করতে সুবিধে হলো।

চামেলী হত্যাকাণ্ডের নায়ক গ্রেফতার

১/১ রমেশ মিত্র রোডে গঙ্গা-যমুনা অ্যাপার্টমেন্টের আবাসিক মিঃ আয়েঙ্গারের পত্নী চামেলী দেবীকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ ওই পরিবারের প্রাক্তন গৃহভৃত্য হীরুকে

রবিবার ভোরে বাগুইহাটির একটি বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে সে চামেলী দেবীর গহনা চুরি করার উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল। সে ভেবেছিল ঘুমন্ত অবস্থায় চামেলী দেবীর গলা থেকে সে পাঁচভরির হারটি খুলে নিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু চালেমী দেবীর ঘুম ভেঙে যায়। সে সময় দুজনে ধস্তাধস্তি হয়। ওই সময় হীরুর পিস্তল থেকে একটি গুলি ছিটকে চামেলী দেবীর বুকে লাগে। তিনি ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।

আমি ক্লিপিংটি পড়ে বললাম, এই খবরটি আমি সেসময়ই পড়েছিলাম। পুলিশ তো অপরাধীকে গ্রেফতারই করে ফেলেছে। অপরাধীও স্বীকার করেছে। ব্যস, এরপর তো চার্জশিট দেওয়া শুধু বাকি থাকে। সেটাও পুলিশের কাজ।

হোসেনুর বললেন, ভবানীপুর থানা কেসটি করছে। আপনারা জানেন, থানা যদি কোনো কেস তদন্ত করার দায়িত্ব নেয়, আমরা আর তখন তাতে ইন্টারফেয়ার করি না। আমাদের ডিডির হাতে এমনিতেই প্রচুর কেস। কলকাতায় এখন মার্ডার তো লেগেই আছে। তাই থানার হাত থেকে স্বেচ্ছায় আমরা কোনো কেস নিই না। কিন্তু আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বলছে, মামলাটি অত সহজ নয়। হীরু যা বলছে, তা সত্যি নাও হতে পারে।

তার মানে আপনি সন্দেহ করছেন হীরু আসল খুনী নয়? আমি বললাম।

খুনী হতে পারে। কিন্তু হীরু অনেক সত্য গোপন করছে।

কি করে আপনার মনে হলো?

মিঃ ইউ পি, আপনি একজন ঝকঝকে বুদ্ধিমান গোয়েন্দা। বলুন তো একজন খুনী কনফেস করে কেন?

অনেক কারণে। এক নম্বর—পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়ে, দুই—বিবেকের তাড়নায়, তিন—আরও বড় কোনো সত্য গোপন করার জন্য।

কারেক্ট। হোসেনুর টিভি ক্যুইজ-মাস্টারের ঢঙে বলে উঠলেন। এক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে আপনার শেষের অনুমানটাই সত্যি। খুনটা কীভাবে হয়েছিল আপনার মনে আছে তো? চামেলী দেবীর বয়স পঞ্চাশ। তাঁর স্বামী মিঃ আয়েঙ্গারের বয়স পঞ্চান্ন। তিনি রবার্টসন ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন পদস্থ অফিসার। দুজনে ওই ফ্ল্যাট থাকতেন। ওঁদের একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে রৌরকেল্লায়।

হীরু ছিল ওঁদের বিশ্বস্ত পুরনো চাকর। দশ বছর ওঁদের পরিবারে কাজ করার পর একদিন স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেয়। বলে সে এখন ব্যবসা করতে চায়। আর কারও বাড়ি কাজ করবে না।

কতদিন আগে সে চাকরি ছাড়ে?

তিন বছর আগে। এই তিন বছরে মধ্যে আয়েঙ্গার পরিবার হীরুর খবর পায়নি। তিন বছর পরে এক দুপুরে চামেলী দেবী যখন তাঁর ফ্ল্যাটে একা ছিলেন তখন তিনি খুন হন। হত্যাকারী তাঁকে রিভলবার দিয়ে গুলি করে।

রিভলবার হীরু কোথা থেকে পেল?

ওটি মিঃ আয়েঙ্গারের রিভলবার। অফকোর্স তাঁর লাইসেন্স ছিল। রিভলবারটি কোথায় থাকত তা হীরু জানত।

কিন্তু হীরু তো রিভলবার চালাতে জানত না।

অনুমান করা যায় সে তিন বছর বন্দুকবাজিতে দড় হয়েছে। এটি কি করে হলো? সে ব্যবসা করত, কিসের ব্যবসা? ভবানীপুর থানার আই. ও-র খবর জমি কেনাবেচার দালালি করত হীরু। তাতে রিভলবার লাগে না। তাছাড়া হীরু তার স্বীকারোক্তিতে বলেছে, সে নাকি চামেলী দেবীর কাছে চাবি ফেরৎ দিতে গিয়েছিল। প্রথমে সে বেল বাজায়। লোডশেডিং ছিল বলে বেল কাজ করছিল না। তাই সে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। দেখে চামেলী দেবী ঘুমোচ্ছেন। তাঁর গলায় পাঁচ-ছ' ভরির একটা হার। হারটা দেখে সে লোভ সামলাতে পারে না। তাই আলতো করে খুলে নিতে যায়। এমন সময় চামেলী দেবী ঘুম থেকে উঠে হীরুকে দেখে চেঁচাতে যান। হীরু তাঁর মুখ চেপে ধরতে গেলে চামেলী দেবী দেওয়ালে দেরাজের মধ্য থেকে রিভলবার বার করেন। হীরু সেটি কেড়ে নিতে যায়। তখনই গুলি ছটকে বেরিয়ে যায়। হীরু তখন ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

যাবার সময় হারটা কি নিয়ে গিয়েছিল?

থ্যাঙ্ক ইয়ু ইউ পি। এই প্রশ্নটি করে আপনি প্রমাণ করে দিলেন আপনার ইনার আই অর্থাৎ রহস্যভেদী দৃষ্টি আছে। হ্যাঁ, আমার খটকা এখানেই। হীরু হারটা নিয়ে যায়নি।

হারটা চুরি করার উদ্দেশ্যেই যদি সে এসে থাকে তাহলে হারটা না নিয়ে সে চলে গেল কেন?

হোসেনুর বলে চললেন, এখানেই আমার মনে হচ্ছে হীরু আরও কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। এই মার্ডার সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। তিন বছর পরে হঠাৎ হীরুর চাবি ফেরৎ দেবার ইচ্ছে জাগল কেন? সৎ উদ্দেশ্য থাকলে সে সন্ধ্যার পর মিঃ আয়েঙ্গার অফিস থেকে আসার পর আসতে পারত।

ভবানীপুর থানা কিন্তু এত সব প্রশ্নের মধ্যে যায়নি। তারা এটাকে খুব সাধারণ ক্রাইম বলে মনে করছে, যা গৃহভৃত্যরা আকছার করে থাকে। কিন্তু সিপি চান না আমি ভবানীপুরের ওসিকে চটাই। তাই তিনি আমায় স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, তুমি চামেলী মার্ডার কেস নিয়ে মাথা গলিও না হোসেনুর। ওই কেস সলভ হয়েই গেছে। কিছুদিনের মধ্যেই আই.ও চার্জশিট দেবে। তাই কাগজে বিজ্ঞাপনটি দেখে আমি আপনার সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিলাম। দেখলাম আপনি জেনুইন প্রফেসনাল গোয়েন্দা এজেন্সি। আমার সবচেয়ে বড় সুবিধে আপনাকে কেউ চেনে না। আপনি গোপনে এই মামলার একটা সমান্তরাল তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবেন। আপনাকে তদন্ত করে দেখতে হবে এই মার্ডারের পিছনে কোনো গোপন রহস্য আছে কিনা। এর জন্য আপনার যোগ্য ফিজ আমি আপনাকে দেব। বাই দি বাই, আপনার ফিজ কত ইউ পি?

আপনি আমার প্রথম মক্কেল, আপনি যা ফিজ দেবেন তাই নেব।

তাহলে দু' হাজার টাকা ক্যাশ আপনি এখনই রাখুন। আর তিন হাজার ফাইন্যাল রিপোর্ট পেলে দেব। টাকাটা পরিশ্রমের তুলনায় খুব কম হয়ে গেল ইউ পি. আমাদের সোর্স মানি থেকে এর চেয়ে বেশি টাকা আমরা দিতে পারি না। ডোণ্ট মাইণ্ড। টেলিফোনের যোগাযোগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গোয়েন্দা প্রধান হোসেনুর রহমান চলে গেলেন।

।। তিন ।।

আমি ও ঋতু মিলে মোটামুটি একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিলাম।

তদনুযায়ী ঠিক হলো, আমরা দুজন হীরুর ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেব।

হীরু বাগুইহাটিতে একটি একতলা বাড়ি করেছে বলে হোসেনুরের কাছে শুনেছিলাম। তিনি আমায় ঠিকানাও দিয়েছিলেন। সেই ঠিকানা অনুযায়ী আমি ও ঋতু গিয়ে হাজির হলাম হীরুর বাড়ি।

হীরু তখনও জেল হাজতে এটা আমরা জানতাম। কিন্তু ভান করলাম যেন কিছুই জানি না।

বাড়িটি নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার পর এক অল্পবয়সী বিবাহিতা মহিলা বেরিয়ে এল।

কাকে চাই?

এখানে হীরুবাবু থাকেন?

মহিলা আমাদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, কোথা থেকে আসছেন?

আমার নাম উদ্দালক প্রধান। আমার বোন ঋতু। গত বছর হীরুবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। উনি আমাদের অফিসে এসেছিলেন একটা বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারে। তা আমার নিজের এখন বাড়ির দরকার।

আপনি ওর সম্পর্কে কিছু শোনেননি?

না তো, কি হয়েছে ওঁর? আমি অবশ্য গত তিন মাস দিল্লি ছিলাম।

ওঁকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

কেন, কি করছেন উনি?

কিছুই করেননি। শত্রুতা করে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে।

কারা?

ওসব কথা বলতে পারব না, আপনারা পরে আসবেন।

দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি ও ঋতু হীরুর বাড়ির সামনে একটি চায়ের দোকানে চা খেতে ঢুকলাম। দোকানে তিন-চারটি যুবক বসেছিল। আমরা ঢুকতেই তারা আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। প্রত্যেকের চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। সামনের চেয়ারে ঝাঁকড়া চুল, মুখে একমুখ দাড়ি, পাজামা-পাঞ্জাবি পরা একটি তরুণ এসে বসল।

আমি বললাম, দাদা কি এখানেই থাকেন?

কেন বলুন তো?

আমরা এসেছিলাম হীরুবাবুর কাছে একটি ফ্ল্যাট ভাড়ার জন্য। তা ওঁর বাড়ি থেকে বলল উনি নাকি—

আপনি জানতেন না, কোথায় থাকেন আপনারা?

বালিগঞ্জ। আমি প্রায়ই বাইরে বাইরে কাটাই। শুনে তো একদম থ। হীরুবাবুর কি কোনো শত্রুটত্রু ছিল, যারা ওঁকে জড়িয়ে দিয়েছে?

তা বলতে পারব না দাদা।

pathagar.net

আপনি তো চিনতেন ওঁকে?

এক পাড়ায় বাড়ি, সবাই যেমন চেনে আমিও তেমন চিনতাম।

এমন সময় হীরুদের বাড়ি থেকে একটি বাচ্চা ছেলে বেরিয়ে এসে তরুণটিকে বলল, ফ্যালা কাকা, বউদি তোমায় এখনই ডাকছে।

লোকটির নাম যে ফ্যালা তা তখনই বুঝতে পারলাম।

রাত্রিবেলা ফোন করলেন হোসেনুর রহমান।

হীরুর বাড়ি গিয়েছিলেন শুনলাম।

আপনি কি করে জানলেন?

আমার চর আছে ওদিকে। আপনি চায়ের দোকানে বসে খবরাখবর নিচ্ছিলেন তাও বলেছে। কিছু ক্লু পেলেন?

পেয়েছি। হীরু দু'বছরের মধ্যে হঠাৎ বড়লোক হয়েছিল কীভাবে? সেটা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে। এদিকে তার প্রচুর টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল যার জন্য ওই বাড়িটা সে মর্টগেজ দেয় মানুভাই প্রপার্টিজের কাছে।

মানুভাই প্রপার্টিজ? আরে তারাই তো গঙ্গা-যমুনা ফ্ল্যাটের প্রমোটার।

হ্যাঁ, হীরুর নিয়মিত যাতায়াত ছিল মানুভাই-এর অপিসে।

কিন্তু চামেলী দেবী খুন হলেন কেন?

সেটা এখনও বুঝতে পারছি না। আমি মিঃ আয়েঙ্গারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিলেন। খুন হবার আগে কদিন ধরেই মিসেস আয়েঙ্গার খুব উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। স্বামীকে কিছু একটা কথা বলি বলি করেও যেন বলতে পারছিলেন না। তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমার রিভলবারটার কার্তিজ ঠিকঠাক আছে তো? চামেলী দেবী নিজেও রিভলবার ছোঁড়া শিখেছিলেন। কলকাতায় যখন নকশাল হাঙ্গামা হয় তখনই মিঃ আয়েঙ্গার আত্মরক্ষার জন্য রিভলবারটি কেনেন। সেই সঙ্গে স্ত্রীকেও চালানো শিখিয়ে দেন। কিন্তু এতদিন পরে স্ত্রী রিভলবারের কথা জিজ্ঞাসা করছে জেনে তিনি একটু ঘাবড়ে যান।

চামেলী দেবী বলেন, ভয় পেও না। একলা একলা থাকি। তাই রিভলবারটির হদিস জেনে নিচ্ছি।

হোসেনুর বললেন, গুড পয়েন্ট। এটা আমি জানতাম না।

আমি বললাম, ডুপ্লিকেট চাবির ব্যাপারটিও ভালো করে জেনে নিলাম। হীরুর কাছে ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি থাকত। চাকরি ছেড়ে দেবার সময় চাবিটা ফেরৎ নিতে আর মনে ছিল না কারো। তারপর থেকে হীরুর আর হদিসও তাঁরা পাননি। হীরু পুলিশের কাছে বলেছে দিচ্ছি দিচ্ছি করে চাবিটা সে ফেরৎ দিতে পারেনি। তারপর নেহাৎ বিবেকের তাড়নাতেই সে চাবিটা ফেরৎ দিতে গিয়েছিল।

হোসেনুর বললেন, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কি ইউ পি! আমি চাইছি খুনের আসল মোটিভটা কী? চামেলী দেবী ভয় পেয়েছিলেন কেন? কে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিল? কিসের ভয়?

আমি বললাম, আমি মিঃ আয়েঙ্গারের ফ্ল্যাটটি আগামীকাল দেখতে যাচ্ছি। আপনি

একবার আসুন না। দুজনে মিলে তাহলে পরামর্শ করা যাবে।

হোসেনুর বললেন, বেশ, আমি যেতে পারি, তবে আপনার বন্ধু হিসাবে—ডিসি ডিডি বলে আমার পরিচয় দেবেন না।

কিন্তু আপনাকে কে না চেনে?

আমি এমনভাবে যাবো যাতে কেউ না চেনে।

।। চার ।।

মিঃ আয়েঙ্গারের ফ্ল্যাট। তাঁর ড্রইংরুমে পাঞ্জাবি আর শান্তিপুরী ধুতি পরে হোসেনুর রহমান।

চামেলী দেবীর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর একমাত্র মেয়ে সুমিতা রৌরকেল্লা থেকে এসে আছে। সুমিতা রান্নাঘর থেকে আমাদের জন্য চা আর দক্ষিণ ভারতীয় চানাচুর নিয়ে এল।

আয়েঙ্গার বলছিলেন, আমার স্ত্রী মার্ডার হওয়ার পর আমার আর এই ফ্ল্যাটে থাকতে একদম ভালো লাগছে না। ভাবছি এই ফ্ল্যাট বেচে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে দেশে যাবো। আমার বাড়ি মাদুরাই জেলায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা আপনার কি মনে হয় মিঃ আয়েঙ্গার, আপনার স্ত্রী নিহত হওয়ার পিছনে নেহাৎ ছিনতাই-এর উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আততায়ী তো কিছুই নিয়ে যায়নি।

হ্যাঁ, হীরুকে পুলিশ এটি জিজ্ঞাসা করেছিল। সে বলল, খুন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। রিভলবারের গুলি ছুটকে চামেলী দেবীকে নিহত করলে সে এমন ঘাবড়ে যায় যে চুরি করার কথা তার মনেই থাকে না। সে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আপনাদের ফ্ল্যাটে সিকিওরিটি নেই? না, কো-অপারেটিভের কর্তাদের মধ্যে নানা গোলমাল চলছে। এখন একটি কোম্পানি সিকিওরিটির দায়িত্বে আছে। তারা রাত নটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত ডিউটি দেয়।

আমরা যখন কথা বলছি তখন ঋতু টয়লেটের যাবার জন্য পাশের বেডরুমে ঢুকেছে। সেখান থেকে দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এসে আমাকে বলল, দাদা শীগ্রি দেখবি আয়। আপনারাও আসুন।

তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে আমরা গেলাম। ঘরটি অন্ধকার। দেওয়ালে টাঙানো একটি বড় লাইফ সাইজ আয়না। সেই আয়নায় গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্টের সমান্তরাল একটি ফ্ল্যাটের প্রতিচ্ছবি আয়নায় ফুটে উঠেছে। ঘরের মধ্যে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক একটি প্যাকেট তুলে দিল আর একটি কমবয়সী ছেলের হাতে। ছেলেটি প্যাকেটটি নিয়ে তার অ্যাটাচি কেসে ভরে ফেলল।

ঋতু অস্ফুট স্বরে বলল, দাদা, ছেলেটিকে চিনতে পাচ্ছিস?

হ্যাঁ, ফ্যালা। বাগুইহাটিতে হীরুর বাড়ির সামনে চায়ের দোকানে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

হোসেনুর বললেন, ইউ পি, ওকে ধরো। যেন পালাতে না পারে।

হুড়মুড় করে আমরা নেমে পড়লাম। ফ্যালা একটা ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছিল, আমি ও হোসেনুর দুজনেই ওকে জাপটে ধরলাম। ঋতু ওর হাত থেকে অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে এক দৌড় দিল।

গুড়ুম করে একটি শব্দ হলো।

কে যেন পিস্তল ছুঁড়ল ঋতুকে লক্ষ্য করে। ঋতুর গায়ে না লেগে গুলিটি একটি প্রাচীরের গায়ে লাগল। ঋতু ততক্ষণে আয়েঙ্গারের ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে পড়েছে। পিস্তল থেকে আর একটি গুলি ছুঁড়বার আগেই কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ এসে ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা লোকটিকে এসে গ্রেফতার করল।

হোসেনুর রহমান বললেন, আমি তৈরি হয়েই এসেছিলাম। তবে জানতাম না, এমন ঘটনা ঘটবে।

ফ্যালার অ্যাটাচি কেস থেকে বেরিয়ে পড়ল, সোনার চেয়ে দামী হেরোইনের প্যাকেট।

।। পাঁচ ।।

এই গল্পের শেষ দৃশ্য আমার বালিগঞ্জ টেরাসের বাড়ি। চামেলী হত্যারহস্য আমরা ভেদ করতে পেরেছি বলে আমার বাবা খুশি হয়ে আজ একটা ডিনার দিচ্ছেন। ডিনারে প্রধান অতিথি হোসেনুর রহমান, মিঃ আয়েঙ্গার ও তাঁর মেয়ে সুমিতা। এছাড়া আছেন সরকারপক্ষের কৌঁসুলি পাবলিক প্রসিকিউটার বিষ্ণু বাগচি। আমি বললাম, বন্ধুগণ, চামেলী দেবীর হত্যার আসল রহস্য এখন হীরু স্বীকার করেছে। তার আগে মিঃ আয়েঙ্গারের বেডরুমে ওই আয়নাটি সম্পর্কে একটু বলা দরকার। ওই আয়নাই চামেলী দেবীর হত্যার কারণ। আর ওই আয়নাই এই হত্যারহস্যের জট ছাড়াবার প্রধান সহায়ক।

এখানে হীরু সম্পর্কে একটু বলা দরকার।

গঙ্গা-যমুনা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক মানুভাই প্রপার্টিজের মালিকের সঙ্গে হীরুর যোগাযোগ হয়। তারা হীরুকে তাদের ফ্ল্যাট বেচা-কেনার দালালিতে নিয়োগ করে। চাকরি ছেড়ে বছর দুয়েকের মধ্যে হীরু দালালি করে প্রচুর পয়সা কামায়। কিন্তু সে নানা বদনেশায় সব টাকা উড়িয়ে দেয়। এমনকি মানুভাই প্রপার্টিজের কাছে তার বাড়িটিও বাঁধা দেয়। প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে সে যখন কি করে আরও টাকা রোজগার করার কথা ভাবছে তখন তাদের পাড়ার ফ্যালা তাকে ড্রাগ পাচারের ব্যবসায়ে নামায়। ওই যমুনা অ্যাপার্টমেন্টের ঠিক আয়েঙ্গারের ফ্ল্যাটের সমান্তরাল ফ্ল্যাটটির মালিক মিঃ আর সি গুপ্তা। ভদ্রলোকের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মুখে ইংরাজির খই ফোটে। লোকে জানে তাঁর সারা পৃথিবী জুড়ে এক্সপোর্টের ব্যবসা। আসলে তাঁর ব্যবসা ড্রাগ পাচারের।

ফ্যালা হীরুকে নিয়ে আসে গুপ্তার কাছে। আর একদিন দুপুরে ওই আয়নার মধ্য দিয়ে মিসেস আয়েঙ্গার হীরুকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিচে নেমে হীরুর জন্য অপেক্ষা করেন। হীরুকে তিনি বলেন, তাঁর সন্দেহ হীরু কোনো বড় মতলবে এখানে এসেছে। তাঁর ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি ফেরৎ না দিলে তিনি কিন্তু পুলিশে খবর দেবেন। হীরু এরপর টেলিফোনে তাঁকে ভয় দেখায়, হীরুকে তিনি যে দেখেছেন, একথা কাউকে জানালে সে চামেলী দেবীকে খুন করবে।

হীরুর এরপর সন্দেহ হয় সত্যিই হয়তো চামেলী দেবী তাকে ধরিয়ে দেবেন। তাই চামেলীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য সে ফন্দি আঁটে। ঠিক করে দুপুরবেলা চামেলী দেবীর ফ্ল্যাটে ঢুকে গলায় ফাঁস দিয়ে চামেলীকে সে খুন করবে। এই উদ্দেশ্যেই সে চামেলী দেবীর ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল। কিন্তু চামেলী দেবী রিভলবার বার করতেই সমস্ত পূর্ব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। চামেলীকে মরতে হলো। সে পালাল।

কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেফতার করল। তখন উকিলের পরামর্শে নিজেই কেসটা অন্যরকম করে সাজাল হীরু। উদ্দেশ্য, অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটানো প্রমাণিত হলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে না, কয়েক বছরের জেল হবে মাত্র। সবচেয়ে বড় কথা সে যে ড্রাগ-পাচারের সঙ্গে জড়িত একথাও চাপা থাকবে। কারণ তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে ড্রাগ-পাচার চক্র তাকে আর বেঁচে থাকতে দেবে না।

সেদিন যদি ফ্যালাকে ঋতু দেখে না ফেলত, আমরা কোনোদিন ভাবতেই পারতাম না চামেলী দেবীর হত্যার পিছনে আর একটা বড় রহস্য লুকিয়ে আছে।

হোসেনুর রহমান বললেন, এই সন্দেহটা প্রথম থেকেই আমার হয়েছিল, তাই আমি ইউ পি আর ঋতুকে কাজে লাগিয়েছিলাম। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা এটা ভাবতেও পারিনি। একেবারে মিঃ আয়েঙ্গারের সমান্তরাল ফ্ল্যাটে এই কাণ্ড চলছে। দুটো ফ্ল্যাটের ব্যবধান চল্লিশ ফুটের মতো। আয়নাটা এমনভাবে ফিট করা ছিল যে হীরুরা কখনও বুঝতে পারেনি সামনের জানালা দিয়ে কেউ তাদের লক্ষ্য করছে। একেই বলে ভবিতব্য। তবে লেডিস অ্যাণ্ড জেণ্টলম্যান, এই রহস্য উদ্ধারের জন্য আমাদের এণ্টায়ার পুলিশ ফোর্স উদ্দালক ও ঋতু প্রধানের কাছে কৃতজ্ঞ।

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ঋতু গিয়ে ধরল। তারপর কিছুক্ষণ পরে রিসিভারটা নিয়ে এসে ঋতু বলল, তোর ফোন।

আমি বললাম, কে?

ঋতু বলল, সম্ভবত তোর দ্বিতীয় মক্কেল।

ফুন্টসোলিং-এর মূর্তিচোর

pathagar.net

সুভাষ ধর

ভূটান পাহাড়ে বুদ্ধমূর্তির সন্ধানে দৌড়ঝাঁপের পর সুশান্তের হাতে তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ নেই অনেকদিন। একটু সময় পেলে বইপত্র ঘাঁটার অভ্যেসটা ওর শিশুবয়স থেকে। আজকাল ক্রিমিনোলজি বা অপরাধবিজ্ঞানের মোটা মোটা কিতাব নিয়ে বসছে। রণজিতের আবার পড়তে বসলেই চোখে ঘুমের ঢল নামে। সুশান্ত যখন ফিঙ্গার-প্রিন্টের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে তন্ময়, রণজিৎ ততক্ষণে আগাথা ক্রিস্টির একখানা বই চোখের সামনে ধরে স্বপ্নের জগতে, মাঝে মাঝে নাসিকাধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। এমন সময় দরজার ঘণ্টি বেজে উঠলো। শিউপুজন দরজা খুলে দিতেই পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো।

সুশান্ত হাতের বই টেবিলে রেখে রণজিতের কাঁধে একটা খোঁচা মেরে বললো, উঠে পড়। আর ঘুমুসনে। মনে হচ্ছে দোরজি সাহেব ভূটানপাহাড় থেকে নেমে এলেন।

আজকাল সামন্তর বাড়িতে দোরজি সাহেবের ঘন ঘন আবির্ভাব ঘটছে। ইরা পাকাপাকিভাবে কোলকাতায় থেকে পড়াশুনোর কথা ভাবছে। ইদানীং সামন্তর কাছেই

থাকছে আর ভাল কলেজগুলোতে ভর্তির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দোরজির আবার ইরাবোন অন্ত প্রাণ। মাসে দু'চারবার ইরাকে না দেখলে কেমন হয়ে যায় মনটা। পুলিশের বড়কর্তার কঠোর খোলস ছেড়ে নানা অজুহাতে কোলকাতায় আসছেন মাঝে মাঝে। দোরজির স্ত্রীও কোলকাতা ভালবাসেন, এখানেই পড়াশুনো করেছেন, তিনিও সঙ্গ ধরেন। কাজেই সামন্তর বাড়িতে মাঝে মাঝেই আজকাল আড্ডার আসর বসে। ক্বচিৎ সুশান্ত আর রণজিৎও হাজির হয়। দোরজি কোলকাতায় এলে যেমন করেই হোক সুশান্তর সঙ্গে দেখা করে যাবেনই।

দোরজি ঘরে পা রাখা মানেই তাঁর নাটকীয় আগমন। বললেন, ওয়েল, ওয়েল ব্রাদার্স, এমন সুন্দর সন্ধ্যায় ঘরে বসে আছো কি করে! চল, বাইরে বেরিয়ে পড়ি। সুশান্ত, চন্দ্রহাটি জায়গাটা কোথায়? মনে হয় খুব কাছেই। আমার একটু সরকারী কাজ আছে, তোমরা সঙ্গে যাবে নাকি?

সুশান্ত বললো, দোরজি সাহেব, চন্দ্রহাটি খুব কাছে নয়। যদি হুগলীর চন্দ্রহাটি হয়, এখান থেকে গুনে গুনে সত্তর কিলোমিটার। আপনার পুলিশের গাড়ি কম করেও দু'ঘণ্টা নেবে। তা আপনার সরকারী কাজটা কি যদি একটু জানান তবে যাবার ব্যবস্থা করি।

দোরজি বললেন, তেমন জরুরি কিচ্ছু না। চন্দ্রহাটি জায়গাটা শুনেছি বেশ মনোরম, গঙ্গার গায়ে গা ঠেকিয়ে রয়েছে। ওখানে রয়েছেন রামসুন্দর মিত্র নামের এক বনেদী ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি। একলা মানুষ, নানান খেয়াল নিয়ে থাকেন। তার একটা হলো যতো কিম্ভূত ধরনের মূর্তি সংগ্রহ। শুনেছি তাঁর সংগ্রহে সিকিম, তিব্বত, ভূটান সব জায়গার তান্ত্রিক মূর্তির একটা বড়সড়ো কালেকশন আছে।

সুশান্ত বললো, দোরজি সাহেব, আপনি পুলিশের লোক, আমিও তাই। অতো সহজ-সরল কারণে আপনি চন্দ্রহাটি যেতে চাইবেন এটা আমি কি করে মেনে নিই! আসল গল্পটা বলুন।

দোরজি বললেন, সব কথা রাস্তায় হবে। চল বেরিয়ে পড়ি। রামসুন্দর মিত্রকে বাড়িতেই পাবো। উনি কখনো বাড়ি থেকে বার হন না এটা জানি। খালি গরমের সময়টায় তিন মাসের জন্য সিকিম, ভূটান, নেপাল চষে বেড়ান। এখন ছটা বাজে, পৌঁছতে পৌঁছতে আটটা হবে। দেখা করার পক্ষে সেটা নিশ্চয় এমন কিছু খাপছাড়া সময় নয়।

রণজিৎ ছোট্ট করে বললো, গাঁয়েগঞ্জে যাবি, রাতের খাবারটা জোটে কিনা ভেবে দেখিস।

দোরজি কোলকাতায় এলেই রয়াল ভূটানের সাদা ধবধবে অ্যাম্বাসাডার গাড়ি, চাপেন, সঙ্গে থাকে সাদা পোশাকে ভূটান পুলিশের লোক। সুশান্ত, রণজিৎ আর দোরজি পিছনে বসলেন, সামনে একটি কীমাকার ভূটানী আর্দালী ড্রাইভারের পাশে বসলো। তার কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটানো .৪৫ রিভলবারের বাঁট জামার ওপর দিয়ে দৃশ্যমান, এটা সুশান্তের চোখ এড়িয়ে গেল না।

সুশান্ত ছোট্ট করে ড্রাইভারকে বললো, বি. টি. রোড ধরে কল্যাণীর পথ ধরুন। কল্যাণী ব্রিজ পার হলেই গঙ্গার ওপারে চন্দ্রহাটি। কম সময়ে পৌঁছে যাবো। হাওড়া হয়ে

দিল্লী রোড ধরে চুঁচুড়া, চন্দননগর পার হতে হতেই রাত দশটা বেজে যাবে।

গাড়ি দমদম এয়ারপোর্টের রাস্তা ধরলো। দোরজি এতক্ষণ আনমনে শিস দিচ্ছিলেন, এবারে আস্তে করে বলতে লাগলেন, আমার পরমাত্মীয় মহাভাগ অনেক কুকীর্তির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। তোমরা হয়তো জানো না, ভুটানের রাজপরিবারে কিছু কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যাঁদের ঐশ্বর্য ও সম্মান রাজার চেয়ে কিছু কম নয়। যেমন ধরো রাজমাতা বা রাজার মামা। এঁরা সবাই অত্যন্ত সম্মানিত রাজপুরুষ। রাজার মামার প্রচুর ভূসম্পত্তি, থিম্পু, পারো ছাড়াও ফুন্টসোলিং-এ রয়েছে প্রাসাদোপম বাড়িঘর। ফুন্টসোলিং শহরের এমনি একজন রাজপুরুষের গৃহ থেকে একডজন মূর্তি অদৃশ্য হয়ে যায় কয়েকমাস আগে। আমি দুঃখিত তাঁর নাম বলা যাবে না, ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। যে মূর্তিগুলো চুরি যায় তার মধ্যে কিছু ছিল তান্ত্রিক সাধুসন্তের আর গোটা দুই বুদ্ধমূর্তি। তবে সচরাচর আমরা যে বুদ্ধ মূর্তি দেখি, এ দুটো সেরকম নয়। আসলে ভুটানের বৌদ্ধধর্ম তন্ত্র প্রভাবিত, তাই বুদ্ধের মূর্তিরও অন্য রূপ। মূর্তিগুলোর ধাতুগত মূল্য নগণ্য, কিন্তু ভুটান রাজপরিবারের কাছে এদের দামের হিসেব কষা যাবে না এবং বিদেশী বাজারে এক থেকে দেড় লাখ ডলার অনায়াসে পাওয়া যাবে। প্রাথমিক তদন্তে মনে হয়েছিল এটা সাধারণ ছিঁচকে চুরি। কারণ মূর্তিগুলো অদৃশ্য হবার পরেই দেখা গেল বাড়ির এক ভৃত্যও নিরুদ্দেশ। শিশুবয়স থেকে সে ঐ পরিবারে আছে। এখন যুবক, নামটা ধরো নরজান গুরুং। অনেক খোঁজাখুঁজি হলো। নরজানের আত্মীয়-পরিজনদেরও জেরা করা হলো। কিছুই হদিস মিললো না। শুধু একটাই খবর ছিল, মহাভাগের আখড়ায় গুরুং যেতো মাঝে মাঝে।

দোরজি একটু থামলেন। গাড়ি ততক্ষণে এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে বারাসাতের পথ ধরেছে। দোরজি আবার শুরু করলেন, আজ থেকে ঠিক বাইশ দিন আগে গুরুং-এর খোঁজ পাওয়া গেল। জলপাইগুড়ির প্রান্তে একটা চায়ের দোকানের পেছনে এক চিলতে ঘরের কড়িকাঠ থেকে গুরুংয়ের দেহ ঝুলছে। বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করবো না। মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্সের সংজ্ঞা অনুযায়ী এটা আত্মহত্যা হতেই পারে না, নিছক নৃশংস হত্যা। তদন্তে জানা গেল গুরুং-এর সঙ্গে থাকতো তারই আরেক শাগরেদ রেশম বাহাদুর। যথারীতি রেশম বাহাদুরও সেদিন থেকে নিপাত্তা। মূর্তিগুলোর কোনো খোঁজ নেই। সুশান্তর বন্ধু কমল হালদার জলপাইগুড়িতে পোস্টেড, তদন্তে অনেক সাহায্য করলো সে। কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। দিন সাতেক আগে রেশম বাহাদুরের দেখাও মিলেছে। খিদিরপুরের এক বস্তিবাড়িতে, তারও দেহ ঝুলছে কড়িকাঠ থেকে। এটাও হত্যা, আত্মহত্যার ব্যাপার নয়। মূর্তির কোনো সন্ধান নেই। কোনো সূত্রও নেই। রেশম বাহাদুরের কোনো শাগরেদের খবর পেলাম না। যে সূত্রটি আজই পেয়েছি তা হলো একটি চিরকুট যেটা রেশম বাহাদুরের পকেট থেকে উদ্ধার হয়েছে। তাতে একটি নাম, একটি ঠিকানা—রামসুন্দর মিত্র, চন্দ্রহাটি, হুগলী। একটু হোমওয়ার্ক করতে হলো রামসুন্দর মিত্র সম্পর্কে এবং তাতেই জানা গেল ভদ্রলোক বেশ ছিটগ্রস্ত। বিয়েথা করেননি, নানান উদ্ভট খেয়াল নিয়ে থাকেন, তার মধ্যে একটা হলো ওই মূর্তি সংগ্রহ। তবে ভদ্রলোকের কোনো ক্রিমিন্যাল রেকর্ড নেই, পরিষ্কার চরিত্র।

সুশান্ত একটু বাধা দিল, দোরজি সাহেব, মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স আমাকেও পড়তে হয়েছে। তবু সংক্ষেপে বলুন, কেন ধরে নিলেন গুরুং এবং রেশম বাহাদুর আত্মহত্যা করেনি, এদের হত্যা করা হয়েছে।

দোরজি হেসে ফেললেন। বললেন, সুশান্ত, তোমার মতো বুদ্ধিমান এবং কৃতী পুলিশ অফিসারকে আত্মহত্যা আর হত্যার বিভাজনটা কি করে বুঝাই! দুটোই এসফিক্সিয়াল বা শ্বাসরোধ করা মৃত্যু। কিন্তু গলায় রশির দাগ আড়াআড়িভাবে রয়েছে, কোনাকুনি নয় এবং কারো জিব মুখের বাইরে আসেনি। আত্মহত্যা হলে রশির দাগ থাকতো কোনাকুনি এবং জিব বেরিয়ে থাকত। এছাড়া আরো কিছু কিছু লক্ষণ আছে হত্যা আর আত্মহত্যার তফাৎটা ধরার জন্য। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে এটাও ধরা পড়েছে গলার চামড়ায় পরিষ্কার আঙুলের ছাপ। এই ছাপটা ধরা পড়েছে চামড়ার প্রথম পর্দা অর্থাৎ ফার্স্ট লেয়ার অব এপিডারমিস উঠিয়ে নেবার পর।

সুশান্ত বললো, অর্থাৎ কিনা দুজনকেই হত্যা করার পর দেহ কড়িকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাতে আরো একটা সূত্র জানা গেল। একাধিক ব্যক্তি এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত। কারণ একজন লোক, সে অসাধারণ শক্তিমান হলেও একা এই কাজ করে উঠতে পারবে না। দুই, মোডাস অপারেন্ডি বা অপরাধ পদ্ধতি ধরলে দুটো অপরাধই একদলের কাজ। তাহলে দোরজি সাহেব, আপনার হাতে দুটি কাজ। এক, হত্যারহস্যের সমাধান এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার; দুই, মূর্তিগুলো উদ্ধার করে যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া। শুধু একটা কথাই মাথায় ঢুকছে না। এই ঘটনার সঙ্গে মহাভাগের কি সম্পর্ক থাকতে পারে!

দোরজি বললেন, মহাভাগ সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয়নি। ছাত্রজীবনে মহাভাগ ভূটানের সেরা কুস্তিগীর ছিল। টাসিগাঙে একটা কুস্তির আখড়া বানিয়েছিল। অনেক ছেলেও আসতো, কুস্তিটুস্তি করতো আর এখানে-সেখানে গায়ের জোর ফলিয়ে বেড়াতো। এ লাইনে থাকলে মহাভাগ যথেষ্ট নাম কিনতে পারতো এটা নিশ্চিত। নরজান গুরুং আর রেশম বাহাদুর দুটোই ছিল মহাভাগের চেলা। পরে নানান হুজ্জতের মধ্যে মহাভাগ জড়িয়ে গেল, আখড়াটাও একসময় বন্ধ হয়ে গেল।

কথাবার্তার ফাঁকে গাড়ি কল্যাণীর কাছাকাছি মথুরাবিলে এসে পড়েছে। রণজিৎ প্রায় সারা রাস্তা ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে পার করেছে। একসময় চোখ খুলে বললো, আমার কথা বাসি হলে বুঝবি ঠিক। এই সব খালবিল জঙ্গল দেখতে খারাপ লাগছে না। কিন্তু রাতে খাবার জুটবে না এটাও ভুললে চলবে না।

সুশান্ত বললো, চন্দ্রহাটির কাজ শেষ করে তোদের নিয়ে যাবো আমার এক পরম শ্রদ্ধেয় জনের কাছে। একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে খাবার ভাবনাটা তাঁর উপরই ছেড়ে দেবো।

রণজিৎ, কে সে? কে সে? করে উঠলেও সুশান্ত কোনো উচ্চবাচ্য করলো না।

চন্দ্রহাটি না শহর না গ্রাম। আশেপাশে বেশ কয়েকটা বড় আয়তনের কলকারখানা। হুগলীর এই অঞ্চলটায় কাপড়, কাগজ, জুট তৈরির মিল। বহুবছর আগে ব্রিটিশ সাহেবরা এসবের পত্তন করে গেছেন, আজ সাহেব নেই, দিশী সাহেবরা দেখাশুনা করেন। তবে

মিলগুলোর রমরমা যে কমে এসেছে এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। গঙ্গার গায়ে গা ঠেকিয়ে চন্দ্রহাটি। কলাবাগান, আমবাগান আর ঝোপজঙ্গলে জায়গাটা বেশ সবুজ। গঙ্গা এখানে এসে একটু সংকীর্ণ হয়ে পড়লেও যথেষ্ট মনোরম।

ফেব্রুয়ারি মাসের সন্ধ্যে হলেও একটু শীতের হিমেল ছোঁয়া গায়ে লাগছে। দুয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই রামসুন্দর মিত্রর হদিশ পাওয়া গেল।

রামসুন্দরবাবুর বাড়ি যেন অট্টালিকা। বিশাল পরিধি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত দশ কাঠা জমির উপর বাড়ি। চারধারে ঘিরে বেশ উঁচু দেয়াল, উপরে আবার তারকাঁটা লাগানো। বাড়িটা দোতলা, একদম মাঝামাঝি জায়গায়। পুরনো সাহেবী প্যাটার্নের বাড়ি, সাদা রং।

রণজিৎ মন্তব্য করলো, এ তো বাড়ি নয়, দুর্গ দেখছি।

বাড়ির কাছ বরাবর এসে গাড়ি ঘ্যাঁচ করে থামলো। আবছা আঁধারে মনে হলো চার-পাঁচটা মুখ এদিক-ওদিক সরে গেল। চোখের ভুলও হতে পারে।

সুশান্ত গেটের কাছে এসে কলিংবেল টিপলো। তারপরই এক অসহনীয় পরিস্থিতি! মনে হলো একপাল কুকুর বাড়ির ভেতর থেকে একইসঙ্গে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কানে তালা লাগার যোগাড়!

সুশান্ত আর দোরজি দুজনেই কুকুরপ্রেমী। সুশান্ত হেসে বললো, দোরজি সাহেব, মিত্তিরমশাই লোক খারাপ হবেন না, কম করেও চারটে স্পিজ আর চারটে পমেডিয়ান কুকুর পুষে রেখেছেন। কলিংবেল টিপলেই এরা সারা বাড়ি জাগিয়ে তোলে।

এমন সময় একজন শীর্ণকায় ফর্সা লম্বা লোক দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিলের মতো চেঁচিয়ে বললো, কারা ওখানে? এই রাতদুপুরে কলিংবেল টেপা হচ্ছে কেন?

সুশান্ত বললো, মিত্তিরমশাই, রাত সবে আটটা। আমরা তো কোলকাতায় ভালো করে সন্ধ্যেই শুরু হয় না।

রামসুন্দর মিত্র বললেন, কোলকাতা থেকে আসছেন শুনে কৃতার্থ হলাম। কিন্তু মহাশয়রা কি কারণে আমার শান্তি বিঘ্নিত করছেন জানতে পারি কি?

দোরজির বাংলা ভাঙা ভাঙা, উচ্চারণও অন্য ধরনের তাই এসব কথাবার্তায় নিজেকে জড়ালেন না। সুশান্তই আবার বললো, মিত্তিরমশাই, ভয় পাবেন না, আমরা পুলিশের লোক।

রামসুন্দরবাবু আবার খেঁকিয়ে উঠলেন, পুলিশের লোক তবে উর্দি চড়িয়ে আসেননি কেন? চেহারাগুলো তো গুণ্ডাদের মতো, পুলিশ না গুণ্ডা বুঝবো কি করে?

রামসুন্দরবাবু ইতিমধ্যে কুকুরগুলোর উদ্দেশে দু'তিনবার ধমক দিতেই সেগুলো চুপ করে গেল।

সুশান্ত বললো, মিত্তিরমশাই, আমি ক্যালকাটা পুলিশের ডিকেটটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসার। আমার নাম সুশান্ত। আপনি হয় কাছে এসে আমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখুন অথবা লালবাজারে ফোন করে জেনে নিন আমি সত্যি বলছি কিনা।

রামসুন্দরবাবুর গলার আওয়াজ হঠাৎ শান্ত নরম হয়ে গেল, বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, সুশান্ত নামটা আমি শুনেছি রায়মশাইয়ের কাছে। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বায়, ওজন

পঁচাত্তর কেজি, শ্যামলা গায়ের রঙ, চওড়া ছাতি। ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করুন।

বলতে বলতে রামসুন্দরবাবু নিচে নেমে এলেন। তালায় চাবি ঘুরিয়ে দড়াম করে দরজা খুলে দিলেন। সুশান্ত, রণজিৎ আর দোরজি ঢুকলেন ভেতরে।

রামসুন্দরবাবু বললেন, আজ প্রায় এক মাস প্রাণ হাতে করে আছি মশাই। বাপ-ঠাকুর্দা বিলিতি সিগারেট কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ করে বিষয় সম্পত্তি করে গেছেন, বাড়িটাও বানিয়ে রেখে গেছেন বিলিতি কেতায়। আমি মশাই একলা মানুষ, বিয়ে-সাদির ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়িনি, নিজের খেয়াল-খুশি নিয়ে থাকি। বই-পত্তর পড়ি, কখনো-সখনো লিখি, আর গরম পড়লে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই। পাহাড়ী লোকগুলো যেমন চ্যাপ্টা, নাকবোঁচা, মঙ্গোলীয়ান ধাঁচের, ওসব দেশের মূর্তিগুলোও তেমনি অন্য ধরনের। সমতলের মূর্তির সঙ্গে কোনো মিল খুঁজে পাবেন না। প্রথম প্রথম একটা-দুটো সংগ্রহ করেছি। পরে কেমন নেশায় পেয়ে বসলো। ফুন্টসোলিং-এ এসে কোন কুক্ষণে মহাভাগের সঙ্গে পরিচয়। সে নিজেকে ভূটান রাজবংশের লোক বলে জাহির করলো। বললো সে একজন মহাতান্ত্রিক অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সে মূর্তিচোরদের খাস সর্দার। আমার মশায় হিসেবের পয়সা, তা সত্ত্বেও প্রথম দিকে কয়েকখানা মূর্তি বেশ ভালদামে মহাভাগের এজেন্টের কাছ থেকে নিয়েছি। ঐ গুরুং আর বাহাদুর দুটোই মাঝে মাঝে মূর্তি নিয়ে আনাগোনা করতো। মাস দুই আগে, তখনো মহাভাগ আপনাদের খপ্পরে পড়েনি, ওর ঐ দুই চেলাকে আমার কাছে পাঠায় এক ডজন বিভিন্ন ধরনের মূর্তি নিয়ে। বারোটা মূর্তির মধ্যে দুটো তান্ত্রিক বুদ্ধমূর্তি আমার চোখে লেগে গেল। আমি ঐ দুটোকে আমার কাছে রেখে বাকিগুলো ফেরৎ দিয়ে দিলাম। কিন্তু দাম হিসেবে ওরা যা চাইলো সেটা অকল্পনীয়। বললো মহাভাগ ঐ দুটো মূর্তির জন্য দশ লাখ টাকা চেয়েছে। আমি দুজনকেই একরকম খেদিয়ে দিয়ে বললাম বিশ হাজারের এক পয়সা বেশি যেন ওরা আশা না করে। আসলে দুটো মূর্তিই দামী, বাকিগুলোর তেমন চাহিদা নেই। বিদেশী বাজারে এই দুটোর দাম অনেক বেশি তা মানছি। কিন্তু আমি ফালতু টাকা ঢালবো কেন!

ওরা দুজন চলে যাবার পরেই মহাভাগ তল্পিতল্পা সমেত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। গুরুং আর বাহাদুরের উদ্দেশ্য ছিল ওদের গুরু ধরা পড়ে গেছে, এবারে গুরুর উপরেই বাটপাড়িটা সেরে নেয়। এদিকে গুরুও চুপচাপ বসে নেই, মনে হয় জেল থেকেই তার অন্য চেলাদের এই দুজনের উপর শোধ নেবার জন্য পাঠিয়ে দেয়। আমি শান্তিপ্রিয় লোক, কোনো সাতে পাঁচে থাকি না, নিজের কিছু শখ-আহ্লাদ নিয়ে দিন কাটাই। তা মশাই, এই বুদ্ধমূর্তি দুটো আমার কাছে গচ্ছিত থাকার পর কি অশান্তি, কি অশান্তি! হঠাৎ রাতবিরেতে হুমকি দেওয়া ফোন আসা শুরু হলো। মূর্তি ফেরৎ দে, নাহলে ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে দেবো। তারপরে যখন-তখন ঢিল-পাটকেল ছুঁড়াছুঁড়ি। ভাগ্যিস বাড়িটা বাউণ্ডারী ওয়াল থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ঢিল-পাটকেল ওয়াল টপকে ফেললেও ঘরের জানলা পর্যন্ত পৌঁছয় না। এরপরে বাজারে যাই তো, পেছনে কেউ ফেউয়ের মতো সেঁটে থাকে, অজানা-অচেনা সব গুণ্ডার মতো লোকগুলো। এদিকে না বেরিয়েও উপায় নেই। পেটে তো অন্ন দিতে হবে। আরো আছে এই পুষ্যিগুলো, ওরা আবার

নির্ভেজাল মাংসাশী, দুধভাত মুখে রোচে না। এদেরও ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা চাই। এসবের ব্যবস্থা করতেই দিন দশেক আগে বিকেলে বেরিয়েছি। বাজার খুব একটা দূর নয়, হেঁটেই যাই। আমাদের চন্দ্রহাটি জায়গাটা খুব শান্ত, কখনো কোনো ঝুটঝামেলা দেখিনি। সন্ধ্যে নাগাদ ফিরছি, বাড়ির কাছাকাছি কলাবাগানের ভেতর থেকে বিটকেল আওয়াজ আর তারপরই দুটো ভুঁইপটকার মতো কিছু ফাটলো আমার দু'পাশে। ভয়ে আমি চোঁচা দৌড় লাগালাম। কোনোমতে পৈতৃক প্রাণটি নিয়ে গেট পর্যন্ত পৌঁছেছি, সাঁই সাঁই করে দুটো পিস্তলের গুলি দু'কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। বাড়ির ভেতরে তাড়াতাড়ি ঢুকে গেট বন্ধ করে দিলাম। তাও কি রক্ষা আছে! দূর থেকে থেমে থেমে এমন বিদকুটে একটা হাসি ভেসে আসছিল, যা শুনলেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়।

রামসুন্দরবাবু থামলেন। রণজিৎ তন্ময় হয়ে শুনছিল, কথায় ছেদ পড়তেই বললো, তারপর?

রামসুন্দরবাবু বললেন, তারপর আর কি! আটদিন আগে রেশম বাহাদুর একাই এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে, তার কাছেই জানলাম নরজান গুরুং-এর শোচনীয় সংবাদ। রেশম এ যাত্রায় দু'লাখে নেমেছিল। আমি আর ঝঞ্ঝাটে যাই! দুটো বুদ্ধমূর্তিই আমি রেশমকে ফেরৎ দিয়ে বললাম, তোর আপদ তুই নিয়ে যা!

সুশান্ত প্রায় আপসোস করে বলে উঠলো, সে কী মিত্তিরমশাই, আপনি মূর্তিদুটো ফেরৎ দিয়ে দিলেন!

দোরজি এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, এইবারে মুখ খুললেন, মিঃ মিটার, আপনি বললেন দশদিন আগে আপনার কানের পাশ দিয়ে দুটো পিস্তলের গুলি বেরিয়ে গেল। আপনি নিশ্চিত জানেন, সেগুলো পিস্তল? না রিভলবার থেকে ফায়ার করেছিল? ফায়ার্ড কাটরিজগুলো আপনি দেখেছিলেন কি?

রামসুন্দরবাবু বললেন, আপনি তো পুলিশের লোক। মশাই, আমার বাড়িতে পিস্তল, রিভলবার, দোনলা বন্দুক কি নেই! আমার বাবার আবার পিস্তল আর রিভলবারের শখ ছিল। আমার হেফাজতে আপাতত আছে .৩২ কোল্ট পিস্তল, .৩৮ স্মিথ ওয়েসন রিভলবার আর .১২ বেলজিয়ান ডাবল ব্যারেল গান।

ছেলেবেলায় অনেক ফায়ার প্র্যাকটিস করেছি, আওয়াজ শুনেই বলে দেবো কোনটা পিস্তল আর কোনটা রিভলবার! আর আমার বাড়িতে যে এসব আগ্নেয়াস্ত্র আছে, আশেপাশের সব মস্তানরাই সে খবর রাখে। কাজেই বাড়িতে ঢুকে আমাকে ঘায়েল করবে সে বুকের পাটা কারো নেই। তাছাড়া আমার কুকরগুলো সারাক্ষণ ছাড়া থাকে, ওদের ডিঙিয়ে কেউ ঢুকতে পারবে!

দোরজি হঠাৎ ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, আমারও চারটে ভুটানী কুকুর, ওদের খুব মিস করছি আমি! কুকুর তো নয় যেন টর্পেডো, কি ভালবাসতেই না জানে!

সুশান্ত বললো, দোরজি সাহেব আপনি কি ভেবেছিলেন বুদ্ধমূর্তিগুলো পেয়ে যাবেন এখানে এলেই? আপনার হিসেব মতো আরো দশটা তান্ত্রিক সাধুর মূর্তিও হাপিস হয়েছে, তাদের জন্য কি ব্যবস্থা?

দোরজি বললেন, ব্রাদার সুশান্ত, দশটা তান্ত্রিক সাধুর মূর্তি ভূটানের বাজারে ওজনদরে

বিক্রি হয়, ওদের জন্য আমি মোটেও ভাবিত নই। এই দুটো বুদ্ধমূর্তির মূল্যায়ন করা খুব মুশকিল। যেমন তাদের অসাধারণ শিল্পশৈলী, তেমনি ঘটেছে ধাতুর মণিকাঞ্চন যোগ। এছাড়া রাজপরিবারে বংশপরম্পরায় রক্ষিত ভগবান বুদ্ধের মূর্তি গুম হয়ে যাওয়া অতি দুর্লক্ষণ।

সুশান্ত বললো, অতঃকিম? কোন পথে এগোবেন এবারে?

দোরজি চিন্তিত মুখ নিয়ে বললেন, রাস্তা একটাই খোলা। মহাভাগ এখন দিল্লীর তিহার জেলে ওর অন্য বিদেশী চোর ভাইদের সঙ্গে অন্তরীণ।

অনেকগুলো মূর্তিচুরি কেসের তদন্ত সি. বি. আই করছে দিল্লীর দফতর থেকে। মহাভাগকে আরেকপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়। কারণ এটা নিশ্চিত, জেলে গেলেও বাইরের দোস্তদের সঙ্গে ওর নিয়মিত যোগাযোগ চলছেই এবং সুচারুভাবে নিজের চক্করও চালিয়ে যাচ্ছে।

রামসুন্দরবাবু বললেন, এহেন সমস্যায় মুশকিল আসান হলেন আপনাদের রায়মশাই। কিন্তু তিনি তো পুলিশ ছেড়ে একরকম সন্ন্যাস নিয়ে বসেছেন।

সুশান্তবাবুর নামটা ওনার কাছেই শুনেছি।

সুশান্ত বললো, মিত্তিরমশাই, আমরা এবারে যাবো। চিন্তা করছি, উপায় একটা হবেই।

গাড়িতে উঠতে যাবে সুশান্ত, রণজিৎ আর দোরজি, একসঙ্গে তিনজনের মাথায়ই যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। মিত্তিরমশাই সশব্দে গেট বন্ধ করে দিয়েছেন ততক্ষণে। দোরজির আর্দালী গাড়ির দরজা খুলতে না খুলতেই কুপোকাৎ। ড্রাইভারের চোখের সামনে পাইপগান ঠেকিয়ে একটা সিড়িঙ্গে লোক, সে বেচারা নড়তে-চড়তে পারছে না, নড়লেই থ্রি-নট-থ্রি বুলেট কপাল ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে। রণজিতের শারীরিক ক্ষিপ্রতা ততটা নয়, দু'ফুট লম্বা বেতের ছড়ি কাঁধে নামতেই ভূমিশয্যা নিয়েছে। দোরজি পুলিশের হোমরাচোমরা অফিসার, এককালে জুজুৎসু করেছেন। আচমকা আঘাত ঘাড়ের কাছে নামতে নামতেই একটু সরে এসেছেন। আঘাত তেমন জমেনি, নিজেকে সামলে নিয়ে গাঢ় অন্ধকারে প্রতিপক্ষর মুকাবিলার জন্য তৈরি হচ্ছেন। সুশান্ত অন্য ধাতুতে গড়া। আততায়ীর আঘাত শুধু ফুলের মতো তার পিঠ ছুঁয়ে গেছে এবং পরমুহূর্তেই তার বজ্রমুষ্টি আততায়ীর চোয়ালে আছড়ে পড়েছে। সে আঘাতে কয়েকখানা দাঁত নিশ্চিত খুলে পড়েছে এবং লোকটিও কাটা গাছের মতো ভূশয্যায় নিশ্চল। ততক্ষণে দোরজির লুগার পিস্তল সিড়িঙ্গে লোকটার মাথায় ঠেকানো হয়ে গেছে, আর্দালী ভূমিতল থেকে উঠে পড়ে রণক্ষেত্রে ভীমসেনের মতো একটি হুঙ্কার ছেড়ে কোমর থেকে .৪৫ রিভলবার বার করেই দুদ্দাড় দু'রাউণ্ড চালিয়ে দিয়েছে অন্ধকার কলাবাগানের দিকে তাগ করে।

সুশান্ত চেঁচিয়ে বললো, ব্যাস, ফায়ার মৎ করো। পঁয়তাল্লিশ বোরকা গোলিসে হাতি মর যাতা, আদমীকা বাৎ কেয়া!

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার কলাবাগানের ভেতরে দুপদাপ আওয়াজের সঙ্গে গোটা দুই গুলির আওয়াজও ভেসে এল।

রণজিৎ এতক্ষণে সামলে উঠে সিড়িঙ্গে লোকটার হাত থেকে পাইপগান ছিনিয়ে নিয়েই এক চপেটাঘাত। আওয়াজটা ছোটখাটো পটকা ফাটার চেয়ে কম হলো না।

সুশান্ত ইতিমধ্যে আততায়ী লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে গাড়ির সিটের নিচে শুইয়ে দিয়েছে। সিড়িঙ্গেকে আরো কয়েকটি চপেটাঘাত করে রণজিৎ গাড়ির ভেতর চালান করে দিল তারপর সবাই উঠে পড়লো গাড়িতে। সুশান্ত সামনে বসতে বসতে বললো, কম করেও পাঁচ-ছটা বদমাশ ছিল, দুটোকে ধরে ফেলেছি, এটাই লাভ। আপাতত এ দুটোকে চন্দ্রহাটি পুলিশ আউটপোস্টে গচ্ছিত রেখে একটু অন্য কাজ সেরে আসা যাক।

অতঃপর সুশান্তর নির্দেশে গাড়ি দু' ফার্লং চলার পর চন্দ্রহাটি আউটপোস্টের দেখা মিললো। আউটপোস্টের ইনচার্জ সাব-ইন্সপেক্টর চৌধুরী হাজির থাকতে সুবিধেই হলো। সুশান্ত সংক্ষেপে নিজের এবং দোরজির পরিচয় দিতেই কাজ হলো চৌধুরী বললেন, স্যার, এ দুটোকে তিনি। রোগাটা অন্ধ্রের লোক, নাম রাও, অন্যটা রাজপুত, নাম বৈঞ্জু। দুটোই নামকরা গুণ্ডা। কয়লা চুরি, ওয়াগান ভাঙা, খুনখারাপি কোনো বিদ্যেই বাকি নেই। পয়সা পেলে যেকোনো কুকর্মে রাজী। এদের বিরুদ্ধে অনেক কেস ঝুলছে। ধরা পড়াতে ভালোই হলো। সুশান্ত বললো, আপনার কাছে এরা আপাতত থাক, লকাপে পুরে রাখুন। এদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। সি. বি. আই., সি, আই. ডি., ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট সকলে একসঙ্গে কাজ করছে এই কেসটায়। আমরা একটু বাদে এসে আবার এদের চার্জ নেবো।

গাড়ি আবার চললো। এক ফার্লং যেতে না যেতেই একটা গেট পেরিয়েই অন্য এক জগৎ। আম, জাম, কাঁঠাল, নানান ফুলের, নানা রঙের বাগানওয়ালা সব বাংলো আলোয় আলোয় ঝলমল। সুশান্তদের গাড়ি একটি দোতলা বাংলোর সামনে দাঁড়াতেই এক দীর্ঘকায় ঋজু শরীর প্রৌঢ় বেরিয়ে এলেন গেটের কাছে। মনে হলো খাপখোলা তলোয়ার! কাটা কাটা বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। সুশান্তকে দেখেই বললেন, 'আরে মাস্টার, পৌঁছে গেছো তাহলে? বুদ্ধমূর্তির সন্ধান মিললো?

দোরজি পুলিশের বড় অফিসার, নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে বিলক্ষণ সচেতন। সেই দোরজির মতো লোকই একলাফে গাড়ি থেকে নেমে সুশান্তর প্রণাম করা শেষ হতে না হতেই আগন্তুকের পা ছুঁয়ে বলে উঠলেন, আমার কী সৌভাগ্য! রায়সাহেব, আপনার দেখা এখানে পাবো আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না।

রায়সাহেব একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, মিঃ দোরজি, আপনি আমাকে প্রণাম করতে গেলেন কেন?

দোরজি বললেন, আপনাকে প্রণাম করবো না এটা হতে পারে স্যার! পুলিশে ঢোকার পর আপনার কাছেই আমার প্রথম দীক্ষা ডিটেকটিভের কাজে। ভুটান পুলিশ আমাকে সেদিন ট্রেনিং-এর জন্য লালবাজারে পাঠিয়েছিল বলেই এই প্রফেশনে কিছু করে দেখাতে পারছি।

সুশান্ত বললো, স্যার, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টটাই একদিন আপনি তৈরি করেছিলেন। আপনার আশীর্বাদ আর পরিচালনায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বা এফ. বি. আই-এর সমতুল্য ছিলাম আমরা। আর আজ আপনিই স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিলেন পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের চাকরি থেকে!

রায়সাহেব বললেন, সুশান্ত, পুলিশের কাজ দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। সারা জীবন সে কাজটাই বুঝেছি, চাকরির শেষ পর্যায়ে এসে চাকরিতে রাজনীতি মেলাতে পারলাম না। এজন্যেই সসম্মানে সরে এসেছি।

সুশান্ত বললো, অপরাধে নিয়ন্ত্রণে আপনার উপদেশ আর অনুপ্রেরণা আজ আর পাই না, কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগে। আপনি কোলকাতায় ফিরে চলুন স্যার। নাহলে আমাকেও আপনার সাথী করে নিন।

রায়সাহেব বললেন, মাস্টার, তোমার সামনে বিরাট সম্ভাবনা, তুমি যা করছো করে যাবে। আমি খানিকটা আত্ম-অনুসন্ধান করছি। সময় বুঝলে আবার কোলকাতায় ফিরে যাবো। কিন্তু তোমাদের কাজটা তো একটু সুরাহা করে দেওয়া উচিত। তোমরা দুটো গুণ্ডাকে ধরে চন্দ্রহাটি আউটপোস্টে রেখে এসেছো সে খবর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি পেয়ে গেছি। আসলে এই পুলিশ ফাঁড়িটা তৈরি হয়েছে আমাদের সংস্থার পয়সায় এবং জমিটাও আমাদের। দশ মিনিটের মধ্যে আমার কাছে দুটো ফোন এসেছে, একটা রামসুন্দর মিত্রের, আরেকটা চন্দ্রহাটি ফাঁড়ির ইনচার্জের কাছ থেকে। তোমাদের মিশনটা কি মোটামুটি বুঝে নিয়েছি। যে দুটো গুণ্ডাকে তোমরা ধরেছো, এরা লালা বলে একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধির গ্যাঙের লোক। এদের পয়সা দিয়ে এ কাজে লাগিয়েছে বিদেশী মূর্তিপাচার চক্র। তোমাদের মহাভাগ একজন বড়সড় এশিয়ান এজেন্ট; এদের আসল কর্তা লণ্ডনের আশেপাশে থাকে, ওকিং শহরে এরই একটা ঘাঁটি ধরা পড়েছিল। লালা আসলে রাজস্থানের লোক, কিন্তু ওর কাজের জায়গা মূলত পশ্চিমবঙ্গ আর বিহারে। আমার কাছে খবর আছে আজকাল ও আলোয়ার শহরে অন্য নাম নিয়ে ঘাপটি মেরে আছে। আলোয়ার রাজস্থানের একটা ছোট্ট শহর, দিল্লী থেকে একশো সত্তর কিলোমিটার। চমৎকার পাহাড়ী জায়গা, আরাবলী পাহাড়ের গায়ে গা ঠেকিয়ে আছে। ওখানকার প্যালেস হোটেলে ক'দিন থাকতে হয়েছিল কয়েক বছর আগে। জয়পুরের এস, পি. ভ্রমর সিং সে সময় আমার সঙ্গে ছিলেন, খুব হৃদ্যতাও হয়েছিল। এখন তিনিই রাজস্থানের আই. জি। সুশান্ত, একটা কাজ করো। ফেরার পথে মগরা থানায় একটা ইন্টিমেশন যখন রেকর্ড করাবে, ভ্রমর সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো তখন। অত্যন্ত কাজের লোক, তার কানে ঢুকিয়ে দিতে পারলে লালাকে তিন তুড়ি মেরে ধরে নেবেন। আর লালা ধরা পড়লেই গুরুং এবং বাহাদুরের খুনের মীমাংসা হয়ে যাবে।

পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, রাত দশটা বেজে গেল। খাওয়াটা আমাদের গেস্ট হাউসে এখনই সেরে নেরে, না মূর্তিচুরির আরেকটু তদন্ত করে নেবে?

কেউ কিছু বলার আগেই রণজিৎ বললো, না না স্যার, আগে কাজ, পরে আহার।

গাড়ি আবার স্টার্ট নিল। এবারে রণজিৎ দোরজির আর্দালীর পাশে সামনের সীটে স্থান করে নিল। সুশান্ত, দোরজি আর রায়সাহেব বসলেন পেছনের সীটে। রায়সাহেবের নির্দেশে গাড়ি আবার যেখানে এসে বাঁক নিল তার সামনে সুনসান কলাবাগানের পাশেই বিশাল জায়গা নিয়ে রামসুন্দর মিত্রের সেই বাড়ি। গাড়ি থামতেই রায়সাহেব তাঁর সহজাত ক্ষিপ্রতায় গাড়ি থেকে নেমে কলিংবেল টিপলেন। আবার শুরু হলো আটটা কুকুরের কর্ণত্রাসী কোরাস এবং একটু পরেই দোতলার বারান্দা থেকে রামসুন্দরবাবুর

চিলের মতো চিৎকার, কে, কে ওখানে?

রায়সাহেব চেঁচিয়ে কথা বলেন না, কিন্তু তাঁর উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যই এমন যে তাঁর প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার শোনা যায়। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, রামসুন্দর, চেঁচামেচি করবে না, আমি এসেছি, দরজাটা খুলে দাও।

রামসুন্দরবাবু প্রায় উড়ে নেমে এলেন, বললেন, সে কী, সে কী, কি সৌভাগ্য, রায়মশাই আপনি স্বয়ং!

এদিকে আটটা কুকুরের হুলস্থুল। রামসুন্দরবাবু শশব্যস্তে আটটাকেই তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ির কেনেলে ঢুকিয়ে দিলেন।

রায়সাহেব কোনো ভূমিকা না করেই জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, রামসুন্দর, বুদ্ধমূর্তি কোথায়? কবে আপদ বিদেয় করেছি!

রায়সাহেবের দু'চোখ দপ করে জ্বলে উঠলো, যেন আগুন, হিস হিস করে বললেন, রামসুন্দর, এ বয়সে জেলের ঘানি টানবে? সুশান্তর হাতের কাজ খুব চমৎকার, তোমার শুকনো চামড়া শরীর থেকে খুলে বার করে নেবে! দোরজিরও অনেক ভূটানী দাওয়াই আছে, পরখ করবে নাকি? দোরজি আর সুশান্ত দুজনেই ছেলেমানুষ। ওদের ধাপ্পা দিলেও আমায় মিথ্যা বলছো, তোমার ধৃষ্টতা তো কম নয়! মূর্তিদুটো তোমার কাছেই আছে, তুমি কস্মিনকালেও বাহাদুরকে ফিরিয়ে দাওনি। বাহাদুর খুন হবার পর তোমার উপর মিছিমিছি হামলা হবে কেন? তাছাড়া একটু আগে সুশান্ত আর দোরজির উপর আক্রমণ করা হয়েছিল এটা ভেবেই যে তুমি হয়তো মূর্তিদুটো ওদের হাতে সঁপে দিয়েছো। যদি বাঁচার ইচ্ছে রাখো, নিজের শখ আর লোভ সামলে মূর্তিদুটো এদের হাতে দিয়ে দাও, তোমার কোনো লোকশান হবে না।

এতক্ষণ রামসুন্দরবাবুর দোতলার ড্রয়িংরুমে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল।

রামসুন্দরবাবু এক মিনিট সময় নিলেন। ড্রয়িংরুমের দেয়ালে একটি চামুণ্ডামূর্তির ছবি। রামসুন্দরবাবু সেটি সরাতেই পেছনে দেখা গেল একটি গোল বোতাম। বোতাম টিপতেই বেরিয়ে পড়ল ১২ × ১২ পরিসরের একটি গুপ্ত চেম্বার।

রামসুন্দরবাবু চেম্বারে হাত ঢুকিয়ে যা বার করে নিয়ে এলেন তা দেখে কারো চোখের আর পলক পড়ে না! দুটি একই ধরনের বুদ্ধমূর্তি। চোখ, কর্ণবলয়, শরীর সবই সাধারণত দেখা বুদ্ধমূর্তির থেকে আলাদা। গঠনশৈলী এবং ধাতুর মিশ্রণ এমন যে ঘরের আলো পড়ে মূর্তিদুটো থেকে একরকম দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

দোরজি দু'হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। রায়সাহেব মূর্তিদুটো রামসুন্দরবাবুর হাত থেকে নিয়ে দোরজির হাতে দিয়ে বললেন, মাস্টার, এ অমূল্যধন আপনিই ফিরিয়ে নিয়ে যান।

দোরজি বললেন, স্যার, আজ দুনিয়ায় সব সেরা সুখী যদি কেউ থাকে সে হলাম আমি। আপনি যাদের ভালবাসেন তাদের মাস্টার বলে সম্বোধন করেন। আপনার প্রিয়পাত্রদের মধ্যে আমিও একজন হলাম, এর বেশি খুশির আর কী থাকতে পারে!

রায়সাহেব স্মিত হাসলেন।

অদৃশ্য দরজা

pathagar.net

তপন সেন

আমার নাম তন্ময় মিত্র। থাকি গোল পার্কের কাছে। আমি দু'বছর আগে অঙ্কে এম. এ. পাশ করেছি, এবং বর্তমানে ফলিত গণিতে রিসার্চ করছি। মনে হয়, আরও বছরদুয়েকের মধ্যেই পিএইচ. ডি. ডিগ্রি পেয়ে যাব।

আমার বড়দা চিন্ময় মিত্র আমার চেয়ে প্রায় সতেরো বছরের বড়। তিনি দশ বছর আগে আমেরিকায় যান, এবং বর্তমানে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। বড়দার একটিমাত্র সন্তান, কিন্তু সে আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক নয়। দেশে ছেলের কোনওরকম চিকিৎসার সুবিধে হল না দেখে, তিনি ভেবেছিলেন বিদেশে হয়তো কিছু একটা ব্যবস্থা হতে পারে। চিকিৎসার ব্যাপারে সেখানেও বিশেষ কোনও সুবিধে হল না, কিন্তু দাদা, বউদি বরাবরের মতো আমেরিকাতেই থেকে গণিতে পিএইচ. ডি. করে, বর্তমানে তিনি আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন।

আমার সেজদার নাম মৃন্ময় মিত্র। সেও আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়। এবং সে-ও গণিতে এম.এ.। সেজদাও কলকাতার একটি কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক। আমার

বাবা বালিগঞ্জের একটা স্কুলে অঙ্ক শেখাতেন। অঙ্ক এবং শিক্ষকতার প্রতি অনুরাগ আমরা সকলেই বোধ হয় উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। পিএইচ. ডি. ডিগ্রির পর আমারও শিক্ষকতার লাইনে থাকার ইচ্ছে।

এম. এ. পড়তে-পড়তে একটি ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তার নাম কৌশিক রায়। কৌশিকও আমার মতো ফলিত গণিতে রিসার্চ করছে। ছেলেবেলায় আমার বিশেষ কেউ বন্ধু ছিল না। আমি স্কুলের গণ্ডি পেরনোর আগেই বড়দা বিদেশে চলে যান, মেজদাও আমার চেয়ে অনেক বড়। তাঁদের সঙ্গে আর কতখানি ঘনিষ্ঠতা সম্ভব? কৌশিককে পেয়ে আমি একই সঙ্গে বন্ধু এবং ভাই পেলাম।

গণিত ছাড়াও কৌশিকের অন্য একটা দিকে বেশ 'ন্যাক' আছে। ইতিমধ্যেই কৌশিককে ছোটখাটো একজন সখের ডিটেকটিভ বলা চলে। আমাদের পাড়ায় রবিন রাহা নামে এক ভদ্রলোক থাকেন, তাঁকে আমরা পাড়াসুদ্ধু সকলেই রবিনদা বলে ডাকি। বছরখানেক আগে রবিনদার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল। পুলিশ কিছুতেই সেই ডাকাতির কিনারা করতে পারছিল না। কৌশিক সমস্ত ঘটনা শুনে, ওই অনুমানের জোরে, ডাকাতদলের সর্দারকে খুঁজে বের করেছিল। কৌশিকের সাহায্যে পুলিশ যখন ডাকাতের দলকে গ্রেফতার করল, তখন আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, ওরা আমাদের সকলেরই বিশেষ চেনা বন্ধুস্থানীয় কয়েকটি ছেলে। আমি ঘটনাটিকে 'রাহা বাড়ির রহস্য' নাম দিয়ে গোয়েন্দা গল্পের কায়দায় লিখে রেখেছি, আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে কোনও মাসিক পত্রিকায় সেই গল্প ছাপা হবে।

কৌশিকের যেমন বুদ্ধি আছে, তেমনই বুদ্ধির গর্বও আছে। আমার সঙ্গে যখন ওর অল্পস্বল্প ঘনিষ্ঠতা হল, এবং ও যখন জানল, আমরা মোট তিন ভাই, এবং আমিই সবচেয়ে ছোট, ও হঠাৎ একদিন বলে উঠল, "নিশ্চয়ই তোমার দাদাদের নাম চিন্ময় এবং মৃন্ময়, কেমন, ঠিক কি না?"

"তুমি কীভাবে জানলে?" ওর নির্ভুল অনুমান দেখে আমি ভীষণ অবাক হলাম।

"অনুমান বলতে পারো, লজিকাল অনুমান," কৌশিক বিজ্ঞের মতো হেসে বলল।

কৌশিকের মুখের হাসি দেখে আমার গা জ্বলে গেল, কিন্তু তবু জিজ্ঞেস করলাম, "কীভাবে অনুমান করলে, সেটাই তো জানতে চাইছি!"

"সব জিনিসকে 'দুই আর দুইয়ে চার'—এর মতো সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না," বলল কৌশিক, 'যদি তুমি তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাই হতে, এবং তোমার নাম যদি 'তন্ময়' হত, তবে অন্য ভাইদের নাম 'চিন্ময়' এবং 'মৃন্ময়' না-ও হতে পারত।"

"কিন্তু, কেন?" আমি ঈষৎ অধীর হয়ে বললাম।

আমার অধৈর্য দেখে ও হাসল, বলল, "এ প্রশ্নের উত্তর ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত, মনে-মনে অনুভব করতে হয়। তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পে এক মেয়ের নাম ছিল 'চারুশীলা' এবং তার ছোট বোনের নাম ছিল 'মেঘুশীলা'। বড় মেয়ে চারুশীলা বলেই ছোট মেয়ের নাম মেঘুশীলা রাখবার কথা মনে হয়েছিল গল্পের বাবা-মায়ের। লেখকের মনের মধ্যে যা-ই থাকুক না কেন। তোমার বেলায়ও তাই। তোমার দাদারা 'চিন্ময়' এবং 'মৃন্ময়' বলেই তুমি 'তন্ময়' হয়েছ।

বুঝলে?”

আমি তন্ময় হয়েই ওর কথার মধ্যে যুক্তি খুঁজছিলাম, কিন্তু আমাকে নিরাশ হতে হল। বললাম, “তোমার ওসব উলটোপালটা যুক্তি আমার মাথায় ঢুকবে না, তাই প্লিজ, তুমি এবার থামো।”

কৌশিকের সঙ্গে এসব কথাবার্তা হয়েছিল আমাদের পরিচয়ের একেবারে গোড়ার দিকে। তারপর আমাদের ঘনিষ্ঠতা আরও অনেক বেড়েছে। বাবা, মা, মেজদা, সবাই কৌশিককে বাড়ির লোক বলেই ভাবেন। গতবছর গরমের ছুটিতে বড়দা এসেছিলেন আমেরিকা থেকে, বড়দারও ওকে খুব পছন্দ হয়েছিল।

আমি একদিন বড়দাকে বললাম, “আমরা তো এখনও চাকরি-টাকরি করি না, এখনও আমাদের হাতে সময় আছে, তুমি যদি ভিসার ব্যবস্থা করে দাও, তবে দু-চার মাসের জন্য আমরা আমেরিকায় বেড়িয়ে আসতে পারি।”

বড়দা বললেন, “আচ্ছা, দেখি।” আমরা পাসপোর্ট তৈরি করালাম এবং ভিজিটার্স ভিসার জন্য দরখাস্ত করলাম। আমরা যতদিন আমেরিকায় থাকব, ততদিন দাদা আমাদের খরচের ভার নেবেন, এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি আমেরিকান কনসাল হাউস-এ চিঠি পাঠালেন। আমাদের কপাল ভাল, দু'জনেরই ভিসা মিলল। আমরা গরমের ছুটির সময় আমেরিকা রওনা হলাম।

ওদেশে গিয়ে প্রথম দুটো সপ্তাহ ওদের ইংরেজি উচ্চারণ বুজতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, তারপর এখন ক্রমশ গা-সহা হয়ে গেছে। দেখলাম, আমেরিকার বারো-তেরো পার্সেন্ট মানুষ কালো, বেশ কিছু বিদেশি, এবং বাকি সবাই সাদা মানুষ।

এককালে আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের ক্রীতদাস হিসেবে ধরে আনা হয়েছিল, বর্তমানে দাসপ্রথা উঠে গেছে, সাদা মানুষদের মতো কালোরাও এখন আমেরিকার স্বাধীন নাগরিক।

আমেরিকানরা সাধারণত বেশ হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল মানুষ। এখানকার সর্বত্রই শনি এবং রবিবার ছুটি। সপ্তাহের পাঁচটা দিন সকলে ভূতের মতো খাটে, বাকি দুটো দিন যথাসাধ্য আরাম করে। মানুষের রোজগার ভালই, কিন্তু খরচও যথেষ্ট। বেশিরভাগ মানুষই যা রোজগার করে, সবই খরচ করে ফেলে। তবে অধিকাংশ মানুষেরই মোটামুটি দিন চলে যায়। ষোলো বছরের নীচের ছেলেমেয়েরা বাদে, এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা, প্রায় সকলেরই একটা করে গাড়ি আছে, এবং সবাই গাড়ি চালাতে জানে।

আমেরিকায় বন্দুক কেনার ব্যাপারে সরকারি বিধিনিষেধ প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে, ঘরে ঘরে সকলের হাতেই মারণাস্ত্র। তাই, এদেশে সুইসাইড এবং হোমিসাইড-এর সংখ্যা পৃথিবীর অন্য যে-কোনও দেশের তুলনায় অনেক বেশি। এ-দেশের প্রায় সর্বত্র মাদক কেনাবেচা এবং ব্যবহারের ব্যাপারে বিধিনিষেধ ভীষণ কড়া। মাদক প্রস্তুত করা এবং বেচাকেনা করা, দুই-ই ঘোর বেআইনি। কিন্তু, লোকের হাতে পয়সা আছে, তাই মাদকের ব্যবহারে কিছু কমতি নেই। দেশের কিছু লোক লুকিয়ে মাদক প্রস্তুত করে। তা ছাড়া, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশ থেকে নিয়মিতভাবে প্রচুর পরিমাণে মাদক দ্রব্য বেআইনি পথে এ-দেশে ঢোকে। যারা ধরা পড়ে, তাদের কঠিন

শাস্তি হয়, কিন্তু মাদকের ব্যবহার এবং চোরা কারবার কোনওটাই মোটেই কমেনি।

আমেরিকায় রাস্তাঘাট খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সারা দেশে অসংখ্য রেস্তরাঁ। রেস্তরাঁয় খাবার লোকের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। খাবারে ভেজাল নেই এবং সব খাবারেই অল্পবিস্তর ভিটামিন মেশানো থাকে, তাই এ দেশে পা দেওয়ার পনেরো-কুড়ি দিনের মধ্যেই আমাদের দু'জনেরই স্বাস্থ্য ফিরে গেল।

সপ্তাহের পাঁচদিনই বড়দা এবং বউদি দু'জনেই সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকেন। ছেলের জন্য একজনকে সবসময় বাড়িতে থাকতে হয়। তাই, ওঁরা নিজেদের রুটিন সেইভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন। বড়দা দিনের বেলায় ইউনিভার্সিটিতেই থাকেন, বিকেলে বাড়ি আসেন। বউদি দিনের বেলায় বাড়ি থাকেন, দাদা ফিরলে উনি একটা সান্ধ্য কলেজে পড়াতে যান। এ-দেশে সমস্ত কাজই সকলের নিজের হাতে করতে হয়, তারই মধ্যে দু'জনেই আবার ব্যায়ামের আখড়ায় গিয়ে নিয়মিত ব্যায়াম করেন। শনি-রবিবার ওঁরা আমাদের নিয়ে নানা জায়গায় বেড়াতে যায় কিন্তু সপ্তাহের বাকি পাঁচটা দিন আমাদের নিষ্কর্মার মতো ঘরে বসে কাটাতে হয়। আমি একদিন বড়দাকে বললাম, "আমাদেরও ব্যায়ামের আখড়ায় নিয়ে চলো। সারাদিন খাওয়া আর ঘুমনো ছাড়া কোনও কাজ নেই, আমরা বসে-বসে শুধু ভুঁড়ি বাগাচ্ছি।"

বড়দা বললেন, "নট এ ব্যাড আইডিয়া। আজই চল, তোদেরও জিমের মেম্বার বানিয়ে দিই।"

'জিম' মানে জিমনাশিয়াম। অর্থাৎ, ব্যায়ামের আখড়া। ওখানে গিয়ে আমরা দু'জনেই একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। একেবারে এলাহি ব্যাপার। বিরাট একটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে সবই আছে। বিল্ডিংটা আগাগোড়া শীততাপনিয়ন্ত্রিত। বিল্ডিংয়ের মধ্যে চারপাশ জুড়ে হাঁটবার ট্রেল। ব্যায়ামাগারটা দুটো তলায় ভাগ করা। নীচের তলায় গোটা মেঝেটা পালিশ-করা চকচকে কাঠের তক্তা দিয়ে ঢাকা। সেখানে ছোট-মাপে ভলিবল, বাস্কেটবল ইত্যাদি কয়েকটি খেলা প্র্যাকটিস করার ব্যবস্থা আছে। ওপরের তলায় মাঝখানটা ফাঁকা। পুরো বিল্ডিং ঘিরে চারপাশ দিয়ে হাঁটবার ট্রেল। একদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে নানা ধরনের ব্যায়ামের মেশিন। বিল্ডিংটা এত বড় যে, হাঁটবার ট্রেল ধরে মাত্র আটবার চক্কর মারলেই এক মাইল বা ১.৬ কিলোমিটার হাঁটা হয়ে যায়।

বড়দার সঙ্গে আমরা যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে। গিয়ে দেখি, ভেতরে অসংখ্য লোক। বেশিরভাগই নানা ধরনের ব্যায়ামে ব্যস্ত। কাউন্টারের সামনে কিছু চেয়ার এবং সোফা পাতা। কিছু লোক আবার সেখানে বসে জটলা করছে।

কাউন্টারের ভেতরে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। বয়স বড়দার মতো, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। বড়দা তাঁকে বললেন, "জিম, দিস ই'জ মাই ব্রাদার তন্ময় মিত্র, অ্যাণ্ড দিস ইয়ংম্যান ইজ হিজ ফ্রেণ্ড। হিজ নেম ইজ কৌশিক রায়।" আমাদের দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললেন, "ইনি হচ্ছেন জেম্‌স হেলার, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, আমার বিশেষ বন্ধু এবং এই জিমের একজন মালিক।"

একটু ঘনিষ্ঠতা হলেই এ-দেশের সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে। এবং পুরো নামটা

মাপে একটু ছোট করে নেওয়া এদের রেওয়াজ। যার নাম রবার্ট, তাকে সবাই 'বব' বলে ডাকে, রিচার্ডকে বলে 'ডিক' বা 'রিচ' বা 'রিচি', জেম্‌স্‌কে বলে 'জিমি' বা 'জিম'। দেখলাম, মিস্টার হেলার বড়দাকে 'চেন' বলে ডাকছেন। চিন্ময়ের জায়গায় 'চেন শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। উনি আমাদের নামদুটো ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলেন কয়েকবার, শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আমাকে ডাকলেন 'ট্যান' বলে, এবং কৌশিকের 'কোশ'। আমরা তিন-চারমাসের জন্য জিমের মেম্বার হব শুনে উনি বেজায় খুশি হলেন। বললেন, "তোমরা 'চেন'-এর লোক, তোমাদের আমি শস্তায় করে দিচ্ছি। অবশ্য শস্তার হিসেবটা দেখে আমাদের মাথা ঘুরতে লাগল। কিন্তু, বড়দা কোনও কথা বললেন না, পকেট থেকে একটা ক্রেডিট কার্ড বের করে দাম মিটিয়ে দিলেন। দেখলাম, ব্যায়ামটা হল নেশার মতো। প্রথম ক'টা দিন গা-হাত-পা টনটন করতে লাগল বটে, কিন্তু পাঁচ-সাতদিন পর থেকে মনে হতে লাগল, জিমে না গেলে আমাদের পেটের ভাত হজম হবে না। জিমে ভর্তি হওয়ার কুড়ি-বাইশ দিন বাদে আমরা অনুভব করলাম, আমাদের খিদে বেড়ে গেছে, কিন্তু শরীর থেকে কিছু মেদ ক্রমে ঝরে যাচ্ছে। রাতের ঘুম আগের তুলনায় অনেক গাঢ় হয়ে গেছে, মোটের ওপর শরীরটা আগের চেয়ে অনেক বেশি ফিট হয়ে গেছে।

আমেরিকায় পা দেওয়ার পর প্রায় চল্লিশ দিন কেটে গেল। জিমটা বড়দার বাড়ি থেকে দূরে নয়, আমরা দু'জন হেঁটেই যাতায়াত করি। সেদিন বিকেলে জিমে গিয়ে হাঁটবার ট্রেল ধরে আমরা দু'জনে বেশ জোর কদমে হাঁটছিলাম, হঠাৎ আমার পেছন থেকে কৌশিক চেঁচিয়ে উঠল "এ কী!"

আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি, কৌশিক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাঁটবার ট্রেলের উলটো দিকে, দুটো দেওয়াল যেখানে মিলেছে, সেইদিকে তাকিয়ে, ও হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে ওদিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম, বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। আমি ওর দিকে ফিরে বললাম, 'কী হল?"

কৌশিক এবার মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখল, দেখি আর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। নাকের পাশটা ফুলে উঠেছে। আমি অবাক হয়ে আবার বললাম, "কী ব্যাপার?"

কৌশিক ট্রেল—এর উলটো দিকে আর-একবার চেয়ে দেখল, তারপর আমার হাত ধরে দ্রুত এগিয়ে গেল সেদিকে। উলটোদিকে পৌছে দুই দেওয়ালের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কৌশিক। বারবার চারদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল, তারপর দেওয়ালে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল। আমি আবার বললাম, "কী হয়েছে, সে-কথা বলবি তো!"

"এক মিনিট আগে ঠিক এই জায়গাটা থেকে একটা লোক হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিন্তু, চেয়ে দ্যাখ, এখানে কোনও দরজা নেই," বলল কৌশিক, তারপর ও দেওয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়ালটাকে পরীক্ষা করতে লাগল।

"তুই ঠিক দেখেছিস তো? আমার তো কিছু চোখে পড়েনি?" আমি আবার বললাম, "তোরা কি চোখ-কান খুলে চলাফেরা করিস যে, সব জিনিস চোখে পড়বে?" বিরক্ত হয়ে কৌশিক বলল।

এমন সময় ট্রেলটার ওপাশে দরজার সামনে জিমের মুখ দেখতে পেলাম। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "ট্যান, কোশ, তোমরা হাঁটছ না কেন? ওখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী করছ তোমরা?"

"কৌশিক এখানে হঠাৎ—" আমার কথার মাঝখানে বাধা পড়ল, কৌশিক চেঁচিয়ে বলল, "হঠাৎ আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল, তাই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এক মিনিট দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

কৌশিকের কথা শেষ হতে না হতে জিম ট্রেলের এপাশে চলে এসেছিলেন।

একবার কৌশিকের কপালে হাত দিয়ে, শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করলেন, তারপর ভুরু কুঁচকে বললেন, "হঠাৎ শরীর দুর্বল হল কেন? এখন সিজন চেঞ্জের সময়, ফ্লু হয়নি তো?"

"কে জানে, গতকাল এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা, গিয়ে দেখি, তার ছেলের ফ্লু হয়েছে, সেখান থেকেই হঠাৎ ইনফেকশন হয়ে গেল কি না, কে জানে?" অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলল কৌশিক। আমার দিকে ফিরে বলল, "মনে হচ্ছে, শরীরটা তেমন ভাল নেই। চল তন্ময়, আজ আমরা বাড়িই ফিরে যাই।"

জিম একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "ফ্লুয়ের তো বিশেষ কোনও ওষুধ নেই, প্রচুর ফ্লুইড খেয়ো।" তারপর হেসে বললেন, "ফ্লুয়ের প্রতিষেধক ফ্লুইড"।

আমরা জিমের কাছে বিদায় নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। হাঁটতে-হাঁটতে কৌশিককে জিজ্ঞেস করলাম, "মিছে কথা বললি কেন?"

কৌশিক হেসে বলল, "প্রয়োজনে মিছে বলতে দোষ নেই। আমি দু'দিন ধরে বুঝতে পারছি, আখড়াটার কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে। আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, এবং তার সঙ্গে যদি জিমের যোগাযোগ থাকে, তবে ওর কাছে সত্যি বললে ক্ষতি হতে পারে।"

"আখড়াটায় কিসের গোলমাল বলে মনে হচ্ছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"গন্ধ! গন্ধ!" বলে উঠল কৌশিক।

'গন্ধ, তার মানে?" আমি ভুরু কুঁচকে বললাম।

"গন্ধ মানে গন্ধ! গাঁজার গন্ধ! গাঁজা বা কোকেন বা ওই ধরনের যে-কোনও নেশার জিনিস যে এ-দেশে নিষিদ্ধ, সে তো জানিস! কৌশিক বলল।

"কই, আমি তো কখনও গাঁজার গন্ধ পাইনি," আমি বললাম।

"পাবি কীভাবে? তোরা যে শুধু চোখ-কান বন্ধ করে চলাফেরা করিস, তা নয়, তোদের সব ইন্দ্রিয়ের দরজাই বন্ধ থাকে।" অধীর হয়ে বলল কৌশিক।

কৌশিকের উষ্মা দেখে আমার হাসি পেল। কৌশিক যখন 'রাহা বাড়ির রহস্য' উদঘাটন করছিল, তখন রাগ করে একদিন আমাকে বলেছিল, "তুমি যেরকম সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে চলাফেরা করো, তাতে কলকাতা শহরে তোমার পোষাবে না, হিমালয়ে গিয়ে, নেংটি পরে, যোগসাধনায় নেমে পড়ো।"

"তারপর আজ আবার ওয়াকিং ট্রেল-থেকে একটা লোককে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে

যেতে দেখলাম। এটা তো স্বাভাবিক ঘটনা নয়।" কৌশিক বলতে লাগল, "জিম-এর ভেতর যে একটা গোলমাল আছে, তাতে আমার আর সন্দেহ নেই। গাঁজার গন্ধ পেয়ে আমার মনে হয়েছিল, খদ্দেরদের কেউ হয়তো গাঁজা টেনে ব্যায়াম করতে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে, বোধ হয় তা নয়। এমনও হতে পারে, জিমের মধ্যে কোনও একটা জায়গায় গাঁজা বা ওই ধরনের কোনও নেশার বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"

পরের দিন আমরা বেলা দুটোর মধ্যেই জিমে গিয়ে পৌঁছলাম। জিম হেলার সাধারণত সেখানে এসে পৌঁছন তিনটে নাগাদ। দেখলাম, কাউন্টারে আজ অন্য এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। আমরা চিন্ময় মিত্রের আত্মীয় শুনে ভদ্রলোক বেজায় খুশি। বললেন, "আমার নাম রিচি বেনেট। আমি জিম হেলারের কাজিন। এবং, এই ব্যায়ামাগারের আরেক মালিক।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কীরকম কাজিন?"

"অনেক দূরের সম্পর্ক", বললেন ভদ্রলোক, "আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা এবং জিমের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা দুই ভাই ছিলেন।"

"আপনারা তো তবে একই ফ্যামিলির লোক, আপনাদের পদবি আলাদা হল কীভাবে?" কৌশিক ভুরু কুঁচকে বলল।

রিচি হেসে বললেন, "গুড অবজারভেশন। আমার ঠাকুর্দা যখন খুব ছোট ছিলেন তখন তাঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকে উনি মামার বাড়িতেই মানুষ। ঠাকুর্দা নামের শেষে হেলার না লিখে তাঁর মামার পদবি 'বেনেট' লিখতেন। সেই থেকে আমরা বেনেট হয়ে গেছি। আসলে আমরাও হেলার।"

এমন সময় জিম এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। রিচি জিমের দিকে ফিরে অনুযোগ জানালেন, "আমরা দু'জন যে কাজিন হই, সে-কথা এই ইয়ংম্যানদের তুমি এখনও বলোনি?"

জিম ঠাট্টার সুরে বলল, "সত্যি, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। এমন দরকারি কথা ভুলে যাওয়া আমার অন্যায় হয়েছে।"

রিচি একটু হাসলেন, তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, "জিমি, তোমার ঠাকুমা তো অনেকদিন কলকাতায় ছিলেন, একবার তুমি ওদের সঙ্গে ঠাকুমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছ?"

জিম এক মিনিট ইতস্তত করলেন, তারপর বললেন, "আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এরা কলকাতার ছেলে। যাই হোক, পরশু রবিবার, 'ট্যানি আর 'কোশ', তোমরা দু'জনে আমার ঠাকুমার বাড়িতে ডিনার খাবে সেদিন। সন্ধে সাতটা নাগাদ চলে এসো। চেন যদি ব্যস্ত না থাকে, তাকেও টেনে নিয়ে এসো।" রিচির দিকে ফিরে বললেন, "রিচি, তুমিও এসো, যদি সময় করতে পারো।"

রিচি ঘাড় নাড়লেন, "কোনও উপায় নেই, ভাই, তুমি তো জানোই, উইক-এণ্ড-এ আমি ছেলেমেয়েদের দেখতে যাই।"

জিম একটা কাগজে ঠাকুমার ঠিকানা লিখে আমার হাতে দিলেন। আমরাও ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওয়াকিং ট্রেলের অন্য দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, যে-

দরজা দিয়ে ট্রেলটার ভেতরে ঢুকতে হয়, সেটা বন্ধ রয়েছে। রিচি এগিয়ে এসে বললেন, "সরি, দরজাটা এখন বন্ধ আছে। ট্রেলটাকে পরিষ্কার করা হচ্ছে। যে ভেতরে কাজ করছে, সে তিনটে নাগাদ বেরিয়ে আসবে। তোমরা ততক্ষণ অন্য ব্যায়াম করো।"

মিনিট পনেরো বাদে ওয়াকিং ট্রেলের দরজা খুলে যে বেরিয়ে এল, তার চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম। কৌশিকেরও দিকে চেয়ে দেখি, সেও ভুরু কুঁচকে লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। লোকটা অন্তত সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, এবং সেই অনুপাতে স্বাস্থ্যবান। সাধারণত এ-দেশের লোকেরা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা, কিন্তু সাড়ে ছ'ফুট দৈর্ঘ্যের মানুষ রাতদিন চোখে পড়ে না।

কৌশিক আমার দিকে চেয়ে নিচু গলায় বলল, "এই ব্যাটাকেই কাল অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিলাম। বুঝতে পারছি, বেআইনি ব্যাপারের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। প্রশ্ন হল, ও কার লোক? জিমের, না রিচির? না কি, দু'জনেরই? অথবা অন্য কোনও মালিকের? আমরা কথা বলতে-বলতে ওয়াকিং ট্রেল-এর ভেতর ঢুকে পড়লাম। কৌশিক আর-একবার লোকটার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার জায়গাটাকে পরীক্ষা করল, কিন্তু কোনও গুপ্ত দরজা বা ওই জাতীয় কিছু কোনওমতেই খুঁজে পেল না।

পরের দিন সকালের কাগজে দেখি, ওই শহরেই এক চোরাকারবারি খুন হয়েছে। এ-দেশে খুনোখুনি সবসময় লেগেই আছে। সুইসাইড, হোমিসাইড এবং অ্যাক্সিডেন্টে এ-দেশের প্রচুর লোক মরে। কাগজে দুটো দুর্ঘটনার খবরও ছাপা হয়েছে। কৌশিক বলে উঠল, "হবেই তো? যে-দেশের প্রত্যেকটি লোকের একটা করে গাড়ি আছে, এবং মুষ্টিমেয় দু-চারটে লোক বাদে সকলের হাতেই বন্দুক আছে, সেখানে ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা তো ঘটবেই।" কাগজে লিখছে, পুলিশের ধারণা, জন অ্যালেন নামে একটি লোক পঁচিশ টন কোকেন কিনেছিল কোনও এক দুষ্টচক্রের কাছ থেকে কিন্তু দাম মেটাতে গাফিলতি করছিল। খুব সম্ভবত, সেই কারণেই সে গুপ্ত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছে। পুলিশ এখন সেই আততায়ীকে খুঁজছে।

সেদিন রাতে ঘরে বসে আমি আর কৌশিক ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কৌশিক বলল, "এই মুহূর্তে জিমের সঙ্গে যুক্ত যে তিনটে লোককে আমরা সন্দেহের তালিকায় ফেলতে পারি, তারা হল, জিম হেলার, রিচি বেনেট এবং ওই বিরাট লোকটা। এদের মধ্যে কে অপরাধী? অথবা, এদের দু'জনের মধ্যে আঁতাত রয়েছে? অথবা তিনজনই একসঙ্গে দুষ্টচক্রের পার্টনার? কিংবা বাইরের কোনও লোক?" কৌশিক চিন্তিত মুখে বলে উঠল, "তন্ময়, এ ব্যাপারে তোর কী মনে হয়?"

আমি ম্লান হেসে বললাম, "কে জানে, ভাই? তবে, বিরাট লোকটাকে দেখলেই মনে হয়, ও বজ্জাত। কিন্তু, জিম এবং রিচি, দু'জনকেই তো সাদাসিধে ভদ্রলোক মনে হয়!"

"ঠিক, ঠিক", অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়ল কৌশিক, "মুখ দেখে তো মনে হয়, দু'জনেই পারফেক্ট জেন্টলম্যান। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের মুখ দেখে তার মনের কথা বোঝা যায় না, এই এক সমস্যা। বিশেষ করে, কেউ যদি চেষ্টা করে মনের ভাব গোপন করতে চেষ্টা করে, তবে তার মনের কথা বোঝা প্রায় অসম্ভব।"

আমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম, "জন অ্যালেন নামে ওই যে লোকটা খুন

হয়েছে, তোর কি মনে হয়, সেও এই ঘটনার সঙ্গেই যুক্ত ছিল?"

"জানি না, হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। যাকগে, অনেক রাত হল, চল, এবার শুয়ে পড়ি," কৌশিক চিন্তাকুল মুখে উঠে দাঁড়াল।

শনিবার সন্ধেবেলা আমরা জিম হেলারের ঠাকুমার বাড়িতে গেলাম। মহিলার বয়েস পঁচাশি পেরিয়ে গেছে, শরীরে নানা রোগ, কিন্তু মাথা একদম ঠিক আছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানলাম, ওঁর জন্ম ইংল্যাণ্ডে। যে সময় উনি কলকাতায় গিয়েছিলেন, তখনও ভারত স্বাধীন হয়নি। উনি টানা সাত বছর, কখনও দিল্লিতে, কখনও কলকাতায় কাটিয়েছেন। দিল্লির কুতব মিনার, লালকেল্লা, আগ্রার তাজমহল, কলকাতার মনুমেণ্ট, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, সবকথাই বললেন। পঁয়ষট্টি-সত্তর বছর আগেকার কথা কিন্তু কিছুই ভোলেননি।

কৌশিক বলল, "আপনি ইংল্যাণ্ডের মানুষ। আপনি এ-দেশে কী সূত্রে এলেন?"

ঠাকুমা হাসলেন, তারপর জিম হেলারের দিকে ফিরে চাইলেন। জিম বললেন, "আমার দাদু এ-দেশ থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে। ওখানে গিয়ে মিস মেরি অস্টিন নামে এক ব্রিটিশ মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। কয়েক বছর বাদে, মেরি অস্টিনকে বিয়ে করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সেই মিস মেরি অস্টিনই বর্তমানকালের এই মিসেস মেরি হেলার।" বলে হাসিমুখে ঠাকুমার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন জিম।

খাওয়াদাওয়ার পর আমরা চারজন যখন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সোফার ওপর গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসেছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। জিম গিয়ে টেলিফোন তুলে বললেন, "হ্যালো।" এক সেকেণ্ড বাদে আমার হাতে রিসিভার তুলে দিয়ে বললেন, "তোমার ফোন।"

amarboi.net

বড়দার ফোন। উনি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কখন ফিরব। আমরা ফিরলে উনি আর বউদি আধঘণ্টার জন্য একটু বেরোবেন। হঠাৎ কী একটা দরকার পড়েছে। আমি মিসেস হেলারকে বললাম, "আপনারা সবাই গল্প করুন। আমি চলি।"

"তুমি যাবে কীভাবে?" জিজ্ঞেস করলেন জিম।

"হেঁটেই যাব। এইটুকু তো পথ। আমার পাঁচ মিনিটও লাগবে না," আমি বললাম।

"না, না, তোমায় হাঁটতে হবে না। আমাকেও এখন উঠতে হবে, আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি," বললেন জিম।

কৌশিক বলল, "আমিও তা হলে উঠি।" বলে, আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল। মিসেস হেলার কৌশিককে বললেন, "তোমার এত তাড়া কিসের? তুমি আর-একটু বোসো, বরং আরও এক কাপ চা খাও।"

কৌশিক আবার ধপ করে সোফাটার ওপর বসে পড়ল। আমি ওকে বললাম, "আমি তা হলে এগোই। তুই হেঁটেই চলে আসিস।"

কৌশিক ঘাড় নাড়ল। আমি জিমের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

কৌশিক ফিরল ঘণ্টাখানেক বাদে। ফিরেই জামাকাপড় ছেড়ে একেবারে বিছানায় আশ্রয় নিল। ওর চেহারা দেখে আমি একটু অবাক হলাম। ওর মুখে-চোখে যেন একটা

চাপা উত্তেজনা। আমি বললাম, "তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটেছে!"

"একটা গল্প শুনে এলাম," বলল কৌশিক, "কিন্তু গল্পটার সঙ্গে বর্তমান ঘটনার যোগ আছে কি না বুঝতে পারছি না।"

"গল্পটা কী, শুনি।" আমি বললাম।

"মিসেস হেলার বললেন, তাঁদের ফ্যামিলিতে বংশপরম্পরায় একটা বিরাট হীরে ছিল, রিচির বাবা জিমের বাবার ভালমানুষি সুযোগ নিয়ে বছর পঁচিশেক আগে সেটা হাতিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু, জিম এতই ভাল যে, ফেরত চাওয়া দূরে থাক, সে রিচির কাছে কোনওদিন সে হীরেটার উল্লেখ পর্যন্ত করেনি", কৌশিক বলল।

"তা হলে, জিমই ভাল এবং রিচি মন্দ, তাই কি মনে হচ্ছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তা জানি না। গল্পটা সত্যি কি না, তা-ও তো আমাদের জানা নেই," কৌশিক পাশ ফিরে শুতে-শুতে বলল "এমনকী এ-ও তো হতে পারে, আমাদের এই গল্প শোনানোর জন্য জিম তাঁর ঠাকুমাকে শিখিয়ে রেখেছিল।"

পরের দিন টিভিতে দুপুর বারোটার খবর শুনে আমরা দু'জনেই আঁতকে উঠলাম। যিনি খবর পড়েন, তিনি দুঃখের সঙ্গে জানালেন, "কিড স্ট্রিটের, অধিবাসী মিস্টার রিচি বেনেট আন্দাজ ভোর চারটে নাগাদ নিজের বাসভবনে প্রাণত্যাগ করেছেন। মিস্টার বেনেটের মৃত্যু সুইসাইড না হোমিসাইড, সে-ব্যাপারে পুলিশ মনঃস্থির করতে পারছে না। পুলিশ প্রথমে ভেবেছিল, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর গৃহে চুরি-ডাকাতির কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ হত্যা সম্পর্কে একটু ধাঁধায় পড়েছে। যাই হোক, এ-ব্যাপারে তদন্ত চলছে।"

আমি মুখ তুলে দেখি, কৌশিকের মুখ লাল হয়ে উঠেছে এবং নাকের পাশটা ফুলে উঠেছে। ও উঠে গিয়ে টেলিফোন তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল। একটু বাদে ওকে বলতে শুনলাম, "আপনাকে কাল ফোনে যে জায়গাটার কথা বলেছিলাম, এখনই সেখানে চলে যান। জানলাটা এক সেকেণ্ডের জন্য চোখের আড়াল করবেন না। আমি বেলা দুটো নাগাদ রাস্তাটার মোড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কাকে ফোন করলি?"

কৌশিক বলল, "পুলিশকে।"

আমি বললাম, "পুলিশের সঙ্গে কখন যোগাযোগ করলি?"

"গতকাল। চল, আমরা স্নান করে খেয়ে নিই, তারপর একসঙ্গে জিমে যাব।"

আমরা যখন জিমের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম, তখন প্রায় দুটো বাজে। হঠাৎ দেখি, আমাদের পাশে আরও একজন ভদ্রলোক হাঁটছেন। বুঝলাম, সাদা পোশাকের পুলিশ। কৌশিক কখন এদের সঙ্গে যোগাযোগ করল, কে জানে? কৌশিক আমাকে বলল, "তন্ময়, তুই ভেতরে যা, আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু ওদিকে যাচ্ছি। একটু বাদেই আসব।"

"একটু বাদে মানেই?" আমার বুক ধুকপুক করতে লাগল।

"একটু বাদে মানে, বড়জোর এক ঘণ্টা। মানে তিনটের মধ্যে। মনে নেই, তিনটে

নাগাদ ওয়াকিং ট্রেলের দরজা খুলে যায়?” কৌশিক বলল।

“তুই এখন কোথায় যাচ্ছিস?” আমি বললাম।

“ওই যে রেস্তরাঁটা দেখতে পাচ্ছিস, ওটার দোতলায়,” বলল ও।

আমি একবার ভুরু কুঁচকে ওর দিকে চেয়ে দেখলাম, তারপর জিমের ভেতর ঢুকলাম। কাউণ্টারে গম্ভীর মুখে বসে আছেন মিস্টার রিড। উনিও জিমের এক মালিক। দু-তিন দিন ওঁকেও কাউণ্টারে দেখেছি। বললেন, “একটা দুঃসংবাদ আছে। আমাদের বন্ধু এবং পার্টনার রিচি বেনেট আজ ভোরে নিজের বাসভবনে মারা গেছেন।”

আমি ভদ্রলোককে সহানুভূতি জানালাম, তারপর বললাম,“মিস্টার হেলার কোথায়?”

“তার তো আসতে রোজই তিনটে বেজে যায়, ”বললেন মিস্টার রিড।

বেলা আড়াইটে নাগাদ হন্তদন্ত হয়ে জিমে এসে ঢুকল কৌশিক। সঙ্গে সেই সাদা পোশাকের পুলিশ এবং অন্য একটি লোক। তৃতীয় লোকটি বেজায় ঢ্যাঙা। জিমের সেই বিরাট লোকটার চেয়েও লম্বা। বোধ হয় সাত ফুটের কাছাকাছি।

সাদা পোশাকের পুলিশ ভদ্রলোকটি পকেট থেকে নিজের পরিচয়পত্র বের করে মিস্টার রিডকে দেখালেন, তারপর বললেন, “এখুনি ওয়াকিং ট্রেলের দরজাটা খুলে দিন। আমরা বাইরে থেকে ওয়াকিং ট্রেলের জানলা দিয়ে যা দেখেছি তা মোটেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়।”

মিস্টার রিড আমতা-আমতা করলেন, “কিন্তু—”

“কোনও কিন্তু নেই। যদি বিপদে পড়তে না চান, এখুনি ট্রেলটা খুলে দিন,” দৃঢ়স্বরে বললেন পুলিশটি, “তারপর আমাদের সঙ্গে ভেতরে চলুন। যদি নির্দোষ হন, আপনিই সরকার পক্ষের সাক্ষী হবেন।”

ভদ্রলোক আর দ্বিরুক্তি করলেন না, ‘মাস্টার কি’ হাতে নিয়ে দ্রুতপায়ে গিয়ে ওয়াকিং ট্রেলের দরজা খুলে দিলেন। আমরা সবাই জোর কদমে এগিয়ে গেলাম ট্রেলের উল্টোদিকে। লম্বা লোকটিকে কৌশিক বলল, “দেওয়ালটার গায়ে সিলিং-এর কাছাকাছি তাকিয়ে দেখুন, একটা বোতাম দেখতে পাচ্ছেন?”

লোকটি এক মিনিট দেওয়ালটার গায়ে খোঁজাখুঁজি করল, তারপর বলল, “এই যে। পেয়েছি। নিশ্চয়ই এটাই বোতাম।”

“বোতাম টিপুন,” বলে, অন্য ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বলল কৌশিক, “রিভলভার লোড করুন, দরকার হলে গুলি করবেন।”

লম্বা লোকটি বোতাম টিপল। একটা অদৃশ্য দরজা খুলে গেল। কৌশিক এবং রিভলভার হাতে পুলিশের লোক একই সঙ্গে ঢুকলেন ভেতরে, আমরা ওদের পেছনে-পেছনে ঢুকলাম।

ভেতরে ছোট একটা ঘর। ঘরের মাঝখানে কাঠের টেবিল। টেবিলের সামনে গোটাকয়েক চেয়ার। দুটো চেয়ারে বসে আছেন জিম হেলার এবং সেই বিরাট লোকটি। আমাদের ওখানে হঠাৎ ঢুকে পড়াটা এমন অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিত যে, ওঁরা প্রস্তুত হওয়ার সময় পেলেন না। পুলিশের লোক দু'জন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। লম্বা লোকটি কোনও প্রতিবাদ করল না, মিস্টার হেলার

চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমার অপরাধ?"

"অপরাধ? অপরাধ কি একটা সার?" কৌশিকের মুখ বিদ্রূপে বঙ্কিম হল, "একটা অপরাধের প্রমাণ এই—" বলতে-বলতে দেওয়ালের গায়ের একটা বোতামে চাপ দিয়ে একটা দেরাজ খুলে ফেলল কৌশিক। ভেতর থেকে বিরাট সাইজের একটা প্যাকেট বের করতে-করতে বলল, "এটা হল কোকেনের প্যাকেট। একটু খুঁজলে গাঁজার প্যাকেটও পাওয়া যাবে, আপনারা যে গাঁজা টানছিলেন, সে তো ঘরে ঢুকেই আমি টের পেয়েছি।"

কৌশিক তবুও কী যেন খুঁজতে লাগল চারদিকে, মিস্টার হেলার চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ "আবার কী চাই? তোমাদের কি ধারণা, হীরেটাও আমি চুরি করে এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছি?"

"আপনি কীভাবে জানলেন, আমি হীরেটাই খুঁজছি," কৌশিকের মুখ বিদ্রূপে বঙ্কিম হল আবার, "খুনের সময় আপনি অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন বুঝি?" বলতে বলতে এক ধাক্কা দিয়ে টেবিলটাকে উলটে ফেলল কৌশিক। দেখা গেল, টেবিলের তলায় কয়েকটা ছোট-ছোট প্যাকেট লাগানো রয়েছে। একটা প্যাকেট থেকে বেরোল সেই হীরেটা, যার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে রিচি বেনেটকে।

কৌশিক পুলিশের হাতে হীরেটা তুলে দিতে দিতে বলল, "বেআইনি নেশার জিনিস তো ঘরের চারদিকেই ছড়ানো আছে। এখন হত্যার মোটিভটাও পাওয়া গেল। খোঁজ নিয়ে দেখুন, আমার মনে হচ্ছে, জন অ্যালেনের হত্যাকারীও এই সঙ্গেই ধরা পড়ে গেল। আমাকে আপনাদের আর দরকার হবে কি?"

পুলিশের লোকটি হাত বাড়িয়ে কৌশিকের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "আর দরকার হবে বলে মনে হয় না। অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

কৌশিক হেসে বলল, "ইউ আর ওয়েলকাম,"তারপর আমার হাত ধরে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

সেদিন রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাইরের ঘরের সোফার ওপর বসে ছিলাম। আমাদের কাছে পুরো ঘটনাটা বলার পর, কৌশিক জিজ্ঞেস করল, "আর কোনও প্রশ্ন আছে কি?"

বড়দা বললেন, "অদৃশ্য দরজাটা দেওয়ালের ঠিক কোন জায়গায়, তোমরা কিছুতেই খুঁজে পেলে না কেন?"

কৌশিক হাসল, বলল, "এ-দেশের প্রায় সব ঘরের দেওয়ালেই রঙিন ওয়ালপেপার দিয়ে মুড়ে রাখা হয় বলেই এটা ঘটেছে। ওয়াকিং ট্রেলের দেওয়ালেও রঙিন কাগজ লাগানো আছে, সেইজন্যই খোঁজাখুঁজি করেও দরজার 'এগজাক্ট লোকেশন' ধরতে পারিনি। দরজা খোলার বোতামটা যে দেওয়ালের অনেক ওপরের দিকে, সেটা অবশ্য আমি অনেক আগেই অনুমান করেছিলাম। আমি যদি ওই লোকদুটোর মতো লম্বা হতাম, তবে আগেই বোতামটা খুঁজে পেতাম।"

আমি বললাম, "পুলিশের লোকটা মিস্টার রিডকে তখন বলল, ওয়াকিং ট্রেলের জানলা দিয়ে তোরা কিছু একটা দেখেছিস, যা স্বাভাবিক নয়, সেটা কী?"

"আমরা লম্বা লোকটাকে ওই ঘর থেকে বেরোতে দেখেছি," বলল কৌশিক, "এবং হাত তুলে, বোতাম টিপে দরজা দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকতেও দেখেছি।"

"টেবিলের তলায় হীরেটা লুকানো আছে কীভাবে জানলে?" বড়দা বললেন।

"আমি আন্দাজ করেছিলাম, ওটা ওই ঘরেই থাকবে, বলল কৌশিক, "আমরা যখন ঘরের মধ্যে ঢুকি, তখন জিমকে টেবিলের তলাটা হাতড়াতে দেখেছিলাম।"

আমি আবার বললাম, "জিম হেলার ওই লোকটাকে নিয়ে জিমের মধ্যে বসে বেআইনি ব্যবসা চালাচ্ছিল, আর কেউ কি টেরই পায়নি?"

"আমার ধারণা, পার্টনাররা কেউ গোপন ঘরের অস্তিত্বের কথা জানতই না। আমি কাল জিমের ঠাকুমার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, বিল্ডিংটা জিমই আগে 'লিজ' নেয়। তারপর মাস তিনেক পর অন্য সব পার্টনার একে-একে ওর সঙ্গে যোগ দেয়। আমার অনুমান, প্রায় তিন মাসের মধ্যেই জিমই ওই গোপন ঘরটা ওখানে প্রস্তুত করিয়েছিল।"

"রিচি বেনেটের ছেলেমেয়েদের কী হবে এখন?" জিজ্ঞেস করলেন বউদি।

কৌশিক অনিশ্চিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, "আমি ঠিক বলতে পারব না। এ-দেশের আইন-কানুন তো কিছু জানি না। তবে, আমি খবর নিয়ে জেনেছি, রিচির উইলের বেনিফিশিয়ারি হল রিচির ছেলে এবং মেয়ে, ওরা সমান অংশীদার। জিমের প্রপার্টি বিক্রি করে নিশ্চয় রিচির নাবালক ছেলেমেয়েদের কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।"

বড়দা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমেরিকায় এসেও তুমি কেরামতি দেখালে। ওয়েল ডান কৌশিক, কনগ্রাচুলেশন্‌স। রাত হল। যাই, এবার শুয়ে পড়ি গিয়ে।"

pathagar.net

অংকপুরীর গুপ্তধন

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরে ঢুকে দেখলাম, সৃজনকাকা একটা চিঠি পড়ছে খুব মন দিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, কার চিঠি? আবার কোনো অ্যাডভেনচার নাকি!

মৃদু হেসে কাকা বললেন, ঠিকই ধরেছিস। তবে ঠিক অ্যাডভেনচার নয়, বলা যায় রহস্যভেদ। যাবি নাকি? দিন কয়েকের প্রোগাম।

কী যে বল। অনেকদিন হয়ে গেল কলকাতা থেকে বেরোনো হয় নি। বাইরে যাওয়ার এ সুযোগ হাতছাড়া করব এমন বোকা নই—

কিন্তু জায়গাটা কলকাতা থেকে খুব একটা দূরে নয়। ক্যানিংয়ে। পছন্দ হচ্ছে?

সে ক্যানিং বা কাঠমাণ্ডু হোক, তুমি যখন যাচ্ছ, তখন আমিও যাব।

পরের রবিবার সকালে ট্রেনে চেপে হাজির হলাম ক্যানিংয়ে। স্টেশনে হাজির ছিলেন কাকার কলেজের বন্ধু প্রতাপ গাঙ্গুলী। খুবই অমায়িক বন্ধুবৎসল মানুষ।

ট্রেন. থেকে নামা মাত্র সৃজনকাকাকে জড়িয়ে ধরলেন প্রতাপকাকা, উঃ, কতদিন পরে যে তোর সঙ্গে দেখা। সেই কলেজ ছাড়ার পর আর দেখা হয় নি। ভাবতেই পারি নি,

তুই সব কাজ ফেলে এত তাড়াতাড়ি চলে আসবি—

কেন আসব না। বন্ধুর কাছ থেকে ডাক পেলে আসব না, এমন পাষণ্ড নই।

স্টেশন থেকে প্রতাপকাকার বাড়ি দূরে নয়। বেশ বড় জমির ওপর একতলা বাড়ি। বাড়ির গেটে মারবেল পাথরে নাম লেখা 'অংকপুরী'।

আমি বললাম, বাড়িটাক নামটা কেমন অদ্ভুত। তাই না!

প্রতাপকাকা মৃদু হেসে বললেন, এই নাম দিয়েছেন আমার ছোটমামা বিভূতি মুখার্জী। উনি নিজেই ডিজাইন করে বাড়িটা তৈরি করেছেন। বিভূতিমামা ছিলেন অংকপাগল মানুষ। অংকে এমন নেশা ছিল যে রাতদিন অংক কষতেন। এক ধরনের পাগলামি আর কি!

চোখে পড়ল, মেন গেটের ডিজাইনও জ্যামিতিক। দু'পাশের দুটো লোহার দরজা জুড়লে তৈরি হয় একটি গোলাকার বৃত্ত। দরজার আশ্চর্য ডিজাইন দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। বাড়ির ভেতরের ডিজাইন দেখলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না, বাড়ির মালিক ছিলেন অংকপ্রাণ মানুষ।

প্রতাপকাকার বসবার ঘরে বসে গল্প হচ্ছিল। হরি আমাদের জন্য গোটাকয়েক ডাব কেটে নিয়ে এলো বাগানের গাছ থেকে। হরি প্রতাপকাকার কাজের লোক। লম্বা রোগা চেহারা। কথাবার্তা বেশ অমায়িক। ডাবের জলের পর হরি নিয়ে এলো দুটো বড় চীনেমাটির থালায় করে পাকা পেঁপে, টুকরো টুকরো করে কাটা। সঙ্গে বড় সাইজের রাজভোগ।

সৃজনকাকা বললেন, এ কি এলাহী কাণ্ড করেছিস আমাদের জন্য—

বিনয়ের হাসি হাসলেন প্রতাপকাকা, এ সবই তো বাগানের গাছের, শুধু রাজভোগটাই যা কেনা। তাছাড়া তোর সঙ্গে কতদিন পরে দেখা বল তো—

পাকা পেঁপে আর রাজভোগ খেতে খেতে গল্প হলো খানিকক্ষণ।

ঘরের সবকিছু দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন সৃজনকাকা, তারপর প্রতাপ, কী ব্যাপারে আমাকে তলব? পুরো ব্যাপারটা খুলে লিখিস নি—

তা ঠিক। নানা কারণে চিঠিতে সবকিছু লেখা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সবকিছু জানিও না। তবে যেটুকু জানি তোকে বলছি। বাকিটা তোকে বের করে নিতে হবে—

এরপর প্রতাপকাকা যা বললেন, তা মোটামুটি এইরকম, ওঁর একমাত্র মামা বিভূতিবাবু বিয়ে-টিয়ে করেন নি। এই বাড়িতে একলাই থাকতেন। ছোট মাঝারি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি স্কুল কলেজে সাপ্লাই দেবার ব্যবসা করতেন। আর অবসর সময়ে ব্যস্ত থাকতেন নানা ধরনের অংক নিয়ে। একমাত্র ভাগনে প্রতাপকাকাকে খুবই স্নেহ করতেন, তবে অংকে ভাগনের উৎসাহ ছিল না, মাঝে মাঝে বকাবকি করতেন। মাস তিনেক আগের কথা মারা যাওয়ার আগে বিভূতিমামা নিজের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি লিখে দিয়ে যান প্রতাপকাকার নামে। অবশ্য সম্পত্তির মধ্যে তখন কেবল তিন বিঘে জমির ওপর ক্যানিংয়ের এই বাড়ি। আর ব্যাংকে কিছু টাকা। তাছাড়া মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই যন্ত্রপাতি সাপ্লাইয়ের ব্যবসাটা বিক্রি করে দিয়ে পুরোপুরি অংক নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অবশ্য বিভূতিবাবুকে যারা চিনত, তারা বলে, ব্যবসা করে উনি সারাজীবন যথেষ্ট

pathagar.net

উপার্জন করেছেন। তাই অনেকের ধারণা, উনি বোধহয় এই বাড়ির মধ্যে কোথাও গুপ্তধন রেখে গেছেন। প্রতাপকাকাও তাই ভাবেন। বিভূতিমামার অ্যাটর্নি সোমনাথ বিশ্বাস বা হরিকে জিজ্ঞেস করেও এ বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

প্রতাপকাকার কাহিনী চুপ করে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন সৃজনকাকা। কাহিনী শেষ হলে প্রথম প্রশ্ন করেন সৃজনকাকা, তোর বিভূতিমামা জীবিত অবস্থায় তোকে কিছু বলেন নি এ বিষয়ে—

না, এ বিষয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে কখনো কোনো কথা হয় নি, যদিও উনি বেঁচে থাকতে বহুবারই কাটিয়ে গেছি এ বাড়িতে—

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে মৃত্যুর আগে অন্য কাউকে কিছু বলে গেছেন।

না, সে সুযোগ পান নি উনি। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় স্ট্রোক হয়ে মারা যান। তখন এ বাড়িতে ছিল শুধু হরি। পরদিন ভোরে হরির কাছ থেকে খবর পেয়ে আসেন ওঁর চিকিৎসক ডাঃ সান্যাল ও অ্যার্টনি সোমনাথ বিশ্বাস। সোমনাথবাবুই ফোন করে খবর দেন আমাকে। আমি এখানে পৌঁছই দুপুর বারোটা নাগাদ। তাই মামার সঙ্গে শেষ কথা বলার সুযোগ আর পাই নি।

হুঁ, সৃজনকাকা কী বলতে গিয়েও যেন গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

প্রতাপকাকা বলে চলেন, ভেবেছিলাম, বিভূতিমামা হয়তো কোনো চিঠিপত্র, ছক বা গুপ্তধনের মানচিত্র রেখে গেছেন। কিন্তু সারা বাড়ি বাগান তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, সেরকম কিছু রেখে যান নি। তবে মামার একটা ডায়েরি পেয়েছি। সেটা পড়ে দেখেছি, তার মধ্যে গুপ্তধনের কোনো কথা নেই, শুধু হাবিজাবি অংকের কচকচি। গত তিন মাস ধরে এ বাড়িতেই বসবাস করছি, এর মধ্যে বাগানের অনেক জায়গায় সুড়ঙ্গ খুঁড়েছি গুপ্তধনের সন্ধানে, কিন্তু শুধু তাল তাল মাটি ছাড়া কিছুই বেরোয় নি—

প্রতাপকাকার কথার ভঙ্গিতে আমি আর সৃজনকাকা দুজনেই হাসছিলাম।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সৃজনকাকা, চল, তোর বাগান দেখে আসি—

বাড়িটার পেছনে বিরাট বাগান। সেখানে আম জাম কাঁঠাল পেঁপে নারকেল পেয়ারা কলাগাছ সবই আছে। বাগানে তখন কাজ করছিল বাগানের মালী শিবু। আমাদের দেখে খুরপি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাল। লোকটার একটা চোখ ট্যারা, ওর তাকানো দেখে অস্বস্তি হয়। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে প্রতাপকাকার কাটানো দু'তিনটে সুড়ঙ্গও চোখে পড়ল। সৃজনকাকা সেসব সুড়ঙ্গগুলিও অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, প্রতাপ, একটা কথা অন্তত বলতে পারি, তোর মামা এই বাগানের নিচে কোনো গুপ্তধন পুঁতে রেখে যান নি।

কী করে বুঝলি? নীরস গলায় জিজ্ঞেস করেন প্রতাপকাকা।

কী করে বুঝলাম সেকথা হয়তো এক্ষুণি ঠিকঠাক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে একটা সহজ কারণ হলো, বাগানে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে গুপ্ত ধন পুঁততে গেলে অন্য লোকের সাহায্য নিতে হবে না, না নিলেও বাইরের লোকের চোখে ধরা পড়ার ভয় থেকে যায়। তাছাড়া দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখে মনে হয় তোর মামা খুব একটা স্বাস্থ্যবান ছিলেন না, তাই তাঁর পক্ষে নিজের হাতে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

বুঝতে পারলাম, সৃজনকাকার কথায় প্রতাপকাকা কিছুটা হতাশ হয়েছেন। তবু মুখে অল্প হাসি ফুটিয়ে বললেন, ঠিক আছে সৃজন, অনেক বেলা হলো, এবার চান করে খাওয়াদাওয়া সেরে নেওয়া যাক।

দুপুরে কুয়োর ঠাণ্ডা জলে স্নান করে জুড়িয়ে গেল শরীর। দুপুরে খাওয়াও দারুণ হলো। সরু চালের ভাত, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, তিন রকমের মাছ, আমের চাটনি, দই-সব মিলিয়ে প্রায় বিয়েবাড়ির খাবার।

খেতে বসে সৃজনকাকা বললেন, প্রতাপ, তোর খাওয়ার ঘরের ডিজাইনটা বেশ অদ্ভুত ধরনের, তাই না!

তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তো! যে ঘরে আমরা খেতে বসেছি, সেই ঘরটা যদিও বেশ বড়, কিন্তু এর আকার একটা সমকোণী ত্রিভুজের। এত জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোথাও এরকম ডিজাইনের খাবার ঘর চোখে পড়ে নি।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের দুজনের শোবার বন্দোবস্ত করে নিজের ঘরে বিশ্রাম নিতে গেলেন প্রতাপকাকা।

সৃজনকাকা বললেন, বুঝলি বাদল, দুপুরে ঘুমোলে চলবে না। সময় কম। দুজনে মিলে এরই মধ্যে বরং সমস্ত বাড়িটা ঘুরেফিরে একটু দেখব—

খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে দু'চারটে ম্যাগাজিন পড়ে আমরা বেরোলাম বাড়িটা ঘুরে দেখতে।

খাওয়ার ঘরে দাঁড়িয়ে সৃজনকাকা হঠাৎ অংকের স্যারের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, জ্যামিতিতে পিথাগোরাসের উপপাদ্য পড়েছিস?

পড়ব না কেন? একটা সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলির ওপর এক একটা বর্গক্ষেত্র দাঁড়িয়ে আছে, সেটা তো?

ঠিক ধরেছিস। একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিস, আমরা যে ঘরে বসে খেলাম, সেটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ। তার তিন কোণায় তিনটে ঘর। আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই তিনটে ঘরেরই আকার চৌকো অর্থাৎ বর্গাকার। কেমন মিলছে পিথাগোরাসের উপপাদ্য। আকাশ থেকে ঘরগুলোর ছবি নেওয়া গেলে মনে হতো যেন জ্যামিতির বইয়ের ছবি দেখছি।

কাকার বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখে অবাক না হয়ে পারি না।

তবু আমি বললাম, মিল তো পেলে, কিন্তু তার সঙ্গে গুপ্তধনের সম্পর্কটা খুঁজে বের করতে পারলে কি?

এখনো পাই নি, তবে পেতেও তো পারি।

সন্ধ্যেবেলা আবার বৈঠক বসল প্রতাপকাকার ঘরে।

আচ্ছা প্রতাপ, তোর বিভূতিমামার রেখে যাওয়া জিনিসপত্তরগুলো একটু দেখাবি?

হতাশ গলায় বলেন প্রতাপকাকা, কী আর দেখবি? তবে দেখতে চাইলে নিশ্চয়ই দেখাব। বিভূতিমামার জিনিসপত্তর বলতে এই বিছানাপত্র, সোফাসেট, ওয়ারড্রোব, তাতে কিছু জামাকাপড়, একটা স্টিলের আলমারি, আর তার ভেতরে মামার রেখে যাওয়া ফাইলপত্র, ডায়েরি, ব্যাংকের পাশবই আর কিছু বিজ্ঞানের বই।

একটু থেমে আবার বলেন প্রতাপকাকা, আর তোকে বলতে ভুলেছি, আলমারির ক্যাশবাক্সে ছিল কিছু টাকা আর ছিল হাউসি খেলার ঝুড়ি, যার মধ্যে রয়েছে নম্বর লেখা একশো কাঠের বল। তবে হাউসি খেলায় আমার কোনোদিন আগ্রহ নেই। তাই ওগুলো পড়ে আছে আলমারির মধ্যেই—

তাই নাকি! তাহলে তো ওগুলো একবার দেখতে হচ্ছে। সৃজনকাকার কথার ভঙ্গি খুবই সিরিয়াস।

প্রতাপকাকা চাবি দিয়ে স্টিলের আলমারি খুললেন। ভেতরে বেশ কিছু বিজ্ঞানের বই আর একটা গোল তারের বাক্সে হাউসি খেলার একশোটা কাঠের বল। দেখলেই বোঝা যায়, কাঠের বলগুলো খুব দামী কাঠের তৈরি। বলের ডিজাইনও খুব সুন্দর। প্রত্যেকটা বলের গায়ে সাদা রংয়ে নম্বর লেখা আছে শুধু। তারের বাক্স থেকে কয়েকটা বল তুলে নিয়ে নিজের কানের কাছে ভালো করে ঝাঁঝিয়ে কী যেন বুঝবার চেষ্টা করলেন সৃজনকাকা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী কাকা, বলগুলো ঝাঁকাচ্ছ কেন, দেখছ না বলগুলো নিরেট কাঠের—

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে কাকা একটা চুরুট ধরালেন, তারপর বললেন, প্রতাপ, তোর আলমারির চাবিটা একদিনের জন্য কাছে রাখতে পারি কি?

কী যে বলিস? একদিন কেন, একমাস-দুমাস যতদিন খুশি চাবিটা রাখ না তোর কাছে—

ও তোর কাছে তো ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

একটু ইতস্তত করে জবাব দিলেন প্রতাপকাকা, না রে। আগে ছিল, কিন্তু কিছুদিন ধরে ডুপ্লিকেট চাবিটা পাচ্ছি না। কোথায় যে গেল।

সৃজনকাকা ভুরু কুঁচকে বললেন সে কি ডুপ্লিকেট চাবি হারিয়েছে। ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক—

না না, কে আর চাবিটা নেবে? হয়তো আমিই কোথাও রেখেছি। তাছাড়া আলমারিতে কী-ই বা আছে?

একটু চুপ করে থেকে প্রসঙ্গ পালটালেন সৃজনকাকা, যাকগে ও কথা। তোর অ্যার্টনি মানে বিভূতিবাবুর অ্যাটর্নির সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। করা যাবে?

কেন করা যাবে না! সোমনাথ বিশ্বাস তো ক্যানিংয়েই থাকেন। তোর কোনো চিন্তা নেই, আমি কাল ভোরেই হরিকে দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি ওর কাছে। তা কবে দেখা করতে চাস? কাল?

না, কাল নয়। পরশু রাত সাতটায়।

সেদিন রাত্তিরে আলোচনা ওখানেই শেষ। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি আর প্রতাপকাকা ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু কাকা ঘুমোন নি, নোটবই আর কলম নিয়ে কী-সব লিখেছেন অনেক রাত পর্যন্ত।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি সৃজনকাকা জামাকাপড় পরে রেডি। বললেন, আমি একটু কলকাতা যাচ্ছি, বুঝলি। ঘণ্টা কয়েকের জন্য—

আর আমি? উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

তোকেও নিয়ে যেতাম, কিন্তু তোর এখানে থাকা দরকার—

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, কেন?

কাকা আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলেন, তুই এই বাড়িতে বসে একটু গোয়েন্দাগিরি করবি।

তার মানে!

তার মানে এই অংকপুরীতে কে আসছে, কে যাচ্ছে, কে কী করছে, বলছে—সব অংকের মতো হিসেব রাখবি। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, শুধু দেখে যাবি।

প্রতাপকাকাকে কিছু না বলে সৃজনকাকা চলে গেলেন। প্রতাপকাকা নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। কাকাকে বিদায় জানাতে গিয়ে দেখি, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে হরি।

হরি বলল, কর্তা এত সকালে বেরোচ্ছেন? আমাকে আগে বললে আপনার জলখাবার তৈরি করে দিতাম।

কাকা চলে গেলে ভাবতে বসলাম, এখন আমার কী কর্তব্য। আমাকে বাদ দিলে বাড়িতে এখন মাত্র তিনজন মানুষ-প্রতাপকাকা, হরি আর শিবু। এর মধ্যে প্রতাপকাকা তো সন্দেহের বাইরে। ওঁর ওপর কী আর গোয়েন্দাগিরি করব। বাকি থাকে শুধু হরি আর শিবু। সুতরাং এই দুজনের ওপরই নজর রাখতে হবে বেশি। তবে হরিকে তেমন সন্দেহ হয় না, ট্যারা শিবুর হাবভাবই কেমন সন্দেহজনক।

একটু পরেই পাশের ঘরে প্রতাপকাকার আওয়াজ পাওয়া গেল, হরিকে কী যেন বলছেন।

প্রতাপকাকা ঘরে ঢুকে বললেন, কী হে বাদল, তোমার কাকা নাকি কলকাতা গেছে। কেন গেল? কখন ফিরবে?

কেন গেল জানি না, তবে ফিরতে বোধহয় বিকেল হবে।

ঠিক আছে, হরিকে সোমনাথবাবুর কাছে পাঠাচ্ছি।

হরি প্রতাপকাকার চিঠি নিয়ে যাবার আগে অবশ্য আমাদের জলখাবার দিয়ে গেল। জলখাবার খেয়ে ঘরে বসে বসেই বিভূতিবাবুর রেখে যাওয়া বইপত্র দেখলাম। বইপত্র ঘাঁটতে গিয়ে দেখি, নানা বিষয়ে বহু বিজ্ঞানের বই যোগাড় করেছিলেন উনি। সবচেয়ে বেশি রয়েছে অংকের বই, এ ছাড়াও ডায়মণ্ড বা হীরে নিয়েও বেশ কিছু বই। দেখছি, ভদ্রলোকের হীরে সম্পর্কে প্রচুর উৎসাহ ছিল। অথচ বাড়িতে তো কোনো হীরে দেখছি না। তাহলে কি সেসব হীরে পুঁতে রেখে গেছেন বাগানের মাটিতে। যদিও সৃজনকাকা বলেছেন, বাগানের মাটির নিচে কোনো গুপ্তধন পাওয়ার সম্ভাবনাই নেই, তবু মনে হলো, সৃজনকাকাও ভুল করতে পারেন। তাই হীরের খোঁজে বাগানে গিয়ে ঘোরাঘুরি শুরু করলাম।

ওখানে কি করছেন খোকাবাবু? প্রশ্ন শুনে চমকে উঠে দেখি, শিবু। কোন গাছের ফাঁকে যে ঘাপটি মেরে ছিল কে জানে। শিবুর ট্যারা চাউনিটা খুবই অস্বস্তিকর।

না, এই একটু বাগানে ঘুরছিলাম—কোনো রকমে জবাব দিয়ে ফিরে এলাম ঘরে।

বাড়িতে ফিরে দেখি, প্রতাপকাকাও নেই। কোথায় যেন বেরিয়েছেন। মনে মনে

ভাবলাম, সৃজনকাকা অনর্থকই কলকাতা গেলেন। কলকাতায় না গিয়ে শিবুকে চাপ দিলেই গুপ্তধনের হদিস পাওয়া যেত। এখন আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই, শিবু লোকটা হাড় শয়তান। এই লোকটা নিশ্চয়ই জানে, বিভূতিবাবুর গুপ্তধন কোথায় লুকানো আছে।

কাকা ফিরলেন সন্ধ্যের মুখে। সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে চেহারা হয়েছে ঝোড়ো কাকের মতো। প্রতাপকাকার সামনে কাকাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছিল না। না হলে জিজ্ঞেস করতাম, গুপ্তধনের কোনো হদিস করতে পারলে কি!

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তেকোণা ডাইনিং রুমে আমাদের আসর বসল। কুয়োর ঠাণ্ডা জলে স্নান করে পরিপাটি হয়ে বসেছি আমি, সৃজনকাকা ও প্রতাপকাকা। গুপ্তধন সম্পর্কে সৃজনকাকা কতটা রহস্যভেদ করতে পেরেছেন, সেটা জানার জন্য আমি ও প্রতাপকাকা দুজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

একটা চুরুট ধরিয়ে সৃজনকাকা বললেন, প্রতাপ, তুই বলেছিলি, এ বাড়িতে বিভূতিবাবুর রেখে যাওয়া গুপ্তধন আছে। তোর সন্দেহ ঠিক। এ বাড়িতে গুপ্তধন হিসেবে তোর মামা রেখে গিয়েছিলেন তিনটে হীরে। প্রত্যেকটাই খুব দামী। কিন্তু দুঃখের কথা, তিনটে হীরেই চুরি গেছে এ বাড়ি থেকে—

প্রতাপকাকা চমকে উঠে বললেন, তাই নাকি!

প্রতাপ, তুই হয়তো ভাবছিস, তোর মামা যে হীরে রেখে গেছেন সে খবর আমি কোথায় পেলাম। এর উত্তরে বলি, এ ব্যাপারে আমাকে সবচেয়ে সাহায্য করেছে তিনটি ব্যাপার। প্রথমত, তোর মামার সংগ্রহে হীরে সম্পর্কে এত রকমের বই থেকে স্বভাতই একটা কথা মনে হয়। হীরে সম্পর্কে যাঁর এত বেশি উৎসাহ তিনি যে হীরে কিনবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। দ্বিতীয় সূত্রটি হলো তোর মামার লেখা ডায়েরি, যাতে উনি বিজ্ঞানের সাংকেতিক ভাষায় কেবলমাত্র তিনটি হীরের গুণাগুণ লিখে রেখে গেছেন বিশদভাবে। ডায়েরির ঐ অংশটুকু মর্মোদ্ধার করতে অবশ্য আমাকে ছুটতে হয়েছিল কলকাতার রত্ন-বিশেষজ্ঞের কাছে। এটা ঠিক, ডায়েরিতে কোথাও লিখে যান নি উনি হীরে কিনেছেন। তবে তিনটি হীরের যে ধরনের খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে রেখেছেন, তা পড়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই তিনটি হীরেই ছিল ওঁর জিম্মায়। তৃতীয় ব্যাপারটি হলো, ওঁর ডায়েরিতে এক জায়গায় লিখেছেন, উনি বেড়াতে গিয়েছিলেন পান্নায়। পান্না মানে মধ্যপ্রদেশের পান্না। তারপর অবশ্য ডায়েরির পাতার অনেকটা জায়গা ফাঁকা। হয়তো ভেবেছিলেন, পান্নায় ভ্রমণের বিবরণ পরে ভালো করে লিখবেন। কিন্তু পরে বোধহয় সময় পান নি বা ইচ্ছে করেই লেখেন নি। তুই জানিস মধ্যপ্রদেশের পান্নায় হীরের খনি আছে। ওখানে মাঝে মাঝেই খুব ভালো হীরে সস্তায় বিক্রি হয় নীলামে। খবর নিয়ে জেনেছি, উনি যে সময় পান্নায় যান, ঠিক সেই সময় পান্নায় হীরের বিরাট নীলাম বাজার বসেছিল। এতে কী প্রমাণ হয়, তুই-ই বল। জানিস তো টু প্লাস টু মেকস্ ফোর।

প্রতাপকাকা ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বছর তিনেক আগে মামা মধ্যপ্রদেশে গিয়েছিলেন দিন সাতেকের জন্য। আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু

শেষ পর্যন্ত যেতে পারি নি। কিন্তু সেটা যে পান্নায়, তা অবশ্য বলেন নি কাউকে—

সৃজনকাকা চুরুটের ছাই ঝেড়ে বলেন, এটা এখন স্পষ্ট বিভূতিবাবু পান্না থেকে তিনটে হীরে কিনেছিলেন, যদিও ব্যাপারটা কাউকে জানাতে চান নি। কিন্তু এখন প্রশ্ন, হীরেগুলো কোথায় রেখে গেলেন। এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। ভাবতে ভাবতে চোখে পড়ল, ডাইনিং হলের তিনটে দরজার ওপর লেখা সংখ্যাগুলি ৫৪৩। সংখ্যাগুলি অবশ্য ৪৩৫ বা ৩৫৪ হতে পারত, কিন্তু নানারকম হিসেব কষে দেখেছি সংখ্যাটা ৫৪৩ হলেই ব্যাপারটা মেলে। সংখ্যার কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল আলমারিতে রাখা কাঠের বলগুলির কথা। কিন্তু তাতে তো ৫৪৩ নম্বর লেখা কোনো বল নেই। তাহলে? তবে হয়তো ৫, ৪ ও ৩ নম্বর বলের মধ্যে কিছু থাকতে পারে। ঐ বলগুলি নিয়ে অনেক ঝাঁকাঝাঁকি করলাম, অন্য বলগুলিও দেখলাম, কিন্তু হীরের খোঁজ পাওয়া গেল না। কিন্তু ঐভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ বুঝতে পারলাম বলগুলো নিরেট নয়, ভেতরে ফাঁপা জায়গা আছে। পরীক্ষা করে বললাম, বলগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম ফাটল আছে। দেখলাম, বলগুলির বিভিন্ন অংশগুলিকে ইচ্ছেমতো ঘোরানো যায় অনেকটা রুবিক কিউবের মতো। এভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে দেখলাম, বলগুলোকে তিনটে অক্ষের ওপর প্রথমে পাঁচ বার, পরে চার চার ও তিন বার ঘোরালে বলগুলির মুখ খুলে যায়। অনেকটা ডিজিটাল তালার মতো। আশ্চর্য ব্যাপার! এভাবে সব কটা কাঠের বলের ভেতরগুলো খুলে দেখেছি, ভেতরে কিছু নেই। কিন্তু ৯, ১৬ ও ২৫ নম্বর বলগুলি খুলতে পারি নি, কারণ এই তিনটে বল কাঠের, ভেতরে ফাঁপা জায়গা নেই—

কাকা আর কিছু বলবার আগে আমি বলে উঠলাম, তার মানে ঐ বলগুলি কেউ নিশ্চয়ই বদলে দিয়েছে।

ঠিক বলেছিস। কিন্তু এখন ভেবে দেখতে হবে কেন বদলাল, কারা বদলাল। কলকাতায় পরীক্ষা করিয়ে দেখেছি, ঐ তিনটে কাঠের বল সম্পূর্ণ অন্য কাঠের তৈরি। আর একটা মজার ব্যাপার। এই তিনটে কাঠের বলের নম্বর ৫, ৪ আর ৩ এর বর্গফল অর্থাৎ ২৫, ১৬ আর ৯।

সৃজনকাকা একটু থেমে আবার বললেন, প্রতাপ, আজ এই পর্যন্ত। বাকিটা কাল। অনেক রাত হয়েছে।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি, কাকার বিছানা খালি। খুঁজতে গিয়ে দেখি, প্রতাপকাকার ঘরে মিলে গোপন পরামর্শে ব্যস্ত। ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকলাম ভেতরে।

টেবিলের ওপর রাখা বার্নিশ-করা একশোটা কাঠের বল। কাকা সেগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন কী করে ভেতরের গর্তের ঢাকনাটা খুলে যায়।

প্রতাপকাকা অবাক হয়ে বললেন, সত্যি কী আশ্চর্য ব্যাপার, বিভূতিমামা যে কাঠের বলের মধ্যে এত কিছু করে গেছেন তা কোনোদিন ভাবি নি।

সবকিছু দেখে আমার মুখও হাঁ।

সৃজনকাকা আমাদের দেখালেন নয়, ষোল আর পঁচিশ নম্বর কাঠের বলগুলো একটু বেশ ভারি, কারণ সেগুলি নিরেট কাঠের আর বাকি বলগুলো কিছুটা হালকা।

প্রতাপকাকা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কে সরালো তিনটে কাঠের বল? হরি শিবু, না কি অন্য কেউ?

সৃজনকাকা হেসে বললেন, এক্ষুণি ঠিক বলতে পারছি না। আরো দু'চারটে ব্যাপারে কিছু খোঁজখবর নিতে হবে। তারপর হয়তো বলতে পারব।

তাড়াতাড়ি ভাতটাত খেয়ে বেলা দশটার মধ্যে বেরিয়ে গেলেন সৃজনকাকা। যাবার আগে বলে গেলেন, প্রতাপ, আমি একটু বেরোচ্ছি। তবে আজ আর কলকাতার দিকে নয়। আজ তাড়াতাড়ি ফিরব।

কাকার অবশ্য ফিরতে ফিরতে দুপুর তিনটে বাজল। কাকা আজও ক্লান্ত এবং মুখ বেশ গম্ভীর। কাকার গম্ভীর মুখ দেখে সন্দেহ হলো, কাকা কি হীরা-রহস্যের সমাধান করতে পারেন নি। তবু কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না।

এদিকে প্রতাপকাকার মুড বেশ ভালো। ওঁর বিশ্বাস, আর দু'চারদিনের মধ্যেই গুপ্তধন-চোরের হদিস মিলবে।

চোখের পাতা নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন প্রতাপকাকা, তোর কথামতো সন্ধ্যের আসর বসাচ্ছি। তুই রেডি তো?

হ্যাঁ, আমি রেডি, তবে তোকে একটা কাজ করতে হবে। আজ বিকেল থেকে দরজায় একটা মোটরগাড়ি মজুত রাখতে হবে। বলা যায় না, কখন কী কাজে লাগে।

আঙুল দিয়ে তুড়ির আওয়াজ তুলে বললেন প্রতাপকাকা, কুছ পরোয়া নেই। এক্ষুণি বন্দোবস্ত হয়ে যাবে—

সান্ধ্য চায়ের আসরে আমরা ছাড়াও বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন প্রতাপকাকার অ্যাটর্নি সোমনাথ বিশ্বাস। ধুতি পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক, টাক মাথা, চোখে চশমা, দোহারা গড়ন, চল্লিশের আশেপাশে বয়স, চেহারায় গাম্ভীর্যের ছাপ। হরি ও শিবু আজকের চায়ের আসরে নানারকম ফাইফরমাশ খাটছে। আয়োজন ভালোই। কাজুবাদাম, সন্দেশ আর রাজভোগের সঙ্গে চা। তাছাড়া অঢেল ডাবের জল তো আছেই।

প্রথমেই আমাদের সঙ্গে পরিচয় হলো সোমনাথবাবুর তারপর খানিকটা হালকা গল্পগুজব, খাওয়া-দাওয়া। একটা চুরুট ধরিয়ে গা এলিয়ে সোফায় বসে ছিলেন সৃজনকাকা। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন সৃজনকাকা, সোমনাথবাবু, আপনি তো বিভূতিবাবুর অ্যাটর্নি ছিলেন। আপনি কি জানতেন, মৃত্যুর কয়েক বছর আগে বিভূতিবাবু কয়েকটা হীরে কিনেছিলেন মধ্যপ্রদেশের পান্না থেকে?

নির্লিপ্তভাবে মাথা নাড়লেন সোমনাথবাবু, উনি নিজে থেকে না বললে ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি খোঁজখবর রাখতাম না।

ঠিকই তো, আপনি হলেন তাঁর অ্যাটর্নি। আপনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে খোঁজখবর রাখবেন কেন? কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি, আপনি বিভূতিবাবুর আলমারি থেকে ওঁর ব্যক্তিগত ডায়েরি সরিয়ে ছিলেন কোন প্রয়োজনে? সৃজনকাকার কণ্ঠস্বর খুব কঠোর শোনাল।

এক মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে হলেও পর মুহূর্তেই গর্জে উঠলেন সোমনাথবাবু, ডায়েরি আমি সরাই নি। ডায়েরি এখনো ওঁর আলমারিতেই আছে।

তা ঠিক, বিভূতিবাবুর ডায়েরি এখন ওঁর আলমারিতেই আছে। কিন্তু আপনাকে যদি প্রশ্ন করি, আপনি কি করে জানলেন ওঁর ডায়েরি আলমারিতে আছে। তবু সে প্রশ্ন মুলতুবি রেখে শুধু জিজ্ঞেস করছি, বিভূতিবাবুর ডায়েরির পাতার ভেতরে আপনার নামে তিনটে কাঠের বল তৈরি করতে দেওয়ার বিল ঢুকল কি করে? জানেন তো চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়েন ধরা কিন্তু নিজের নামে বিল লিখিয়েই সবচেয়ে বড় ভুলটা করে ফেলেছেন।

এক মুহূর্তের জন্য চুপসে গেলেন সোমনাথবাবু, আমতা আমতা করে বললেন, সে আমি বলতে পারব না। তবে আমার ঐ বিলটা হারিয়ে গিয়েছিল, তখন হয়তো হরি ভুল করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। নিজের নামে বিল করানোতে অপরাধ কোথায়? আমি নিজে কি তিনটে কাঠের বল তৈরি করতে পারি না?

হ্যাঁ, তা পারেন। তবে বিভূতিবাবুর আলমারি থেকে ঠিক তিনটে কাঠের বল সরিয়ে অন্য তিনটে কাঠের বলই আবার রাখা হয়েছে। এই ব্যাপারটার সঙ্গে পুলিশ হয়তো আপনার বিলের সম্পর্ক খুঁজে পারে। কারণ ঐ তিনটে চুরি-হওয়া কাঠের বলের মধ্যে ছিল বিভূতিবাবুর কেনা তিনটে হীরে। এবং সেই চুরিটা আপনিই করিয়েছেন আলমারির হারিয়ে যাওয়া ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে—

এই দেখুন—সৃজনকাকার ইঙ্গিতমতো প্রতাপকাকা একশোটা কাঠের বল সাজিয়ে রাখে টেবিলের ওপর।

টেবিলের ওপর কাঠের বলগুলো দেখে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন সোমনাথবাবু।

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন সৃজনকাকা, খবরদার, পকেটে হাত দেবেন না, হাত তুলুন—মুহূর্তের মধ্যে কাকার হাতে ঝলসে উঠল রিভলবার।

ব্যাপার দেখে আমি তো হতভম্ব।

কাকা চেঁচিয়ে ডাকলেন, মিঃ পাল, একটু এ ঘরে আসবেন?

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন, স্থানীয় থানার পুলিশ অফিসার মিঃ পাল। তারপর সোমনাথ বিশ্বাসের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

প্রতাপকাকা হতভম্ব হয়ে বললেন, মিঃ পাল, আপনি কখন এলেন?

রিভলবার পকেটে ঢুকিয়ে একটা চুরুট ধরালেন সৃজনকাকা।

pathagar.net

অপারেশন এক্স

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

সোফায় বসে সিগ্রেট ধরালো কর্নেল ব্যাণ্ডো। ছিপছিপে চেহারায় ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা। উজ্জ্বল চোখ দুটোয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি।

অ্যাশট্রে এগিয়ে দিয়ে পিটার হাসলো, দাদা মাস দুয়েক আগে মারা গেছেন। এয়ারফোর্সের দুর্ধর্ষ বৈমানিক ছিলেন। যুদ্ধবিমান ছিল হাতের খেলনা। হি ডায়েড আনসীন এণ্ড আনসাঙ্গ। এমনই হয়। এয়ার কমোডর রনি ডিমেলোকে ভুলে গেছে ফৌজি দপ্তর। পিটারের কণ্ঠে ঘন বিষণ্নতা, তবু আমি খুশি কর্নেল, দাদা ছিলেন আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনি তার খোঁজ নিতে এসেছেন। বলতে বলতে চুপ করে গেলো পিটার ডিমেলো।

ওদের বংশে ফৌজি রক্ত। রনির বাবা সানি ছিলেন বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। ঠাকুর্দা জনি ডিমেলো ওয়ার ভাইস মার্শাল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের স্বনামধন্য অফিসার, ভিক্টোরিয়া ক্রসে সম্মানিত বায়ুসৈনিক।

সিগ্রেট নিভে গেছিল, লাইটার ধরালো ব্যাণ্ডো, সঙ্গে মিষ্টি জলতরঙ্গের বাজনা।

তাকিয়ে আছে পিটারের দিকে—বলিষ্ঠ চেহারা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, পরনে ড্রেসিং গাউন। চশমা খুলে সেন্টার টেবিলে রাখে পিটার, দাদার অসুখের খবর পেয়ে ছুটে এসেছি। কিন্তু কদিনই বা সময় পেলাম। দিন সাতেকের মধ্যে সব শেষ—কলেরায় মারা গেলেন। চেষ্টার ত্রুটি করিনি, বড় শ্বাস ফেললো, আর্মি এডুকেশন কোরে রয়েছি। লিয়েন সার্ভিসে বাইরে। গাল্ফ কান্ট্রির বিভিন্ন য়ুনিভার্সিটিতে পড়াই—সাবজেক্ট হিস্ট্রি, নেপোলিয়ন।

এসব কথা কানে ঢুকছিল না ব্যাণ্ডোর। কর্নেল আসলে সামরিক বিভাগের নামকরা গুপ্তচর, সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ এণ্ড অ্যানালিটাক উইং 'র'তে কর্মরত। সতর্ক চোখে ঘরটা দেখছিল। বসবার ঘর যেমন হয়। সাজানো-গোছানো। সোফা সেট, লম্বা টানা কাচের আলমারি, শো পিস। ওপরে পর পর ছবি—সামরিক পোশাকে ডিমেলো বংশের তিন পুরুষ। এখন বাবার পাশে ফটো হয়ে হাসি হাসি মুখে রনি। সামনের দেয়ালে মস্ত বড় অয়েল পেন্টিং-এ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। রনির হিরো। বাঁ দিকের দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যীশু, পাশে মা মেরীর প্রতিমূর্তি। ঘরে ধূপ জ্বলছিল—আবহাওয়া কেমন গম্ভীর। ডিমেলোরা বাঙালী ক্রিশ্চান—ক্যাথলিক। বারাসাত ছাড়িয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে দৌড়ে গেছে টাকী রোড বাংলাদেশ বর্ডারের দিকে। এই রাস্তার পাশে একটু ভেতরে গির্জার পেছনদিকে ওদের বাড়ি। হাত-পা ছড়ানো মস্ত কম্পাউণ্ড, নাম সেন্ট হেলেনা। ব্যাণ্ডোর চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই নির্জন দ্বীপ—যেখানে বন্দী ছিলেন পরাজিত নির্বাসিত সম্রাট। চারদিকে সমুদ্র, তীরে আছড়ে পড়ছে ঢেউ আর ঢেউ। নীল শুধু নীল। এই বাড়ির নামে নাম—সেন্ট হেলেনা। আর এখানে অ্যানুয়েল লিভে এসে মারা গেল রনি, সম্রাটের মতন। ব্যাণ্ডো ছবির দিকে তাকিয়ে কত কি যেন ভাবছে।

pathagar.net

পিটার বললো, নেপোলিয়ন শুধু দাদার নয়, আমারও হিরো। শুনে খুশি হবেন গবেষণা করে একটা বই লিখেছি—'নেপোলিয়ন দ্য গ্রেট'। দেশে-বিদেশে সামরিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হচ্ছে।

জানি মিঃ পিটার। রনি ছিল আমার ফার্স্ট ফ্রেণ্ড, ওর মুখে বইটার কথা শুনেছি। রাশিয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছিল। তারপরই ছুটিতে এখানে। ফি বছর আসতো। আমিও অনেকবার এই বাড়িটায় এসেছি। থেকেছি ওর সঙ্গে।

আপনিও আসতেন?

হ্যাঁ, আমি। আপনার জানার কথা নয়। বাইরে থাকতেন বেশির ভাগ। এবার অনেক বছর পর ফিরলেন। তাই না?

শূন্য দৃষ্টি পিটারের, ইয়েস কর্নেল, আট বছর।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ব্যাণ্ডো। রনি এ জায়গাটা মনের মতো সাজিয়েছিল। বলতো, রিটায়ার করে নিজেকে গুটিয়ে নেব সেন্ট হেলেনায়। লেখাপড়া, বই আর কুকুর নিয়ে সময় কাটাবো।

আগ্রহ বাড়ে পিটারের, কুকুর কেন?

ব্যাণ্ডো হাসলো, ওর পোষা কুকুরের নাম লাকি, প্রভুভক্ত ডোবারম্যান। এখানে লাকিকে নিয়েই মেতে থাকতো। ও ফিরে গেলে সকাল-বিকাল বাড়ির গেটের সামনে

অপেক্ষা করতো নাকি, মাসের পর মাস। রনি ছুটিতে এলে ওর আনন্দ দেখে কে। রনি বলতো, বই, গাছগাছালি আর কুকুর মানুষের প্রকৃত বন্ধু। কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। মানুষের শত্রু মানুষ নিজেই।

এবার আসল কথায় আসি। আমি এখানে এসেছি দিল্লীর নির্দেশে। আমাদের সন্দেহ রনির মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।

চমকে উঠলো পিটার, সন্দেহের কারণ?

ওর মতো দুর্ধর্ষ বৈমানিক মারা গেলে শত্রুপক্ষের লাভ, আমাদের ক্ষতি—তাই।

একথা আমিও ভেবেছিলাম কর্নেল ব্যাঙো। গির্জার ফাদার এলবার্টের মেসেজ পেয়েই ছুটে এসেছি। কিন্তু দাদার মৃত্যু হয়েছে আন্ত্রিক রোগে। ন্যাচারাল ডেথ, ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। তবুও আমি পোস্টমর্টেম করিয়েছিলাম। জানি মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। সেই রিপোর্টেও কিছু নেই।

আমরা ফৌজি। উই ডোন্ট বিলিভ রিপোর্ট অব দ্য সিভিলিয়ন ডক্টরস, কবর থেকে ডেডবডি তুলে এনে আমরা দেখব। পোস্টমর্টেম করবেন আমাদের এ এম সির বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা।

বলেন কী! চমকে উঠলো পিটার, না ব্যাঙো, মাটির তলা থেকে দাদার ডেডবডি—সে আমি সইতে পারবো না। কঙ্কাল হয়ে গেছে এতদিনে। মাস দুয়েক হয়ে গেল।

হাঁ, কঙ্কালটাই পরীক্ষা করব আমরা। তার ওপর আর্মি বিশেষজ্ঞরা বসিয়ে দেবেন নকল মাংসপেশী, মুখ। দেখলে মনে হবে জীবন্ত।

তাতে লাভ?

মিঃ পিটার, প্লীজ ডোন্ট গেট আপসেট। আজকাল স্বনামধন্য লোকদের কবর দেওয়ার বদলে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মৃতদেহ প্রিজার্ভ করা হচ্ছে, মিশরের মমির মতো। লেলিনের কথা নিশ্চয়ই জানেন। কাচের বাক্সে শুয়ে আছেন। মনে হয় ডাকলেই উঠে বসবেন। পুনেতে আর্মড ফোর্স মেডিক্যাল কলেজের মিউজিয়ামে রনির মতো বীরদের মমি করে রাখব আমরা, ফর ইনসপিরেশন অব ইয়ঙ্গার জেনারেশন। তাছাড়া কাচের জারে স্পেসিমেন হিসেবে থাকবে স্মৃতিস্মারক, প্রয়াত হিরোদের চুল নখ। ভুললে চলবে না, দে গেভ দেয়ার লাইভ্‌স ফর আওয়ার বেটার টুমরো।

এখন ফৌজি কর্তৃপক্ষ যা ভাবছেন, একশ বছর আগে ডিমেলো পরিবার সে কথা চিন্তা করেছিল। এই যে, শো-পিসের দিকে তাকান, পর পর তিনটে কাচের জার। ভেতরে রয়েছে সামরিক পোশাক পরা পাসপোর্ট সাইজ পোশাক ফটোগ্রাফ—সঙ্গে মাথার চুল আর নখ, রনি, বাবা, ঠাকুর্দার। কফিনে ঢোকাবার আগে স্মৃতিচিহ্ন আমরা রাখি, পারিবারিক প্রথা আমাদের।

দুঃখ লাগে পিটার, বড় মাপের মানুষগুলোর ছবি ছোট কাচের জারে—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো ব্যাঙো। এগিয়ে গিয়ে বাজপাখির দৃষ্টিতে দেখছিল, আমি জানি মিঃ পিটার। আপনাদের ফ্যামিলি ট্রাডিশনের কথা রনির কাছে শুনেছি। দেখে খুশি হলাম, রনির চুল আর নখও রয়েছে। এগুলো আমাদের দিন। সযত্নে মিউজিয়ামে রাখবো।

দীর্ঘশ্বাস পিটারের, পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন কেই বা হাতছাড়া করতে চায়, তবে যখন

বলছেন নিশ্চয়ই পাবেন। তিনটি কাচের জার নামিয়ে সেন্টার টেবিলে রাখলো।

ব্রিফকেস থেকে ফাইল বার করলো ব্যাণ্ডো, ওপরে লেখা অপারেশন এক্স।

পিটার অবাক, অপারেশন এক্স কেন?

হো হো করে হাসলো কর্নেল, লাইটারে সিগ্রেট ধরালো, সেই টুংটাং সুরেলো আওয়াজ—এক্স মানে অজানা। রনি ডিমেলো ছিল এয়ার কমোডর, তার মৃত্যুটা আমাদের কাছে রহস্যের মতো। সেই জন্যে গোয়েন্দা বিভাগের নতুন ফাইল 'অপারেশন এক্স'।

এই ব্যাপারে আপনাকে আমিও সাহায্য করতে চাই কর্নেল সাব, আমার ফাইল আপনাকে দিচ্ছি, ভেতরে রয়েছে দাদার ডেথ সার্টিফিকেট, অসুখের বিবরণ, সঙ্গে আমার ডায়েরি। এতে পাবেন শেষ সাতদিনের কথা। আলমারি থেকে ফাইল আর ডায়েরি বার করে জারগুলোর পাশে রাখলো পিটার।

রক্তের রঙ লাল?

ডাক্তারি রিপোর্ট আর ডায়েরিতে চোখ বুলোচ্ছে ব্যাণ্ডো। বাকরুদ্ধ কণ্ঠস্বর পিটারের, এই মস্ত বাড়িটা আর ভালো লাগে না। দাদার স্মৃতি আমায় সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়ায়। এখানে আমরা মাত্র দুজন। আমি আর পরিচারক যোশেফ। আমার সিকিউরিটি কাম বডিগার্ড বলতে পারেন। গির্জার ফাদার অনুগ্রহ করে যোশেফকে দিয়েছেন। আর আছে লাকি, দাদার প্রিয় ডোবারম্যান।

লাকি! চোখ দুটোয় আনন্দ ব্যাণ্ডোর, সাড়াশব্দ পাচ্ছি না যে। আগে দেখলেই ছুটে আসতো, লাফ দিয়ে জড়িয়ে ধরতো।

বিমর্ষ গলা পিটারের, দাদা চলে যাবার পর খেতেই চায় না, দিনরাত বসে আছে কবরের পাশে। আমায় দেখলে তাড়া করে, দাদাকে মাটির তলায় রাখতে দিচ্ছিলো না। হয়তো ভাবে জোর করে শুইয়ে দিয়েছি, মাটি খুঁড়ে দেখতে চায়।

ব্যাণ্ডো নিরুত্তর। তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। এখন মে মাস। দুপুরের বাতাসে আগুনের হলকা। কিন্তু এ জায়গাটা খোলামেলা। গরমের তেজ কম। পাঁচিল ঘেরা চকচকে ঝকঝকে বাড়ি, রনির ড্রিম হাউস—সেন্ট হেলেনা। অন্যদিকে পারিবারিক সমাধিস্থল। শান বাঁধানো বেদী—পাথরের ক্রস।

শিলালিপিতে পরিচয়। জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। সামনে ফৌজি প্রথায় মাটিতে গেঁথে আছে বেয়োনেটের ফলা—উল্টানো রাইফেলের হাতলের মাথায় হেলমেট। সামরিক শোক চিহ্ন—লাস্ট স্যালুট।

কর্নেলের থমথমে গলা, এয়ার কমোডর ডিমেলোকে ভুলে গেছে ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স—এ ধারণা ঠিক নয় মিঃ পিটার। মৃত্যুসংবাদ আমরা দেরিতেই পেয়েছি। কাছেই কলকাতা—কমাণ্ড হসপিটাল, সেখানেও নেওয়া হয়নি। যাক্‌গে বোধহয় সময় পাননি। কিন্তু মরণোত্তর সম্মান জানাবো আমরা। ডেডবডি তুলে এনে কাটা ছেঁড়া হবে—সেটা ডাক্তারদের ব্যাপার, অপারেশন এক্স-এর একটা দিক। অপরদিকে ফৌজি কায়দায় সমাধি দেব—জোয়ানরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে উইথ 'রিভার্স আর্ম'—শূন্যে ছোঁড়া হবে

গুলি, থার্টি গান স্যালুট। বিউগলে বাজবে বিদায়ের করুণ সুর, মাটি ছড়িয়ে দেবেন স্বয়ং এয়ার মার্শাল—বায়ুসেনার সর্বাধিনায়ক।

কথায় বাধা পড়লো। যোশেফ ঘরে ঢুকলো। হাতে ট্রে—কোল্ড ড্রিঙ্কস, গ্লাস। পিটার ড্রিঙ্কস গ্লাসে ঢেলে কাচের জারগুলো সরিয়ে এগিয়ে দিলো, নিন, গলা ভিজিয়ে নিন ব্যাণ্ডো সাহেব। বড্ড গরম। অনেকক্ষণ এসেছেন, ভালো লাগবে।

থ্যাঙ্কস্ গ্লাসে চুমুক দিল, ফটো সহ জারগুলো ভালো করে দেখছে, আশ্চর্য! রনির চুল এই জারে—সত্যি? ধবধবে সাদা চুল। অথচ ঘন কালো চুল ছিল ওর।

সেটাই আশ্চর্য। হঠাৎই যেন সব চুল পেকে গেছল রনিদার। এই নিন, জারটা হাতে তুলে দিল পিটার, ভালো করে দেখুন।

তাড়াহুড়োয় ভুল করেছেন পিটার সাব, এটাতে আপনার ঠাকুর্দার ছবি রয়েছে। ঘুরিয়ে দেখলো। আসল কথা মন খারাপ হলে যা হয়, ফটোটা না দেখলে আমারও ভুল হতো। এই যে এটা রনির স্মৃতিস্মারক কাচের স্পেসিমেন বাক্স, সঙ্গে ছবি। চুলগুলো পাকা—অন্য দুটোয় তার ড্যাডি এণ্ড গ্রাণ্ডপার হেয়ার ব্ল্যাক। অবশ্য অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁদের। বীর যোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন।

ব্যাণ্ডোর কথা শুনতে শুনতে করুণ হয়ে উঠছে পিটারের চোখ-মুখ। এবারে প্রসঙ্গান্তরে আসতে চাইলো সে, আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে, আপনি বরঞ্চ ফাইল আর আমার দেওয়া ডায়েরিটায় চোখ বুলোন। আমার লেখা এই বইটাও পড়তে পারেন। চলুন, ওপরের গেস্টরুমে, রিলাক্স করবেন।

বইটা হাতে নিল কর্নেল। ফরেন পাবলিকেশন। দুর্দান্ত গেট আপ, সুন্দর ছাপা। মিঃ পিটার, বইটার দাম কত বলুন, কিনব। রনির মুখে বইটার কথা শুনেছি।

কিনবেন কেন? একটা কপি আমি আপনাকে দিচ্ছি, উইথ কমপ্লিমেন্টস। দিন সই করে দিই, ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত দিয়ে ডট পেন বার করলো পিটার।

না, না, নীল কালিতে নয়, ব্রিফকেস খুলে একগাদা পেন মেলে ধরলো ব্যাণ্ডো, পেন জমানো আমার হ্যাবিট। এই নিন লাল পেন। রক্তের অক্ষরে লিখুন, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য সৈনিকদের ধমনীতে টগবগ করে ফুটছে ফৌজি রক্ত।

হাসলো পিটার, মলাট উল্টে প্রথম পাতায় খসখস করে লিখলো কর্নেলের নাম, তলায় স্বাক্ষর—পিটার ডিমেলো।

খুশির গলা ব্যাণ্ডোর, দেখুন পিটার সাব, সাদা পাতায়, আই মিন হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে রেড লেটার, লাল হরফে আপনার সুন্দর সই। দারুণ কন্ট্রাস্ট, সো প্রমিনেন্ট তাই না?

হ্যাঁ, লাল কালিতে লেখা, আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের চিহ্ন।

হঠাৎ হো হো করে উঠলো ব্যাণ্ডো, ধরা পড়ে গেলেন পিটার, আপনি কালার ব্লাইণ্ড, রঙ চিনতে পারেন না।

ধেৎ, কী বলছেন আপনি?

ঠিকই বলেছি সাহেব, আই অ্যাম ডেফিনিট, সাদা চুল আই মিন রনির জারটা

গুলিয়ে ফেলেছিলেন, ফটো দেখে সামলে নিলেন। দেখুন বই-এর পাতা, সাদা বললাম, মেনে নিলেন, ওটা কিন্তু নয়। ইচ্ছে করেই অন্য কালির পেন দিয়েছিলাম—ধরতে পারেননি। ওটা লাল নয়, কালো, প্লিজ ডোন্ট মাইণ্ড, অনেকের এরকম থাকে। বুজতে দেয় না। খুঁত কেই বা জানাতে চায়।

পিটার চুপ।

কালার ব্লাইণ্ডদের আর্মিতে নেওয়া হয় না—আপনি এডুকেশন কোরে রয়েছেন—টিচার। সিভিলিয়ান পোস্ট। আপনার ক্ষেত্রে ছাড়।

কাঁপা গলা পিটারের। ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি—কে আপনি?

পরিচয় ঠিকই দিয়েছি, আমার নিক নেম ব্যাণ্ডো। ফার্স্ট নেম সত্যজিৎ, সেকেণ্ড নেম বন্দ্যোপাধ্যায়। খাঁটি বঙ্গসন্তান আপনাদেরই মতো। কর্নেল এস, বি. বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে হয়ে গেছি ব্যাণ্ডো।

পিটারের চোখ-মুখ শুকনো, মাই গুডনেস, আপনি সেই 'অপারেশন ঈগলের' দুর্দান্ত গোয়েন্দা! এয়ারপোর্ট হোটেলে জাল পেতে ধরেছিলেন মিসাইল বিজ্ঞানীদের হত্যাকারীকে! অভিনন্দন স্যার!

লাইটার-রহস্য এবং সংস্কৃত

ব্যাণ্ডোর মুখের হাসিটা কেমন যেন রহস্যময়। লাইটারের টুংটাং শব্দে সিগ্রেট ধরালো, মিঃ পিটার, একটু আগে প্রশ্ন করেছিলেন বার বার সিগ্রেট ধরাচ্ছি, দু'এক টান দিয়ে রেখে দিচ্ছি অ্যাশট্রেতে, নিভে যাচ্ছে আবার ঠোটে সিগ্রেট হাতে লাইটার। অবাক হয়ে গেছেন তাই না। রহস্যটা বলি।

নড়ে-চড়ে বসলো পিটার। বাইরে দুপুরের রোদ নরম হয়ে আসছে ক্রমে। পর্দা দুলিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকলো।

লাইটার জ্বালালো ব্যাণ্ডো, আলোর ঝলক। সঙ্গে শব্দ, বইটা সরিয়ে দাঁড় করলো ছোট টেবিলে। অপরদিকে সোফায় পিটার—ব্যগ্রতার চোখমুখ।

এবার দেখুন, আসলে এটা কিন্তু ট্রান্সমিটার, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, মিনি রেকর্ডপ্লেয়ার উইথ মাইক্রোফিল্ম। ভেতরে রয়েছে মাইক্রোটেপ, রিল। লাইটারের পেছন দিকে ছোট একটা বোতাম টিপতেই পিটারের টেপ করা কথা সব ভেসে উঠলো। ব্যাণ্ডো বললেন, জানেন পিটার সাহেব, লাইটারের আলোতেই প্রয়োজনীয় ছবি উঠে আসছে।

অস্ফুট কণ্ঠস্বর পিটারের, ফ্যানটাসটিক!

এবার কবজির ঢাউস হাতঘড়ির চাবিটা টান দিতেই বেরিয়ে এল অ্যান্টেনা, সঙ্গে পাতলা সরু তার, এটা মোবাইল ফোন। মাইক্রো সেট, ডায়ালের অক্ষরে চাপ দিতেই বিপ বিপ শব্দে রিং হচ্ছে কোথাও, মুখের কাছে ধরলো ঘড়িটা, ইয়েস দিস ইজ ব্যাণ্ডো। কোড অপারেশন এক্স। ক্যালকাটা কলিং—অ্যান্টেনার সরু তারের প্রান্তে ছোট্ট বোতাম—ইয়ার পিস। কানে গুঁজে কথা শুনছে। ভালো করে না দেখলে ধরে কার সাধ্যি! অনর্গল

কথা বলে যাচ্ছে কর্নেল। ভাষা বুঝতে পারছে না পিটার। তাকিয়ে রয়েছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

কী ভাষা ধরতে পারলেন না নিশ্চয়ই, সংস্কৃতে কথা বলছিলাম।

ইউ মিন স্যান্‌সক্রিট। আশ্চর্য!

ইয়েস, দেবভাষা। ঘড়িতেও টেপ হয়ে গেছে। আশ্চর্য হবার কথাই বটে। নিশ্চয়ই জানেন টেররিস্ট মোকাবিলায় ইজরায়েলের নো হাউ বিশ্ববিখ্যাত। আমাদের বন্ধু দেশ। ওখানকার সামরিক দপ্তর থেকে এক সাহেব এসেছেন। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত জুড়ে সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তাণ্ডবে সরকার হিমশিম। পেছনে রয়েছে পাকিস্তানের আই. এস, আই-এর মদত। ইণ্ডিয়া ইজ গোয়িং টু বি আ সুপার পাওয়ার—ওরা ভয় পাচ্ছে। ইজরায়েলের সাহেব আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন, হাউ টু ট্যাক্‌ল দেম। ইংরেজি জানেন না, ওঁর ভাষা আমরাও বুঝি না। কিন্তু সংস্কৃত অনর্গল বলেন। ওখানে স্যান্‌সক্রিট স্কুলের পাঠ্য—আমারও প্রিয় ভাষা। কথাবার্তা সেই ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছিলো। এটা বর্ডার এরিয়া তাই। রনি সম্পর্কে অ্যাডভাইস নিলাম।

ওয়ান মিনিট প্লিজ, ঘড়িতে চাপ দিয়ে নম্বর মেলাতেই লালবাজার গোয়েন্দা সদর দপ্তর...গুড আফটার নুন কবিরুল সাহেব,...ইয়েস...কী বললেন ফ্যাক্সে বায়ুসেনার সদর দপ্তর থেকে এই মাত্র খবর পেয়েছেন...থ্যাঙ্কস, স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাজ এগ্রিড ফর এক্সহিউমেশন অব ডেডবডি..নো ডিফিকাল্টি...আজ রাতেই পোস্টমর্টেম হবে। রাইট, আমি রনির চুল আর দাঁত সহ স্পেসিমেন জার পাঠিয়ে দিচ্ছি...কমাণ্ড হাসপাতালে...থ্যাঙ্কস মিঃ ইসলাম, ওভার

পিটারের বিস্ময়ের কণ্ঠ, চুল আর দাঁত দিয়ে কী হবে?

জানি না, ওটা আর্মি মেডিক্যাল কোরের ব্যাপার। দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে মিলিটারি পুলিশ হ্যাজ মুভড্‌ অলরেডি টু কালেক্ট ইট ফর কমাণ্ড হসপিটাল।

সার্টিফিকেট

কথা শেষ হতে না হতেই এসে গেল স্পেশাল মেসেঞ্জার। স্পেসিমেন নিয়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের গতিতে। বার বার ঘড়িতে সময় দেখছে পিটার। জিপের শব্দে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখলো, যোশেফ স্টিয়ারিং-এ বসে। আই অ্যাম অলরেডি লেট কর্নেল, মিঃ মালহোত্রা আমার লিগাল অ্যাডভাইসার, ওয়েট করছেন। অনেক দূরের পথ। এয়ারপোর্টের কাছে, যশোর রোড, ২নং গেট। ব্যাপারটা খুলে বলি, দাদার অবর্তমানে আমার ঘাড়েই চেপেছে। বাজার দর প্রায় কোটি টাকা। সাক্সেসন সার্টিফিকেট বেরিয়ে গেছে কোর্ট থেকে।

নিশ্চয়ই আপনার ফেবারে।

বংশে আর যে কেউ নেই। এসব নিয়ে কি করব? না, না, এদেশে থাকার ইচ্ছে নেই। প্রমোটারদের সঙ্গে কথা হয়েছে। দাদার স্মৃতি সেন্ট হেলেনা অক্ষত থাকবে—গাছগাছালি জংলা জায়গা সাফাই করে, পুকুর বুজিয়ে তৈরি হবে রনি হাউসিং কমপ্লেক্স।

মধ্যবিত্তদের জন্য খুবই কম দামে বিক্রি হবে বাড়িগুলো। থাকবে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল। ফিরে যাবার আগে ফাইনাল করে যেতে চাই।

ব্যাণ্ডোর কণ্ঠে হতাশা, তার মানে বিজনেস? অনেক টাকা পাবেন।

উত্তর নেই পিটারের মুখে।

প্রমোটারকে না দিয়ে ডিফেন্স মিনিস্ট্রিকে দান করে দিন। যতদূর শুনেছি রনির তাই ইচ্ছে ছিল। আমরা পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে ফৌজি কলোনি বানাব। গাছগাছালি কাটবো না। গাছ আমাদের বন্ধু। এখানে তৈরি হবে মিলিটারি স্কুল, কমান্ডো ট্রেনিং সেন্টার।

ঠিক বলেছেন, আপনার কথা ভেবে দেখার মতো। আগে সাক্সেসন সার্টিফিকেট হাতে আসুক, তারপর দেখি কি করা যায়।

আবার ঘড়ি দেখলো পিটার, হর্ন দিচ্ছে যোশেফ, এক্সকিউজ মি কর্নেল সাহেব আমি সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরব। উঠে দাঁড়ালো রনির ভাই।

ব্যাণ্ডো উঠলো, জাস্ট আ মিনিট প্লিজ, মিঃ ডেভিড সুরিটা সাড়ে ছটায় আসবে খবর পাঠিয়েছে। আপনার সঙ্গে দরকার, ওয়েট করবে।

চমকে উঠলো পিটার, ডেভিড, কোন ডেভিড?

আপনি চেনেন নাকি?

না, না—নিশ্চয়ই আপনাদের ফৌজি লোক।

আমিও চিনি না। তবে আপনি এখানে পৌঁছুবার আগে হপ্তা তিনেক ছিল এ বাড়িটায়। ওর কাছে রনির অনেক খবর পাবো আশা করি।

গাড়ির হর্ন আবার, পিটার উত্তরে কি বললো, বোঝা গেল না।

চটপট ড্রেস চেঞ্জ করে তিনতলা থেকে নেমে এলো। ব্যাণ্ডো হাত নাড়ালো, বেস্ট অব লাক মিঃ পিটার, আমিও কাজে বেরোচ্ছি। পরে দেখা হবে। জিপ বেরিয়ে যেতেই ওয়াকি টকিতে কথা বলছে ব্যাণ্ডো, ফ্লাইট লেফটেনান্ট কাপুর, ক্যান ইউ হিয়ার মি...ইউ আর ওয়েটিং আউটসাইড...ফলো দ্য জিপ...ছাপার মতো লেগে থাক, ওর সঙ্গে, ওভার।

পিটার চলে যেতেই মাথায় একরাশ চিন্তা। নেপোলিয়নের ছবিটা দেখছিল। বাঁ দিকের দেয়াল আলমারির দিকে হঠাৎই নজর গেল। আগে এখানে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ভলিউমগুলো থরে থরে সাজান ছিল। রনির প্রিয় বই। কোথায় গেল? তার বদলে আলমারি ভর্তি নতুন বই—নেপোলিয়ন দ্য গ্রেট। কেন? হাতল টানলো, না—বন্ধ, চাবি দেওয়া। যে কোনো তালা খুলতে পারে কর্নেল। একটা সরু তারই যথেষ্ট। ডট পেনের রিফিল বার করে বিশেষ কায়দায় ঘোরাতেই খুলে গেল পাল্লা। একটা বইয়ের পাতা উল্টাতেই বিস্ময়ে হতবাক, সব বিদেশী টাকা—ডলার। পাতার পর পাতা উল্টে চলেছে ব্যাণ্ডো—খাঁজে খাঁজে ডলার আর ডলার। হাত বুলোতে মিহি পাউডারের মতো গুঁড়ো উঠে আসছে আঙুলে। পোকায় না কাটার জন্যে বিশেষ ওষুধ হয়তো। নোটের নাম্বারগুলো মনে হচ্ছে পরিচিত—পকেটের মিনি কম্পিউটারের মেমরি চালু করতেই বেরিয়ে এল খবর। ইন্টারপোলের মেসেজ—এ সবই ব্যাঙ্ক ডাকাতির অর্থ, মিলে যাচ্ছে নম্বর। সিঙ্গাপুর লয়েড ব্যাঙ্ক থেকে লুঠ হয়ে যাওয়া ডলার।

ব্রিফকেসের রহস্য

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো ব্যাঙো। এখন বিকেল। চারদিকে বেলা শেষের আলোয় বিষণ্ণতার ঢল। আকাশে মেঘ। এলোমেলো হাওয়ায় গাছের মাথাগুলো দুলছিল। আম, জাম, হিজল, শিরিষ ইউক্যালিপটাস। কবরখানার পাশে ফুটে আছে নানা রঙের মরসুমী ফল। টাটকা তাজা বাতাস সুবাসে ভরপুর। ফুলে ফুলে প্রজাপতির ওড়াউড়ি। হাওয়ায় সঙ্গীতের সুর। সব শেষ হয়ে যাবে? বিক্রি হয়ে যাবে রনির সাধের সেন্ট হেলেনা।

অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক চিরে।

হঠাৎ কোথা থেকে দৌড়ে এলো লাকি। ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিল এতক্ষণ। আগের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো, উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলো। ঈশ্! কত রোগা হয়ে গেছে লাকি। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো কর্নেল, লাকি, মাই ডিয়ার বয়, মাই সান। লাকি মুখ ঘষছে ব্যাঙোর বুকে, চোখ দুটোয় জল।

হাই সাটাজিত, মাই সান। কখন এলে?

এই নামে আজকাল কেউ ডাকে না। কে? চমকে পেছন ফিরে দেখে ফাদার এলবার্ট, ছেলেবেলাকার স্কুলে প্রিন্সিপাল ছিলেন, রিটায়ার করে এখানে। গির্জার পুরোহিত। সোসাইটি অব জেসুইট্সের সেন্ট ভিনসেন্ট গির্জা। ধবদবে সাদা চুল, দাড়ি এবং আলখাল্লায় চোখে-মুখে পবিত্রতার ঢল। কাঁধে ঝুলছে লম্বা সাইড ব্যাগ। বুকে লম্বা চেনের সঙ্গে ক্রস।

প্রণাম করলো ব্যাঙো। ফাদার বললেন, গড ব্লেস ইউ মাই সান। ব্যাগ থেকে রুটি, বিস্কুট, মাংসের বাটি বার করে লাকির সামনে ধরলেন। গত বছর পাঁচেক ধরে এখানে আছি। এই বাড়িতে রোজই আসি, ঠিক বিকেলের দিকে।

গোগ্রাসে ফাদারের দেওয়া খাবার খাচ্ছে লাকি। ঘাড়ে-পিঠে হাত বুলোচ্ছে ফাদার, জানো সাটাজিত, সারাদিন ও কিছু খায় না। রনিকে পাহারা দেয়। বসে থাকে আমার প্রতীক্ষায়। রনির সমাধিক্ষেত্রের সামনে দাঁড়ান ফাদার, বুকে ক্রস আঁকলেন, যীসাসের লকেটে হাত দিয়ে চোখ বুঁজে একটু বাদে তাকালেন, প্রার্থনা করো। প্রার্থনার একটা শক্তি রয়েছে। শুধু রনি কেন, আমি তোমাদের সবার জন্যেই প্রার্থনা করি। তুমি আর রনি দুজনেই আমার ছাত্র। ডু গুড আনটু অল। ভালোবাস, সবাইকে ভালোবাস। লাভ ইজ গড।

ফাদারের সামনে বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছে যেন ব্যাঙো, হাতটা ধরে মাথায় ঠেকালো, কী সৌভাগ্য আমার, আপনাকে দেখব ভাবিনি। চলুন ফাদার, ওপরে গেস্টরুমে। আপনার সামনে বসে বাইবেলের গল্প শুনব সেই আগের মতো।

ওকে জড়িয়ে ধরেছেন ফাদার, চলো মাই সান, আই লাইক মাই স্টুডেন্টস।

ফুলবাগানের মাঝ দিয়ে সুন্দর রাস্তা চলে গেছে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। কবরখানা থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছেন ফাদার, সঙ্গে ব্যাঙো। প্রজাপতি আর ফড়িং উড়ছে ঘুরে ফিরে। ঘরে ফিরছে পাখিরা। টিয়া, চন্দনা ফুলটুসি। ইউক্যালিপটাস গাছের

দিক থেকে একজোড়া ময়ূর ডেকে উঠলো।

হঠাৎ সামনে এসে পথ আটকাল লাকি, ফাদারের আলখাল্লা ধরে টানছে, গর্জে উঠছে বারবার, কিছু বলতে চায় বুঝি। ফাদার দাঁড়িয়ে পড়লেন, হোয়াট হ্যাপেন্ড মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, এনিথিং রঙ?

লাকি ততক্ষণে একদৌড়ে দেয়ালের কাছে বাড়ির সীমানায় পৌঁছে গেছে, চিৎকার করছে, ডেকে উঠছে বার বার, মাটি আঁচড়াচ্ছে।

ফাদার বললেন, চলো ব্যাপারটা দেখি গে। থাবার নখে মাটি সরিয়ে ফেলেছে লাকি? দুজনে পৌঁছুতে শান্ত হলো। দু'পায়ের থাবার মধ্যে একটা ব্রিফকেস, দাঁতের কামড়ে হ্যাণ্ডেল ধরে তুলে দেখাচ্ছে।

ব্রিফকেসের ধুলো ঝাড়ল ব্যাণ্ডো, বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে আছেন ফাদার, বিদেশী জিনিস, কম্বিনেশন লক। নম্বর তিনটা নয় ছটা।

ফাদার বলেন, নম্বর যার ব্রিফকেস সেই জানে। জানি না কি আছে ভেতরে? অন্য লোকের পক্ষে খোলা ইমপসিবল।

ইমপসিবল কথাটা আমার অভিধানে নেই ফাদার, হিপ পকেট থেকে পাতলা চৌকো বাক্স বার করে নম্বারগুলোর সামনে ধরলো, ক্যালকুলেটারের মতো দেখতে—মৃদু চাপ দিতেই বাক্সের পর্দায় লেখা ফুটে উঠলো 'ডাজ নট কনটেন মেটাল অর বোম্ব'—যাক্ ফাদার, নিশ্চিন্ত হলাম, কোনো বিস্ফোরক পদার্থ বা অস্ত্রশস্ত্র নেই। কিন্তু ভারী বাক্স, দেখা যাক কী আছে। চৌকো বাক্সটার নিচে চাপ দিল, বললো, কম্বিনেশন লকের নম্বরের জন্য সার্চার রোবটকে নির্দেশ দিলাম—বাক্সের মুখটা তখন লকের দিকে, পর্দায় ফুটে উঠছে নম্বর বার বার, মুছে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ বাদে স্থির হয়ে গেল ছটা সংখ্যা, সিক্স ডিজিট—৭৫১৮২১। যন্ত্রটা পকেটে রেখে হাসলো ব্যাণ্ডো, ফাদার, সার্চার ভুল করে না। এই দেখুন।

নম্বরগুলো ঘুরিয়ে সাজাতেই খুলে গেল ব্রিফকেস—নোটে ভর্তি! আমেরিকান ডলার!

ফাদার বললেন, আশ্চর্য!

আশ্চর্য হবার কিছু নেই ফাদার। এ সমস্ত ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকা। পিটার এখানে আসার মাস খানেক আগে বাড়িটায় রহস্যময় এক আগন্তুক এসেছিল। অস্ত্রশস্ত্রের চোরা-কারবারী, দেশের শত্রু, বিদেশী এজেন্ট। কাঁচাপাকা চুল, মুখভর্তি দাড়ির জঙ্গল। আশ্চর্য সমুদ্রনীল রঙ চোখ দুটো। কুচকুচে কালো মণি। এবার তড়িঘড়ি ফিরে এসেছিল রনি, বোধহয় ওকেই ধরতে। আর্মি ইনটেলিজেন্সের খবর এদিকে কোথাও গুপ্ত অস্ত্রভাণ্ডার রয়েছে, এ কে ৪৭, রকেট লঞ্চার, মর্টার, অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র। এটা বর্ডার এলাকা। পাচার করা যাচ্ছে বাংলাদেশ হয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, উগ্রপন্থীদের হাতে হাতে ঘুরছে।

দীর্ঘশ্বাস ফাদারের, বাড়িটার দেখাশোনা গত বছর চারেক ধরে আমিই করে আসছি। কেয়ারটেকার বলতে পারো। কেউ এলে খুলে দিই। রনির চিঠি নিয়ে একজন এসেছিল, আমি থাকতে দিয়েছিলাম। পরে শুনেছিলাম চিঠিটা জাল।

রনির মুখে আর কিছু শোনেননি ফাদার?

সময় পেল কোথায় বলার। এসেই ম্যালেরিয়া, সর্দি, কাশি, জ্বর। দিন দশেকের

ভেতর ভালো না হতেই আবার অসুস্থ। আমার কাছে খবর পেয়ে পিটার এল। আশ্বস্ত হলাম। রনি সেই যে বিছানা নিল, আর উঠলো না। কঙ্কালসার চেহারা—কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

একতলার বসার ঘরের সামনে পৌঁছে গেছে দুজনে কথা বলতে বলতে। ব্যাঙোর কাঁধে ফাদারের হাত, জানো সাটাজিত, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

একথা কেন ফাদার?

বারান্দায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরের গাছগাছালির উপর উদাস দৃষ্টি ফাদারের, রিটায়ার করে এই চার্চে এলাম, কলকাতার মতো পলিউশন নেই। টাটকা তাজা বাতাস। কেমিস্ট্রি পড়াতাম তোমাদের, মনে আছে?

ব্যাঙো হেসে উঠলো, সেজন্যই তো কথা বলতে ভয় পাই। মনে হয় এখুনি জিজ্ঞেস করবেন নাইট্রাস অক্সাইডের কম্পোজিশন, না পারলে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দেবেন বেঞ্চে।

ইয়েস কেমিস্ট্রি, এটম আর মলিকুলের খেলা জগতে—বছর পাঁচেকের মধ্যে দেখতে দেখতে বদলেই গেল জায়গাটা। কাতারে কাতারে লোকজন আসছে, আসছে বর্ডার পেরিয়ে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। গাছ কেটে, পুকুর বুজিয়ে, গড়ে তুলেছে নতুন বসত। শ্যালো ওয়াটার পাম্প এবং ডিপ টিউবেল দিয়ে সেচের জন্য উঠিয়ে নিচ্ছে মাটির জল। আমি কেমিস্ট্রির লোক, বুঝতে পারি কী ভয়ঙ্কর এক সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, ফাদারের গলা কাঁপছিল, পরীক্ষা করে দেখি, এখানকার খাবার জলে আর্সেনিক বিষ। ছোট লেবরেটারি আছে আমার, রোজ পরীক্ষা করি আর চমকে উঠি।

আর্সেনিক কেন ফাদার?

প্রকৃতির প্রতিশোধ বলতে পারো। পুকুর-টুকুর বুজিয়ে, গাছ-টাছ কাটলে ভূস্তরের পরিবর্তন হয়। মাটির তলায় স্বাভাবিক খনিজ স্তরে আর্সেনিক থাকে। সবুজ বিপ্লব আর অধিক খাদ্য ফলানোর নামে বাড়ছে ক্ষেতখামার—কীটনাশক পদার্থ স্প্রে হচ্ছে। সেচের জন্য পুকুর না কেটে মানুষ তুলে নিচ্ছে পৃথিবীর সঞ্চিত জল। অনেকগুলো ডিপ টিউবেলের জল পরীক্ষা করে আর্সেনিক পেয়েছি। সরকারকে জানিয়েছিলাম। প্রথমে গা করেনি। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যে বেশ কিছু লোক অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। হাতে-পায়ে-চামড়ায় ঘা, ক্ষতস্থানে ক্যান্সার। সুদীর্ঘকাল ধরে আর্সেনিকযুক্ত জল খেয়ে লোকজনের এই উপসর্গ। তখন টনক নড়লো। সিল করে দিয়েছে দূষিত জলের নলকূপ, কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়েই গেছে। আর্সেনিককে বলবো 'নীরব হত্যাকারী', চুপিসাড়ে শরীরে ঢোকে। বিষে বিষে ক্ষয়ে যায় মানুষ। এদিকে কেন, বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই এখন সেই ভয়ঙ্কর শত্রুর দাপট। মৃত্যু মনে হয় স্বাভাবিক। ধরে কার সাধ্যি! আর্সেনিকমুক্ত জল পেতে গেলে যে সব দরকারী যন্ত্রপাতি দরকার, কারখানার প্রয়োজন—তা নেই এদেশে। কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে এই আর্সেনিক—কী ভয়ঙ্কর!

ব্যাণ্ডোর চোখে ভাবান্তর, বলে উঠলো, সেণ্ট হেলেনা, নেপোলিয়ন—এয়ার কমোডর রনি ডিমেলো, আর্সেনিক। মনে হয় মিল আছে ফাদার, ইংরেজরা যতই সাফাই গাক, ওরা স্লো পয়জনিং করেছিল। নেপোলিয়ন মারা গেছলেন ঐ সেঁকো বিষের জন্য।

ইউ আর কারেক্ট মাই বয়, আর্সেনিক ইজ 'ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক'। শরীরে ঢুকে যায়, বেরোতে পারে না। চুল, নখ, দাঁত আর হাড়ের কানাগালিতে আটকে যায়। বহু বছর বাদে চুল, হাড় পরীক্ষা করলেও ধরা পড়ে। মমির মতো সাদা ফ্যাকাশে হয় মৃতদেহ—সাদা চুল।

কী বলছেন ফাদার! রনির কেসটা আর্সেনিক পয়জনিং নয় তো?

নো, নো, ঝটপটই চলে গেছে রনি। দূষিত জলের আর্সেনিকে মৃত্যু হয় কিন্তু সময় লাগে অনেক অনেক বেশি।

হাতের মুঠি দৃঢ় হলো ব্যাণ্ডোর, কণ্ঠে উত্তেজনা, নো ফাদার, আই অ্যাম ডেফিনিট ইট্‌স আ কেস অব মার্ডার, পেছনে বিদেশী এজেণ্ট। পরমাণু অস্ত্র বহনকারী বিশেষ প্লেন চালাবার দক্ষতা একমাত্র এদেশে ওরই ছিল। সেকেণ্ড অ্যাটম বোম্ব টেস্ট আণ্ডারগ্রাউণ্ডে এ বছরই হবার কথা। পরমাণু বোমা গুপ্ত জায়গা থেকে রাজস্থানের মরুভূমির কাছে ফৌজি বিমানে ল্যাণ্ড করার কথা ছিল ওর, পিছিয়ে গেলাম আমরা। একটু থামলো ব্যাণ্ডো, সেঁকো বিষ পারদের তুলনায় চার গুণ শক্তিশালী। মারণ ডোজ, আই মিন ফ্যাটাল ডোজ অব আর্সেনিক ১২৫ মিলিগ্রাম, ঠিক বলছি তো?

আই অ্যাম প্রাউড অফ মাই বয়, তোমার ঠিকই মনে আছে—সেই কবে পড়িয়েছিলাম।

যদি ঐ পরিমাণ বিষ চা কিংবা কফির সঙ্গে এক চামচ মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মৃত্যু অবধারিত—পোস্টমর্টেমে ধরা পড়বে না। রনির মতো উপসর্গে মরে যাবে যে কেউ।

রাইট মাই সান—এ কথাটা কিন্তু ভাবিনি। রনির মৃত্যু কলেরার মতো রোগে।

রহস্য নম্বর ৭৫১৮২১

নিচের ঘরে সোফায় বসে কথাবার্তা হচ্ছিলো। ফাদার এবং ব্যাণ্ডো। সামনে লাকি থাবা গেড়ে বসে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঘরে আলো জ্বলছে—ধূপ পুড়ছে যীসাসের সামনে।

ফাদার বলছিলেন, তোমার কথাটা ভাবার মতো, রনির মৃত্যু সম্পর্কে যা বলছো হতেও পারে। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? পোস্টমর্টেম নর্মাল।

ফাদার, এই ফটো কাইণ্ডলি দেখুন, চিনতে পারেন কিনা—পকেট থেকে একটা পাসপোর্ট ছবি ফাদারের দিকে এগিয়ে দিল ব্যাণ্ডো।

ইয়েস দ্যাট ম্যান। সেই অদ্ভুত চোখ, দাড়ি, হাঁ, সেই রহস্যময় আগন্তুক, কোথায় পেলে?

যোশেফ দিয়েছে ফাদার। ও আমাদের লোক, বহুদিন ধরেই বাড়িটার দিকে নজর রাখছিল। ইণ্টারপোল থেকেও এই ফটো পেয়েছি, ওর নাম ডেভিড ডিসুজা।

যোশেফ তোমাদের লোক! গোয়েন্দা! বুঝতেই পারিনি।

সোফায় বসে নেপোলিয়নের ছবিটা দেখছিল কর্নেল, ভাগ্যের কী আশ্চর্য পরিহাস—বাড়ির নাম সেণ্ট হেলেনা! কেউ কেউ হয়তো ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আজ রাত্তিরে কবর থেকে তোলা হবে রনিকে। তারিখ ৮ মে। মে মাসের এই তারিখেই পোস্টমর্টেম হয়েছিল সেই সম্রাটের—অদ্ভুত মিল, কাকতলীয় কিন্তু আশ্চর্য সত্য।

ইয়েস মাই সান, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। ঈশ্বর করুণাময় অথচ কঠোর। যদি আর্সেনিক পয়জনিং—এ মৃত্যু হয় রনির তাহলে অপরাধী ধরা পড়বেই। প্লিজ ওয়েট।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ব্যাণ্ডো, ফাদার, সামনের অয়েল পেন্টিং দেখুন, নেপোলিয়ন—নিচে লেখা জন্ম ও মৃত্যু সাল, ১৭৬৯—১৮২১ এ. ডি.। ১৮২১ সালের ৭ মে মারা গেছলেন সম্রাট। তার মানে ৭/৫/১৮২১, ৭৫১৮২১—ব্রিফ কেসের লকের নাম্বারটা কিন্তু তাই। অপরাধী যেই হোক, ওঁর মৃত্যু তারিখ মুখস্থ—প্রিয় নাম্বার। নিশ্চয়ই নেপোলিয়ন বিশেষজ্ঞ, ফোনের নাম্বার, জন্মতারিখ, বিবাহবার্ষিকী—এসব নম্বর আমরা ভুলি না। সেরকমভাবে কম্বিনেশন লকের অক্ষর সাজাই—ভুল যাতে না হয়।

পিটারকে সন্দেহ করতে হয় তাহলে। হি ইজ অথোরিটি রিগার্ডিং নেপোলিয়ন।

নো ফাদার পিটার রনির নিজের ভাই। ও এ কাজ করবে না। লেট আস্ সি এণ্ড ওয়েট।

ঘড়ি দেখলো ব্যাণ্ডো, অনুগ্রহ করে একটু বসুন ফাদার। আমি বাইরে যাচ্ছি, হেডকোয়ার্টারে মেসেজ দেব। এখন সোয়া ছটা, পিটার ফিরে আসছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে থাকুন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাব। লাকি, মাই ফ্রেণ্ড, ফাদারকে দেখ।

একছুটে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় বেরিয়ে গেল ব্যাণ্ডো। মিশে গেল বাইরের অন্ধকারে। জিপ এসে গেছে, গাড়ি থেকে নামলো পিটার আর যোশেফ।

সেই চোখ

সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। বাইবেল পড়ছেন ফাদার। সাক্সেসন সার্টিফিকেট ভাঁজ করে ছোট টেবিলে রাখলো পিটার, ব্যাণ্ডো কোথায় ফাদার? ক্লান্ত দেখাচ্ছিল পিটারকে, যা ঝামেলা, সার্টিফিকেট করতেই মাস খানেক লেগে গেল।

বাইরে পায়ের শব্দ, ফাদার বললেন, নিশ্চয়ই ব্যাণ্ডো আসছে।

যোশেফ এসে দাঁড়ালো, ব্যাণ্ডো নয়, ডেভিড ডিসুজা, মিঃ পিটার স্যার।—হি ওয়ান্টস টু মিট ইউ।

ডেভিড ডিসুজা! বিস্ময়ের গলা পিটারের।

ঘরে ঢুকে পড়েছে তখন আগন্তুক। ফাদার অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। সেই লোক যার ফটো একটু আগে ব্যাণ্ডো দেখিয়েছিল, এই-ই জাল চিঠি নিয়ে এসেছিল। সেই অদ্ভুত চোখ, কাঁচাপাকা চুল, দাড়ি। ভয়ঙ্কর দৃষ্টি।

যোশেফ বললো, বসুন ডেভিড সাহেব, কী খাবেন চা না কফি?

কফি প্লিজ, চিনি নয় কিন্তু। গুড ইভনিং ফাদার, আবার দেখা হলো। আর আপনি তো পিটার ডিমেলো, আমায় চিনতে পারছেন না? কী ব্যাপার, ওরকম বড় বড় চোখে তাকাচ্ছেন কেন?

মুহূর্তের ভেতর রিভলবার উঠে এল পিটারের হাতে, আপনি সেই ডাকাত, কুখ্যাত অপরাধী! নড়বার চেষ্টা করবেন না ডেভিড, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবেন।

সশব্দে হাসল ডেভিড, উত্তেজিত হচ্ছেন কেন পিটার। আপনার এত রাগ কেন? ডেভিডকে চেনেন নাকি? বলতে বলতে মাথা নিচু করে কণ্টাক্ট লেন্স খুলে ফেলে তাকালো, চোখ আর মণির রঙ পাল্টে ফেলেছিলাম, এবার চোখের দিকে পাল্টে তাকান, আসল চোখ দেখুন। পরচুলা খুলে ফেলল ডেভিড একটানে।

ফাদারের বিস্ময়ের কণ্ঠ, ব্যাঙো, তুমি!

ইয়েস ফাদার, আমি। গলার স্বরও পালটে দিয়েছিলাম। দুজনেই বোকা বনে গেছলেন। হাসছে ব্যাঙো, ফটো দেখলে যে কোনো রূপে সাজতে পারি—এবার নিশ্চয়ই বুঝলেন ডেভিড আর ব্যাঙো একই লোক। সাজপোশাক আলাদা।

বুলেটপ্রুফ জামাটা উল্টে পরেছিল ব্যাঙো, এবার সোজা করে নিল। ডিপ মেরুন কালার থেকে নেভি ব্লু রং এখন। আগের মতন। ব্যাঙো বলছিল, পিটার সাব, ওপরে তিনতলায় রেস্ট নিন, ধকল আপনার কম যায়নি। আমাকে সারারাত জাগতে হবে। আজ রনির ডেডবডি তোলা হবে কবর থেকে। আপনিও সাবধানে থাকবেন। মনে রাখবেন ইয়োর লাইফ ইজ অলসো ইন ডেঞ্জার। শত্রুপক্ষ আপনাকে ছাড়বে না, আপনি অনেক খবর জানেন। বলে যদি দেন তাহলে ওদের ক্ষতি।

আই ডোণ্ট কেয়ার, সব আপনাকে বলেছি।

না, না, সাবধানের মার নেই। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এই পুরো জায়গা এখন আণ্ডার আর্মি কমাণ্ড। মাছি গলার উপায় নেই।

ফাদার বললেন, এবার আমায় উঠতে হচ্ছে সাটাজিত, ঈশ্বরে আশীর্বাদে সত্য নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে।

হতাশ দেখাচ্ছিল পিটারকে। বিধ্বস্ত চেহারা, আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

যোশেফ ঘরে ঢুকলো সঙ্গে সঙ্গে। ব্যাঙো বললো, থ্যাঙ্কস যোশেফ, তুমি খাবারের সঙ্গে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিও। সকাল ৮টার আগে যাতে ঘুম না ভাঙে পিটারের। জাল গুটিয়ে এনেছি। কাল ফাইনাল রাউণ্ড।

ও. কে. স্যার।

মৃত্যু না হত্যা?

সকাল ৯টা। ড্রয়িং রুমে সোফায় গা এলিয়ে বসে ব্যাঙো। একদিকে ফাদার এলবার্ট, অপরদিকে পিটার। ঘরে জমাট নিস্তব্ধতা। কথা নেই কারো মুখে।

রাতজাগা ব্যাঙোর চোখে ক্লান্তির ছাপ নেই। বাইরের কবরখানার দিকে তাকিয়ে

ভাবছিল বোঝার উপায় নেই কত কাণ্ড ঘটে গেছে রাত্তিরে। সামরিক বিভাগের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর—লিভিং মেটাল ডিটেকটার—দাপিয়ে বেরিয়েছে সারা জায়গা জুড়ে। গন্ধ শুঁকেছে, দাঁড়িয়েছে। ছুটেছে। জোয়ানরা খুঁড়ে ফেলেছে মাটি—উঠে এসেছে নানা ধরনের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। মেশিনগান থেকে রকেট লঞ্চার, আর ডি এক্স-এর বাক্স—কলকাতা উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কৃষ্ণপক্ষের রাত্তিরে নাইট ভিশন চশমা পরে জওয়ানরা কাজ সেরেছে। অপারেশন এক্স সম্পূর্ণ। গুপ্ত অস্ত্রভাণ্ডার থেকে গাড়ি বোঝাই অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলেন যখন ব্রিগেডিয়ার সিং তখন রাত তিনটে। অন্যদিকে আর্মির ডাক্তাররা কবর থেকে তোলা রনির ডেডবডি তুলে ছবি তুলেছেন বার বার। কী আশ্চর্য! মৃতদেহে পচন নেই! কোঁচকানো চামড়ায়, ফ্যাকাশে চোখমুখে মমি হয়ে শুয়ে আছে রনি। ধবধবে সাদা চুল। রাত চারটায় জ্বলে উঠেছিল সার্চ লাইটের জোরালো আলো। পোস্টমর্টেম শেষ তখন। সামরিক অভিবাদন সহ বিদায়ের শেষ সুর তখন বিউগেলে। কফিনে ডেডবডি রেখে কবরের সামনে টুপি খুলে দাঁড়ালেন এয়ার মার্শাল—বায়ুসেনার সর্বাধিনায়ক। স্যালুট করলেন। ব্যাঙো দাঁড়িয়ে ছিল। দ্রুত মেরামত করা হলো সব জায়গা। নতুন করে ঠিক করা হলো ক্ষতিগ্রস্ত কবরস্থান। ফিরিয়ে দেওয়া হলো সেই আগের চেহারা । ব্যাঙো দাঁড়িয়ে ছিল অশ্রুসজল চোখে—বুকের ভেতর অব্যক্ত এক যন্ত্রণা। ফৌজিরা ফিরে গেল ঠিক পাঁচটায়। ঘড়ির মাইক্রোফোনে মেসেজ পাঠালো ব্যাঙো—দিল্লীর সদর দপ্তর—ইয়েস ব্যাঙো স্পিকিং, অপারেশন এক্স ওভার—মিশন সাক্সেসফুল, ইয়েস মার্ডার। আর্সেনিক। কালকের ঘটনা চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলো।

প্রথম পিটার মুখ খুললো, এত কাণ্ড ঘটে গেছে বুঝতেই পারিনি। কেস অব মার্ডার? কী বলছেন আপনি?

ব্যাঙোর কণ্ঠস্বর শান্ত, হ্যাঁ খুন। গুপ্ত অস্ত্রভাণ্ডারের খবর আগেই পেয়েছিল রনি। অপরাধীকে চিনতেও পেরেছিল। কিন্তু তখন আর তার কথা বলার শক্তি নেই। তার আগেই ব্রেকফাস্টের দুধে আর্সেনিকের মারণ-ডোজ মিশিয়ে দিয়েছে খুনী। আমরা তাকে সনাক্ত করেছি পিটার। ক্লোজ সার্কিট টিভিতে দিল্লীতে বসেই দেখেছি।

হু ইজ দ্যাট মার্ডারার? টেবিলে ঘুষি মেরে চেঁচিয়ে উঠল পিটার, আই ওয়ান্ট টু কিল হিম। হি মাস্ট বি অ্যান এজেন্ট অব আই. এস. আই।

ঠিক বলেছেন। তিনি ভারতীয় কিন্তু দেশদ্রোহী। আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন, আপনার কাছ থেকে পাওয়া রনির চুল আর নখে পাওয়া গেছে আর্সেনিক—লিথাল ডোজ। খুনী সেই মিঃ ডেভিড, বিদেশী এজেন্ট। ছাত্র সেজে পি. এইচ. ডি. করার ছুতোয় আপনার কাছে আই মিন পীটার ডিমেলোর সঙ্গে মিশে গেল। নতুন গবেষণা—'ট্রু স্টোরি অব সেভেন ফাইভ এইট্টিন টুয়েন্টি ওয়ান, এ ডেথ অব অ্যান এম্পায়ার।'

নেপোলিয়নের মৃত্যু রহস্যের উপর আলোকপাত। বই হয়ে বোধহয় বেরিয়ে গেছে এতদিনে।

সিগ্রেট ধরালো ব্যাঙো, লাকি বসে আছে পিটারের পেছনে, গোঁ গোঁ করে উঠছে

বার বার। আক্রোশের গলা। উঠে দাঁড়ালো লাকি, সেই ব্রিফকেসটার হাতল মুখে করে ব্যাঙোর পাশে রাখলো।

থ্যাঙ্কস মাই ফ্রেণ্ড, ব্রিফকেসটা এগিয়ে দিল পিটারের দিকে ব্যাঙো, এটা চিনতে পারেন—কম্বিনেশন লক, দেখুন না যদি খুলতে পারেন।

এর নাম্বার আমার জানার কথা নয় কর্নেল।

দৃঢ় কণ্ঠস্বর ব্যাঙোর, আপনি নেপোলিয়ন বিশেষজ্ঞ—'ট্রু স্টোরি' বই লিখেছেন। নিশ্চয়ই পারবেন, ইয়েস ইউ নো-দ্য নাম্বার। কালপ্রিট আপনার মতোই নেপোলিয়ন ভক্ত, সাহায্য করেছে বই লেখায়। এই কেসটা ডেভিডের।

তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? সে খুনী, ব্যাঙ্ক ডাকাত।

কী করে জানলেন খুনী, কাকে খুন করেছে? রনিকে? আপনাকেও খুন করার চেষ্টা করেছিল নাকি? বলুন খুলে বলুন।

ম্লান হাসি পিটারের, যখন অপরাধী ধরেই ফেলেছেন, আমাকে বলতে হবে কেন, এই কম্বিনেশন লকের সুন্দর গল্প বানাতে পারেন—এখন হয়তো বলেই বসবেন আমিই অপরাধী, খুন করেছি রনিকে, নেপোলিয়নের মতো, আর্সেনিক প্রয়োগে।

ফাদার বাইবেল পড়ছেন, এবার তাকালেন, পিটার মাই সান, কিছু জানলে বল, ঈশ্বরে কাছে কেঁদে বললে তিনি সব ক্ষমা করে দেন।

ব্যাঙো বলে উঠলো, রাইট ফাদার, তিনি ক্ষমা করেন—করুণাময় অথচ কঠোর! তাঁর কাছে সবই ধরা পড়ে। যাক্‌গে পিটার সাহেব, কালপ্রিট হিসাবে আপনাকে মিন করছি না, আপনি রনির ভাই, আপনার কথা আলাদা। সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। বনির হত্যাকারী এখন হাতের মুঠোয়।

সিগ্রেটটা নিভিয়ে গ্লাসের জলে চুমুক দিল ব্যাঙো, অতি চালাকির গলায় দড়ি—পচা শামুকে মাঝে মাঝে পা কাটে। সেই নতুন বইটায় নেপোলিয়নের মৃত্যুরহস্য রয়েছে—তারিখটা মনে করুন—এবার নাম্বার ঘোরান। ছটা নাম্বার—কী! মনে হচ্ছে ভুলে গেছেন। আমি সেই ৭/৫/১৮২১-এ ঘুরিয়ে দিচ্ছি—এই যে খুলে গেছে ব্রিফ-কেস। নেপোলিয়নের মৃত্যুদিন—ডেথ অব এম্পায়ার।

চমকে উঠলো পিটার, এত টাকা! ভাবাই যায় না!

আপনার আলমারিতে বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে আরো আছে পিটার। ব্রিফকেসের ডালার ভেতরে আঙুলের ছাপ, বইয়ের টাকায় ছাপ, রনিকে যে গ্লাসে দুধে লিথাল ডোজ আর্সেনিক দেওয়া হয়েছিল সেখানেও ছাপ পাওয়া গেছে।

কর্নেল, মুখে হাসি পিটারের, ছাপ দিয়ে কি আসে যায়, নিশ্চয়ই ডেভিডের সঙ্গে মিলে গেছে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানেন হাতের ছাপে আমরা সবাই আলাদা। একজনের সঙ্গে আরেকজনের মেলে না। কিন্তু ফিঙ্গার প্রিণ্টগুলো একই ব্যক্তির, আপনি যখন এখানে তখন ডেভিড হাওয়া হয়ে গেছে। রনিকে দুধ রোজ সকালে আপনি দিতেন অথচ গ্লাসে ডেভিডের আঙুলের ছাপ কি করে এলো সেটাই রহস্য।

খুব সোজা কর্নেল, বোধহয় ছদ্মবেশে এসেছিল।

তাহলে ডেভিড পিটার সাজতে পারে, প্রয়োজন হলে পিটার ডেভিড—তাই না?

পিটার ছটফট করছিল, কথা ঘুরোতে চাইছে, আমাকে একটু লিগাল অ্যাডভাইসারের কাছে যেতে হবে কর্নেল, সার্টিফিকেট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো, হাউ টু সেল দ্য প্রপার্টি।

ঐ সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলে দিন পিটার।

কেন?

ফাদার বললেন, রনির উইল আমার কাছে, অলরেডি রেজিস্টার্ড। এই সব জমি জায়গা বাড়ি সব এখন চার্চের সম্পত্তি, সোসাইটি অব জেসুইট্স অনাথ আশ্রম বানাবে, হোম ফর দ্য হোমলেস—

ব্যাঙো বললো, আই. এস. আই এজেন্টদের কাছে এ জায়গাটা ছিল আদর্শ স্থান। আপনি সাক্সেসন সার্টিফিকেট পেলে ওদের সুবিধা হতো, গুপ্ত অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলতই। আর এটা হয়ে উঠতো বিদেশী এজেন্টদের স্বর্গরাজ্য। অলরেডি তাই হয়ে গেছলো। আপনিও খুন হয়ে যেতেন একদিন।

কথাগুলোয় পাত্তা দিল না পিটার, বাঃ চমৎকার গল্প। সুন্দর বলতে পারেন—রনি আমার ভাই, ওর সঙ্গে শেষের দিকে কত কথাই না হয়েছে। ডেভিড কিংবা অস্ত্রভাণ্ডার সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু বলতো—না, বলার মতো অবস্থায় ছিল না, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, যে কোনো লোক নিজেকে পিটার বলে পরিচয় দিলে মেনে নিত।

হোয়াট ডু ইউ মিন, আমি পিটার নই? শুনুন ফাদার, কর্নেল কীসব বলছে—

মাই সান, গত পাঁচ বছর ধরে আমি এখানে, তোমায় প্রথম দেখলাম। আগে চিনতাম না। যার চেনার কথা সে রনির শোকে পাগল—তোমাকে পিটার বলে মানতে চায় না, তাড়া করে। হ্যাঁ, আমি লাকির কথা বলছি। সুদীর্ঘকাল পরে দেখলেও কুকুরের চেনার ক্ষমতা প্রশ্নাতীত।

পিটার চুপ, জানি না আপনাদের কি উদ্দেশ্য, আমাকে ফাঁসিয়ে কী লাভ? কর্নেল, আসল কথা খুলে বলুন। আমি আসতামই না, ফাদারের তার পেয়েই এসেছি—

হ্যাঁ পিটার—চোরের মায়ের সবসময়ই বড় গলা। আগে আমায় বলতে দিন। রনি হত্যার ছক বছর চারেক আগেই কষা হয়েছিল। ডেভিডকে ছাত্র সাজিয়ে পাঠানো হলো পিটারের কাছে। দারুণ ভাবে মিশে গেল ডেভিড। ও এদিককারই ছেলে। থিসিসের নাম করে কাছের মানুষ হয়ে গেল পিটারের। উদ্দেশ্য অন্য। তার স্যার পিটার ডিমেলো আসলে আমাদের গুপ্তচর। ওঁর কাছ থেকে বিদেশী চক্রান্তের খবর নিয়মিত পেতাম। ম্যাপে দেখবেন এ জায়গাটার কী ইমপর্টেন্স। দেশপ্রেমিক ডিমেলো পরিবারের বাড়ি আই. এস. আই-এর সদর দপ্তর হলে অনেক সুবিধা। কারও সন্দেহ হবে না। তক্কে তক্কে ছিল ডেভিড। রনির অসুস্থতার খবর ডেভিডের হাতে পৌঁছেছিল—তার আগে অবশ্য এখানকার সব জেনে নিয়েছে ও। তিল তিল করে জায়গাটাকে গুপ্ত অস্ত্রাগার এবং অস্ত্র বেচাকেনার টাকার স্বর্গ করে তুলেছিল। আর ডেভিড ছিল কালার ব্লাইণ্ড, মিঃ মিটার, আপনিও কালার ব্লাইণ্ড—সেই অপরাধী।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো পিটার, দু' হাতে দুটো রিভলভার, একটা যোশেফ

আরেকটা ফাদারের দিকে, ইয়েস আমিই ডেভিড। বিদেশী এজেন্ট। রনির ভাই সেজে এসেছিলাম, পিটার এখন আমাদের হাতে বন্দী। রনি আর লাকি আমায় ধরে ফেলেছিল। রনিকে বলার সুযোগ দিইনি, তার আগেই সরিয়ে দিয়েছি। আমায় যেতে দিন, না হলে এ দুজন খুন হয়ে যাবে। ব্যাঙো—কম মেহনত করিনি, পিটারের আস্থা অর্জনের জন্য।

নেপোলিয়ন গুলে খেয়েছি। জানি এই এলাকাটার জলে আর্সেনিক, রনির মৃত্যুতে সন্দেহ হবে না কারো। আর সাতটা দিন সময় পেলেই সব অস্ত্র, টাকা-পয়সা পাচার করে এখানকার মালিক হয়ে যেতাম—খুন করে ফেলতাম পিটারকে।

হেসে উঠলো ব্যাঙো, হাতের অস্ত্র ফেলে দিন ডেভিড, ওদের দুজনকে খুন করতে পারেন, আমায় পারবেন না—আমার বুলেটপ্রুফ জামা আর শরীরে রয়েছে পাতলা কৃত্রিম চামড়ার ইলেকট্রনিক আস্তরণ। গুলি লাগে না—ইজরায়েলে তৈরি। ডবল প্রোটেকশন বলতে পারেন। আর বেরোবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ। বেরুটে সমুদ্রের ধারে নির্জন জায়গায় পিটারকে বন্দী করে রেখেছেন? বাঁচিয়ে রেখেছেন এখনও? কিন্তু কোনো লাভ নেই। মরে গেলেও পিটার মুখ খুলবে না। বলবে না বর্ডারের কোথায় কোথায় ক্ষেপণাস্ত্র বসান আছে।

লাফ দিয়ে হঠাৎই ডেভিডের ঘাড়ে কামড়ে ধরল লাকি। এক ঝটকায় বসে পড়ল ডেভিড, ট্রিগার টিপল—

লাভ নেই ডেভিড। একটা গুলিও নেই আপনার অস্ত্রে, যোশেফ আগেভাগে সব সরিয়ে ফেলেছে। তবে আপনি দারুণ অভিনয় জানেন, ভালোই হলো স্বীকার করলেন। আমি সব জানতাম। গল্প ফাঁদতে হয়েছিল ঠিকই, সেটা কাচের জার মানে রনির চুল আর নখ হাতাবার জন্যে। মাস দুয়েক ধরে আপনি এখানে। বাইরের কোনো খবর পাচ্ছেন না। আপনার শক্তিশালী ওয়ারলেস যন্ত্রটাও খারাপ করে রেখেছে যোশেফ। তা না হলে ধরে ফেলতেন পিটার এখন মুক্ত। ইজরায়েলের আর্মি ইনটেলিজেন্সের সাহায্যে কমাণ্ডোরা নির্জন গুপ্ত স্থান থেকে তুলে নিয়ে এসেছে পিটারকে। আপনার গোটা দশেক শাগরেদ মারা গেছে। পিটার এখন তেল আবিবে, ভালো আছে। আমিও সেই অপারেশনে ছিলাম। ওখান থেকেই এসেছি ডেভিড সাহেব ওরফে নকল পিটারকে গ্রেপ্তার করতে—বড় বড় শ্বাস ফেলছে ব্যাঙো, হাতে রিভলবার।

এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন ডেভিড, দেশদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যু—আমি পাঁচ গুনছি, যীসাসের কাছে পাপ স্বীকার করুন—ওয়ান, টু, থ্রি....,হঠাৎ থেমে গেল ব্যাঙো, না, আপনাকে মারবো না, আমার একটা গুলির মূল্য আপনার মতো ঘৃণ্য লোকের জীবনের চেয়েও বেশি।

ফাদার বললেন, আইন নিজের হাতে তুলে নিও না ব্যাঙো, দেখলে তো ঈশ্বর আছেন, তিনি ধরিয়ে দিলেন, শাস্তি তিনিই দেবেন।

বাইরের জিপ থেকে ভারী পায়ের শব্দে ঘরে ঢুকে পড়েছেন তখন পুলিশ কমিশনার মিঃ ইসলাম, সঙ্গে ফৌজি পুলিশ। ব্যাঙো বললো, ডেভিডকে মারলে তোমাদের গুপ্ত খবর আর পাবে না—কাইণ্ডলি অ্যারেস্ট হিম মিঃ ইসলাম, যা বলবার উনি আদালতে বলবেন।

চায়ের পেয়ালায়

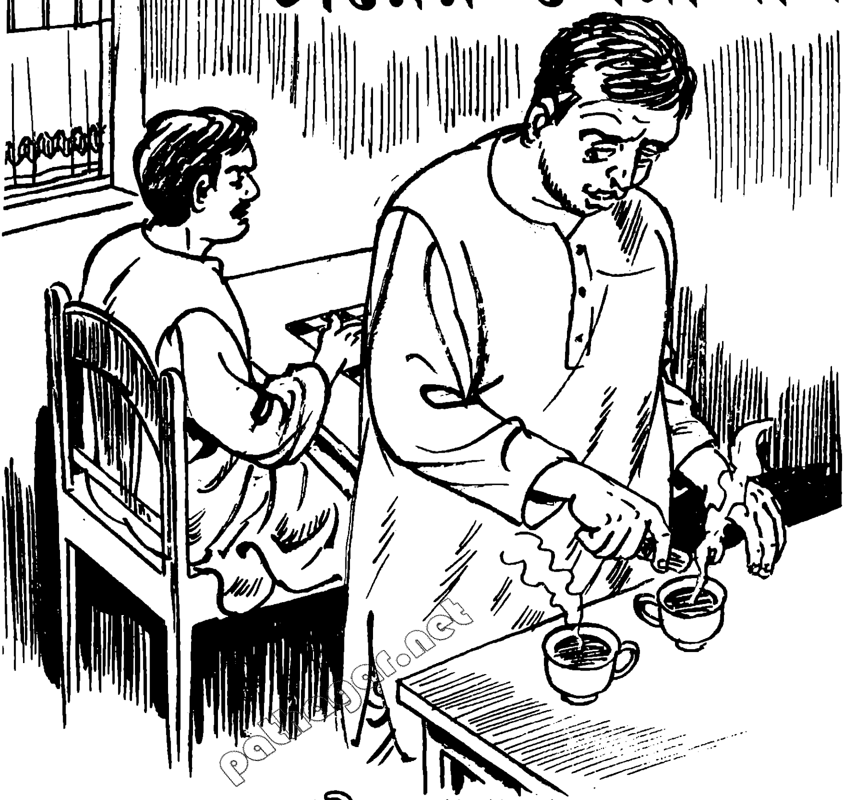

ভবানী মুখোপাধ্যায়

রায়সাহেব জয়দেব চৌধুরী আমাদের পাড়ায় যখন নতুন বাড়ি তৈরি করে এসে বসলেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় আটান্ন কি উনষাট। দিল্লীতে কি সরকারী চাকরি করতেন, খাস লাটসাহেবের দপ্তরে।

আমরা তখন বয়সে অনেক ছোট, শুধু শুনতাম দিল্লীর বড়লাট আর তাঁদের সব নানা রকম উদ্ভট খেয়ালের গল্প। অর্ধেক রাত্তিরেও তাঁরা জয়কে ডেকে পাঠাতেন, ঐ নামেই নাকি তাঁরা তাঁকে ডাকতেন। রায়সাহেব মানুষটা ভালো। আমাদের সরস্বতী পুজোয় বিনা বাক্যব্যয়ে একেবারে পাঁচ টাকা দিতেন, আমরা তাই 'সঙ্ঘশ্রী' ক্লাবের বাঁধা প্রেসিডেণ্ট করে নিয়েছিলুম রায়সাহেবকে। শুধু কিছুক্ষণ বড়লাটদের কথা শুনতে হতো—

'জানো হে, সে-বার তো লর্ড রিডিং সিমলে থেকে নেমে এলেন, এসেই বললেন—জয় কো বোলাও—

ভয়ে থরহরি কম্প, না জানি কি আদেশ হবে। কাঁপতে-কাঁপতে গিয়ে হাজির।

লাটসাহেব তো আমাকে দেখেই—হ্যালো জয়—বলে একেবারে বুকে জড়িয়ে

ধরলেন। তারপর নানারকম কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর কি বললেন—জানো?'

আমরা আর কি করে জানবো লাটসাহেব কি বলতে পারেন। রায়সাহেব আমাদের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'পারলে না তো? শোনো তাহলে বলি। লাটসাহেব বললেন—জয়, শনিবার রাত্রে আমার এখানে একটা খুব বড় ব্যানবোরেট হবে। লেডী সাহেবের খেয়াল হয়েছে 'স্মোকড হিলসা' খাওয়াবেন। তোমাকে 'এ্যারেঞ্জ' করতে হবে—এ্যানি হ্যউ—'

শক্ত শক্ত ইংরাজীগুলি তিনি ইংরাজীতেই বলতেন। যেমন 'এ্যারেঞ্জ' 'এ্যানি হাউ', বাকিটা বাংলায়।

আমরা সমস্বরে বললাম—'স্মোকড্ হিলসা কি জিনিস দাদু?'

—'এই দেখো, স্মোকড্ হিলসা বুঝতে পারলে না তোমরা, যাকে বলে ইলিশ-পোড়া। সাহেবরা তো আর তেল নুন খেতে ভালোবাসেন না। ওঁরা পোড়া, আধপোড়া, সেদ্ধ—এইসব খান। তার নাম রোস্ট, স্ট্যু, এমনই আর কি—'

আমাদের বাবলুই বুঝি প্রশ্ন করলো—'তা কি করলেন দাদু, ইলিশ মাছ পেলেন কোথাও?'

'ঐ দেখো, সে কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। ইলিশ মাছ, তখন মনে করো অক্টোবর মাস, সেবার বোধ হয় পুজো ঐ সময়ে পড়েছে। তখনই আমার পিসিমার দেওর নণ্টেকে তার পাঠালাম—ব্রিং টু ডজন হিলসা অ্যাণ্ড স্টার্ট এ্যাট্ ওয়ান্স'। সেদিন বুধবার। শনিবারের ভেতর নণ্টে দু'ডজন ইলিশ নিয়ে হাজির, আমারও মান-সম্ভ্রম বাঁচলো। লাটসাহেব সেবার খুশি হয়ে এই ছড়িটা আমাকে প্রেজেণ্ট করলেন।'

এই রকম সব গল্প। হাজার রকমের এবং একই কাহিনী হাজার বার। কখনো লর্ড রিডিং, কখনো বা আরউইন—কিন্তু আমরা বিরক্ত হতাম না। চাঁদাটা তখনই পাওয়া যেতো, বার বার ঘোরাতেন না কখনও।

রায়সাহেবের একটিমাত্র ছেলে, তার নাম হারাধন। তিনি কি জানি কিসের বিজনেস করেন। একটা পুরাতন ফিয়াট গাড়ি চড়ে সকাল সাতটায় বেরিয়ে যান আর ফেরেন রাত দশটায়। রায়সাহেব বিপত্নীক। বাড়িতে একটা পুরাতন চাকর, তার নাম শিউপূজন। সে-ই কর্তাকে দেখাশোনা করতো ফাই-ফরমায়েস খাট্‌তো। বাজার করা থেকে বাগানের কাজ সবই করতো। আর বন্ধু ছিলেন ঘোষালমশাই। এই ঘোষালমশাই নাকি দাবা খেলায় ওস্তাদ। রায়সাহেব দাবা খেলতে ভালোবাসতেন। এক-একদিন খেলা তেমন জমে উঠলে ঘোষালমশাই ঐখানেই রাতটা থেকে যেতেন, তিনিও খুব মজার মজার গল্প বলতে পারতেন।

পাড়ার সবাই আমরা রায়সাহেবকে দাদু আর ঘোষালমশাইকে ছোটদাদু বলতাম। ঘোষালমশাই অন্য পাড়ার মানুষ হলেও আমাদের সঙ্গে বেশ জমে গিছলো তাঁর।

এই কাহিনীটি রায়সাহেবের না ঘোষালমশাইকে নিয়ে, তাই এখন মাঝে মাঝে ভাবি। আর ভাবি, মানুষ যখন শয়তানে পরিণত হয়, তখন তার কী রূপান্তরই না ঘটে! আকৃতি পর্যন্ত পালটে যায়। মুখ চোখ সবই শয়তানের মত কেমন বিশ্রী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

শ্রাবণের সকাল। সারারাত ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি হয়েছে। এখনও আকাশের ঘোর

কাটেনি। আমি সবে ব্যাকরণ কৌমুদীটি খুলে কি শুরু করবো চিন্তা করছি। এমন সময় দেখি তিন চারজন লালপাগড়ি আর তাদের সঙ্গে ইনস্‌পেকটার হাজরা সাহেব গট্‌মট্‌ করে চলেছেন।

এই জল-বৃষ্টিতে কোথায় রে বাবা! কোথায় আবার চুরি-ডাকাতি হলো, কে জানে! বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, রায়সাহেবের বাড়ির সামনে বেশ ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। সবাই হাত-পা নেড়ে কি যেন বলছে।

আমিও জল-বৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ না করে বেরিয়ে পড়লাম ব্যাপারটি কি স্বকর্ণে শোনার জন্য।

কর্ণের চেয়ে চক্ষুর কাজই বেশি। জানলা দিয়ে দেখি, রায়সাহেবের বৈঠকখানায় তাঁর বিরাট দেহটা পড়ে আছে। আর ঘোষালমশাই দাঁড়িয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছছেন।

পুলিশ এসে সবাইকে হটিয়ে দিল। আমি কিন্তু একপাশে বাড়ির ছেলের মতো কাঁদো-কাঁদো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সত্যি রায়সাহেবকে আমরা ভালোবাসতাম। ভারী মিষ্টি কথা বলতেন তিনি—

হাজরা সাহেব সব খুঁটিনাটি লিখলেন, তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ঘোষালমশাইকে ডাকলেন—'এদিকে আসুন একবার। আপনার একটা স্টেটমেণ্ট লিখে নিই।'

ঘোষালমশাই হাত জোড় করে এসে দাঁড়ালেন। হারা বললেন, 'রায়সাহেব আপনার কতোদিনের বন্ধু? আপনি কি রোজ এখানে আসেন?'

—'আজ্ঞে না স্যার। আমি থাকি সেই বাঁশদ্রোনী। আগে কাছাকাছি ছিলাম, ছেলেবেলায় একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। তারপর জয়দেব যখন পেনসন নিয়ে কলকাতায় এলো, আমি মাঝে মাঝে আসতাম।

জয়দেব দাবা খেলতে ভালোবাসতো, তাই সপ্তাহে দু-একদিন এসে দাবা খেলতাম। কোনো কোনো দিন বেশি রাত হলে এইখানেই থেকে গেছি।'

হাজরা বললেন—'কাল কখন এসেছিলেন? কতক্ষণ খেলেছেন?'

—'এসেছি ঠিক সন্ধ্যার পর। জয়দেব বললো, আজ তুই এখানেই খাবি, এখন একহাত খেলা যাক—। খেলতে খেলতে যখন প্রায় দশটা বাজে, তখন ও শিউপূজনকে হুকুম করলো—চা লে আও—। আমি বললুম, এখন আর চা কেন, রাত তো অনেক হয়ে গেল। জয়দেব বললো, হারাধন এখনও ফেরেনি, ও ফিরে এলেই আমরা খেতে বসবো, ততক্ষণ এক কাপ চা খাওয়া যাক। খেলায় তেমন মন লাগছে না।'

হাজরা বললেন—'তারপর কি হলো? চা এলো?'—আজ্ঞে হ্যাঁ। শিউপূজন পাকা লোক। একেবারে দু'কাপ চা নিয়ে এলো। আমি একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলাম, আর জয়দেব যেই চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়েছে, এই কাণ্ড ঘটে গেল। কী সর্বনাশ যে হলো স্যার—টেবিলক্লথটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ও পড়ে গেল।' এই বলে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন ঘোষালমশাই।

হাজরা সাহেবের পাশে আর একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। চোখে কালো চশমা, একটু ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে। মুখে একটা বর্মা চুরুট। তিনি হঠাৎ বললেন—

'ঘোষালমশাই, কাজকর্ম কি করেন আপনি?'

—'কিছুই করি না স্যার। দু'চার ঘর যজমান আছে, তাতেই চলে যায়। ছোট সংসার।'

সেই ভদ্রলোক বললেন—আপনি কি শুনেছেন চায়ে একটা কড়া রকমের বিষ মেশানো ছিল?

—'কি করে জানবো স্যার! তবে অনুমান তো সেই রকমের—'

ভদ্রলোক আবার বললেন—'রায়সাহেবের একটা উইল আছে শুনলাম। আপনি তো তাঁর বন্ধুলোক, কি আছে সে উইলে কিছু শুনেছেন কখনও?'

—'উইল আর কি! রিটায়ার করে এই বাড়ি-টাড়ি করে বিশেষ কিছুই ছিল না। বাড়িটা আর হাজার দশেক টাকা হারাধনকে, আমাকে দু'হাজার আর শিউপূজনকে পাঁচশো টাকা দেবার কথা উইলে আছে শুনেছি—'

—'যা শুনেছেন, তা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। তা ঘোষালমশাই, আপনি সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, এমন সময় চায়ের পেয়ালা মুখে তুলেই রায়সাহেব টেবিলক্লথ টানতে টানতে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন। আপনি ভাগ্যিস চায়ের কাপে মুখ দেননি, তাহলে কি হতো বলুন তো?'

—'নারায়ণ রক্ষা করেছেন স্যার! এ একেবারে তাঁর খেলা।'

সেই দাড়িওলা ভদ্রলোক এইবার ইনসপেক্টার হাজরাকে বললেন—'ইনসপেক্টার, ঘোষালের হাতে হাতকড়া লাগাও, কোমরে দড়ি। নারায়ণ আর ওঁকে রক্ষা করতে পারলেন না।'

ঘোষালমশাই মাটিতে বসে পড়লেন।

দাড়িওলা ভদ্রলোক বললেন—'ঘোষালমশাই, যজমানি করে খেলে কি হয়, আপনার মাথায় চাল-কলার চেয়ে বুদ্ধিটা একটু বেশি। টেবিলক্লথ জড়িয়ে জয়দেববাবু মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন, আর আপনার পেয়ালাটি ঠিক রয়ে গেল। এমন কি, দু'এক ফোঁটা চা টেবিলক্লথে গড়িয়ে পড়লো না। অর্থাৎ ঐ কাপটা ঘটনা ঘটবার অনেক পরে আপনি ঐখানে রেখেছেন আর জয়দেববাবুর চায়ের পেয়ালায় যা মেশাবার সেটা আপনারই হাতের কারসাজি। আপনার নস্যির কৌটোটা মাটিতে পড়েছিল, সেটার ভেতর কি আছে আমি দেখেছি।'

ইনস্পেক্টার হাজরা বললেন, 'স্যার, তাহ'লে মোটিভ্‌টা কি? এঁরা দু'জন এতো বন্ধু—'

দাড়িওলা ভদ্রলোক বললেন, 'অতি সহজ এবং সরল। উইলের মোটা টাকা পাবে হারাধন। উনি এবং শিউপূজন অল্প টাকা! অতএব সন্দেহটা হারাধনের ওপরই পড়বে। আর উনি দু'হাজার টাকা পকেটে পুরে দাবার পাল্টা চাল শেষ করবেন, এই ছিল আসল মতলব।'

ঘোষালমশাই এখন আর কাঁদছেন না। তাঁর হাতে যে হাতকড়া লাগাচ্ছে, তার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছেন। মুখটা কেমন ছাগলছাগল হয়ে গেছে।

Pathagar.net

pathagar.net

শয়তানের চোখ

অরুণ বাগচী

দরজা খুলে আমি অবাক! পাড়ার রমারঞ্জনবাবু এত রাত্রিতে এসে কড়া নাড়ছেন! কী ব্যাপার? কারও কোন বিপদ ঘটেছে নিশ্চয়।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন তিনি বললেন, "না, না, বাড়িতে কারও বিপদ ঘটেনি। আমি স্বয়ং একটু মুশকিলে পড়ে গেছি মশাই। তাই আপনাকে জ্বালাতন করতে হল। অবশ্য আপনি বেশ রাত্তির করে ঘুমোতে যান তাই জানি।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ আমি জেগেই ছিলাম। আসুন আসুন ভিতরে এসে কথা বলা যাক।' একটু ইতস্তত করে তিনি আমার সঙ্গে বসবার ঘরে চলে এলেন। বললাম, 'আরাম করে বসে বলুন আমাকে কি হয়েছে।'

চেয়ারে বসে কোন ভণিতা না করে রমারঞ্জনবাবু তাঁর গল্প বলতে লাগলেন 'সৌজাত্যবাবু, আমি মেয়ে কলেজের প্রফেসর। ইতিহাসের অধ্যাপক। সাদামাটা জীবন। কোন তরঙ্গ নেই তাতে। স্ত্রী গত হয়েছে দশ বছর আগে। এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছি দু'বছর হল। ছেলে তো জার্মানীতে চাকরি নিয়ে আছে আপনি জানেন। পাশপোর্ট

করানোর ব্যাপারে আপনার সাহায্য নিতে হয়েছিল। একলা একলা থাকি। কোন ঝঞ্ঝাট নেই। কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড মধু সংসার চালায়। মোটামুটি বিশ্বাসী।'

'এর মধ্যে হঠাৎ সকালবেলা একদিন একটা ছোট পারসেল এসে হাজির। খুলে দেখি ছোট একটা মারবেলের মত জিনিস। সোনালী রঙ করা। একদিকে কালি দিয়ে একটা চোখ আঁকা। ওটার সঙ্গে একটা চিঠি ছিল। চিঠিতে লেখা ঃ তুমি ভাগ্যবান! তাই তিন মাসের জন্য এই পবিত্র চোখ কাছে রাখার জন্য নির্বাচিত হয়েছ। এই চোখ তোমাকে অভাবিত সৌভাগ্য এনে দেবে। কিন্তু সাবধান, তিন মাস শেষ হতেই এই চোখ তুমি নদীতে ফেলে দেবে। নইলে সর্বনাশ ঘটে যাবে। এ পর্যন্ত তিন হাজার চারজন লোকের হাতে হাতে এই চোখ ঘুরেছে, তাদের মধ্যে চারজন লোক এই নির্দেশ অবহেলা করে গুরুতর শাস্তি পেয়েছে। তাদের নাম ঠিকানা লেখা আছে। তুমি ভাগ্যচক্রের শেষ মানুষ। তিন মাস ফুরোলেই কাছের যে কোন নদীতে চোখটা ফেলে দেবে।'

আমি বললাম, 'বুঝেছি, ডাকে এ রকম চিঠি হরদম আসে। অমুক তাঁদের নাম দশটা পোষ্টকার্ডে লিখে দশজনকে পাঠান ইত্যাদি। আমি তো মাসে গণ্ডাকয়েক ওই চিঠি পাই। ওতে ঘাবড়াবেন না।'

রমারঞ্জনবাবু ম্লানমুখে হাসলেন। 'ঠিক আমারও ওই ফিলিং হল। ড্রয়ারের মধ্যে চোখটা আর চিঠিটা রেখে বেমালুম সব ভুলে গেলাম। তারপর ক'দিন বাদেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা সেমিনারে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ পেলাম। সারা জীবনের স্বপ্ন বিলেত ঘুরে আসব। কাজেই ওই ইনভাইটেশান পেয়ে বড় আনন্দ হল। তোড়জোড় করছি। হঠাৎ একটা উকিলের চিঠি। ছোড়দাদু আজীবন কাশীবাস করে মারা গেছেন কিছুদিন হল। তাঁর বাড়ি, নগদ টাকা লাখ খানেক, সব আমাকেই দিয়ে গেছেন। ছুটলাম কাশী। ডেথ ডিউটি, সাকসেসন সার্টিফিকেট এই সব নিয়ে কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করে দু'হপ্তা বাদে ফিরলাম কলকাতায়। ফিরে দেখি জামাইয়ের টেলিগ্রাম, নাতি হয়েছে।'

আমি বললাম একটু হেসে—'তাহলে তো চোখটার ব্যাপার উড়িয়ে দেওয়া যায় না, একটার পর একটা ভাল খবর। লটারীর টিকিট কিনলে পারতেন।'

হাসিটা ফেরৎ না দিয়ে রমারঞ্জনবাবু বললেন, 'অনেকদিন থেকেই আমি কিনি। দু-চার টাকার টিকিট ফি মাসে। আর এর মধ্যে বিহার লটারীতে একটা টাকাও পেয়েছি।

'বলেন কি মশায়!'

'হ্যাঁ ফার্স্ট প্রাইজ নয়। তবে পঁচিশ হাজার টাকা পেয়েছি। সত্যিই ভাগ্য। যাতে হাত দিই, ফল ফলে। ঘোড়ার 'ঘ' জানি না মশাই। একদিন মজা করে একশ' টাকা খেললাম। ন-হাজার টাকা উঠে এল। তাসের আড্ডায় তো আমার—কিন্তু যাক্ ও কথা, তালগোলে মশায় আমি চোখটার কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। ছেলে ছুটিতে সুইডেনে বেড়াতে গিয়ে মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এই টেলিগ্রাম পেয়েও মশাই-এর খেয়াল হল না। পরশু আমার চাকর মধু বাজারে পিছলে পড়ে ঠ্যাং ভেঙেছে। হেটেলে খেতে হবে ভেবে বিরক্ত হলাম। কিন্তু আর কিছু ভাবলাম না। কাল ট্যাক্সি করে কলেজ যাচ্ছিলাম একটা প্রাইভেট বাসের সঙ্গে এমন কলিশন হল—কাগজে পড়েছেন তো খবরটা। বেচারা ট্যাক্সি ড্রাইভার আর তার সঙ্গী দুজনেই খতম। আমি যে কি করে সম্পূর্ণ অক্ষত

রইলাম। সেদিন হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেই আমি চোখ আর চিঠিটা ড্রয়ার থেকে বের করলাম। হিসেব করে দেখলাম, তিন মাস পার হয়ে গেছে। আর ঠিক যেদিন তিন মাস পুরেছে তার পরদিন থেকেই গড়বড় শুরু হয়ে গেছে।'

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম। আমাকে থামিয়ে দিয়ে রমারঞ্জনবাবু বললেন, 'আমি তখন নাম ঠিকানা দেখে আমার আগে যে চারজন চক্র ভেঙেছিল তাদের খোঁজ করতে গেলাম। খোঁজ পেয়েও গেলাম। দুজন আত্মঘাতী হয়েছেন। একজন দুর্ঘটনায় মৃত, চতুর্থজন গত দু'বছর থেকে পক্ষাঘাতজনিত অসুখে শয্যাশায়ী। বুঝেছেন, আর মশাই আমি দেরী করব না। নদীতে গিয়ে ফেলে দেব চোখটা। এই সব সাত-পাঁচ ভেবে চোখটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। রাস্তায় আপনার ঘরে আলো দেখে মনে হল, একলা কেন যাব। যদি বিপদ ঘটে, কেউ কিছু জানবে না। আপনাকে বলে যাই ব্যাপারটা। তাই আপনাকে ডিসটার্ব করতে হল মশাই, কিছু মনে করবেন না।'

আমি বললাম, "না মশায় না। বরং আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

রমারঞ্জনবাবু বললেন, 'তবে তো খুব ভালই হয়।'

এখন ভাবছি না গেলেই হত। হাওড়া ব্রীজের উপর থেকে চোখটা ফেলে দিতে গিয়ে রমারঞ্জনবাবুও যে হঠাৎ জলে ঝাঁপ দিলেন এটা বোকার মত তাকিয়ে দেখতে হত না। এখন থানা পুলিশ কে সামলায় বলুন দেখি?

সাদা প্যাকেট কালো টাকা

সঞ্জীব সিংহ

সকাল থেকেই আকাশে মেঘ। বিকেলের ঠিক মুখেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

সমুদ্রের হু হু হাওয়ায় বিক্রমদার চুল উড়ছে। সমুদ্রের দিকে মুখ করে বিক্রমদা আধশোয়া বালির ওপর। হাতে ধরা সেদিনের কাগজটা। আরও দু-একটা কাগজ রয়েছে। দীঘাতে এলে বিক্রমদা দু-তিনদিনের কাগজ একসঙ্গে পড়েন। এটা বরাবরই খেয়াল করেছে শমি। আজ আর জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না।

শমির প্রশ্ন শুনে বিক্রমদা হাসলেন, 'কলকাতার মতো তো এখানে সকালের চায়ের সঙ্গে মুচমুচে খবরের কাগজ জোটে না। তাই অভ্যাসটা বদলে নিলে ক্ষতি নেই।'

এটা অবশ্য ঘটনা, দীঘাতে যখন খবরের কাগজ পৌঁছায় ততক্ষণে দিনের কাজ প্রায় মাঝপথে।

ওঠার কথা ভাবছিল শমি। বিক্রমদার কথা শুনে বসে পড়ল।

'খবরের কাগজে তোর রাকেশদার নাম বেরিয়েছে দেখেছিস?'

'তাই!' চোখ বড় বড় করে শমি হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাগজের ওপর। পাঁচের পাতার

এককোণে খবরটা রয়েছে। শমি পড়ল—বিশেষ সংবাদবাতা ঃ মৌড়িগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন কেবিনে খুন হয়ে যাওয়া জহর বসুর সঙ্গে ড্রাগ পাচারকারীদের যোগাযোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। শহরের বুকে পরপর বেশ কয়েকটি একই ধরনের খুন হয়ে যাওয়ায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এদিন দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে ডেকে পাঠান পুলিশ কমিশনারকে। একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্তকারী টাস্ক ফোর্স গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দায়িত্বে থাকছেন ডি সি ডি ডি ওয়ান রাকেশ চৌধুরী।

বিক্রমদা বললেন, 'তোর রাকেশদাই তো দেখছি টাস্ক ফোর্সের ইনচার্জ।'

বিক্রমদাকে এতটা ভাল মুডে চট করে পাওয়া যায় না। শমি তাই বুক ঠুকে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'আচ্ছা ব্যাপারটা কী হচ্ছে বলো তো?'

বিক্রমদার ভুরু কুঁচকে গেল, 'কোন ব্যাপারটা?'

'এই যে কলকাতায় পরপর বেশ কয়েকটা খুন হয়ে গেল। সবগুলোর সঙ্গেই কি ড্রাগ পাচারকারীদের সম্পর্ক রয়েছে?'

বিক্রমদা কাঁধ ঝাঁকালেন, 'হতেও পারে, নাও হতে পারে। এখানে বসে আন্দাজে বলা মুশকিল। তবে এইসব খুনখারাপির চেয়েও অনেক ইন্ট্রেস্টিং খবর রয়েছে কিন্তু কাগজে। সেটা দেখেছিস কি?'

'কোনটা বলো তো?'

'নেতাজী ইনডোরে একটা দুর্দান্ত ফ্রি রেসলিং টুর্নামেন্ট হচ্ছে। বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন মিকি রোমানো লড়বে। একবার দেখে আসলে মন্দ হতো না।'

শমির চোখ চকচক করে উঠল, 'যাবে? চলো না দেখে আসি। সেই দানব কুস্তিগীরগুলো লড়বে তো! দারুণ মজার ব্যাপার।'

বিক্রমদা বলতে যাচ্ছিলেন, 'নারে, খুব একটা মজার নয় ব্যাপারটা।' কিন্তু কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই শোনা গেল একটা ভয়ার্ত চিৎকার।

খানিকটা দূরে খাঁড়ি মতন। সমুদ্রের জল কিছুটা ভেতরে ঢুকে এসেছে। কয়েকটা জেলে ডিঙি উল্টে পড়ে রয়েছে। বালিয়াড়িতে শুকোতে দেওয়া সাদা মাছ ধরার জালগুলো রোদে ঝকমক করছে।

সেদিক থেকে শমিদের দিকে ছুটে আসছে দুটো লোক। একজন প্যান্ট-শার্ট পরা। আরেকজন মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেছে। বালির ওপর জোরে দৌড়ানো যায় না। তবু লোক দুটো বেশ জোরেই দৌড়াচ্ছে। আর একটু পরেই শমিদের সামনে দিয়ে ঝাউবনের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

'চোর, চোর..., ডাকাত, পালিয়ে গেল, পাকড়ো, পাকড়ো।' লোক দুটোর পেছন পেছন চেঁচাতে চেঁচাতে আপ্রাণ ছুটছেন একজন প্রৌঢ়। কিন্তু দুটো জোয়ান লোকের সঙ্গে তিনি দৌড়ে পারবেন কেন? পিছিয়ে পড়তে পড়তে একসময় দাঁড়িয়েই পড়লেন ভদ্রলোক। দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগলেন। কী করবে ঠিক করার আগেই শমি দেখল পাশের জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে। চোখের নিমেষে উঠে গেছেন বিক্রমদা।

শমি ছুটতে শুরু করে দেখল বিক্রমদা। প্রায় পৌঁছে গেছেন মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা লোকটার কাছে। অনেকটা ফুটবল খেলোয়াড়ের মতন শুয়ে পড়ে লোকটার পায়ে

পা জড়িয়ে ফেলে দিলেন বিক্রমদা। লোকটা মুখ গুঁজে পড়ল বালিতে। পাশের লোকটা দৌড় না থামিয়ে তেড়ে এল বিক্রমদার দিকে। দূর থেরে শমি দেখল লোকটার হাতে শেষ বিকেলের আলো পড়ে ঝকঝকে করে উঠেছে একটা লম্বা ছুরি।

'বিক্রমদা, সাবধান!' শমি চেঁচিয়ে উঠলেও জানে বিক্রমদাকে সাবধান করার দরকার হয় না। একসময়ের কম্যাণ্ডো, ক্যাপ্টেন বিক্রম মুখার্জির ক্যারাটেতেও সিক্সথ ডান পর্যন্ত করা রয়েছে।

ছুরিসুদ্ধু লোকটার হাত ধরে মুচড়ে আছড়ে ফেললেন বিক্রমদা। হাত ঝেড়ে বললেন, 'যত বাজে ঝামেলা! শমি, এর পকেট থেকে সোনার হারটা বের করে নে। হার ছিনতাই করে পালাচ্ছিল।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পড়েছেন। তাঁর যেন এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। চোখ দুটো গোল গোল করে বললেন, 'উফ্! ব্রিলিয়ান্ট মশাই...। আপনি তো ব্রুস লির ওপর দিয়ে যান। কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব!'

ভদ্রলোকের হাতে হারটা তুলে দিয়ে বিক্রমদা বললেন, 'কীভাবে নিল?'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক তখনও হাঁফাচ্ছেন। বললেন, 'আর বলবেন না। এই সময় তালসারির এদিকটায় ভাল মাছ-টাছ পাওয়া যায় বলেই এসেছিলাম। তা আমার মেয়ে আর নাতনি বায়না ধরল। তারপর এই কাণ্ড। ব্যাটারা তক্কে তক্কে ছিল।'

বলতে বলতে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন এক ভদ্রমহিলা। মোটাসোটা, হাতে গলায় আরও বেশ কিছু গয়না রয়েছে, সেগুলো ছিনতাইবাজরা নিতে পারেনি। ভদ্রমহিলার সামনে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল একটি বাচ্চা মেয়ে।

প্রৌঢ় বললেন, 'আমার মেয়ে আর নাতনি।' ভদ্রমহিলা হেসে নমস্কার করলেন। বললেন, 'আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। সত্যি, আজ আপনি না থাকলে...'

বিক্রমদা বললেন, 'না, না, এ আর এমন কী!'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলছেন কি মশাই! অন্য কেউ হলে কি আর এভাবে দুটো গুণ্ডাকে ধরা যেত? অবিশ্যি আপনার চেহারাটা দেখলেই বোঝা যায়। আপনি কি পুলিশ-টুলিশেই আছেন নাকি।'

বিক্রমদা হাসলেন, 'না, না, পুলিশে নেই। তবে একসময় আর্মিতে ছিলাম।'

'এই দেখুন তাহলে মোটামুটি ঠিকই আন্দাজ করিচি। তা আপনার নামটা?'

'বিক্রম মুখার্জি। আর এ আমার মাসতুতো ভাই—শমি।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের চোখ দুটো আবার গোল গোল হয়ে গেল, 'আপনিই বিক্রম মুখার্জি! আপনি তো বিখ্যাত লোক মশাই। কী আশ্চর্য! এ যে মেঘ না চাইতেই জল! আপনি আমাকে একটু সময় দিতে পারবেন? তাহলে বড় উপকার হয়।'

বিক্রমদা বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। এখানে আমি এসেছি ছুটি কাটাতে। কোনো সমস্যায় আর জড়াতে চাই না!'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিক্রমদার হাত দুটো ধরে ফেলে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, 'বড় বিপদে পড়েই আপনার পরামর্শ চাইছি। নইলে এই ছোট্ট মেয়েটাকে বোধহয় বাঁচানো যাবে না।'

বিক্রমদার ভুরু কুঁচকে গেল, 'সে কি কথা! কেন, কী হয়েছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রৌঢ় বললেন, 'সন্ধ্যেবেলায় আপনাদের চায়ের নেমন্তন্ন রইল। আপনি আসুন। সব বলব।'

।। দুই ।।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের নাম দিবাকর সেন। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা রয়েছে। এখন সেটা তাঁর ছেলেই দেখে। নিউ দীঘাতে বাড়ি বানিয়ে রেখেছেন। অবসরের বেশির ভাগ সময়টা এখানেই কাটান।

তাঁর বাড়িতে যে এত বড় একটা চমক অপেক্ষা করে ছিল, ভাবতেই পারেনি শমি।

ওরা পৌঁছতে দিবাকর সেন নিজে বেরিয়ে এলেন, 'আসুন, আসুন! আমার কী সৌভাগ্য!'

বসার ঘরে প্রথম ঢুকেই অবাক হয়ে গেল শমি। একেবারে সামনেই মুখোমুখি বসে আছেন রাকেশদা। পুলিশের পোশাক ধূলিধূসরিত। চুল উস্কোখুস্কো। বোঝাই যাচ্ছে অনেক দূর থেকে আসছেন রাকেশদারা। সঙ্গে রয়েছেন আরও একজন পুলিশ অফিসার। গাঁটাগোট্টা চেহারা। তাঁরও একই অবস্থা।

শমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে রাকেশদা! তুমি এখানে!' নিজের চোখে দেখার পরেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না শমির।

রাকেশদা ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসলেন, 'খুব অবাক হয়েছিস তো! আমি কিন্তু জানতাম তোরা আসবি।'

শমি বলল, 'কী করে জানলে?'

রাকেশদা বললেন, 'খুব সোজা। একটু আগেই দিবাকরবাবু বলেছেন।'

রাকেশদার কথা শুনে বিক্রমদা বসতে বসতে হেসে ফেললেন। বললেন, 'কী ব্যাপার রাকেশ, তুই এখানে ছুটে এসেছিস মানেই তো কোনো গুরুতর ঘটনা! বিকেলে দিবাকরবাবুও অবশ্য বলছিলেন।' কথা শেষ করে বিক্রমদা তাকালেন দিবাকর সেনের দিকে।

একটা গলা খাঁকারি দিয়ে দিবাকর সেন বললেন, 'ওঁরা অনেক দূর থেকে আসছেন। আগে একটু চা হোক। তারপর না হয় বলছি।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে ঘড়ির দিকে তাকালেন রাকেশদা। বললেন, 'আপনি বরং শুরু করে দিন। চা আসতে আসতে কিছুটা শোনা হয়ে যাবে। কারণ আমাদের আবার ফিরতে হবে সেই কলকাতায়।'

দিবাকর সেন নার্ভাস ভঙ্গিতে আঙুল মটকালেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই দেরির জন্য। এই দুদিন ধরে নিজের ভেতর অবিরত যুদ্ধ চলেছে। ভেবেছি ঘটনাটা পুলিশকে বলে দিই। তারপর আবার বিপদের আশঙ্কা করে পিছিয়ে এসেছি।' একটু দম নিলেন দিবাকর সেন। একঢোঁক জল খেলেন। বললেন, 'দুদিন আগে মাঝরাতে ঘটনাটা প্রথম চোখে পড়েছিল আমার নাতনি টাটুমের। আমরা দীঘা আসছিলাম। মৌড়িগ্রাম স্টেশনের লেভেল ক্রসিং পেরোনোর সময় চারটি লোককে দেখেছিল টাটুম। দে ওয়্যার ডুয়িং সামথিং রং। আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। খেয়াল করিনি। পরে টাটুমের মুখে সব শুনেও ভেবেছিলাম বাচ্চার খামখেয়ালিপনা। কিন্তু তারপরেই

কাগজে দেখলাম জহর বসু খুন হওয়ার খবরটা। ইউ নো, আয়্যাম টেরিবলি কনফিউজড। খবরটা চেপে গেলে কিছুই হতো না, আমি জানি। কিন্তু বিবেক বাধা দিল।'

রাকেশদার সঙ্গী পুলিশ অফিসারের নাম প্রশান্ত পুরকায়স্থ। তিনি বললেন, 'কিন্তু আপনার নাতনির বয়স তো খুবই কম। ওর ডেসক্রিপশনের ওপর কতটা ভরসা করা যাবে? ধরুন খুনীদের যদি ধরাও যায় তাহলেও কি ঐটুকু মেয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারবে?'

দিবাকর সেন বললেন, 'আমি জানতাম এই প্রশ্নটা উঠবে। কিন্তু টাটুমের একটা বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। শি ইজ এ চাইল্ড প্রডিজি। একবার কারও মুখ দেখলে ও হুবহু সেটা এঁকে ফেলতে পারে।'

দিবাকর সেন থামলেন। ঘরে পিন পড়লেও শব্দ পাওয়া যাবে। বাইরে শুধু এলোমেলো সমুদ্রের হাওয়া বয়ে যাওয়ার শব্দ।

বিক্রমদা এতক্ষণ কোনো কথা বলেননি। এবার বললেন, 'অ্যামেজিং! আপনার নাতনিকে একবার ডাকুন দেখি। আগে ওর মুখ থেকে ঘটনাটা শোনা যাক।'

টাটুম ঘরে এল। টুকটুকে লাল ফ্রক পরেছে। কোলে একটা বড়সড় পুতুল। শমির বিশ্বাসই হচ্ছিল না। এইটুকু মেয়ে কিনা একবার কারও মুখ দেখলে হুবহু এঁকে ফেলে! অবিশ্বাস্য ক্ষমতা!

রাকেশদা বললেন, 'টাটুম, তুমি যাদের দেখেছিলে তাদের আরেকবার দেখলে চিনতে পারবে?'

কোলের পুতুলটাকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে টাটুম একদিকে ঘাড় হেলাল। অর্থাৎ পারবে।

রাকেশদা বললেন, 'লোকগুলোকে কেমন দেখতে শুনি। তারপর তুমি ওদের ছবি এঁকে দেখাবে।'

টাটুম মুখ তুলে তাকাল, 'ভীষণ বাজে। একটা তো সেলফিশ জায়েন্টের মতন। মস্ত বড়। চুলটা পনিটেল করা।'

'আর অন্যগুলো?'

'একইরকম। বাজে, পচা।'

'আচ্ছা বড় দৈত্যটার গোঁফদাড়ি ছিল?'

টাটুম দুদিকে মাথা নাড়ল, 'না, দাদুর মতন।'

সবার চোখ ঘুরে গেল টাটুমের দাদু অর্থাৎ দিবাকর সেনের দিকে। দিবাকর সেন অস্বস্তির হাসি হেসে কামানো গালে একবার হাত বোলালেন।

বিক্রমদা হেসে বললেন, 'তার মানে নেই! আচ্ছা আর কিছু মনে পড়ছে তোমার? আর কোনো স্পেশালিটি?'

টাটুম পট করে প্রশান্ত পুরকায়স্থর দিকে হাত তুলল, 'ঐ কাকুর মতন একজনের গালে কাটা দাগ ছিল। তবে সেই লোকটার গোঁফদাড়ি ছিল।'

প্রশান্ত পুরকায়স্থ একটু নড়েচড়ে বসে শমিকে বললেন, 'তুলনাগুলো কীরকম দিচ্ছে

pathagar.net

দেখেছো? এমব্যারাসিং!'

শমি হেসে ফেলল। মেয়েটার মধ্যে যে সত্যিই বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। নইলে এত ডিটেল বলতে পারে! কার গালে কটা দাগ রয়েছে, সেটাও মনে রেখেছে। '

বিক্রমদা বললেন, 'আচ্ছা টাটুম, একেবারে প্রথম থেকে মনে করার চেষ্টা কর তো! একেবারে গোড়া থেকে ঠিক কী কী দেখেছিলে তুমি?'

গোটা ঘরে দমবন্ধ করা নীরবতা। ট্রেতে চা নিয়ে ঢুকছিলেন টাটুমের মা বনলতা দেবী। সবাইকে চুপচাপ দেখে তিনিও দাঁড়িয়ে পড়লেন চৌকাঠের কাছে।

রাকেশদা বললেন, 'যাক্, ঠিক সময়েই চা এসে হাজির।

সবাই চায়ের কাপ হাতে তুলে নেওয়ার পর টাটুম বলতে শুরু করল, 'মৌড়িগ্রাম ক্রসিংয়ে ওঠার আগেই লাইনের মাঝখানে সাদা ভ্যানটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। গাড়িটা কোনাকুনি রাখা ছিল। আমাদের ড্রাইভার হরিপদদা দুবার হর্ন দেবার পর গাড়িটার ওপাশ থেকে দৈত্যটা বেরিয়ে এল। হাত দেখিয়ে বলল বেরিয়ে যাও। এইসময় দেখলাম কেবিনের কাছ থেকে চারজন লোক বেরিয়ে আসছে।

বিক্রমদা বললেন, 'চারজন না পাঁচজন?'

টাটুম একটু ভাবল। বলল, 'চারজনই। একজন সবার শেষে দৌড়ে এসে বলল, ফিনিশ বস্।'

রাকেশদা বললেন, 'তারপর?'

'আমাদের গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দৈত্যটা এগিয়ে এসে হাত উলটে জিজ্ঞেস করল, "হেই, হোয়াটস হ্যাপেনড? নিড আ পুশ?" বলে একহাতে ভ্যানটাকে পেছন থেকে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে দিল। আমাদের গাড়িটাও পেরিয়ে গেল।'

বিক্রমদা একটু অবাক গলায় বললেন, 'দৈত্যটা ইংরেজি বলল?'

টাটুম ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

বিক্রমদা তাকালেন রাকেশদার দিকে। রাকেশদা মাথা ঝাঁকালেন। শমি বুঝল এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট।

বিক্রমদা বললেন, 'ভ্যানটার নম্বরপ্লেট ছিল টাটুম? খেয়াল করেছিলে?'

টাটুম খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, হ্যাঁ, দেখেছি তো!'

উত্তেজিত গলায় রাকেশদা বললেন, মনে আছে নম্বরটা?'

বিক্রমদা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন মনে থাকবে না? বলে দাও তো টাটুম।'

'ডবলু বি জিরো ওয়ান বি ডাবল ফোর নাইন সেভেন।'

রাকেশদা এত অবাক হয়ে গেছেন যে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, 'ওঃ গ্রেট! শি ইজ মোর দ্যান প্রডিজি! প্রশান্ত, নম্বরটা লিখে নাও।'

লিখতে লিখতে প্রশান্ত পুরকায়স্থ বললেন, 'কী সাংঘাতিক মেমারি রে বাবা! এ মেয়ে বড় হয়ে বিরাট কিছু না হয়ে যায় না!'

বিক্রমদা চায়ের কাপে শেষ চুমুক মেরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আশা করি টাটুম থাকায় এই কেসটায় মেজর ব্রেকথ্রু পেয়ে যাবে রাকেশ। কী রাকেশ, তাই তো!'

boiGhar.net

রাকেশদাও উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, 'সে আর বলতে! তবে দিবাকরবাবু কাল ভোরেই একটু কষ্ট করে টাটুমকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলে ভাল হয়। কারণ বুঝতেই পারছেন বেশ কিছু বিপজ্জনক লোকজন কেসটার সঙ্গে জড়িত। যতদিন না সল্‌ভ হচ্ছে ততদিন টাটুমকে একটু সাবধানে রাখা দরকার। দীঘা ইজ নট সেফ। আমি লোকাল থানায় বলে যাচ্ছি কাল আপনাদের সঙ্গে এসকর্ট দিয়ে দেবে।'

দিবাকর সেন বিক্রমদার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ক্যাপ্টেন মুখার্জি যদি টাটুমের সেফটির দিকটা দেখেন তাহলে পুলিশ-টুলিশ কিছুই চাই না।'

টাটুম এগিয়ে এসে বিক্রমদার একটা হাত ধরে ফেলল, 'কাকু, তুমি দারুণ ক্যারাটে লড়ো। আমাকে শেখাবে?'

রাকেশদা হেসে বললেন, 'চিন্তা করবেন না দিবাকরবাবু। আসল লোক ভিকিকে ধরে ফেলেছে। ও আর না করতে পারবে না।'

বিক্রমদা কাঁধ ঝাঁকালেন। অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, 'নাথিং ডুয়িং! কেউ কিছু শিখতে চাইলে তো আর না করা যায় না। ঠিক আছে টাটুম, এই ঝামেলাটা মিটে যাক। তারপর তোমাকে ক্যারাটে শেখাব, কেমন?'

ঠিক হলো, পরদিন ভোরে দিবাকর সেন আর টাটুমকে নিয়ে বিক্রমদা, শমি রওনা হয়ে যাবে। সঙ্গে লোকাল পুলিশ যাবে মেচেদা পর্যন্ত। মেচেদায় ওয়েট করবেন রাকেশদা নিজেই। লোকাল থানার ওসিকে সব বুঝিয়ে বলে গেলেন রাকেশদা।

দিবাকর সেনের চাপাচাপিতে রাতের খাওয়াটা ওখানেই সারতে হলো শমিদের।

pathagar.net

।। তিন ।।

অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙল শমির। কটা বাজল? দিন না রাত? চোখ কচলে শমি বোঝার চেষ্টা করল। ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরে এখনও দিনের আলো ফোটেনি। একটু পরেই সব মনে পড়ল শমির।

টাটুমের সঙ্গে আজই ভোরে ওদের কলকাতায় ফেরার কথা। সেজন্যই ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুয়েছিল গতরাতে। কিন্তু বিক্রমদা কোথায়?

বিছানা ছেড়ে নামতে নামতে শমি ভাবল বিক্রমদা নিশ্চয়ই বাথরুমে। চানটান সারছে। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে শমি আড়মোড়া ভাঙল। সমুদ্রের দিক থেকে একটানা হাওয়া বইছে। ভোরের হাওয়ায় গা শিরশির করে। আকাশ ধূসর হয়ে আছে। আজও বৃষ্টি হবে নাকি?

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে শমি চমকে উঠল। পাঁচটা বেজে পনেরো। এত বেজে গেছে! আকাশে মেঘ থাকায় বোঝাই যাচ্ছে না।

জানলা থেকে বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে শমি ধাক্কা খেল ছোট সেন্টার টেবিলটায়। অবশ্য ধাক্কা খেল বলেই ওর চোখে পড়ল টেবিলের মাঝখানে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া চিরকুটটা। বিক্রমদার হাতের লেখা, চিনতে অসুবিধে হলো না।

ছোট্ট চিঠি। বিক্রমদা লিখেছেন, শমি তোর ঘুম ভাঙালাম না। আমি চারটে পাঁচের ফার্স্ট বাস ধরে কলকাতায় যাচ্ছি। দরকারে যেতে হচ্ছে। রাকেশ বা প্রশান্ত ফোন করলে

বলে দিবি। তুই দিবাকরবাবুদের সঙ্গেই থাকবি। বিক্রমদা।

একটু অভিমান হলো শমির। সত্যি! বিক্রমদা মাঝেমধ্যে এমন এক একটা কাজ করে না! ডেকে বলে যেতে কী হয়েছিল? ওকি বাচ্চা ছেলে! এবার মাধ্যমিক দিয়েছে। দুদিন বাদে কলেজে পড়বে।

শমি ব্রাশে পেস্ট লাগাতে গিয়েই শুনল ফোন বাজছে। নিশ্চয়ই রাকেশদার ফোন। কলকাতা থেকে।

শমি ফোন তুলল, 'হ্যালো।'

'কে, শমি বলছো?' রাকেশদার গলা নয়।

'হ্যাঁ, শমি বলছি। আপনি...?'

'প্রশান্ত পুরকায়স্থ। শোন, তোমার দাদা কি থাকছেন তোমাদের সঙ্গে? এইমাত্র আমি রাকেশবাবুর কাছ থেকে একটা মেসেজ পেলাম। কনফার্ম করার জন্যই ফোনটা করছি।'

শমি বলল, 'ঠিকই শুনেছেন। বিক্রমদা ফার্স্ট বাস ধরে কলকাতা বেরিয়ে গেছেন। আমি ঘুম থেকে উঠে এইমাত্র বিক্রমদার চিঠি পড়ে জানলাম।'

ওপাশ থেকে প্রশান্ত পুরকায়স্থর হাসি ভেসে এল, 'সেকি, তোমাকে না বলেই চলে গেছেন! ইটস নট গুড! যাকগে মন দিয়ে শোন, লোকাল থানায় আমি বলে দিচ্ছি। পুলিশ এসকর্ট না নিয়ে যেন বেরিও না। ঠিক আছে? রাখছি।'

রওনা হতে হতে প্রায় সাড়ে ছটা বাজল। টিপটিপ করে বৃষ্টিও শুরু হলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে দিবাকর সেন বললেন, 'ডিসগাস্টিং! এই ওয়েদারে কোনো কাজ হয়!'

টাটুমের কোলে সেই কলকের পুতুলটাই রয়েছে। শমি বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করল। জিজ্ঞেস করল, 'এই পুতুলটা তোমার খুব প্রিয়, তাই না টাটুম!'

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল টাটুম। বলল, 'এটা আমার মেয়ে।'

শমি অবাক হয়ে ভাবছিল, একটা ছয় বছরের মেয়ের কী আশ্চর্য ক্ষমতা!

লোকাল থানা থেকে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর পাঠিয়েছে। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের পাশে বসেছে শমি।

পেছনের সিটে দিবাকর সেন আর টাটুমের পাশে বসেছে একজন কনস্টেবল। সঙ্গে একটা আদ্যিকালের বন্দুক। সামনের সিটে চলে এল শমি। এসে আরেক বিপত্তি। পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা বারবার আড়চোখে দেখছে শমিকে। কীরকম যেন সন্দেহজনক হাবভাব। ঠোঁটে একচিলতে হাসি। এও কী পুলিশের লোক?

কলন্দর মস্ত কলন্দর...। অনেকক্ষণ ধরে এই একটা লাইনই সমানে গাইছে। লোকটা। বাকিটা কি জানে না? হাতের বালাটা স্টিয়ারিংয়ে ঠুকে তালও দিচ্ছে।

মুকুটশীলার ভাঙা ব্রিজ পেরিয়ে গেল। জায়গাটা আশ্চর্য নির্জন। পিকনিক করার পক্ষে আদর্শ। ছোট্ট নদী এঁকেবেঁকে চলেছে। গেরুয়া জল। কালীনগরে গাড়ি থামিয়ে টোলের টিকিট কেটে আনল পাঞ্জাবী ড্রাইভার। লোকটার হাঁটার ভঙ্গিটা খুব চেনা চেনা। কোথায় যেন দেখেছে? মনে করতে পারল না শমি।

দিবাকর সেন বললেন, 'খুনীদের সেই ভ্যানটা পাওয়া গেছে, জানো তো শমি।'

শমি ঘুরে বসল পেছন দিকে। 'তাই! কোথায়?'

'বেহালা ছাড়িয়ে। ডায়মণ্ডহারবার যাবার রাস্তায়।'

'তার মানে কি ওরা ওদিকেই চলে গেল নাকি?'

'হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। অনেক সময় পুলিশের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য উল্টোদিকে এরকম করে থাকে খুনীরা। হয়তো ওরা এসেছে এদিকেই।'

'এদিকেই?' গা শিরশির করে উঠল শমির। তাও তো গুণ্ডারা এখনও জানে না টাটুমের এই বিশেষ ক্ষমতার কথা। জানলে কী হবে ভাবলেই গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

দিবাকর সেন বললেন, 'আরও একটা সম্ভাবনার কথা বললেন প্রশান্তবাবু। সেটা সত্যি হলেও চিন্তার বিষয়।'

'কী বললেন প্রশান্তদা?'

'কলকাতায় একটা আন্তর্জাতিক ফ্রি রেসলিং টুর্নামেন্ট হচ্ছে শুনেছো তো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিকি রোমানো এসেছে লড়তে। কিন্তু তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?'

'বাঃ, তুমি তো অনেক খবর রাখো। না, সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। অন্তত এখনও সেরকম কোনো প্রমাণ মেলেনি। তবে এইসব কুস্তিগীররা খুব ড্রাগ নেয়। যে কারণে এই সময় ড্রাগ পাচারকারীদের আনাগোনা খুব বেড়ে গেছে শহরে। এদের মধ্যেও অনেকে ড্রাগ পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকে। প্রশান্তবাবু বলছিলেন, 'মিকি না কী যেন, তুমি যে নামটা বললে, সে নাকি আমেরিকায় বেশ কয়েকবার জেল খেটেছে এজন্য।'

এ খবরটা জানত না শমি। অবাক হয়ে বলল, 'আজকের দিনে লোককে বিশ্বাস করা মুশকিল।'

'তা যা বলেছো।'

গাড়ির স্পিড কমতে শমি সামনের দিকে মুখ ফেরাল। কী ব্যাপারও রাস্তায় কাজ হচ্ছে। খাকি পোশাক পরা একজন বাঁ দিকের রাস্তায় নেমে যেতে বলল। শমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, ওদের পেছনে পুলিশের জিপটাও নেমেছে। একটা বড় পুকুর পেরোনোর পর শুরু হলো বেতবন। লম্বা লম্বা সবুজ বেতগাছ হাওয়ায় দুলছে।

উল্টোদিক থেকে একটা লরী আসছে। সরু রাস্তায় অতিকষ্টে লরীটাকে পাশ দেওয়া গেল। এবার অনেক দূরে একটা কালো অ্যাম্বাসাডর দেখা যাচ্ছে। শমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল লরীটা ওদের পেরিয়ে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে থেমে গেছে। পেছনে আটকে গেছে পুলিশের জিপটা।

কালো গাড়িটা দ্রুত এগিয়ে আসছে। শমির বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। রাস্তাটা বড় নির্জ্জন। দুপাশে শুধু বেতবন। লরীটা অনেক পেছনে পড়ে গেছে। তারও পেছনে পুলিশের জিপ। শমিদের গাড়ির সামনে এসে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল কালো অ্যাম্বাসাডরটা। দুদিকের দরজা খুলে দৌড়ে এল তিনজন।

দিবাকরবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা তখনও গান গাইছে দেখে গা-পিত্তি জ্বলে গেল শমির। সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল বিক্রমদার ওপর। কী

দরকার ছিল আজই ভোরে ওভাবে চলে যাওয়ার?

লোকগুলোর চোখমুখ নিষ্ঠুর, ভাবলেশহীন। এরা যে পেশাদার গুণ্ডা সেকথা বলে দিতে হয় না। সামনের লোকটার কুস্তিগীরের মতন চেহারা। লোকটা এসেই এক হ্যাঁচকা টানে বসে থাকা পুলিশ কনস্টেবলকে তুলে রাস্তায় ফেলে দিল। লোকটার বন্দুক ছিটকে পড়ল।

দিবাকরবাবু 'কী হচ্ছে, কী হচ্ছে' বলতে বলতেই লোকটা এবার টাটুমকে তুলে নিল। শমি দরজা খুলে নেমে আটকাতে যেতেই একটা বিরাশি সিক্কার ঘুঁষি খেল মুখে। মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখলেও শমি সেই অবস্থায় প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল মোটা লোকটার সঙ্গীর পেটে। লোকটা পেট চেপে বসে পড়ল রাস্তায়। এবার ডান দিকে চোখ ফেরাতেই শমি একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখল। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের গলায় যে লোকটা ছুরি ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। পাঞ্জাবী ড্রাইভার রাস্তায় নেমে সেই মোটা গুণ্ডাটার মুখোমুখি। পেটে লাথি খেয়ে পড়ে যাওয়া লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের সাইড কিকে আবার শুয়ে পড়ল। আর এই সাইড কিকের ভঙ্গিটাই চিনিয়ে দিল বিক্রমদাকে।

শমি মুখের ব্যথা ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, বিক্রমদা!'

এই ফাঁকে টাটুম মোটা গুণ্ডাটার হাত ছাড়িয়ে ছুট মেরেছে। গুণ্ডাটা কী করবে ভেবে ওঠার আগেই বিক্রমদার দ্বিতীয় লাথি গিয়ে পড়ল তার কানের পাশে। লোকটা সামান্য টলে গেল। বিক্রমদা এবার এগিয়ে গিয়ে পাঞ্চ করলেন পেটে। আঁক করে একটা শব্দ হলো।

কালো গাড়িটার মুখ ততক্ষণে ঘুরে গেছে। মোটা লোকটা কোনোরকমে দৌড়ে গিয়ে ঝুলে পড়ল গাড়ির দরজা ধরে।

কারণটাও বুঝল শমি। দূর থেকে পিস্তল উঁচিয়ে ছুটে আসছেন দীঘা থানার ওসি। সঙ্গে আরও তিন কনস্টেবল। ভদ্রলোকের যা ভুঁড়ি তাতে পৌঁছতে সময় লাগাই স্বাভাবিক। এসেও হাঁপাতে লাগলেন। বললেন, 'ঐ বদমাইশ লরীটার জন্য, বুঝলেন, আমরা আটকে গেছিলাম। কিছু দেখতেও পাচ্ছি না। নেমে দেখতে পেয়েই ছুটতে আরম্ভ করেছি।'

বিক্রমদা ততক্ষণে নকল দাড়ি, পাগড়ি খুলে ফেলেছেন। বললেন, 'দেরি করে ফেললেও আপনারা যে এসেছেন এই যথেষ্ট। আপনাদের সঙ্গীকে তুলে জিপে নিয়ে যান। যথেষ্ট পাহারা হয়েছে। আর দরকার নেই। শমি, ঐ গুণ্ডাটার হাত বেঁধে আমাদের গাড়িতে তোল।'

দিবাকর সেনের মুখে হাসি ফিরে এসেছে। বললেন, 'কম্যান্ডো অ্যাকশনের কথা কানে শুনেছি। এই প্রথম চোখে দেখছি মশাই। আপনার দৌলতে...'

বিক্রমদা স্টিয়ারিং ধরে বসতে বসতে বললেন, 'বেশি না দেখাই ভাল দিবাকরবাবু।' তারপর ঘুরলেন শমির দিকে, 'তুই আর গোমড়া মুখে থাকিস না। একদম মানায় না। ছদ্মবেশ নেওয়ার দরকার কেন হয়েছিল পরে বুঝতে পারবি।'

গুণ্ডাটার জ্ঞান ফিরেছে। হাত-পা বেঁধে ওকে বসানো হয়েছে শমি আর বিক্রমদার

মাঝখানে। খুব বেশি চাপ দিতে হয়নি। নাম বলেছে খালেদ।

বিক্রমদা গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, 'বাকি কথা বের করার দায়িত্ব লালবাজারের। ওরা জানে কীভাবে পেট থেকে কথা বের করতে হয়।'

।। চার ।।

বাইরে থেকে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামকে প্রথমে চিনতে পারেনি শমি। চোখ টেনে নিচ্ছে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ নানারঙের পতাকা। ফুটপাতের চায়ের দোকানগুলোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না গাড়ির ভিড়ে। দেশী গাড়ির পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহু বিদেশী গাড়িও।

স্টেডিয়ামে ঢোকার মূল গেটের কাছে টাঙানো রয়েছে কুস্তিগীরদের বিরাট বিরাট কাট-আউট। মিকি রোমানোর ছবি আগেও দেখেছে শমি। ন্যাড়া মাথা, বুদ্ধমূর্তির মতো শান্ত চাউনি, লম্বা-চওড়া, পেশীবহুল মানানসই চেহারা। রঙিন কাটআউটে চোখ টেনে নিচ্ছে। আরও একজনের দৈত্যের মতো চেহারা। সারা গায়ে উলকি। বড় বড় চুল পনিটেল করে পেছনে বাঁধা। শমি নামটা পড়ল ঃ রোমেরো গঞ্জালেস। এই ফ্রি রেসলিং প্রতিযোগিতায় রোমেরো হচ্ছে চ্যালেঞ্জার।

স্টেডিয়ামে ঢোকার মুখে দেখা হলো রাকেশদার সঙ্গে। রাকেশদার ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। চেহারা দেখেই তা মালুম হলো শমির। খারাপ লাগল খুবই। রাতজাগা লাল চোখ। উস্কোখুস্কো চুল। রাকেশদা ওদের দেখে যেন আশ্বস্ত হলেন। বললেন, 'যাক তোরা এসেছিস। চল, ভেতরে চল। কি শমি, কেমন অ্যাডভেঞ্চার হলো আজ সকালে?'

দীঘা থেকে ফেরার সময় টাটুমকে কিডন্যাপের যে চেষ্টা হয়েছিল, সেকথাই বলছেন রাকেশদা। শমি বলল, 'বিক্রমদা না থাকলে আজ আর টাটুমকে খুঁজেই পাওয়া যেত না।'

রাকেশদাকে গম্ভীর দেখাল। বললেন, 'সকাল থেকে খালেদকে জেরা করে বেহালার দিকে ওদের একটা ডেরার সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে কিছুই পাওয়া যায়নি সেখানে।'

বিক্রমদা বললেন, 'না পাওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়া খালেদের কাছে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না।'

শমি বলল, 'কেন?'

বিক্রমদা বললেন, 'খালেদকে যে তাড়া করেছিল তাকে ধরতে পারলে তাও কিছুটা কাজ হতো।'

শমি বলল, 'তদন্ত যভাবে এগোচ্ছে তাতে চট করে ধরা পড়বে?'

রহস্যময় হাসি খেলে গেল বিক্রমদার মুখে। বললেন, 'সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে তাহলে কী হয় বল তো?'

শমি বলল, 'ভূত তাড়ানো যায় না।'

বিক্রমদা বললেন, 'একেবারে যায় না বলে হাল ছেড়ে দিলে তো মুশকিল। ভূত ঠিকই তাড়ানো যায় তবে একটু সময় লাগে এই যা।'

রাকেশদা বললেন, 'এসব ক্ষেত্রে কোন সর্ষের মধ্যে ভূত আছে সেটা জেনে যেতে

পারলে কাজটা একটু সহজ হয়।'

এসব হেঁয়ালি একদম ভাল লাগে না শমির। যদিও বিক্রমদাকে চেপে ধরলেও কোনো লাভ নেই। কিচ্ছু বলবে না। বরং রাকেশদাকে ধরলে তবু কিছু লাভ আছে। শমি রাকেশদাকে ধরলে তবু কিছু লাভ আছে। শমি রাকেশদাকে বলল, 'হেঁয়ালি না করে বলো না বাবা, কিছু এগোল তদন্ত?'

রাকেশদা হাসলেন, 'একেবারে এগোয়নি বললে ভুল হবে। তবে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে বলাটা ঠিক হবে না।'

বাইরে পুরোপুরি অন্ধকার নেমে গেছে। জ্বলে উঠেছে সবকটা আলো। কাট-আউটগুলোর ওপর রংবেরঙের আলো পড়ার ফলে দানব কুস্তিগীরদের আরও ভয়ঙ্কর লাগছে।

রাকেশদা বললেন, 'প্রশান্ত পুরকায়স্থর কথা মতন মিকি রোমানোর ওপর আলাদাভাবে নজর রাখা হয়েছে। গতরাতে হোটেল থেকে মিকি বেরিয়েছিল।'

বিক্রমদা বললেন, 'কোথায় গিয়েছিল কিছু জানা গেল?'

রাকেশদা মাথা নাড়লেন, 'নাঃ, ও এত জোরে ড্রাইভ করে যে ফলো করা মুশকিল হয়ে পড়ে।'

অনেকক্ষণ ধরেই শমির মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছিল। এই ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা রাকেশদা, এখন পর্যন্ত যারা খুন হয়েছে তারা প্রত্যেকেই কি ড্রাগ পাচারকারীদের সঙ্গে জড়িত?'

রাকেশদা বললেন, 'হ্যাঁ, মোটামুটি তাই। শেষ যে খুন হলো, মানে জহর বসু হচ্ছে কিং পিন। ওকে যে খুন করেছে সে খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন। কোনো সন্দেহ নেই।'

স্টেডিয়ামের ভেতর থেকে তুমুল চিৎকার কানে আসছে। বিক্রমদা বললেন, 'সত্যি কী ক্রেজ ভাবা যায় না। না দেখলে বিশ্বাস হতো না। সব টিকিট নিশ্চয়ই শেষ রাকেশ?'

রাকেশদা বললেন, 'শেষ মানে? রীতিমতো গেট ক্র্যাশ হওয়ার যোগাড়। বাইরে ভিড়টা দেখলি! কলকাতা শহরের নতুন হুজুগ আর কী! এদের মাঝখানে কিছু ড্রাগ ডিলার আর গুণ্ডা-বদমাইশ ঢুকে আমাদের প্রাণ জেরবার করে দিচ্ছে।'

বিক্রমদা শমিকে বললেন, 'আসলে কলকাতার মানুষ কখনও এ ধরনের লড়াই দেখেনি তো, তাই ওদের কাছে ব্যাপারটা নতুন। হংকং-এ কিছু গোপন মার্শাল আর্টের ডেরা রয়েছে, যেখানে লড়াই চলে মৃত্যু পর্যন্ত। সেগুলো খুবই ভয়ঙ্কর লড়াই। টাকাও অবশ্য অনেক বেশি থাকে সেখানে।'

রাকেশদা বললেন, 'এখানেও সেই ঝুঁকি যে একেবারে নেই তা নয়! শুধু বক্সিংয়েই কত লোক মারা যায় প্রতি বছরে! কয়েকটা দেশে তো এর বিরুদ্ধে আন্দোলন পর্যন্ত সংগঠিত হচ্ছে।'

বিক্রমদা বললেন, 'কিছু স্পোর্টস রয়েছে, যাদের হাই রিস্ক স্পোর্টস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন আইস হকি, আমেরিকান ফুটবল, কার রেসিং, বক্সিং!'

শমি জিজ্ঞেস করল, 'এই ফ্রি রেসলিং কি তার মধ্যে পড়ে?'

বিক্রমদা হেসে উঠলেন, 'ধুস! এটা কোনো স্পোর্টসই নয়। তবে এসব জায়গায় কিছু প্রাক্তন মার্শাল আর্ট এক্সপার্ট চলে আসে, যাদের কাছ থেকে কিছু না কিছু সবসময়েই শেখা যায়। হয়তো একটা কোনো নতুন স্টাইল বা নতুন কোনো প্যাঁচ চোখে পড়ল!'

রাকেশদা বললেন, 'উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমাদের প্রশান্ত পুরকায়স্থ রয়েছেন। তাই অতটা চিন্তা নেই।'

বিক্রমদার ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'তাই নাকি! এটা জানতাম না তো!'

রাকেশদা মুচকি হাসলেন। হাসিটা খুব অর্থপূর্ণ মনে হলো শমির কাছে।

স্টেডিয়ামে ঢোকার মুখে বাজনার তালে তালে চিৎকারটা কানে এল। প্রায় কানে তালা ধরার যোগাড়। গ্যালারির বাঁ দিক থেকে বাজনার তালে তালে সুর মিলিয়ে চেঁচাচ্ছে একদল লোক। মি-কি, মি-কি, মি-কি...। বিক্রমদা বললেন, 'দেখেছিস শমি, মিকির কত ফ্যান! এদের জনপ্রিয়তা সিনেমার স্টারেদের মতন! কিছু লোক থাকে যারা এদের লড়াই দেখার জন্য দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়!'

যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে শমি। গোটা ব্যাপারটাই ওর কাছে নতুন। তবে সব কিছু আরও জট পাকিয়ে গেছে পরপর কয়েকটা খুন হয়ে যাওয়ার জন্যে। হয়তো এই খুনের সমাধান সহজে করাও যেত না, যদি না টাটুম দেখে ফেলত খুনীদের। টাটুমের আঁকা ছবি এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিশের হাতে চলে এসেছে। সেই ছবির কপি এবার ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। টাটুমের বিশেষ ক্ষমতা না থাকলে অবশ্য এটা সম্ভব হতো না। আর এই খবরটা পেয়ে যাওয়ার জন্যই গুণ্ডারা আরও বেশি করে চেষ্টা করছে টাটুমকে ধরে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু এখানে একটাই খটকা। গতকাল বিকেলে দিবাকর সেন খবরটা দিয়েছিলেন রাকেশদাকে। বিক্রমদা আর শমিও ছিল। সেখানেই ঠিক হয়, আজ ভোরে টাটুমকে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে। এই খবরটা এত তাড়াতাড়ি ড্রাগ পাচারকারীরা পেল কী করে? বিক্রমদাই বা ছদ্মবেশ নিলেন কেন? নাঃ, শমির মাথায় কিছুই ঢুকছে না। বরং মন দিয়ে এই অদ্ভুত ধরনের কুস্তিটা দেখাই ভাল।

মাঝখানে রিং। বক্সিং রিং-এর মতোই দড়ি দিয়ে ঘেরা। তবে জায়গাটা বেশ বড়। রিং-এর সামনে বেশি দামের টিকিট আর ভি আই পি এনক্লোজার। তখনও লড়াই শুরু হতে মিনিট পাঁচেক দেরি।

বিক্রমদা নিজের মনেই বললেন, 'মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই হতো সেই প্রাচীন যুগে। গ্রীক রাজ্য থেসাস এ ধরনের লড়াই চালু করেছিলেন। যারা লড়তো তাদের কি বলতো জানিস?'

শমি বলল, 'গ্ল্যাডিয়েটর?'

'হ্যাঁ। তার আগেও কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধকে খেলা হিসেবেই নিত লোকে। কিন্তু থেসাস এসে সেটাকে বিকৃত করলেন। শুধু মানুষে মানুষে লড়াই নয়, রোমানদের সময় ক্রীতদাসদের ধরে ছেড়ে দেওয়া হতো ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে।'

'বীভৎস!'

'হ্যাঁ, তাছাড়া আর কী! মানুষের মধ্যে এই হিংস্রতা পছন্দ করার প্রবণতা আজও কিন্তু রয়ে গেছে। নইলে চারদিকে এত খুনখারাপি হয়!' শেষদিকে বিক্রমদার গলা বিষণ্ণ

শোনাল।

মন দিয়ে বিক্রমদার কথা শুনছিল শমি। হঠাৎ দেখল ভিড় ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন রাকেশদা।

রাকেশদার চোখমুখে উত্তেজনা। কাছে এসে বললেন, 'মিকি গাড়ি চেয়েছে উদ্যোক্তাদের কাছে। মনে হচ্ছে কোথাও বেরোবে।'

বিক্রমদা উঠে পড়লেন চোখের নিমেষে। 'তাহলে তো ফলো করা দরকার।'

রাকেশদাকে মুহূর্তে জন্য বিমূঢ় দেখাল। বললেন, 'কিন্তু শমি? ও কি এখানে থাকবে? যদি কোনো গণ্ডগোল হয়।'

বিক্রমদা কিছু বলার আগেই শমি বলে উঠল, 'আমি যাব। এখানে একা থাকব না।'

রাকেশদা হাসলেন, 'জানতাম তুই যাবি। অ্যাডভেঞ্চার ছেড়ে এখানে বসে থাকার ছেলেই নোস তুই।'

কালচে নীল মারুতি চালিয়ে মিকি বেরিয়ে গেল। বিক্রমদা আজ নিজে জিপের স্টিয়ারিং ধরেছেন।

রাকেশদা বললেন, 'মিকি কিন্তু দারুণ জোরে গাড়ি চালায়। বি কেয়ারফুল।'

বিক্রমদা হাসলেন, 'যত জোরেই যাক, ভুলে যাস না এটা কলকাতা শহর। হয় ক্রসিং, নয়তো জ্যাম, কোথাও একটা ঠিকই ফেঁসে যাবে।'

একটু দূরত্ব রেখে ফলো করছেন বিক্রমদা। মিকির গাড়ি এসে থামল পার্ক সার্কাসের বিখ্যাত গোরস্থানের সামনে। বিক্রমদা ওভারটেক করে কিছুটা দূরে গিয়ে জিপ থামালেন।

মারুতি থেকে নামল কালো জ্যাকেট পরা লম্বা একদন মানুষ। চওড়া কাঁধ, সরু কোমর, চমৎকার চেহারা। ছোট্ট একটা পোলো ক্যাপ পরে থাকায় মিকির কামানো মাথা ঢাকা পড়ে গেছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে মিকি অন্ধকার গোরস্থানে ঢুকে পড়ল।

জিপ থেকে লাফিয়ে নামলেন বিক্রমদা। ফিসফিস করে বললেন, 'তোরা বস। আমি আসছি।' অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন বিক্রমদাও।

শমি তাকাল রাকেশদার দিকে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ওর বুক ধকধক করছে।

রাকেশদা গলা নামিয়ে বললেন, 'এসব জায়গাগুলোই হচ্ছে ড্রাগ পাচারের পক্ষে আদর্শ। রাতের দিকে ভয়ে কেউ আসে না।'

শমি বলল, 'কিন্তু বিক্রমদা যে একা গেল। যদি কিছু হয়ে যায়।'

রাকেশদা বললেন, 'ভিকি নিজেকে বাঁচাতে জানে।'

একটা করে মুহূর্ত পার হয় আর শমির মনে হয় যেন সময় কাটতে চাইছে না।

বিক্রমদা ফিরলেন প্রায় আধঘণ্টা পরে। অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন রাকেশদাও। ভাবছিলেন ঢুকে পড়বেন অন্ধকার গোরস্থানে। তার আর দরকার হলো না। বিক্রমদা ফিরলেন গম্ভীর মুখে। বললেন, 'আমি আর ইনডোরে ফিরছি না রাকেশ। বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা মাথায় গোটা কেসটা নিয়ে ভাবা দরকার।'

রাকেশদা বললেন, 'কিন্তু মিকি?'

বিক্রমদা গম্ভীর গলায় বললেন, 'মিকিকে আর ফলো করার দরকার নেই। যেটা

দরকার ছিল সেটা মিটে গেছে।'

ব্যস! এটুকু বলে সেই যে মুখে কুলুপ আঁটলেন বিক্রমদা, সারা রাস্তায় আর কথাই বললেন না।

।। পাঁচ ।।

প্রথম রিংটাতেই ঘুম ভেঙে গেল শমির। ঘুমচোখে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলতে গিয়েই দেখল বিক্রমদা নেই। জানলা দিয়ে এসে পড়েছে সকালের আলো। গতরাতে পার্ক সার্কাস গোরস্থানে মিকিকে ফলো করে ফিরে আসার বিক্রমদার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলছে। বিক্রমদা কেসটার মধ্যে যে সাংঘাতিকভাবে ঢুকে পড়েছেন, এটা তারই প্রমাণ। হয়তো ভেতরে ভেতরে বিক্রমদা অনেকটা এগিয়েও গেছেন। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

শমি ফোনটা তুলল, 'হ্যালো...।' শমি বলার পরেও কোনো উত্তর নেই। একটা অস্পষ্ট ঘড়ঘড় আওয়াজ। বিরক্ত হয়ে শমি ফোনটা রেখে দেবে ভাবছিল। এইসময় কেউ যেন ওদিক থেকে চাপা শব্দে হাসল। মেরুদণ্ডর কাছে একটা শিরশিরে ঠাণ্ডা অনুভূতি টের পেল শমি। তারপরেই কেউ এখটা খসখসে কর্কশ গলায় বলল, 'বি কেয়ারফুল বেবি! ইটস আ গেম অফ ডেথ।'

গেম অফ ডেথ! মৃত্যুর খেলা! কোথায় যেন শব্দগুলো দেখেছে শমি? ওঃ হো, মনে পড়ে গেল। নেতাজী ইনডোরে দানব কুস্তির আসরের বাইরেই তো বিরাট করে লেখা রয়েছে! কিন্তু তার সঙ্গে এই হুমকির কি সম্পর্ক রয়েছে?

রিসিভার নামিয়ে রাখার সময়েই শমি টের পেল হাত কাঁপছে। এটুকু সময়ের মধ্যেই কপালে ঘাম জমে গেছে। ইংরেজি বলার ধরন শুনেই মনে হলো বিদেশীর গলা। টাটুম যে খুনী ফরেনারকে দেখেছিল মৌড়িগ্রাম ক্রসিংয়ের কাছে, সে নয় তো!

'কীরে একটা হুমকিতেই ঘাবড়ে গেলি?' চমকে ভেঙে তাকিয়ে শমি দেখল বিক্রমদা হাসছেন। শমির ফ্যাকাসে ভাবটা তখনও কাটেনি। বলল, 'তুমি শুনেছো?'

বিক্রমদা বললেন, 'শুনলাম। পাশের ঘরের এক্সটেনশন থেকে।'

বলতে বলতেই আবার ফোন বাজল। শমি ধরতে যাচ্ছিল, বিক্রমদা হাত তুলে বললেন, 'ছেড়ে দে. আমি দেখছি।'

উঠতে গিয়ে শমি দেখল বিক্রমদার কপাল কুঁচকে গেছে। লক্ষণ ভাল নয়। দু-একবার 'হুঁ, হ্যাঁ' করে বিক্রমদা ফোন রাখলেন 'এখনই যাচ্ছি' বলে।

ফোনটা নামিয়ে রেখে বিক্রমদা চাবুকের মতো ঘুরলেন শমির দিকে। বললেন, 'কুইক শমি, এখনই বেরোতে হবে। রাকেশ ফোন করেছিল। পুলিশ কাস্টডিতে খালেদাকে মৃত পাওয়া গেছে।'

খালেদা আর বেঁচে নেই! গা-টা ছাঁত করে উঠল শমির। গতকাল সকালে ছেলেটা ওর আর বিক্রমদার মাঝখানে বসে অতটা রাস্তা এসেছে। হোক না গুণ্ডা বদমাশ! তবু মানুষ তো! হাত-পা বাঁধা ছিল বলে শমিই দুবার ওর গলায় জল ঢেলে দিয়েছিল। সেই খালেদ মরে গেল! তাও আবার খোদ লালবাজারের মধ্যে! কীভাবে? সর্ষের মধ্যে ভূত! হঠাৎ বিক্রমদার কথাটা মনে পড়ে গেল শমির। বিক্রমদা কেন বলেছিলেন কথাটা? বেশি ভাবার

সময় পেল না শমি। লেক প্লেসের বাড়ির থেকে লালবাজারে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না।

খালেদের ডেডবডি তখনও সরানো হয়নি। লক-আপের দেওয়ালে এমনভাবে হেলান দিয়ে বসে আছে যে দূর থেকে দেখলে মনে হবে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু কাছে গেলে বোঝা যায়, খালেদের চোয়াল বেয়ে গ্যাঁজলা বেরিয়ে এসেছে।

'কেস অফ ক্লিয়ার পয়জনিং!' রাকেশদা বললেন।

বিক্রমদার চোখমুখ থমথমে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন জানা গেল?'

রাকেশদা বললেন, 'এই তো সকালে। প্রশান্ত রুটিন জেরা করতে ঢুকে আবিষ্কার করল।'

'ছবিগুলো দেখে কাউকে আইডেন্টিফাই করা গেল?'

বিক্রমদার প্রশ্নের জবাবে রাকেশদা বললেন, 'চল একবার কম্পিউটার রুমে যাই। ছবিগুলো তোরও একবার দেখা দরকার।'

কম্পিউটার ঘরটা ছোট মতন। প্রবল ঠাণ্ডা। দুটো এ সি মেশিন সমানে চলছে।

কম্পিউটার রুমের দায়িত্বে রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার কুমারবাবু। অল্পবয়সেই কাঁচাপাকা চুল। মুখে একধরনের ছেলেমানুষি রয়েছে।

রাকেশদা বললেন, 'কালকের পোর্ট্রেট ফাইলগুলো একটু কল করুন তো। কয়েকটা প্রিন্টও দিয়ে দিন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'প্রিন্ট তো রেডি নেই। মিনিট দশেক লাগবে।'

ছোট্ট টিভির মতো স্ক্রিন কম্পিউটারের। টাটুম ছবি এঁকে দিয়েছে গতকালই। সেই ছবিগুলোই লোড করা রয়েছে কম্পিউটারের মেমারিতে। গোটা ব্যাপারটাই নতুন শমির কাছে।

কিন্তু দশ মিনিট তো পেরিয়ে গেল। এতক্ষণ সময় লাগছে কেন? অনেকক্ষণ ধরেই কি-বোর্ডে পাগলের মতো কী সব টেপাটেপি করছেন ভদ্রলোক। এই ঠাণ্ডার মধ্যেও কপালে ঘাম জমে গেছে।

'ও ছবি আর কোনোদিনই আসবে না।' বিক্রমদার গম্ভীর গলায় চমকে গিয়েছিল শমি।

রাকেশদাও প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সে কি, কেন? কী হয়েছে কুমারদা? মেশিন কি হ্যাং করে গেছে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন বিক্রমদা। গলাটা কঠোর। বললেন, 'ছবিগুলোর ফাইল সব ইরেজ করে দেওয়া হয়েছে। ইউ উইল নেভার গেট ইট। কি, তাই তো কুমারবাবু?'

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক ফ্যাকাসে মুখে বললেন, 'গতকাল রাতে আমি নিজে হাতে ফ্লপিতে রেকর্ড করে রেখেছি। কে মুছে দিল?'

বিক্রমদা বললেন, 'সেটা জানা গেলে তো সব রহস্যের এখনই সমাধান হয়ে যায়। মূল ছবিগুলোও খুঁজে লাভ নেই। পাওয়া যাবে না।'

রাকেশদাকে উদ্ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে। টেবিলের ওপর মাথা রেখে বসে পড়েছিলেন রাকেশদা। বিক্রমদা গিয়ে পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, 'চিয়ার আপ রাকেশ। এখন

ভেঙে পড়লে একেবারেই চলবে না।'

'কিন্তু কী হবে এখন?' হতাশ গলায় রাকেশদা বললেন, 'আমাদের হাতে প্রমাণ বলতে তো কিছুই রইল না। আমরা আবার অন্ধকারে পড়ে গেলাম। টাটুমকে গিয়ে আবার আঁকিয়ে, কপি করে তদন্তর কাজ শুরু করতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে!'

বিক্রমদার মুখ গম্ভীর। কিছু একটা ভাবছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'এখন সবচেয়ে জরুরি টাটুমকে বাঁচিয়ে রাখা। ওর ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছে অপরাধীরা। এবার চাইবে যত দ্রুত সম্ভব ওকে সরিয়ে ফেলতে।'

টাটুমের মুখ মনে পড়তেই গা শিরশির করে উঠল শমির। ফুলের মতন একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে যারা এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তারা কি মানুষ? খুব একটা না ভেবেই শমি বলল, 'টাটুমের দাদু দিবাকর সেনের কাছ থেকে কেউ কায়দা করে জেনে নেবে না তো?'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বিক্রমদা বললেন, 'কী জেনে নেবে?'

'টাটুম কোথায় আছে?'

প্রথমে খেয়াল করেনি। হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন বিক্রমদা, 'থ্যাঙ্ক ইউ শমি। ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস! রাকেশ, এখনই একবার দিবাকর সেনের বাড়িতে ফোন কর। এখনই!'

রাকেশদা ফোন তুলে ডায়াল ঘোরালেন। পেয়েও গেলেন একেবারেই। 'হ্যালো...লালবাজার থেকে বলছি। দিবাকরবাবু আছেন?' ওপাশ থেকে কেউ একটা কিছু বলছে। শমি দেখল রাকেশদার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে শুনতে শুনতে। রাকেশদার গলায় অবাক হওয়ার ভঙ্গি, 'সে কি কোথাও বেরিয়ে গেছেন? পুলিশের জিপ গিয়েছিল? না, আমি তো পাঠাইনি!' হতভম্ব দেখাচ্ছে রাকেশদাকে। বিক্রমদা এসে ফোন নিয়ে নিলেন। বললেন, 'কতক্ষণ বেরিয়েছেন দিবাকরবাবু? মিনিট পাঁচেক?...'ফোন রেখে নিমেষে ঘুরলেন বিক্রমদা, 'এখনই বেরোতে হবে। এখনও দেরি হয়ে যায়নি। কুইক, তুই জিপ রেডি কর। তবে তার আগে একটা জরুরি ফোন...গ্র্যাণ্ড হোটেলে...'

দ্রুত নম্বর ঘোরালেন বিক্রমদা, 'ইয়েস, পুট মি টু রুম নাম্বার থ্রি জিরো টু।' গ্র্যাণ্ডে কাকে ফোন করছেন বিক্রমদা? বিক্রমদার গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো মিকি! বিক্রম হিয়ার...' দ্রুত কিছু কথা ইংরেজিতে বললেন বিক্রমদা। শমির মনে হলো কিছু একটা ডিরেকশন দিচ্ছেন বিক্রমদা। দ্রুত শেষ করলেন। রাকেশদাকে বললেন, 'চল। আর দেরি নয়। কলকাতার রাস্তাই আমাদের একমাত্র ভরসা। আশা করা যায় ওরা বেশিদূর যেতে পারেনি।'

শমির এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, ড্রাগ পাচার আর খুনের জন্য যে মিকিকে সন্দেহ করা হচ্ছিল, সেই মিকির সঙ্গেই সন্দেহ করা হচ্ছিল, সেই মিকির সঙ্গেই এইমাত্র ফোনে কথা বললেন বিক্রমদা! আর এমনভাবে কথা বললেন যেন বহুদিনের চেনা! নাঃ, সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। শমি বেশি ভাবতেও পারল না। আর আগেই জিপে স্টার্ট দিলেন বিক্রমদা।

লাল আলো আর তীব্র হুটারের আওয়াজে রাস্তা ফাঁকা পেতে অসুবিধে হলো না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই শমিরা পেয়ে গেল ফাঁকা, চওড়া ডায়মণ্ডহারবার রোড।

স্পিডোমিটারের কাঁটায় চোখ পড়তে চমকে উঠল শমি। একশো কুড়ি পেরিয়ে একশো তিরিশে পৌঁছে থরথর করে কাঁপছে কাঁটা। ওদের সঙ্গে আরও দুই জিপ ভর্তি পুলিশ রওনা হয়েছিল। তাদের টিকিও দেখা যাচ্ছে না।

।। ছয় ।।

বেহালা ছাড়িয়ে জোকার মুখে পড়তেই আচমকা বৃষ্টি শুরু হলো। সকালের দিকে আকাশে মেঘ দেখেছিল শমি। কিন্তু বৃষ্টি হবে ভাবতেই পারেনি। জোকার ট্রামডিপো পেরিয়ে খানিকটা গিয়ে বাঁ দিকে একটা এঁদো গলির মধ্যে জিপ ঢোকালে বিক্রমদা। চারদিকে টালির চালের বাড়ি। দু-একটা পাকা বাড়িও রয়েছে। রাস্তা পাকা নয় সব জায়গায়। কাদা থকথক করছে। রাস্তার ধারে বড় বড় কচুর পাতায় জল জমে রয়েছে। বিক্রমদা জিপ থামালেন।

খুব নির্জন জায়গা। রাস্তায় বিশেষ লোক নেই। বৃষ্টিটা একটু ধরলেই টিপটিপ করে পড়েই চলেছে। হেঁটে যেতে যেতে ওরা ভিজে গেল। একটা উঁচু পাঁচিলঘেরা পুরনো বাড়ির কাছে এসে থামলেন বিক্রমদা।

রাকেশদা বললেন, 'ফোর্স আসা পর্যন্ত ওয়েট করলে হতো না?'

বিক্রমদা মাথা নাড়লেন, 'একেবারেই সময় নেই। লেট্স মুভ।'

কারও গলা পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরে শুধু বৃষ্টির শব্দ। শমি ঘুরে দেখল বৃষ্টি জলে ভিজে চকচকে সবুজ হয়ে গেছে লনের ঘাসগুলো। কিন্তু একটাও মানুষ নেই কেন? এই বাড়িতে কি কেউ থাকে না?

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দা। বারান্দার দুদিকে ঘর। মাঝখানে সরু প্যাসেজ। আরও অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। কিসে যেন হোঁচট খেল শমি। ঝুঁকে পড়ে দেখতে গিয়ে শমির শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। পুলিশের সাদা পোশাক পরা একজন পড়ে রয়েছে।

'বিক্রমদা!' শমি ডাকার আগেই বিক্রমদা চলে এলেন। তিনিও দেখতে পেয়েছেন। ঝুঁকে পড়ে সাদা পোশাক পরা শরীরটা ঘুরিয়ে দিতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল শমি। 'একি, প্রশান্ত পুরকায়স্থ!'

হতভম্ব শমিকে থামিয়ে দিলেন বিক্রমদা। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'জানতাম এটাই হবে! বেচারা, বেশি লোভ করতে গিয়েই শেষ হয়ে গেল।'

সামনের ঘর থেকে উঁ উঁ করে একটা চাপা আওয়াজ আসছে। রাকেশদা ঠেলে দরজা খুলতেই দেখা গেল ঘরের কোণে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন দিবাকর সেন। ভদ্রলোকের মুখ বাঁধা থাকায় ওরকম চাপা আওয়াজ আসছে।

শমি দৌড়ে গিয়ে খুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিক্রমদার ইস্পাতকঠিন গলা ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিল।

'দাঁড়া শমি। দিবাকরবাবুকে কষ্ট করে আর বাঁধার কাজটা আমাদের করতে হবে না। ভালই হয়েছে!' বিক্রমদার চোয়াল শক্ত। এগিয়ে গিয়ে শুধু দিবাকর সেনের মুখের বাঁধনটা খুলে দিলেন।

জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে দিবাকর সেন বলে উঠলেন, 'এর মানে কী ক্যাপ্টেন মুখার্জি?'

হিসহিস করে উঠলেন বিক্রমদা, 'মানে বুঝবেন। তবে ধীরেসুস্থে। সব ব্যাপারে এত তাড়াহুড়ো করলে কী হয়?'

শমি এতটা অবাক হয়ে গেছে যে কথা বলতেও ভুলে গেছে। ঘুরে রাকেশদাকে জিজ্ঞেস করবে ভাবছিল, কিন্তু তার আগেই ঘুরে যেন একটা ঝড় ঢুকে পড়ল!

বিক্রমদা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শমি, সরে যা!'

দেওয়ালের দিকে লাফিয়ে সরে যেতে গিয়েই শমির চোখে পড়ল বিরাট দৈত্যের মতো চেহারাটা। ফ্যাকাসে ফর্সা রঙ। চুল পনিটেল করে বাঁধা। দৈত্যের মতো লোকটা অনায়াসে একহাতে তুলে ফেলল রাকেশদাকে। তুলেই ছুঁড়ে ফেলল ঘরের কোণে।

শমি দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে ধাক্কা খেল আরেকটা পাহাড়ের সঙ্গে। ষণ্ডাগুণ্ডা আরও দুটো লোক ঢুকে পড়েছে ঘরে। হিংস্র গলায় দিবাকর সেন চেঁচিয়ে উঠল, 'কিল দেম রোমেরো। কিল দেম!'

হাত-পা হিম হয়ে গেল শমির। তাহলে এই লোকটা রোমেরো গঞ্জালেস! মিকি রোমানোর চ্যালেঞ্জার। এতগুলো গুণ্ডার সঙ্গে একা পারবেন বিক্রমদা?

রাকেশদা পড়ে গিয়ে আর নড়ছেন না। দৈত্যের আর তার দুই সঙ্গী বিক্রমদার মুখোমুখি। দিবাকর সেন আবার চেঁচাল, 'ফিনিশ হিম রোমেরো। ফিনিশ...'

শমির ইচ্ছে করছিল দিবাকর সেনের মুখটা চেপে ধরতে। ভেতরে ভেতরে লোকটা এত বদমাশ? বোঝা যায়নি তো একেবারেই! কিন্তু নিজের নাতনিকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে কেন লোকটা?

ভাবতে ভাবতেই চারদিকে তাকাচ্ছিল শমি। যদি কিছু একটা পাওয়া যায়! দৈত্যটার একটা ঘুঁষি কোনোরকমে এড়ালেন বিক্রমদা। জবাব দিলেন ঘুরে গিয়ে পা ছুঁড়ে। একটা গুণ্ডার কানের পাশে লাগতে পড়ে গেল। দৈত্যের মতো চেহারা নিয়ে রক্ত জল-করা চিৎকার করে রোমেরো এগিয়ে গেল বিক্রমদার দিকে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল শমি। খুলল আরেকজনের গলা শুনে, 'কাম অন ভিকি। কাম অন...'

বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুত একজন ঢুকে পড়েছে শমির পাশ দিয়ে। লম্বা শরীরটা প্রচণ্ড জোরে গিয়ে আছড়ে পড়ল রোমেরো গঞ্জালেসের ওপর। দুটো বিরাট শরীর এত জোরে দেওয়ালের ওপর পড়ল যে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠল। নেতাজী ইনডোরের সেই চিৎকার যেন হঠাৎ আছড়ে পড়ল শমির কানে। মিকি...মিকি...মিকি...

মিকি রোমানো বনাম রোমেরো গঞ্জালেস। লড়াইটা তাহলে এখানেই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মিকি রোমানো বিক্রমদাকে এতটা ঘনিষ্ঠভাবে চিনল কী করে? একটু আগে তাহলে ফোনে মিকিকে এ জায়গারই ডিরেকশন দিচ্ছিলেন বিক্রমদা! নাঃ, সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে শমির।

বিক্রমদা এবার নিশ্চিন্তে বাকি দুটো গুণ্ডার ব্যবস্থা করছেন। একজনের মাথা ঠুকে দিলেন দেওয়ালে। আরেকটা গড়াতে গড়াতে শমির কাছে এসেছিল। শমি এই সুযোগে মনের সুখে লাথি মেরে নিল!

মিকি রোমানো আর রোমেরো গঞ্জালেস মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একে অন্যকে মাপছে।

বিক্রমদা ঘুরলেন ওদের দিকে। বললেন, 'মে আই হেল্প ইউ মিকি?'

মিকি বলল, 'নো। লিভ মি অ্যালোন। আই উইল গেট হিম!'

শান্ত বুদ্ধমূর্তির মতো মুখ। মিকি রোমানোকে অবাক হয়ে দেখছিল শমি। পাথরে খোদাই করা গ্রীক ভাস্কর্যের মতো চেহারা।

মিকি এগিয়ে লাথি ছুঁড়তেই রোমেরো পা ধরে ঘুরিয়ে দিল। অন্য কেউ হলে পা ভেঙে যেত। কিন্তু পড়তে পড়তেই আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় অন্য পা দিয়ে রোমেরোর কানের গোড়ায় লাথি মারল মিকি। টলে গেল রোমেরো। এলোপাথাড়ি ঘুঁষি ছুঁড়ল। একটাও লাগল না। শমি বুঝতে পারল, রোমেরোর দৈত্যের মতো চেহারা আর প্রচুর শক্তি থাকলেও লড়াইতে বিশেষ দক্ষ নয়।

বিক্রমদা বললেন, 'ওয়েল ডান মিকি। গেট হিম ইন দ্য বিলো!'

মাথা ঝাঁকাল মিকি রোমানো। আইডিয়াটা পছন্দ হয়েছে। এগিয়ে গিয়ে হাঁটু দিয়ে আঘাত করল রোমেরোর পেটে। একই সঙ্গে কাঠারির মতো দুটো হাত নেমে এল রোমেরোর ঘাড়ের ওপর। এটাই মোক্ষম মার। দৈত্যের চেহারা নিয়ে কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রোমেরো গঞ্জালেস।

বিক্রমদা জড়িয়ে ধরলেন মিকিকে। বললেন, 'ইউ আর দ্য গ্রেটেস্ট ফাইটার। স্টিল ইউ আর...'

শমির দিকে ঘুরলেন বিক্রমদা। হেসে বললেন, 'এই মিকির কাছেই চার বছর আগে, জাপানে সিক্সথ ডান ব্ল্যাকবেল্টের পরীক্ষায় হেরেছিলাম। বুঝলি শমি, যোগ্য লোকের কাছে হারতে কোনো দুঃখ নেই।'

যাক, বিক্রমদার সঙ্গে মিকির পুরনো পরিচয়ের রহস্য কিছুটা বোঝা গেল। কিন্তু বাকিটা?

pathagar.net

।। সাত ।।

'বাকিটা বেশ জটিল। জানতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে সেই দিনটায়, যেদিন টাটুম মৌড়িগ্রামের লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে ড্রাগ পাচারকারী জহর বসুকে খুন হতে দেখেছিল।' এই পর্যন্ত বলে থামলেন বিক্রমদা। ঘরে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেদিন টাটুম খুনীদের দেখেছিল ঠিকই, কিন্তু যেটা দেখেনি তা হচ্ছে গাড়ির পেছনের ডিকিতে এককেজি হেরোইন পাচার করে দেওয়ার দৃশ্যটা। যার দাম বাজারে বেশ কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু কথা হলো, দিবাকর ঘটনাটা পুলিশকে বা আমাকে জানালো কেন? খুবই সহজ কারণ। ঐ কয়েক কোটি টাকার হেরোইনের জন্য যে অন্য মাফিয়া গ্রুপ হামলা করতে পারে সে বিষয়ে বিলক্ষণ সচেতন ছিল দিবাকর। আর তা-ই পুলিশ এবং আমার দ্বারস্থ হওয়া। এতে এক ঢিলে দুটো পাখি মারার বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেল। একইসঙ্গে নিজের ওপর থেকে সন্দেহের নজর সরানো গেল, আর পুলিশের প্রোটেকশনও পাওয়া গেল।'

থেমে একটু দম নিলেন বিক্রমদা। জল খেয়ে বললেন, 'প্রশান্ত পুরকায়স্থকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল দিবাকর। ইচ্ছে ছিল কাজ শেষ হলে সরিয়ে দেবে। সেটাই করেছে। প্রশান্তকে মেরে নিজের হাত-পা বেঁধে দিতে বলেছিল নিজের দলের লোকজনদের। এটা ছিল দ্বিতীয় এবং শেষ কৌশল। আমরা ভাবতাম দিবাকরবাবুকে

ডেকে এনে প্রশান্ত পুরকায়স্থ টাটুমের লুকিয়ে থাকার জায়গাটা জেনে নিয়েছিল। আর তারপর টাটুমকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় গুণ্ডাদের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা গেছে। টাটুমকে কিছুদিন লুকিয়ে রাখলে কেসটাও ধামাচাপা পড়ে যেত। সবাই জানত প্রশান্তই নাটের গুরু। কিন্তু দিবাকরবাবু যে এমন করতে পারে তার একটা আগাম আশঙ্কা করেছিল প্রশান্ত। আর তাই পরে ব্ল্যাকমেল করার জন্য দিবাকরের সঙ্গে সমস্ত কথাবার্তা টেপরকের্ডারে ধরে রেখেছিল। প্রশান্তর কথাবার্তা এবং আচরণের কিছু অসঙ্গতি থেকেই আমাদের প্রথম সন্দেহ হয়। যেমন শুরু থেকেই মিকি রোমানোর ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা। এই জায়গাটা রাকেশ আরও ভাল বলতে পারবে। রাকেশ, প্লীজ...'

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, রাকেশদা হেসে বললেন, 'পুলিশ লক-আপে খালেদের মৃতদেহের পাশে আমরা একটা পুলিশ উর্দির বোতাম আবিষ্কার করি। সম্ভবত বিষ দেওয়ার পর ছটফট করার সময় খালেদ প্রশান্তর জামা আঁকড়ে ধরেছিল। তখনই বোতামটা ছিঁড়ে পড়ে। আর তারপর কম্পিউটার রুমে টাটুমের আঁকা ছবির সমস্ত রেকর্ড মুছে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নিশ্চিত হয়ে যাই যে, পুলিশের ভেতরে কারও হাত রয়েছে।' রাকেশদা থামলেন।

বিক্রমদা আবার শুরু করলেন, 'মিকি রোমানোর ঠাকুর্দা ছিলেন পোর্তুগীজ বণিক। পার্ক সার্কাস গোরস্থানে তাঁরই কবর রয়েছে। ছোটবেলায় মিকি ঠাকুর্দার কাছেই মানুষ। আর সেই টান থেকেই রাতের বেলা ওর গোপন অভিযান। দিনের বেলা ভক্তদের ভিড় এড়াতেই রাতে যাওয়া। আর সেটাকেই বিকৃত করে সন্দেহের তীর ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল দিবাকর, প্রশান্তরা। অবশ্য সে রাতে ফলো না করে গেলে আমি চিনতেও পারতাম না মিকিকে। জাপানে আমরা একসঙ্গে সিক্সথ ডান ব্ল্যাকবেল্ট করেছিলাম। মিকি রোমানো ওর ছদ্মনাম। তাই চিনতে পারিনি। আসল নাম বার্ড স্টুয়ার্ড। নিয়তির ফেরে আজ ও পেশাদার রেসলার। যাকগে, পুরনো বন্ধুকে ফিরে পেয়েছি—এটাই বড় কথা।'

বিক্রমদা থামতেই শমি বলে উঠল, 'কিন্তু সেই এক কেজির হেরোইনের প্যাকেট?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিক্রমদা উঠলেন। তাক থেকে নামিয়ে আনলেন টাটুমের পুতুলটা। মস্ত বড় একটা টেডি বিয়ার। শমি খেয়াল করেছে এটা কখনও কোলছাড়া করত না টাটুম। সেই পুতুলের পেটের সেলাই খুলতেই বেরিয়ে এল সাদা সেলোফেন পেপারে মোড়া প্যাকেট।

বিক্রমদা বললেন, 'ছোট্ট মেয়েটার সারল্যের সুযোগ নিয়ে দিবাকর এটাকে পুরে দিয়েছিল পুতুলের পেটে। টাটুমের সঙ্গে আমরা এতদিন এই নিষিদ্ধ মাদকও পাহারা দিয়েছি! তবে আর নয়, মাদক পাচারের অভিযোগ দিবাকরের বিরুদ্ধে আনার জন্য এক কেজির প্রয়োজন নেই। একশ গ্রামই যথেষ্ট। বাকিটা নষ্ট করে দিচ্ছি রাকেশের অনুমতি নিয়েই। নইলে এটাই আবার পুলিশ কাস্টডি থেকে গোপনে চলে যাবে কালোবাজারে। প্রশান্ত পুরকায়স্থর সংখ্যা তো খুব একটা কম নয়!' বলতে বলতে কাঁচি দিয়ে প্যাকেটটা কেটে ফেললেন বিক্রমদা। ডাইনিং স্পেসের বেসিনে কল খুলে দিয়ে ঢেলে দিতে লাগলেন সাদা গুঁড়ো নিষিদ্ধ মাদক।

কোটি কোটি কালো টাকা জলে ধুয়ে যেতে লাগল।

pathagar.net

ছোটমামার গোয়েন্দাগিরি

উজ্জ্বল কুমার

প্রতিবারই গরমের ছুটির সময়ে আমরা ধানবাদে মামার বাড়ীতে বেড়াতে যাই। তখন সেখানে বড় মাসি, ছোটমাসির ছেলে মেয়ে সবাই আসে। বড়মাসি, ছোটমাসির ছেলে মেয়েরা ও আমরা মিলিয়ে মোট পাঁচজন। সেজন্য ছোটমামা আমাদের নাম দিয়েছে পঞ্চ পাণ্ডব।

এবারও গরমের ছুটিতে ধানবাদে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাদের স্টেশনে রিসিভ করতে এসেছিল মদনদা। মদনদা ছোটবেলা থেকেই মামার বাড়ীতে থাকে। সব রকম কাজকর্ম করে।

মামার বাড়ীতে যেতে যেতে রাস্তায় মদনদার মুখে শুনলাম, ছোটমামা নাকি বেশ কিছুদিন যাবৎ গোয়েন্দা হবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে।

একথা শুনে আমার আর দিদির খুব আনন্দ হলো। কারণ এবারের গরমের ছুটিটা তাহলে বেশ ভালোই কাটবে।

তা আমি মদনদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মদনদা ছোটমামা গোয়েন্দা হবার

জন্যে কি কি করছে?'

—কি করছে না তাই বল? বর্তমানে তিনি পৃথিবীর সব বিখ্যাত ডিটেকটিভদের বুদ্ধি ধার করে জাঁদরেল ডিটেকটিভ হতে চেষ্টা করছেন। তেনার সামনে এখন আর হাঁ করার উপায় নেই। মনের কথা তিনি টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে পটাপট চোর ছ্যাচ্চোড় ধরে ফেলার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মদনদার কথা শুনে আমার দিদি শর্মিলা অবাক হয়ে বলল, 'বল কি গো?'

—কি আর বলছি! আরো খবর শুনলে তো তোমাদের চক্ষু একেবারে ছানাবড়া হয়ে যাবে। আমি বললাম—'বল না মদনদা আরো কি খবর আছে?'

—কি আর বলব, আমাদের পাড়ার কালীবাবু কয়েকমাস আগে বেশ মোটা টাকা ঘুষ খেয়ে নাথ বাবুর ছেলে মলয়কে কোলিয়ারীতে একটা চাকরি করে দিয়েছেন, ব্যাস! তোমাদের ছোটমামা সেই গোপন খবর টেনে হিঁচড়ে বের করে সব ফাঁস করে দিয়েছেন।

—তা কালীবাবুর কি হলো?

—কি আর হবে! আমরা কি আর সে রকম দেশে বাস করি গো, যে অন্যায়ের বিচার হবে। কালীবাবু কদিন লজ্জায় বাড়ী থেকে বের হননি। তারপর কদিন যেতে না যেতেই আবার বুক ফুলিয়ে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছেন।

এসব কথা বলতে বলতে আমরা মামার বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম। মাল-পত্তর নামিয়ে আমি আর আমার দিদি শর্মিলা ছোটমামার ঘরের দিকে ছুটে গেলাম।

গিয়ে দেখি ছোটমামার ঘরে চুনকাম করে বেশ বড়সড় একটা মড়ার মাথা আঁকা রয়েছে। আর ঘরের মাঝখানে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সাহেবী কায়দায় ছোটমামা পাইপ টানছেন। তাঁর চোখে মুখে গভীর চিন্তার ছাপ যেন কিলবিল করছে। মুখ গম্ভীর। চোখের দৃষ্টি শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ।

আমি আর দিদি ঘরের মধ্যে ঢুকবো কি ঢুকবোনা ভাবছি, এমন সময়ে দিদি আমায় আস্তে আস্তে বলল দেখ ভাই ছোটমামার সাথে কিন্তু একদম ফচকেমি করিস না। তাহলে কিন্তু আমাদের দু'জনকেই দূর করে দেবে।

—আরে নানা! আমার ঘটে কি একটুও বুদ্ধি নেই? তুই আমাকে কি ভাবিস বলতো? ছোটমামা কী আর সেই ছোটমামা আছে নাকি? এখন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ ছোটমামা।

যাক্ অবশেষে আমি আর দিদি আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। একবার আমরা মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম। অথচ আশ্চর্য ছোটমামা যেন আমাদের দেখেও দেখতে পেল না। অথচ তাঁর চোখ ছিল আমাদের দিকে আর মন চলে গিয়েছে হয়তো অন্য কোথাও। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের যেমন হয় ঠিক তেমনি।

আমি আর দিদি বেশ কিছুক্ষণ বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের কি করা উচিত তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তারপর দিদি আমায় ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ রে ছোটমামা ওরকম শার্লক হোমসের মতো পাইপ পেল কোথায়?'

—হয়তো কোন লাট সাহেব টায়েবের কাছ থেকে গ্যাঁড়া মেরেছে।

—নারে গ্যাঁড়া নয় ওই দেখ ইজিচেয়ারের পাশে টিপয়ের ওপরে টেবাকো টিন আর

একটা লাইটারও রয়েছে।

—তাহলে হয়তো পাইপটা কিনেছে। কারণ এত সব তো একসাথে গ্যাঁড়া মারা যায় না।

আমি এতক্ষণ ছোটমামাকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করছিলাম। তাঁর দৃষ্টি ছিল শূন্যে। তাই আমাদের দিকে তাকিয়েও আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। যাই হোক, আমাদের ছোটমামা যে একজন উঁচুদরের মানুষ হয়ে উঠেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমি ছোটমামার দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে ছোটমামার দিকে এগোলাম। আমার দেখাদেখি দিদিও আমার পিছন পিছন এগিয়ে এলো। আশ্চর্য তবুও ছোটমামার চোখের পাতা পড়লো না। স্থির অপলক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল।

তারপর আমি, দিদি আর এগোতে সাহস পেলাম না। যদি হঠাৎ রেগে যায়। তাই ঘরের এক ধারে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ ঘরের একধারে আলনার মধ্যে একটা গরম স্যুট ঝুলতে দেখলাম, সঙ্গে একটা ফেল্ট হ্যাটও টাঙানো রয়েছে।

এসময়ে ছোটমামা হঠাৎ নড়েচড়ে বসে উঠলেন 'হ্যাঁ এতক্ষণ পর একটা গিঁট খুলেছে। আর একটা গিঁট ব্যাস!

এ কথাগুলো উচ্চারণ করেই ছোটমামা আবার চিন্তার সাগরে ডুব দিল।

এসব ব্যাপার-স্যাপার দেখে দিদি আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। ও আমায় কি জিজ্ঞেস করবে তা আমি আগেই জানতাম তাই প্রশ্ন করার আগেই বললাম, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এরকমই হয়, ওনারা যখন ভাবেন তখন গভীর ভাবেই ভাবেন। তখন তাদের কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না। চল এখন আমরা স্নানটান করে একটু খেয়েদেয়ে নিই। তারপর বিকেলবেলা যা হোক কিছু একটা করা যাবে।

দিদি আমার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে সেটাই ভালো হবে।

তারপর আবার বিকেলবেলা ছোটমামার ঘরে গিয়ে দেখি সেই একই অবস্থায় চুপচাপ বসে আছে। কিছুক্ষণ পর দেখি হঠাৎ ছোটমামা 'ইউরেকা-ইউরেকা-মিল্ গ্যায়া' বলে ইজিচেয়ার ছেড়ে দু'হাত তুলে আনন্দে নাচতে শুরু করলো।

এসব দেখে আমি আর দিদি ভয়ে জড়সড় হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। হায় হায় হায় ছোটমামা কি শেষে পাগল হয়ে গেল।

হঠাৎ ছোটমামা লাট খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দুটো গিঁট খুলে গেছে আর একটা। তারপরই খপ্—

একথা বলেই ঝট্ করে আমার হাতটা চেপে ধরলো। এ অবস্থা দেখে আমি বললাম, 'ব্যাস আসামী ধরা পড়ে গেছে।'

ছোটমামা বললেন, 'আলবাত ধরা পড়ে গেছ। তুমিই ডাঃ বাবুর সাইকেলের টায়ারটা চুরি করেছো।'

—তবে আর কি। জেলে পুরে দাও।

—দেবো মানে এক্ষুণি দেবো।

—ভালোই হল আসল মামার বাড়ী না থেকে পুলিশ মামার বাড়িতেই এবারের

গরমের ছুটিটা কাটিয়ে যাই।

মামার বাড়ি শুনে সেই অতি পরিচিত হাসি হেসে আমার আর দিদির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও তোরা এসে পড়েছিস? স্কুলের গরমের ছুটি পড়ে গেছে?'

—হ্যাঁ। এই গতকাল পড়েছে।

—তোদের কথাই আজকে রাত্রে ভাবতাম।

আমি বললাম, 'কি ভাবতেন।'

—হ্যাঁ ভাবতাম, মানে ফিউচারটেন্স, কতদিন তোদের কথা একেবারেই ভাববার সময় পাইনি, চার দিকে যা চুরি ডাকাতি চলছে, এই সময় যদি দেশের কথা না ভেবে তোদের কথা ভাবি , তাহলে তো দেশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

দিদি বলল, 'ধ্বংস হয়ে যাবে কেন?'

—আরে বোকা মেয়ে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে না!

একজন যদি ক্রিমিনাল তৈরী হয় তাকে যদি সমাজে সকলের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তাহলে তো সে আরো ক্রিমিনাল তৈরী করবে। এরকম ভাবে সারা দেশের লোক সব ক্রিমিনাল হয়ে উঠবে। উঃ, সে একটা ভয়ানক ব্যাপার।

আমি বললাম, 'তুমি কি এর বিহিত করতে চাইছো।'

—চাইছি মানে! দিনরাত এই নিয়েই তো ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। দেশের এ রকম দুরবস্থায়, দেশের অন্য লোকের মতো তো আমি স্বার্থপরের মতো হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না।

—সত্যিই তো।

—সত্যি মানে। দেশের প্রতি আমার তো একটা নৈতিক কর্তব্য আছে।

ছোটমামার এসব কথা শুনে দিদি বলল, সত্যি ছোটমামা তোমার মতো যদি এ দেশের প্রতিটা লোক হতো তাহলে এই দেশ সোনার ভারত হয়ে পারতো।

—যা বলেছিস।

আচ্ছা একদিন তোমার অ্যাসিসটেন্ট হিসাবে আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে নাকি?

—দেবো মানে তুইই তো আমার অ্যাসিসটেন্ট হবার যোগ্য লোক। আর ভাগ্নেগুলোতো সব ল্যাবেনডিস।

দিদি ছোটামামাকে বলল, 'আচ্ছা ছোটমামা তোমার এসব স্যুট ফেলট্ হ্যাট, তামাক খাবার পাইপ এসব আবার কবে কিনলে?'

গতবার একটা কাজে দিল্লীতে গিয়েছিলাম সেখান থেকে আসবার সময় এসবগুলো কিনে আনলাম।

আমি ছোটমামার কথা শুনে বললাম, 'তুমি এসব পড়ে শার্লক হোমসের মতো বিখ্যাত গোয়েন্দা হতে চাও বুঝি?'

—কারেক্ট! এই না হলে আমার ভাগ্নে। বুঝলি বিল্টু, গোয়েন্দা হবার আগে যদি গোয়েন্দার ড্রেসটাই না ঠিক করলাম তাহলে আর কি হল।

—দিদি বলল, 'সত্যিই তো!'

—আর তাছাড়া ঐসব ড্রেস যদি না পরি তাহলে ঠিক মেজাজই আসে না। আমি ছোটমামার কথার রেশ টেনে বললাম, 'আর মেজাজটা যদি না আসে শার্লক হোমসের মতো জটিল কেসের কুলকিনারাও করতে পারবে না।'

আমার একথা শুনে ছোটমামা বলল, 'সত্যি বিল্টু তোর চিন্তাশক্তির কোন জবাব নেই।'

একথা বলে ছোটমামা একটু বাথরুমে গেল।

এই ফাঁকে আমি তোমাদের ছোটমামার কিছু গুণের কথা বলে নিই। আমার ছোটমামার মত খুব কম লোকই সাজিয়ে গুছিয়ে গম্ভীর ভাবে গুল মারতে পারে। যেমন কিছুদিন আগে আমাদের বাড়ীতে একবার বেড়াতে গিয়েছিল। সেবার গিয়ে বলল, ছোটমামা ১৯০৩ সালে যখন স্কটল্যাণ্ডের ইয়ার্ড শহরে ছিল তখন নাকি শার্লক হোমসের স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েল নাকি আমার ছোটমামার জুনিয়ার হিসেবে বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন।

ব্যাস আর বললাম না। আশাকরি তোমাদের বিষম লেগেছে। হাতের সামনে জলের গ্লাস থাকলে একটু জল খেয়ে নাও।

ইতিমধ্যে মদনদা আমাদের তিনজনের জন্যে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে জলখাবার, ছোটমামার ঘরে এনে হাজির করেছে।

ছোটমামা বাথরুম থেকে এসে এতসব খাবার দাবার দেখে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

তারপর বেশ রসিয়ে রসিয়ে লুচি আর আলুরদম খেতে খেতে বলল, 'তোরা সব এলি বলে আমি খাওয়া-দাওয়ার একটু সময় পেলাম। নাহলে তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার চব্বিশ মিনিটও সময় নেই।

এই তো তোরা সবাই গরমের ছুটিতে আসবি বলে আমি এই গোয়েন্দাগিরি কাজে একমাস ছুটি চেয়েছিলাম কিন্তু তা আর হল না। এখানে এক কোলিয়ারির বড় সাহেব আমায় ডেকে বললেন যে, 'আপনি যদি এ সময় ধানবাদ ছেড়ে একমাস বাইরে গিয়ে থাকেন তারপর একমাস পর এসে দেখবেন, চোরেরা ধানবাদের সমস্ত কোলিয়ারি গুলোই চুরি করে আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে চলে গেছে।"

ব্যাস হয়ে গেল। আমার ছুটি নেওয়া হলোনা। আর তাছাড়া তোরা তো জানিস আমি আবার কারো কাকুতি-মিনতি একদম উপেক্ষা করতে পারি না।

—হ্যাঁ ঠিকই তো তোমার তো আবার দয়ার শরীর।

আমার একথা শুনে ছোটমামা একেবারে আনন্দে গদগদ হয়ে পড়লো।

—তা আমি মদনদার মুখে শুনলাম তুমি নাকি আজকাল সব সময় সাইকেলের টায়ারের চুরির তদন্তে ব্যস্ত থাকো?

—হ্যাঁ ঠিকই শুনেছিস।

দিদি বলল 'আচ্ছা ছোটমামা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার কি দরকার? তোমার উচিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনালদের পেছনে দৌড়নো। এসব দেশী ছিঁচকে চোর ধরে

তোমার প্রতিভাকে নষ্ট করে দিও না।'

দিদি কথা শেষ করতে না করতেই আমি বললাম 'আর তাছাড়া তোমার আগুারে এককালে শার্লক হোমসের মতো বড় বড় ডিটেকটিভ কাজ করেছেন। আর তুমি কি না...।

আমার আর দিদির কথা শুনে ছোটমামা বার খেয়ে একেবারে টইটম্বুর হয়ে গিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস আমার যা ট্যালেন্ট আছে....। কিন্তু

—কি কিন্তু!

—একটা কথা জানিস শর্মিলা, দুনিয়ার সব বড় বড় চোর ডাকাত সবাই কিন্তু প্রথমে এই সাইকেলের টায়ার চুরি করে হাত পাকিয়েছে। তাই তো বিরাট স্মাগলার হওয়ার আগেই এদের একেবারে কচি অবস্থাতেই টায়ার চোরদের বংশ নিঃবংশ করে দেওয়া দরকার।

আমি ছোটমামার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'ঠিক বলেছো ছোটমামা।'

ছোটমামা বলল, 'জানিস, বিল্টু গত সপ্তাহে আমাদের পাড়ার ডাক্তারবাবুর সাইকেলের নূতন টায়ারটা চুরি গেছে। এই চুরির তদন্ত নিয়ে আমি এ' কদিন খুব ব্যস্ত। আর তাছাড়া ডাক্তারবাবুর সাইকেলের টায়ার চুরি যাওয়া মানে জনগণের ক্ষতি হওয়া।

—দিদি ছোটমামার কথার মানে বুঝতে না পেরে বলল, আচ্ছা ছোটমামা ডাক্তারবাবুর টায়ার চুরি যাওয়া মানে জনগণের ক্ষতি একথা বললে কেন?

—আরে পাগলী বুঝলি না। ডাক্তারবাবুর সাইকেল যদি না থাকে তাহলে রুগীদের পায়ে হেঁটে দেখতে যেতে পারবেন না। রুগীরা তখন বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন। এ ক্ষতি সমস্ত জনগণের ক্ষতি। তার মানে গোটা জাতির ক্ষতি। উঃ অসম্ভব ব্যাপার। এ অবস্থায় প্রতিটি ভারতবাসীর উচিত সংঘবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো।

ছোটমামার এরকম বৈপ্লবিক কথাবার্তা শুনে এ সম্পর্কে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিতে উঠছিলাম। কিন্তু দিদি আমার হাত ধরে বসিয়ে দিল।

আমি ছোটমামাকে বললাম, 'আচ্ছা ডাঃ বাবুর টায়ারটা কিভাবে চুরি হলো?'

ছোটমামা বললেন, 'কি করে আবার রুগী দেখতে বেরিয়ে সাইকেলটা আমাদের বাড়ির সামনে ঐ জলের ট্যাঙ্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে শিশিরবাবুর মেয়ে সোনাকে দেখতে ছুটেছেন, ব্যাস ওইটুকু সময়ের মধ্যেই হাপিস্ করে দিয়েছে। শুধ্ তাই নয়, চোর ব্যাটা ডাঃ বাবুর সাইকেল থেকে নূতন টায়ারটা খুলে নিয়ে একটা ফাটা টায়ার লাগিয়ে দিয়ে সটকে পড়েছে।'

একথা শুনে দিদি বলল, 'কি সাংঘাতিক' আমি দিদির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চোর ব্যাটা শুধু সাংঘাতিক নয়, লোকটা রসিকও বটে।'

ইতিমধ্যে ছোটমামা খাওয়া-দাওয়া সেরে পাইপ ধরিয়ে স্টাইল করে ফুক ফুক করে টানতে লাগলো।

আমি ছোটমামাকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা ডাঃ বাবুর টায়ার চুরির ব্যাপারে তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?'

আমার প্রশ্ন শুনে ছোটমামা ইজিচেয়ার ছেড়ে শার্লক হোমসের স্টাইলে পায়চারী

করতে করতে বললেন, 'আমার সন্দেহ,' ঠিক বলেছিস। আমার সন্দেহের কথাটা তোদের জানা উচিত। তোরাই তো এখন আমার অ্যাসিসটেন্ট।'

সেবার আমি যখন কলকাতায় গিয়েছিলাম, তখন কলকাতার এক বিখ্যাত ডিকেটটিভের বাড়িতে এক ককটেল পার্টিতে পুলিশ কমিশনার সাহেব আমাকে একটা গোপন কথা বলেছিলেন, যে সুদূর উজবেকিস্তান থেকে একদল ছিঁচকে চোর নাকি চোরা পথে ভারতবর্ষে ঢুকে পড়েছে। দিল্লী, বম্বে মাদ্রাজ আর কলকাতায় চুরি-চামারি সেরে বিহারের দিকে এগুচ্ছে।

তারপর আমাকে কমিশনার সহেব অনুরোধ করে বললেন, 'আপনি তো বর্তমানে বিহারে আছেন। যদি আপনার সময় হয় তাহলে ঐ ছিঁচকে চোরের দলকে একটু অ্যারেস্ট করতে চেষ্টা করবেন। আর তাছাড়া আপনার তো ডিটেকটিভ হিসেবে ভীষণ নাম-ডাক।'

দিদি বলল, 'তারপর তুমি কি বললে ছোটমামা?'—আমি আর কি বলব গম্ভীর মুখে শুধু বললাম, ঠিক আছে আপনার কথাটা আমার মাথায় রইলো।

তারপর ধানবাদে আসবার পর কমিশনারের কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু মাসখানেক আগে ডাঃ বাবুর সাইকেলের টায়ার চুরি হওয়ার পর থেকেই সেই কমিশনারের বলা ছিঁচকে চোরের দলের কথা মনে পড়ে গেল।

আমি বললাম, 'তাহলে তোমার কি ধারণা সেই ছিঁচকে চোরের দল বর্তমানে বিহারে প্রবেশ করেছে?'

—আলবাত করেছে। না হলে এই ছোট্ট শহরে এত চোর ছ্যাঁচ্চোড় এলো কোথা থেকে।

দিদি বলল, 'আচ্ছা মামা দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে এই কোলিয়ারীতে চোরেরা কি মধু পেল?'

—কি জানি।

তার পরদিন সকালবেলা জলখাবার খেয়ে আমাদের নিয়ে ছোটমামা টায়ার চুরির তদন্তে বেরিয়ে পড়লো। ছোটমামার পরণে কোট-প্যান্ট, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, হাতে ছড়ি, মুখে পাইপ চোখে কালো চশমা। একেবারে ডিটো শার্লক হোমস। ছোটমামাকে দেখে চেনার আর কোন উপায় নেই।

তখন গরমকাল। সে মাসের শেষাশেষি। ধানবাদে তখন ১০০ গরম। ওই গরমে ছোটমামার পরণে কোট প্যান্ট দেখে আমার আর দিদির ঘাম ঝরতে লাগলো।

আমি আর সহ্য করতে না পেরে বললাম, 'ছোটমামা এই প্রচণ্ড গরমে কি করে এই কোট প্যাণ্ট পরে বেরলে। গরমে যে তোমার শবীরটা একেবারে গলে যাবে।'

আমার কথা শুনে ছোটমামা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'নারে পাগল। জানিস না বিষে বিষে বিষক্ষয়। গরমকালে গরম স্যুট পরলে গায়ে কোন রোদ লাগবে না। এসব অবশ্য তোদের মতো ছোটমামার কাজ নয়। এসব বিজ্ঞানের কথা। ওসব থাক, আমার সাথে আয়। আমাদের টায়ার চুরির তদন্ত শুরু হবে ঐ জলের ট্যাঙ্কের নীচ থেকে। কারণ ঐখান থেকেই সাইকেলের টায়ারটা চুরি হয়েছিল।

pathagar.net

তারপর আমরা সবাই জলের ট্যাঙ্কের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ এইখানেই সাইকেলটা রেখে ডাঃ বাবু শিশিরবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। এইটুকু সময়ের মধ্যে নতুন টায়ার খুলে নিয়ে আবার একটা ফাটা টায়ার লাগিয়ে দেওয়া কি সম্ভব।

প্রশ্নটা আমার মনে বার বার উঁকিঝুঁকি মারলেও ছোটমামাকে বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কে জানে হঠাৎ হয়তো আমার ওপর রেগে গিয়ে আমাকে অ্যাসিসটেন্ট থেকেই বরখাস্ত করে দেবে।

ইতিমধ্যে দিদি ঘাসের ওপর থেকে কয়েকটা পোড়া বিড়ি কুড়িয়ে বলল, 'পেয়েছি, ক্লু পেয়েছি ছোটমামা এই দেখ কয়েকটা পোড়া বিড়ি এখানে পেয়েছি।'

ছোটমামা দিদির হাত থেকে বিড়ির টুকরোগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করে বলল, 'তাহলে চোরের দল আগে থেকেই প্ল্যান করে এখানে এসে অপেক্ষা করছিল। তারা আগে বাড়িতে রুগী দেখতে আসবেন।' ব্যাস হয়ে গেল।

আমি বললাম, 'কি হয়ে গেল?'

—দেখবি কি হয়ে গেল। এখন থেকে আমাদের সব সময় সজাগ থাকতে হবে যে কোন চোর বিড়ি খাচ্ছে কি না। যদি খায় তাহলেই তাকে খপ্ করে।

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে ছোটমামা বলল, 'শর্মিলা ঐ পোড়া বিড়ির টুকরোগুলো ফেলে দে। ওতে কোন কাজ হবে না। কারণ এ কোলিয়ারীতে সব শালাই বিড়ি খায়। সুতরাং সরষের ভেতরে ভূত খুঁজে লাভ নেই।'

আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম 'লাভ নেই মানে?'

—না কোন লাভ নেই। কোন কথা না বাড়িয়ে তুই আর শর্মিলা আমাকে স্রেফ ফলো করে যা।

অগত্যা আমি আর দিদি ছোটমামাকে ফলো করে চললাম। কিছুদুর এগিয়ে হঠাৎ ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখ ঐ লোকটা যে সাইকেলটা চেপে আসছে, মনে হচ্ছে সাইকেল টায়ারটা নতুন না!

—হ্যাঁ একেবারে নিউ ব্র্যাণ্ড।

লোকটা কাছে আসতেই ছোটমামা তাকে হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

তারপর তাকে বলল, 'আমি আপনার সাইকেলটা একটু দেখতে চাই।'

—তা দেখো। লেকিন আপকা মতলব কেয়া হ্যায় পহলে তো বাতাও।

ছোটমামা তার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, 'মতলব সেটা এক্ষুণিই টের পাবে বাছাধন।'

ছোটমামা ঐ লোকটার সাইকেলের টায়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে তাকে একের পর এক প্রশ্ন করে চললো।

—কতদিন আগে তুমি এই সাইকেলের টায়ার কিনেছো?

—এই এক মাহিনা হবে।

—হুম। তা না হয়ে যাবে কোথায়, তা ইতিমধ্যে তোমার সাইকেলের টায়ার ফাটে নি।

—নেহি তো!

pathagar.net

—ঠিক বলছ তো? না হলে.....

—জরুর। আচ্ছা আপ পুছতা হ্যায় কিউ? তুম ইয়ে সাইকেল খরিদ করেগা?

—না। দেখছি তুমি আমাদের ডাঃ বাবুর সাইকেলের নতুন টায়ারটা গেঁড়িয়েছো কি না।

—'গেড়িয়েছো' মানে কি আছে।

—কুছ নাহি। যাও এ যাত্রায় বেঁচে গেলে। হাতে নাতে যেদিন ধরতে পারবো সেদিন টের পাবে বাছাধন। কত ধানে কত চাল হয়', বিহারীটা ছোটমামার কোন কথার মানে না বুঝে হাসতে হাসতে সাইকেল চেপে চলে গেল।

তারপর একটু এগোতেই মদনদার সাথে আমাদের দেখা। ছোটমামাকে দেখে মদনদা হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, 'জানেন বীরপাড়ার লক্ষ্মীবাবু তাঁর সাইকেলের পেছনের চাকায় একটা নতুন টায়ার লাগিয়েছেন। আমি ডাঃ বাবুর টায়ার চুরি গেছে বলতেই আমার ওপর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

তারপর আমি চলে আসছি, এমন সময় ওনার পাশের বাড়ির সলিলবাবুর সাথে আমার দেখা। আমি লক্ষ্মীবাবুর এরকম অস্বাভাবিক আচরণের কথা জানাতেই উনি বললেন, 'রাগবে না! যেদিন ডাঃ বাবুর টায়ার চুরি হয়েছে সেদিনই তো ওনার সাইকেলের পেছনের চাকায় নতুন টায়ার দেখলাম।

মদনদার মুখে এসব কথা শুনে ছোটমামা আমায় আর দিদিকে নিয়ে বীরপাড়ায় সলিলবাবুর বাড়ীর দিকে রওনা দিল।

pathagar.net

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সলিলবাবুর বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম। তারপর সলিলবাবুকে নিয়ে লক্ষ্মীবাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম।

সলিলবাবু লক্ষ্মীবাবুর নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করতেই লক্ষ্মীবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

তারপর বললেন, কি হয়েছে? সলিলবাবু ফোঁস করে উঠে বললেন, 'কি আর হবে? ডাঃ বাবুর সাইকেলের টায়ারটা চুরি করে নিজের সাইকেল লাগিয়ে তো বেশ ঘুরছেন। সে ব্যাপারেই আপনার কাছে এরা এসেছেন।'

সলিলবাবুর কথাশুনে লক্ষ্মীবাবু একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তারপর বললেন, 'কি আমি ডাক্তারবাবুর টায়ার চুরি করেছি?' সলিলবাবু বললেন, 'আলবাত করেছেন। নাহলে আপনার সাইকেলে নতুন টায়ার এল কোথা থেকে?'

একথা শুনে লক্ষ্মীবাবু আরো রেগে গেলেন। এসব দেখে ছোটমামা ওদের ঝগড়া থামিয়ে কুল পায়না।

তারপর ওরা দু'জনে শান্ত হলে ছোটমামা ওস্তাদি হাসি হেসে বললেন, 'দেখুন লক্ষ্মীবাবু আমাদের ডাঃ বাবুর সাইকেলের টায়ার চুরি হয়েছে এটা যেমন সত্য ঘটনা তেমনি আপনি সে কথা শুনে ভীষণ রেগে গেছেন, সেটাও সত্য ঘটনা। আপনি যদি রেগে না যেতেন তবে আমার সন্দেহ গলে পাতলা হয়ে যেত। কিন্তু তা যখন হল না তখন সন্দেহ যে আমার ঘনীভূত ও দৃঢ় হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং আপনাকে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

লক্ষ্মীবাবু আবার বরিশালের লোক। ওনার স্বভাবে একটু ঝগড়া করার টেনডেন্সি আছে। ছোটমামার এসব কথা শুনে তিনি আবার বারুদের স্তূপের মতো ফেটে পড়লেন।

তারপর বললেন, 'আমি চোর আমাকে তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তা তুমি কোন্ হরিদাস পাল।

ছোটমামাকে হরিদাস পাল বলাতে ছোটমামার মুখের হাসিটা নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আমি বেগতিক দেখে লক্ষ্মীবাবুর কাছে গিয়ে বললাম, 'আমাদের ছোটমামা টায়ার চোর ধরার জন্যে শার্লক হোমস সেজেছেন দেখছেন না?'

একথা শুনে লক্ষ্মীবাবু রেগে গিয়ে ভেতরে এক হাঁক মেরে বললেন, 'পুঁটির মা আমাদের রামদা নিয়ে আস দেখি। আজ শালা শার্লক হোমসের বাচ্চার দেহ থেকে মুণ্ডুটাই আলাদা করে দি।'

একথার পরই আমি ছোটমামার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ভয়ে একেবারে মুখ শুকিয়ে গেছে।

তারপর আমি ছোটমামার কাছে গিয়ে কানেকানে বললাম, 'চল এই ফাঁকে কেটে পড়ি কারণ লক্ষ্মীবাবু একে বরিশালের লোক তার ওপর আবার হাতে রামদা, বুঝতেই পারছো উনি এখানে রক্তগঙ্গা না বইয়ে ছাড়বেন না।'

আমি ছোটমামার হাত ধরে নিয়ে দৌড়তে লাগলাম। কিছুদূর দৌড়েই হোঁচট খেয়ে ছোটমামা পড়ে গেল। তারপর অনেক কষ্ট করে তুলে নিয়ে আমি আর দিদি কোন রকমে বড়িতে নিয়ে এলাম।

ছোটমামা যখন এসে বাড়ীতে পৌঁছাল তখন ছোটমামার পরণে আণ্ডারওয়ার ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আর হাত পায়ের যা অবস্থা, সেকথা না বলাই ভালো। হাত পা কেটে একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা।

মদনদা তাড়াতাড়ি করে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলো।

ডাঃ বাবু আসা মাত্রই ছোটমামা বলল, 'ভাববেন না ডাক্তারবাবু আপনার টায়ার চুরির কিনারা করে তবে ছাড়বো।

তবে আমার নাম.....'

ডাঃ বাবু ছোটমামার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন,—'না আমার সাইকেলের টায়ার তো চুরি যায়নি। আমার গোটা সাইকেলটাই বদলাবদলি হয়ে গিয়েছিল।'

আমি বললাম, 'তার মানে?'

—তার মানে আর কি। আমি ভুল করে আমার সাইকেলটা রেখে ডাবু গোয়ালার সাইকেলটা নিয়ে গিয়েছিলাম। গত পরশুদিন ডাবু গোয়ালা আমার সাইকেলটা ফেরৎ দিয়ে ওর সাইকেলটা ফেরৎ নিয়ে এসেছে।'

একথা শুনে ছোটমামার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। যাও একটা টায়ার চুরির কেস পেয়েছিল সেটাও হাতছাড়া হয়ে গেল।

বেচারা ছোটমামা!

ছবি চুরির রহস্যভেদ

কমলেন্দু সরকার

রাত দশটা। হাড় হিম করা ঠাণ্ডা। ক'দিন ধরেই তাপমাত্রা নেমে গেছে মাইনাসে। সকলেই ঘরের মধ্যে ঘর-গরম করা যন্ত্রটা লাগিয়ে দিয়েছে। না হলে এই ঠাণ্ডা সহ্য করা মুশকিল।

তিতলি কিন্তু এই ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়েছে। অথচ চাম্বাতে আসবার কথাই ছিল না তার। এত রাত্তিরে অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। শুধু ঠাণ্ডাটুকু ছাড়া পাহাড়ি এলাকায় মানুষজন খুব ভাল এবং সৎ।

জানুয়ারির শেষের দিকে তিতলি এসেছিল দিল্লি বেড়াতে। অলকানন্দায় তার বন্ধু উত্তমা থাকে। চাকরি করে এক নামী ইংরেজি দৈনিকে।

উত্তমাদের কাগজেই বেরিয়েছিল খবরটা। চাম্বার এক মিউজিয়াম থেকে চুরি হয়েছে দু'টো কাংড়া পেন্টিংস। একটি-দ্য এক্সপেরিয়েন্সড হিরোইন, ১৮২৫ সালের। অন্যটি-লাভ ইন আ গার্ডেন প্যাভেলিয়ন, ১৮১০ সালের। ছবি দু'টির শিল্পী হলেন-সুরদাস। খবরটি উৎসাহিত করেছিল তিতলিকে। কারণ, বহুদিন হতে কাজ নেই। সময় কাটছে আলস্যে।

তিতলি প্রেসিডেন্সি থেকে অর্থনীতি নিয়ে পাশ করে। এম এ করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু ওর ঝোঁক রহস্যে। তাই অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দিয়ে হয়েছে প্রাইভেট গোয়েন্দা। এ লাইনে বেশ নাম-ডাকও হয়েছে তিতলির।

চেহারাটাও বেশ তিতলির। মাঝারি গড়নে একটু ছেলেদের মতো। জিনসের ট্রাউজার আর গেঞ্জি পরে সে। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। চট্ করে দেখলে মেয়ে বলে বোঝা যায় না। ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছে। আর রাইফেল শুটিং-এ ইউনিভার্সিটি ব্লু। খুব চৌখস মেয়ে। আর ধনী পরিবারের মেয়েও বটে। ওর বাবা বিখ্যাত শিল্পপতি ধীরেন বসু। আজ সকালে দিল্লি থেকে বাসে এসেছে চাম্বা। এসে খুব ভাল লাগছে তিতলির। কেন না, প্রকৃতি এখানে উজাড় করে দিয়েছে দু'হাত ভরে। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। তারই মাঝে সবুজ উপত্যকা চাম্বা। পাশ দিয়ে দুরন্ত নদী রবি। তার উচ্ছ্বাসের শব্দ শোনা যায় বহুদূর থেকেই। আর এই সুনসান হিমেল রাতে রবি যেন আরও বেশি চমক জাগায়।

তিতলি ঘুরতে ফিরতে এসে বসল নদীর ধারে কাফেটাতে। কাফে বন্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে কর্মচারীরাও। তবে একা নয় তিতলি। আজ দুপুরেই আলাপ হয়েছে হরিয়ানাবাসী বাঙালি তরুণ তমাল ঘোষের সঙ্গে। অল্প দিন হল জেলাশাসক হয়ে তিনি এসেছেন চাম্বায়।

তমাল চান না খবরটা রটে যাক। তাই তদন্ত সারতে চান গোপনেই। তিতলির পরিচয় পেয়ে তাই সে বেজায় খুশি। এঁর কাছে ছবি চুরির বিবরণটা পুরোপুরি পেয়ে গেল তিতলি। এবং সে জানিয়ে দিল তমাল পুলিশকে যেন ওর গোয়েন্দাগিরির কথা কিছু না বলে।

হোটেলে ফিরল তিতলি। তখন প্রায় রাত বারোটা বাজে। আলাপ হল মিস্টার কাপুরের সঙ্গে। উনি তখন লবিতে বসে আলোচনা করছেন পরের দিনের শুটিং সম্পর্কে। সকাল বেলা হোটেলের ঘর বুকিং-এর সময় ওঁকে দেখেছিল সে। রিসেপসন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে লবি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন ওঁর আকর্ষক চেহারাটা নজরে পড়েছিল তিতলির। এবং তমালবাবুর কাছ থেকে সব শুনেছে মিস্টার কাপুর সম্পর্কে। উনি একজন নামী পরিচালক। এখানে এসেছেন হিমালয় নিয়ে একটা টিভি সিরিয়ালের শুটিং করতে।

কথা বলে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হল ভদ্রলোককে। এবং বেশ পড়াশোনা-জানা লোক। বছর পাঁচেক হল এসেছেন ছবির জগতে। তাঁর প্রথম ছবিটা পরিচালকের প্রথম ছবি হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছে। এটিই হল ওঁর প্রথম টিভি সিরিয়াল। কথার পিঠে কথা বলতে গিয়ে তিতলি জানতে পারল, মিস্টার কাপুর একজন ভাল সংগ্রাহকও বটে।

ঘরে ফিরে এসে জামা কাপড় বদলে শুতে গেল তিতলি। নানা ভাবনা মাথায় এল। তমালের কাছেই সে শুনেছে, যে ছবি দু'টি চুরি হয়েছে তা প্রথমে দেখতে পায় রামদাস। সে গ্যালারি খুলতে গিয়ে দেখে ছবির জায়গাদুটি ফাঁকা। তারপর ও মিউজিয়ামের কিউরেটার শর্মাজীকে জানায় ব্যাপারটা। শর্মাজী খবরটা শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন

এবং উনি জানিয়েছিলেন যে কাল বিকেলের দিকে শেষ দর্শক হিসেবে একজন দেখেছিলেন। ব্যাপারটা যাতে চাউর হয়ে না যায় তাই পুলিশকে আর তমালবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন তদন্তটা গোপনে সারতে। তবুও দিল্লির কাগজের এক সাংবাদিক এটা জানতে পেরে ঘটনাটা খবর করে দেয়।

রাত করে ঘুমোলেও, বেশ সকালেই উঠে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে তিতলি। চারিদিকে সুন্দর মোহময় প্রাকৃতিক পরিবেশ। দূরে কোথাও কোথাও রয়েছে তুষার পাহাড়। তার ওপর সার দেওয়া পাইন গাছ। জগিং করতে করতে দেখতে পেল তিতলি লক্ষ্মী-জর্নাদন মন্দিরের এক কোণে দাঁড়িয়ে মিস্টার কাপুর। সঙ্গে আর একজনও রয়েছে।

পিছন থেকে তমালের গলা শুনে থমকে দাঁড়াল, সে একটু রামদাসের সঙ্গে কথা বলতে চায়। আর মিউজিয়ামটা ঘুরতে চায়। এ পাশ-ওপাশ ঘুরে কাফেতে এসে বসল ওরা দু'জন। নানা গল্প করে সময় কাটিয়ে দু'টি কাজই সেরে হোটেলে ফিরল তিতলি।

দু'দিন হল কোনও খোঁজ নেই তিতলির। হোটেলেও কিছু বলে যায়নি। অথচ ঘরটা তার নামেই বুকিং আছে এখনও। কি হল? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তমাল দেখল সন্ধ্যা ক্রমশ নেমে আসছে। ঠাণ্ডাটাও বাড়তির দিকে আজকে। তার ওপর ফিল্মের পার্টিটাও রয়েছে সাতটায়। অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটা দিল তমাল হোটেলের দিকে।

আজ সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কাপুর সায়েব—মিউজিয়ামের দারোয়ান রামদাস থেকে শুরু করে জেলা-শাসক তমাল ঘোষ পর্যন্ত। কারণটা, সকলেরই সমান সহযোগিতা তিনি পেয়েছেন শুটিং-এর ব্যাপারে।

পার্টি চলছিল হোটেলের রিসেপসন কাউণ্টার পেরিয়ে খোলা জায়গাটায়। সকলেই যে যার দল বেঁধে গল্পে মত্ত। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল তিতলি। তাকে দেখতে লাগছে ঝোড়ো কাকের মতো। তাকে একটি বেয়ারা বলল পার্টির ব্যাপার। মিস্টার কাপুর তিতলিকে দেখতে পেয়ে আমন্ত্রণ জানালেন পার্টিতে।

তিতলি ঘরে ফিরে ফ্রেশ হয়ে এল পার্টিতে। তখন তাকে দেখে তমালের হাতে চাঁদ পাওয়ার অবস্থা। তিনি তিতলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন পুলিশ অফিসার হরবন্স সিংহের সঙ্গে। পার্টি শেষ হলে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল তমাল, হরবন্স, রমেশ কাপুর, রামদাস আর শর্মাজীকে।

ঘরে সকলকে বসিয়ে একটা বড়মত শক্ত খাম বের করল তিতলি। তার মধ্যে থেকে দুটো ছবি বার করে রামদাসের চোখের সামনে তুলে ধরল সে। বলল, 'দেখিয়ে তো এ পেন্টিংসে আপকো মালুম হ্যায়?' রামদাসের মুখ তখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। হরবন্স সিংহ তার দিকে উত্তেজিতভাবে এগিয়ে যেতেই, হাত তুলে ওর দিকে যেতে নিষেধ করল তিতলি।

তিতলি বলল, 'হি ইজ ইনোসেন্ট। আমি জানি কে ছবি দু'টো সরিয়ে ছিলেন। তবে পুলিশ অফিসারকে অনুরোধ করব ব্যাপারটা উনি যেন গোপন রাখেন। এবং তাঁকে যেন গ্রেফতারও করা না হয়। কারণ, উনি একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক এবং তাঁর ব্রাইট প্রসপেক্টও রয়েছে। আর ছবি দুটো যখন অতি সহজেই উদ্ধার করা গেছে, তখন আর জল ঘোলা করে কি লাভ।

শুটিং-এর এক ফাঁকে ছবি দুটো সরিয়ে ছিলেন মিস্টার কাপুর। কেননা, ওনার বাতিক রয়েছে ছবি সংগ্রহের। তাই ছবি দুটো দেখে উনি লোভ সামলাতে পারেননি। আর ওই ছবি দুটো সরিয়ে উনি রেখেছিলেন লক্ষ্মী জনার্দনের মন্দিরের এক কোণে। পুরো ব্যাপারটা দেখে ফেলেন রামদাসজী। তারপর এক ফাঁকে ছবিগুলোকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলেন রামদাস। পরে শর্মাজীর পরামর্শে ওগুলো রেখে আসেন তিনি কাংড়ায় তাঁর গ্রামে।

মিস্টার কাপুর অত বড় লোক বলে ওনারা ভয়ে কিছু বলতে পারেননি। সিনেমার দলটি চলে গেলে আবার যথাস্থানে রেখে দিত ছবি দুটো। পুরো ব্যাপারটা রামদাস তার বাবাকে বলে ছবি দুটো বাড়িতে রেখে দেন। এবং ছবিগুলোর ব্যাপারে রামদাসের একটু সেন্টিমেন্টও ছিল। কারণ, সুরদাস ছিলেন ওঁদেরই পূর্বপুরুষ। আর রামদাসের বাবা কৃষ্ণদাসও হলেন একজন বেশ বড় মাপের কাংড়া শিল্পী। আমি রামদাসের কাছেই জানতে পারি ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা। দু'দিনে যা যা ঘটেছে তার পুরো বিবরণ দিল তিতলি।

রমেশ কাপুর ধরা পড়ে গিয়ে মাথা নিচু করে বসে আছেন। তাঁর মুখ লজ্জায় ও অপমানে লাল। তিতলি পরিবেশটা হালকা করে দেবার জন্য বলল, দেখুন মিস্টার কাপুর, বই আর শিল্পীসামগ্রী চুরি করা খুব একটা অপরাধযোগ্য নয়। তাহলে অনেক বড় বড় মানুষই তো অপরাধী। তবে এই ছবিগুলো তো জাতীয় সম্পত্তি, তাই এটা আপনার উচিত হয়নি।

pathagar.net

আবার সকলকে চমকে দিয়ে আর একটি কাজ করল তিতলি। আর একটি কাংড়া—পেণ্টিং বার করে উপহার দিল কাপুরসায়েবকে। বলল এটা পুরনো নয়, নতুন। রামদাসজীর বাবার আঁকা। তবে আপনার ঘর সাজাবার কাজে লাগবে। এবং সংগ্রহেও রাখবার মতো ছবিটি। তিতলির একান্ত অনুরোধে ছবিটি মিস্টার কাপুর নিলেন।

ওইদিন রাতে হালকা বরফ পড়েছিল চাম্বায়। ওই বরফ পড়া রাতেই সকলে বেরিয়ে এলেন সবুজ উপত্যকা চাম্বার রাস্তায়। তবে তমাল যাবার সময়ে বলে গেলেন, অনেক ধন্যবাদ মিস্ বোস। আরও দু'দিন থেকে যান এখানে আমার অতিথি হয়ে। আর কালকে চলুন ভারমোর থেকে ঘুরে আসি। কেননা, আমার বউ কদিন ধরেই বলছে ভারমোর যাবার কথা। তিতলি খুব খুশি এই বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণে।

কেননা ও উত্তমার কাছে শুনেছে ভারমোর হল ভারতের সুইজারল্যাণ্ড।

বাঘের চামড়া গেলো কোথায়

মৃদুলকান্তি দে

শেখর আর তাপুই ঘুম থেকে উঠতেই মামা বললেন, কাল রাত্তিরে বিরাট অঘটন ঘটে গেছে।

কী হয়েছে, মামা? শেখর বলল।

মহারাজা ক্লাব থেকে নব্বই বছরের পুরনো বাঘের ছাল চুরি হয়েছে। মামা চোখ বড় বড় করে বললেন।

মহারাজা ক্লাব কোথায়? তাপুই জিগ্যেস করল বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে। এটা তাপুইয়ের স্বভাব। উত্তেজিত হলে সে দাঁড়িয়ে পড়বে সটান।

মামা চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, সেকি! কুচবিহারের মহারাজা ক্লাবের কথা শুনিস নি?

ঠিক তখনই ঝংকার দিয়ে উঠলেন রাঙা মামি।—মহারাজা ক্লাবের কথা এখন না বললেও হবে। ছেলে দু'টো ঘুম থেকে উঠেছে, এখনো দাঁত ব্রাশ করেনি। কখন খাবে ওরা?

শেখর আর তাপুই মামির ঝংকার শুনে বিছানা থেকে নেমে পড়ে। শেখর আর তাপুই দুই বন্ধু। শেখরের বয়স চোদ্দ, তাপুইয়ের বারো। শংকরপ্রসন্ন চৌধুরী বহুবছর কুচবিহার শহরে রয়েছেন। গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি এসেছে শেখর সঙ্গে বন্ধু তাপুই। ওরা কাল সন্ধেয় এসে পৌঁছল।

খাবার টেবিলে বসে শেখর বলল, তাপুই গেট রেডি। দারুণ একটা তদন্ত করা যাবে।

শেখর আর তাপুইকে গরম লুচি বিতরণ করতে এসে মামি কথাটা শুনলেন। তদন্ত করা যাবে?—তোরা কি চোর ধরবি? সরু চালের পায়েস ভর্তি বাটিগুলো এগিয়ে দিয়ে মামি জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, মামি। তদন্ত করব। তদন্তর শেষে আমরা চোর ধরব। শেখর বেগুনভাজা দিয়ে লুচি পুরল মুখে।

সে কি' গোয়েন্দাদপ্তরে কাজ করিস নাকি তোরা? মামি রীতিমত অবাক হলেন। মামিকে আবার চমকে দিয়ে তাপুই বলল, দু'বছর আগে আমরা শিলং গিয়েছিলাম তদন্তের কাজে।

ছোটদের কথা শুনে মামি ঠোঁট টিপে হাসলেন। আজকাল ছোটরা মনের কল্পনাটা এমনভাবে প্রকাশ করবে, শুনে মনে হবে, সত্যি কথাটা বলছে। খোঁজ নিলে বা একটু জেরা করলেই আসল কথাটা বেরিয়ে আসে। শেখর আর তাপুইয়ের তদন্তমূলক কথাগুলো নিছক কাল্পনিক সংলাপ মনে করে মামি আরো মজা পেলেন।

আর দু'টো লুচি দেবো?

না, মামি। শেখর হাত বাড়িয়ে বলল।

সেকি! যারা তদন্তের কাজ করে, তারা খুব সাহসী হয়, তোদের লুচি খেতেই ভয়!

মামি কথাগুলো মজা করে বললেন। তাপুইও লুচি বেশি নেবে না। খাবার পর্ব তাড়াতাড়ি শেষ করে ওরা ওপরতলায় উঠে গেলো মামার খোঁজে।

শেখর আর তাপুই দোতলায় উঠে দেখল, জানালার পর্দা তুলে মামা বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

শেখর ডাকল, মামা।

মামা তর্জনী তুলে—ইশারা করলেন, চুপ। শেখর আর তাপুই জানালার কাছে মামার পাশে এসে দাঁড়াল।

মামা বললেন, ওই যে লালরঙের বাড়িটা দেখছিস, ওটা মহারাজা ক্লাব।

তাপুই বলল, মামা, পুলিশ কুকুর নিয়ে এসেছে?

বিরাট বাগানের মধ্যে দৌড়দৌড়ি করছে পুলিশের কুকুর। উৎসাহী মানুষজন ভিড় করে সেটাই দেখছে। টেনিস-কোর্ট, ক্রিকেট খেলার জায়গা, শাল সেগুন গাছ সব রয়েছে এগারো বিঘা জমি নিয়ে তৈরি ক্লাব চত্বরে। ইতিহাস বলছে, মহারাজা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪০ সালে।

কুকুরটা মহারাজা ক্লাবের গেটের দিকে ছুটে আসতেই ভিড়-করা লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। মানুষজন যেভাবে ছুটে ছুটে সরে যাচ্ছে, হঠাৎ মনে হবে, পুলিশ বুঝি লাঠিচার্জ করেছে। গেটের বাইরে এসে রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল

pathagar.net

নিকষ-কালো কুকুরটা।

আচ্ছা মামা, একটা বাঘের ছাল চুরি হয়েছে বললে, বাঘের ছালটা কোথায় ছিলো? শেখর ঝানু গোয়েন্দার মত জিজ্ঞেস করল।

মামা নাকে নস্যি টেনে বললেন, মহারাজা ক্লাবের যে ঘরটায় বিলিয়ার্ড বোর্ড আছে, সেই ঘরটার দেয়ালে বাঘের ছালটা কাচ-ঢাকা বাক্সে টান টান করে রাখা ছিলো।

কাচের বাক্সটা চুরি হয়েছে? তাপুই জানতে চাইল।

না। মামা বললেন, নিপুণভাবে কাচ কেটে বাঘের ছালটা বের করে চোর সরে পড়েছে।

শেখর আর তাপুই পরস্পরের দিকে তাকালো। রহস্য জমাট বাধলে যেমন ছমছম অন্ধকার অনুভব করা যায়, ওরা সেরকম অন্ধকার সুড়ঙ্গ দেখতে পেলো। এই সুড়ঙ্গ দিয়েই এগোতে হবে।

মহারাজা ক্লাবে বাঘের ছাল কী করে এলো, মামা? শেখরের খুব কৌতূহল।

মামা এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। মামার চোখের দৃষ্টি বাইরে। মামা বললেন, একসময় শিকার খেলাধুলার পর্যায়ে পড়ত। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ শিকার ভালোবাসতেন। আসাম এবং ডুয়ার্সের জঙ্গলে তিনি বন্ধু-অতিথিদের সঙ্গে শিকারে বেরোতেন। ১৮৭১ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত তাঁর শিকারের দিনলিপি থেকে দেখা যায় মহারাজ বাঘ শিকার করেছিলেন ৩৬৫ টি।

তাপুইয়ের চোখ কপালে উঠে গেলো। শেখর এক পা সরে এসে মামার কাঁধে হাত রাখল। মামা হাসলেন, তোরা ভয় পেয়ে গেলি? আরো শুনবি? শিকারের তালিকায় আছে ৩১১ টি চিতা, ২০৭ টি গণ্ডার, ১৩৩ টি ভাল্লুক।

মামা আমাদের মহারাজা ক্লাবের ভেতরটা দেখিয়ে আনবে? শেখর আবার বলল। আসলে রহস্য উন্মোচনের একটা অদম্য কৌতূহল দু'টি কিশোরকে নেশার মত টানছে। পুলিশ চলে গেছে। কুকুরও।

ওরা মহারাজা ক্লাবের ভিতরটা দেখে এলো। পরপর বিলিয়ার্ড-এর ঘর, টেবিলটেনিস খেলার ঘর, তাস খেলার ঘর রয়েছে। বিলিয়ার্ড বোর্ডের দু'পাশে ছোট কাঠের গ্যালারি। অপূর্ব দেখতে। শেখর আর তাপুই বারবার কাঠের ছোট গ্যালারি দু'টো দেখল। একসময় রাজ-মহারাজাদের সমাবেশ ছিলো এখানে। কতো কলরব স্মৃতির মতন চুপ হয়ে আছে খেলার ঘরগুলোতে। বাগানটাও বড় সুন্দর, কতোরকম গাছ।

সুন্দর সুরক্ষিত এতো বড় বাড়ি। এই বাড়ি থেকে নব্বই বছরের পুরনো বাঘের ছাল চুরি হলো? শেখর আর তাপুই ভাবছিলো। ওদিকে শংকরপ্রসন্ন চৌধুরী মহারাজ ক্লাবের ভাইস-প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন গাড়ি বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে। ভাইস-প্রেসিডেন্টের গোঁফ দেখে মনে হবে, বাঘের ছাল কেটে তৈরি। শরীরের গঠনটা এখন, যেন বাস্কেটবল খেলোয়াড়। উনি তর্জনী তুলে শেখর আর তাপুইকে ডাকলেন। কোন্ খেলা বেশি পছন্দ? ফুটবল না ক্রিকেট? ভাইস-প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন। গম্ভীর গলার স্বর। যেন মেঘের গর্জন।

ক্রিকেট। শেখর বলল।

তোমার?

ক্রিকেট। তাপুই বলল।

কুচবিহারের মহারাজা ভূপবাহাদুর জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ রনজি ট্রফির খেলায় বাংলা দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। ক'বার? ভাইস-প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

শেখর আর তাপুই পরস্পরের দিকে তাকালো। দুজনেই বলল, জানিনা।

দু'বার। মহারাজা ক্লাব তো দেখলে, কেমন লাগলো? মোটা গোঁফের দুইপ্রান্ত যেন ফুঁসে উঠবে, ভাইস-প্রেসিডেন্ট কঠোর ভাবে তাকালেন।

ভালো। খুব সুন্দর। শেখর বলল।

এর আগে মহারাজা ক্লাবে চুরি হয়েছিলো। তাপুই বলল?

ভাইস-প্রেসিডেন্ট অ্যামবাসেডর গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন।—হ্যাঁ, হয়েছিলো। সেবার বাইসনের দু'টো মাথা চুরি হয়েছিলো।

শেখর বলল, চোর ধরা পড়েছিলো সেবার?

হ্যাঁ। ভাইস-প্রেসিডেন্ট বলিষ্ঠ দু'টি হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে কথা বলছেন?

—সেবার চুরির জন্য ধরা হয়েছিল মহারাজার একজন চিকিৎসকের পুরনো ভৃত্যকে।

ভৃত্যটি এখন কোথায়? তাপুই বলল।

ভৃত্যটি অনেকদিন নিখোঁজ।

তাপুই আর শেখর মামার সঙ্গে মহারাজা ক্লাব থেকে বেরিয়ে এলো। শেখর বলল, মামা, রাজবাড়ি যাবো। মামা বললেন, রাজবাড়ির ভিতরে তো যেতে দেবে না। রাজপ্রাসাদ বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে।

বাস থেকে নেমে ওরা মামার সঙ্গে হেঁটে গেলো রাজপ্রাসাদের কাছে। অটল পর্বতের মত বিশাল রাজপ্রাসাদ। তাপুই শেখর অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে। সামনে বিরাট ফাঁকা জমি রাজবাড়ির মাঠ।

পিয়ার্সন সুরিটার নাম শুনেছিস? মামা বললেন।

হ্যাঁ। বিখ্যাত ধারাভাষ্যকার। শেখর বলল।

আমি আনন্দমঠ ছবিতে পিয়ার্সন সুরিটার অভিনয় দেখেছি। তাপুই বলল।

পিয়ার্সন সুরিটা রাজবাড়ির মাঠেও খেলে গেছেন। লালা অমরনাথ, পিটার রিচার্ডসন, জয়সীমা, নবাব পাতৌদি, বিজয় হাজারে, চুনি গোস্বামী খেলে গেছেন রাজবাড়ির মাঠে। কুচবিহারের মহারাজা ছিলেন খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষক। ক্রিকেটের উন্নতির জন্য মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ সে সময় সাসেক্স থেকে জর্জ কক্স এবং জো ভাইনকে কুচবিহার নিয়ে এসেছিলেন, ভাবা যায়? কিংবদন্তীর মত শোনাবে। মামা নাগাড়ে বলে যাচ্ছেন। শেখর তাপুই খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে।

হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল। রাজবাড়ির দক্ষিণদিকে এলে, চোখে পড়ল একটি শীর্ণ নদী। শেখর তাপুই দেখল, খানিকটা হাঁটলে নদীর কাছে সহজেই যাওয়া যায়। ওরা মামাকে বলল, নদীর কাছে যাবে।

নদী হেঁটেই পারাপার করা যায়। পায়ের পাতা—ডোবানো জল। এরকম নদীর কাছে এসে শেখর তাপুই উচ্ছ্বাসিত হয়ে পড়ে। মামাকে ওপারে একলা রেখে ওরা বালকসুলভ

চাপল্য আবেগে নদী পেরিয়ে ওপারে গেলো। মামা নদীর পারে বসে আছে, হাতে নস্যির কৌটো। মামা দু'একবার হাঁক দিয়েছেন, বেশিদুর যাস না।

শেখর তাপুই নদী পেরিয়ে একটা টিবির উপর উঠল। টিবির ঢাল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ছোট একটি কুটির। রাজপ্রাসাদ, পাশে নদী, নদীর পারে ছোট কুটির, বেশ তো। শেখর তাপুই কুটিরের সামনে গিয়ে দেখল, ভিতরে একজন গেরুয়া-পোষাক-পরা জটাধারী লোক ঘুমুচ্ছে। ঘরের ভিতরে একটি ঘটিতে জল। এ ছাড়া আর কিছু নেই। লোকটির ডান হাতের মুঠোয় একটি কাগজ না? মাথা নীচু করে শেখর তাপুই খোলা দরজা দিয়ে দেখল, তিরতির হাওয়ায় লোকটার মুখভর্তি দাড়ি শিরশির কাঁপছে।

তাপুই ফিসফিস করে বলল, শেখর, ওই কাগজটা কি, দেখবি?

শেখর হাত বাড়িয়ে খুব সাবধানে লোকটার মুঠো থেকে কাগজটা টেনে বের করে নেয়। কাগজটা খুলে দেখে, লেখা ঃ

কর্কশ ডাক।

সম্মানের পরের দুই

ঘি খাব।

কী মজা। এবার শুই।

পদ্যটা পড়েই শেখর আঙুলে টুসকি বাজালেন। তাপুই বললো, বুঝেছি। এখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ানো ঠিক হবে না। জটাধারী জেগে উঠলেই, সর্বনাশ হবে। রহস্যের জাল কেটে আসল অপরাধীকে ধরা যাবে। ভাবতেই শেখর আর তাপুইয়ের মন আনন্দে ভরে ওঠে। ওরা ছুটল। পা-ডোবানো জলে হেঁটে তাড়াতাড়ি নদী পেরলো। টিবিটার জন্য কুটির দেখা যাচ্ছে না। খুব শিগ্গিরি কাজটা সারতে হবে। জটাধারী জেগে যদি দেখতে পায় কাগজটাই উধাও, তবে সব চেষ্টা পণ্ড হয়ে যেতে পারে।

গাছের ভাঙা শুকনো ডালপালা কুড়োন একটি বাচ্ছার সঙ্গে মামা কথা বলছিলেন। শেখর তাপুই ছুটতে ছুটতে গিয়ে মামাকে বলল, মামা, কুইক, দৌড়াও। শংকর প্রসন্ন অবাক হলেন। শেখর তাপুই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে। বাঘ তাড়া করেছে নাকি! শংকরপ্রসন্ন চিন্তিত হলেন। তিনি দ্রুত পা ফেলে হাঁটতে থাকেন।

রাজবাড়ির বাইরে দুটো কামান রাখা আছে। শংকরপ্রসন্ন দেখলেন, শেখর আর তাপুই একটি কামানের মুখে চোখ রেখে কী দেখছে।

শংকরপ্রসন্ন কাছে এসে দাঁড়ালেন।

তোদের কি বাঘে তাড়া করেছে? অ্যাঁ। মামা বললেন।

বাঘ না। বাঘের ছাল। শেখর বলল।

কামানের মুখে শেখর আর তাপুই চোখ রেখে দেখছে কামানের ভিতরটা। আনন্দ উত্তেজনায় দু'টি কিশোর তখন রোমাঞ্চিত। শেখর হাত বাড়িয়ে কাগজটা মামাকে এগিয়ে দেয়। মামা ভ্রূ কুঁচকে পদ্যটা পড়লেন। একবিন্দু বুঝতে না পেরে ধৈর্য্যচ্যুতি হলো তার—আমাকে খুলে বল, কী হয়েছে?

মামা, বাঘের ছাল। তাপুই বলল।

দু'টি কিশোর কামানের মুখে মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কামানের ভিতরটা ওরা

অমন আগ্রহ নিয়ে দেখছে কেন? এবার শংকরপ্রসন্ন ক্ষেপে উঠলেন। সর সর—বলে শেখর তাপুইকে ঠেলে সরিয়ে তিনি নিজেই চোখ রাখলেন কামানের মুখে।

এতো বাঘের ছাল। অবাক চোখে চেঁচিয়ে ওঠেন মামা।—কী আশ্চর্য! তোরা এর হদিশ পেলি কী করে?

ওই চিরকুটটাতে সব লেখা আছে। শেখর বলল।—চিরকুটটা আমরা পেয়েছি জটাধারী ঘুমন্ত একজন লোকের কাছে। তাপুই বলল।

বারো-চোদ্দ বছরের দু'টো কিশোরের কথা শুনে হেঁয়ালি লাগছে মামার। বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থার প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে মামা কৌটো খুলে নস্যি নিলেন।

মামা চিরকুটটা খুলে ভ্রূ কুঁচকে পড়লেন ঃ কর্কশ ডাক। মানে কা। শেখর বলল।

সম্মানের পরের দুই। মামা দ্বিতীয় লাইনটা পড়লেন।

মানে, মান। শেখর বলল।

হলো, কামান। এবার তাপুই বলল।

শেখর বলল, ঘি খাব? কী মজা। অর্থাৎ বেশ টাকা আছে লোকটার কাছে। ওরকম জীর্ণ কুটিরে দীর্ণ বসন-পরা জটাধারী লোকটার কাছে ঘি খাবার অনেক টাকা থাকবে কেন? মনে পড়ল ভাইস-প্রেসিডেন্টের কথা। রাজবাড়িতে চুরি করত পুরনো ভৃত্য। অনেক দিন নিখোঁজ।

শেখর, এখনো আসল কাজটাই বাকি। হঠাৎ চিৎকার করল তাপুই—জটাধারী লোকটাকে ধরতে হবে।

শেখর তাড়াতাড়ি কামানের গহ্বরে হাত ঢুকিয়ে টেনে আনল বাঘের ছালটি। নব্বই বছরের পুরনো বাঘের চামড়া। মেরুদণ্ড শিরশির করে ওঠে। নিজেদের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। শেখর আর তাপুই মানুষখেকো বাঘের চামড়ায় হাত বুলিয়ে দেখছে। চোখময় আনন্দে উচ্ছ্বসিত।

বাঘের চামড়াটা মামার হাতে দিয়েই শেখর আর তাপুই ছুট দিল।—মামা তাড়াতাড়ি। মামা বলল, তোরা একা একা যাস্ না ওদিকে। দু'টি কিশোর তখন জয়ের আনন্দে বন্ধনমুক্ত। কোনো পিছুটান নেই। টগবগ আনন্দে শেখর আর তাপুই ছুটছে। মামা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলেন। শেখর আর তাপুইকে কিছুতেই ওভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

নদী পেরিয়ে, ঢিবি পেরিয়ে তিনজন এসে পৌঁছালো ছোট কুটিরের কাছে।

বিদ্যুৎগতিতে দরজা টেনে ওরা ঢুকে পড়ে। কুটির শূণ্য। জটাধারী তবে কোথায় গেলো? জনবিরল ধুধু মাঠ। হঠাৎ বিচ্ছিরি কা কা শব্দে একটা কাক উড়ে গেলো কেন? অনাগত কোনো ঘটনার বিপদসূচক সাবধান বার্তা।

মামা ঘেমে ওঠেন। মামা বললেন, এখানে আর দাঁড়াব না। এক্ষুণি চল্। পুলিশকে ফোন করে সব জানাতে হবে।

বাতাস কেটে এক ঝাঁক তীর ছুটে আসছে না? মামা তীক্ষ্ণ চিৎকার করলেন, শুয়ে পড় সবাই। আর এক মুহূর্ত দেরি করলে মাথাগুলো উড়ে যেত। ঢিবির আড়ালে শুয়ে পড়ে তিনজন। এক ঝাঁক তীর নদীর জলে গিয়ে পড়ল ক্ষিপ্রবেগে।

মামা বললেন, শেখর কী হবে এখন? গলার স্বরেই বোঝা যাচ্ছে, মামা বিচলিত

বোধ করছেন। শেখর বলল, মামা, মাথা তুলবে না। তাপুই বলল, বুকে হেঁটে যতদূর যাওয়া যায়, এগিয়ে চলি।—বুকে হেঁটে! কী করে? নিরাপত্তাহীন ব্যাপারটা মামাকে খুব কাহিল করে দিয়েছে। তাপুই শেখর বুকে ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। মামাও।

আবার কি এক ঝাঁক তীর ছুটে আসবে? সুদূর জঙ্গল থেকে কে ছুঁড়ল তীরগুলো! রীতিমতো নদীর ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ওরা পার হলো। জামাকাপড় ভিজে চুপচুপ। ভয়-বিহ্বল বুক আজানা আশঙ্কায় কাঁপছে। বাঘের চামড়া উদ্ধার হয়েছে—আনন্দটুকু ঠিকমত উপভোগ করবার সময় অবাক কাণ্ড ঘটল। তিনজনের মাথা লক্ষ্য করে এক ঝাঁক তীর ছুটে এসেছিলো।

নদী পেরিয়েই ওঁরা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে শুরু করে. তাপুই শেখর আর মামা। পা হড়কে পড়ে যেতে গিয়ে মামা একবার সামলে নিলো নিজেকে। মামার হাতে বাঘের ছাল। এই জিনিসটার জন্যই এতে বিপত্তি। মাথায় একরাশ ধুলো আর ভিজে জামাকাপড় নিয়ে দৌড়নো যায়।

রাজপ্রাসাদের কাছে এসে তাপুই জিজ্ঞেস করল : মামা, রাজবাড়ির কেয়ারটেকারের ঘর কোথায়? ফোন করব পুলিশকে। কেয়ার টেকারের ঘরে ফোন আছে, সব জানানো হলো তখনই।

কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে হাজির। কে বলবে, পুলিশ। চারজন পুলিশ জেলে সেজে এসেছে, হাতে মাছধরার জাল। সাদা পোষাকের পুলিশগুলো মাঠের এক জায়গায় বসল, যেন বিশ্রাম নিচ্ছে। মামা বললেন, ওরা পুলিশ। ফোনে জানিয়েছিলো, ওরকম সাজ পরেই আসবে ওরা। এখন মামার বেশ ভালো লাগছে। অভিযানে যেমন ঝুঁকি আছে, তেমনই মজা আছে। পুলিশ এসে গেছে, ঝুঁকিটা এখন নেই। ফাঁদ পাতা রইল। এখন শুধু অপেক্ষা, ঘুঘু কখন ধরা পড়বে।

একি! রাজবাড়ির কাছে এসে কামানের ভিতরে হাত ঢোকালো কেন লোকটি? নিপাট ভালোমানুষের মত দেখতে একজন ভদ্রলোক। চারজন পুলিশ ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল লোকটাকে। এখানে সাদা পোষাকের পুলিশ রয়েছে লোকটির জানার কথা নয়। কেয়ার-টেকারের ঘরবারান্দার আড়াল থেকে মামা শেখর তাপুই ছুটে এলো।

মামা বললেন, এযে গাড়ির ড্রাইভার ডাব্বু।

পুলিশ ওয়াকি-টকিতে খবর পাঠালো। দশ মিনিট পর পুলিশের জীপ এলো। ডাব্বুকে এক ধাক্কা মেরে পুলিশ বলল, ওঠ্। ডাব্বুকে জীপে তুলে, মাছধরার জালটা ছড়িয়ে দিল ডাব্বুর গায়ে।

মামা বাঘের চামড়াটা দারোগাকে অর্পণ করলেন। দারোগাসাহেব বললেন, শংকরপ্রসন্নবাবু, সন্ধ্যেবেলা মহারাজ ক্লাবে আসুন। শেখর তাপুইয়ের পিঠ চাপড়ে দিলেন তিনি।

—সাবাস, দুই কিশোর গোয়েন্দা। এরপর কী হলো, সন্ধ্যেবেলা গল্পটা বলব। হুস করে জীপ ছেড়ে দিল।

মামা বললেন, ডাব্বুকে আমি চিনি। সে গাড়ির ড্রাইভার। মহারাজ ক্লাবের বাগানে কয়েকটি গ্যারেজ তৈরি করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ডাব্বু এরকম একটি বাগানে

কয়েকটি গ্যারেজে গাড়ি রাখে। রাত্তিরবেলা গাড়ি গ্যারেজে রেখে ডাব্বু ক্যারাম খেলত মহারাজ ক্লাবের বারান্দায়। মনে হয়, কাল সুযোগ বুঝে ও বাঘের চামড়াটা চুরি করেছিল।

শেখর বলল, বুঝেছি। জটাধারী সাধুবাবা হচ্ছে ডাক্তারবাবুর পুরনো ভৃত্য। অনেকদিন নিখোঁজ ছিলো।

তাপুই বলল, এবার আমি বলব। জটাধারী লোকটাই ডাব্বুকে দিয়ে চুরি করিয়েছিল। জঙ্গলের আড়াল থেকে সেই তীর ছুঁড়েছিলো।

হঠাৎ শেখর বলে উঠল, মামা, দোতলা বাস।

মামা বললেন, ভিজে জামাকাপড় পরে আর থাকতে পারছি না। শীতশীত করছে। চল্ বাসে উঠে পড়ি। তিনজন ছুটল। রাজবাড়ির মাঠ থেকে মামা হাত দেখাতেই দোতলা বাস দাঁড়িয়ে পড়ে।

প্রেতের টেলিফোন

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝরাতে টেলিফোন বেজে উঠল ডাক্তার সুধীন দত্তের খাসকামরায়।

ডাক্তার দত্ত রিসিভার তুলে নিয়ে বললেন, 'ইয়েস, দত্ত স্পিকিং।'

'ডাক্তার দত্ত? হ্যাঁ, আমি আপনাকেই চাই!'

ডাক্তার দত্ত বলিলেন, 'হ্যাঁ বলুন, কী চান? কে আপনি? কোত্থেকে কথা বলছেন?

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে প্রচণ্ড একটা হাসির ঝঙ্কার ভেসে এল—বুঝি রিসিভার কেঁপে উঠল। তারপর হাসির ঝঙ্কার মিলিয়ে যেতে-না যেতেই শোনা গেল, কে আমি, জিজ্ঞেস করছেন ডাক্তার দত্ত? কেন, আমার গলার আওয়াজে কি চিনতে পারছেন না?'

না তো! কে আপনি?' ডাক্তার দত্তের কণ্ঠস্বরে মৃদু কম্পন।'

আবার সেই কণ্ঠস্বর আশ্চর্য! স্মৃতিশক্তি আপনার এত দুর্বল! এই তো মাত্র সেদিনের কথা, ভুলে গেলেন এরই মধ্যে? হার্টটা ডাইলেটেড হয়ে গিয়েছিল, না—কিন্তু বড্ড জ্বালা! ডাক্তারবাবু, বড্ড জ্বালা। একটু রিলিফ দিতে পারেন? আমি যে,—

'কে আপনি? মিষ্টার বোস—রবীন বোস?'

ডাক্তার দত্তের স্বরে কাঁপুনি, দেহে কাঁপুনি—তিনি অসহায়ভাবে চেয়ারে বসে পড়লেন, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না!

'হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!'

তীব্র হাসির আবার একটা ঝলক। শাণিত ছুরির ফলার মত সে হাসি ডাক্তার দত্তের বুকে বিঁধল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। চট করে রিসিভার রেখে দিয়ে টেলিফোনের দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত চেয়ে রইলেন। তাঁর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

ডাক্তার সুধীন দত্ত ভীরু নন ; কিন্তু তাই বলে এমন একটা কেউ স্থির থাকতে পারে না। মিস্টার বোস—ওরিয়েণ্ট এঞ্জিনীয়ার্স কোম্পানির একমাত্র মালিক রবীন বোস, যিনি মারা গেছেন আজ সাতদিন মাত্র,—তাঁর মৃত্যুর পর তিনি আজ টেলিফোনে ডাক্তার দত্তের সঙ্গে কথা কইবেন এমনভাবে! এ কখনো সম্ভব হতে পারে?

পরক্ষণেই কি একটা সন্দেহ তাঁর মনে জাগতেই তিনি আবার রিসিভার তুলে নিয়ে এক্সচেঞ্জ-অফিসের সঙ্গে কথা কইতে শুরু করলেন।

তিনি বললেন, 'এইমাত্র আমার নম্বরের সঙ্গে কে কথা বলছিলেন তাঁর নম্বরটা দয়া করে জানাবেন কি?'

সাড়া এল অপর প্রান্ত থেকে : 'কই কেউ তো আপনার সঙ্গে কনেকশন নেয়নি? আজ ভোরবেলা দুটো নম্বর থেকে আপনার নম্বরের সঙ্গে কথা বলেছে বটে, কিন্তু তারপর আর কেউ তো আপনাকে ডাকেনি!'

'কী বলছেন আপনি!' বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে ডাক্তার দত্ত আবার বললেন,—'এই তো পাঁচ মিনিটও নয়, আমার সঙ্গে একজন কথা বলছিলেন!'

'তাহলে মাপ করবেন স্যার, সে খবর আপনিই ভাল জানেন, টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ তার কোন খবর জানে না।' প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সঙ্গে জবাব এল এক্সচেঞ্জ থেকে, আর সঙ্গে সঙ্গে কট করে একটা শব্দ হল। অপারেটর রিসিভার রেখে দিয়েছেন।

ডাক্তার সুধীন দত্ত এবার যেন মৃত্যুর শীতল স্পর্শ তাঁর দেহে অনুভব করলেন! তৎক্ষণাৎ তাঁর খাস-কামরার বাইরে দরজা থেকে টেনে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন।

স্ত্রী তাঁর মুখে-চোখে একটু অস্বাভাবিক ভাব লক্ষ্য করলেন, স্বামীকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন কয়েকবার ; কিন্তু ডাক্তার দত্ত কোন জবাব না দিয়ে ধুপ্ করে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন—আবার সেই মাঝ-রাত্রি। বালিগঞ্জের বিরাট এক প্রাসাদে সহসা টেলিফোন বেজে উঠল।

পরলোকগত এঞ্জিনীয়ার রবীন বোসের ভাইপো, ইন্দু বোস এ-বাড়ির মালিক। ব্যারিস্টারি করে কোনরকমে অতি কষ্টে তাঁর সাহেবি ঠাঁট বজায় রেখেছিলেন। বাপ-পিতামহের বাড়িখানি না থাকলে কত কষ্টই যে তাঁর হত, কে জানে!

ব্যারিস্টার ইন্দু বোস শুয়ে শুয়ে আজ কেবল এই কথাটাই খুব বেশি করে ভাবছিলেন।

কাকা রবীন বোস বিলেত-ফেরতা এঞ্জিনীয়ার। ভাইপোর সঙ্গে তাঁর প্রায় কোন সম্পর্কই ছিল না। দু-জনের দেখাশোনা হত কদাচিৎ! ইন্দু বোস মাঝে মাঝে নিজে থেকে কাকার হোটেলে যেতেন বটে কিন্তু রবীন বোস তাঁর ভাইপোর বাড়িতে কোনদিনই আসতেন না।

কাকার এমন ব্যবহারের পরও ইন্দু বোস মাঝে-মাঝে যাওয়ায় অনেকেই অনেক মন্তব্য করত। কেউ কেউ বলত, 'কাকা তো সারা জীবন বে-থা করলেন না—এত-বড় এঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের তাহলে ভাবী উত্তরাধিকারী হবে এই ইন্দু বোস। এমন সময় সে যাবে বৈকি দু-একবার! সুযোগ পেলে কাকার মুখে একটু-কিছু তুলে দিতে পারে কোন অজুহাতে, সেই সুযোগে কাকাকে একদিনেই পরপারে পাঠিয়ে নিজে মালিক হয়ে বসবে! সে সুযোগ খুঁজতেও তার যাওয়া উচিত বৈকি।

ইন্দু বোস নিজে বলতেন, 'কাকা আমার আজীবন ব্রহ্মচারী—বিয়ে করলেন না—হোটেলে বন্ধুদের নিয়ে দিন কাটিয়ে দিলেন ; আমাদের কোন সাহায্য বা কোন উপকারের তোয়াক্কা তিনি করেন নি! তবু মানুষের শরীর তো! বিশেষ করে এমন পরিশ্রমী! কখন কি ব্যারাম-পীড়া এসে যায়। তা একটু-আধটু আমাদের না দেখলে চলবে কেন? তাই মাঝে-মাঝে আমি যাই।'

ইন্দু বোস তাই মাঝে-মাঝে কাকার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁর হোটেলে আসতেন। রবীন বোস যেদিন মারা গেলেন, সেদিনও বিকালে ইন্দু বোস এসেছিলেন। দু-জনে একসঙ্গে বসে চা-জলখাবারও খেয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দু বোস চলে আসবার খানিক পরেই তাঁর কাকা অসুস্থ হয়ে পড়েন, দেখতে দেখতে 'হার্ট ডাইলেটেড্' হয়ে যাওয়ায় রাত দশটার সময় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

টেলিফোনে খবর পেয়ে ইন্দু বোস ছুটে আসেন। কিন্তু রবীন বোসের দেহ তখন নিমতলা শ্মশানে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য বন্ধুবান্ধবেরা তৈরী। ভাইপো ছুটে গিয়ে কাকার দেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন এবং বালকের মত আর্তনাদে চারিদিকে মুখরিত করে তোলেন।

ডাক্তার সুধীন দত্ত তাঁর শেষ চিকিৎসা করেছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও তিনি তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না। 'হার্ট ডাইলেটেড' হয়ে যাওয়ায় মৃত্যু ঘটেছে বলে সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে ডাক্তার দত্ত তাঁর কর্তব্য সমাধা করলেন।

তবু কেন জানি না, নিমতলা ঘাটের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শবসৎকারে প্রথম কোন অনুমতি দেন নি। বোধহয় মৃতের বিবর্ণ মুখ দেখে তাঁর মনে একটু সন্দেহের উদয় হয়েছিল। যাহোক, অবশেষে প্রধানত ব্যারিস্টার ইন্দু বোসের ব্যক্তিগত আধিপত্যে ও অনুরোধে কাজটি সহজ হয়ে গেল—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শব-সৎকারে অনুমতি দিলেন।

কাকাকে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে ইন্দু বোস যখন বাড়ি ফিরে এলেন, রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—চারটে বাজে।

ইন্দু বোস আজ এইসব কথা ভাবছিলেন ; তাঁর ঘুম হচ্ছিল না। কাকার বিরাট কারখানার একমাত্র উত্তরাধিকারী তিনি। কিন্তু কাকা কোন উইল করে যায় নি তো?—মাঝে-মাঝে দু-একবার এমন একটা সন্দেহ যে তাঁর মনে উদয় হচ্ছিল না, তা নয়।

এলোমেলো কত চিন্তাই তাঁর মনে হচ্ছিল। হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা।

'হ্যালো! কে?' রিসিভার নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'কে আমি, জিজ্ঞেস করছিস? কেন, চিনতে পারছিস নে? তোর আজ হল কী রে ইন্দু? হাঃ হাঃ হাঃ!'

'কে, কে আপনি? কাকাবাবু? আপনি কাকাবাবু কথা কইছেন?'

ইন্দু বোস স্পষ্ট বুঝলেন, কাকা পরলোক থেকে কথা বলছেন টেলিফোনে! কিন্তু এমন ব্যাপারও কি সম্ভব?—তাঁর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে আবার কথা শোনা গেল, কী রে, কাঁপছিস? ভয় করছে তোর? এতে আর ভয়ের কী আছে? সাহস তো কম নয় তোর! এত-বড় এঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের মালিক হয়ে গেলি, তোর কি এখন ভয় সাজে রে ইন্দু! যা চেয়েছিস তাইই তো হয়ে গেল। বিরাট সম্পত্তির তুইই এখন একছত্র সম্রাট। নে, এখন একটা ভাল দিন দেখে দখল নিয়ে নে!'

ইন্দু বোস আর সহ্য করতে পারলেন না। বালকের মত সজল চোখে চিৎকার করে তিনি বললেন, 'কিন্তু এ তো আমি চাইনি কাকাবাবু! আমি তো আপনার বিষয়-সম্পত্তির কিছুমাত্র লোভ রাখিনি! হঠাৎ এ কি হল কাকাবাবু!

আবার একটা প্রচণ্ড হাসি, সঙ্গে সঙ্গে জাগাল বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বর, 'কী হল জানতে চাস? কেন, হার্ট ডাইলেটেড্! যা, গিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস কর, 'হার্ট ডাইলেটেড, মানে কী! বিকেলবেলা একসঙ্গে সবার খানাপিনা হল ; সবারই হার্ট ঠিক রইল, ঠিক রইল না শুধু একজনের! কেমন, এ একটা মজার কথা নয় রে ইন্দু?'

—কাকাবাবু, আপনার ইঙ্গিত আমি বুঝতে পাচ্ছিনে! আপনি কি তাহলে—'

ব্যারিস্টার ইন্দু বোসের কথা সম্পূর্ণ হল না—আবার একটা প্রচণ্ড হাসির ঝঙ্কারে তাঁর কান যেন বধির হয়ে গেল। অপর প্রান্তের অশরীরী বক্তা তখন টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

ইন্দু বোসও এক্সচেঞ্জ অফিসকে ডেকে তখনই বক্তার টেলিফোন নম্বর জানবার চেষ্টা করলেন। তাঁরও সন্দেহ হয়েছিল, কি জানি যদিই বা কারো কোন চালাকি হয়ে থাকে! না হলে, নিজের হাতে যাকে পুড়িয়ে ছাই করে এসেছেন, সে কখনো টেলিফোনে কথা কয়।

এক্সচেঞ্জ-অফিস বিস্ময় প্রকাশ করে জানালো, 'কই সারাদিনে কেউ তো আপনার নাম্বার চায় নি!'

উপর্যুপরি দু-রাতের ঘটনা বিজনবাবুও শুনলেন। বিজনবাবু ছিলেন মৃত রবীন বোসের বাল্যবন্ধু, সহপাঠী এবং ম্যানেজার। এঞ্জিনীয়ার রবীন বোস বিশিষ্ট বন্ধু বিজন সেনকে তাঁর কারখানার ম্যানেজার করে বন্ধুত্বের পুরস্কার দিয়েছিলেন এবং বাসও করতেন দুজনে একসঙ্গে—একই হোটেলে, একই কামরায়। দুজনে এক ভাব ছিল যে, রবীন ও বিজনের বন্ধুত্ব প্রায় প্রবাদের মত সুপরিচিত হয়ে পড়েছিল। অসুখে-বিসুখে একে অন্যের এমনধারা সেবা-শুশ্রূষা করতেন যে, ডাক্তার-নার্সরা পর্যন্ত বিস্ময় বোধ করত।

সেদিন বিকেলে চা-জলখাবার খেয়ে খানিকটা পরেই মিস্টার রবীন বোস যখন সহসা

অসুস্থ হয়ে পড়লেন, বিজনবাবু তখন একেবারে হতভম্ব। ব্যারিস্টার ইন্দু বোস তার একটু আগেই চলে গিয়েছেন ; কাজেই বিজনবাবু বুঝতে পারলেন না, তিনি এখন কী করবেন।

রবীন বোস তখন যন্ত্রণায় বুক চেপে ধরে ছট্‌ফট্‌ করছেন। এমন অবস্থায় বিজনবাবু তাঁকে একা ফেলে যানই বা কেমন করে? যাহোক, অবশেষে হোটেলের অপর একটি বন্ধুকে বলে-কয়ে ডাক্তার সুধীন দত্তের কাছে পাঠিয়ে দেন। ডাক্তার দত্ত দেখেশুনে অভিমত প্রকাশ করলেন, কোন কারণে হার্টডাইলেটেড্‌ হয়ে গেছে। এখন আর তাঁর করবার কিছু নেই, ঘণ্টাখানেক আগে হলে চিন্তা করা যেত।

কথাটা শুনে অবধি বিজনবাবুর সে কী অনুশোচনা! কারণ, রবীনবাবুর অসুস্থ হওয়ার লক্ষণ তো অনেক আগেই প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু বিজনবাবু তাঁর বন্ধুকে একা ফেলে কেমন করে যাবেন, শুধু এই ভাবনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নষ্ট করেছেন অনেকটা সময়। ডাক্তার সুধীন দত্তের কথা শুনে বিজনবাবু নিজেকেই অপরাধী মনে করে সেদিন যেভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন, অমন কান্না বুঝি নিজের ভাইও কখনো কাঁদে না।

বন্ধুর মৃত্যুর পর থেকেই বিজনবাবু যেন একেবারে নির্বাক হয়ে গেছেন! কোনদিন আহার করেন, কোনদিন করেন না। কেবল নির্দিষ্ট সময়ে কারখানায় যাওয়াটি তাঁর ঠিক বাঁধা আছে। কিন্তু সেখানে গিয়েও তিনি প্রকৃতিস্থ থাকতে পারেন না। এখানে সেখানে বন্ধুর স্মৃতি, এমনকি তাঁর হাতে লেখা সামান্য কাগজটুকু দেখলেও তিনি বালকের মত কেঁদে ওঠেন।

ডাক্তার সুধীন দত্ত হোটেলের সকলকে বলেছেন,—শকটা বড্ড লেগেছে ভদ্দরলোকের। এ অবস্থায় অনেকে পাগল হয়ে যায়, কারো কারো পক্ষে আত্মহত্যা করাও অসম্ভব নয়। আপনারা ওঁকে একটু চোখে-চোখে রাখবেন।'

উপর্যুপরি দুটো রাত ডাক্তার সুধীন দত্ত ও ব্যারিস্টার ইন্দু বোসের বাড়িতে যেভাবে মৃত রবীন বোসের বিদেহী আত্মা টেলিফোনে কথা কয়ে গেছে, সে খবর বিজন সেনও শুনতে পেলেন। ডাক্তার দত্ত ও ইন্দু বোস নিজেরাই এসে সবিস্তারে তাঁকে বলেছিলেন। আর তাঁদের দু-জনের কথা থেকেই বিজনবাবু মনে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাঁর বন্ধুটির মৃত্যু তাহলে বুঝি স্বাভাবিকভাবে হয়নি। মৃত রবীন বোসের প্রেতাত্মা নিজেই নাকি এমনি কোন ইঙ্গিত দিয়ে গেছে। ডাক্তারি অভিমত হার্টডাইলেটেড্' কথাটার উপরই নাকি বিদ্রুপ করেছে বড্ড বেশি!

কথাটা শুনে রাগে ও দুঃখে বিজনবাবুর চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। যাহোক, তবু যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করে এই কথাই তিনি হোটেলের বন্ধুদের বলেছিলেন, 'এঁদের কথাগুলো যদি সত্য হয়, তাহলে এর একটা প্রতিকার হওয়া উচিত। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, রবীন যদি কোন ষড়যন্ত্রের ফলেই মারা গিয়ে থাকে, মানে, রবীনের মৃত্যু যদি আসল হয়ে থাকে হত্যাকাণ্ডে, রবীনের আত্মা তাহলে আমার সঙ্গে কথা কয় না কেন? সম্ভবত এ বিষয়ে আমিই সাহায্য করতে পারি সবচেয়ে বেশি।'

আরো দুটো রাত বিনা ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল। বিজনবাবু যেন রোজই শুয়ে শুয়ে তাঁর মৃত বন্ধুর টেলিফোনের আহ্বান প্রতীক্ষা করে রাত কাটান। অবশেষে রাত দুটোর সময় একদিন তাঁরই হোটেলে টেলিফোন বেজে উঠল।

ম্যানেজার রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই জবাব হল, 'মিস্টার বিজন সেনকে দয়া করে

ডেকে দিন। বড্ড জরুরী।

টেলিফোনে ডাকছে খবর পেয়েই বিজনবাবু ছুটে এলেন ; কম্পিত হস্তে রিসিভার তুলে নিয়ে বললেন, 'হ্যালো, বলুন, আমি বিজন সেন।'

ওঃ! বিজন! এসেছ? এত শিগগির আসতে পেরেছ? কেন, ঘুম হয়নি বুঝি? ঘুম হচ্ছে না না, কেমন?

বিজনবাবুর স্বর কেঁপে উঠল। তিনি বললেন, কে? কে কথা বলছ?

হাঃ! হাঃ! হাঃ!'—সেই পরিচিত হাসি, আর এ-হাসির ঝঙ্কারের বর্ণনা বিজনবাবু শুনেছেন ডাক্তার দত্ত আর ইন্দু বোসের কাছ থেকে।

বিজনবাবুর কানের কাছে আবার কে কথা কইল, এখন চিনতে পেরেছ নিশ্চয়! আমি রবি।

হ্যাঁ, বল কী বলতে চাও?

বিজনবাবুর স্বরে অসহায় আত্ম-সমর্পণের ভাব। মুহূর্তে তাঁর সমস্ত শক্তি-সাহস যেন কোথায় উবে গেছে।

জবাব এল, 'কী বলতে চাই? হাঃ হাঃ হাঃ! কেন, তুমি কি তা জান না বিজন? একসঙ্গে খানাপিনা করলুম—তুমি, আমি আর ইন্দু। আমারই হার্টটা ডাইলেটেড্ হয়ে গেল বন্ধু!

বিজনবাবু স্খলিত কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললেন, তা আমি কী করতে পারি ভাই? সে তো ডাক্তারের অভিমত । তুমি—

'চুপ কর! বলতে দাও, সময় আমার বড্ড কম! হ্যাঁ, ডাক্তারের অভিমত, না? কথাটা খুব ঠিক। কিন্তু সেজন্য দায়ী কে? একটু ভেবে বলবে ভাই?'

'দায়ী? দায়ী কে? কেন, তুমি—তুমি—?'

'হ্যাঁ, আমি! আমি তা জানি বলেই বলছি বিজন। বল, এখন তুমি কী বলতে চাও?'

বিজনবাবু এবার আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, রিসিভার হাতে নিয়ে কথা কইতে কইতে বসে পড়লেন। জড়িত স্বরে বললেন, 'কিচ্ছু চাইনে ভাই! আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ক্ষমা কর! মুহূর্তের লোভে যা করে ফেলেছি সেজন্য আমায় শাস্তি দিয়ো না! স্থির করেছি, তোমার জিনিস তোমারই থাকবে, তোমার উইলের সুযোগ নিয়ে আমি তার এতটুকুরও মালিক হতে চাইনে! শুধু আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর রবি!'

সহসা হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে গেল, হাত তাঁর এমন কাঁপছিল। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে!

ঘরের আলোটা হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেল—যেন একটা ভৌতিক কাণ্ড! মাটিতে লুটোনো রিসিভার থেকে তখনো যেন কার বজ্র আহ্বান ফুটে বেরুচ্ছে, 'বিজন!'

বিজন সেন জ্ঞান হারিয়ে মুহূর্তে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

জ্ঞান যখন হল, তখন দেখলেন, তাঁর চারদিকে সশস্ত্র পুলিশের দল। তাদের পুরোভাবে ইনস্পেকটর হেম রাহা, আর এক কোণে বসে আছেন বিখ্যাত ডিটেকটিভ প্রদীপ মিত্র।

বিজনবাবুর জ্ঞান হয়েছে দেখে মৃদু হেসে প্রদীপ মিত্র এগিয়ে এলেন, এবং বিনম্র-

কম্প কণ্ঠে বললেন, ছিঃ বিজনবাবু, শেষকালে রবীন বোসকে বিষ দিয়ে মারবার অপরাধে আপনাকেই গ্রেপ্তার করতে হল? উদার-হৃদয় রবীন বোস মাত্র মাসখানেক আগে আপনার মত একজন বন্ধুকে নিতান্ত বিশ্বস্ত এবং হিতৈষী মনে করে উইলে তাঁর মৃত্যুর পর আপনাকেই তাঁর কারখানার মালিক করেছিলেন। কিন্তু আপনি এমন ব্যবহার করলেন তাঁর সম্পত্তির লোভে? ছিঃ! ছিঃ! অল্প কয়েক দিনের ব্যাপার হলেও এর মধ্যে পুলিশকে আপনি কম হয়রান করান নি!

'প্রথমে ডাক্তারকে সন্দেহ হল, কিন্তু তাঁর কী স্বার্থ? তবু তাঁকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলুম ভৌতিক টেলিফোনের ব্যবস্থা করে। তারপর নেড়ে দেখা হল ব্যারিস্টার ইন্দু বোসকে। কারণ, কোন উইলের অস্তিত্ব না থাকলে রবীন বোসের মৃত্যুতে তিনিই হলেন একমাত্র স্বার্থবান ব্যক্তি—ভাবী উত্তরাধিকারী। তা ছাড়া, সরল বিশ্বাসে সেদিন কাকার সঙ্গে তিনি শেষ খাওয়া খেয়ে গেছেন। তারপর শ্মশান-ঘাটে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী প্রথম সৎকারে অনুমতি দিতে চায় নি। যাহোক, ইন্দু বোস তা সরল বিশ্বাসে ও কর্তব্যবোধ করেছিলেন, তাই তাঁকে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। কিন্তু ভৌতিক টেলিফোনের জবাবে তিনি যেভাবে কথাবার্তা কইলেন, তাতে বুঝতে বাকি রইল না যে কাকার মৃত্যু তিনি কোনদিনই কামনা করেন নি। এরপর প্রয়োজন হল, বিজনবাবু আপনাকে পরীক্ষা করা।

'কলকাতা-টেলিফোন কোম্পানি অবশ্য পুলিশ-কমিশনারের অনুরোধে আমাদের সবরকম সুযোগ দিয়েছিলেন। যে কোন লোকের টেলিফোনের সঙ্গে রেকর্ড থাকত না। আপনার সঙ্গেও তেমনি ভাবে আমি কথা শুরু করি। আপনি তো অপরাধ একরকম স্বীকার করে ফেলেছেন। আর সেই স্বীকারোক্তি মেশিনের সাহায্যে বেমালুম রেকর্ড হয়ে গেছে বিজনবাবু। কাজেই এখন আর আপনার পেছুবার উপায় নেই।

'হোটেলের ম্যানেজারবাবুকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ। আজ পুরো রাতটার জন্য আমরা তার অফিস-ঘর দখল করেছিলুম—গোপনে বন্দোবস্ত করে। আর আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই হোটেলেরই অপর এক মেম্বার মদনবাবুকে।

'রবীন বোসের শবের সঙ্গে যাঁরা শ্মশানে গিয়েছিলেন মদনবাবুও ছিলেন তাঁদের একজন! রবীনবাবুর বিবর্ণ মুখ দেখে তাঁরও সন্দেহ হয়েছিল। তারপর দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেলেও পুলিশকে তিনি তাঁর সন্দেহ গোপনে জানিয়ে কর্তব্য পালন করেছেন।

'মদনবাবুর সাহায্য, টেলিফোন-কোম্পানির সাহায্য আর এই হোটেলের ম্যানেজারবাবুর সাহায্য না পেলে এবং তাঁরা সমস্ত ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষা না করলে আজও আপনি নিশ্চিত থেকে যেতেন বিজনবাবু। যে কৌশল আপনি অবলম্বন করেছিলেন আর রবীন বোসের মৃত্যুর পর যে অভিনয় করেছিলেন, তা খুব চমৎকার হয়েছিল, এ-কথা সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবে।

'যাহোক, আপনার এখন জ্ঞান হয়েছে, অনেকটা সুস্থ হয়েছেন ; এখন সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে হাতকড়িটা পরে নিন মিস্টার সেন। ইনস্পেকটর রাহা, আপনি আপনার কর্তব্য পালন করুন। খুনী আসামীকে কখনো হাতকড়ি-ছাড়া উচিত নয়।'

ইনস্পেকটর রাহা একজোড়া হাতকড়ি নিয়ে বিজনবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন।

বিজন সেনের চোখের সামনে থেকে পৃথিবীর আলো তখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

নিখোঁজ নটরাজ

অজিত পূততুণ্ড

কৌস্তুভ এবার নিয়ে চতুর্থবার বেনারসে এল। কৌস্তুভের মেজ পিসীর বিয়ে হয়েছে বেনারস শহরের চৌধুরী পরিবারে। চৌধুরীরা বেনারসের বনেদী পরিবার। পাঁচ পুরুষ তাঁরা সেখানে বাস করছেন। গঙ্গার কাছেই চমৎকার সাজানো বাড়ি তাঁদের। লোহার গেটটা পেরোলেই বাড়িতেই প্রবেশের প্রশস্ত পথ। পথের দু পাশে মোট চারটি ঘর। বাইরের লোকজন এলে এই ঘরগুলোতেই থাকে।

পথটা একটা খোলা প্রাঙ্গণে গিয়ে মিশেছে। প্রাঙ্গণের ডান দিকে একটি ছোট মন্দির। এই মন্দিরের দেবতা নটরাজ। কষ্টিপাথরে তৈরি নটরাজ মূর্তিটি নৃত্যের ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো। কপালে একটি দামী চুনী বসানো। মূর্তিটি অবিশ্যি খুব বড় নয়, মাত্র পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। তবে খুবই সুন্দর দেখতে।

এক সময় খুব ধুমধাম করে এই নটরাজের পুজো হতো। তখন নটরাজকে অর্ঘ্য না দিয়ে বাড়ির কেউ মুখে কিছু তুলত না। বাড়ির কর্তা অর্থাৎ কৌস্তুভের মেজ পিসীর শ্বশুর মারা যাবার পর থেকেই সে-সব কমতে শুরু করে। প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়ায় মেজ

পিসীর শাশুড়ি বাতে পঙ্গু হবার পর। এখন কেবল নিয়মরক্ষা করার মতো পুজো হয়।

কুলপুরোহিত দু বেলা পুজো করে যায়, আর বাড়ির কাজের মেয়ে প্রতিদিন একবার মন্দিরের ধোয়া-মোছা করে। ব্যাস।

মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণ পেরোলেই চৌধুরীদের ভেতর বাড়ি। ভেতর বাড়ির লম্বা টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে কৌস্তুভের মেজ পিসীর ভাসুর ধৃতিমান চৌধুরীর নিজস্ব ঘর।

ধৃতিমান চৌধুরী একটু খেয়ালী গোছের মানুষ। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই-পত্র পড়তে ভালোবাসেন। বিশেষ করে ফিজিক্সের বই তাঁর খুবই পছন্দ। ফিজিক্স নিয়ে এম. এস-সি, অব্দি পড়েছিলেন, কিন্তু কি খেয়ালে পরীক্ষা দেননি।

বেনারস শহরে চৌধুরীদের বিশাল দোকান। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির। এই দোকান ছাড়াও তাঁদের অন্যান্য ব্যবসা আছে।

ধৃতিমানরা তিন ভাই। ধৃতিমানের ওপর ইলেকট্রনিকসের দোকানের ভার। বাকি দু ভাই অন্য ব্যবসা দেখেন।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে করতেই হালে ধৃতিমানের মাথায় নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার বাতিক প্রবেশ করেছে। আর এই বাতিকের জন্যই ধৃতিমানকে কৌস্তুভের ভালো লাগে। ধৃতিমান চৌধুরীও কৌস্তুভকে ভালোবাসেন খুব।

কৌস্তুভ বেনারসে এসে ধৃতিমানের সঙ্গে ভিড়ে গেল। ধৃতিমান চৌধুরীকে কৌস্তুভ বড়জ্যেঠু বলে ডাকে। যেমন তার পিসতুতো ভাই-বোনরা ডাকে।

কৌস্তুভ এবার এসে দেখল ধৃতিমান চৌধুরী নিজের ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে আছেন। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে প্রায় বেরোন না। কাউকে ঘরে প্রবেশ করতেও দেন না। দুই ভাইকে বলে কয়ে মাসখানেকের জন্য দোকান থেকে ছুটি নিয়েছেন।

ধৃতিমান কিন্তু কৌস্তুভকে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিলেন না। কৌস্তুভকে দেখে বরং খুশিই হলেন। বললেন, 'আরে কৌস্তুভ তুই! আয় আয়। ঠিক সময়েই এসে পড়েছিস।'

ঠিক সময় বলতে বড়জ্যেঠু কি বোঝাতে চাইলেন কৌস্তুভ তা' বুঝল না। ঘরে প্রবেশ করে তার মনে হলো, সে যেন হঠাৎ একটা ফটোগ্রাফারের স্টুডিওতে এসে পড়েছে।

ঘরের এক কোণে একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করানো আছে একটা যন্ত্র। সেটাকে দেখতে কতকটা টেলিভিশন ক্যামেরার মতন। যন্ত্রটার পেটের কাছে একটা লম্বা হ্যাণ্ডেল। বোঝাই যায়, হ্যাণ্ডেলটা ধরে যন্ত্রটার মুখ এদিক-ওদিক ঘোরানো যায়। যন্ত্রটার মুখ চোঙার মতো। এই চোঙা-মুখে একটা লেন্স লাগানো। ক্যামেরার অদূরে একটা ছোট টেবিলের ওপর একটা টেলিভিশন সেটের মতো যন্ত্র। সম্ভবত সেটা একটা মনিটর।

ঘরের মাঝখানে ক্যামেরার চোঙের মুখোমুখি একটা টেবিল। টেবিলের ওপর রাখা টবে লাগানো একটা ফুল গাছ। টেবিলের ওপর গুটি কয়েক সদ্য ছেঁড়া ফুলও পড়ে আছে। তাছাড়া আরো নানা রকম যন্ত্রপাতি ঘরময় ছড়ানো।

কৌস্তুভ ঘরের চারদিক দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বড়জ্যেঠু, ব্যাপার কি? এটা কোনো ক্যামেরা নাকি? ফুলগাছের ছবি তুলছেন?'

কৌস্তুভের প্রশ্নে ধৃতিমান খুব খুশি হলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'তুই ঠিকই ধরেছিস কৌস্তুভ। এটা একটা ক্যামেরাই। তবে আর পাঁচটা সাধারণ ক্যামেরার মতন নয়।'

কৌস্তুভ তাড়াতাড়ি বলল, 'টেলিভিশন ক্যামেরা নিশ্চয়?'

ধৃতিমান বললেন, 'কাছাকাছি গিয়েছিস। তবে পুরোপুরি ঠিক নয়। মানুষের মস্তিষ্কে যেমন স্মৃতি-কোষ আছে, এই ক্যামেরাতেও তেমনি স্মৃতি-ছবি ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে। এবং সেই ছবিও সচল।

কৌস্তুভ বলল, 'স্মৃতি-ছবি মানে?'

ধৃতিমান হেসে বললেন, 'ক্যামেরা মানেই তো ছবি। সুতরাং ক্যামেরার স্মৃতিতে যা ধরা থাকবে তা তো ছবিই হবে। তাকে স্মৃতি-ছবি ছাড়া আর কি বলতে পারি?'

কৌস্তুভ সামান্য অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু যে-কোনো ছবি মানেই তো স্মৃতি, তাহলে!'

কৌস্তুভকে বাধা দিয়ে ধৃতিমান বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে এই ক্যামেরা আলোকতরঙ্গের স্মৃতি থেকে ছবি তোলে কিনা, তাই।'

কৌস্তুভের কাছে ব্যাপারটা কেমন হেঁয়ালি ঠেকল।

ধৃতিমান এবার বললেন, 'তুই ক্যামেরার সামনে দাঁড়া, তোর একটা ফটো তুলি।'

কৌস্তুভ আদেশ পালন করল। ধৃতিমান কৌস্তুভের একটা ফটো তুললেন। পৃথকভাবে ফুলগাছেরও একটা ফটো তুললেন। দুটো পৃথক ফটো তোলা হলো ক্যামেরা বন্ধ করে বললেন, 'এবার তুই গাছ থেকে একটা ফুল তুলে ফ্যাল।'

কৌস্তুভ আদেশমতো গাছ থেকে একটা ফুল তুলে ফেলল। কৌস্তুভের ফুল ছেঁড়া হলে ধৃতিমান নিজেই টেবিলসহ ফুলগাছটাকে সরিয়ে দিলেন এবং ওই শূন্যস্থানের ছবি তুললেন। তারপর বললেন, 'এবার মনিটরের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ আমার ক্যামেরা কি কি ছবি তুলল!'

কথাটা বলেই তিনি মনিটরের একটা বোতাম অন করলেন। মনিটরে প্রথমে কৌস্তুভের ছবি দেখা গেল। তারপর টেবিলের ওপর রাখা টবসহ ফুলগাছের ছবি। এবং শেষে কৌস্তুভের গাছ থেকে ফুল তোলার ছবি। শেষের ছবিটা তিনি শূন্য স্থান থেকে তুলেছিলেন।

কৌস্তুভ অবাক হয়ে বলল, 'অদ্ভুত তো।'

ধৃতিমান বললেন, 'হ্যাঁ, অদ্ভুত। আর এই ছবিকেই আমি স্মৃতি-ছবি বলছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেমন করে এই স্মৃতি-ছবি উঠছে।'

ধৃতিমান সামান্য সময় চুপ করে বলতে লাগলেন, 'আমরা চারপাশে যে-সব জিনিস দেখতে পাচ্ছি তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব মানের আলোকতরঙ্গ প্রতিফলিত করছে। কেবল আলোকতরঙ্গই না, এক ধরনের বস্তুতরঙ্গেরও প্রতিফলন ঘটছে। প্রতিফলিত তরঙ্গের মান অনুসারে আমরা প্রত্যেকের রূপ দেখতে পাচ্ছি।'

একটু থেমে ধৃতিমান যোগ করলেন, 'কোনো বস্তু স্থানচ্যুত হওয়ার পরেও কিন্তু বস্তু থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গের রেশ থেকে যায়, যেমন কোনো গন্ধদ্রব্য সরিয়ে নেওয়ার পরেও গন্ধের রেশ থাকে। আমার এই ক্যামেরা প্রতিফলিত তরঙ্গের এই রেশটুকু থেকে

ছবি তুলতে সক্ষম। তবে তার স্মৃতিতে ওই তরঙ্গের মান সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেমন তোর এবং এই ফুলগাছের তরঙ্গ সম্বন্ধে তার ধারণা হয়েছিল আলাদাভাবে তোলা তোদের ফটো থেকে। সেইজন্য তোর ফুল তোলার ছবিটা সে তুলতে পেরেছে।'

ধৃতিমানের কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে বারান্দায় বেশ একটা হৈচৈ শোনা গেল। বাড়ির সকলে মিলে কি একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করছে।

তখন সকাল সাতটাও বাজেনি। এত সকালে কিসের এত হৈচৈ বুঝতে না পেরে কৌস্তুভ কৌতূহলী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে শুনল, মন্দির থেকে নটরাজের মূর্তি চুরি গেছে।

নটরাদের মূর্তি চুরি! কৌস্তুভের মনটা খারাপ হয়ে গেল।

চৌধুরীদের কুলপুরোহিত মহাদেব ভট্টাচার্যের বয়েস বেশি না। বছর তিরিশ। তার পিতা শিবনাথ ভট্টচার্যের মৃত্যুর পর থেকে এই বাড়িতে পৌরোহিত্যের কাজ করছে। সকালে পুজো করতে এসে সে-ই প্রথম আবিষ্কার করে সিংহাসনে নটরাজ নেই। এবং তারপর থেকেই বাড়িময় হৈচৈ। এদিকে মেজ পিসীর শাশুড়ী কাঁদতে কাঁদতে কেবলই বলছেন, 'এ যে ঘোর অমঙ্গলের চিহ্ন! নটরাজের অন্তর্ধান এ-যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার।'

কথাটা একেবারে মিথ্যে না। চৌধুরী পরিবারের দুশো বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি। নটরাজের অন্য মূল্য যা-ই থাক না কেন এর আর্থিক মূল্যও কম না। প্রথমত, কষ্টিপাথরের তৈরি মূর্তি। দ্বিতীয়ত, দামী চুনী বসানো। কাজেই যে চুরি করেছে, সে এর আর্থিক মূল্যের কথা ভেবেই চুরি করেছে। কিন্তু কে চুরি করতে পারে এবং কিভাবেই বা চুরি করতে পারে?

বেনারসে আসার পরের দিন ধৃতিমানের আবিষ্কার দেখে কৌস্তুভ এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, তার মনে হয়েছিল, বেনারসের আর কোনো কিছু দেখার প্রয়োজন নেই। বেনারসের সেরা জিনিসটিই তার দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু নটরাজের অন্তর্ধানের কথা শোনার পর কৌস্তুভের মনে হলো, আর একবার নটরাজকে না দেখা পর্যন্ত বেনারসের কিছুই দেখা হলো না।

পুলিশে খবর দিলে হয়তো ঝামেলা অনেক কমে যেত। কিন্তু ঠাকুরমা পুলিশকে খবর দিতে দিলেন না। তিনি সজল চোখে বললেন, 'বাবা নটরাজের যা ইচ্ছে তা-ই হবে। তিনি নিজেই গেছেন, তাঁর ইচ্ছে হলে আবার নিজেই ফিরে আসবেন।' তারপর ছেলেদের ওপর সামান্য বিরক্ত হয়েই বললেন, 'তোদের মনে ঠাকুর-দেবতার ওপর ভক্তি শ্রদ্ধা কি আর আছে? আগের মতো নটরাজকে কি আর মানিস? এখন মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানা। তিনি আপনা হতেই ফিরে আসবেন।'

কাজেই ব্যাপারটা ওখানেই থেমে গেল। কৌস্তুভের যুক্তিবাদী মনটা অবিশ্যি থেমে গেল না। সে চুরি যাওয়ার সম্ভাব্য পথ খুঁজতে লাগল।

কৌস্তুভ প্রথমে চৌধুরী পরিবারের লোকজনকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিল। পরিবারের লোকজনকে বাদ দিলে সন্দেহের তালিকায় থাকে তিনজন, যাদের পক্ষে নটরাজ মূর্তি চুরি করা সম্ভব। এই তিনজনের প্রথম জন পুরোহিত মহাদেব ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয় জন নতুন কাজের মেয়ে সৌদামিনী এবং তৃতীয় জন চৌধুরীদের দোকানের এক কর্মচারী গণেশ শর্মা।

নটরাজের মন্দিরে বিশাল তালা দেওয়া থাকে। এই তালার চাবি থাকে ঠাকুরমার ঘরে। ঘরের দেওয়ালে একটা পেরেকে চাবি ঝোলানো থাকে। পুরুতমশাই পুজো করতে এলে বাড়ির কেউ না কেউ ঠাকুরমার ঘর থেকে চাবিটা এনে তার হাতে দেয়। পুরুতমশাই নিজেই তালা খুলে পুজোটুজো করে। যাবার সময় বাড়ির কারো হাতে চাবিটা দিয়ে যায়। চৌধুরীবাড়ির এটাই নিয়ম। মহাদেবের ক্ষেত্রেও এই নিয়মই চলছে।

মহাদেব ভট্টাচার্য অবিশ্যি যজমানিকে পুরোপুরি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেনি। তার আসল পেশা স্কুলে শিক্ষকতা করা। তাছাড়া ভালো গানও জানে। বাবার আমলের দু-একটা পৌরোহিত্যের কাজ বজায় রেখেছে মাত্র। সকাল-সন্ধ্যায় চৌধুরীবাড়িতে সাইকেল চেপে আসে। কাঁধে থাকে একটা সাইড ব্যাগ। সাইড ব্যাগে গামছা এবং টুকিটাকি দু-একটা জিনিস। মানুষটি সম্ভবত একটু ভুলো গোছের। পুজো সেরে প্রায়ই এই সাইড ব্যাগটা নিয়ে যেতে ভুলে যায়। মাঝপথ থেকে ফিরে এসে তালাটালা খুলে আবার সাইড ব্যাগ নিয়ে যায়। কাজের মেয়ে সৌদামিনীও অনেক সময় তালা খুলে মহাদেবের হাতে ব্যাগটা তুলে দেয়। মহাদেব দ্বিতীয়বার আর মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করে না।

গত সন্ধ্যায়ও মহাদেব ব্যাগটা নিতে ভুলে গিয়েছিল এবং সে যথারীতি মাঝপথ থেকে ফিরে এলে সৌদামিনীই তাকে ব্যাগটা বের করে দিয়েছিল। অনেকেই সেটা দেখেছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, মহাদেব যদি নটরাজের মূর্তি চুরি করে থাকে তাহলে গতকাল সন্ধ্যাতেই করেছে। সম্ভবত গায়ের চাদরের আড়ালে নটরাজের মূর্তিটি আগেই লুকিয়ে রেখেছিল। সৌদামিনী সাইড ব্যাগটা বের করে আনার সময় তাড়াতাড়িতে নটরাজের মূর্তি আছে কি নেই সেটা ভালো করে লক্ষ্য করেনি।

আর সৌদামিনী যদি চুরি করে থাকে তাহলে?

সৌদামিনীর বয়েস বেশি না, বছর পঁচিশ। অভাবী, ভদ্রঘরের বিধবা। স্কুলে ক্লাস সেভেন অব্দি পড়েছে। মাত্র মাস দুয়েক হলো চৌধুরীবাড়িতে কাজ করতে এসেছে। কে জানে মনে মনে সে কি পরিকল্পনা করে রেখেছিল? হয়তো সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। গত সন্ধ্যায় তার সামনে সেই সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছিল। মহাদেবের ব্যাগটা বের করে আনার মুহূর্তে অতি দ্রুত নটরাজের মূর্তিটি নিজের আঁচলের নিচে লুকিয়ে ফেলে। হয়তো ইতিমধ্যে তার কোনো আত্মীয় বা কোনো পরিচিত মানুষের হাতে মূর্তিটি পাচারও করে দিয়েছে।

আর বাকি রইল গণেশ শর্মা। সে বছর খানেক হলো চৌধুরীদের ব্যবসায় সেলসের কাজে যুক্ত হয়েছে। গ্রামের ছেলে হলেও খুবই স্মার্ট। হিন্দী তো বটেই, ইংরেজীতেও খুব সুন্দর কথা বলতে পারে। বাংলাও মন্দ বলে না। মাসে একবার গ্রামের বাড়িতে যায়। খুবই উচ্চাভিলাষী ছেলে। অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে পারছে না বলে চৌধুরীদের বাইরের একখানা ঘরে থাকে। অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা হলেই সে চলে যাবে। শরীর খারাপ বলে গতকাল সারাদিন সে ঘরেই শুয়েছিল। অর্থাৎ গতকাল গণেশ শর্মার নটরাজ মূর্তি চুরি করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

মন্দির-প্রাঙ্গণ খুবই নিরিবিলি। গণেশ শর্মা ইচ্ছে করলেই সুযোগ মতো ডুপলিকেট চাবি তৈরি করিয়ে মন্দিরের তালা খুলতে পারে। সাবান অথবা নরম মাটির ওপর চাবির ছাপ তুলে নিয়ে ডুপলিকেট চাবি তৈরি করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার না।

এই তিনজনের মধ্যে আসল দোষী কে তার উত্তর এক মাত্র বড়জ্যেঠুর ক্যামেরা দিতে পারে। মনে মনে কথাটা ভাবল কৌস্তুভ। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন প্রত্যেকের ফটো। এমনকি স্বয়ং নটরাজেরও একটা ফটো প্রয়োজন।

কৌস্তুভের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। একটা গ্রুপ ফটো পাওয়া গেল। দুর্গাপুজোর সময় তোলা। সেই গ্রুপে সৌদামিনী এবং মহাদেবও উপস্থিত ছিল। উপস্থিত ছিল গণেশ শর্মাও। নটরাজের মূর্তির অনেক ছবিই বাড়িতে ছিল, তার একটা সংগ্রহ করল কৌস্তুভ। তারপর ফটো এবং ছবি নিয়ে হাজির হলো ধৃতিমানের ঘরে। ধৃতিমান তখন তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত।

ধৃতিমানের সামনে গিয়ে কৌস্তুভ বলল, 'বড়জ্যেঠু, এবার আপনার ক্যামেরাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু পরীক্ষার আগে আপনার ক্যামেরার স্মৃতি-কোষে এই ছবিগুলোর স্মৃতি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করুন।'

ধৃতিমান প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলেন না। তাই ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন সামান্য সময়। কিন্তু কৌস্তুভের হাতের ছবিগুলো দেখেই সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'চমৎকার আইডিয়া। দেখা যাক কি হয়।'

ধৃতিমান তাঁর ক্যামেরায় গ্রুপ ফটো থেকে প্রত্যেকের পৃথক পৃথকভাবে ফটো তুললেন। ফটো তুললেন নটরাজের মূর্তিরও। তারপর একসময় নিরিবিলিতে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করে নটরাজের শূন্য সিংহাসনের ফটো তুললেন।

এবার মনিটরের সাহায্যে ফটোগুলো দেখার পালা। কৌস্তুভের মনটা কৌতূহল উত্তেজনায় টগবগ করতে লাগল।

মনিটর চালু করতে করতে ধৃতিমান বললেন, 'এই ক্যামরার স্মৃতি কোষ শেষ থেকে শুরু করে। তোমার ফুল ছেঁড়ার ক্ষেত্রে কেবল একটাই ফটো ছিল, তাই ওখানে শেষ থেকে শুরু করার প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু নটরাজের মন্দিরের ক্ষেত্রে তা না হওয়াই সম্ভাবনা। সেখানে একেবারে শেষে নটরাজের মূর্তিটা যে ধরবে প্রথমে তারই ফটো উঠবে। অবশ্য ক্যামেরাকে যাদের ফটো চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কাউকে থাকতে হবে।'

ধৃতিমান মনিটর চালু করলেন। ভিডিও রেকর্ড চালু হলো যেন। প্রথমে গ্রুপ ফটোর সব কটা ফটো পৃথক পৃথকভাবে দেখা গেল। তারপর কৌস্তুভ এবং ধৃতিমানকে অবাক করে দিয়ে পর্দায় ভেসে উঠল মহাদেবের চলমান ফটো। মহাদেব ভট্টাচার্য সিংহাসন থেকে নটরাজের মূর্তি তুলে নিল কিন্তু মূর্তিটি সিংহাসনে আর রাখল না।

মহাদেবের ছবিটা দেখেই কৌস্তুভ বলে উঠল, 'তাহলে মহাদেব ভট্টাচার্যের কাছেই নটরাজের মূর্তি আছে।'

মনিটর বন্ধ করতে করতে ধৃতিমান বললেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু মহাদেব তো তেমন ছেলে না। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত।'

ধৃতিমানের কথা শেষ হতে না হতেই বন্ধ দরজায় টোকা পড়ল। কৌস্তুভ দরজা

খুলতেই ওদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল মহাদেব ভট্টাচার্য। তার পরনে ধুতি, গায়ে সাদা চাদর, কাঁধে কাপড়ের সাইড ব্যাগ।

মহাদেব ঘরে প্রবেশ করে ধৃতিমানের কাছে সরে এসে বলল, 'বড়দা, আপনি কি খুব ব্যস্ত? আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা ছিল।'

ধৃতিমান সহজভাবেই বললেন, 'বলো তোমার কি কথা। কৌস্তুভের সামনেই বলতে পারো। কৌস্তুভ অত্যন্ত রিলায়েবল।'

মহাদেব ধৃতিমানের কথাটা যেন খেয়ালই করল না। সে বিনা ভূমিকাতেই বলতে লাগল, 'এসব ভড়ং ভালো লাগছে না। বাড়ির কারো শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, আন্তরিকতা নেই। কেবল কতগুলো আনুষ্ঠানিক ব্যাপার চলছে। সকাল-সন্ধ্যায় দীপ-ধূপ ধুনো, আর ঘণ্টা নাড়ানো। এসবের কি কোনো মানে আছে? বাড়ির সবাই যে-যার মতো চলছে আর একা নির্বান্ধব পড়ে আছেন নটরাজ। যেন নটরাজ এই বাড়ির কেউ না। তা তিনি যখন এ-বাড়ির কেউই নন তখন তাঁকে হটিয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। বাড়িতে একটা বাইরের মানুষ দু দিন থাকলেও তো বাড়ির লোকজন জিজ্ঞাসা করে, কিগো কেমন আছ? কিন্তু একবারের জন্যও নটরাজের খোঁজ নেয় না কেউ। আমি দু বেলা আসছি, আর দম দেওয়া কলের পুতুলের মতো কাজ করে যাচ্ছি। এসব ভড়ং না?' মহাদেবের গলায় অভিমানের সুর প্রকাশ পেল।

একটু থেমে সে বলল, 'নটরাজকে তাই বলেছি, তুমি কেন অবহেলা সহ্য করে পড়ে থাকবে? তুমি আমার সঙ্গে এই ব্যাগের মধ্যে থাকো। আমি যেখানে যাব, তুমি যাবে। আমি যখন গান গাইব, তুমি শুনবে। কিন্তু গোলমাল বাধালেন এ বাড়ির বড়মা। তিনি বলে বসলেন, নটরাজ নিজের ইচ্ছেতেই গেছেন, ইচ্ছে হলে তিনি নিজেই আবার ফিরে আসবেন। কি গভীর বিশ্বাস একবার ভাবুন তো! তখনই বুঝলাম, বড়মার ওই গভীর বিশ্বাসের জন্যই নটরাজ অন্যদের অশ্রদ্ধা, অভক্তি গায়ে মাখেন না। নিশ্চিন্তে সব মেনে নেন। আমিও তাই মত বদলেছি। ঠিক করেছি ওই বিশ্বাসের সিংহাসনেই নটরাজকে বসিয়ে দেব। আজই। অন্যদিনের মতো সন্ধ্যারতি সেরে চলে যাবার সময় নটরাজকে রেখে দেব। কাল সকালে বড়মা দেখবেন তাঁর বিশ্বাসের জোরে নটরাজ আবার ফিরে এসেছেন।'

কি একটু ভেবে সে আবার বলল, 'আপনাকে কেন এসব বলছি জানেন? বলছি এই জন্য যে, বড়মা যখন থাকবেন না তখন অন্তত আপনার মনে এই বিশ্বাসটুকু যেন থাকে। আপনি সকলের বড়! আর বড়র তো অনেক দায়! বড়র আচ্ছাদনের আড়ালে থেকে ছোটরা প্রায়ই পার পেয়ে যায়। নইলে নটরাজ বড় ব্যথা পাবেন।'

কৌস্তুভ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল মহাদেবের দিকে। এমন অদ্ভুত লোক সে জীবনে দেখেনি। নটরাজ সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলছে যেন সেই কষ্টিপাথরের মূর্তি সত্যিই কোনো জীবন্ত মানুষ।

মহাদেবের কথার উত্তরে ধৃতিমান মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি একটা পাগল ছেলে হে, মহাদেব। এই কথাটা তুমি আমাকে আগেই বলতে পারতে। এত সব কাণ্ড করতে গেলে কেন?'

মহাদেব এবার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনার আপনজনের কথা আমায় মনে করিয়ে দিতে হবে, তারপর আপনি মনে করবেন? এ যে লজ্জার কথা! নটরাজের লজ্জা! এত কালের সম্পর্ক আপনাদের!'

ধৃতিমান এবার সত্যিই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। মহাদেবের একটা হাত ধরে বললেন, 'নটরাজের আর অবহেলা হবে না ভাই। এবারকার মতো তুমি আমাদের মাপ করো। তুমি নিঃশব্দে তাঁকে তাঁর সিংহাসনে বসিয়ে দাও।'

মহাদেবের চোখে-মুখে খুশির আভা ছড়িয়ে পড়ল। তাকে দেখে মনে হলো সে যেন অনেক কিছু পেয়ে গেছে।

পরদিন সকালে নটরাজকে যথাস্থানে দেখে চৌধুরীবাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সবাই এসে জড়ো হলো মন্দিরে। নটরাজের মাহাত্ম্যে সবাই অভিভূত হয়ে পড়ল। সবাই দেখল, আনন্দে মহাদেবের দু চোখে জলের ধারা।

ধৃতিমান এক সময় কৌস্তুভের কানে কানে বললেন, 'আমার ক্যামেরা নিয়ে গর্ব করে লাভ নেই। তার ক্ষমতা খুব সামান্য। সে কেবল মানুষের বাইরের ছবিটাই তুলতে পারে। মহাদেবের মতো মানুষের হৃদয়ের খবর সে দিতে পারে না।'

কৌস্তুভ অনুভব করল, কথাটা সত্যি। অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

pathagar.net

প্ল্যানচেট, ফেলুদা ও গোয়েন্দা আর্য সেন

চণ্ডী ভট্টাচার্য

pathagar.net

গোয়েন্দা আর্য সেন যে প্ল্যানচেট করতেও জানে—এটা জানা ছিল না কারও। সুনন্দবাবুরা তাঁদের ওপরতলার এই বাসিন্দাটিকে কয়েক বছর ধরে দেখে আসছেন, কিন্তু তাঁরাও কোনোদিন জানতে পারেননি মানুষটির গোয়েন্দাগিরি, উপন্যাস লেখা ছাড়াও ওই গুণটি আছে। সুতরাং আর্য যখন প্রস্তাবটা তুলল, তখন স্বাভাবিকভাবেই কথা উঠল, 'যাহ্, আপনি ওসব পারেন নাকি?'

আর্য হাসতে হাসতে বলল, 'দেখুন পারি কিনা। আমাকে শুধু একটা টেবিল, গোটা কয়েক চেয়ার আর একটা মোমবাতি এনে দিন। প্ল্যানচেটে বিশেষ একজনের আত্মাকে নামাব আমি। সেই আত্মাই বলে দেবে ঘড়িটা কোথায় আছে আর কে-ই বা নিয়েছে সেটা। এখন আপনারাই ঠিক করুন প্ল্যানচেটে কাকে ডাকবেন, মানে কার আত্মাকে ডাকা যেতে পারে।'

সুনন্দবাবুর ছেলে ব্যাসদেব ফেলুদার ফ্যান। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফেলুদা, ফেলুদা।' ব্যাসের দিদি তৃণাও মত দিল তাতে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফেলুদাকেই ডাকা হোক।'

কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন সুনন্দবাবু। আর্য তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমরা ফেলুদার আত্মাকেই নামাব।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ এল সুনন্দবাবুর ভাই অর্ণবের কাছ থেকে, 'কী বলছেন আর্যদা! ফেলুদা কবে শরীরী ছিল যে, তাকে অশরীরী বানাচ্ছেন?'

এবারও আর্য হাসল মিষ্টি করে। বলল, 'অর্ণব, ফেলুদার কাহিনীগুলো পড়েছ তো?'

'পড়েছি কয়েকটা।'

'আমি সব পড়েছি। স-ব।' ব্যাস বলে উঠল।

তৃণাও ভাইয়ের মতো বলল, 'আমিও পড়েছি।'

'দেখলে তো অর্ণব, ফেলুদা কেমন জনপ্রিয়? অমন একজন গোয়েন্দাকে রক্তমাংসের মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবতে ভাল লাগে? হ্যাঁ, মানছি ফেলুদা শরীরী নয়, সাহিত্যের চরিত্র। তবু এরা যখন বলছে—দেখি না, সাহিত্যের ওই বিখ্যাত চরিত্রটি আমাদের প্ল্যানচেটে সাড়া দেন কিনা?'

অর্ণব তবু কী যেন বলতে যাচ্ছিল, আর্য থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এদিকে এসো। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি।' বলে দুজনেই উঠে একটু দূরে সরে গিয়ে কথা বলতে লাগল।

কোন কথা হলো কে জানে, ফিরে এসে অর্ণব শুধু বলল, 'দেখুন চেষ্টা করে। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

সুনন্দবাবুরও আপত্তি করলেন না। আপত্তি করবেনই বা কেন, সোনার ঘড়িটা তো তাঁরই। দাদুর কাছ থেকে পাওয়া। কুচবিহারের রাজপরিবার থেকে দাদুই পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিলেন ঘড়িটা। ওই ঘড়িটার গল্প অনেকের কাছেই করেছেন তিনি। দেখিয়েছেনও কাউকে কাউকে। গতকাল সন্ধ্যের কিছু পরে শিবশঙ্কর আর সুনীলবাবু এসেছিলেন। তাঁদেরও দেখিয়েছিলেন ঘড়িটা। স্পষ্ট মনে আছে, রেখেও দিয়েছিলেন সযত্নে। আজ সকালে আর খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই তো সন্ধ্যেতে ওপরতলা থেকে ডেকে এনেছেন আর্যকে। ঘড়িটা তাঁর খুঁজে পেলেই হলো।

প্ল্যানচেটের উপকরণগুলো গোছাতে গোছাতেই সাতটা। পাঁচজন বসল টেবিলটার চারদিকে—সুনন্দবাবু, আর্য, অর্ণব, তৃণা আর ব্যাস। মিডিয়াম অর্ণব।

আর্যর কথামতো সবাই চুপ। নিঃশব্দেই কেটে গেল অনেকক্ষণ। ঘরের মধ্যে তখন তৈরি হয়ে গেল থমথমে ভাব, একটা গা-ছমছম করা পরিবেশ।

হঠাৎ নিঃশব্দতা ভেঙে গেল আর্যর কণ্ঠস্বরে, 'ফেলুদা ফেলু-দা! তুমি এখানে আছ?' কথাগুলো ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে। কোনো উত্তর এল না।

'ফেলুদা, তুমি আছ এখানে?'

এবারও ফেলুদার আত্মা নিরুত্তর। কিন্তু মোমবাতির শিখাটা কাঁপতে লাগল ভীষণভাবে। সবারই শ্বাস-প্রশ্বাস থমকে গেছে। কী হয় কী হয় ভাব।

'আর ইউ হেয়ার, ফেলুদা?'

এবার শোনা গেল ফেলুদার গলা। যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো, 'ই-য়ে-স, ই-য়ে-স। আমি এখানে।'

'উইল ইউ হেলপ আস?'

'ই-য়ে-স'।

'আমি তোমার কাছে একটা ধাঁধার উত্তর জানতে চাইব। তুমি বলবে?'

'নি-শ্চ-য়।'

'সুনন্দদার সোনার হাতঘড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে একটা ধাঁধা তার খোঁজ দিতে পারে।'

'ধাঁধাটা কী?'

'সে এক মজার ধাঁধা—

জ্যা-এর মাঝে জিয়নকাঠি

আমি মোটেই খাই না মাটি

হাইতি থেকে আসেন খাঁটি

বড় সাহেব।

ফক্সে নিলে কুকুরছানা

হবেই গায়েব।

শুনেছ তো ফেলুদা? এখন বলো, এর মানে কী? কী বলতে চাওয়া হয়েছে এর ভেতর দিয়ে?'

কোনো উত্তর নেই।

'কী হলো ফেলুদা, চুপ করে গেলে কেন? কী হবে ধাঁধাটার উত্তর?'

'এ তো সহজেই বোঝা যায়। ছড়াটা একটু ভাল করে পড়লেই হলো। তুমি তো গোয়েন্দা। তুমি বুঝতে পারোনি?'

'আমি তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই।'

'আই-সী। প্রথম লাইন থেকে পঞ্চম লাইন পর্যন্ত ১, ২, ৩, ১, ২—এই ধারায় অক্ষরগুলো সাজিয়ে যাও। কী পাচ্ছ উত্তর?'

'জ্যামিতি বক্সে। ঘড়িটা কি সেখানেই আছে?'

'এটা বলব না। তুমি বুঝে নাও।'

'আমার তো সেরকমই মনে হচ্ছে।'

আর্যর কথা শেষ হতেই 'পেরেছে, পেরেছে।' বলে হাততালি দিয়ে উঠল ব্যাস।

কিন্তু তৃণা বলল, 'না, না। জ্যামিতি বক্সে বললেই উত্তর হয়ে গেল না। কার জ্যামিতি বক্সে, তা বলতে হবে। ঘড়িটাকেও খুঁজে বার করতে হবে।'

'বেশ, তা হলে বলি—আজ দুপুর পর্যন্ত কি বিকেল পর্যন্তই ধরুন, ঘড়িটা ছিল ব্যাসদেবের জ্যামিতি বক্সের ভেতরে। কিন্তু এখন নেই। সেটা আবার হাত বদল হয়ে গেছে।'

'সে কি!' তীরে এসেও নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম দেখে সুনন্দবাবু হতাশ।

আর্য বলল, 'হ্যাঁ। হাত বদল হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে ঘড়িটা। আর সে কাজটা করেছে ফক্স।'

'ফক্স? ফক্স মানে তো খ্যাঁকশিয়াল!' বললেন সুনন্দবাবু।

আর্য হাসল। বলল, 'নিশ্চয় তাই। ঘড়িটা যে নিয়েছে, সে নিজের নাম নিয়েছে ফক্স।

কারণ নিজেকে সে শিয়ালের মতোই ধূর্ত মনে করে। অবশ্য ধূর্ত কিছুটা সে ঠিকই। কেননা, ধাঁধাটা তার হাতে দিয়েই বেরিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আমাকে আগ্রহী করে তোলবার জন্যে আজ বিকেলেই চিরকুট পাঠিয়েছে—'সাবধান, এ ব্যাপারে নাক গলাবে না। তাহলে মারা পড়বে।' ধাঁধার ছড়াটা আবার লিখে দিয়েছে চিরকুটের পেছনে। হাতের লেখা দেখে বোঝার উপায় নেই। আবার বুদ্ধি করে ছড়াটা কেটেকুটে দিয়ে এমন ভাবে ভাব সৃষ্টি করেছে যে, যাতে মনে হয় ছড়াটা ফালতু। আসলে সে রহস্য উদঘাটনের একটা পথ খোলা রেখেছে ইচ্ছে করেই। যাতে আমাকে ঘাবড়ে দেওয়া যায়। এতগুলো পাকা কাজ যার মাথা দিয়ে বেরোয়, তার ছদ্মনাম তো ফক্সই হওয়ার কথা।'

'কে সে?'

'কে? সুনন্দা, সে তো আছে আমাদের কাছাকাছিই ।'

অর্ণবও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, 'কে, আর্যদা?'

'বলব?'

'কেন বলবেন না? বলুন, কে সে?'

'সে হলো মিস তৃণা মুখার্জী।'

'তৃণা!'

'ইয়েস, ইয়েস। মিস তৃণা। আর তার সঙ্গী ব্যাসদেব।'

তৃণা আর ব্যাস পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল একবার। মাথা কাত করল তৃণা। তারপর একই সঙ্গে সজোরে হাততালি দিয়ে উঠল ভাই-বোনে।

লুকিয়ে রাখা জায়গা থেকে ঘড়ি বার করে এনে দিল তৃণা নিজেই।

সুনন্দবাবুর মুখে হাসি ফুটেছে। বকতে গিয়েও বকলেন না ছেলে-মেয়েকে। বললেন, 'কী করে বুঝলেন, তৃণাই সরিয়েছে ঘড়িটা?'

আর্য বলল, 'প্রথমে বুঝিনি। ভেবেছিলাম সত্যিই চুরি গেছে। কিন্তু হুমকি লেখা কাগজটা যখন পেলাম, তখন একটু সন্দেহ হলো, কাজটা এ বাড়িরই কারও। আর ওই ধাঁধাটা, চোর কি চুরি করে নিয়ে গিয়ে ধাঁধা লিখে ঘড়িটার সন্ধান দেবে? অথচ তাই করা হয়েছে। তাতেই বুঝতে পারি আমাকে এ বাড়িরই কেউ পরীক্ষা করতে চায়। ফেলুদার ফ্যান তৃণা-ব্যাস ছাড়া এবাড়িতে ও কাজটা করবে কারা? তা ছাড়া আমি তো জানি যে, তৃণার ছড়া লেখার হাত আছে। সুতরাং দুয়ে দুয়ে চার। পেয়ে গেলাম উত্তর। তৃণা আর ব্যাসেরই কাজ। তবে ব্যাস নয়। আসল কাজটা করেছিল তৃণাই। আলমারি খুলে ও-ই জ্যামিতি বক্সের ভেতরে। কিন্তু এক ফাঁকে ধাঁধায় পড়ে যাই। আপনি বোধহয় লক্ষ্য করেননি, ঘড়িটা জ্যামিতি বক্সে আছে বলামাত্র ব্যাস হাততালি দিলেও তৃণা দেয়নি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম ব্যাপারটা। তখনই বুঝতে পারি, ঘড়িটা জ্যামিতি বক্স থেকে সরিয়ে ফেলেছে তৃণা। কি মিস ফক্স? রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছি তো?'

তৃণা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমরাও আপনার একটা ব্যাপার ধরে ফেলেছি আর্যকাকু। প্ল্যানচেটে আপনি মোটেই ফেলুদার আত্মাকে নামাননি। ওটা আপনার আর ছোটকার কারসাজি।'

তৃণার কথা শেষ হতেই হো হো করে হেসে উঠল আর্য আর অর্ণব।

ট্রেনের মধ্যে গোয়েন্দাগিরি

কালীপদ দাস

বুলেট আর রাজা প্রায় দৌড়াতে দৌড়তে প্ল্যাটফর্মে এসে যখন পৌঁছল, ট্রেন ততক্ষণে বিছের মতো ধীরে ধীরে গড়াতে শুরু করেছে। ওরা দুজনে নিজের নিজের ব্যাগ সামলাতে কোনোরকমে সামনের একটা কামরায় উঠে পড়ল।

রাজা এতক্ষণ কিছু বলেনি। কিন্তু গাড়িতে উঠেই রাগে ফেটে পড়ল সে, তোকে সেই সকাল থেকে বলছি, ওরে তাড়াতাড়ি কর, কে শোনে কার কথা! তোর সেই কাছিমের মতো লিটিস আর পিটিস। গাড়ি...

আঃ রাজা, গাড়ি তো ছেড়ে যায়নি। তাহলে আর তোর অত রাগ কেন? দেখ, যেটা হবার সেটা হবেই, শত চেষ্টা করেও তাকে এড়াতে পারবি না, তো মাঝখানে থেকে অযথা বকবক করে কেন ছুটির মুডটা নষ্ট করছিস! মোটে তো তিনটে দিন হাতে সময়, এর মধ্যে তুই যদি আমার মাথা খেতে শুরু করিস তো গেল সব মাঠে মারা! বুলেট রাজার কথায় বাধা দিয়ে নির্বিকার ভাবে বলে। এরকম নির্বিকার, গা-ছাড়া ভাবে কথা বলা বুলেটের পুরনো অভ্যেস।

উত্তরে রাজা কিছু না বলে গুম মেরে বসে থাকে।

আঙ্কেল, আপনার কাছে দেশলাই আছে? পাশে বসা প্রিন্স কোট পরা শিক্ষিত চেহারার এক ভদ্রলোককে বলে বুলেট। তারপরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে শুধরে নেয়, না, মানে সিগারেট-টিগারেট আমরা খাই না, আসলে ওর থেকে একটা কাঠি নিতে চাইছি আমি। দৌড়ে আসার সময় মনে হচ্ছে কানের মধ্যে কি একটা যেন ঢুকেছে, কেমন খচমচ করছে।

বুলেটের পরের কথাটাতে ভদ্রলোক খানিকটা আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হলো। চুপচাপ পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে তিনি বুলেটের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

দেশলাইয়ের বাক্সটা নিয়ে তার থেকে একটা কাঠি বের করে বুলেট আবার সেটা ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিল।

আঙ্কেল, আপনি কতদূর যাবেন?

এবারে রাজার প্রশ্ন। প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক রাজার দিকে এক ঝলক তাকালেন বটে কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

ওহ্ রাজা! তোকে কতবার বলেছি, ট্রেনের মধ্যে এরকম কাউকে প্রশ্ন করিস না। কেউ তোর মতো ওরকম খেজুরে আলাপ পছন্দ করে না ট্রেনের মধ্যে। তবু সেই তোর 'ইন্টারভিউ' নেবার বদভ্যাস। সরি আঙ্কেল, বুদ্ধুটা ফালতু প্রশ্ন করে আপনাকে বিরক্ত করছে।

কথাগুলো বুলেট এমন করে বলে যেন ও একটা বেশ হোমরা-চোমরা ব্যক্তি আর রাজা একটা বাচ্চা ছেলে।

ওদিকে ঐ ভদ্রলোক কিন্তু ওদের দিকে তেমন কোনো নজরই দিচ্ছিলেন না।

গাড়ি চলতে থাকে। বুলেট আর রাজা দুজনেই নিজের মতো করে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু ভদ্রলোক নির্বিকার বসেছিলেন, ওদের ঘাসে মুখ দেবার নামও নিচ্ছিলেন না।

মনে হচ্ছে বেশ সেয়ানা! অযথাই এবার ঝঞ্ঝাটে ফেললেন শর্মা আঙ্কেল! এ তো দেখছি হাঁ পর্যন্ত করে না। রাজা নিজেই মনের এসব ভাবছিল।

সামনে বোধহয় কোনো স্টেশন আসছে। গাড়ির গতি আস্তে আস্তে কমে আসছে। তারপর হঠাৎ, গাড়িটা তখনও পুরোপুরি থামেওনি, একদল পুলিশ পর পর কয়েকটা কামরাতে উঠে পড়ল। পুলিশ দেখেই কিনা বোঝা গেল না, ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বাবা, আমার ব্রিফকেসটা একটু দেখো, আমি বাথরুম থেকে আসছি। বলেই বুলেট বা রাজার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে ভদ্রলোক বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ততক্ষণে গাড়ি পুরোপুরি থেমে গেছে। আর থামতেই ওদের কামরাতেও একজন ইন্সপেক্টর আর জনা চারেক সেপাই উঠে এল। উঠেই শুরু করল খোঁজাখুঁজি জিজ্ঞাসাবাদ।

ইতিমধ্যে ঐ ভদ্রলোক বাথরুম থেকে ফিরে এসেছেন।

কি ব্যাপার ইন্সপেক্টর? কিছু খুঁজছেন মনে হচ্ছে?

pathagar.net

হ্যাঁ, আমাদের কাছে খবর আছে, এই গাড়িতে একজন ড্রাগ নিয়ে যাচ্ছে।

সর্বনাশ! বলেন কি? বলতে বলতে তিনি নিজের ব্রিফকেসটাও ইন্সপেক্টরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, প্রত্যেককে এক-এক করে সার্চ করুন, খবর যদি ঠিক হয়, বাছাধন যাবে কোথায়!

ইন্সপেক্টর আরও বেশ কয়েকজনের বাক্স-প্যাঁটরা দেখলেন। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না।

রাজার মাথায় তখন ড্রাগের ব্যাপারটা ঘুরপাক খাচ্ছে। ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে আবার, ইন্সপেক্টর আর সেপাইগুলো নেমে গেছে। ধীরে ধীরে ট্রেনের গতিও বাড়ছে। ভদ্রলোক আবার নিজের ভাবে বিভোর হয়ে গেছেন।

হঠাৎ রাজার গা-টা কেমন গুলিয়ে ওঠে। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ও দ্রুত বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। খানিক করে চোখে-মুখে জল দিয়ে ও ফিরে আসে।

কি ব্যাপার? শরীর খারাপ করছে নাকি তোর...

নাঃ, এখন ঠিক আছে, হঠাৎ কেমন বমি এসে গিয়েছিল। বুলেটের প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলে। তারপর আবার ওরা নিজেদের মধ্যে গল্পে মেতে উঠে।

পরের স্টেশনে নেমে রাজা দুজনের মতো কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসে। ট্রেন চলতে শুরু করলে ওরা খেতে থাকে। পাশের ভদ্রলোক তখন রীতিমতো ঝিমুচ্ছেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে মুখ করে গাড়িও ছুটে চলেছে। গাড়ির গতি কম হলো আরও আধঘণ্টা বাদে। পরের স্টেশনে ঢোকার সময়।

পরের স্টেশনে লোক তেমন কেউ নামল না, বরং জনকয়েক ওদের কামরাতে উঠে এল।

স্টেশন ছেড়ে গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে। এর পরেই বম্বে সেন্ট্রাল। যাত্রীরা উঠে যে যার জিনিসপত্র নামাতে-গোছাতে শুরু করে। পাশে বসা ভদ্রলোক আবার উঠে বোধহয় বাথরুমে গেলেন।

সুযোগ পেয়ে সামনের ভদ্রলোককে, যিনি এইমাত্র আগের স্টেশনে উঠলেন, রাজা বলল, আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারেননি ফড়কে আঙ্কেল, আমি রাজা, ও বুলেট। গতবার কোকেন-চোর ধরার সময় আমরা ছিলাম আপনার সঙ্গে, মনে আছে?

সামনের ভদ্রলোক নিজের নাম শুনে রাজার দিকে তাকান।

আপনি বোধহয় বরৌদা থেকে ইন্সপেক্টর শর্মার মেসেজ পেয়েছেন?

হ্যাঁ, কিন্তু—

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ওই প্রিন্স কোট পরা ভদ্রলোক এদিকে এলেই ওকে ধরবেন। ওই লোকটাই 'কালপ্রিট'।

রাজার কথা শুনে সাদা পোশাকে সামনে বসা ইন্সপেক্টর ফড়কে বলেন, কিন্তু আমি তো খবর পেলাম ওঁর কাছেও কিছু পাওয়া যায়নি।

আপনি ঠিকই বলেছেন আঙ্কেল, ওঁর কাছে তখন কিছু পাওয়া যায়নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস এবার ওঁর কাছে মাল আছে। ওঁকে ধরুন, পালাতে দেবেন না।

pathagar.net

কিন্তু তুমি এত নিশ্চিত করে বলছ কি করে?

ইন্সপেক্টর ফড়কের প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলে, আগের এক স্টেশনে পুলিশ দেখেই ও ঝটপট উঠে গিয়ে বাথরুমে চলে গিয়েছিল। তারপর বুদ্ধি করে ড্রাগের প্যাকেটটা বাথরুমের আয়নার পেছনে লুকিয়ে এসেছিল। পরে আমি বমি করার অছিলায় বাথরুমে গিয়ে তা দেখে এসেছি। আর তারপরেই আমি খাবার আনার নাম করে নেমে স্টেশনমাস্টারের ঘর থেকে শর্মা আঙ্কেলকে ফোন করে আপনাকে এখানে সাদা পোশাকে পাঠাবার জন্য বলেছিলাম। কারণ আপনিও ইউনিফর্ম পরে এলে ও এখানে মানে গাড়িতেই ড্রাগস ফেলে পালাত।

আমরা তো ওর কাছে কিছু না পাওয়া যেতে খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। অথচ শর্মা আঙ্কেল যা বলেছিলেন, সেটাই মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ লোকটার ডান হাতে ছ'টা আঙুল। তবু ওর কাছে কিছু পাওয়া গেল না। ভাগ্য ভাল রাজার মাথায় হঠাৎ খেলে গিয়েছিল যে ড্রাগসের প্যাকেটটা ও বাথরুমের মধ্যেই কোথাও লুকিয়েছে। এবারে বুলেট বেশ সপ্রতিভতার সঙ্গে বলল।

ওদের কথার মধ্যেই সেই প্রিন্স কোট পরা লোকটা রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর ব্রিফকেসটা তুলে নেয়।

স্যার, দয়া করে আপনি এখানেই আসন গ্রহণ করুন। বলেই ইন্সপেক্টর ফড়কে এবং তাঁর সঙ্গী সাদা পোশাকের সেপাইরা লোকটাকে জাপটে ধরে ফেলে। তারপর ওকে সার্চ করতেই গেঞ্জির ভেতর দিকের একটা বিশেষ ধরনের পকেট থেকে পাওয়া গেল ড্রাগসের প্যাকেট।

শাবাশ রাজা। শাবাস বুলেট। আজ আবার তোমরা সমাজের আর এক শত্রুকে ধরতে আমাদের সাহায্য করলে।

থ্যাঙ্কু স্যার। তবে এবারের ট্রেনের মধ্যে গোয়েন্দাগিরি আমাদের বেশ ভাল লেগেছে। রাজা, বুলেট একসঙ্গে বলে।

ওদিক জালে পড়া পাখির মতো লোকটা মিঃ ফড়কের হাতের মধ্যে ছটফট করছিল। কিন্তু ঐ ছটফটই সার। ইন্সপেক্টর ফড়কের হাতে পড়ে আজ পর্যন্ত কেউ সটকে পড়েছে এমন ঘটনা অন্তত রাজা বা বুলেট কখনও শোনেনি।

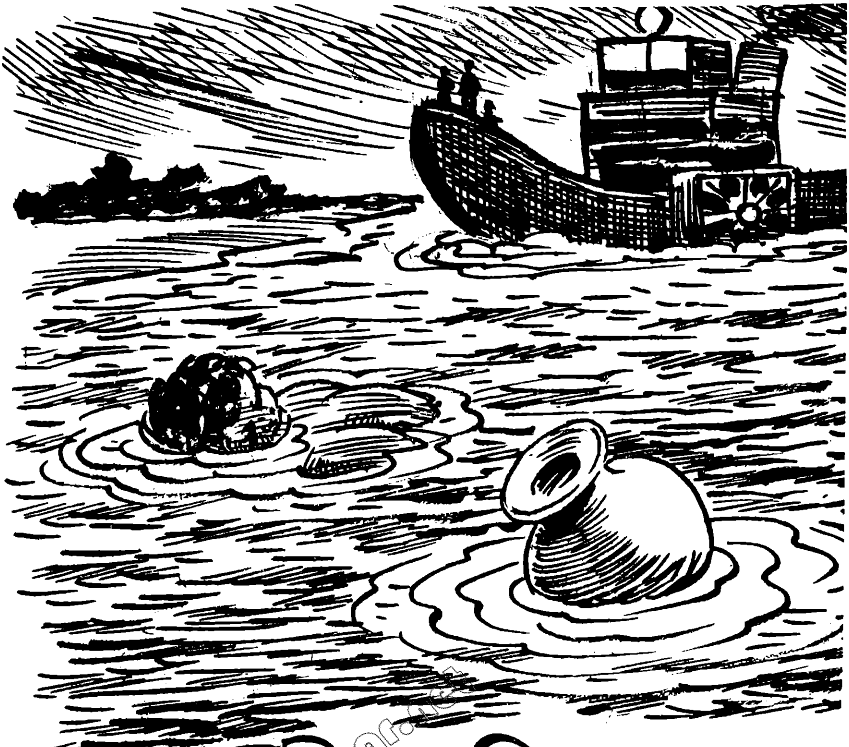

নীলমণি দারোগা

যদুনাথ ভট্টাচার্য

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন খুলনা যশোহর জেলার অন্তর্গত একটি থানা মাত্র। তখন খুলনায় স্থল-পুলিশ ও জল-পুলিশের বড় আড্ডা ও কালেক্টরের অফিস ছিল। খুলনায় অনেক চোর ডাকাত ধরা পড়িত, খুলনা হইতে দুই-তিন দিনের পথে নিয়ত চুরি ডাকাতি হইত। এখন যেমন বিদ্যানুসারে পুলিশ বিভাগে পদ-বিভাগ করা হয়, তখন তেমনি বুদ্ধি ও চুরি-ডাকাতি আস্কারা করিবার ক্ষমতা অনুসারে লোক নিযুক্ত করা হইত।

পুলিশের বড় কর্তা কাপ্তেন হগ স্টিমার সহযোগে বাদার অনেক স্থানে জল-পুলিশের অনেক আড্ডা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি খুলনার নিকটে নদীগর্ভে একটি সন্দেহজনক মৃতদেহ পাইয়াছেন। মৃতদেহটির গলা প্রায় বারো আনা কাটা ছিল। তাহার মাথায় একটা দড়ি দিয়া এক মেটে কলসী বাঁধা ছিল। কলসী জলে সম্পূর্ণ ডুবে নাই। স্টিমার চালানোর ঢেউতে কাপ্তেন হগ মৃতদেহের মাথা দেখিতে পান। তিনি মৃতদেহটা তুলিয়া লইলেন। মৃতদেহ হইতে পাইয়াছেন তিনি একটি মেটে কলসী, একগাছি দড়ি, একখানি পরিধেয় বস্ত্র, একখানি গামছা ও একগাছি লম্বা পৈতা।

পুলিশের বড় কর্তা কাপ্তেন হগ খুলনায় আসিয়াছেন। খুলনা থানার বড় প্রাঙ্গণে তাঁহার তাঁবু পড়িয়াছে। দলে দলে লোক আসিয়া কার্যপ্রার্থী হইতেছে। কেহ কনেস্টবলী, কেহ রাইটার কনেস্টবলী, কেহ হেড্‌-কনেস্টবলী ও কেহ দারোগাগিরি কার্যের উমেদারী করিতেছে। আমাদের নীলমণিও আজ যিনি এই খুন আস্কারা করিতে পারিবেন, তিনি দারোগা ও যাঁহারা এই খুন আস্কারা সম্বন্ধে সাহায্য করিবেন, তাঁহারা গুণানুরূপে কনেস্টবল ও হেডকনেস্টবল হইবেন।

নীল—আমি দারোগাগিরি কার্যের প্রার্থী। হগ—টুমি কি লেখা পড়া জানে?

নীল।। আমি বাংলা, উর্দু, পার্শী ও অল্প অল্প ইংরাজি জানি।

হগ।। টুমি খুন আস্কারা করিতে জানে?

নীল।। আজ্ঞে, তা পারি।

হগ।। মনে কর, আমি জলে একটি খুন পাইয়াছে। খুনের সঙ্গে আর পাইয়াছে একটি কলসী, একখানি কাপড়, গামছা ও পৈটা। এটে টুমি খুন আস্কারা করিটে পারে?

নীল।। মৃত ব্যক্তির মাপ ও ছবি রাখেন নাই?

হগ।। হাঁ, টাও পাবে।

নীল। তবে তো খুন আস্কারা করা অতি সহজ, সবই আছে।

অনন্তর কাপ্তেন হগ দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন এবং নীলমণিকে তাঁবুর মধ্যে লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন।

কাপ্তেন হগ বলিলেন—'টুমি এই খুন আস্কারা করিতে চাহিলে কি কি চাহে?'

নীলমণি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—'এই খুন আস্কারা করিতে চাই, তাহার নক্‌সা, মাপ ওই কলসী, পৈতা, কাপড় ও গামছা, চারজন কনস্টেবল, তাহার মধ্যে তিনজন গান ও খোলকরতালে বিশেষ অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক আর একখানি নৌকা ও কিছু টাকা আরও চাই সকল থানা দারোগার উপর এই মর্মের এক পরোয়ানা যে, আমার যখন যত কনস্টেবল, দারোগা ও চৌকিদারের প্রয়োজন হইবে, তখনই তা সব দিবে।

হগ। কাল এগারটার সময় টুমি এ সব পাবে। এ সব পেলে টুমি খুন আস্কারা করিতে পারিবে?

নীল।। আজ্ঞে, নিশ্চয় পারিব।

পরদিন বেলা এগারটার সময় নীলমণি কাপ্তেন হগের সহিত দেখা করিলেন। চারজন গায়ক কনস্টেবল, একখানি দুই মাল্লা নৌকো, পঁচিশটি টাকা ও মৃত ব্যক্তির সহিত যে যে দ্রব্য ছিল, তাহা ও মৃতব্যক্তির একখানি ছবি ও মাপ প্রাপ্ত হইলেন। নৌকায় আরও তিনটি দাঁড় বসাইলেন। একটি খোল, দুই জোড়া করতাল, পাঁচটি বাউল বৈরাগীর পোষাক ও কৃত্রিম দাড়ি গোঁফ প্রস্তুত করিলেন। মাঝিদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা বাউল বৈরাগী। তাঁহারা পূর্ব দেশে ভিক্ষা করিতে গমন করিবেন। সেদিন আয়োজনেই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে নীলমণি পূর্ব উত্তরাভিমুখে নৌকা চালাইয়া দিলেন। নীলমণির নাম হইল জগদানন্দ গোস্বামী ও অন্য চারজন লোকের নাম হইল যথাক্রমে অতুলানন্দ বাবাজী, প্রেমানন্দ বাবাজী, পুলকানন্দ বাবাজী, নিত্যানন্দ বাবাজী। সকলেই গৈরিক কৌপীন পরিধান করিল ও গৈরিক আলখাল্লায় সর্ব শরীর আচ্ছাদিত করিল।

বৈরাগী বাবাজীরা স্থানে স্থানে কুম্ভকার বাড়ীতে খুব গান করিয়াছেন ও বেশ চাউল ডাল উপার্জ্জন করিয়াছেন। বাবাজীর ভিক্ষার পাত্র একটি কলসী।

জগদানন্দ প্রভু স্নান করিয়া আসিয়া পাক করিতে বসিলেন। প্রভু তিনবার স্নান করেন। প্রচার আছে যে, প্রভু নানাপ্রকার আদি ভৌতিক ঔষধ ও কবচ জানেন। আজ গোপাল পালের বাটীতে তাঁহারা অতিথি! গোপালের মাতা রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন। গোপালের কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। স্ত্রীমহলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, গোপালের স্ত্রী বন্ধ্যা কিন্তু গোপালের মাতা এখন ঔষধ কবচ কুড়াইতে বিরত হন নাই। প্রভু জগদানন্দ রন্ধন করিতেছেন এবং গোপালের মাতা যুক্ত করে বলিলেন—'প্রভু শুনিলাম, আপনি অনেক ঔষধ ও কবচ জানেন। আপনি বেশ গোণা পড়া জানেন। আপনি গুণে বলুন, আমার গোপালের ছেলেপিলে হয় না কেন এবং একটি ভালো ঔষধ দিন।'

জগ।। আজ হ'তে রাত্রে বিকালে তোমার বাড়ি হ'তে এক পক্ষের মধ্যে কে কলসী নিয়েছে?

গোপালের মাতা অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন—'গত মঙ্গলবার দিন প্রায় দুই প্রহর রাত্রিতে রায়বাবুদের বাড়ীর বিধু চোপদার একটি কলসী লইয়াছিল।'

জগ ।। তবেই হয়েছে, তবেই হয়েছে। দুধ নাই, তা ছেলে হয়ে খাবে কি? উড়োবানে আগে তোমার গোপালের স্ত্রীর দুধ নষ্ট করেছিল, সেদিন রাত্রে কলসী নিয়ে একেবারে আসল বানে সর্বনাশ করেছে। যা হ'ক, কলসী আমার হাতে পড়েছে। আমি দোষদৃষ্টির কলসীই শোধন ক'রে নিয়ে ভিক্ষা করি। দোষটা আমি আগেই কেটে দিয়েছি। আমি জলপড়াও প্রস্তুত করে দিচ্ছি, আজ হ'তে এক বৎসরের মধ্যে তোমার গোপালের সুসন্তান হবে।

সে রজনী কুম্ভকার বাটিতে অতীত হইল। গোপালের মাতা জলপড়া ও কবচ পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। শ্রোতৃগণ আবার প্রভুদের আহারান্তে সঙ্গীত আরম্ভ করিতে বলিলেন। প্রায় রজনী অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রাতে বৈষ্ণব প্রভুগণ কুম্ভকার বাড়ি ছাড়িয়া পথ বাহিয়া চলিলেন। তাঁহারা যে সে বাড়িতে গান করেন না।—প্রকৃত হরিভক্তের বাড়িতেই গান করেন। কিছুদূর যাইতেই অতুলানন্দ প্রভু বলিলেন—'প্রভো! এ মথুরানাথ রজকের বাড়ী, কি করা যাইবে?' জগদানন্দ প্রভু বলিলেন—'মথুরের মা প্রকৃত হরিভক্ত। এ বাড়ীতে হরিনাম করতে হবে।'

এই বলিয়া জগদানন্দ প্রভু তাঁহার ভিক্ষার কলসীর গলায় একখানি কাপড়ে ধোপার চিহ্ন দেখাইয়া বলিলেন,—'বল দেখি মথুরের মা, এই কাপড়ের দাগটি কার? এই কি তোমার মথুরের দেওয়া।'

মথুরের মাতা হাসিয়া উত্তর করিল,—এ দাগ তো মথুরেরই দেওয়া। এ দাগ মথুর দেয়, আমি দেই ও আমার এক ছোট মেয়ে দেয়। এই দাগ রায় বাবুদের বাড়ির গোমস্তা রমাকান্ত চক্রবর্তীর কাপড়ে দেওয়া হয়! কিন্তু সেই ঠাকুর আজ সাত আট দিন নিরুদ্দেশ। সেই সংগে রামটহল পাঁড়েকে পাওয়া যাইতেছে না।'

জগ।। চুপ কর, চুপ কর মা, বাজে কথায় কাজ নাই। দুষ্ট লোক তোমার মেয়ের ছেলে, কী ছেলের চিহ্নমাত্র নষ্ট করেছিল। জলপড়া ও কবচ লও। আমরা আর দেরি করতে পারি না, এখনই উঠবো।

চৈত্র মাস, বেলা প্রায় একপ্রহর হইয়াছে। খরকর সূর্য্যদেব প্রখরভাবে উদিত হইয়াছেন। বরিশাল জেলার পশ্চিম প্রান্তে এক থানার দারোগা বাবু এজলাসে বসিয়া আছেন। থানা লোকে পূর্ণ হইয়াছে। এমন সময় আর এক নতুন দারোগা থানাগৃহে প্রবেশ করিলেন। নূতন দারোগার সহিত মাত্র চারিজন কনেস্টবল। নতুন দারোগা অন্যান্য লোকদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তিনি থানার দারোগাকে এক পরোয়ানা দেখাইয়া বলিলেন—'আমি চাই, এমনি একখানি দ্রুতগামী নৌকো, বেলা একটার মধ্যে একশত চৌকীদার দশবারজন কনেস্টবল, তিনজন সাব-ইনেস্‌পেক্টর ও হেডকনেস্টবল।'

থানায় দারোগা বাবু সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন—'আমি সব যোগাড় করছি। বেলা একটার মধ্যে সব পাবেন।'

থানায় দারোগা বাবু এই কথা বলিয়া উচ্চরবে দেরবর সিং, পহীপত পাঁড়ে, রামটহল দোবে, লছমণ মিশ্র, বাহাদুর বিশ্বাস, আবদুল করিম, কাজী এইজদ্দি লস্কর প্রভৃতি কনেস্টবলদিগকে ডাকিলেন। তিনি দোবেকে অর্ধ-ঘণ্টার মধ্যে একখানি দ্রুতগামী নৌকো আনিতে বলিলেন ও পাঁড়ে, মিশ্র এবং কাজীকে বেলা এগারটার মধ্যে দেড়শত চৌকীদার আনিতে আদেশ করিলেন, আর লস্কর ও বিশ্বাসকে কুড়িটি বন্দুক যোগাড় করিতে বলিলেন। থানায় ঘোর সমরায়োজন হইতে লাগিল।

অর্ধ-ঘণ্টার মধ্যে দোবে এক দো মাল্লার নৌকায় ছয় দাঁড় বসাইয়া তাহাকে দ্রুতগামী করিয়া লইয়া আসিল। সে নৌকায় উঠিয়া নবাগত দারোগাবাবু তাঁহার সঙ্গের এক কনেস্টবলের নিকট নিম্নলিখিত মর্মের একখানি পত্র লিখলেন ঃ—

মহামহিম মহিমার্ণর শ্রীল শ্রীযুক্ত কাপ্তেন হগ সাহেব
বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু।

সেলাম বহুত বহুত আরো বিশেষ, আমি হুজুরের সকাজ হইতে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া দুইদিন পথে পথে ছিলাম। তৃতীয় দিন রাত্রিতে ঘটনার কতক অংশ জ্ঞাত হই। চতুর্থ দিন সকালে আরও কিছু অগ্রবর্তী হই। পঞ্চম দিন রাত্রিতে সমস্ত অবগত হইয়াছি। ঘটনা বড় রহস্যজনক। ঘটনার বড় রহস্যজনক। ঘটনায় বড় ঘরে কলঙ্ক ; বড় ঘরের বহু লোকের জীবন লইয়া টানাটানি। আমার হুজুরের কাছে নিবেদন আছে, আমার প্রথম আস্কারার মোকর্দমার কাহাকেও ফাঁসী দিতে পারিবেন না। আমি সমস্ত বিষয়েরই আস্কারা করিয়াছি। সন্ধ্যার মধ্যে আসামীগণকে গ্রেপ্তার করিব ও আর এক খুন আস্কারা করিব। হুজুর কল্য যত সকালে আসিতে পারেন, ততই ভাল হইবে। আপনি আসিয়া দুই কুল বজায় রাখিতে আজ্ঞা হয়। ইতি সন ১২১৩ তাং ১৮ই চৈত্র।

আরোজকারী
শ্রীনীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলা তিনটার সময় অমুক গ্রামের রায়বাড়িতে দেড়শত চৌকীদার, 'বারো জন কনস্টেবল, তিনজন হেড কনেস্টবল ও দুইজন সাব-ইনেস্‌পেক্টর উপস্থিত হইলেন। চৌকীদারগণ পদব্রজে ও পুলিশের লোকজন অশ্বপৃষ্ঠে। সূর্য্য করে ঢাল, অসি প্রভৃতি ঝক্ ঝক্ করিতেছে ও গুলিহীন বন্দুকের দুড়ুম দুড়ুম শব্দ শ্রুত হইতেছে। চারিদিকে চৌকিদারী লাঠির ঠন্ ঠন্ শব্দ উত্থিত হইতেছে। সতের জন পুলিশ-কর্মচারী অশ্বপৃষ্ঠ

হইতে অবতরণপূর্বক বহির্বাটিতে প্রবেশ লাভ করিলেন। তাঁহারা কালীকিশোর রায় ও তাঁহার কর্মচারী ও পাইক—পেয়াদাগণকে বন্দী করিলেন। রায় বাড়ির অন্তঃপুর ও বহির্বাটী তিনজন হেড-কনেস্টবল ও পাঁচ জন কনস্টেবল ও পঁচিশজন চৌকিদারের জিম্বার রাখিয়া বন্দিগণকে ও খুন লইয়া দুই দারোগা, পুলিশ কর্মচারী ও চৌকীদারগণ বাখরগঞ্জ জেলার অমুক থানায় উপস্থিত হইলেন। বিশ হাজার টাকা ঘুসের প্রস্তাবেও দারোগাদ্বয় কর্ণপাত করিলেন না।

সপ্তম দিন মধ্যাহ্নে কাপ্তেন হগ স্টিমারে বাখরগঞ্জ জেলার অমুক থানায় উপস্থিত হইলেন। অগ্রে নীলমণি পরে সেই থানার দারোগাবাবু ও পরে অন্যান্য পুলিশ-কর্মচারীগণ কাপ্তেনের সহিত দেখা করিলেন। নীলমণি খুনঘটিত আদ্যন্ত বিবরণ কাপ্তেনকে জানাইলেন এবং কাপ্তেন নীলমণির সকল কথা বিশ্বাস করিলেন। জমিদার ও তাঁহার কর্মচারীগণের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাঁহাদিগের সঙ্গে গোপনেও কিছু কিছু কথা হইল। রায়বাবু ও দেওয়ানজী জামিনে বাড়ি যাইবার অবসর পাইলেন। ক্রমে সকল জমিদারীর কর্মচারিগণ গৃহে যাইবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। কাপ্তেনের নিকট অনেক ডালি উপঢৌকন আসিতে লাগিল। মাছ, মাংস, মুরগী, আণ্ডা, মাখন, ঘি, মিষ্টান্ন, ফল-ফুলারি কতই আসিতে লাগিল। নীলমণি ও থানার দারোগা তফাৎ তফাৎ থাকিতে লাগিলেন। নবম দিনে জমিদার বাড়ি হইতে পুলিশ ও চৌকিদারগণকে উঠাইয়া আনা হইল, দশম দিনে কাপ্তেন হগের রিপোর্ট প্রস্তুত হইল। রিপোর্ট শুনাইবার জন্য নীলমণি ও থানার দারোগাবাবুকে ডাকা হইল। রিপোর্ট এইরূপ ঃ—

'বাখরগঞ্জ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় সমীপেষু,—

আমি বাঙ্গালা চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে খুলনার নিকট নদীগর্ভে একটি মৃতদেহ প্রাপ্ত হই। নূতন দারোগা নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়কে মৃত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র, গামছা, তাঁহার উপবীত সঙ্গের একটি কলসী, মাপ ও নক্‌সা দিয়া খুন তদন্ত করিবার আদেশ দেই। নীলমণি অতি বিচক্ষণতার সহিত খুন আস্কারা করিয়া সাক্ষী প্রমাণ লইয়া রিপোর্ট প্রস্তুত করে আসামী চালান দিবার জন্য আমাকে পত্র লিখেন আমি তদানুসারে তিন দিন সাক্ষী প্রমাণ লইয়া এই রিপোর্ট প্রেরণ পূর্বক আসামীগণকে দণ্ড প্রার্থনা করি।

কালীকিশোর রায় এক পুরাতন জমিদার বংশের লোক। এই বংশের বহু সৎকার্য আছে। ইহাদের বাড়িতে ইস্কুল, ডাক্তার খানা, কবিরাজী ঔষধখানা, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও পোস্টাফিস দেখিলাম। কালীকিশোর যুবা পুরুষ। দুই এক বৎসর মাত্র জমিদারী দেখিতেছেন। সরকারী সারকুলার, রুল ও রেগুলেশনের কিছুই জানেন না। পুরাতন জমিদার বাড়িতে যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ কালীকিশোর রায় মহাশয়ের অন্তঃপুরে একটি দাসী আছে। এই দাসীর নাম অলকমণি দাসী মন্দচরিত্রা। রমানাথ চক্রবর্তী কালীকিশোরের ছোট জমানবীশ। ইহারা উভয়ে গোপনে মন্দ অভিপ্রায়ে অলকের সম্মতিক্রমে তাহার ঘরে যাইত। রমানাথ অলকের ঘরে যাইয়া থাকিতে থাকিতে অলক কোন কার্য উপলক্ষে বাহিরে যায়। এই সময় রামটহল এক সু-ধার তরবারি লইয়া অলকার ঘরে প্রবেশ করে। রমানাথ প্রাণভরে রামটহলের পেটে ছোরা মারে এবং রামটহল তরবারি দিয়া রমানাথের গলায় কোপ মারে। ওই আঘাতে রাত্রি এগারটার সময় রমানাথের মৃত্যু হয় এবং রাত্রি চারটার সময় রামটহলও ইহলোক পরিত্যাগ

করে। জমিদার কালীকিশোর রায়ের অন্তঃপুরে এই খুন হওয়ায় তাঁহার কোনও স্বজন—মহিলার উপর অন্যায়রূপে কলঙ্ক আরোপিত হইবে, আশঙ্কায় তিনি কর্ম্মচারিবর্গের সহিত যোগে প্রথম খুন জলে ফেলিয়া দেন ও দ্বিতীয় খুন মাটিতে পুঁতিয়া রাখেন। জমিদার কালীকিশোর রায়, তাঁহার দেওয়ান ভরদেব চক্রবর্ত্তী, পেস্কার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, জমানবীশ রাজমোহন ঘোষ, সুখরনবীশ, হরিমোহন দে, বিধু চোপদার, গজপতি সিং, কাজল বিশ্বাস ও আবদুল করিম খাঁকে খুন গোপন করার অপরাধে চালান দিলাম। আমি অলকমণি দাসী, মোহন পাঁড়ে প্রভৃতি জমিদারের চাকর ও চাকরাণীগণের ও স্কুল মাস্টার শ্রীনাথ রায়, দেবনাথ মুখার্জ্জী, সূর্য্যকুমার আচার্য্য কবিরাজ গদাধর সেন, পণ্ডিত জগমোহন বিদ্যারত্ন, পোস্টমাস্টার হরকুমার ঘোষ ও গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, মধুসুদন মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ও ভুবনমোহন রায়ের জবানবন্দী লইয়াছি ও তাঁহাদের নির্দিষ্ট তারিখে কাছারিতে হাজির হইবার নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকা করিয়া মুচলেকা লইয়াছি। এ. মোকদ্দমার হত্যাকারী ও হত ব্যক্তি উভয়েই মরিয়াছে, কেবল খুন গোপনকারিগণ মূল আসামী। কালীকিশোরের সঙ্কট অবস্থা, তরুণ বয়স ও অনভিজ্ঞতার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আগামী ৮ এপ্রিল এই মোকদ্দমার বিচারের দিন স্থির হইয়াছে।"

রিপোর্ট শুনিয়া নীলমণি বলিলেন,—'শেষ হয়েছে। পাপিদেরও অল্প অল্প দণ্ড হয় এবং কাহারও প্রাণদণ্ড না হয়, এই হ'লে বাঁচি।' অপর দারোগা বলিলেন—'মোকদ্দমাটা তো অন্যরূপ বুঝেছিলেম।'

হগ।। মোকড্ডমা টো অন্যরূপ বটে, নীলমণির ইচ্ছা জমিডার বাঁচে ও টার বাড়ির মেয়েলোকের নিন্দা না হয়। এটা কড়িতে হইলে মোকড্ডমা একটু বদলাইটে হয়। দ্বি-দা। হাঁ হুজুর! সকল দিক বজায় রাখতে হইলে এই বেশ রিপোর্ট হয়েছে।

এই সময় পর্যন্ত নূতন পেনাল সুড অর্থাৎ ভারতের দণ্ডবিধি আইন সঙ্কলন হয় নাই। এই সময়ে পুলিশের বড় সাহেবগণের মতানুসারেই ম্যাজিস্ট্রেটগণ আসামীগণের দণ্ড করিতেন। ৮ এপ্রিল দুই খুনী মোকদ্দমার বিচার হইল। বিচারে কালীকিশোর রায়ের হাজার টাকা, তাঁহার দেওয়ানজীর হাজার টাকা ও তাঁহার অন্যান্য শিক্ষিত কর্ম্মচারিগণের দু'শত টাকা ও পাইক পেয়াদাগণের প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইল। রায়ে নীলমণি দারোগার খুব প্রশংসা উঠিল।

সত্য গোপন থাকিবার জিনিস নহে। মোকদ্দমার বিচারান্তে ছয় মাস মধ্যে প্রচার হইল, এই মোকদ্দমায় কালীকিশোর রায়ের ত্রিশ হাজার টাকা উৎকোচ লাগিয়াছে। নীলমণি ও অমুক থানায় দারোগা এক পয়সাও ঘুষ লন নাই। রমানাথ চক্রবর্ত্তীর আত্মীয়গণ কোনও নূতন কথা তুলিলেন না। তাঁহার আত্মীয়গণ অঙ্গীকার করায় তহবিল তছরূপী দেড় হাজার টাকার বেয়াত পাইয়াছেন ও নগদ হাজার টাকা পাইয়াছেন। পাঁড়ের দেশ হইতে কেহ আসেও নাই, কেহ কিছু পায় নাই। গজপতি পাঁড়েই সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং গজপতি দুই শত টাকা বকসিস্ পাইয়াছেন। যে আটজন পুলিশ কর্ম্মচারী রায় বাড়ির প্রহরায় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা চারি হাজার টাকা পাইয়াছে। এই খুন আস্কারা করায় নীলমণি পাকা দারোগা হইলেন, দুই সহস্র টাকা পুরস্কার পাইলেন ও কাপ্তেন হগের সুদৃষ্টিতে পতিত হইলেন।

ছায়া রহস্য

আলী ইমাম

সেটা ছিল লাল রোদের একটি দুপুর। সামনের বাড়ির পামগাছের ডালে বসে একটি চিল অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে। ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করছি, চিলটা সেখানে বাসা বাঁধার চেষ্টা করছে। আমি মাঝে মাঝে বাইনোকুলার দিয়ে চিলটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছি। ঘাড়ের কাছে খয়েরী পালকের পাশে কিছু শাদা পালকও দেখি। কিছুদিন আগে আমি এ শহরের একমাত্র 'পাখি দেখার ক্লাব' এর সদস্য হয়েছি। কাক, চিল এবং চড়ুই সম্পর্কে একটি বেশ বড় প্রবন্ধ লিখছি। ক্লাবের মাসিক সভাতে সেটি পড়বো। দরকারবোধে পাখিগুলোর কিছু রঙিন স্লাইডও দেখাবো। পত্রিকায় একটি ইন্টারেস্টিং খবর বেরিয়েছে। আমেরিকার একটি তিমি রক্ষাকারী সমিতি ১২০ ফুট লম্বা একটি প্লাস্টিকের তিমির মডেল বাতাস ভরে ভাসিয়ে দিয়েছে। নাম তার 'ফ্লো'। 'ফ্লো' এখন আমেরিকার বিভিন্ন শহরের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। অনেকেই দেখছে সেই ভাসমান তিমিকে। তার গায় বড় বড় করে লেখা "আমাদের তোমরা আর হত্যা ক'রো না। আমরা বেঁচে থাকতে চাই"। এই দশকে তিমি শিকার খুব বেড়ে গিয়েছে। গোপনে বিভিন্ন সমুদ্রে দেদার তিমির হত্যা চলছে।

এই হত্যা লীলার হাত থেকে বাচ্চা তিমিরাও রেহাই পাচ্ছে না। দুরন্ত সমুদ্র তাদের রক্তেও লাল হয়ে যাচ্ছে। হারপুন গেঁথে তাদের শরীরও ঝটপটিয়ে উঠছে। শিকারীদের লোভ তিমির বিশাল চর্বির ভাণ্ডারের দিকে। যেন একটি পুরো কারখানা। তিমির হাড়ও অনেক কাজে লাগে। শাদা তিমির গল্প পড়েছিলাম। প্রাণী বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন এভাবে তিমি হত্যা নির্বিচারে চলতে থাকলে, প্রাণীটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এমনি করে কতো প্রাণী পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে। মরিশাস দ্বীপের ডোডো পাখি, নিউজিল্যাণ্ডের মোয়া পাখি, ক্যারিবিয়ানের কোন কোন দ্বীপের নেনে নামের এক জাতের হাঁস।

সেই বাতাস ভর্তি প্লাস্টিকের তিমি নাকি চেরী ফুলের দেশ, ফুজিয়ামার দেশেও যাবে। সেই দেশে তিমি রক্ষা সমিতির সদস্যদের একটি বিরাট সমাবেশ হবে। কিভাবে প্রাণীটিকে নিষ্ঠুর শিকারীদের হাত থেকে, লোভী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা করা যায় তার আলাপ আলোচনা চলবে। যখন আমি এই খবরটি পড়ছি তখন দরজায় টক টক শব্দ। কে এলো এই দুপুরে। দরজা খুলতেই দেখি পিয়ন। হাতে চিঠি।

আমি দেখলাম লম্বা খামের উপর থোকা থোকা চেরী ফুল আর ফুজি পাহাড়ের ঝকঝকে ডাকটিকিট। বা, অদ্ভুত মিলে গেলো তো ব্যাপারটা। সত্যি, মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনার মিল হয়ে যায় যে রীতিমতো অবাক হয়ে যেতে হয়। টোকিও থেকে এক টি. ভি. কোম্পানী লিখেছে বাংলাদেশের উপজাতীয়দের উপর একটি রঙিন চলচ্চিত্র তুলতে কিছুদিনের মধ্যেই একটি দল আসছে। আমি যেন তাদের সাথে সব রকমের সহযোগিতা করি।

বছর কয়েক আগে একটি জাপানী টি. ভি. দলের সাথে সুন্দরবনে কাজ করেছিলাম। ওরা এসেছিল রহস্যময় সুন্দরবনের উপর তথ্যচিত্র তুলতে। সেই থেকে যোগাযোগ। বাওয়ালীরা কিভাবে বনবিবির উৎসব করে। কিভাবে পাখিদের বলি দেয়, সেসব দৃশ্য তোলার জন্য আমি সাহায্য করেছিলাম। পরিচালক মিঃ হানোদা আমাকে খুশী হয়ে একটি চমৎকার আকাই টেপ-রেকর্ডার উপহার দিয়েছিলেন। আমি তাতে সুন্দরবনের অনেক ধরনের রহস্যময় শব্দ রেকর্ড করে রেখেছিলাম। শীতের সময়ের পাতা ঝরার শব্দ। তীব্র বাতাসে শিসের মত শব্দ করে তখন পাতা ঝরে। হরিণের বাচ্চার করুণ ডাক। ছবি তোলার সেসব দিনগুলো ছিল যথেষ্ট উত্তেজনাময়। নদীর বুক দিয়ে চলেছে আমাদের লঞ্চ। মাছ ধরার নৌকা যাচ্ছে। কতো রকমের মাছ। চান্দা, ভেটকী, পায়রাতলী, কাইন, গলদা, নোনা চিংড়ি। গলদার লাল মগজ গরম ভাতের সাথে মাখিয়ে খেতে সে কি স্বাদ।

কোথায় লাগে তার কাছে মধু। চরপাটা দিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে। ওদের কালো কালো শরীর। বাঁশের শলা দিয়ে পাটা তৈরি হয়। বহুদূর দূর এলাকা থেকে লোকেরা মাছ ধরতে আসে সুন্দরবনে। জালিয়ার চরে মওসুমী বসতি করে। হোগলা পাতার ঝুপড়ি বানিয়ে থাকে। আমরা জালিয়ার চরে সুটিং করেছিলাম। রাশি রাশি মাছ টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। চরের বালুমাটিতে কোথাও কোথাও সবুজ পাতা। পাতার নীচে তরমুজ। কালার ছবিতে খুব চমৎকার এসেছিল। জাপানী টি. ভি. দলটি শুধু বাঘের সন্ধান করতো।

কোথায় পাবে বাঘের দেখা। নদীর এক পাশে ভিজে মাটিতে একবার বাঘের পায়ের

ছাপ দেখা গেল। সেই ছাপের ছবি ক্যামেরায় 'বিগ ক্লোজ আপে' মানে কিনা খুব বড় করে তোলা হলো। মাঝে মাঝে বনের ভেতর দিয়ে ছুটে যায় হরিণের পাল। তাদের ছবি তোলা হয় টেলিলেন্সের সাহায্যে। ভাটি এলাকায় আছে পাখির বাতান। সেখানে গাছের মাথায় এসে থাকে রকমারি পাখি। কুড়া বক, বিল বাগচু। সূর্য ডোবার পর খাবারের খোঁজে এই পাখি বিলের বুকে ঝপাৎ ছপাৎ করে নামে।

একটি ঝোপের কাছে দেখেছিলাম একজন মানুষের বাঘে খাওয়া শরীরের কিছু অংশ। মাছি ভন ভন করছে। সেটার ছবি তুললো হানোদা।

তারপর দেখেছিলাম সেই শব দেহটিকে পাশে ফেলেই অন্য বাওয়ালীরা কাঠ কাটতে, মধু সংগ্রহ করতে বনের ভেতর এগিয়ে যাচ্ছে। জীবিকার তাগিদে ওরা এখান থেকে পালাতে পারে না। হানোদা এক সন্ধ্যে বেলায় লঞ্চের রেলিং-এ হেলান দিয়ে গম্ভীর গলায় আমাকে বলছিল, 'বেঁচে থাকার জন্য কতো কষ্ট করে এখানকার লোক। শুধু কিছু ভাত, নুন আর মাছের জন্য।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে সেসব কথা ভাবছিলাম। আবার কিছু কাজ করতে পারবো ভেবে ভালো লাগছিল।

নির্ধারিত দিনেই জাপানী টি. ভি. দলটি এলো। চার জনের দল। পরিচালক একজন তরুণ। নাম মিসুমিসু। হানোদার প্রিয় ছাত্র। হানোদা তার কাছে নাকি আমার কথা বলেছে। ওরা এসেই কাজের পরিকল্পনা করে ফেললো। সময় নষ্ট করতে মোটেই তারা রাজী নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বছরের এ সময় তাপমাত্রা কি রকম থাকে সেসব তথ্য ওরা নিজ দেশে থাকতেই সংগ্রহ করেছে। এতো গুছিয়ে কাজ করে জাপানীরা যে কোন রকমের অসুবিধে অনুভবই করা যায় না। ঠিক হলো, প্রথমে যাওয়া হবে বান্দরবনে। খুমি আর মুরাংদের জীবন যাত্রার উপর ছবি তুলতে। আমি দেখলাম ওরা আমাদের দেশের উপজাতীয়দের সম্পর্কে অনেক তথ্য জোগাড় করেছে। মিসুমিসুর সাথে খুব ভাব হয়ে গেল আমার। জাপানের একটি টেলিভিশন কোম্পানীর সদস্য হয়ে সে ব্রাজিলের গভীর অরণ্যে ছবি তুলে এসেছে গত বছর। সেটা নাকি দারুণ রহস্যময় এক জায়গা। একদল জংলীর সন্ধান পেয়েছিল যারা পিঁপড়ে খায়। কোনদিন পানির কাছে যায়নি। সমস্ত শরীরে উলকি আঁকা। মিসুমিসুর ইচ্ছে আছে বিভিন্ন দেশের উপজাতীয়দের ঘুমপাড়ানি গান নিয়ে একটি ছবি করার।

'আমি দেখেছি, বিভিন্ন দেশের ঘুমপাড়ানী সুরের মাঝে কথার এক ধরনের চমৎকার মিল আছে। আফ্রিকার জুলুজাতির মা হয়তো তার ছেলেকে ঘুম পাড়াবার সময় ঘুমপাড়ানী মাসিকে লোভ দেখাচ্ছে বাইসনের মাংস দেবে বলে আর তোমাদের দেশে বলছে কাজলী গরুর দুধ দেবে। ল্যাপল্যাণ্ডের মায়েরা বলছে বলগা হরিণের বুটি বুটি ছাল দেবে।'

মিসুমিসুর সাথে কথা বলে আমার চমৎকার লাগল। এ ধরনের লোকদের সাথে কথা বললে কাজ করায় বেশ উৎসাহ পাওয়া যায়। মনে হয় কোন এ্যাডভেঞ্চারে চলে যাই। কোন অরণ্যে কিংবা পাহাড়ে। যেখানে লুকিয়ে আছে গভীর রহস্য। মিসুমিসুর এক ভাই হোক্কাইডার কাছে ছোট একটি দ্বীপ কিনে শ্যাওলার চাষ করছে। শ্যাওলা থেকে চমৎকার সব খাবার নাকি প্রস্তুত করা যায়। আগামী বছর হোক্কাইডোতে ওরা একটি

অদ্ভুত রেস্তোঁরা খুলবে। সেখানের মেনুতে থাকবে আশ্চর্য ধরনের কিছু খাবার। জাপানের বুনো তিতিরের কলজের স্যুপ, শ্যাওলার সালাদ, তাতানি মাছের ডিমের সাথে বন্য পায়রার বুকের নরম মাংসের ভাজি। নানারকমের বনজ লতাপাতা দিয়ে ওরা খাবার তৈরি করবে। রেস্তোঁরাটিতে থাকবে প্রাচীন পরিবেশ। গাছের গুঁড়ি কেটে বানানো হবে বসার জায়গা। গানের পরিবর্তে সেখানে বাজবে বিভিন্ন পশুপাখির ডাক-এর ক্যাসেট। মিসুমিসু তাদের সেই ভবিষ্যতের রেস্তোঁরাতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালো।

পরদিন আমরা রওয়ানা দিলাম বান্দরবনের দিকে। পাহাড়ী পথ। কোথাও কোথাও জুম চাষ হচ্ছে। জঙ্গল পোড়ানো হচ্ছে। এক জায়গায় দেখলাম শসা আর ঢেঁড়সের বাগান। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঁশের ঘর। কাঠের খুঁটির উপর ঘরগুলো। মাটি থেকে পাঁচ, ছয় ফুট উঁচুতে। ঘরগুলো ছনঘাস আর কুরুক পাতা দিয়ে ছাওয়া। মাচানের নীচে হাঁস মুরগী শুকর চরছে।

বান্দরবনের রাজবাড়ি থেকে একটি জীপ সংগ্রহ করলাম। যেতে হবে থানছি থানাতে। সবটা পথ আবার জীপে যাওয়া যাবে না। ওখানেই পাহাড়ের চূড়োতে ঘর বানিয়ে থাকে খুমিরা।

দু'পাশের অপরিচিত গাছপালা আর পাখি দেখে জাপানী দলটি বেশ উল্লসিত। মাঝে মাঝে থেমে কিছু সুটিং করছি। খুমিরা গাছের ডালে ঘর বানায়। আমার মনে হচ্ছিল সুইস পরিবার রবিনসনের কথা। কিভাবে জাহাজে ডুবির পর নির্জন দ্বীপে একটি পরিবার গাছে বাসা বানিয়েছিল। খুমিদের গ্রামের চারদিকে পরিখা। সহজে যাওয়া যায় না। ওরা বেশ বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে। আমরা বান্দরবনের রাজবাড়ির একজন সদস্যকে গাইড হিসেবে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

খুমিদের গ্রাম প্রধানের সাথে কথা বলে ছবি তোলার অনুমতি পাওয়া গেল। আমরা একটি খোলা জায়গায় তাঁবু বাঁধলাম। মিসুমিসুর উৎসাহ ওদের বিভিন্ন উৎসবের ছবি তোলার। একটি উৎসব হলো ছাগল হত্যা। গ্রামবাসীরা শপথ নেবার দিন এ উৎসব করে। অদ্ভুত সুরে বাজনা বেজে উঠলো। খুমিরা উঠানের চারদিকে গোল হয়ে বসে। কয়েকজন লোক একটি ছাগলের পায়ে দড়ি বেঁধে বিভিন্ন দিক থেকে টানতে লাগলো। এমনি করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে গেল ছাগলটি। তখন উঠে দাঁড়ালো খুমি প্রধান। টকটকে লাল চোখ তার। হাতে ধারালো অস্ত্র। এক কোপে ছাগলটিকে হত্যা করে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। সেই রক্তে হাত ভিজিয়ে শপথ নেয় খুমিরা। তারা অনুগত থাকবে। সারা জীবন অনুগত থাকবে গ্রাম প্রধানের কাছে।

হত্যা করা ছাগলটির মাংস তখন কেটে সবার মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়। রক্ত মাখা মাংস। রান্না হবে। ভোজ হবে। সবাই পেটপুরে খাবে। পোষা কুকুরদের দিকেও মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দেবে।

এ ধরনের আরেকটি উৎসবের সুটিং করেছিলাম মুরংদের গ্রামে। উৎসবটির নাম হলো 'নস্যাৎ পা।' জুম চাষের সময় একটি ষাঁড়ের বাচ্চাকে এক জায়গায় ঘেরাও করে আটকে রাখে। তারপর মুরং নারী পুরুষরা নাচতে নাচতে বাঁশের চোখা শলাকা দিয়ে সেই ষাঁড়কে আঘাত করতে থাকে।

তখন মুরংদের খুব নিষ্ঠুর মনে হয়। একটানা বাজনা বাজে। ডিডিং ডং ডিডিং ডং। এমনি আঘাতে আঘাতে কাবু হয়ে যায় ষাঁড়টি। যেই ষাঁড়টি মারা যায় অমনি তার মাংস কেটে নেয় সবাই। আগুনে ঝলসে খায়।

সেদিন সারাদিন সুটিং ক'রে আমরা ক্লান্ত। সাথে বাবুর্চি এনেছি। চমৎকার রান্না করে। কচি বাঁশের ভেতরে চাল ভরে সেদ্ধ করে সেই ভাত খেতে খুব মজা। কেমন মিষ্টি এক ধরনের গন্ধ। কিছু বন মুরগীও আনা হয়েছে। শেষ বিকেলের দিকে আমি আর মিসুমিসু একটু হাঁটতে বেরুলাম। লোকালয় ছেড়ে গেলেই কেমন নিঝুম লাগে পরিবেশ। মনে হয় কোথাও যেন কোন শব্দ নেই। একটি অদ্ভুত আকৃতির পাহাড় দেখে আমরা কৌতূহলী হই।

বুনো গাছপালায় জায়গাটি ঠাসা। তার মাঝে পাহাড়ের একটি গুহামুখ দেখা যাচ্ছে। ছমছমে অন্ধকার। একটা বড় আকারের গিরগিটি সাঁৎ করে এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে চলে গেল। আমি চমকে যাই। গুহাটাকে কেমন রহস্যময় মনে হতে থাকে। আমি মিসুমিসুকে চলে আসতে বলি। সে নাছোড়বান্দা। আমরা শেষ বিকেলের আলোতে গুহার সামনে এসে দাঁড়াই। নীচে আরেকটি গুহা দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে ম্লান আলো যেন সেই গুহার ভেতরে চুইয়ে চুইয়ে নামছে। চারপাশে কোন শব্দ নেই। হঠাৎ মিসুমিসু চমকে আমার হাত ধরে। আমি সাথে সাথে তাকাই। নীচের গুহাটিকে আবছা অন্ধকারে একটি লোকের ছায়া মূর্তি দেখা যাচ্ছে যেন। লোকটি কেমন কুঁজো হয়ে থপথপিয়ে হাঁটছে। যেন আদিম যুগের মানুষ। হাতে একটি পাথরের অস্ত্রের মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে। লোকটির কাঁধে ওটা কি? আমরা কি তাহলে ভূত দেখছি। কে এই লোক। আস্তে আস্তে লোকটির মূর্তি যেন বাতাসের মাঝে মিলিয়ে যায়। সেই দৃশ্য দেখে আমার কেমন শীত শীত করতে থাকে। মিসুমিসুও কেমন চুপ হয়ে যায়। আমরা দু'জন মুরং পাড়ায় হেঁটে আসি। আমাদের মাথায় শেষ বিকেলের সেই গুহার আবছা দৃশ্যটি দপদপ করতে থাকে।

পরদিন খুব সকাল হতেই আমি আর মিসুমিসু সেই গুহার দিকে রওয়ানা দেই। ফকফকে আলো চারদিকে। উজ্জ্বল আলো থাকলে ভয় কম লাগে। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামতে আমাদের খুব কষ্ট হয়। বুনো গাছের কাঁটায় শরীরের অনেকটা অংশ ছড়ে যায়। শক্ত লতা ধরে আমরা নেমে যাই। আমার তখন টার্জানের ছবির কথা মনে হয়। লাল মুখের কয়েকটা বাঁদর কিচকিচ করে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফাতে থাকে।

পায়ের নীচে লম্বা ঘাস। সরসর শব্দ হচ্ছে। এক জায়গায় দেখি কয়েকটি পাখির কঙ্কাল পড়ে আছে।

সামনেই সেই গুহামুখ। ভেতরে থিকথিকে অন্ধকার। একটা বড় বাজপাখি মাথার উপর দিয়ে চক্কর মারতে মারতে উড়ে গেল। উপরের দিকে তাকাই। গতকাল বিকেলে যেখানটায় আমরা দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখেছিলাম, সে জায়গাটিকে চিনতে পারি। আমরা আস্তে আস্তে গুহার ভেতরে প্রবেশ করি। গতকালের দেখা সেই লোকটির আস্তানা এটা। ভেতরে ঢুকে আমরা টর্চ জ্বালাই। এক ধরনের ভ্যাপসা গন্ধ। গুহাটি বেশ পরিষ্কার। আমরা এদিক ওদিক তাকাই। কোথাও সেই মৃত বাইসনটা নেই। কোন লোকের থাকার কোন রকমের চিহ্ন নেই। এই গুহাতে যে কেউ বহু বছর ধরে বাস করে না, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত হই। তবে গতকাল শেষ বিকেলের আবছা অন্ধকারে

আমরা কাকে দেখে ছিলাম! মিসুমিসুকে খুব চিন্তিত মনে হয়। কী যেন গম্ভীর ভাবে ভাবছে। গুহার ভেতরে পায়চারী করছে।

ঃ তুমি ঠিক জানো, এই জঙ্গলে বাইসন পাওয়া যায় না? মিসুমিসু আমাকে প্রশ্ন করে।

ঃ মোটেই পাওয়া যায় না। তবে কয়েক হাজার বছর আগে নাকি এদেশে বাইসন পাওয়া যেত। বইতে পড়েছি। এমনকি নোয়াখালীর বিভিন্ন চরে, দ্বীপ হাতিয়াতে, সন্দ্বীপের ঘাসের বনে বাইসন চরতো বলে জানা গেছে।

মিসুমিসুর মুখটাকে একটু উজ্জ্বল মনে হয়। যেন রহস্যের কালো পর্দাটির মাঝে একটুখানি আলো পেয়েছে।

ঃ তোমাদের এই অঞ্চলে কবে থেকে মানুষ বাস করছে?

ঃ নতুন পাথরের যুগ থেকে। সীতাকুণ্ডের পাহাড়ের কাছে নতুন পাথরের যুগের বেশ কিছু অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়েছে বছর কয়েক আগে। সেগুলো ঢাকা মিউজিয়ামে রাখা আছে।

মিসুমিসুকে এবার বেশ গম্ভীর দেখায়।

ঃ গতকাল বিকেলে আমরা যে বাইসন শিকারীকে এই গুহাতে দেখেছি সে এ যুগের নয়। সে নতুন পাথরের যুগের মানুষ।

ঃ মানে?

ঃ আর আমরা কোন আসল লোককে দেখিনি। চার হাজার বছর আগের ছায়াকে দেখেছি।

সেই কথা শুনে আমার আবার কেমন শীত শীত করতে থাকে।

ঃ ঠিক এ ধরনের একটি ব্যাপার ব্রাজিলের জঙ্গলের এক পাহাড়ের গুহাতেও দেখেছিলাম। তারপর দেশে ফিরে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের সাথে আলাপ করি। তাঁরা আমাকে নতুন রহস্যের সন্ধান দেন। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম, একটি মানুষ এক জায়গায় কিছুক্ষণ থেকে উঠে গেলেও তার অবয়বের ছায়াটি সেখানে কিছুক্ষণের জন্য থাকে। যেটা ঠিক খালি চোখে দেখা যায় না। বিশেষ উত্তাপের সাহায্যে সে ছায়া অবয়বের কাঠামোকে দেখা যায়। রাশিয়াতে বর্তমানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে। এর নাম হলোগ্রাফী পদ্ধতি। হাজার বছর আগে নতুন পাথরের যুগের সময় এই গুহাটিতে সেই বাইসন শিকারী বাস করতো। সে হয়তো এক বিকেলে জঙ্গল থেকে একটি বাইসনকে হত্যা করে কাঁধে ফেলে তার সেই গুহাতে ফিরে এসেছিল। তার সেই দিনের ছায়ার ভিডিও ইমেজ যে কোনভাবেই হোক গুহার আবছা অন্ধকারে বন্দী হয়ে আছে। গুহাতে সেই বিশেষ এক ধরনের উত্তাপ সৃষ্টি হলেই সেই ছায়া মূর্তি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। আমরা গতকাল সেই বাইসন শিকারীর সচল ছায়াকেই দেখেছি। এ এক রহস্য।

আমি আর মিসুমিসু গুহার আবছা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলাম।

মিসুমিসু শুধু বললো, 'কতো অদৃশ্য ছবি আমাদের চারপাশে মিশে আছে। যদি সেগুলো দেখতে পারতাম।'

কয়েকটা পাখি ডানায় রোদ মেখে সামনের ঝোপ থেকে হঠাৎ উড়াল দিল।

pathagar.net

দুই ডিটেক্‌টিভ, দুই রহস্য

পরিমল গোস্বামী

আমি একটি যুবককে অনুসরণ করছি, পাঠক, তুমি আমাকে অনুসরণ কর। ওই যে গান্ধী-টুপি পরা যুবকটি চলেছে, ওর নাম বেণীমাধব। ওর একটি ইতিহাস আছে, আমি সেই ইতিহাসটি অনুসরণ করছি। ওর সেই আশ্চর্য কাহিনীটি আমি শুনেছি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে এবং সে তারও বন্ধু।

বেণীমাধব ছিল কলেজের ছাত্র এবং ঘোর বাবু। স্বাস্থ্য তার ভালো, বয়সোচিত উদ্দীপনা আর উৎসাহের অভাব ছিল না, পড়াশোনায় ছিল প্রখর। বৃত্তি পাওয়া ছেলে। কিন্তু উৎকৃষ্ট কুসুমেও যেমন কীট প্রবেশ করে, এই যুবকটির মধ্যে তেমনি এক ব্যাধির প্রবেশ-লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। লক্ষণ যেটি সব চেয়ে প্রবল বোধ হল, সে হচ্ছে পারিবারিক আকর্ষণে শৈথিল্য, ঘরের প্রতি ঔদাসিন্য। এ ক্ষণটি তার মায়ের চোখে আগে ধরা পড়ল। তিনি মনে মনে নানা কল্পনা করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু মনে হয় কিছু বুঝতে পারলেন একদিন। বুঝে বড়ই ভাবনায় পড়লেন। তিনি ছেলের ঘরে গিয়ে একদিন আবিষ্কার করলেন তার টেবিলে যে ক'খানা পড়ার বই ছিল,

তার সংখ্যা অকারণ অনেক বেড়ে গেছে। তিনি ইংরাজি বই পড়া শেখেননি কখনও, কিন্তু বইয়ের মলাটে যে চিহ্ন ছিল তা থেকে তিনি চকিতে বুঝতে পেরেছিলেন অবস্থা খুব সুবিধের নয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল, ছেলের প্রসাধনেও বেশ বদল ঘটেছে অর্থাৎ এদিকেও তার ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছে। একটি চুল বেঁকে দাঁড়ালে যে ছেলে তাকে প্রাণপণে সোজা করতে বসত, সেই ছেলের দু-তিনটি চুল কিছু কাল ধরে খাড়া থাকতে দেখেছেন, এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত, উদাস এবং স্বপ্ন স্বপ্ন ভাব। সব মিলিয়ে মায়ের প্রাণ থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল। একটা অজানা আশঙ্কা, অথচ মুখ ফুটে কাউকে তা বলবার উপায় নেই, অশুভ কথাটা উচ্চারণ করতে তাঁর মুখে আটকায়।

বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকে না। তার ছোট বোনকে সে ডেকে ডেকে পড়াত, এখন আর পড়ায় না। সে জন্য তার মন ভার। তার বাবা লক্ষ্য করেও করলেন না, ভাবলেন ও বয়সে তিনিও ওই রকম হয়েছেন কোনও আদর্শবাদ মাথায় ঢুকে থাকবে, কিন্তু সে আর কত দিন।

কিন্তু তাঁর অনুমান ঠিক হল না। ক'দিন নয়, বছর খানেকের মধ্যে ব্যাধির লক্ষণ এমন বেড়ে গেল যে তাঁর পক্ষেও আর চুপ করে থাকা চলল না।

কিন্তু রহস্য ভেদ করার কাজ হচ্ছে ডিটেকটিভদের, আপন ছেলের বিষয়ে কোনও রহস্য বাপ ভেদ করতে স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করে, এ ক্ষেত্রেও তাই হল ; রাধামাধব সে রকম চেষ্টা করলেন না, শুধু স্ত্রীকে বললেন, কৌশলে মেয়েটার পরিচয় নাও, এবং নিতান্ত অসম্ভব না হলে সব ঠিক করে ফেলো। কিন্তু স্ত্রী তো ভিতরের খবর জানেন, কাজেই তাঁর ভয় আরও বেড়ে গেল। তিনি আরও জানেন ছেলের যে ব্যাধি তিনি অনুমান করেছেন, তার বিষয় কিছুই না জেনে যদি প্রেসক্রিপশনে কোনও বিয়ের কনের ব্যবস্থা করতে হয়, তা হলে হিতে বিপরীত হবে। তিনি একটা অজানা ভয়ে অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন, অথচ মনের মধ্যে যে কথাটি কাঁটার মত বিঁধে আছে, তা কতবার তিনি বলতে গিয়েও মুখে আটকে গেছে, বলতে পারেননি।

পাঠক তুমি কি কিছু অনুমান করতে পার? না কী করে পারবে, তুমি তো ডিটেকটিভ নও। আধা ডিটেকটিভ হতে গিয়ে যিনি পিছিয়ে এসেছেন, তাঁর কথাই তো এতক্ষণ বলছিলাম, তিনি বেণীমাধবের মা। তিনি মনের সব কথা সম্পূর্ণ গোপন করে স্বামীকে ভারী গলায় বললেন, দেখ চেষ্টা করে, আমি এর মধ্যে নেই। কিন্তু রাধামাধব প্রিনসিপল-ওয়ালা লোক, তিনি নিজে এ দায়িত্ব নিতে চান না। এবং আসল কথা না জেনে কনে দেখতেও রাজী নন। মস্ত বড় সঙ্কট। তিনি একটি সম্পূর্ণ রাত শার্লক হোমস-এর অনুকরণে বসে বসে তামাক খেলেন এবং সামান্য কয়েকটি সূত্র ধরে ইনডাকটিভ এবং ডিডাকটিভ উভয়বিধ পদ্ধতিতে চিন্তা করেও কিছুই কিনারা করতে পারলেন না। সকাল বেলা শুধু তাঁর মাথা দপদপ করতে লাগল চোখ দুটি রক্তবর্ণ ধারণ করল, এবং মেজাজ বিগড়ে গেল। তিনি মনে মনে একটি শপথ করে বসলেন এবং যে বিষয়ে এতদিন তিনি প্রায় উদাসীন ছিলেন, সেই বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তবে ছেলের ব্যাপারে নিজে ব্যক্তিগত ভাবে হস্তক্ষেপ করবেন না, এ নীতিটি তিনি

তখনও বজায় রাখলেন।

পাঠক, তুমি কি ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস সরকারের কথা ভুলে গিয়েছ ; অবশ্যই ভুলতে পার না। সে সামান্য চার পাঁচটা রহস্য ভেদ করেই তো ভারত বিখ্যাত হয়েছিল, সে কথা কে না জানে? তবে তাকে আমরা বহু দিন দেখিনি। কিন্তু দেখিনি বলেই যে সে লাম্বার রুমে পড়ে পড়ে গায়ে মরচে ধরাচ্ছে, তা মনে করার কোন হেতু নেই। সে আজ কয়েক বছর ধরে ইউরোপের নানা জায়গায় মেক-আপ বিদ্যা, ছদ্মবেশ ধারণের নতুন নতুন কৌশল শিখে বেড়িয়েছে। ছদ্মবেশ ধারণে তার তুল্য এখন ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। শুধু ছদ্মবেশ নয়, সে এখন অসাধ্য সাধন করতে পারে। খাড়াভাবে পোঁতা গ্রীজপোলের মাথায় সে শুধু দু-খানা পায়ের সাহায্যে, দেহটিকে পোলের সমকোণ অবস্থায় রেখে উঠতে পারে। ওঠবার সময় দু'হাতে তার প্রিয় যে-কোন একখানা বই পড়ে। অথবা নোট লেখে। বেণীমাধবের বাবা এই ব্রজবিলাসকেই নিযুক্ত করলেন পুত্রের রহস্য ভেদের কাজে। কিন্তু ফী হাজার টাকার নিচে সে কিছুতেই নিতে রাজী হল না। এই রকমই হয়। আগে সে পাঁচ টাকা বা সাড়ে সাত টাকায় যে কোনও রহস্য ভেদ করত, এখন বিদেশ ঘুরে এসে তার দাম বেড়ে গেছে। রাধামাধব কৃপণ নামে বিখ্যাত, তাঁর পক্ষে এত টাকা এক সঙ্গে দেওয়া প্রাণান্তকর। অথচ ব্রজবিলাস সব টাকা অগ্রিম না নিয়ে কাজ করবে না। শেষে তিন দিনের কচলা-কচলির পরে ব্রজবিলাস দুটি কিস্তিতে টাকা নিতে রাজি হল এবং পাঁচশ টাকা অগ্রিম নিয়ে টাকার রসিদ এবং রহস্য ভেদের গ্যারাণ্টি পত্র লিখে দিয়ে বিদায় নিল।

পাঠক, ওই যে দেখতে পাচ্ছ রাজপথে বেণীমাধবের থেকে দশ-বারো হাত দূরত্ব বজায় রেখে একটি শুকনো নোংরা কুকুর তাকে অনুসরণ করে চলেছে, ওটি আসলে কুকুর নয়। ওই হচ্ছে ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস সরকার। কিন্তু সে নিশ্চিন্ত মনে চলছে না, ছদ্মবেশ ধরা পড়ার ভয়ে নয়, তার ভয় কর্পোরেশন থেকে তাকে ধরে নিয়ে না যায়। কর্পোরেশন থেকে কুকুর ধরার হিড়িক চলছিল তখন অবশ্য সে অন্য যে-কোনও ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারত, কিন্তু তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না, এই বিশেষ কেস্‌টিতে কুকুর সাজাই নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন হলে সে পাখি সাজতেও পারে, এমনি তার বিদ্যা। এই তো এক বছর আগে পরীক্ষামূলকভাবে সে লণ্ডনে একটি কেস্‌ হাতে নিয়ে ভারতীয় ময়না সেজে অপরাধীর বাড়িতে গিয়ে ধরা দিল এবং সেখানে খাঁচায় অতি আদরে পালিত হয়ে তাদের সমস্ত গোপন তথ্য জেনে নিল এবং খাঁচা থেকে পালিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এসে সব জানিয়ে দিল। ব্লেকও এই কেস হাতে নিয়েছিল, কিন্তু ব্লেক ছুটে আসার আগেই ব্রজবিলাসের সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। ব্লেক পরাজিত হয়ে ফিরে গেল, বলল এ সব ভারতীয় ম্যাজিক। কিন্তু ইয়ার্ডের পুলিশ কমিশনার ব্রজবিলাসের অপ্রত্যাশিত সাফল্যে মুগ্ধ এবং গদগদ হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে এমন চুমো খেয়েছিলেন যে সে দাগ তার মুখ থেকে এখনও মেলায়নি। কমিশনার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ব্রজবিলাসের প্রশংসা-পত্র দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্রজবিলাস তা নিতে অস্বীকার করে হেসে বলেছিল, আর ওসব কেন, এই দাগ রইল, এটাই বড় সার্টিফিকেট।

ব্রজবিলাস পুরো একটি সপ্তাহ বেণীমাধবকে অনুসরণ করে ডায়েরির পাতা বিচিত্র

তথ্য বোঝাই করে ফেলল এবং অতি সহজেই রহস্যের তলদেশে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু তখন রাধামাধবকে জানাল না, কারণ মাত্র সাত দিনে কাজ উদ্ধার হয়েছে দেখলে রাধামাধব ভাববে এমন সহজ কাজের জন্য এতগুলো টাকা জলে গেল। তাই সে পনেরো দিন পরে আরও একবার বেণীমাধবকে শেষবারের জন্য (এর প্রয়োজন ছিল না, তবু ডাকল নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য) অনুসরণ করে কুকুরের বেশেই রাধামাধবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। রাধামাধববাবুর প্রতিদিনই ব্রজবিলাসের অপেক্ষা করছিলেন এবং তাকে না দেখে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, এমন সময় ব্রজবিলাসের পরিবর্তে দরজায় এক শুকনো কুকুর দেখে ভীষণ বিরক্ত হয়ে লাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করতে গেলেন। কুকুরবেশী ব্রজবিলাস মানুষের ভঙ্গিতে দুপায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি চিনতে পারেননি, তাতে আমি খুশিই হয়েছি ; শুনুন, আপনার পুত্র কমিউনিস্ট হয়েছে, আর কোনও ভাইস তার নেই। তাকে আমি দু'ভাবে বিচার করেছি-কুকুর সেজে তাকে অনুসরণ করে দেখেছি কোথায় কোথায় সে যায়, এবং নিজে মার্কসবাদী সেজে তার সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, তার বিশ্বাসকে কারো নাড়া দেবার সাধ্য নেই। অমি অবশ্য প্রায় ছাত্ররূপে দীক্ষিত হতেই গিয়েছিলাম, তর্কও করেছিলাম, কিন্তু পরাজিত হয়েছি। অবশ্য জোর করে বিশ্বাসকে নাড়া দিতে গেলে সে অবিশ্বাস করত, আমাকে সন্দেহ করত। কিন্তু এ বিষয়ে তার জ্ঞান দেখে অবাক হয়েছি, আমাকে সে অনেক কিছু শেখাতে পারে। যাইহোক, তার সম্পর্কে আমাকে যা জানতে দিয়েছিলেন, তা জানিয়েছি, এবারে বাকি টাকাটা দিয়ে দিন।

রাধামাধব সব শুনে ক্ষেপে গেলেন। বললেন, আমি এর একটা কথা বিশ্বাস করি না, তুমি ভুল লোককে অনুসরণ করেছ।

আসন্ন বিপদ বুঝে তাঁর স্ত্রী ছুটে এলেন সেখানে এবং বললেন, উনি মিথ্যা বলেননি, আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম সব, কানেও এসেছে অনেক কথা।

রাধামাধববাবু এবারে আরও ক্ষিপ্ত হলেন, বলেন, তুমি-তুমি জানতে, বলনি? হাজার টাকা খরচ করালে এ জন্য?

স্ত্রী তাঁকে বললেন, তুমি এখন একটু থামতো, কেন বলিনি সে কথা তোমাকে পরে বলব, আপাতত তুমি ওঁর সঙ্গে কথা মিটিয়ে ফেলো। আর ব্রজবিলাসবাবু, আপনি ওই কুকুরের ছদ্মবেশ ছাড়ুন, একটা কুকুরকে আপনি বলতে আটকাচ্ছে।

রাধামাধব এতক্ষণে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন এবং অপরিচিত লোকের সামনে দাম্পত্য কলহ শুরু করে কিছু লজ্জিতও হয়ে পড়েছেন। তিনি স্ত্রীর কথার প্রতিধ্বনি করে অনেকটা শান্ত সুরে ব্রজবিলাসকে বললেন, আপনি বলতে আমারও আটকাচ্ছে, আমি আগে তুমি বলে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না।

ব্রজবিলাস বলল, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্রজবিলাস নিজ মূর্তিতে বেরিয়ে এল, কুকুরের ছালটা তার হাতে ব্যাগের মতো ঝুলছে।

কিন্তু রাধামাধববাবুর উদ্বেগ কমল না। তিনি উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন এবং হঠাৎ ব্রজবিলাসের দিকে ফিরে বললেন ওকে ফেরাবার উপায়

কী? ব্রজবিলাস বলল, সে কাজ আমার নয়। আমার কাজ আমি করেছি, টাকাটা দিয়ে দিন। রাধামাধববাবু ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ব্রজবিলাসের প্রাপ্য বাকি টাকাটা দিয়ে দিলেন।

পাঠক, শুনে দুঃখিত হবে, রাধামাধব পুত্রকে ফেরাতে পারলেন না। ফেরানোর উপায় চিন্তা করতে না করতে শোনা গেল ছেলে কোন্ এক আইন অমান্য দলে ধরা পড়েছে এবং ইনকিলাব জিন্দাবাদ করতে করতে জেলে গিয়েছে। জেল হয়েছে এক বছরের। এ সংবাদে বেণীমাধবের বাবা ও মায়ের কি অবস্থা হল তা আমাদের জানবার দরকার কী? কোন নায়কের বাপ মাকে নিয়ে পাঠকদের কোনও মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু পাঠক, তোমার পুত্র কখনও জেলে গিয়েছে কি? যদি না গিয়ে থাকে, তবে আর ওদের দুঃখ কল্পনা করতে চেষ্টা করও না, দরকারও নেই। মাত্র একটি বছর। কিন্তু তা কত দীর্ঘ-তা নির্ভর করে বছরটা যায়, তার উপর। পাঠকের কাছে এই এক বছর দশ বছর মনে হতে পারে যদি বলতে আরম্ভ করি কিন্তু নাঃ, বলব না। বেণীমাধবের বাপ-মায়ের কাছে এই এক বছর অবশ্যই একটা যুগ মনে হল, কিন্তু সব যুগেরই পার আছে এবং সে পার শুধু ক্যালেণ্ডারের বছরই হয় না, মানুষের মনের বছরেও পার হয়। কিন্তু পাঠক, তত্ত্বকথা শুনতে চেয়ো না, ঘটনা অনুধাবন করার চেষ্টা কর। বেণীমাধবের মুক্তির আর সাত দিন মাত্র বাকি, এমনি সময় সে তার বাবাকে জানাল তাকে অবিলম্বে খদ্দেরের ধুতি পাঞ্জাবি এবং একটি গান্ধী টুপি পাঠিয়ে দেওয়া হোক। এই অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত খবর পেয়ে রাধামাধববাবু প্রায় নাচতে শুরু করলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, পুলিশকে এ জন্য তিনি পুরস্কার দেবেন। এত বড় মহৎ কাজ আর কারও দ্বারা সম্ভব হত না। অবশেষে এল মুক্তি দিবস। বেণীমাধব চমৎকার কংগ্রেসী পোশাকে সেজে, গান্ধী টুপি মাথায়, বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে জেলখানা মুখরিত করে বাইরে বেরিয়ে এল। কংগ্রেসের এক বিরাট দল তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বলল, এ দলের পুরোভাবে রাধামাধব। তিনি কোনও দলেই ছিলেন না, কিন্তু ছেলে খদ্দর-পোশাক চাওয়ার পরই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসী পাঠক, তোমার কোনও কমিউনিস্ট ছেলে হঠাৎ কখনও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে কি? না দিলে, বুঝতে পারবে না রাধামাধব ও তাঁর স্ত্রীর মনে আজ কি আনন্দ। বিশেষ করে তাঁরা এখন কংগ্রেসী হওয়াতে আনন্দের পরিমাণ শতকরা অন্তত পঁচিশ গুণ বেড়ে গেছে, এই বুদ্ধিটাও তোমার মনে কোনও আলোড়ন জাগাবে না। কিন্তু না জাগায় যদি বয়েই গেল। অতএব সে কথা থাক। পরবর্তী সমস্যা তাঁদের নয়, বেণীমাধবের বন্ধুদের। কারণ সে গান্ধিটুপি পরার পর থেকে আর তাদের সঙ্গে মেশে না। পথের ছেলেরা বেণীমাধবের মাথার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে, বেণীমাধবের ধ্বজা দেখে যা। বেণীমাধব অবশ্য এতে বিচলিত হয়না। বেণীমাধব কাউকে কিছুই বলে না, মনটা তার কিছু বিষণ্ণ, অথচ তার কোনও হেতু খুঁজে পায় না কেউ। অতএব কানা-ঘুষো চলতে থাকে নানারকম। অনেক জাগতিক ঘটনার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না একথা সত্য, এমন কী অনেক মানসিক ঘটনার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না এ কথাও সত্য, কিন্তু তাই বলে কেউ চুপ করে বসে থাকে কি? থাকে না। বেণীমাধবের বন্ধুরাও চুপ করে বসে

রইল না।

পাঠক, এইবার বেণীমাধবের এক অভূতপূর্ব বন্ধু ধনঞ্জয় গুপ্তকে (কঃ পাঃ) অনুকরণ করি এস। ওই যে বসে আছে ডিটেকটিভ ব্রজবিলাসের মুখোমুখি। ব্রজবিলাস বলছে, হাজার টাকার নিচে আমি কোনও কেস নিই না। ধনঞ্জয় প্রাণপণে বোঝাচ্ছে এ কোনও লাভের ব্যাপার নয়, একটি বিশুদ্ধ রহস্য, এ রহস্য আদৌ ভেদ করা যায় কি না তা দেখতে কী আপনার কৌতূহল নেই? থাকা তো উচিত। ব্রজবিলাস নিবিষ্ট মনে পাইপ টানতে টানতে বলল, রহস্যের জন্য রহস্য-আর্ট ফর আর্টস সেই-কথাটা শুনতে মন্দ নয়! কিন্তু আমি সে অবস্থা পার হয়ে এসেছি। আপনি বরং আমার ভূতপূর্ব সাকরেদ শম্ভুর কাছে যান, সেও খুব ওস্তাদ ডিটেকটিভ এবং শস্তাও বটে। তার ফী মাত্র আড়াই টাকা, এখনও দর বাড়ায়নি। কী কষ্টে যে সংসার চালায়, কিন্তু লোকটা খাঁটি। তাকে আমি আমার সহকারী করে নেব কিছুদিনের মধ্যেই। যাবেন তার কাছে? এই নিন তার কার্ড।

আড়াই টাকার কথা মন্ত্রের কাজ করল। ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ শম্ভুর কাছে চলে গেল।

পাঠক। শেষ অধ্যায়টি বড়ই জটিল, বড়ই করুণ এবং নিরাশায় ভরা। কিন্তু শম্ভুর অসাধারণ কৃতিত্বের কথায় এ সবের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। শম্ভু কেসটি হাতে নিয়েই বেণীমাধব যে জেলে ছিল সেখানে চলে গেল। তার পরিচয় পুলিশ মহলে জানা, অতএব কোনও অসুবিধে হল না। সে প্রথমে বেণীমাধব যে ঘরটিতে ছিল সেখানে গিয়ে বসল। তারপর গুরুর অনুকরণে এক পাইপ তামাক খেলো বসে বসে। এক ঘণ্টা লাগল। এক ঘন্টার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হয়ে গেল, কিন্তু তার আচ্ছন্ন বুদ্ধিও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বেণীমাধবকে একখানা চেয়ার ও টেবিল দেওয়া হয়েছিল, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বসে শম্ভু আবার তামাকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটি কাগজ, ছোট্ট এবং দুমড়ানো, টেবিলের নিচে দেয়ালের অন্ধকার কোণে পড়ে আছে। সেখানা খুলে তার লিখন পাঠ করতেই তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবং সে অবিলম্বে তার হাত-ব্যাগ থেকে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বার করে টেবিলের উপর অদৃশ্য কোনও বস্তু খুঁজতে লাগল। লিখনটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। বঞ্চিত জিনিস তাকে পেতেই হবে টেবিলে। দুই আর দুই চার এই অমোঘ বিধান আজও কেউ বদলাতে পারেনি, ধোঁয়া থাকলে আগুন থাকতেই হবে, এ কথাও তো সকলের জানা। কিন্তু ডিটেকটিভের কাজ ঠিক এর উল্টো দিক থেকে শুরু করতে হয়। অর্থাৎ আগুন যখন আছে, তখন কালো ধোঁয়া অবশ্যই ছিল, অতএব তার চিহ্ন তাকে অবিষ্কার করতে হয়।

শম্ভু অল্পক্ষণের সন্ধানেই প্রচুর চিহ্ন পেয়ে গেল, এবং তা খুব যত্ন করে একখানা ছুরির সাহায্যে জড়ো করে প্লাস্টিকের একটি কৌটোয় সংগ্রহ করে রাখল। তারপর সে গেল জেল-ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে। সেখান থেকে সে গেল ওষুধ তৈরির ঘরে। কম্পাউণ্ডারের কাছ থেকে সে অনেক কিছু জেনে নিল।

পাঠক ভাবছ, শম্ভু যদি সবটা আগেই বুঝে থাকে, তাহলে এত কাণ্ড করার দরকার কী। কিন্তু এরকম ভাবা ঠিক নয়। সব জানলেও, সব মিলিয়ে না দেখলে ডিটেকটিভ কখনও তৃপ্ত হয় না, গল্পেরও সাসপেন্স নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু পাঠক, ওই দেখ, শম্ভু বাড়িতে এসে তার গবেষণা ঘরে বসে জেল থেকে সংগৃহীত এক শিশি ক্লু মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলে দেখছে আর শিস্ দিচ্ছে। শম্ভু বড় ডিটেকটিভ হবার জন্য নিজে কয়েক বছর মেডিক্যাল কলেজে পাঠ নিয়েছিল।

পাঠক, আর দেরি নয়, এবারে রহস্য ভেদ! ওই যে ধনঞ্জয় বসে আছে শম্ভুর সামনে। শম্ভু অগ্রিম এক টাকা নিয়েছিল, বাকি দেড় টাকা নিয়ে তার অদ্ভুত রহস্যভেদের কথা বলতে আরম্ভ করল। দেখুন ধনঞ্জয়বাবু, এটি বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক কেস্। বেণীমাধব চেহারা বিষয়ে ছিল অত্যন্ত মনোযোগী এবং সে কথা আপনি যেদিন আমাকে কেস্ দেন, সেইদিন বলেছেন। আরও বলেছেন, সে তার চুল বিষয়ে আগে অত্যন্ত বিলাসী ছিল, কিন্তু কমিউনিস্ট হওয়ার পর চেহারা চুল এবং পোশাক, সব বিষয়েই উদাসীন হয়ে পড়েছিল এবং আমি সে কথা বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন, মনের কোন বাসনা দমিত থাকলে ভবিষ্যতে যে-কোন সময় তা আবার জাগতে পারে। বেণীমাধবেরও তাই হয়েছিল, সে কিছুদিন জেল বাসের পরেই চুল সম্পর্কে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দৈব ছিল প্রতিকূল, হঠাৎ তার মাথায় অতি মারাত্মক রকমের একজিমা দেখা দেয় এবং তার ফলে সে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে। পাঠক, তুমি কখনও কারও মাথায় একজিমা হতে দেখেছ? না দেখলে বুঝতে পারবে না তা কী ভয়ঙ্কর হতে পারে। বেণীমাধবেরও অবস্থা তাই হল এবং ক্রমে তার চুল উঠে যেতে লাগল! এই চুল উঠে যাওয়ার মধ্যে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। এলোমেলোভাবে এক এক জায়গা থেকে এক এক গোছা উঠে গেল। তাই জেল থেকে তার মুক্তির দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, ততই লজ্জায় ক্ষোভে সে অস্থির হতে লাগল। শেষে একদিন স্থির করল, সে আত্মহত্যা করবে। সমস্ত রাত সে চিন্তা করল, কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব, তা তার মাথায় এল না। শেষে হঠাৎ এক সময় সে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। এখন ওটাই তার একমাত্র পথ। সে স্থির করল, কংগ্রেসে যোগ দেবে।

তার পরের ঘটনা পাঠকের জানা আছে। লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য গান্ধী টুপি পরা ভিন্ন সত্যিই তার আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু হাজার টাকা খরচ করলেও সে রহস্য ভেদ করা কঠিন ছিল, শম্ভু আড়াই টাকা ফী নিয়ে গান্ধী-টুপির নিচে মাত্র পাঁচ ইঞ্চি জায়গার মধ্যে এত বড় একটা রহস্যের সন্ধান পেল, এ জন্য আমি তার সঙ্গে দেখা করে তাকে চুমো খেয়ে এসেছি। আশা করি পাঠক আমার অনুকরণ করবে না, তুমি, নিজ রুচিতে যা বলে, তাই করবে।

সাজানো রহস্য

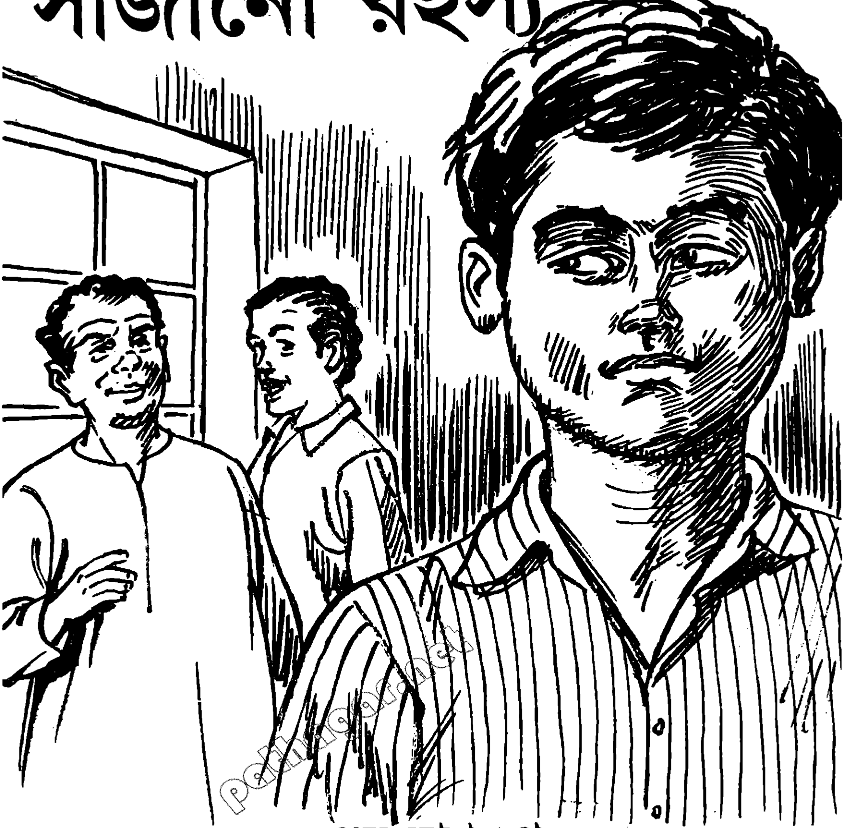

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

মিতুন মানে শুভ্র সান্যাল গোয়েন্দা গল্প পড়ে গোগ্রাসে। শার্লক হোমস, এরকুল পিয়ারো থেকে শুরু করে ব্যোমকেশ বক্সী, পরাশর বর্মা কিংবা কিরীটি রায় গোয়েন্দা হিসেবে তার আদর্শ। সে এখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। সে ভাবে বড় হলে সে এক বিশাল মাপের ডিটেকটিভ হবে। কবে যে বড় হবে! অভ্রদা তার থেকে মাত্র সাত বছরের বড়। অথচ কেমন জেণ্টলম্যান হয়ে গেছে। রোজ দাড়ি কামায়।

দাদু বলে 'তুই কি করে ডিটেকটিভ হবি? তোর কব্জি কি অভ্রর মতো? শক্তপোক্ত না হলে কি আর দুরন্ত সব ঝঞ্ঝাট বাঁধানেওয়ালার মোকাবিলা করতে পারবি!'

মিতুন ফোঁস করে ওঠে 'তুমি কি জানো না বুদ্ধিমানরা রোগাই হয়?' মিতুন প্রতি বছর ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছে। অভ্রদা কোনও মতে টেনেটুনে পাশ করছে। পড়ার নামে অষ্টরম্ভা কিন্তু শরীর চর্চায় ঘাটতি নেই। রোজ ঘোড়ার মতো ভেজানো ছোলা খায় আড়াইশ গ্রাম। সে তো সকাল ছটার ব্যাপার। আটটার সময় খান পাঁচেক রুটি। দুটি ডিম সেদ্ধ, দুটি টম্যাটো আর সব্জীসেদ্ধ। মিতুন পরের খাবারের কথা ভাববে না। মরুক

গে—যারা কম খায় তারা ইনটেলেকচুয়াল হয়।

মিতুন কী চমৎকার ইংরেজি বলতে পারে! ইউ. এস. এ. থেকে বাবার বন্ধু চস্টারটন সাহেব এসেছিলেন। তিনি তো মিতুনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অভ্রদা কেমন কাচুমাচু করে খাবারের টেবিলে বসেছিল। ইয়া, ওকে, থ্যাঙ্ক ছাড়া কিচ্ছু বলতে পারে নি। তখন অবশ্য মিতুনের খুব মায়া হয়েছিল। হাজার হোক নিজেরই দাদাতো। তখন ভেবেছিল দাদাকে সে তার অ্যাসিস্টেন্ট বানাবে। কিন্তু পরের দিনই দাদার থাপ্পড় খেয়ে সে ইচ্ছেয় জল ঢেলে দিয়েছে।

দাদুই তার একমাত্র বন্ধু। সবসময় দাদুর সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয় যদিও ; বিশেষত দাদার হয়ে দাদু যখন কথা বলে। দাদু ওর গল্প করার সঙ্গী খেলার সঙ্গীও। এরই মধ্যে দাদুকে সে পাঁচবার কিস্তি মাত করেছে দাবায়। এদিকে দাদু যে তাকে তিন হাজার বার মাত করেছে সেটা মিতুনের মনে থাকে না। অন্তত দাদুর তাই ধারণা।

সেদিন দাদু হার্ডি বয়েজ এনে দিয়েছে। মিতুন পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্বপ্ন দেখছিল সে এক বিশাল দ্বীপে গিয়েছে একটি মূর্তি চুরির রহস্যের কিনারা করতে।

প্রবল হই হই শব্দে ঘুম ভাঙলো। তখন রাত মোটে আটটা কুড়ি। ওদের বাড়ির মন্দির থেকে হীরের হার চুরি হয়ে গেছে। অভ্রদা নাকি স্বচক্ষে চোরকে দেখেছে। ধরতে পারেনি শুধুমাত্র চোরের গায়ে প্রচুর সরষের তেল মাখানো ছিল বলে। দিদিমা বিষ্ণুমূর্তির পায়ে মাথা রেখে প্রায় কাঁদেন। বড়মাসি গেল বছর মারা যাবার পর থেকে। আসলে বড়মাসি দিদিমার সবচেয়ে আদরের মেয়ে।

দাদুর দুই মেয়ে। বাবা ও বড়মেসোমশাই দুজনেই দাদুর ব্যবসা দেখাশোনা করে। তাই ওরা সবাই দাদুর কাছেই থাকে। দাদুর এই বিশাল বাড়িতে কী নেই। ঘরের পর ঘর। পাঁচটি রান্নাঘর। ছটি টয়লেট।

একেবারে মাঝখানে মন্দির। সেখানে দিদিমাই পুজো করেন, প্রসাদ বিতরণ করেন। কী চমৎকার প্রসাদ।

দাদু বললেন, 'এই চুরির রহস্যভেদ করবে মিতুন। আমি পুলিশ-টুলিশে খবর দেব না। তা দাদুভাই তুমি পারবে তো?'

মিতুন বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, 'তা চেষ্টা করতে দোষ কী?' তারপর একটু থেমে অভ্রদার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?'

অভ্র ব্যঙ্গ করল যেন 'তুমি ডিটেকটিভ তোমাকেই বার করতে হবে।'

মিতুন পাকা ডিটেকটিভের মতো জিজ্ঞাসা পর্ব শুরু করল। প্রথমেই দিদিমা। দু'জনের মধ্যে যা কথাবার্তা হল তা এ রকম ঃ

'তুমি কি চোরটিকে দেখেছ?'

'না রে?'

'কখন প্রথম দেখলে হীরের হারটি নেই?'

'আমি গড় করে উঠতেই দেখি নেই?'

'কতক্ষণ গড় করেছিলে? চোখ বন্ধ ছিল কি ছিল না?'

'ঘড়ি তো দেখিনি তা হবে আধঘণ্টা। চোখবন্ধ করেই ছিলাম।'

'কোন পায়ের শব্দ পেয়েছিলে?'

'না। কারণ তুই তো জানিস আমি একদম ঠাকুরের কাছে চলে যাই।'

'যখন দেখলে হীরের হারটি নেই তখন তুমি কী করলে?' 'সঙ্গে সঙ্গে অভ্রকে ডাকলাম।'

'বেশ তুমি যেতে পার।'

এবার অভ্রদার পালা। অভ্রর ঠোঁটে একটু যেন তাচ্ছিল্যের হাসি। দাদু বললেন, 'না। অভ্র। ও যা জিজ্ঞেস করবে তা তোমাকে বলতেই হবে।'

অভ্র বলল, 'নিশ্চয় বলব।' মিতুন সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করেছিল 'তা তুমি যখন দিদিমার ডাক শুনলে তখন কী করলে?'

'আমি পড়ছিলাম। প্রচণ্ড জোরে ছুটে আসতে গিয়ে ওই থামের আড়ালে ধাক্কা খেলাম কার সঙ্গে যেন। বাতি জ্বলছিল না। কিচ্ছু দেখতে পাইনি। কিন্তু একজন মানুষ যেন আমার হাতে লেগে পিছলে গেল। মনে হয় ওই চোর।'

'কে চোর সেটি আমিই বার করব। তুমি এবার বলো দিদিমা কি হাউমাউ করছিলেন?'

'মোটেই না। শুধু বললেন আমার ঠাকুরের হারটি চুরি গেছে। আমি তখন ভাবলাম কেউ একজন এসেছিল সারা শরীরে তেল মেখে যার সঙ্গে আমি ধাক্কা খেয়েছিলাম বারান্দার থামের আড়ালে।'

'দাদুকে খবর দিলে কখন?'

তক্ষুণি ছুটে পশ্চিমের বারান্দায় যাচ্ছি তখন ওই থামের কাছাকাছি এই কাগজটি পেলাম।'

'কই দেখি?'

মিতুন পড়ল তাতে লেখা আছে,

'সমুদ্রের পাশে পক্ষ এখনি বসাও।
তারপর ঋতু জোড়ো-নেত্রে মেলে চাও।।
অবশেষে দাও জুড়ে তুমি চন্দ্রশর।
এইটুকু সূত্র রাখি খোঁজো তারপর।।
ইতি
৪১৪১'

হাতের লেখাটি মিতুনের চেনা চেনা মনে হল। কিছু না বলে অভ্রকে ফের জেরা শুরু করল।

'সত্যি কি তুমি দেখতে পাওনি লোকটি কেমন?'

'না!'

'আসলে তুমি সত্যিই থামের সঙ্গেই ধাক্কা খেয়েছিলে!'

'একটা মানুষ আর থামের তফাৎ বুঝব না। তুই কী বলছিস?'

আর কথাবার্তা হল না। মিতুন দাদুকে বলল 'আমি চিরকুটটি নিয়ে যাচ্ছি। পরে আবার কথা হবে।'

pathagar.net

দাদু বললেন, 'আর কাউকে জেরা করবে না?'

'না। আপাতত এই থাক।' মিতুন ভারিক্কি চালে বলল।

স্কুলে এখন ক্রিসমাসের ছুটি। পড়াশোনা কদিন ফেলে রাখলে ক্ষতি নেই। মিতুন নিজের ঘরে গিয়ে বসলো। একটু একটু কুয়াশা নেমেছে। বোধহয় শুক্লা নবমী। সে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। আগে মিতুন প্রতিপদ দ্বিতীয়া ইত্যাদি জানতো না। কিন্তু দিদিমার কাছে এ সবই শিখতে হয়েছে।

ওপাশে একটি বস্তি। ওর পড়ার টেবিলের পাশেই জানালা। সে হঠাৎ শুনলো কেউ যেন পড়ছে। ওই বস্তিতেই কোনও ছেলের গলা। কান খাড়া করলো। বাচ্চা ছেলে। মানে, মিতুন তার থেকে অনেক বড়ো। সে শুনলো ছেলেটি চেঁচিয়ে পড়ছে 'একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ, পাঁচে পঞ্চবান, ছয়ে ঋতু, সাতে সমুদ্র, আটে অষ্টবসু, নয়ে নবগ্রহ, দশে দিক।' এভাবে তো মিতুন কখনও পড়েনি। সে মনে মনে মনোযোগ দিয়ে পড়ে। ওদের বাড়িতে কেউ ছেলেটির মতো চেঁচিয়ে কথাও বলে না—পড়া তো দূরের কথা। এমন কী অভ্রদার মতো অমন বিশাল চেহারার মানুষও না।

চিরকুটটি সামনে খোলা আছে। অভ্রদা যদি বাঁকিয়ে লেখে তাহলে সম্ভবত এমন লেখা হতে পারে। ওর কাছে অভ্রদার একটি চিঠি আছে। গেল মাসে পাহাড়ে ট্রেকিং করতে গিয়েছিল। হরিদ্বার থেকে লেখা সেটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। ওর মনে হল একটু মিলতো রয়েছে। পৃথিবীতে খুব কম লোকেরই লেখার ছাঁদ এরকম হয়। কিন্তু ওর সন্দেহ কেন অভ্রদার উপর গিয়ে পড়ছে।

সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। প্রায় ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েছিল। কিন্তু সুসভ্য সংস্কৃতিবান মানুষেরা চেঁচায় না।

ধাঁধাটি বিশ্লেষণ করল। সমুদ্রের পাশে পক্ষ। কী হতে পারে? সেই বাচ্চা ছেলেটি তখন সুর করে পড়ছে। ও খেয়াল করল। সমুদ্র মানে কি তাহলে সাত বোঝাচ্ছে। পক্ষ দুই। তাহলে দাঁড়াল গিয়ে ৭২। পরের লাইনের ঋতু আর নেত্র মিলে হল ৬৩। তৃতীয় লাইনে পাওয়া যাচ্ছে 'চন্দ্রশর'। মানে কী হবে? 'চন্দ্র' যদি হয় ১ 'শর' তবে কী? শর মানে তো মিতুন জানে না। তাড়াতাড়ি 'চলন্তিকা' খুললো। শর মানে তীর, বাণ। এইতো পাওয়া গেল। তারমানে ৫। পুরোটা দাঁড়াল তাহলে ৭২৬৩১৫। ...আরে আরে এতো মিতুনদেরই ফোন নম্বর। তাহলে হারচোর এ বাড়িরই কেউ? কিন্তু কে? আবার সে অভ্রদার কথা ভাবলো। অদ্ভুত অভ্রদার কোনও ডাকনাম নেই। যদিও মাঝে মাঝে দাদু তাকে মিতুন বলে ডাকেন। এতে অভ্রদার ভীষণ আপত্তি। আমি কি দিদিমার কেষ্টঠাকুর? আমার একশো আটরকম নামের দরকার নেই।'

মিতুন আবার ইতি'র দিকে তাকালো। ৪১৪১ অর্থাৎ চার হাজার একশো একচল্লিশ। কী হবে? ইংরেজী অ্যালফ্যাবেটের ৪নং লেটার 'D'। অমনি তার মাথায় খেলে 'DADA'। এক নম্বর তো A-ই। তাহলে সত্যি অভ্রদাই চুরি করেছে! অসম্ভব। অভ্রদাকে মিতুনের পছন্দ নয়। কিন্তু এ কাজ অভ্রদা করতে পারে না। মিতুন বাইরে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইলো। জানলা থেকে এখন চাঁদ সরে গেছে। ঘড়ি দেখলো দাদু একটু মিটমিট করে হাসছেন আর অভ্রদার দিকে তাকাচ্ছেন। বিদ্যুৎ চমকের মতো

মিতুনের মাথায় খেলে গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহলে সাজানো। অভ্রদা আর দাদু মিলেই ব্যাপারটি করেছেন। মিতুন তো মাঝে মাঝে দাদুকে দাদাও বলে থাকে। মিতুন এবার হাসিমুখে দাদুকে বললো, 'চোর দুজন। দুজনকেই ধরে ফেলেছি।'

'কীভাবে? কে ওরা?' দাদুর প্রশ্ন।

'চিরকুটের হাতের লেখাটি অভ্রদার।' শান্ত গলা মিতুনের।

'যা হতেই পারে না। তুই কবে হ্যাণ্ডরাইটিং স্পেশালিষ্ট হলি?' অভ্রদা অবিশ্বাসের হাসি হাসলো।

'তোমার হরিদ্বার থেকে লেখা চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি।' আপনারে তুমি করিবে গোপন কী করি? মিতুন রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাহায্য নিল।

দাদু বললেন, 'তুমি বলতে চাইছো একজন চোর হল অভ্র। তাহলে অন্যজন কে?'

'তুমি।' মিতুন আস্তে বললো।

'কিন্তু আমাদের মোটিভ কি?'

'খুব সহজ আমাকে বোকা বানানো।' মিতুনের জবাব শুনে খাবার টেবিলে সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। মিতুন একটুও বিচলিত না হয়ে বলল, 'আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো। হেয়ালিটি বুঝতে একটু কষ্ট হয়েছিল—পরে ওটি যে আমাদের টেলিফোন নম্বর করে ফেললাম। এর পরে আনুপূর্বিক সমস্ত প্রক্রিয়াটি মিতুন ব্যাখ্যা করল।

দাদু হাসিহাসি মুখ করে বললেন, 'বাঃ। চমৎকার। সত্যি তুমি রহস্যভেদী গোয়েন্দা হতে পারবে। এবার থেকে তোমাকে আমরা ডাকব ডিটেকটিভ মিঃ এস এস।' শুভ্র সান্যাল যে এস এস। —'তাহলে আমার উপহার দাও।'

অভ্রদা একটি প্যাকেট টেবিলের উপর রাখলো চেয়ারের পেছন থেকে। শুভ্র সান্যাল ওরফে মিতুন ওরফে ডিটেকটিভ এস এস দ্রুত বেসিনে হাত ধুয়ে প্যাকেটটি খুলে দেখল আর্থার কোনান ডয়েলের রহস্য কাহিনী সমগ্র।

গম্ভীর মুখে নিজের ঘরের দিকে শুভ্র এগুলো।

pathagar.net

পোড়োবাড়ির আলো

শমীক মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন ধরেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে সৌগত, ঠিক মধ্য রাতে ওদের বাড়ির সামনে যে জরাজীর্ণ বাড়িটা, সেটায় আলো জ্বলে টিম টিম করে। রাত জেগে পড়তে হয় তাকে। স্কুল খুললেই পরীক্ষা, আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। পাশের ঘরে বাবা মা থাকে, এটা সৌগতর নিজস্ব ঘর। ডানপাশের ঘরে থাকে দিদি, সৌগত পড়ার টেবিল থেকে উঠে জানালার সামনে এগিয়ে গেল, খানিকটা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেওয়াল ঘড়িটা এই মুহূর্তে বেরসিক শব্দে ঢংঢং করে বারোটা ঘোষণা করল। বিরক্তির চোখে সুদৃশ্য ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল—ঘণ্টা বাজার আর সময় ছিল না। ঘণ্টার শব্দ থেমে গেলে আবার স্পেসে কার পায়ের শব্দ—নিশ্চয়ই বাপি উঠেছে। তড়াক করে লাফিয়ে আবার চলে এল পড়ার টেবিলে, সৌগত জানে ওর বাপি একবার ভেজানো দরজা ঠেলে উঁকি দেবে ছেলে কী করছে দেখবে। দিলোও তাই, সৌগত নিবিষ্ট মনে বই-এর দিকে তাকিয়ে আছে।

বাপি শুয়ে পড়তে আবার চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। ধীরে পায়ে এগিয়ে গেল

জানলার সামনে। জানলাটা ভেজানো ছিল, অল্প ফাঁক করে চোখ রাখল জানলায়। — ঘরের মধ্যে মৃদু আলো, মাঝে মধ্যে আলোটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সৌগত জানলা ছেড়ে এসে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে জানলাটা পুরোপুরি খুলে ভালো করে তাকালো— কিছুদিন আগেও মামনি ওকে ওই বাড়িটা দেখিয়ে বড় বড় চোখ করে বলেছে—ওই বাড়িতে ভূত আছে। ভূতের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। এখন আর সৌগত ভয় পায় না, ভূত বলে যে কিছু আছে তা-ই বিশ্বাস করে না লোকে শুনলে কী বলবে? ক্লাস নাইনে পড়ে, দু'দিন বাদে কলেজে যাবে, ভূতের ভয় পায়। দিনের বেলা যখন ঐ বাড়িটার পাশ দিয়ে যায় তখন তো দেখে মনে হয় না ওই বাড়িটায় কেউ বসবাস করে। জরাজীর্ণ বাড়িটা, বাড়ির চারিদিকে ঝোপ জঙ্গল, গভীর রাতে কে ওখানে আলো জ্বালায়? ঠিক এগারোটার পর দেখা যায়। পা টিপে জানালা ছেড়ে টেবিলের সামনে এসে আলোটা জ্বালল। ভেজানো দরজাটা খুলে একবার উঁকি দিল, ডায়নিং স্পেসে নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। বাবা মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ, দিদি ভাইও নিজের ঘরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ডায়নিং স্পেস অতিক্রম করে সোজা চলে এলো ড্রইংরুমে। দরজা খোলাই ছিল, টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দরজা বন্ধ করে দিল, ফোনের রিসিভার কানে লাগিয়ে ডায়াল করলো। একটু পরেই ওর মুখ থেকে বিরক্তি সূচক আওয়াজ বেরিয়ে এলো এন-গেইজড, আবার ডায়াল করল, ওপ্রান্তে ক্রিং ক্রিং আওয়াজে রিং বেজে উঠল। ড্রইং রুমে টাঙানো দেওয়াল ঘড়িটায় এক নাগাড়ে টিকটিক শব্দ হয়ে চলেছে বারটা পঁচিশ, ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো-হ্যালো-কে শমীক? —বলছি, এত দেরী করে ফোন করলি কেন? আমি শুয়ে পড়েছিলাম। —বাবা উঠে পড়েছিল। আজ কী দেখলি? সেই একই ঘটনা, সন্ধ্যে থেকে আমি চোখ রেখেছিলাম। আলো দেখতে পেলাম ঠিক সাড়ে এগারটার পর। ও প্রান্তে কোন সাড়া নেই, সৌগত চাপা কণ্ঠে বলল, —হ্যালো কি হল, কথা বলছিস না কেন? —ভাবছি

—কি ভাবছিস? —না, থাক, এখন বলব না, শোন পরীক্ষাটা হয়ে যাক তারপর ভাবা যাবে, বুঝলি? তুই কিন্তু নজর রাখবি, দরকার হলে নোট করে রাখবি, প্রতিদিন কি দেখছিস, না দেখছিস কি ঠিক আছে? —ঠিক আছে, ছেড়ে দিলাম।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো দুই বন্ধু স্কুল থেকে বেরিয়েই ঐ আলোচনায় মেতে উঠল। শমীক অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল—তুই সব নোট করে রেখেছিস্ তো, কবে কি দেখলি? সৌগত মাথা একপাশে যতটা সম্ভব নুইয়ে দিল অর্থাৎ লিখে রেখেছে।

—গুড্, শোন কাল বিকেলে আমি তোদের বাড়িতে যাব, তার আগে তুই সকালে এসে আমাদের বাড়িতে বলবি যে আমি তোদের বাড়িতে খাব এবং থাকব। যে কোন একটা কারণ দেখিয়ে দিবি, বলবি দিদিভাইয়ের জন্মদিন অথবা...সে তুই যা ভাল বুঝবি বলবি। আমি আর তুই আগামীকাল রাতে তোদের বাড়িতে একসাথে থাকব, কি বুঝলি? —যদি আমার বাড়িতে জানতে চায় তুই কেন রাতে থাকবি?

—সাধারণ ব্যাপার নিয়ে এতো মাথা ঘামাস কেন বুঝি না, বলবি আমার মা বাবা বাড়িতে নেই, তাই...

—ঠিক আছে আর বলতে হবে না। দু'বাড়িতেই ওদের কোন ঝামেলায় পড়তে হলো

না। শমীক আর সৌগত তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া করে নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়ল, সৌগত ফিস ফিস করে বলল—শমীক চল আমরা লাইট বন্ধ করে শুয়ে পড়ি, সবাই ভাববে ঘুমিয়ে পড়েছি। —তার আগে তুই কয়েকটা জিনিস নিয়ে আয়। —কী কী? —একটা টর্চ লাইট, একটা মোমবাতি, দেশলাই, আর ধারালো কোন অস্ত্র। আঁতকে উঠল সৌগত—ধারালো অস্ত্র! ও দিয়ে কী হবে?—ও তুই বুঝবি না, তুই নিয়ে আয়তো তারপর দেখা যাবে। সৌগত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, ফিরে এল মিনিট দশেক পর, তোয়ালের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে টর্চ লাইট, মোমবাতি দেশলাই আর পাঁউরুটি কাটার ছুরি। শমীক হাতে নিয়ে বলল—গুড, এবার লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়।

রাত প্রায় বারোটা, গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ সবাই শুয়ে পড়েছে, শমীক অন্ধকারে জানালা খুলে বসেছিল, সৌগত ঠিকই বলেছে সোয়া এগারটা সাড়ে এগারোটায় আলো দেখা গেল। সৌগত বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। জানালা ছেড়ে শমীক সৌগতর কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে ডাকলো। —চল তৈরি হয়ে নে এবার বেরুব। দুজনে টাইট প্যাণ্ট গেঞ্জী সু পরে নিলো, শমীকের কোমরে ছুরি আর টর্চ, সৌগতরই পকেটে দেশলাই আর মোমবাতি। পা টিপে টিপে ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল টিভির উপর থেকে সদর দরজার চাবি নিয়ে ওরা নিচে নেমে এল। ওদের বুকের মধ্যে যেন কেউ হাতুড়ি পেটাচ্ছে, সদর দরজার সামনে এসে নিশ্চিন্ত।

রাত বারোটা মানে এই এলাকা জন মানব শূন্য। রাস্তার কুকুরগুলো শুধু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে, এত রাতে দুটি মানুষকে রাস্তায় দেখে ওরা এক নাগাড়ে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে। ওরা ভ্রূক্ষেপ না করে পাশ কাটিয়ে চলে এল সৌগতদের বাড়ির পিছন দিকে, এখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার শমীক ফিস্ ফিস্ করে বলল, —এই দিকটায় একটা আলোর ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই? —আলোর ব্যবস্থা আছে, লাইট থাকে না, কে বা কারা যেন ইঁট মেরে ভেঙ্গে দেয়। অন্ধকারে শমীক সৌগতর মুখের দিকে তাকায় কোন কথা বলে না, মনে মনে কী যেন ভেবে বলে চল, ওই পাঁচিলটার উপর উঠি।

পাঁচিল এর উপর উঠলেই জীর্ণ বাড়িটার ভেতরটা দেখা যাবে। শমীক আর সৌগত দুজনে পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড়াল, পাঁচিল অনেকটা উঁচুতে, শমীক ফিস্ ফিস্ করে বলল—সৌগত তুই নীচু হয়ে দাঁড়া আমি তোর কাঁধে ভর দিয়ে পাঁচিলে উঠব।

সৌগত নীচু হয়ে দাঁড়াল, শমীক ওর কাঁধে ভর দিয়ে পাঁচিলের উপর উঠে পড়ল। পাঁচিলের উপর উবু হয়ে বসে শমীক যা দেখলো তাতে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। পোড়ো বাড়ির ঘরে বসে আছে চারজন। ঘরের দুপাশে দুটো মোমবাতি জ্বলছে, ওই চারজনের দুজনকে খুব ভালভাবে চেনে, এ পাড়ায়ই থাকে। প্রায় বিকেলেই ওরা বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু ওরা করছেটা কী, এত শিশি কিসের? আর তাতে কিই বা সাটাচ্ছে? শমীকের মনে সন্দেহ হল, রাতের অন্ধকারে লোক চক্ষুর আড়ালে, ওরা নিশ্চয়ই কোনও ভালো কাজ করছে না। এদিকে সৌগতর সারা শরীরে মশা প্রায় ছেঁকে ধরেছে, উপর দিকে তাকিয়ে শমীকের ইশারার অপেক্ষা করতে লাগল। শমীক মাথা ফিরিয়ে ইশারা করল নামবে, পাঁচিলটা ধরে শমীক ঝুলে পড়ল, মাটিতে নেমে খুব ঘন

ঘন নিশ্বাস নিতে লাগল। সৌগত ফিস ফিস গলায় জিজ্ঞাসা করল—কী রে কী দেখলি?
—চুপ আগে বাড়ি চল, সব বলছি।

বাড়ির সামনে এসে শমীক সব খুলে বলল—বুঝলি ওরা অপরাধ মূলক কোনও কাজ করছে, আচ্ছা বলতে পারবি এখানকার থানার ফোন নাম্বার কত? —বাবার ডায়রীতে লেখা আছে, কেন? তুই থানায় ফোন করবি নাকি? —নিশ্চয়ই। ভয়ার্ত গলায় সৌগত বলল—যদি কিছু হয় আমাদের? —আমাদের কী হবে আবার? ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করতেই থানার বড়বাবু—ধরল, শমীক নিজেদের পরিচয় গোপন করে বিস্তারিত সব খবরাখবর জানিয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। পরদিন খবরের কাগজে বড় বড় করে ছাপা হল অজ্ঞাত নামা এক কিশোরের ফোনে ধরা পড়ল—জাল ঔষধ তৈরির এক চক্র। খবরের কাগজ নিয়ে শমীক ছুটে এল সৌগতর বাড়িতে, বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলল দেখলি আমরা সমাজের কত বড় দায়িত্ব পালন করলাম।

ব্যাঙ্ক ডাকাতি

হাপিজুল হক্‌

—কেউ এক পাও এগুবেন না, —যে যেখানে যেমন ভাবে আছেন দাঁড়িয়ে, সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকুন। উহু একদম চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। সেলিম এক কোণে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ করে ঘটনাটা দেখছে। মুখোশধারীরা সংখ্যায় ছ'জন, বাইরে আছে কিনা জানে না, গেটের সামনে দুজন, একজন গেটের বাইরের দিকে বন্দুক তাক করে আছে, অন্য জন ভেতরের দিকে। বাকি চারজন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একজন তাদের মধ্যে বলছে। সকলের হাতেই বন্দুক, আচমকা ওরা ঢুকে পড়েছে, একটু আগেও ব্যাঙ্কের ঘরের মধ্যে কথাবার্তা হাসাহাসি ঘরটা সরব ছিল, কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা ঘরের চেহারাই পাল্টে গেল। বারটা বাজে। মাসের শেষ দিক ব্যাঙ্ক একটু ফাঁকা ফাঁকাই ছিল, সেলিম এসেছে দাদার সাথে, দাদা টাকা তুলবে, কি একটা গোলমাল হওয়াতে তার দাদা সেলিম কে এক পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ীতে গেছে, এর মধ্যেই ঘটে গেল ঘটনাটা—চাবিটা কোথায়, চাবি দিন।—চাবি তো আমার কাছে নেই ও তো......

কথা শেষ হওয়ার আগেই রিভলবারের বাট দিয়ে আঘাত করলো ম্যানেজারের

মাথায়, সঙ্গে সঙ্গে ফেটে রক্ত। ম্যানেজার কপালে হাত দিয়ে বসতে যাচ্ছিল, মুখোশধারী ডাকাতটি বাধা দিয়ে বলল—উঁহু আগে চাবি। ঘরে যারা ছিল তাদের সকলের দৃষ্টি মুখোশধারীদের দিকে, সবাই ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, সকলের হাত উপরে। সেলিম এক পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। প্রথমটায় ও হকচকিয়ে গেছিল, ভেবে পাচ্ছিল না এরা কারা। কি ওদের উদ্দেশ্য অনেক বইতে পড়েছে, দু'একটা সিনেমায়ও দেখেছে কিছু চাক্ষুস.....কাউন্টারের ওপাশে একটা লোক ফোন তুলতে যাচ্ছিল মুখোশধারীর একজনের রিভলবার গর্জে উঠল, মাত্র একটা শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কাটা কলা গাছের মতো, উপস্থিত সকলে আঁতকে উঠল, চাপা কণ্ঠে মুখোশধারীটি বলল—যে একটু এদিক ওদিক করবে, তাকেই এই ভাবে মরতে হবে, চালাকি করার একদম চেষ্টা করবেন না।

ম্যানেজার বেগতিক দেখে চাবিটা এগিয়ে দিলেন, মুখোশধারী বলল—উহুঃ চলো, লকার তুমি খুলবে বলেই রিভলবারের বাট দিয়ে ধাক্কা দিল, ম্যানেজার দু'হাত উপরে তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল লকারের দিকে, অন্য মুখোশধারীদের চোখ চরকির মতো এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল, দুজন গেটে দণ্ডায়মান মুখোশধারী হঠাৎ দু'পাশে নিজেদের আড়াল করে নিল, গেট দিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করলো দুটি লোক, সঙ্গে সঙ্গে একজন মুখোশধারী তাদের বুকের দিকে রিভলবার তাক করে বলল—এদিকে আসুন। আচমকা এমন একটা পরিস্থিতিতে ওরা পড়তে পারে কল্পনায়ও ভাবে নি, ভূত দেখার মতো ওরা চমকে উঠে দু হাত উপরে তুলে দিল, মুখোশধারী বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে ওদের এক জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে আরো সব কাষ্টমারকে জড়ো করেছে, একমাত্র সেলিমকে-ই কিছু বলেনি, বলবেই বা কি? বয়স তো মাত্র দশ বছর, বয়সের তুলনায় ওকে বড় বেশি ছোট দেখায়। গেটের সামনে তো দুজন দাঁড়িয়েই আছে, কারো সাধ্যি আছে ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেরোয়, সেলিম মনে মনে ভাবছে এক্ষুণি ওর দাদা আসবে। দাদার সঙ্গেও ওরা নিশ্চয়ই এমন ব্যবহার করবে। দাদার আবার ভয় ডর কম যদি মাথা গরম করে ফেলে? একটা অঘটন না ঘটে যায় সেলিম মুখোশধারীদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পিছু হটতে লাগল। ঐ দিকের জানালাটা খোলা। যদি পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করানো যায়। ভাগ্যিস সেলিমকে ঐ দিকে নিয়ে যায়নি।

আবারও একজন কাস্টমার আসলো, তাকেও পূর্বের জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল, সেলিম পিছু হটতে হটতে একেবারে জানালার সামনে এসে গেল। পকেট থেকে পেনসিলটা বের করে একটা কাগজে লিখে ফেলল—ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছে,' জানালা দিয়ে নীচের দিকে তাকালো, রাস্তা ধরে অনেকেই হেঁটে যাচ্ছে, উপর থেকে শুধু কাগজটা ফেললে, কারো চোখে তো নাও পড়তে পারে, তার চেয়ে.....সেলিমের চোখ চক চক করে উঠল, এই তো আইডিয়া এসে গেছে, ঐ কাঁচের গ্লাসে কাগজটা ঢুকিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে দিলো, গ্লাসটা রাস্তায় যেই ঝন ঝন শব্দে ভেঙে গুড়িয়ে গেল। ব্যাঙ্কের উপরে তেমন একটা আওয়াজ শোনা গেল না, দু'তিনজন পথচারী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। উপর দিকে তাকিয়ে নীচের দিকে তাকালো। একজন লোক ভাঙা গ্লাসের মধ্য থেকে কাগজটা তুলে পড়তে লাগল, সেলিম নিজেকে আড়াল করে সব

দেখতে লাগল, আস্তে আস্তে জটলা বাড়তে লাগল, মাত্র তিন মিনিট। তার পরেই এসে গেল এক ভ্যান পুলিশ, পুরো ব্যাঙ্কটা ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল, ততক্ষণে ব্যাঙ্কের লকার সাফ করে ডাকাতরা ঘরের সবাইকে লকারে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখল, ডাকাতরা টাকার বস্তা নিয়ে যখনই গেট অতিক্রম করতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের বন্দুক গর্জে উঠল, টানা আধ ঘণ্টা চলল গোলাগুলি অবশেষে ডাকাতরা ধরা দিল, ডাকাতদের দুজন গুলিতে প্রাণ হারালো পুলিশ এসে লকার খুলে সকলকে উদ্ধার করলে, ম্যানেজার সর্বপ্রথম ছুটে গেল সেলিমের কাছে, ওকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বলল—এই ছেলেটির জন্য ঐ ডাকাত দল ধরা পড়েছে, এত বড় একটা অভিযানের পুরো কৃতিত্ব ওর, ইন্‌সপেক্টর মনসুর খান সেলিমের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল—ইউ আর জিনিয়াস, হোয়াটস ইওর নেম—আই এ্যাম সেলিম খান। পরের দিন খবরটা গোটা শহরে ছড়িয়ে গেল, সবাই দেখতে আসতে লাগল ক্ষুদে গোয়েন্দাটিকে।

বাবুলের গোয়েন্দাগিরি

pathagar.net

পুণ্ডরীক চক্রবর্তী

অন্যান্য দিনের মতো প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফিরছিল বাবুল। রাত্রি নটা হবে। ওর সঙ্গে তুতুলও আছে। তুতুল বাবুলের বন্ধু। ওরা একই স্কুলে পড়ে। বাবুল এবার স্কুল ফাইন্যাল দেবে। তুতুল দেবে সামনের বছর। ডায়মণ্ডহারবার নদীর তীর ঘেঁষে P. W. D রাস্তা ধরে ওরা হেঁটে আসছিল। ডায়মণ্ডহারবার স্টেশনের কাছাকাছি রায়নগর গ্রামে ওরা থাকে। দু'জনের দৃষ্টি ছিল নদীর দিকে। নদীর বুকে ঝুঁকে আছে তখন গভীর নির্জনতা। আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আলোর বাতি। দেখে মনে হবে কারা যেন আলোর প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়েছে জলে। আসলে ওই আলোগুলো সারিবদ্ধ মাছ ধরার নৌকার আলো। সম্ভবত এখন জোয়ার। তাই ঢেউ এসে বারেবারে তীরে মাথা ঠুকছে। এখানে নদী রহস্যময়। তার ওপর রাতের নদী। আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ কলকাতার দিক থেকে তীব্র বেগে ছুটে এসে একটা ট্যাক্সি সামনের অশ্বত্থ গাছটির নীচে দাঁড়াল। ওদের থেকে কিছু দূরে। শীতের রাত। পথে লোক চলাচল কম। দু'একজন যারা ব্যস্ত চলাফেরা করছিল তারা গাড়িটিকে লক্ষ্য করল। গাড়ি থেকে তিন-

চারজনকে হন্তদন্ত হয়ে নামতে দেখা গেল। বেশ আশঙ্কা নিয়েই লোকগুলো এদিকে ওদিক দেখছিল। তারপর একজন আর একজনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিড় বিড় করে কী যেন বলল। বাবুলের কৌতূহল হল। সে তুতুলের হাত চেপে ধরল। বলল, দাঁড়া, কি রকম একটা অশুভ গন্ধ পাচ্ছি। তুতুল দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা আকাশমণি গাছটার আড়ালে গা ঢাকা দিল। পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সবই দেখতে পাচ্ছিল। দূর থেকে দেখে প্রথমেই লোকগুলোকে বাঘের মতো হিংস্র মনে হল বাবুলের। গাড়ির পেছনের ঢাকনা খুলে ওরা একটা ভারি জিনিস সম্ভবত পিছমোড়া করে বাঁধা, টেনে হিঁচড়ে নামাতে লাগল। সবকটা লোকই তাগড়াই চেহারার। দেখে মনে হল গায়ে বেশ জোর আছে। লোকগুলো আর বেশি দেরি করল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে সেই ভারি-বস্তুটা টানতে টানতে নদীর আরও কাছে এগোল।

বাবুলের মনে হ'ল কিছু একটা অশুভ ঘটনার প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা চলছে। তুতুলের হাত কাঁপছিল। বাবুল ওকে সাহস দিল। ভয় নেই। বাবুল দেখল সেই ভারি বস্তুটা লোকগুলো জোয়ারের জলে ঝুপ করে ফেলে দিল। তুতুল কাঁপা গলায় বলল, কি আছে ওতে। বাবুল বলল, জানি না, তবে ভয়ংকর একটা কিছু হবে। লোকগুলো এবার গাড়ির কাছে ফিরে এল। বাবুল দেখল ওদের পা মাটিতে ঠিকমতো পড়ছে না। বাতাসে একটা বাজে গন্ধ। গন্ধটা বাবুলের ডায়মণ্ডহারবারে খুব চেনা। ওই গন্ধে বাবুলের বমি পায়। অথচ আজকাল বেশির ভাগ মানুষই ওই গন্ধের পূজারী। ছাইপাশগুলো কি করে মানুষ পেটের ভেতর চালান করে, বাবুল ভেবেও তার কূলকিনারা পায় না। বাবুল যেটা মনে মনে চাইছিল তাই হল। লোকগুলো কি ভেবে যেন ঘুরে দাঁড়াল। অমনি একটা উল্টো দিক থেকে আসা ট্রাকের হেডলাইটের আলো সরাসরি ওই লোকগুলোর মুখের ওপর পড়ল। বাবুল যতদূর সম্ভব ভালো করে মুখগুলো দেখে নিল। তার সমস্ত সজাগ ইন্দ্রিয় দিয়ে। আর মনের রঙ-তুলি দিয়ে একটা ছবিও এঁকে ফেলল সে।

ট্যাক্সিটা আর মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে রওনা হয়ে গেল। এবার বাবুল ও তুতুল আকাশমণি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাইরে। তুতুলের ধড়ে প্রাণ এল। ওর রহস্যের ভেতরে যেতে বরাবরই ভয়। বাবুল তার বিপরীত। কোন কিছুর রহস্যের গন্ধ পেলে বাবুল টান টান হয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে তখন ওর অন্য মন অন্য চোখ কাজ করে। এক্ষেত্রে ওকে সাহায্য করে ওর শিল্পী মন। ও ভালো ছবি আঁকতে পারে। আর ঐ ছবি আঁকার সুবাদে ও ভীষণ পরিচিত। এদিকে যখন বাবুল ও তুতুল আকাশমণি গাছের আড়ালে থেকে সব লক্ষ্য করছিল। উল্টো দিক থেকে ফুচকাওয়ালা ফটিক সেও পুরো ব্যাপারটা নজর রেখেছিল। এই ফটিকও একদিন বাবুলের সঙ্গেই পড়াশোনা করত। ফটিকের বাবা ছিল জেলে। একবার নদীতে ইলিশমাছ ধরতে গিয়ে নৌকাডুবিতে মারা যায়। সংসারে ফটিকের বাবার আর কেউ ছিল না। সেদিন থেকে ফটিকের ঘাড়ে সংসারের সব দায়িত্ব পড়ে গেল। ফটিক ফুচকা বিক্রি করে সংসার চালায়। বিধবা মাকে দেখাশোনা করে। ফটিক বাবুল মুখোমুখি হতে, ফটিক বলল, কিরে বাবুল প্রাইভেট পড়ে ফিরছিস? বাবুল বলল, হ্যাঁ। ফটিক এবার বলল, লোকগুলোকে দেখলি কি একটা ফেলে দিয়ে গেল জলে। বাবুল বলল, হ্যাঁ দেখলাম।

—কিছু বুঝলি? বাবুল বলল, কিছু একটা রহস্য আছে। লোকগুলোকে মোটেই, স্বাভাবিক ঠেকল না। না, আর কথা না বাড়িয়ে বাবুল আর তুতুলকে সঙ্গে নিয়ে হনহন করে যেতে চাইল বাড়ির দিকে। সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা। বাবুল এখন প্রতিদিন কাকভোরে ঘুম থেকে ওঠে। আজও সে অন্ধকার থাকতেই পড়তে বসে গেল। বইয়ের পাতার ওপর চোখ রেখে বসে থাকতে থাকতে একটু ঘুম পাচ্ছিল বাবুলের। এমনি সময় মর্নিংওয়ার্ক ফেরা মাষ্টারমশাই সুবিনয় বাবু একরকম দৌড়তে দৌড়তে একটা সাংঘাতিক গা চমকানো খবর দিলেন। ডায়মণ্ডহারবারের কাপড় ব্যবসায়ী সত্যেন নস্কর খুন হয়েছেন। তাঁর ডেড্‌বডি নদীর পাড়ে পড়ে আছে। আতসবাজির মতো এ খবর ছড়িয়ে পড়ল নিমেষে গ্রামে শহরে। আর এই হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। উত্তেজনায় আতংকে একটা ভয়ের ছায়া নেমে এল মানুষের মুখে। যা হয়ে থাকে, আর কী। সত্যেন নস্করকে প্রায় এ তল্লাটে সবাই চিনতেন। রমরমে কাপড়ের ব্যবসা ছিল। গাড়ি বাড়ি সব ছিল। বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। এবার দুর্গাপুজোয় প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা কেনা বেচা হয়েছিল তাঁর। ধনী হলেও তার অহংকার ছিল না। ছোট বড় সবার সঙ্গে মিশতেন। হাসি খুশি মানুষটার কেউ শত্রু থাকতে পারে বলে কোনদিনও কারও মনে হত না। শোনা গেল, সত্যেন বাবুর কাছে বিভিন্ন মাল গস্ত করার জন্য প্রায় তিন লাখ টাকা ছিল। ওই টাকা নিয়ে সত্যেন বাবু কলকাতায় মাল গস্ত করতে গেছিলেন।

বাবুলের পড়াশুনো শিকেয় উঠল। তার অঙ্ক যেন মিলে যেতে চলেছে। তার চোখের সামনে গতকাল রাতের রহস্যময় ছবিটা ভেসে উঠল। রীতিমতো অস্বস্তি হতে লাগল তার। অথচ ঘটনাটা আগবাড়িয়ে কাউকে জানাবার নয়। বাবুলের কয়েকটা বাড়ির পরেই থাকে তুতুল। সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল বাবুলের পড়ার ঘরে। আতংক মেশানো গলায় বলল, শুনেছিস বাবুল, কাল কে খুন হয়েছে? বাবুল শুধু মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। তুতুল বলল, তবে কি আমরা কাল যা আন্দাজ করেছিলাম তাই, মানে সেটা ছিল ডেড্‌বডি? বাবুলের মুখ উত্তেজনায় লাল। সে বলল, হয়তো হবে। আবার সেটা নাও হতে পারে। বাবুল একটু থেমে, গলায় সব উৎসাহ ঢেলে বলল, চল, তুতুল দেখে আসি। তারপরে মন্তব্য করা যাবে। তুতুল বলল, আমার ভয় করছে। বাবুল তাকে সাহস দিল, বলল, কিসের ভয়? আমিতো আছি।

এদিকে খুনের খবরের সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট সব বাজারের বন্ধ হয়ে গেছে। যে গুলো বন্ধ ছিল সে গুলো আর খোলা হল না। দারোগাবাবু ও থানার কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দারোগাবাবু ও গোয়েন্দা অফিসার মিঃ দত্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ব্যাপারখানা দেখে শিউরে উঠলেন। একটা চটে মোড়া মৃতদেহ। হাত, পা, মুখ সব পৃথক করে কাটা। হত্যাকাণ্ডের এই পাশবিকতা দেখে তারা প্রথমটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলো বটে কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। সময় নষ্ট না করে ভালোভাবে খুঁটিনাটি জিনিসগুলি লক্ষ্য করতে আরম্ভ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে। কী করে এই হত্যাকাণ্ডের সূত্র আবিষ্কার করা যায়। শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ ধরপাকড়। নদীর ধারে যারা কেনা বেচা করে সেই বাদামওয়ালা, ফুচকাওয়ালা প্রথমেই তাদের তোলা হল। কারণ তারা নদীর পাড়ের

অনেক ঘটনার সাক্ষী থাকে। অনেক কিছু জানে। যেমন ট্রেন ডাকাতির অনেক সাক্ষী থাকে হকাররা। তারা গুণ্ডা, বদমাইশ ও ছিনতাইকারীদের চিনে থাকে। এক্ষেত্রেও তেমন আর কি। কিন্তু এ যে ঠিক অন্ধকারে হাত-পা ছোঁড়ার মতোই। একটা কিছু আনুমানিক সূত্র না পেয়ে তাঁরা কোন দিকেই এগোতে পারলেন না।

এদিকে বাবুল ও তুতুল এসে দেখল নদীর ধারে উৎসুক মানুষের ভীড়। আর পুলিশের জটলা। বাবুল ও তুতুল দু'জনেই এক মত হ'ল। কাল রাতে তারা সন্দেহজনক ভাবে কয়েকজনকে যে ভারি বস্তুটা টানতে টানতে গাঙের জলে ফেলতে দেখেছিল সেটা আর কিছু নয়। সত্যেন বাবুরই ডেড্‌বডি। এ বিষয়ে বাবুল ও তুতুলের আর কোন সন্দেহ রইল না। হঠাৎ পুলিশের গাড়িটা বেরিয়ে গেল। বাবুল দেখল গাড়িটার ভেতর তার চেনা বহু মুখ। এমনি ফটিকও রয়েছে বসে। তাকে দেখে ফটিক যেন কি একটা বলতে গেল। কিন্তু বাবুলের কানে ফটিকের কথা পৌঁছল না। ফটিকের পাংশু মুখটা দেখে বাবুলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তারই বা কি করার আছে? বিকেলে বাবুল খেলতে যাচ্ছিল মাঠে। ঠিক এমন সময় থানা থেকে পুলিশের গাড়ি এসে থামল বাবুলদের দোরগোড়ায়। একে বাতাসে খুনের গন্ধ। তার ওপরে পুলিশের গাড়ি বলে কথা। ভয়ে মুখ চুন সকলের। আশঙ্কা, অজানা ভয়ে আঁতকে উঠল সারা বাড়িটা। প্রতিবেশীরা উঁকি ঝুঁকি দিল দরজা জানলার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে। দারোগাবাবু দরজায় কড়া নাড়তে বাবুলের বাবা অমলবাবু দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন রুদ্ধশ্বাসে। দারোগাবাবু অমলবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বললেন, —আপনাদের একটু বিরক্ত করতে এলাম। বিরক্ত মানে? ওই হল আর কি? ঘাবড়াবেন না। একটু থেমে দারোগাবাবু বললেন, একটু দরকারেই আসতে হল।

অমলবাবু দুঃশ্চিন্তায় ঘেমে উঠলেন। বললেন, কিন্তু আমার কাছে......এ সময় কী দরকার থাকতে পারে? দারোগাবাবু বললেন, বলছি, সব বলছি একটু পরেই সব জানতে পারবেন। তার আগে আমাদের একটা বসার ঘর ব্যবস্থা করে দিন তো। অমলবাবু বাইরের ঘরে দারোগাবাবুর বসার ব্যবস্থা করে দিলেন। অমলবাবু এতোক্ষণে দেখলেন দারোগাবাবু ছাড়াও আর একজন সঙ্গে আছেন। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, চাউনি রহস্যময়। দারোগাবাবু সোফায় বসেই বললেন, আপনার ছেলের নামই তো বাবুল—হ্যাঁ—ওকে দেখছি না তো। ও কে ডাকুন। বাবুলের বাবাকে আর ডাকতে হল না। বাবুল নিজেই ঘরে ঢুকল। কারণ সে পর্দার পেছনেই মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

দারোগাবাবু রাশভারী গলায় বললেন, এস বাবুল বস। বাবুল বসল দারোগাবাবুর সামনের খালি চেয়ারটায়। দারোগাবাবু দেখলেন, বাবুলের চোখে ভয় নেই। আছে কৌতূহল। এবার দারোগাবাবু অমলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আলাপ করে দিই। আমার সঙ্গে যাকে দেখছেন, ইনি হলেন গোয়েন্দা অফিসার মিঃ দত্ত। সত্যেন নস্করের খুনের রহস্য উদঘাটনের দায়িত্ব এনার ওপরই পড়েছে। অমলবাবু একটু অস্থির হয়েই বললেন, বেশ তো, কিন্তু আমরা কি করতে পারি। দারোগাবাবু একটু হেসেই বললেন, আবার ভয় পাচ্ছেন তো? কেন জানি না আপনারা পুলিশ ও গোয়েন্দা অফিসারদের দেখে ভয় পান? আমরা তো বাঘ-ভাল্লুক নই। আমরা তো মানুষ। এবার গোয়েন্দা

অফিসারটি বললেন, আমরা বাবুলের কাছে কিছু জানতে চাই। বোঝা গেল কাজের কথায় আসতে চান গোয়েন্দা অফিসার। দারোগাবাবু, গোয়েন্দা অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, জানেন মিঃ দত্ত এই বাবুলই আমার সেবার মান বাঁচিয়েছিল। শুধু মান বলি কেন, চাকুরিও বলতে পারেন। গোয়েন্দা অফিসারটি জানতে চাইলেন, —সেটা কি রকম?

দারোগাবাবু একটানা বলে গেলেন। ঘটনাটা বেশি দিনের নয়। আট-নয় মাসের আগের ঘটনা। এক ব্যাটা চোর, করবি তো কর, একেবারে দেখে দেখে M. L. A-র বাড়িতে সিঁধ কেটে বসল। তাও রাত্রে নয়। দিনের বেলায়। সেদিন M. L. A. সাহেব সস্ত্রীক চিড়িয়াখানা দেখতে গেছিলেন। চোর যখন চুরি করে পালাতে যাবে ঠিক তখনই দু'একজন পড়শির চোখে পড়ে গেল। পড়শিরা চোর-চোর-চোর করে হেঁকে ডেকে চোরের পিছু তাড়া করল। চোরও পাঁই পাঁই করে হাওয়ার বেগে দৌড়তে লাগল। এরকম যখন চলছে তখন স্কুল থেকে ফিরছে বাবুল তার বন্ধুদের। সঙ্গে বাবুল যেন দূর থেকে রহস্যের গন্ধ পেয়েছিল। ওর তৃতীয় চোখ, মন সজাগ হয়ে উঠেছিল আর বাবুলই ঐ চোরটাকে খুব কাছে থেকে দেখে ফেলল। প্রথমে মনে, পরে কাগজের পাতায় ওই চোরটির একটি ছবি এঁকে ফেলল। চোরটি একসময় ধরা ছোঁয়ার নাগালের বাইরে চলে গেল।

দারোগাবাবু এবার একটু দম নিলেন। আবার বলতে শুরু করলেন, খোদ M. L. A. সাহেবের বাড়িতে চুরি। বোঝেনই তো থানায় কতখানি চাপ থাকতে পারে। আর ওই চাপ সামলাবার জন্যে আমি সেদিন দু'একজনের কথামতো বাবুলের স্মরণাপন্ন হই। বাবুল যে এত ভালো ছবি আঁকতে পারে আমার জানা ছিল না। ও যদি কাউকে একবার দেখে তো তার ছবি এঁকে দিতে পারে। বাবুল রত্ন। হ্যাঁ যা বলছিলাম, সেবার বাবুলের আঁকা ছবির সূত্র ধরে মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যেই অপরাধীকে হদিশ করা সম্ভব হয়েছিল। গোয়েন্দা অফিসার মিঃ দত্ত বললেন, দারুণ ইন্টারেস্টিং তো! দারোগাবাবু এবার বললেন, শোন বাবুল আজও আমরা তোমার স্মরণাপন্ন। তোমার সাহায্য চাই। এতোক্ষণে অমলবাবুর কিছুটা আতঙ্কের জ্বর ছাড়ল। বাবুলও মনে মনে কিছুটা আঁচ করতে পারল। এবং সে হাত মেলাতে রাজি হল। মনে মনে। গোয়েন্দা-অফিসার মিঃ দত্ত বললেন, আচ্ছা, বাবুল, তুমি ফটিককে চেনো! —হ্যাঁ। বাবুল মাথা নাড়ল। গতকাল রাত নটার সময় তুমি প্রাইভেট পড়ে ফিরছিলে? মিঃ দত্ত জানতে চাইলেন। —হ্যাঁ, বাবুল মাথা নাড়ে। —আচ্ছা বাবুল, কালরাতে প্রাইভেট পড়ে আসার পথে তোমার চোখে সন্দেহজনক ভাবে কিছু পড়েছিল? —হ্যাঁ। বাবুল একইভাবে মাথা নাড়ল। —তুমি কাউকে চিনতে পেরেছ, মানে তোমার চেনা বলে কাউকে মনে হয়েছে? বাবুল স্পষ্ট ভাষায় জানালো, না। এবার দারোগাবাবু বললেন তুমি কি দেখেছিলে বলো তো?

মিঃ দত্ত বললেন, —কিছু বাদ দেবে না কিন্তু। সামান্য মনে হলেও তা বলবে। বাবুল তার নিজের চোখে যা যা দেখেছিল আগা থেকে গোড়া সব বলল। দারোগাবাবু ও গোয়েন্দা অফিসার সব শুনে কেমন যেন খুশি হলেন। সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার জন্যে প্রশংসা করলেন। তারিফ করলেন। বারে বারে। এবার দারোগাবাবু বললেন, আচ্ছা

বাবুল, ধর তোমায় যদি বলা হয় গতকাল রাতে ট্রাকের হেড লাইটে যে লোকগুলোকে দেখেছিলে তাদের দু'একজনের মুখের ছবি এঁকে দিতে, তুমি পারবে? মাথা নাড়ল বাবুল। হ্যাঁ সে পারবে। good, good, very good। আনন্দে উত্তেজনায় প্রায় এক সাথে দারোগাবাবু ও গোয়েন্দা অফিসার মিঃ দত্ত লাফিয়ে উঠলেন। বাবুল কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ ভেতরের ঘরে গেল এবং পরক্ষণেই বেরিয়ে এল।

তারপর সবাইকে হকচকিয়ে দিয়ে তারই আঁকা একটা ছবি দেখাল। তার চোখে মুখে রহস্যের হাসি।—কই দেখি, দেখি। প্রায় একই সাথে দারোগাবাবু ও মিঃ দত্ত ছবির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। আসলে বাড়ি ফিরে ছবিটা রাতেই বাবুল এঁকে রেখেছিল। বাবুল জানালো। মিঃ দত্ত আর দারোগাবাবু যেন আকাশের চাঁদ পেলেন। আর বসলেন না। বাবুল ও বাবুলের বাবার সাথে করমর্দন করে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসলেন। দিন তিনেক পর। বেলা দশটা নাগাদ দারোগাবাবু জিপ নিয়ে বাবুলদের বাড়িতে হাজির। সঙ্গে সেই গোয়েন্দা অফিসারটি। অমলবাবু হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন, বললেন কি খবর?

দারোগাবাবু এক গাল হেসে বললেন, খবর মানে, ভীষণ ভালো খবর। বাবুলের আঁকা ছবির সূত্র ধরে আসামীদের পুরো গ্রুপটাই আজ সকালে জয়নগর থানায়, লুটের টাকা সমেত ধরা পড়েছে। তারা স্বীকার করেছে, তারা ওই টাকার জন্যে সত্যেন নস্করকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। সত্যেনবাবু টাকা দিতে অরাজি হয়েছিলেন। এবার একটু দম নিয়ে দারোগাবাবু বললেন, জানেন অমলবাবু এ সব কৃতিত্ব বাবুলের। এরই মধ্যে বাবুলও ঘর থেকে ছুটে এসে বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গোয়েন্দা অফিসার মিঃ দত্ত তাঁর খুশি আর আবেগকে বেঁধে রাখতে পারলেন না প্রায় বাবুলকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বাবুল তোমার উপস্থিত বুদ্ধি ও দুরন্ত প্রতিভার জন্যে কী বলে যে তারিফ করব, প্রশংসা করব তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। রত্ন। সত্যি তুমি রত্ন। তুমি না হলে আমাদের এত তাড়াতাড়ি খুনীদের ধরা সম্ভব হত না। এবার মিঃ দত্ত অমলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি কথা বলতে কী বাবুলের গোয়েন্দাগিরিতেই আমার গোয়েন্দাগিরির চাকুরিটা বহাল থাকল।

অমলবাবু সন্তানের প্রশংসায় গর্বিত। তবু বিনীতভাবে বললেন, অমন করে বলবেন না আপনারা। বাবুল আপনাদের সন্তানের মতো। দারোগাবাবু রসিকতা করে বললেন,—কী বাবুল, আমরা কি সব বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকব? অমলবাবু জিব কাটলেন। বললেন,—আসুন। ভেতরে আসুন। দারোগাবাবু সহাস্যে বললেন, আজ নয়। অন্য এক দিন। আপনি বরং হাতের কাজ সেরে একটু পরে বাবুলকে নিয়ে একবার থানায় আসুন। থানায় বাবুলকে একবার দরকার।

ডিটেকটিভ কেবলরাম

বিজন কুমার ঘোষ

খুট করে একটা শব্দ। নাড়ুমামার ঘুমটা ভেঙে গেল। একবার ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে না। সেজন্য ঘুম ভাঙানো কারণটার ওপর নাড়ুমামার ভীষণ রাগ। একবার মনে হল অনি দুষ্টুমি করে কোন শব্দ করছে। না তো? না, অনি চুপচাপ ঘুমিয়ে আছে। নাড়ুমামা পাশের খাটের দিকে আড় চোখে তাকায়। জানালা দিয়ে ফিকে জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকেছে। আর তাতেই এবার কারণটা স্পষ্ট বোঝা গেল। নাড়ুমামার গায়ে বরাবর যেমন শক্তি তেমন সাহস। জানালা দিয়ে একটা সরু বাঁশ ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। বাঁশের লক্ষ্য দেওয়ালে ঝোলানো কালো কোটটার দিকে। কোটের পকেটে ছ'টাকা আশি পয়সা। নাড়ুমামা মনের মতো একটা কাজ পেয়ে গেল। খাট থেকে লাফিয়ে পড়েই অনেকখানি এগিয়ে এল। কিন্তু বাঁশ চালানকারীর গায়েও কম জোর নেই। পাল্টা প্রবল টানে নাড়ুমামা জানালার কাছাকাছি চলে এল। কিন্তু উপায়! নাড়ুমামা বুদ্ধি করে খাটের সঙ্গে পা বাঁধিয়ে দিল টান। বাঁশ আবার সরে এল আবার ওদিক থেকেও উল্টো হেঁচকা টান। এইভাবে টানাটানিতে দশটি মিনিট বেরিয়ে গেল। কারও মুখে কথা নেই। নাড়ুমামার গা দিয়ে কালঘাম ছুটছে। আর কিছুক্ষণ

এই ভাবে চললে নাড়ুমামার হাত অবশ হয়ে পড়বে। আর সেই ফাঁকে বাঁশ বেরিয়ে যাবে। নাড়ুমামা এখনও তিন হাজার লোকের সামনে মোটা লোহার শিকল ছিঁড়ে ফেলে। ঘুষি মেরে আস্ত নারকেল ফাটায়। তিন প্যাকেট তাস এক মোচড়ে ছিঁড়ে ফেলে। তাছাড়া আরও কত কী করতে পারে। তা সেই লোকের হাত থেকে বাঁশ বেরিয়ে যাওয়া মানে চূড়ান্ত পরাজয়। ঘরের মধ্যে ধুন্ধুমার শব্দে অনির ঘুমও ভেঙে গেল। ওর চোখে আদর্শ পুরুষ নাড়ুমামা। শিকলের বদলে এক টানে সুরু সুতো ছেঁড়া এবং এক ঘুষিতে খালি দেশলাই বাক্স ফাটানো এখন প্র্যাকটিশ করছে। সেই মামার দুরবস্থা দেখে অনি তড়াক করে উঠেই হাত লাগাল—মার টান হেইও—আরও জোরে হেইও—বাইরে হঠাৎ খিলখিল হাসি।—দুয়ো দুয়ো, নিজে পারে না আবার ভাগনেটাকে ডেকে এনেছে! দুয়ো—নাড়ুমামা অনিকে বলল, তুই চুপ করে বোস। দাঁড়া, এবার মজা বার করছি—এই বলে আবার টান। চলল এ রকম টানা দশ মিনিট। নাড়ুমামার সঙ্গে বাইরের লোকটাও জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। তার মানে দু'জনেই হাঁপিয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে আর বেশিক্ষণ চালানো যাবে না। নাড়ুমামা এবার হুঙ্কার দিল, কে তুই? বাইরে থেকেও জোর আওয়াজ উঠল। তোর বাবা। নাড়ুমামা বলল, আমার বাবা জুলাই মাসের সাত তারিখে মারা গেছেন। এবার বল তুই কে? লোকটা যেন দমে গেল এ কথায়। খোঁনা খোঁনা গলায় বলল, আঃ, বাঁশটা ছেড়ে দিন মশাই, ভেঙে যাবে —লজ্জা করে না রাত দুপুরে পরের বাড়িতে বাঁশ চালান করতে?—নাড়ুমামা গর্জে উঠল।—আপনার লজ্জা করে না কোটের পকেটে ছ'টাকা আশি পয়সা রাখতে! এ কথায় নাড়ুমামা একটু দমে গেল। তার কারণও আছে। নাড়ুমামা আগে ইস্কুলে মাস্টারি করত। মাস্টারি একদম অপছন্দ। অনেকে তখন উপদেশ দিল, তোমার লাইন বাছাই ভুল হয়েছে বাছা। এরকম স্বাস্থ্য নিয়ে মিলিটারিতে গেলে আজ মেজর জেনারেল হয়ে বসতে। কিন্তু বয়েস বেড়ে যাওয়ায় সে পথে কাঁটা। শেষে নাড়ুমামা আইন পাশ করে আলিপুর কোর্টের কালো কোট গায়ে চাপিয়েছে। দুঃখের বিষয় তিনটি বছর হয়ে গেল নাড়ুমামা মক্কেল কিংবা পয়সার মুখ দেখতে পেল না। আলিপুর কোর্টের বিশাল বটগাছের নীচে ছারপোকা ভর্তি সরকারি বেঞ্চ পাতা। নাড়ুমামা নিঃশব্দে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত সেই বেঞ্চ আলো করে বসে থাকে। না, ঠিক নিঃশব্দে নয়। হাফ কিলোটাক চিনে বাদামের খোলা ভাঙার শব্দ ওঠে কেবল। সুতরাং অজ্ঞাত কুলশীল লোক এসে পয়সার খোঁটা দেবে—এটা অসহ্য। সুতরাং ফের টানাটানি চলল দশ মিনিট। অনি চুপচাপ খাটের ওপর বসে আছে। মাঝে মাঝে ফিকে জ্যোৎস্নায় লোকটাকে দেখার চেষ্টা করছে। এবার লোকটাই কথা বলল।—কী জ্বালা! বাঁশটা ছাড়ুন মশাই।—কেন ছাড়ব?—আমাকে তো আরও পাঁচ বাড়িতে যেতে হবে। নাকি একটা বাড়ি নিয়ে পড়ে থাকলেই চলবে?—এটাই ব্যবসা নাকি? চমৎকার।—নাড়ুমামা সযত্নে খোঁচা দিল। বলি কাজ করে খেতে পারো না! চুপচাপ। দু'জনেই বিশ্রাম নিচ্ছে যেন। লোকটা আস্তে বলল, চারদিকে এত বেকার, খোঁড়া লোককে কে চাকরি দেবে?—কেন, এখন তো প্রতিবন্ধী বর্ষ চলছে। এটাই তো চাকরি পাওয়ার হাই টাইম।

বাইরে হাসির শব্দ উঠল।—আমি শুধু খোঁড়া নই, লেখাপড়াও জানি না। আমাকে কে নেবে? নাড়ুমামা বলল, নেবে না মানে? এখন টেন পার্সেন্ট, মানে দশ শতাংশ চাকরি প্রতিবন্ধীদের জন্য রাখা হবে। সরকার এরকম একটা আইন পাশ করেছে।—ও সব আমাদের

জন্য নয়।—আলবৎ তোমাদের জন্য। এবার জোর গলায় হো-হো হাসি।—আপনি নেহাৎ ছেলেমানুষ। এ জন্যই আলিপুর কোর্টে পসার হচ্ছে না।—দাঁড়া, তোর লেকচার বার করছি!—নাড়ুমামা প্রবল টানে বাঁশটাকে ভিতরে নিয়ে এল অনেকখানি। বাড়িতে হঠাৎ লোকজন এসে পড়লে অনি নাড়ুমামার পাশের খাটটিতে শোয়। কাল ছোট জাগুলিয়া থেকে এসেছে পিসি আর টুবলু। পরশু কোকরাঝোড় থেকে এসেছে ছোট পিসি, মিঠুদাদা, টিলুদাদা আর মিমি। সুতরাং স্থানাভাব। আর নাড়ুমামার পাশের খাটটি এমনি পড়ে থাকে। সেই আশ্রয়দাতার দুরবস্থা দেখে অনি বলল, আমি হাত লাগাব নাড়ুমামা?—না, না, তুই বসে থাক। বাছাধনকে আমি উচিৎ শিক্ষা দিচ্ছি। আবার হাসি।—অসম্ভব। ছোটবেলা থেকে এ লাইনে আছি স্যার। বাঁশ আমি ছাড়িয়ে নেবই।—বটে। চোরের সাতদিন গৃহস্থের একদিন।—ওটা স্যার প্রবাদ বাক্য। ওতে ভুলবে না।—তবে রে, প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ এবার অনি ঘরের মধ্যেই দেখতে পেল। মশারি টশারি ছিঁড়ে একাকার। টেবিল থেকে কালির দোয়াত উল্টে গেল। জানালায় রাখা কাঁচের গেলাস ভাঙল ঝনঝন শব্দে। ধপ্ ধপ্ করে খান কতক মোটা বই পড়ে গেল তাক থেকে মেঝেয়। এমন দুরন্ত টাগ অব ওয়্যার কেউ কখনও দেখেনি। বাঁশ একবার এদিক একবার ওদিক। কেউ হার মানবে না। হঠাৎ এই সময় মচ্ মচ্—মচাৎ এবং তারপরে দু'জন দু'দিকে ধপ্‌ধপ্—ধপাস্। তার মানে বাঁশ ভেঙে দু'জনেই ছিটকে পড়েছে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কেউ হার মানেনি। পরদিন পাড়ায় হই-হই কাণ্ড। গোটা পাড়া ভেঙে পড়েছে। চোরের সঙ্গে সারারাত দড়ি টানাটানি লোকজন তো উপচে পড়বেই। সবাই নাড়ুমামার মুখ থেকে সব কথা শুনতে চায়। কিন্তু তিনি ক্লান্ত। তাই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিতে হচ্ছে অনিকেই। সব পাড়ায় কিছু সবজান্তা দাদা থাকে যাবতীয় খবরাখবর যাদের নখদর্পণে। কেবল রাম বিশ্বাস এরকমই একজন সবজান্তা দাদা। তার সব চেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন সখের ডিটেকটিভ। রীতিমতো চেয়ার টেবিল টেলিফোন সাজিয়ে তার চেম্বার। সহকারী দু'জন, হুলো ও পেঁচো। মুশকিল হয়েছে, এ পাড়ায় খুন জখম প্রায় উঠেই গিয়েছে। শেষ খুন হয়েছিল সাত বছর আগে হরিবোলা কেষ্টাবোলার মা। দুই ভাইকে হাত পা বেঁধে মাকে খুন করে টাকা পয়সা সোনাদানা নিয়ে কারা যেন চম্পট দেয়। পুলিশ আজও সেই খুনের কোন কিনারা করতে পারেনি। আর কেবল রাম বিশ্বাসও তখন এ লাইনে আসেনি। আসবে কী করে, ইস্কুলে পড়ে। হায়ার সেকেণ্ডারিতে আজকাল ভাল ভাল ছেলেরাও ফেল করে। ফেল কেবলও করেছে। এতে কোনও দোষ হয় না। ওই কাঁচা বয়সেই ডিটেক্‌টিভ হতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবার জন্য বেচারা পারেনি। গত আশ্বিনে বাবা গত এ লাইনে আর কোনও বাধাই রইল না। অ্যাসিস্টেন্ট হয়ে এল হুলো আর পেঁচো। কেবল তো তবু হায়ার সেকেণ্ডারি ফেল। হুলো ক্লাস সিক্সে ও পেঁচো সেভেনেই আটকে গেছে মাষ্টার মশাইদের খেয়াল খুশির জন্যে। ক্যাবলাদা বলেছে, ওরে, তোরা আমার অ্যাসিস্টেন্ট হয়ে যা। ওই নিয়ে আর দুঃখ করিস নে। তোরা শুধু গুপ্ত তথ্য জোগাড় করে আনবি।

সেই থেকে জগাই মাধাই লেগে গেছে কাজে। মুশকিলের কথা তো আগেই বলা হয়েছে, এটা এখন সাধুবাবাদের পাড়া। খুন জখম প্রায় ভুলেই গেছে। এমনি কি, বেপাড়া থেকেও কেউ চুরি ডাকাতি করতে আসে না। ওরে, তোরা এত সাধু হলে ডিটেকটিভের কী করে চলবে? চেয়ারে কি ছুঁচোয় ডন মারবে? সকাল বেলায় লুচি—আলুকফির তরকারি চা খেয়ে

কেবলরাম যখন এই সব দুঃখের কথা ভাবছিল, তখনই হুলো-পেঁচো ছুটতে ছুটতে আসে, সর্বনাশ হয়ে গেছে ক্যাবলাদা, কাল গভীর রাতে অনির নাড়ুমামার সঙ্গে এক ডাকাতের বাঁশ টানাটানি হয়েছে। বাঁশের আধখানা পড়ে আছে, ডাকাত হাওয়া। আমরা স্পট থেকেই আসছি। —বলিস কিরে? —কেবল রাম তক্ষুণি দরকারি নোটবই খানা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঠিক তাই। নাড়ুমামা ধরাশায়ী হয়ে পড়ে আছে। অত বড় পালোয়ান হলে কী হবে, তখনও হাঁফাচ্ছে। দুটো দুটো সহকারীর সাহায্যে কেবলরাম কাজ করতে শুরু করে দিল তক্ষুণি। প্রথমে সময়, তারিখ, বাঁশটাকে কী অবস্থায় পাওয়া গেছে, সে সব ছোট নোট বুকে লিখে নিল। পায়ের দাগ লক্ষ্য করল। উত্তেজনা পূর্ণ কাজ করার আগে চোর ডাকাতরা সাধারণত খুব বিড়ি সিগারেট খায়। সেরকম তিন খানা আধ পোড়া বিড়ি আবিষ্কার করল জানালার পাশে। বিড়ি কিন্তু পুরো খায়নি। উত্তেজনার জন্য দুই একটি টান মেরেই ফেলে দিয়েছে। সেটাও নোট করে নিল। তারপর অনির কাছে, যেই শুনল দাদুর মৃত্যু সাতই জুলাই, এটা নাড়ুমামা বলতেই চোরের গলাটা কী রকম যেন খোঁনা খোঁনা হয়ে গিয়েছিল, অমনি কেবলরাম চেঁচিয়ে উঠল, ইউরেকা, পেয়ে গেছি, এসব তারাপদর কাজ। ব্যাটা ওপরে গিয়ে জাত ব্যবসা ভোলেনি! হুলো বলল, দ্যাখো ক্যাবলাদা, ডান পায়ের গোড়ালির ছাপ পড়েনি। তারাপদর ডান পায়ের গোড়ালিতে ঘা ছিল, তাই গোড়ালি উঁচু করে হাঁটছে। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও মা বোনেদের লক্ষ্য করে উৎফুল্ল কেবলরাম জোরে জোরে নোট বই খানা খুলে পড়তে শুরু করে দিল ঃ আজ সাতই জুলাই, ১৯১১ সাল। আজ সকালে পাড়ার বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তি পীতাম্বর বাবু সাধনোচিত ধামে গমন করলেন। একই দিনে বিকালে পাড়ার আর এক ব্যক্তি, তাকে ব্যক্তি না বলে দুষ্কৃতি বলাই ভাল, সেই তারাপদ মারা গেল। সবাই জানে তারাপদ পাকা চোর। তারাপদর একটি পা খোঁড়া। রাতে ঘরের মধ্যে পেরেক ঢুকে এই কাণ্ড।' জনগণ হই-হই করে ওঠায় আর পড়া গেল না। একজন বলে উঠল, আজ কী ঘটতে পারে তা ১৯৯১ সালেই টের পেয়ে গেছে। একেই বলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ডিটেক্‌টিভ। বাহাদুর ছেলে বটে! আর একজন বললেন, আমার বেড়াল ছানাটা হারিয়ে গেছে। ক্যাবলার কাছে যেতে হবে দেখছি। ভোম্বলবাবু বললে, রুপো বাঁধানো ছড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না। বড় সখের জিনিস। হ্যাঁ মশাই, ক্যাবলার রেট কত? পেঁচো বলল, দেখেছ ক্যাবলাদা, তারাপদর টেকনিক একই আছে, সেই বাঁশবাজি। ইতিমধ্যে কে যেন থানায় টেলিফোন করে দিয়েছে। ও. সি. শত্রু মর্দন মুখার্জি নিজেই মোটর বাইক চালিয়ে এসে হাজির। এই সব কথাবার্তার মাঝখানে মোটর বাইকটা গর্জন করতে হইহই করে উঠল, স্যার, এই রকম বিপদের মধ্যে আমাদের ফেলে রেখে চলে যাচ্ছেন? শত্রু মর্দনবাবু গোঁফ জোড়া ভয়ঙ্করভাবে নাচিয়ে বললেন, তবে কি অশরীরীর সঙ্গে হাতাহাতি করব নাকি? পুরুৎ টুরুৎ ডেকে এই বেলা শান্তি স্বস্তয়ন করুন। না হলে পাড়ার অনেক বাড়িতেই বাঁশবাজি হবে। এক গেলাস গরম হরলিকস্‌ খেয়ে নাড়ুমামা তখন সবে উঠে বসেছেন। হঠাৎ প্রশ্ন করল, তা হলে আমি, সারারাত ধরে কার সঙ্গে বাঁশ টানাটানি করলাম? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আর মোটা লোহার শিকল ছিঁড়ে ফেলা, ঘুষি মেরে আস্ত নারকেল ফাটানো, তিন প্যাকেট তাস এক মোচড়ে ছিঁড়ে ফেলা মহা শক্তিশালী নাড়ুমামা মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা ট্যাজলা তুলে দুম করে পড়ে গেল। সে এক মহা কেলেঙ্কারী কাণ্ড।

WWW.PATHAGAR.NET

সেই হীরের হার

সেকেন্দার আলি সেখ

শীতকালে ঘন কুয়াশার জন্য লোকজন রাস্তায় কম। জানুয়ারীর মাঝামাঝি ক'দিন সকাল আট-টার আগে সূর্যের রোদ দেখা যাচ্ছে না। তবুও ডিটেকটিভ বন্ধু চন্দ্রদীপ ভট্টাচার্য অনেক আগেই প্রতিদিনের মতো বিছানা ছেড়ে উঠেছে। আমাদের রুমে হেরাল্ড কোম্পানীর সেই বড়ো ঘড়িটায় ৫টার অ্যালার্ম বেজে উঠলে চন্দ্রদীপ ট্রাকস্যুট পরে মর্নিং ওয়াক করতে বেড়িয়ে পড়ে। ডায়মণ্ডহারবার থেকে পুরানো কেল্লার মোড় পর্যন্ত দৌড় লাগিয়ে তবেই ও বাসায় ফেরে। ওর ফিরতে ফিরতে বেলা হয় সাড়ে সাতটা থেকে আটটা। 'চন্দ্রদীপই' আমাকে ডাকলে তবেই আমি বিছানা ছাড়ি। বেলা পর্যন্ত ঘুমের জন্য চন্দ্রদীপ মাঝে মধ্যে কুম্ভকর্ণ বলে বন্ধু মহলে ক্ষ্যাপায়। মঙ্গলবার চন্দ্রদীপ মর্নিং ওয়াক থেকে এখনও আমাদের ছোট্ট বাড়িটাতে ফেরেনি। খুব স্পষ্ট কলিংবেলের আওয়াজ শুনে ঘুমের ঘোরে চমকে উঠলাম! তাইতো এতো সকালে কে এলো। চন্দ্রদীপ তো কোথাও যাবার সময় বাইরে থেকে রুমের সদর দোরে তালা লাগিয়ে যায়। আর পিছনের দোরের চাবি থাকে আমার কাছে। আমার যদি কোনদিন হঠাৎ বাইরে যাবার

papai

দরকার হয় পিছনের দোর খুলেই যাই। চন্দ্রদীপ কোনোদিন তো সকালে আমার মতো কুম্ভকর্ণের কাঁচা ঘুম ভাঙানোর জন্য কলিং বেল বাজায়নি। বিছানায় উঠে প্রথমে জানলাটা খুললাম। তখনও বাইরে জমাট কুয়াশা। কলাগাছের পাতায় শিশির পড়ছে। আবার কলিংবেল বেজে উঠল।

কলিং বেলের আওয়াজ শুনে পিছনের দরজাটা খুলে বাইরে তাকাই। না, তেমন কেউ এদিকে নেই। একটু ঘুরে গিয়ে রুমের সামনের দিকে দেখি একটা যুবতী মেয়ে হাঁপাচ্ছে। মেয়েটির বয়স হবে প্রায় সাতাশ-আটাশ। বিয়ে হয়নি। যেমন ফর্সা তেমনি সুন্দরী। দেখলেই বোঝা যায় কোন অভিজাত বাড়ির মেয়ে। আর গায়ের রং তেমনি দারুণ। আমার উপস্থিতি জানিয়ে দেবার জন্য একটু জোরে গলাটা খাঁকরে বললাম—'নমস্কার'। মেয়েটি তখন কিসের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার দিকে এগিয়ে এসে এক নিমেষে বলেই ফেলল—'স্যার আমাকে বাঁচান। আমার দিদিকে বাঁচান। প্রথমটায় আমি হক চকিয়ে উঠলাম। যতই হোক একটা অ্যান্ ম্যারেড ছেলের দিকে একটা যুবতী মেয়ে অমন করে এগিয়ে এলে কার না অবাক লাগে! মানে যুবতীকে দেখে অবাক ঠিক নয়, একটু ভয়। কিংবা ভয় ও ঠিক নয় ; একটু 'ইয়ে'। কি জানি কেন আমার সবটা গুলিয়ে গেল। আগন্তুককে বসতে বলতে হয় সেই ভদ্রতাটুকুও আমার স্মরণ ছিল না। মিনিট দু'য়েক পরে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বললাম ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আসুন বসুন। খুলে দিলাম বসার ঘরটা। চারদিকে কুয়াশা তাই একটু আলোর জন্য সামনের ও পিছনের জানালার পাল্লাগুলো খুলে দিলাম। তবুও রুমে তেমন আলো এল না। বাধ্য হয়েই বাল্বের সুইচটা অন্ করলাম। ঘরভর্তি আলো ঠিক্‌রে পড়তে মেয়েটি বুকের কাপড় আর অবিন্যস্ত শাড়ির আঁচলটা ঠিক্ ঠাক করে নেয়। মেয়েটি তখনও শীতের সেই সকালে কাঁপছে। পায়ের চটির ডগায় কাদা। শাড়ির ফলসের পাড়ে চোর কাঁটা জড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটি উত্তেজিত অবস্থায় বললো—স্যার আমি অনেক দূর দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে আসছি। বাঁচান আমাকে, আমার দিদি আত্মহত্যা করবে। ডিটেকটিভ বন্ধু তখনও বাসায় ফেরেনি বলেই বাধ্য হয়ে ভদ্রমহিলাকে বসিয়ে রাখার চেষ্টা করি। দু'টো কথা বলে মেয়েটিকে ভুলিয়ে রাখার জন্য বলি—বাঃ আপনার সাহসের তারিফ করতেই হয়। শীতের এই সময়ে রাতের গাড়ি ধরে একাই আসছেন? যন্ত্রচালিতের মতো ভদ্রমহিলা উত্তর দেয়—কি করব বলুন আমার দিদির জন্য গতকাল দুপুরেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। বাড়ির সবাই জানে আমি মামার বাড়ি মালদহে যাচ্ছি। চুরি করে আসছি কারণ আমার দিদি কোকো আত্মহত্যা.....ভদ্রমহিলার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম শান্ত হন, 'সত্য ডিটেকটিভ ব্যুরোতে যখন এসেছেন, নিশ্চয়ই কেস্‌টা আমরা টেক করবো। মনে রাখবেন, এই কাজে আমার ডিটেকটিভ বন্ধু চন্দ্রদীপ নিশ্চয়ই আপনার দিদিকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচাবেই। বসুন, আমি আপনার জন্যে চা করে আনি। চায়ের কেটলিটা নিয়ে ঘরে ঢুকছি, ঠিক তখনই হিন্দী ছবির নায়কের মতো জগিং করতে করতে ডিটেকটিভ বন্ধু চেঁচিয়ে উঠল—গুড্, মর্নিং মর্নিং। আজ সকাল সকাল উঠে সত্যি সারপ্রাইজ দিলে। আসলে চন্দ্রদীপ তখনও ভদ্রমহিলাকে দেখতে পায়নি। ম্যারাথন রানের চ্যাম্পিয়নের মতো ঘরে ঢোকার মুখে আগন্তুক ভদ্রমহিলাকে দেখে বন্ধু জিভ

কেটে ফেলে। কোন রকম থতমত খেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—ডোন্ট মাইণ্ড, নমস্কার। ভদ্রমহিলা নমস্কার বিনিময় করেন। চন্দ্র একমিনিট বলে হাত মুখ ধুতে বেরিয়ে যায়। চায়ের কাপটা ভদ্রমহিলার হাতে তুলে দিয়ে বলি—নিন্ চা খেয়ে নিন। ডিটেকটিভ বন্ধু চন্দ্রদীপ এসে গেছে। ও এখুনি হাতমুখ ধুয়ে আসছে। তখন সব কথা বলবেন।

একটু পরেই ডিটেকটিভ বন্ধু ড্রেস বদল করে বসার ঘরে ঢোকে। বিজ্ঞের মতো ইজি চেয়ারে হেলান দিতে দিতে ভদ্রমহিলাকে একবার আড়চোখে দেখে নেয়। স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে চন্দ্র ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করে—বাংলাদেশে আপনার আত্মীয় স্বজনেরা ভালো আছেন? এমন একটা প্রশ্নে ভদ্রমহিলা চমকে ওঠে। অবাক হয়ে উত্তর দেয়—হ্যাঁ। পরক্ষণেই ভদ্রমহিলা পাল্টা প্রশ্ন করে আপনি কি আমায় কোনদিন বাংলাদেশে দেখেছেন? ডিটেকটিভ বন্ধু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে চোখটা পিট পিট করে বলে আমি জীবনে কোনওদিন বাংলাদেশে যাইনি। তাছাড়া জীবনে কোন দিন আপনাকেই দেখিনি। তাহলে জানলেন কিভাবে যে আমার আত্মীয় স্বজনেরা বাংলাদেশে আছেন? আপনি কি তাহলে গনৎকার?—না। আমি গনৎকার নই। গনৎকারের উপর বিশ্বাসও করি না। আমি জানলাম আপনার পরিহিত শাড়ির লেবেলে ঢাকার বিখ্যাত 'ভাইয়া গ্রুপের' ছাপ দেখে। আর খুলে রাখা ঐ চটি জুতোতে পাচ্ছি 'মেড ইন্ বাংলাদেশ' দেখে। ডিটেকটিভ বন্ধুর উপস্থিত বুদ্ধি দেখে আগন্তুকের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ভদ্রমহিলা একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন আমি বিউটি চৌধুরী। আসছি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার একটি গ্রাম থেকে। আমি আসছি কারণ আমি দারুণ বিপদে পড়েছি। আমাকে বাঁচান। দিদি বেছে নিয়েছে আত্মহত্যার....। বন্ধু হাত তুলে বিউটিকে কি জানি কিছু বলতে নিষেধ করল। ইশারায় আমাকে বলল 'কুম্ভকর্ণ' রেকর্ড করো শুনলেই হবে না। মনে হচ্ছে রহস্যটা জটিল। যতদূর সম্ভব দীঘার সমুদ্র সৈকতে বধূহত্যার মামলার সঙ্গে সিমিলারিটি আছে। সিরিয়াস ভাবেই হাতের কাছে টেপ রেকর্ডার আর রাইটিং প্যাডটা নিয়ে ডট পেনটা বার করতে করতে বললাম—আই এ্যাম রেডি, বলুন এবারে। কোন ব্যাপার চেপে রাখার চেষ্টা করবেন না। মিস্ চৌধুরী একরাশ অজানিত আশঙ্কা নিয়ে থতমত খেতে খেতে বললো—আমার একমাত্র দিদি মানে কোকো বি. এ পাশ করে কলকাতা থেকে পিজিবিটি পাশ করেছে। চাকরি পায়নি। আমি মিস চৌধুরীর কথার মাঝে বোকার মতো বলেই ফেলি—অতশত বলতে হবে না। আসল ব্যাপারটা—ডিটেকটিভ বন্ধু আমাকে ধমক দিয়ে বলে—লিমিট। বোকার মতো সিচ্যুয়েসান নষ্ট কোর না। বিস্তারিত জানতে হবে। পরে ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্যে বন্ধু বলে—হ্যাঁ, সমস্ত ব্যাপারটা ডিটেলসেই জানান। মিস চৌধুরী বলেন ঃ আমার ঠাকুরদা ছিলেন চৌধুরী বংশের বিরাট ধনী লোক। এক কথায় জমিদার। সরকার জমি জায়গার সিলিং করার পর বহু বেনামী বিষয় সম্পত্তি সরকার নিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, সেই সময় আমার ঠাকুরমার গলায় হীরের কাজ করা ২০ ভরি একটা সোনার উপর হীরে বসানো হার ছিল, সেই হারটার বর্তমান মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। হারটা ছিল চৌধুরী বংশের স্মারক। ঠাকুরদা মৃত্যু শয্যায় বাবাকে হাত ধরে বলে গিয়েছিলেন ওই হারটা যেন বংশের বড় মেয়ে হিসাবে কোকোর বিয়ের সময় গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। মরার আগে ঠাকুরদা সাবধান

করে দিয়েছিল—আমার কথা রাখিস। ওই হীরের হারটা ছাড়া কোথাও কোকোর বিয়ে দিবি না। কিন্তু......ডিটেকটিভ বন্ধু সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো কিন্তু কি! বলুন বলুন।

মিস বিউটি বলতে থাকেন—সেই হারটা সোমবার থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গেছে। অন্যদিকে বাবা বালুরঘাটের এক ডাক্তারের সঙ্গে কোকোর বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছেন। তাই বিয়ের আগে ওই হার চুরি গেছে বলেই কেউ আর মৃত ঠাকুরদার কথা অমান্য করে দিদির বিয়ে দিতে ভরসা পাচ্ছে না। আর দিদিও বলছে আমি পাপী। তোদের বংশের কলঙ্ক। তাই মুখ রাখতে কোথাও গিয়ে আমি আত্মহত্যা করব। ডিটেকটিভ বন্ধু বিদ্যুতের জ্বলন্ত বাল্‌বের মতো চোখের তারা দুটো ভদ্রমহিলার দিকে স্থির রেখে বলে আপনার দিদি কিভাবে আত্মহত্যা করবে বলছে? কোথাও গিয়ে আত্মহত্যা করবে বলছে। কিন্তু কিভাবে আত্মহত্যা করবে তা দিদি জানায়নি। বন্ধু চন্দ্রদীপ একটা ঢোঁক গিলে আবার একটি সিগারেট ধরায় এবং জিজ্ঞাসা করে কিছু মনে করবেন না। জমিদার বাড়ির ব্যাপারতো তাই কয়েকটা প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতেই হবে। আচ্ছা বলুন তো ওই হারটা কোথায় থাকতো? বাবার ঘরে বড় লোহার একটা সিন্দুকে। চাবি কোথায় থাকতো? তা আমি জানার চেষ্টা করিনি। তবে মায়ের কাছে থাকতো বলেই জানি। কারণ বাবা ধর্ম-কর্ম নিয়েই আছেন বলেই সাংসারিক আর বৈষয়িক বিষয়ে বাবা বরাবর উদাসীন। অনেকক্ষণ পর রহস্যের কোথায় যে কি একটা ফাঁক ফোঁকর রয়ে যাচ্ছে মনে করে নোট করা থামিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা মিস চৌধুরী আপনার দিদির বিয়েতে হারটা উপহার দেবার কথা যেমন জানলাম, তেমনি এ ব্যাপারে অর্থাৎ হার চুরির ব্যাপারে আপনার দিদির মন খারাপ, না বিয়ের ব্যাপারে আপনার দিদির মন খারাপ?—তা ঠিক বলতে পারবো না। দু'টোর জন্য হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে। তবে বিয়ের প্রায় পাকা দেখাশোনার দিন সকাল থেকেই দিদির মনটা যেন উদাসীন ছিল। আর আপনার বাবা ও মা? মা বাবা অতিথিদের জন্য মাছ ধরা রান্নাবান্না আর চাকরদের নিয়ে ঘরদোর ধোওয়া মোছা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বিজ্ঞের মতো চন্দ্রদীপ জিজ্ঞাসা করে—আপনার দিদি তখন কি করছিল? উত্তরের দোতলার ঘরে শুয়ে কি যেন লিখছিল আর কাঁদছিল। আপনার দিদি কি কবিতা লেখে বা গল্প? নাঃ কোনও দিন কবিতা-টবিতা লিখতে দেখিনি। তবে মাঝে মধ্যে কি যেন লিখতে দেখেছি। এ ব্যাপারে দিদিও খুব লাজুক। আর আমার থেকে ও বড় বলেই আমি ব্যাপারটা জানতে চেষ্টা করিনি। আমি মাঝখানে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে বলি—আচ্ছা তখনও কি হার চুরির খবর আপনারা জানতেন?—না। বিয়ের দেখাশোনার দিন রবিবার বাবা নিজে থেকে হার দেবার প্রসঙ্গ তোলেন। পরে সোমবার দিন সকালে সিন্দুক খুলে হার পাওয়া যায়নি। সেই হার চুরির খবর জানার পর দিদি বলছে আমি কোথাও চলে যাবো।

ডিটেকটিভ বন্ধু ঢোঁক গিলে বিজ্ঞের মতো ভারী গলায় বলে উঠল হুঁ রহস্যটা দানা বেঁধেছে। ব্যাপারটা যতো সহজ ভেবেছিলাম ততটা সহজ নয়। আচ্ছা মিস চৌধুরী এখন আমাদের কি করতে হবে?—আপনারা দয়া করে দিদিকে বাঁচান।—আচ্ছা আপনার দিদির কি কোন প্রেমিক আছে?—হ্যাঁ। আমি একবার গোপনে দিদির একটা চিঠি খুলেই দিদির গোপন প্রেমের কথা জানতে পেরেছি।—কি জানলেন?—জানলাম দিদি জনৈক

অধ্যাপককে ভালোবাসেন। আর তাই দিদি বাবার পছন্দমতো ডাক্তারকে বিয়ে করতে চাইছে না। দিদি ওই কলকাতার অধ্যাপককেই বিয়ে করতে চায়। ডিটেকটিভ বন্ধু গলাটা নামিয়ে প্রশ্ন করে—একজন, সাবালিকা পছন্দমতো বিয়ের পাত্র নির্বাচন করতেই পারে। তাছাড়া পাত্রতো অধ্যাপক। কিন্তু হার চুরির সঙ্গে এ সব সম্পর্কের—হ্যাঁ সম্পর্ক আছে বলেই বলছি। দিদি ওই মূল্যবান হারটি চুরি করেছে এবং আমার মনে হয় ওই হার কোথায় আছে দিদিই একমাত্র জানে। আমি বললাম, তাহলে আমাদের মতো গোয়েন্দারা আপনার দিদিকে আগে বাঁচাবে, না আগে হার উদ্ধার করবে? মিস্ চৌধুরী খুব বিনীত কণ্ঠে জানাল হার চাইনা, দিদিকে চাই। কারণ জানেন তো চৌধুরী বংশের একটা ইজ্জত আছে। সেই মর্যাদা রক্ষা করার জন্য চুরি যাওয়া হার না পাওয়া গেলেও দিদির বিয়েটা যাতে হয় সে ব্যবস্থা আপনাদের করতেই হবে। ডিটেকটিভ বন্ধু প্রশ্ন করে কিন্তু বংশের প্রথানুসারে ওই হীরের হার না হলে বিয়ে—মিস চৌধুরী চটপট জবাব দেয়—নিশ্চয়ই হবে। আজকাল প্রাচীন যুগের নিয়ম মানলে হবে না। পণ নিরোধক আইনে তো কিছু দেওয়া এবং নেওয়া আইনত অপরাধ। তাই হার চুরি গেছে বলে চোখের জল ফেললে হবে না। দরকার এখন দিদির বিয়ে।—ব্যাস্। তাহলে তো আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুরে আপনাদের বাড়িতে একটু তদন্ত করতে হবে। ওই তদন্তে নিশ্চয়ই আমরা আপনার দিদিকে—হ্যাঁ। বুঝিয়ে সুঝিয়ে শুভ বিয়েটা সম্পন্ন করতেই হবে। দিদির বিয়ে হলেই আমি খুশী হবো। দিদিও আত্মহত্যার পথ থেকে বাঁচবে। ডিটেকটিভ বন্ধু ডাইরির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো ঃ পরশুদিন ভারত বন্ধ ওই দিন গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ থাকবে, যাওয়া যাবে না। তাই আপনি পথ নির্দেশ ও পুরো ঠিকানা লিখে বাড়ি ফিরে যান। আগামীকাল রাতের গাড়িতে আমরা যাচ্ছি। মিস্ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে—প্লিজ একটা শর্ত আছে। কুশমণ্ডীতে গিয়ে আমার নাম বা আমি এখানে এসেছি বলা যাবে না। ওই প্রসঙ্গটা গোপন রাখতেই হবে। বলবেন, গোপনে খবর পেয়ে আমরা তদন্তে এসেছি। আর হ্যাঁ, আমার ঠিকানাটা বলছি লিখে নিন। আমি ডায়েরিতে ঠিকানা লিখতে যাবো হঠাৎ ডিটেকটিভ বন্ধু বলে উঠলো-জায়গার নাম ধাম ভুল হলে—না, না, ভুল হবে না আমি বলছি লিখে নিন। হঠাৎ কি মনে করে চন্দ্রদীপ আমাকে ঠিকানা লিখতে দিল না। খুব শখের এবং যত্নের ডায়েরি থেকে পাতা ছিঁড়ে মিস চৌধুরীর হাতে দিয়ে অনুরোধ করলো আপনিই লিখুন। আপনার এলাকার জায়গা, আপনি ভালো লিখতে পারবেন। বাধ্য হয়ে ভদ্রমহিলা ঠিকানাটা লিখলেন। লিখে দিলেন পথ নির্দেশ।

ছোট্ট ঠিকানাটা পড়ে নিয়ে ডিটেকটিভ বন্ধু বললো—আসুন নিশ্চয় আমরা আগামীকাল দক্ষিণ দিনাজপুরে রওনা দিচ্ছি। আর হ্যাঁ আমরা নিশ্চয়ই হীরের হার উদ্ধার করতে না পারলেও আপনার দিদির বিয়ে দিয়েই বাড়ি ফিরবো। মিস চৌধুরী একরাশ হাসি আর চাপা একটা আনন্দের আমেজ নিয়ে বিদায় নিলেন। মিস্ চৌধুরীর কথা মতো ধর্মতলা থেকে বালুরঘাট কালিয়াগঞ্জের বাসে চেপেছি। উত্তর বঙ্গ পরিবহন সংস্থার এই বাসে আগেও কয়েকবার চড়েছি। সেবার ফ্লাইংগার্ল লিখা চক্রবর্তীর কেলেঙ্কারির হদিস জানতে আমাকে কান্দী-বহরমপুর-মালদহ বালুরঘাট ঘনঘন আসতে হয়েছে। উত্তর বঙ্গে বিশেষ করে দক্ষিণ দিনাজপুরে ওই ধরনের গোপন চক্রের সঙ্গে এই

হীরের হার চুরির কোন গোপন সম্পর্ক আছে কিনা ভাবতে ভাবতেই চন্দ্রদীপ গুম হয়ে বসে আছে। সারাটা রাত আমিও চন্দ্রদীপকে বিরক্ত করিনি। কারণ জানি সিরিয়াস কোন কেসের রহস্য উদঘাটন করার আগে খ্যাত ডিটেকটিভরা কোথায় যেন চিন্তার জগতে হারিয়ে যায়। রাতের আঁধার ফালিফালি করে বাস ছুটছে। রাতে কখন যে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি তা দুজনেই বুঝতে পারিনি। বাম্পারে বাসটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলে ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। চোখ মুছতে মুছতে বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি সকালের সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে এসে গেল কুশমণ্ডী। দু'জনেই নামলাম। আমার হতে অ্যাটাচিটা আর ডিটেকটিভ বন্ধুর হাতে একটা বড়ো ব্যাগ। কাছাকাছি থানার টিউবয়েলে মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম তদন্তে। মিস চৌধুরীর দেওয়া ম্যাপ দেখে চৌধুরীদের জমিদার বাড়িতে যেতে কোন অসুবিধা হল না। বাড়িতে তখনও নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য বাড়ির গেটের দারোয়ানকে বিউটিকে ডেকে দেবার কথা বলি। দারোয়ানকে আর ডেকে দিতে হলো না। বিউটি দোতলার রেলিং থেকে হাত নাড়িয়ে জানিয়ে দিলো আসছি দাঁড়ান। মনে হলে যেন বিউটি আমাদের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। নিমেষে দোতলা থেকে নেমে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাল একটা ঘরে। শীতের সকালে এতটা পথ হাঁটার জন্য তখনও আমরা ঘামছি। ফ্যানের সুইচটা অন্ করে দিয়ে গলাটা একটু নামিয়ে বিউটি চুপি চুপি জানালো প্লিজ। ডিটেকটিভ পরিচয় দেবেন না। বলবেন, আপনারা আমার কলেজ হোস্টেলের প্রাক্তন বন্ধু এবং আসছেন কাছাকাছি রায়গঞ্জ থেকে। বন্ধু যন্ত্রচালিতের মতো মাথা নেড়ে বললো সব ঠিক আছে। বিউটিকে দেখে খুব অস্থির মনে হচ্ছিল সেদিন। কি যেন একটা চাপা উত্তেজনায় মিস চৌধুরী কি করবেন আর কি বলবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। চন্দ্রদীপ একটা সিগারেট ধরালো এবং অতি ব্যস্ত বিউটিকে তাকিয়ে দেখছিল। মনে হচ্ছিল মিস বিউটির দেহলির রূপ দেখে চন্দ্রদীপ রহস্য উদঘাটনের বিষয়টি গুলিয়ে ফেলেছে। তবে কি চন্দ্রদীপ বিউটির প্রেমে পড়েছে ভাবছিলাম এটা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার না হোক চন্দ্রদীপের একটা হিল্লে হবে।

বিউটি একটু পরেই ধবধবে সাদা এক মধ্যবয়সী মহিলাকে ও মাঝ বয়েসী এক ভদ্রলোককে নিয়ে আমাদের বসার ঘরে ঢোকে। শীতের দিনে ফ্যান চলছিল তাই ফ্যানটা বন্ধ করে দিলাম। বিউটি দুই আগন্তুকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে জানাল—ইনিই আমার মা আর ইনি আমার বাবা। আমরা দুজনেই 'নমস্কার' জানালাম। বিউটি আমাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—মা ইনি হচ্ছেন চন্দ্রদীপদা আর ইনি হচ্ছেন—। আমি মিস বিউটির কথা কেড়ে নিয়ে বললাম—আমরা দু'জনেই ওর কলেজের বন্ধু। অনেকদিন পরে এদিকে একটা দরকার ছিল তাই দেখা করতে এসেছি। দেখলাম বিউটির মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। কোন কথা বললেন না। চন্দ্রদীপ উৎসুক ভাবে বললো—মাসীমা আপনি চুপচাপ কেন? শরীর খারাপ নাকি?—না বাবা। ভাব দেখালাম যেন কিছুই জানি না। বললাম—আমি তো আপনার ছেলের মতো। বলুন—মধ্যবয়েসী সেই ভদ্রমহিলা ব্যথিত হৃদয়ে জানালেন—রবিবার আমাদের চৌধুরী বাড়ির হীরের হার চুরি গেছে। সেই হারটি ছিল আমাদের বংশের স্মারক। তাই হারটা চুরির জন্য আমাদের

বংশের মান-মর্যাদা মাটি হতে চলেছে। ডিটেক্‌টিভ বন্ধু পাকা অভিনেতার মতো চটকদারি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—মাসীমা ওতে আর এমন কি ক্ষতি হয়েছে? আপনারা জমিদার মানুষ। টাকার তো আর অভাব নেই। তাই নতুন একটা হার গড়িয়ে নিন। মাসীমা কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। দেখলাম তাঁর মুখে একটা আক্ষেপের ছাপ। তিনি বললেন—টাকার অভাব নেই সত্য। কিন্তু টাকা থাকলেই কি ওই হারটা পাওয়া যাবে বাবা? তাছাড়া ওই হীরের হার দিয়ে আমার বড়ো মেয়ে কোকোর বিয়ে হওয়ার কথা। তাই হারটা খোওয়া গেল মানে আমাদের সব গেল। আমি অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলাম—ওই হারটা চুরির ব্যাপারে আপনি কাকে সন্দেহ করছেন?—সন্দেহ আর কাকে করবো বাবা। আমি তো কাউকে সন্দেহ করতে পারছি না। তবে ছোট মেয়ে বিউটি বলছে হীরের হার চুরি করেছে নাকি আমাদের বাড়িরই কাজের লোক। ডিটেক্‌টিভ বন্ধু অত্যন্ত উৎসুকভাবে প্রশ্ন করে—কাজের লোক মানে? মাসীমা বললেন—কাজের লোক মানে আমাদের বাড়ির পুরানো চাকর সাকিল। অবশ্য চাকর বলে সাকিলকে ছোট করা উচিত হবে না। ও খুব বিশ্বাসী। প্রায় বছর দশ আগের কথা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কোন এক এলাকায় বন্যা হতে শিয়ালদহ সাউথ সেকশন থেকে ট্রেন ভুল করে উত্তরবঙ্গে চলে আসে। সেই থেকে আমাদের বাড়িতেই তার ঠাঁই হয়। কিন্তু হঠাৎ সোমবার সকালে বিউটি সাকিলকে হার চুরির ঘটনার জন্য দায়ী করলে ও কেঁদে ফেলে। তারপর রাগ করে সে কোথায় চলে গেল। মিস বিউটি গলা চড়িয়ে বললো—চলে গেল নয় মা, সাকিল পালিয়ে গেছে। আর পালিয়ে যখন গেছে তখন কি আর বুঝতে বাকি থাকে যে কে চোর? আমি কথার ফাঁকে চন্দ্রদীপকে ছেড়ে মিস বিউটির বাবার পাশে পড়ে থাকা শূন্য চেয়ারটাতে গিয়ে বসলাম। খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি সাকিলকে সন্দেহ করছেন? ধর্মভীরু সৎ ও অমায়িক সেই ভদ্রলোক বললেন—জানি না। বাড়িতে আমরা মাত্র কয়েকটা প্রাণী থাকি। আমাদের সঙ্গে সাকিলও সংসারের একজনই হয়ে এতদিন থেকেছে। তাই তাকে আমি সন্দেহ করছি না। বাইরে থেকে কে যেন কাকে ডাকল। ঠিক বোঝা গেল না। একটু পরেই বিউটির বাবা-মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ডিটেক্‌টিভ বন্ধু বিউটিকে একা পেয়ে জানালেন কয়েকটা গোপন কথা আছে। আপত্তি না থাকলে চলুন আপনার রুমে গিয়ে বসি।—না না আপত্তি থাকবে কেন? তাছাড়া বাবা-মা তো জানেনই যে আপনারা আমার এক্স ক্লাশমেট্। বিউটির সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় ওর শোবার ঘরে ঢুকি। সুন্দর ছিমছাম ঘর। চারদিকে সাজানো গোছানো। ডিটেকটিভ বন্ধু নিখুঁতভাবে ছবি, টেবিলের বই, আলমারি সব দেখতে থাকে। দেখার ফাঁকে চন্দ্রদীপ বলে—আমরা কি আপনার দিদির সঙ্গে কথা বলতে পারি?—দিদি আপনাদের এখানে নাও আসতে পারে। কারণ ওই তো হার চুরির মতলবটা পাকিয়েছে। কেউ কি আর সহজে মুখ খুলতে চাইবে?

—তবুও দেখুন না। আপনার এক্স ক্লাসমেট হিসাবে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায় কিনা। মিস বিউটি চকিতে আনন্দিত হয়ে বললো—নিশ্চয়ই। হ্যাঁ ডিটেকটিভ বললে দেখা করবে না জানতাম। তবে আমার বন্ধু বললে দেখা করতে পারে। ঠিক আছে আপনারা বসুন। আমি আসছি। মিস বিউটির অনুপস্থিতিতে ডিটেকটিভ বন্ধু টেবিলের উপর রাখা

পুরানো ডাইরিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে। পরের দ্রব্যে হাত দেওয়া অনুচিত জেনেও বন্ধু বিউটির টেবিলের ড্রটারটা টেনে বের করে। ড্রয়ারের মধ্যে রাখা পুরানো কয়েকটা মুদ্রা, হরেক্‌রকম ডিজাইনের কলমগুলো দেখতে দেখতে একটা রাইটিং প্যাড বের করে। রাইটিং প্যাডের কোনো পৃষ্ঠায় লেখা নেই। বন্ধুটি ব্যাগ থেকে তার লেন্সটা বের করে সাদা প্যাডের উপর ঝুঁকে পড়ে। হঠাৎ একমুখ হাসি হেসে দেরী না করে প্যাডটা কোটের পকেটে লুকিয়ে রাখে। আর মেঝেতে পড়ে থাকা একটা ট্রেনের টিকিট কুড়িয়ে কি যেন দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। কারা যেন সিঁড়ি দিয়ে উপরেই আসছে। দেখতে দেখতে বিউটির মা বড় মেয়ে কোকোকে সঙ্গে করে আমাদের ঘরে আসেন। আমি কোকোকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকি। বাঃ কি সুন্দর! যেমন মিষ্ট রং তেমন মাথায় একরাশ ঘনকালো চুল। এককথায় অপরূপা সুন্দরী। সেই সুন্দরীর চোখের তারার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল এসব মেয়েরা পৃথিবীতে কোন অন্যায় করতে পারে না। ইচ্ছা হলো কথা বলার। চন্দ্রদীপকে সুযোগ না দিয়েই প্রশ্ন করলাম—মিস বিউটি আপনার নিজের বোন? হ্যাঁ।—আপনার মনটা ভাল নেই। তাই না?—হ্যাঁ। লক্ষ্য করলাম কোকো বেশি পছন্দ করেন না। চন্দ্রদীপ তাই বেশি ভূমিকা না করেই বলল—আমরা বিউটির বন্ধু, তাই আপনার বিয়েতে আমাদের নিমন্ত্রণ করবেন তো?—নিশ্চয়ই। তবে কবে হবে জানা নেই। এখনও বিয়ের ব্যাপারে তেমন ভাবিনি। আমি বললাম—আপনাদের বাড়িতে হীরের হার চুরি হয়ে গেছে জেনে খুব খারাপ লাগছে।—কি আর করা যাবে বলুন! ডিটেকটিভ বন্ধু সুযোগমতো প্রশ্ন ছুঁড়লো—হার চুরির ব্যাপারে আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন না?—না। বাড়ির কারোর প্রতি আমার অবিশ্বাস নেই।—আপনাদের বাড়ির চাকর সাকিল কি হারটি চুরি করেছে?—না। আমার বিশ্বাস ও নেবে না। সাকিল মিথ্যা কথা বলে, গুল দেয়। তবে চোর নয়। লক্ষ্য করলাম বিউটি দিদিকে ডাকতে যাবার নাম করে এখনও ফেরেনি। বাইরে ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যাচ্ছে। ডিটেকটিভ বন্ধুটি হঠাৎ 'আসছি' বলেই দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাধ্য হয়ে কোকোর বিয়ে, জামাই দেখাশোনা, আর হারচুরির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চালিয়ে গেলাম। ডিটেকটিভ বন্ধু ঘরের বাইরে থেকে 'ডোন্ট মুভ' বলে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। আমারা ছুটে নীচে নেমে যাই বিউটি তখন ঘরের পিছনে খড়ের গাদার কাছে। কেউই ব্যাপারটা বুঝে উঠলাম না। ডিটেকটিভ বন্ধু সেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পায়চারি করতে করতে রাইফেলের ট্রিগারে হাত রেখে বললে—মিস বিউটি হীরের হারটা ফেরৎ দিন। বিউটি পাকা অভিনেত্রীর মতো সাফাই গেয়ে বলে উঠলো—মুখ সামলে কথা বলবেন। হীরের হারের কথা আমি কি জানি!

এতক্ষণে লোকজন জমে গেছে। বন্ধুর নির্দেশমতো ফেরিওয়ালাকে আটকে দিই। তবুও ব্যাপারটা আমার কছে সহজ হল না। বন্ধু বলে আমার হাতে অনেক প্রমাণ আছে। হার চুরি করেছে মিস বিউটি। এবং সেই হীরের হার রয়েছে এইখানেই। একটু দেরি হলে অবশ্য ফেরিওয়ালা পাচার করত। উপস্থিত সকলে চমকে উঠল। ডিটেকটিভ চন্দ্রদীপ কোটের পকেট থেকে সেই প্যাডটি বের করে বললো—এই প্যাডটাই তার প্রমাণ। চন্দ্রদীপ বিউটির মায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে জনৈক ফেরিওয়ালার মাধ্যমে

হারটা বাংলাদেশে পাচার করা হবে বলে প্যাডে লেখা আছে। সেই চিঠিটা আমার কাছে না থাকলে ও চিঠির হুবহু কপির 'ইম্প্রেশন' লক্ষ্য করুন। চিঠি লেখার দাগ দেখে মিছিমিছি আমায় চোর বললেই হবে? বিউটি রেগে বলে। নিশ্চয়ই না। আরো প্রমাণ আছে। আপনার রুমে পাওয়া গেছে এই ট্রেনের টিকিটটা। এটা শিয়ালদহ সাউথ সেকশানের এবং তারিখটা সোমবারের। তার অর্থ আপনি আপনার বাড়ির চাকর সাকিলকে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগণায় পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। টিকিটটা বাইরে ফেলে দিতে ভুলে গেছেন। সাকিলকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেছেন। সাকিলকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আপনি আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। আর তাই আপনি আমাদের ওখানে যাওয়ার ব্যাপার এবং ডিটেকটিভ পরিচয় জানাতে নিষেধ করেছিলেন। মিস বিউটির মা ভ্রু কুঁচকে বলেন—সোমবার বিউটি তো মামার বাড়ি গিয়েছিল! ডিটেকটিভ বন্ধু একটা বাসের টিকিট বের করে বললো—দেখুন বিউটির নাম লেখা কলকাতার বাসের টিকিট এটা এবং দিনটা ওই সোমবার। বিউটি অন্যমনস্ক ভাবে বাসের টিকিটটা আমাদের ঘরের বাইরে ফেলেছিল। কোকো প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—হার চুরি করে ওর লাভ? ও তো আর বাইরের লোক নয়?—জানি ও আপনার বোন। কিন্তু চৌধুরী বংশের প্রথানুসারে ওটা বিয়ের সময়ে আপনাকেই দেওয়ার কথা। এটাই মিস বিউটি সহ্য করতে পারেন নি। তাই মিস বিউটি চেয়েছিলেন কোনমতে আপনার বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি হবেন ঐ হারটার মালিক। ডিটেকটিভ বন্ধুর কথা শুনে উপস্থিত সকলে স্থির হয়ে গেলে। আমি বললাম—বিষয়টা নিয়ে প্রথম থেকে আমারও কেমন সন্দেহ ঠেকছিল। কারণ বিউটির আবেদন ছিল হারানো হীরের হার খুঁজতে হবে না। কোনরকমে দিদির বিয়েটা সারলেই হবে। দ্বিতীয়ত আমাদের কাছে হার চুরির ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য বিউটি বিশ্বস্ত চাকর সাকিলকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ডিটেকটিভ বন্ধু হো-হো করে হাসতে হাসতে খড়ের গাদার ভিতর থেকে হীরের হারটা বার করে বলে—মাসীমা, এই নিন আপনার হার। মিস বিউটি, সে তার সব অপরাধ স্বীকার করে নেয়। ডিটেকটিভ বন্ধুটি বলে—মনে রাখবেন—বড় চোরেরা পুলিশ দেখলে পালায় না, বরং তারা লালবাজারের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করে। কোকো বলে, ভয় নেই। আমি ডাক্তারকে বিয়ে করছি না। যখন আমার বিয়ে হবে তখন আপনাদেরই আসতে হবে।

কমলের গোয়েন্দাগিরি

pathagar.net

মীর মমতাজ

এখন সকাল দশটা। কমল বোধ হয় এখনও ঘুমোচ্ছে। যাই—ওকে ডেকে তুলি। ওকে যতক্ষণ না খবরটা দিতে পারছি ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। আমার মনে হয় কমলই এই রহস্যটা উদঘাটন করতে পারে।

যখন ও সরস্বতী পুজোর পেতলের বাসনপত্র চুরির কেসে ও পাড়ার কালিদের ধরল তখন থেকেই ওর উপর আমার একটা আলাদা ইন্টারেস্ট এসে গেছে। ওর কাজগুলো একেবারে পেশাদারি গোয়েন্দাদের মতো নিঁখুত। আর হবেই বা না কেন হোমস্ থেকে শুরু করে ফেলুদা সবই ওর কণ্ঠস্থ। গোয়েন্দাদের সব আদব-কায়দা ওর রপ্ত। ওর কাছে যতই মিথ্যে কথা নিখুঁত ভাবে সত্যি বলি না কেন, এমন জেরা করবে যে আসল কথাটা বের করে তবে ছাড়বে।

কমলদের বাড়ি আমাদের পাশের, পাশের বাড়িটা। মাঝের বাড়ি প্রদীপদের।

বেল টিপতেই কমলের মা বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলাম—কমল আছে?'

—এখনও ঘুমোচ্ছে কতবার ডাকলাম তাও উঠছে না। শুধু উঠছি আর উঠছি করছে।

দেখতো তুমি গিয়ে ডেকে তুলতে পার কিনা।' আমি ওর ঘরে গিয়ে ওর গায়ের চাদরটায় একটা হ্যাঁচকা টান মেরে তুলে নিলাম। দেখি বাবু এখনও উঃ আঃ করছে। কমল.....এই কমল.....ওঠ্ একটা ইন্টারেস্টিং কেস আছে? কোন উত্তর এল না। কমল.....এই কমল কমল এইবার ধড়পড় করে উঠে বসল।—কি ব্যাপার? কি হয়েছে? এত সকালে?' জড়ানো কথায় আড়মোড়া ভঙতে ভাঙতে কমল জিজ্ঞেস করল। আমি বললুম সর্বনাশ হয়ে গেছে 'কেন কি হয়েছে?' আজ সকালে প্রদীপের বাবার আড়াই হাজার টাকা চুরি হয়ে গেছে।

—তাই নাকি। তা আমি কি করব? তুই কি করবি মানে? সখের গোয়েন্দা হয়েছিস কি করতে। তোকে এই চুরির কেসটা সমাধান করতে হবে। তুই যদি এটা করতে পারিস তবে প্রদীপের বাবা খুশি হবেন। অন্তত তাহলে আর বলতে পারবেন না যে আমাদের জন্যই প্রদীপ পড়াশুনাতে গোল্লায় গেছে।—প্রদীপের তো আজ থেকে টেস্ট নারে।' হ্যাঁ। ও পরীক্ষা দিতে চলে গেছে চল। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে। নে ওঠ্। ওদিকে হয়ত বেচারা সাগরটা আধমরা হয়ে গেছে? কেন? কেন?

সবাই বলছে ওই নাকি চুরি করেছে। 'চুরিটা হ'ল কখন?' কাল রাত্তিরে। ওর বাবা অফিসের মাইনে পেয়ে বাড়িতে টেবিলের উপর রেখেছে। সকালেই হাপিস।—ঠিক আছে তুই একটু বোস্ আমি আমি এক্ষুনি আসছি।' প্রদীপরা খুব বড়লোক। ওদের তিনতলা বাড়ি মারুতি গাড়ি আরো কত কি আছে। প্রদীপের বাড়িতে যে কত দেশি বিদেশী খেলনা আছে তার ইয়ত্তা নেই। ও ওর বাবার কাছে যাই চায় তাই পেয়ে যায়। কিন্তু তবুও প্রদীপ ছেলেটা খুব ভালো। যে দিন ওর সাথে প্রথম বন্ধুত্ব হয় সেদিন থেকেই বুঝেছি ওর মধ্যে কোন অহংকার নেই। খুব ভালো ছেলে। ও এবার মাধ্যমিক দেবে। আমাদের থেকে দু'ক্লাস নিচুতে। আজ থেকে ওর পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

এখন ঠিক দশটা চল্লিশ। আমি আর কমল দুজনে ওদের বাড়িতে গেলাম। কমলের ভাবখানা একেবারে পাকা গোয়েন্দার মতো। বাড়িতে খুব শোরগোল শুনতে পেলাম। বেচারি সাগর এতক্ষণে হয়ত.....।

প্রদীপের বাবা দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। প্রথম কথাটা কমলই বলল, 'কাকু শুনলাম নাকি আপনাদের বাড়িতে চুরি হয়েছে?'—চুরি কি গো টাকা নিয়েছে। ঐ হতচ্ছাড়া সাগরের দিকে কটমট করে তাকিয়ে প্রদীপের বাবা বললেন—এখনও বলছি বের করে দে নইলে ঐ গেলুম থানায়। সাগরের দুচোখে জল। কাতর স্বরে বলল আমি নিইনি বাবু—আমি নিইনি। কমল বলল—দাঁড়ান আমরা দেখছি।' বলেই সাগরের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল সাগর তুই যদি না নিস্ তবে কে নিয়েছে? আমি জানি না। প্রদীপের বাবা আবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করে জানি না মানে ঐ ঘরে সন্ধ্যেবেলায় তুই ছাড়া আর কে ছিল শুনি? আমি দোকানে গেছিলাম। দেখেছ দেখেছ কেমন মিথ্যে কথা বলে দাঁড়া আজ তোর একদিন কি.....কাল সন্ধ্যেবেলা আমি অফিস থেকে এসে এই আটটা নাগাদ উপরের ঘরে টেবিলের উপর কেবল রেখেছি। বাথরুম থেকে এসে দেখি হাওয়া। বলি ঘরে আর কে ছিলো শুনি? টাকাগুলো কি আর ভূতে নিয়ে গেল? কমল ওস্তাদি করে বলল—কাকু কেসটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন আমরা দেখছি। চোরকে ঠিক ধরে

দেবো, এটা আমাদের প্রমিস।' 'দেখো তোমরা। আমি তো সারা দিনে আর বার করতে পারলাম না।' বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। শখের গোয়েন্দা এবার প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করল—'সাগর তুই কাল রাত আটটার সময় কি করছিলি।' সত্যি কথা বলছি কাল আটটার সময় নেতাজি সংঘে যাই।' কেন? ওখানে কি আছে, তাই দেখতে। টিভিতে কি ছিল? চিত্রহার। বাড়িতে টিভি দেখতে দেয় না? দেয় কিন্তু দাদাবাবুর পরীক্ষা বলে কাল টিভি বন্ধ ছিল। তারপর? তারপর চিত্রহার শেষ হতেই দৌড়ে বাড়ি চলে আসি। দেখি মামাবাবু গেটে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই বললে, বল কোথায় রেখে এসেছিস? আমি বললাম—কি?' দাদাবাবু বললে—কি? চালাকি হচ্ছে?' বলেই.....হাউ হাউ করে কঁদে .উঠল সাগর। কমল বলল,—তুই যে কাল বাইরে টিভি দেখতে গেছিলি তখন কি মামাবাবু বাড়িতে এসেছিলেন?' হ্যাঁ। তুই কি বলে গেছিলি?

আমরা দুজনে ওদের বাড়ি থেকে আসছি এমন সময় ন্যাপলার সঙ্গে দেখা। কমল ন্যাপলাকে দেখে বলল। অ্যাই ন্যাপলা কাল তোদের ক্লাবে সাগর এসেছিল চিত্রহার দেখতে? কে সাগর? আরে প্রদীপদের বাড়ির ছেলেটা? কালো মতন বেঁটে।

ও হ্যাঁ এসেছিল তো। কেন? কি হয়েছে? না মানে.....এম্‌নি। আমরা বিকেল বেলায় প্রদীপদের বাড়ি গেলাম কমলের হাতে একটা ব্ল্যাঙ্ক ক্যাসেট। আমি বললাম কি করবি রে ওটা দিয়ে, কথাগুলো রেকডিং করবি? তবে তো তুই সত্যিই......আরে না না। প্রদীপরা একটা নতুন ডেক কিনেছে। বাইরের। ওটা নাকি দুর্দান্ত রেকর্ডিং হয়। কালকে আমি একটা ক্যাসেট রেকডিং করতে দিয়েছিলাম। ওটা আমার মাসির মেয়ে নিয়ে গেল। তাই আবার এই ক্যাসেটটা দিচ্ছি। তাহলে তো বেশ ভালই রে। এবার কোন গান রেকডিং করতে হলে প্রদীপের বাড়িতে গিয়েই করা যাবে।

প্রদীপ সবে পরীক্ষা দিয়ে এসেছে আমি বললাম কিরে কেমন পরীক্ষা হল। মুখে হাসি নিয়ে প্রদীপ বলল দুর্দান্ত। রচনাটা যা লিখেছি না। কমল বলল এবার তাহলে পাশ কর্‌ছিস্ নির্ঘাৎ—শুনেছি তোরা নাকি আজ সকালে এসেছিলি কি গোয়েন্দাগিরি করতে? আমি বললাম হ্যাঁ জানিস না, কমল তো এখন পেশাদারি গোয়েন্দা।—কমল প্রশ্ন করল আচ্ছা প্রদীপ কাল যখন ঘটনাটা ঘটে তখন তুই কি করছিলি? তোর ক্যাসেট রেকডিং করছিলাম। ও.....আর কেউ এসেছিল কি? না তো? তবে আমাদের মালি এসেছিল। কিন্তু ওতো আমার ঘরেই বসে ছিল। কমল বলল ঠিক আছে এই নে ক্যাসেটটা। আরো একবার করে দিস। ও তোর তো পরীক্ষা আমি তো ভুলেই গেছিলাম। ও কোন ব্যাপার না। আজকেই চাই? হ্যাঁ। আমি তাহলে রাত সাড়ে আটটায় আসব। বিকেলের পর কি ঘটেছে কমলবাবুর গোয়েন্দাগির কেমন চলেছে জানি না। হয়ত কালকেই নতুন কোন ঘটনার মোড় নেবে। হঠাৎ দরজায় খট খট। কি ব্যাপার রাত দশটার সময় আবার কে এলো? একটা চেনা চেনা গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আমার নাম ধরে ডাকছে কমল। আমার ঘরে ঢুকে কমল বলল সম্রাট কেসটা প্রায় সলভ্ হয়ে গেছে।' কি করে বার করলি? কে সে? প্রমাণ পেয়েছিস? সব পরে বলব। এখন শুধু আমি বলতে এলাম—কাল সকাল ছয়টায় তুই আর আমি মর্নিং ওয়ার্কে যাব। কেন? হঠাৎ? কি ব্যাপারে? ওফ। প্রশ্ন করিস না। যা বলছি তাই শোন। কাল সকাল ছয়টায় দেশবন্ধু পার্কে পুকুরের

ধারে যে ক্লাবটা আছে তাতে পৌঁছে যাবি।

পরের দিন সকাল হতে না হতেই আমি যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম। আমার পাশে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। আমার দিকে পিছন করে। কমলের কোন পাত্তা নেই আমাকে বলে এখন নিজেই......

দূরে একটা চেনা চেনা মুখ দেখতে পাচ্ছি যদিও কুয়াশায় বোঝা যাচ্ছে না। তবুও মোটা সোটা একটা চেহারা বড়গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে আরো একজন এসে ঐ গাছটার তলায় দাঁড়াল। ওদের মধ্যে বাক্যালাপ হতেই দুজন দুদিকে চলে গেল। আমি বসে আছি। হঠাৎ সিটটার তলা থেকে জোর শব্দ......জোরে মুহূর্তের মধ্যে সব ঘটনাগুলি ঘটে গেল। দেখি কমল দৌড়াচ্ছে আমিও সঙ্গে সঙ্গে কমল কমল বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়াচ্ছি আর আমার পাশের বসা লোকটা আমার পেছনে দৌড়াচ্ছে। একি উনি তো প্রদীপের বাবা.......কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই দেখি উনি আমাকে টপকে চলে গেলেন। সোজা বড়গাছটার তলায়। এ কি প্রদীপ যে। কি ব্যাপার। কমল ডান হাতটা দিয়ে প্রদীপের হাতটা চেপে ধরল। আর হাঁপাতে হাঁপাতে—কাকু এই যে আপনার আসল টাকা 'চোর'। 'বার কর বার কর' বলে প্রদীপের এক পকেট থেকে অনেকগুলি একশ টাকার নোট ও কিছু ছাপানো কাগজ বার করল। প্রদীপ ভ্যাবাচ্যাকা। হাতে নাতে অপরাধী ধরা পড়লে যেমন হয় ওর ভাবটাও সেই রকম। আমিও কিছু বুঝতে পারার আগেই কমল বলল,—প্রদীপ আপনার টাকা চুরি করে তাই দিয়ে ফাঁস হয়ে যাওয়া পরীক্ষার কোয়েশ্চেন পেপার কেনে। এই সেই কোয়েশ্চেন পেপার আর টাকা।'

ওই দিন দুপুরে আমি কমলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তুই কি ভাবে এই কেসটা উদ্ধার করলি।' তাতে কমল যা বলেছিল তা হুবুহু তুলে দিলাম। প্রথমত সাগর চুরি করেনি? ও সেই সময় ঘরে ছিল না। এটা সত্য। দ্বিতীয় সাসপেকট মালি। কিন্তু সে তখন প্রদীপের ঘরে বসে নতুন রেকর্ডিং ডেকটার গান শুনেছিল। তাই আমার সন্দেহ যায় প্রদীপের উপর। যে ছেলে বিগত তিন বছর পরীক্ষায় ফেল করে এল সে বাংলা পরীক্ষা একেবারে ফাটিয়ে দিয়ে আসে তাতে আমার সন্দেহ হয়। কাল যখন ওর বাড়ি থেকে আমার রেকর্ডিং করা ক্যাসেটটা শুনি তখন দেখি শেষ গানটা শেষ হয়ে যাবার পরও একটা কিসের আওয়াজ আসছে। কৌতূহল বশতঃ কাছে গিয়ে শুনতে পাই প্রদীপের গলা। ও কাকে বেশ ফোন করছে তাদের কথাবার্তায় আমার কাছে প্রদীপের কুকীর্তি, পরিষ্কার হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার মাসির বাড়িতে গিয়ে আগের রেকর্ডিং করা ক্যাসেটটা নিয়ে আসি। দেখি সেখানে একটা গানের মাঝেই একটা ভাসা ভাসা কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। তাতেই ওই একই কথা শুনবি। বলে কমল ঐ ক্যাসেটটা ওর টেপে লাগিয়ে দিল। কালি কালি আঁখে শেষ। এবার ঐ আওয়াজটা শুরু হল, একজনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। হ্যালো হ্যাঁ সবই মিলেছে। কাল কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ টাকা নিয়েই যাব? যা চাইবে তাই দেবো। আচ্ছা রাখছি।

মিথ্যে খুন

নাসির সাহেব

আলতাফ হোসেন তার চেম্বারে বসে মৌজ করে সিগারেট টানছিল। হাতে বিশেষ কোন কাজ নেই, গতকালই একটা জটিল কেসের নিষ্পত্তি করেছে। নতুন কোন কেসও আসেনি। 'নর্থষ্টার' এর্পাটমেন্টের ফিফথ্ ফ্লোরে অফিস, অফিস মানে দশ বাই দশ একটা ঘর। ঘরের আসবাব বলতে একটা টেবিল, টেবিলের একদিকে একটা রিভলভিং চেয়ার। তাতে বসে আছে গোয়েন্দা সম্রাট স্বয়ং আলতাফ হোসেন। তার অন্য পাশে খান কতক চেয়ার, ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বসির আলী খান। আলতাফ হোসেনের সহকর্মী। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। ঢাকা রাজপথ ধরে অনবরত গাড়ি যাতায়াত করছে। বসিরের দৃষ্টি উদাস, হঠাৎ লক্ষ্য করল রাজপথ ধরে একটি লোক হন্তদন্ত হয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে, চারদিকে তার ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টি, দেখে মনে হবে তাকে বুঝি কেউ অনুসরণ করছে। বসির যতদূর দৃষ্টি যায় তাকালো, না, তেমন কোন লোকতো নজরে আসছে না। লোকটি ক্রমশ এই এপার্টমেন্টের দিকেই এগিয়ে আসছে। বসিরের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাথাটা সামান্য ফিরিয়ে বলল—যদি ভুল না হয়

তোমার কাস্টমার আসছে......নড়ে চড়ে বসে গোয়েন্দা সম্রাট বলল—কি করে বুঝলে? মৃদু হেসে বসির বলল—তোমার সান্নিধ্যে এসে, তোমার বিকল্প না হতে পারলেও তোমার শিক্ষা তো কিছু পেতে পারি।

বসির আলীর ধারণা যে ভুল নয় তা একটু পরেই প্রমাণ হলো। হন্তদন্ত হয়ে একটা লোক ঐ ঘরে প্রবেশ করেই পিছন ফিরে দরজার দিকে তাকালো—ডিটেকটিভ আলতাফ হোসেনের চেম্বার এটা, তাকে কোথায় পাব বলতে পারেন?

আলতাফ হোসেন মৌজ করে সিগারেট টান ছিল আর আগন্তুককে লক্ষ্য করছিল। বয়স পয়তাঁল্লিশ বলেই মনে হলো, ভারী চেহারা মাথায় মস্ত বড় এক টাক, পরনে পাজামা পাঞ্জাবি, চোখে মুখে ক্লান্তি এবং ভয়ের ছাপ বিদ্যমান। বসির আলতাফ হোসেন কে দেখিয়ে বলল—ঐ তো আপনার সামনেই বসে আছেন।

—স্যার, আপনি আমাকে বাঁচান, ওরা আমায় মেরে ফেলবে, যত টাকা লাগে আমি দেব স্যার।

আলতাফ হোসেন শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—শান্ত হয়ে বসুন আগে। লোকটি ধপ করে বসে পড়ল, বার বার পিছন দিকে দরজার দিকে তাকাচ্ছে।—ভয় নেই, গোটা দেশে এমন কোন অপরাধী নেই যে আমার ঘরে ঢুকে কারোকে বিরক্ত করবে, বলুন কি ঘটনা।—স্যার গত রবিবার আমার চোখের সামনে একটি খুন হয়ে গেল, যারা খুন করেছে তারা আমাকে দেখে ফেলেছে। তারপর থেকেই তারা আমার পিছু নিয়েছে, তবে.......

pathagar.net

—এক মিনিট, খুনটা কোথায় হয়েছে?—রেললাইনের ধারে, প্লাটফর্ম থেকে একটু দূরে। জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে ভোজালি দিয়ে কুপিয়েছে।—যে খুন হয়েছে আপনি তাকে চেনেন?—চিনি স্যার, ভাল করে চিনি।—আরা যারা খুন করেছে? লোকটি চুপ করে তাকিয়ে আছে, ভয়ার্ত দৃষ্টি এবার বসিরের দিকে, আবার আলতাফ হোসেনের দিকে।

—কি হলো বলছেন না কেন?—মানে স্যার, আমি যদি কোন বিপদে পড়ি....—তাহলে আমার কছে এসেছেন কেন?—রাগ করবেন না স্যার, বলছিলাম সংসারী মানুষ তো, এমন ঘটনা ঘটে যাবে চোখের সামনে ভাবতেই পারিনি।

আলতাফ হোসেন বসিরের দিকে তাকিয়ে বলল—কৈ আমরা তো তেমন কোন খুনের ঘটনা শুনিনি, কাগজেও পড়িনি। তুমি শুনেছ? বসির দু'পাশে মাথা নাড়ে অর্থাৎ শোনেনি।

আলতাফ হোসেন আর যা কিছু জানার ছিল জেনে লোকটিকে বিদায় দিল। খুনিদের নাম ধামও জেনে নিল।

সেদিন রাতেই তদন্তে বেরিয়ে পড়লো দুজনে। মধ্য রাতের অন্ধকারে দুজন এগিয়ে চলল ঢাকার রাজপথ ধরে, গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করে প্রথমেই এলো থানায়। এত রাতে গোয়েন্দা সম্রাটকে দেখে ওসি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার এত রাতে?—গত রবিবার একটা খুন হয়েছে, তবে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা চাই।

—খুন! কোথায় খুন হয়েছে?—রেললাইনের ধারে। ওসি আকাশ থেকে পড়ল—কি বলছেন হোসেন সাহেব, গত এক মাসে কোন খুনের ঘটনা ঘটেনি। কে আপনাকে এসব বলল,—আশ্চর্য, অথচ.....ঠিক আছে, অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। থানা থেকে

বেরিয়ে হোসেন সাহেব বলল—বুঝলে পার্টনার, আর তদন্ত করে লাভ নেই।

—মানে! তুমি কি জানো কে খুন করেছে এবং ঐ লোকটির পিছু নেওয়ার কি উদ্দেশ্য?

আগামী কাল সব জানতে পারবে, তার আগে আমি আমার ঘরে যাব, আজ আর আমার সাথে দেখা হবে না, আগামী কাল সকালে বেড টির সময় দেখা হবে। বসির আলী জানে তার বস্ এখন নিজের ঘরে বসে নিভৃতে একাকী কেস্ এর জট খুলবে।

পরদিন বিকেলে ঐ লোকটি উপস্থিত হলো।—কিছু জানতে পারলেন স্যার?

গোয়েন্দা সম্রাট মৃদু কণ্ঠে বলল—আমি আপনার বাড়ীটা একবার দেখতে চাই।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই এক্ষুণি চলুন।—এক্ষুণি যাওয়া সম্ভব নয় আপনি ঠিকানাটা দিয়ে দিন ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমরা চলে যাব।

ভদ্রলোক ঠিকানা দিয়ে চলে গেলেন, আলতাফ হোসেন একটি ছোট মত যন্ত্র পকেটে নিয়ে সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ীটা খুঁজে নিতে দেরী হলো না। এই শহরের স্বনামধন্য ধনী ব্যক্তি, বোধ হয় ভদ্রলোক ওদের অপেক্ষাতেই বসেছিলেন, উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন, মিনিট দশেক বাড়ীটা ভাল করে দেখে হোসেন সাহেব বললেন—মি ঃ........

—ফিরোজ খান।—ও হ্যাঁ, ঠিক আছে শুনুন, যতদিন না এই কেস্টার নিষ্পত্তি হয়, ততদিন এই ঘরের বাইরে আপনি বেরুবেন না, আমি বাড়ীর আশেপাশে পাহারার ব্যবস্থা করছি। চোখ কপালে তুলে ফিরোজখান বললেন—সেকি স্যার! আমি তো মরে যাব। হোসেন সাহেব হেসে বললেন—সেই ভয় ঘরের থেকে বাইরে অনেক বেশী। আশা করি খুব বেশী দিন আপনাকে এ কষ্ট পেতে হবে না। তিন দিন পরের ঘটনা, আলতাফ হোসেন উপস্থিত হলেন থানায়। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন ওসি—আসুন, আসুন স্যার।

আরাম কেদারায় বসে গোয়েন্দা সম্রাট বললেন—আবদুল সাহেব, আমার হাতে একটা অদ্ভুত কেস এসেছে, তার সমাধানও আমি করেছি। আলতাফ হোসেন—ঘটনাটা পুরোপুরি খুলে বললেন। এতক্ষণ ওসি হাঁ করে শুনছিলেন, তারপর বললেন—অদ্ভুত! তা সমাধান কি হলো?—সমাধান আর কিছুই না।

ধনী ফিরোজ খানের প্রতিবেশী কিছু বখাটে ছেলে টাকা আদায় করার জন্য এই ফন্দী এঁটেছিল, ওদেরই দলের একটি ছেলেকে ফিরোজ খানের সামনে মিথ্যে খুন করে, গুম করে রাখে। ঘটনাটা ফিরোজ খান দেখেছে, তাই তারা তার উপর ক্রুদ্ধ, এমন একটা ভাব করে ওর পিছু নেয়। ঠিক তার পরেই কেসটা আমার কাছে আসে। আমি তাদের ধরেছি, তারা আমার পায়ে ধরে অন্যায় স্বীকার করেছে, তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ফিরোজ খানকে ভয় দেখিয়ে কিছু টাকা আদায় করা। সে যাই হোক, আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি। বলেই পকেট থেকে চারটি ছেলের ছবি ঠিকানা বের করে টেবিলের উপর রেখে বলল—এরাই কালপ্রিট, এবার আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।

বলেই গোয়েন্দা সম্রাট উঠে পড়লেন, দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ওসির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—তবে একটা কথা। ফটো দেখেই বুঝতে পারছেন ছেলে গুলোর বয়স খুবই কম, শাস্তিটি দেবার সময় আশাকরি এই ব্যাপারটা মনে রাখবেন।

pathagar.net

ক্ষুদে গোয়েন্দা

কণা বসু মিশ্র

টাট্টুদের বাড়ির সামনেই একটা দর্জির দোকান। সারাদিন সেখানে সেলাই হয়। একটা বুড়ো মতন দর্জি বসে বসে পা-মেসিন চালায়। তার মাথার চুলগুলো আগাগোড়া তামাটে। চোখের মণিদুটো বাদামী।। সে দাড়ি কামায় না প্রায়ই। গালে খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে থাকে। দোকানের সামনে খানিকটা খালি জমি। একটা দুটো বাড়ি উঠেছে। এখনো কিছুটা জায়গা ফাঁকা থাকায় টাট্টুরা সেখানে ফুটবল ক্রিকেট খেলে।

খেলতে খেলতে অনেক সময় টাট্টু যখন এলোমেলো এদিক ওদিক তাকায়, তখন ও দেখে, বুড়োটা চশমাজোড়া নাকের ডগায় ঝুলিয়ে ত্যারছা চোখে তাকেই দেখছে।

ওটা শুধু দর্জির দোকানই নয়, ওটা স্যাকরার দোকানও বটে। বুড়ো দর্জির ঠিক পছন দিকেই বসে বসে আর একটা লোক আগুন জ্বেলে সোনা গলায়। সে তার ছোট্ট াতুড়ি দিয়ে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে আওয়াজও করে।

টাট্টুদের বল যদি ছিট্‌কে গিয়ে কখনো ওই দোকানটার মধ্যে পড়ে, তাহলে ওই দর্জি

আর স্যাকরাটা দুজনেই ক্ষেপে লাল হয়।

বল তো আর মানুষ নয়? সে কেন কথা শুনবে? টাট্টুরা যতই সাবধানে খেলুক, বলটা তবু ছিট্‌কে চলে যায় বুড়ো দর্জিটার দোকানের ভেতরে।

টাট্টু বল কুড়োতে গেলেই দর্জি আর স্যাকরাটা দারুণ চমকে ওঠে। স্যাকরাটা তাড়াতাড়ি কি যেন লুকোতে ব্যস্ত হয়। টাট্টু এটা অনেক সময় লক্ষ্য করে।

টাট্টুদের বাড়ির সামনের গলির মধ্যে আর একটা অদ্ভুত মানুষকেও প্রায়ই দেখে টাট্টু। রোজই ঠিক ভর দুপুরে লোকটা গলির মধ্যে দিয়ে হেঁকে হেঁকে যায়, "পুরনো খবরের কাগজ আছে? কা-গ-জ? ভাঙা পেতল, কাঁসা, ভাঙা কাঁচের বোতল?"

টাট্টুর সকালে স্কুল। অতএব দুপুরে সে বাড়িতেই থাকে। মা, বাবা, দুজনেই অফিসে চলে যান। বাড়ির অনেক দিনের পুরনো কাজের লোক সুখাইদাদা সে তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

সুখাইদাদা নামেও সুখাই, কাজেও সুখাই। সে যখন ঘুমোয়, তখন তার মত সুখী আর কেউ নেই। এই লম্বা দুপুরগুলো টাট্টুর পক্ষে একা কাটানোই কষ্টকর হয়ে ওঠে। টাট্টু তখন গুল্‌তি দিয়ে পাখীর গায়ে তাক্ করে। অথবা প্রসন্নর মত বল করতে গিয়ে জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলে, আলমারীর কাঁচ ভেঙে ফেলে। কিংবা দেওয়ালে বল মেরে বোমার মত শব্দ তুলে বাড়ি কাঁপিয়ে দেয়। কুম্ভকর্ণ সুখাইদাদার এতে অবশ্য ঘুমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না।

সেদিন দুপুরবেলা টাট্টু হঠাৎ দেখে, সেই পুরনো-কাগজ-কেনা লোকটার ঝোলা গোঁফটা ঝুপ করে পড়ে গেল গলিতে। লোকটা চারিদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি করে ঝোলার মধ্যে থেকে একটা আঠার টিউব বার করল। নাকের তলায় একটু আঠা লাগিয়ে মুহূর্তে গোঁফটা লাগিয়ে লোকটা তাড়াতাড়ি দর্জির জানালার কাছে এগিয়ে গেল।

দর্জিটা জানালার মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল, কেউ তাদের দেখছে কি না। আশেপাশে বাড়ির লোকেরা তখন জানালা, দরজা বন্ধ করে ফ্যান্ চালিয়ে তোফা ঘুম লাগিয়েছে গরমের দুপুরে। তাই কে আর ওঁৎ পেতে বসে থাকবে ওদের ব্যাপার-স্যাপার দেখবার জন্যে? সব্বাই তো টাট্টু নয়।

কাউকে কোথাও দেখতে না পেয়ে দর্জিটা জানালার মধ্যে দিয়ে রাজহাঁসের মত গলা বাড়িয়ে কি যেন বলছে কাগজওলাটাকে। ওরা জানতেও পারছে না উল্টোদিকের বাড়ির জানলাটার কপাট সামান্য ফাঁক করে একটি ছোট্ট ছেলে কেমন করে ওদের দেখছে। ব্যাপারটা টাট্টুর কাছে বেশ জটিল বলে মনে হল।

দিন দু'য়েক পরে, টাট্টু ফের দেখে, সেই পুরনো কাগজওলাকে তাদের গলির মধ্যে ঢুকতে। টাট্টুদের বাড়ি দমদম অঞ্চলে। তখন বোধহয় গোটা দুইয়েক বাজে। কাছেই স্টেশন। একটা লোকাল ট্রেন হুশ্‌হুশ্ করে চলে যায়। আর তার দাপটে টাট্টুদের গলিটাও দপ্ দপ্ করে কেঁপে ওঠে।

টাট্টু তখন ছাদে দাঁড়িয়ে গুল্‌তি দিয়ে পাখী মারার চেষ্টা করছে। ওকে দেখামাত্রই নিজের কাজ বন্ধ রেখে টাট্টু তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ে জানালার পাশে।

লোকটা যথারীতি তার হাঁকডাক সেরে চারিদিকে তাকায়। তারপর চুপিচুপি সেই

দর্জির জানালার কাছে এগিয়ে যায়। টাট্টুর জন্মদিনে তার দাদু একটা বক্স ক্যামেরা দিয়েছিলেন তাকে। বাবার কাছ থেকে ছবি তোলাও শিখেছে টাট্টু। তবে টাট্টুর তোলা ছবিগুলোর কোনটায় মানুষটার মাথা কাটা যায়, কোনটায় মাথা থাকে, কিন্তু ধড়টাই পুরো বাদ হয়ে যায়। নিজের তোলা ছবিগুলো দেখে টাট্টু আজকাল লজ্জাই পায় তবু টাট্টু ছবি তুলে যায় তার মায়ের, বাবার, সুখাইদাদার।

টাট্টুর এই মুহূর্তে মনে পড়ে যায় ক্যামেরাটার কথা। ফিল্ম আছে তো? হ্যাঁ আছে। এই তো ক'দিন আগে মামার বাড়ি গিয়ে দাদু, দিদিমার ছবি তুলেছিল। মামাতো বোন রিন্‌কীর ছবিও তুলেছিল। বাকীগুলো ও রেখে দিয়েছিল কিছু রোমাঞ্চকর ছবি তুলবে বলে। ওর মনে হয়, তার চেয়ে এই ছবিটা কম জরুরী নয়। ক্যামেরা নিয়ে ছাদের ওপরে চলে যায় টাট্টু।

হ্যাঁ, এইবার, ঠিক পজিশনে।

দর্জিটার কানে কানে কথা বলছে পুরনো কাগজওলাটা, স্যাকরাটা কি যেন ভরে দিচ্ছে কাগজওলাটার ঝোলায়। বাহ্ চমৎকার। এসব শট্ খুব কাজে লাগবে, বন্ধুদের কাছে ও যখন বানিয়ে গোয়েন্দা গল্প করবে।

বড় রাস্তার মোড়ে সেদিন এক হইহই কাণ্ড। কি? না একটা চোর ছুটে পালাচ্ছে। তার পেছন পেছন ছুটছে পাড়াসুদ্ধ লোক। চোরটা নাকি একটা বাড়ির গড্‌রেজের তালা অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে ফেলেছে।

খানিক দূরে যেতে না যেতেই চোরটা ধরাও পড়ে যায়।

ভিড়ের মধ্যে টাট্টুও ঢুকে পড়ে চোর দেখতে। চোরের মুখটা খুব চেনাচেনা লাগছে? টাট্টু মুচকি একটু হাসে। টাট্টু ছুটে গিয়ে ক্যামেরাটা নিয়ে আসে। ও ক্লিক করে তুলে নেয় চোরের মুখটা।

টাট্টুর কাণ্ড দেখে সবাই হাসে। বেদম পিটিয়ে শ্রীমান চোরকে তো শ্রীঘরে চালান করে দেওয়া হয়। কিন্তু গলির চুরি বন্ধ হয় না। এ বাড়ি সে বাড়ি থেকে নানা চুরির খবর আসে। টাট্টু দর্জি, স্যাকরা আর কাগজওলার ছবিগুলো অ্যালবামে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ওর মনের সন্দেহের কথা ও কাউকে বলে না। তবে টাট্টু আজকাল প্রায়ই একশো নম্বরে ডায়াল করে। "হ্যালো! লালবাজার?"

টাট্টুর মা বলেন, "কিরে তুই কার সঙ্গে এত কথা বলিস?"

ও গম্ভীর চালে বলে, "পুলিশের সঙ্গে।"

"পুলিশ! সে আবার কি?"

"সে আবার কি মানে? তুমি কি পুলিশের নাম শোননি মা?"

"তা শুনবো না কেন? কিন্তু তুই পুলিশের...?"

টাট্টু হেসে থামিয়ে দেয় মাকে। "হ্যাঁ, পুলিশদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। ওরা আমার বন্ধু।"

টাট্টুর মা সেদিন দেখেন, টাট্টু টেলিফোনে পুলিশকে একটার পর একটা ছড়া শুনিয়ে যাচ্ছে। ছড়া শেষ হ'ল তো গান শুরু হ'ল। শেষ পর্যন্ত "জনগণমন অধিনায়ক জয়

হে”...।

টাট্টুর রকমসকম দেখে মা তো হেসেই খুন।

ক'দিন পর ক্ষুদে গোয়েন্দা টাট্টুদের বাড়িতেই চুরি হয়ে যায়। ওর বাবা তো থানা, দারোগা নিয়ে ব্যস্ত, আর মা তার গয়নার শোকে পাগল।

পাড়ার লোক এসে জড় হয় টাট্টুদের বাড়ি। খবরটা চাট্‌নীর মত পরিবেশন করেন একে অন্যকে।

অনেকেই বলেন, “চুরিগুলো এমন অদ্ভুতভাবে হচ্ছে যে পরিষ্কার বোঝা যায়, কোন জানা-শোনা চোরেরই কাজ।”

টাট্টু কোন কথায় থাকে না। ও সোজা একশো নম্বরে ডায়াল করে। “হ্যালো! লালবাজার? লালবাজার?”

সবাই আশ্চর্য হয়ে শোনে, টাট্টুর কথা। “পুলিশ কাকু, এবার আমাদের বাড়িতেই চুরি, এক্ষুণি চলে এসো।”

ওদিকে টাট্টুর বাবা থানার ও. সি. আর দুজন কনেস্টবলকে নিয়ে এসেছেন। ওঁরা সবাই বাড়ির কাজের লোকেদের নানা জেরা করছেন। ঠিক তেমনি মুহূর্তে লালবাজারের ভ্যান এসে হাজির।

একগাল হেসে টাট্টু এগিয়ে যায় তার পুলিশকাকুর সামনে। ও অ্যালবামটা তুলে দেয় ওর কাকুর হাতে। পুলিশকাকুকে চিনতে অবশ্য টাট্টুর কষ্ট হয় না। উনি তো দিনদুইয়েক আগেও এসে ওর সঙ্গে দেখা করে গেছেন গলির মোড়ে।

টাট্টু তখন ক্রিকেট খেলছিল। পুলিশকাকু ছদ্মবেশে এসে টাট্টুকে ডেকেছিলেন। তারপর একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, “আমি তোমার পুলিশকাকু টাট্টু। তোমায় চিনে নিতে এলাম।”

“তুমি যে পুলিশকাকু তার প্রমাণ?” টাট্টু মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল। পুলিশকাকু একটু হেসে পকেট থেকে বার করেছিলেন তাঁর আইডেনটিটি কার্ড। পুলিশের পোশাকে পুলিশকাকুর সঙ্গে এই মানুষটির চেহারার হুবহু মিল।

পরে বন্ধুরা যখন জিজ্ঞেস করেছিল, “ওই ভদ্রলোক কে রে টাট্টু?” টাট্টু গম্ভীরভাবে বলেছিল, “উনি লালবাজারের পুলিশ।” বন্ধুরা বলেছিল, “বেশ বানিয়ে গল্প বলিস তো তুই।” টাট্টুর কথা ওরা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল।

আজ কিন্তু পুলিশ ভ্যান থেকে পুলিশের ওই ভদ্রলোককে নামতে দেখে, তার বন্ধুরা সত্যিই হকচকিয়ে যায়। এমন কি টাট্টুর মা, বাপ, থানার ও. সি., কনস্টেবল পর্যন্ত। টাট্টু ভারিক্কী চালে হ্যাণ্ডসেক করে তার পুলিশকাকুর সঙ্গে। ওর ছবির অ্যালবামটা খুলে ও দেখায় পর পর সাজিয়ে রাখা ছবিগুলো।

এক নম্বর, পুরনো কাগজওলার গোঁফ খুলে যাওয়া।

দু নম্বর, আঠা দিয়ে গোঁফ লাগিয়ে নেওয়া।

তিন নম্বর, সেদিন গলির মধ্যে ধরা-পড়া চোরটার মুখ।

পরের পাতার আঁটা সেই ছবিগুলো, যে ছবিগুলোতে ছদ্মবেশী কাগজওলার সঙ্গে দর্জি কানে কানে কথা বলছে।

দ্বিতীয় ছবিতে স্যাকরা তার ঝোলাতে চুপিচুপি কি যেন ফেলে দিচ্ছে। দর্জির চোখের ইশারা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে ছবিতে। তবে তার মাথার অর্ধেক কাটা গেছে। যদিও তাতে কোন অসুবিধে নেই। কেননা তার ঘরের ছবিগুলোয় দর্জির মাথা পরিষ্কার উঠেছে। স্যাকরাকে চিনতেও অসুবিধে নেই।

পুলিশকাকু কোন কথা না বলে, সোজা গিয়ে স্যাকরা আর দর্জিকে অ্যারেস্ট করেন। তাদের দোকান সার্চ করে পাওয়া যায় চোরাই গয়না আর কিছু টাকা-পয়সা।

পরদিন খবরের কাগজে টাটুর ছবি ওঠে। ক্ষুদে গোয়েন্দা টাটুর কীর্তি পড়ে লোকে তো তাজ্জব বনে যায়। সরকার থেকে টাটুকে পুরস্কারও দেওয়া হয়। টাটুর পুলিশকাকু ওকে আলাদা করে উপহার দেন একটা দারুণ ক্যামেরা।

pathagar.net

রহস্যময় সেই রিভলবার

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

মৌলালি একটুখানি ছাড়ালেই সার্কুলার রোডের ওপর বিশাল সেন্ট জেমস্ জোড়াগির্জা নিশ্চয় অনেকের দেখা। অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত পুরনো আমলের গির্জা—একপাশে পাঁচিল দেওয়া বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র, আরেক দিকে সবুজ ঘাসের গালচে দেওয়া মাঠ। চমৎকার। প্রধানত রোববার সকাল-বিকালে ভিড়ের চাপ বেশী, অন্যান্য দিনে লোকজনের আসা যাওয়া কম। যদিও আমি খ্রীষ্টান নই, তবুও সপ্তাহে অন্তত একবার ঘন্টা দেড়-দুইয়ের মতো বিকেলে, গির্জার নিরিবিলি এলাকায় ঘুরে আসি। বেশ লাগে। সাধারণত ঘোরাফেরা করি সমাধিক্ষেত্র ও তার লাগোয়া সবুজ মাঠে, যেখানে শুভ্র ফুলের মৃদু সুগন্ধ মনকে উন্মনা করে তোলে।

আমার একটি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ বিক্রির দোকান আছে তালতলায়। দোকান ছোট হলেও বেশ চালু। ওষুধপত্রের স্টক ভালই। নিজে অধিকাংশ সময়ে দোকানে বসি, দুজন কর্মচারীও আছেন, বাবা-মাকে নিয়ে থাকি সিংহীবাগান সি-আই-টি বিল্ডিংয়ের ফ্ল্যাটে, দোকান বন্ধ করে হিসেব পত্তর মিলিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত্তির হয়ে যায় অনেক, তাই

রোজ বাড়ি ফেরা সম্ভব হয় না। সপ্তাহে তিন দিন আমি দোকানেই থাকি, রাত্তিরে ওখানেই ঘুমোই। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে আসে বাড়ির ছোকরা চাকর। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার বাড়ি ফিরি অপেক্ষাকৃত সকাল সকাল, মানে, রাত দশটা নাগাদ। আর, রোববার তো দোকান বন্ধ।

সেন্ট জেমস গির্জাতে মিস্টার স্টানলি হপ্‌কিন্‌সের সঙ্গে আমার পরিচয়, উনি প্রায়ই উপাসনা করতে আসতেন। কখনও একা, কখনও স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে। যেদিন একা আসতেন, সেদিন উপাসনা সেরে অমনি চলে যেতেন না, আমার মতো খানিকক্ষণ হাঁটাচলা করতেন নিরিবিলিতে। প্রথম-প্রথম কয়েকদিন চোখাচোখি হওয়ার পর ভাবছিলাম যেচে আলাপ করব কিনা।—এমনি এক সন্ধেতে তিনি নিজেই আমাকে গুড ইভনিং জানিয়ে কথা শুরু করলেন।

ওঁর নামটি খুব জাঁকালো হলেও লোকটি সাদাসিধে ও নিরীহ। শান্ত সৌম্য চেহারা—সুদর্শনই বলা যায়। বয়সে ৪০-৪১, দোহারা গড়ন, স্বাস্থ্য ভাল। খুব ফর্সা নন—তামাটে রং, তবে কিনা একটু লালচে ঘেঁষা। চোখের তারা হালকা নীল। মাথার চুল ঈষৎ বাদামী। জামাকাপড় একেবারে সাধারণ, তবে রীতিমতো ফিটফাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উনি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।

চোস্ত ইংরেজিতেই আলাপ শুরু করেছিলেন, তারপর প্রাণখোলা হেসে সাবলীল বাংলা ভাষায় আমাকে বললেন, "আসুন, বাংলাতে কথা বলা যাক। আমার মাতৃভাষা যদিও ইংরেজি, কিন্তু আমার জন্ম লেখাপড়া সবকিছু কলকাতায়, বাংলা ভালই জানি। তাছাড়া আমার স্ত্রীও বাঙালী খ্রীষ্টান।"

মিস্টার স্ট্যানলি হপ্‌কিন্স অতিশয় ভদ্র ব্যক্তি, কথাবার্তা যথেষ্ট মার্জিত। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ধীরে ধীরে জমে উঠল। আমি তিন দিন তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম, তিনিও কয়েকবার এসেছিলেন আমার ওষুধের দোকানে। এন্টালির পিছনে নিউ সি-আই-টি রোডে একটি দু কামরার ফ্লাটে তাঁর বাস। স্ত্রী এবং দুটি ছোট ছেলে মেয়ে। স্ত্রী বড় ভাল মানুষ—শান্ত স্বভাব। নিতান্ত আপনজনের মতো ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে। হপ্‌কিন্‌স একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত পবিবার বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই, বাইরের ঘরে একটি সুন্দর পিয়ানো আছে এছাড়া ঘরে দামী আসবাবপত্র তেমন কিছু না থাকলেও বেশ ছিমছাম সাজানো। সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো মা মেরির কোলে শিশু যিশুর চমৎকার এক অয়েল পেইনটিং।

পপ্‌কিনসের সঙ্গে একদিন চা খেতে-খেতে ওঁর পারিবারিক ইতিহাস শুনলাম। ওঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন খাস ইংরেজ। তিনি তদানীন্তন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরে হিসাবে কলকাতায় আসেন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন খাঁটি ইংরেজ। ওঁদের নাতি বড় হয়ে বিয়ে করেন এদেশী মেয়ে এবং তাঁর বংশধরেরা ক্রমেই এদেশের সমাজে আরও মিশে যান।

স্ট্যানলি হপ্‌কিন্‌সের গায়ের রং ও মাথার চুলের কথা আগেই বলেছি। ওঁদের মিষ্টি ছেলেমেয়ে দুটি উজ্জ্বল কিন্তু বাবার চেহারার ঐ বৈশিষ্ট্য পায়নি। তাদের রং বাঙালী মায়ের মতো শ্যাম, মাথার চুলও কালো। অবশ্য বাবার চোহারার একটা বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে—ভাইবোন দুজনেরই চোখের তারা হালকা নীল।

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পূর্বপুরুষের কোনো স্মৃতিচিহ্ন আছে? উনি মৃদু হেসে আলমারি খুলে একটি চৌকো লোহার বাক্স বার করে আনলেন, এবং সেটি খুলে যা দেখালেন তাতে আমি একেবারে অবাক! বৃহৎ আকারের এক রিভলবার। আজকাল যে আকৃতির রিভলবার দেখি, তার প্রায় ডবল। নল লম্বা, বাঁটও বড়, ইস্পাতের তৈরী, চকচকে কালো রঙ। বাঁট এবং নলের ওপর এনগ্রেভ করে খুব সুন্দর চিত্রবিচিত্র কারুকাজ। ট্রিগারের কাছে এবং বাঁটে লাল সবুজ কয়েকটি পাথর সেট করা। হপ্‌কিন্‌স বললেন, ওগুলো নাকি চুনী ও পান্না, সব মিলিয়ে এমন সুন্দর গঠন যে, আমি হাঁ করে দেখতে লাগলাম। রীতিমত ভারী, আমার মনে হল কিলো দুইয়েক হতে পারে। বাঁটে খোদাই করা তারিখ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ, মানে অনেক বছর আগেকার।

হপ্‌কিন্‌স বললেন, "চমৎকার জিনিসটা, না? বড্ড ভারী অবশ্য—তা সে সময়ে আগ্নেয়াস্ত্রের ওজন আজকালের চেয়ে বেশী-ই হত। তখনকার দিনের লোকের গায়ে শক্তি বেশী ছিল, তাঁরা ভারী অস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্তও ছিলেন। তাছাড়া এ রিভলবার শখ করে তৈরী করানো, তাই সেকালের অনুপাতেও বড়।"

"অত আগের জিনিস, এখনো এমন চকচক করছে কেন?"

"বাবা, ঠাকুর্দা, তাঁরও বাবা নিয়মিত কলকব্জা মুছে সাফ রাখতেন, আমিও সেইভাবেই রাখি।"

"কত দাম হবে এখন?"

"আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবে তেমন নয়, তবে পুরনো দুষ্প্রাপ্য জিনিস হিসেবে এর অনেক দাম। ওর গায়ে যে সুন্দর চিত্রবিচিত্র নকশা ও কিছু দামী পাথর রয়েছে এসব দেখে অতীতে এবং বর্তমানে কেউ কেউ নিতে চেয়েছিলেন, আমরা রাজী হইনি। এক কিউরিও সংগ্রহকারী এই তো কিছুদিন আগে ছয় হাজার টাকা অবধি দাম দিতে চেয়েছিলেন।"

"গুলি চালানো যায় কিনা জিজ্ঞেস করছেন? খুব ভাল চালানো যায়। কলকব্জা সব ঠিক আছে। তবে, বেশী ভারী বলে এক হাতে তুলে লক্ষ্য স্থির রেখে ফায়ার করা মুশকিল। দুহাতে তুলে ট্রিগার টিপতে হয়। রিভলবার ভারী হওয়ায় বুলেটের ভেলোসিটি বেশী, আওয়াজও জোরে। প্রচলিত সাধারণ মানের কার্তুজেই কাজ চলে।"

"আপনি বলতে চাইছেন, সাধারণ রিভলবারের চেয়ে এর শক্তি খানিকটা বেশী?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"আপনার লাইসেন্স আছে? চালিয়েছেন এ রিভলবার?"

"হ্যাঁ, পারিবারিক লাইসেন্স বরাবর আছে, আর, আমার অল্প বয়সে ছোটখাট শিকারে গিয়ে দুহাতে ধরে এটি চালিয়েছি বৈকি! বাবাও শিকারে গিয়ে কখনও-কখনও ব্যবহার করেছেন। তারপর, মা-বাবার মৃত্যুর পর ১২ বছর কেটে গেছে, এই দীর্ঘকাল আগ্নেয়াস্ত্রটি ব্যবহারের প্রয়োজন দেখিনি—তবে, যথারীতি, মধ্যে-মধ্যে খুলে নাড়াচাড়া করি, সাফসুতরো রাখি।"

রিভলবারটির গায়ে আলতো হাত বুলোচ্ছি, হঠাৎ হপ্‌কিন্‌স একটু অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললেন, "নির্দোষ, নিরীহ মানুষের অকারণ রক্তপাত কখনও করেনি এ রিভলবার। আপনি হয়ত ভাবছেন আমার পূর্বপুরুষেরা নিরীহ ভারতবাসীকে—।"

আমি বললাম, "না, না, আমি তা ভাবব কেন? সাহেব হলেই তিনি অত্যাচারী হবেন, এ ধরনের নির্বোধ মতবাদে আমি বিশ্বাস করি না।"

কথা শুনে হপ্‌কিন্‌সের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "ব্যাপার হল এই, আমার যে পূর্বপুরুষ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এটি তৈরী করান, তিনি খুব সদাচারী সাধু প্রকৃতির ছিলেন। তিনি নাকি বলতেন, এ রিভলবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে, পাপকে বিনষ্ট করবে, সাহস আনবে অসহায়ের বুকে। কখনও যেন অস্ত্রটি অন্যায় কাজে ব্যবহৃত হয়ে কলুষিত না হয়। সেই আদর্শই আমাদের বংশে চালু হয়ে গেছে। কোনো অন্যায় কাজে রিভলবারটি কেউ ব্যবহার করেননি। আমার বাবা, দাদু অস্ত্রটির বিশেষ শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন, যদিও তাঁরা নিজেদের জীবনে তেমন বিশেষ কিছু ঘটতে দেখেননি। মানে সংস্কার আর কী। যাই হোক, রিভলবারটির বিশেষ গুণাগুণে আমি বিশ্বাস না করলেও এ পূর্বপুরুষেরা যেহেতু এটি পবিত্র বলে বিশ্বাস করতেন, তাই জিনিসটি আমারও প্রিয়।"

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। রোববারের এক সকালে হপ্‌কিন্‌সের ফ্লাটে গিয়ে দেখি ওঁর মুখ খুব বিষন্ন। ওঁর স্ত্রীরও মুখ শুকনো, গলা ভার, ওঁকে আমি দিদি বলে ডাকি, আমাকে দেখে দিদির মুখ হাসিতে ভরে গেল।

হপ্‌কিনসের পাশে বসে বললাম, "কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে যেন? কী ব্যাপার?" হপ্‌কিন্‌স একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "কিছুদিন যাবৎ মানসিক অশান্তির মধ্যে আছি, বছর দুইয়েক হল সি-আই-টি রোডের ফ্ল্যাটে-বাড়িতে এসেছি, তার আগে থাকতাম ইলিয়ট রোডের একটা প্রকাণ্ড ভাড়া বাড়িতে। ভারাটে অনেক। তবে বেশ ঘরোয়া পরিবেশ, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া, সম্প্রীতি ছিল। ইলিয়ট রোডের বাড়ি খুব পুরনো হয়ে যাওয়ায় বাড়িওলা ভেঙে ফেলে, তাই এখানে এসেছি। মুশকিল হল, এখানকার প্রতিবেশীরা আমাদের পছন্দ করে না।"

হপ্‌কিন্‌সের কথা শুনে আমার খুব খারাপ লাগল।

কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যায় আমার ওষুধের দোকানে এলেন হপ্‌কিন্‌স, তখন খদ্দেরদের ভিড় তেমন ছিল না। ওঁকে কাউন্টারের মধ্যে বসিয়ে কফি আনালাম। বললাম, "কী খবর বলুন।"

ওঁর আগের বিমর্ষভাব দেখলাম অনেকটা কেটেছে। বিনা ভূমিকায় হাসিমুখে বললেন, "ঠিক করে ফেলেছি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সেটল্ করব।"

"সে কি মশাই!"

"আপনি তো জানেন গত কয়েক বছর ধরে ভারতের বহু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অস্ট্রেলিয়ায় চলে গিয়ে পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা করছেন। এতকাল আমি তা করিনি, কিন্তু এবার চেষ্টা-চরিত্র করে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম ওখানে যেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না।"

"কলকাতার পাট চুকিয়ে চলে যাবেন চিরকালের মতো?"

"তাছাড়া গত্যন্তর কী? কলকাতাকে অবশ্য খুব ভালবাসি, কিন্তু পাড়ার লোক যখন আমাদের চায় না, তখন তো চলে যাওয়াই ভাল। স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের অবশ্য যেতে মোটেই ইচ্ছে নেই, ওদের মন খুব খারাপ। কিন্তু ওদের আমি বুঝিয়ে রাজী করাব। মাস

দেড়েকের মধ্যে রওনা হতে পারব আশা করি।"

দিন দশেক বাদে বিকেলে আবার আমার দোকানে এলেন হপ্‌কিন্স, হাতে একটা কাগজে মোড়া বাক্স। দিনটা স্পষ্ট মনে পড়ে। সোমবার। উনি এসেই বললেন, "একটা প্রাইভেট কথা আছে আপনার সঙ্গে—খুব দরকারি।"

কাউন্টারের মধ্যে একটু ঘেরা জায়গা আছে, ওঁকে সেখানে নিয়ে বসাতে উনি হাসিমুখে বললেন, "অস্ট্রেলিয়া চলে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা, আজ ২০শে সেপ্টেম্বর—সামনের মাসে এই তারিখেই যাত্রা করব, এদিকের কেনাকাটি বিলিব্যবস্থা করছি কিছু-কিছু।"

কথাটা শুনে আমার মুখ কালো হয়ে গেল। হপকিন্‌স এবার একটু ইতস্তত করে বললেন, "মুশকিল হয়েছে টাকার ব্যাপারে। আমার নগদ ১৮০০ টাকা চাই—ইমিডিয়েলি। কিন্তু আপাতত হাতে বাড়তি কিছু নেই—অফিস থেকে পেতে দিন বারো তো লাগবেই, আপনি কি দিন বারোর জন্য এই ১৮০০ টাকা আমাকে ধার দেবেন? অবশ্য শুধু হাতে চাইছি না, এটা বন্ধক রেখেই চাইছি।"

বাক্সটা খুলে তিনি কারুকার্য-করা রিভলবারটা বার করলেন। আমি তো স্তম্ভিত। বললাম, "সে কী মিস্টার হপ্‌কিন্‌স, এতদিনের পরিচয়ের পর একথা বলতে পারলেন? ১৮০০ টাকা অবশ্যই আপনাকে ধার দিতে পারব, কিন্তু আপনার পারিবারিক সম্পদটি বন্ধক দেওয়ার কথাই ওঠে না!"

মিস্টার হপ্‌কিন্‌স মৃদু হেসে আমার কাঁধে হাত রেখে গাঢ় কণ্ঠে বললেন, "আমি জানি আপনি আমাদের ভালবাসেন, বিশ্বাস করেন। তাইতো আমাদের এত প্রিয় জিনিসটি বন্ধক দিতে ছুটে এসেছি আপনার কাছে, অন্য কারুর কাছে বন্ধক দিতে পারব না, কারণ তিনি যদি রিভলবারটি ফিরিয়ে না দিয়েই বেমালুম অস্বীকার করেন। কিন্তু মিস্টার সেনগুপ্ত, শুধু হাতে আমি কখনো ধার নিই না, এটা আমার বরাবরের নিয়ম। কাজেই আপনার কাছে আমার অনুরোধ, রিভলবারটা রেখেই টাকাটা দিন।"

আর কথা বাড়ানো বৃথা বুঝে আমি বাক্সসুদ্ধ রিভলবারটা আলমারির মধ্যে চাবি বন্ধ করে রাখলাম। হঠাৎ কোনো জরুরি প্রয়োজনের জন্য ২০০০ টাকা সব সময়েই দোকানের আলমারিতে আলাদা করে তুলে রাখা থাকে। আমি তার থেকেই ১৮০০ টাকা দিয়ে দিলাম। উনিও ধন্যবাদ জানিয়ে তখুনি ব্যস্তভাবে চলে গেলেন।

সন্ধ্যের একটু পরে হঠাৎ আমার কেমন ইচ্ছে হল, আজই এমন সুন্দর জিনিসটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে বাবা-মাকে দেখাই। আগেই বলেছি, সেদিনটা সোমবার—কাজেই সে রাত্রে বাড়ি ফেরার কোন প্রোগ্রাম নেই। পরের দিন মঙ্গলবার রাত্রে বাড়ি ফেরার কথা। এবং বরাবর আমি নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলি। কিন্তু মন এমন উচাটন হয়ে উঠল, আজ রাত্তিরেই বাড়ি যাওয়া চাই।

যুক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাড়াহুড়োর কোনো কথা ওঠে না। হপ্‌কিন্‌স বারো দিনের জন্য রিভলবারটা আমার কাছে রেখে গেছেন—এর মধ্যে আগামীকাল কিংবা পরে যে-কোনো দিন বাবা-মাকে দেখানোর জন্য বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু ঐ যে বললাম। অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলে কী হবে, আজ রাতেই বাড়ি ফেরার ইচ্ছে মনের মধ্যে ক্রমে তীব্র হয়ে উঠল।

শেষে 'দুত্তোর' বলে ঠিক করলাম, যত রাতই হোক আজই বাড়ি যাব।

দোকানের হিসেবপত্র মেলনোর পর একটা ট্যাক্সি নিয়ে সিংহীবাগানের প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট-বাড়ির মেন গেটে যখন এসে দাঁড়ালাম তখন রাত সওয়া বারোটা। অন্ধকার এবং নির্জনতা থমথম করছে চারদিকে। প্রায় সব ফ্লাটের আলো নিভে গেছে—শুয়ে পড়েছে সবাই। সিঁড়ির মুখে কিংবা করিডরে কেউ কোথাও নেই। নির্জন সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে আমার ফ্লাটের দরজায় নক করতে গিয়ে থমকে গেছি! এ কী! দরজা তো ভেতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে ঠিকমতো বন্ধ নয়! ভেজিয়ে রাখা হয়েছে পাল্লা দুটো এবং দরজার চিঠি ফেলার ফুটো দিয়ে আলোর আভাস। এত রাত্রে বাবা-মা জেগে! দরজা বন্ধ নেই! তবে কী ওঁদের কারও শরীর খারাপ—ডাক্তার এসেছেন?

আস্তে দরজা খুলে এক পা ভিতরে ঢুকেই আমি স্তম্ভিত। মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরে উঠল—হিমশীতল একটা স্রোত যেন নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে! ঘরে আলো জ্বলছে কিন্তু জানালাগুলো বন্ধ থাকায় আলোর রশ্মি বাইরে যায়নি। বাবা-মা-র মুখ বাঁধা। বিছানায় বসে আছেন। টেরিকটের শার্ট ও প্যান্ট পরা তিনজন অপরিচিত লোক ঘরে। একজন চাবি দিয়ে আলমারি খুলে জিনিসপত্র ও টাকা এক জায়গায় জড়ো করছে, অপর দুজনের হাত চকচকে দুটো ভোজালি—মা-বাবার সামনে সতর্ক প্রহরায় দাঁড়ানোর ফলে আমাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু আমার মা আমাকে হঠাৎ সামনে মুখোমুখি দেখতে পেয়েই প্রাণপথে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। অমনি সামনে দাঁড়ানো লোকটা অস্পষ্ট গালাগাল দিয়ে বিদ্যুৎবেগে হাতের ধারালো ভোজালি তুলল ওপরে। টিউবলাইটের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল চকচকে নৃশংস ফলাটা, দ্রুতবেগে নীচে নামছে—এখুনি মা-র গলায় গেঁথে যাবে।

আমার মুখ দিয়ে বোধহয় একটু স্বর বার হয়েছিল, তাই মা-র গলায় বসবার পূর্বমুহূর্তে লোকটা ভোজালি থামিয়ে পিছন ফিরে তাকাল। মুখের সে কী বীভৎস চেহারা! রক্তলোলুপ পশুর মতো হিংস্র, বিকৃত, চোখের দৃষ্টি ভয়ানক উত্তেজিত। ভোজালি উঁচিয়ে একলাফে এগিয়ে এল আমার দিকে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি দুহাত দিয়ে ভারী রিভলবারটা তুলে তাক করলাম এবং তখুনি দিলাম ট্রিগার টিপে। একটা কানফাটা বিস্ফোরণের আওয়াজ! আর্তনাদের পর আর্তনাদ। মেঝেতে গুরুভার দেহের পড়ে যাওয়ার শব্দ, বারুদের ধোঁয়া, ফিনকি দিয়ে রক্ত!

মিনিটখানেক নিশ্চয়ই আমার জ্ঞান ছিল না, কারা যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে পালাবার চেষ্টা করল, তারপরই সিঁড়ি ও করিডরে চীৎকার। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার ফ্ল্যাটের দরজার সামনে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ভিড় করে ফেললেন। এবং আরও আসছে পিলপিল করে, হতবুদ্ধি মুখে তাঁদের একটাই প্রশ্ন, কী ব্যাপার, হয়েছেটা কী?

মা-বাবার বাঁধন খুলে দেওয়া মাত্র তাঁরা কাঁদতে-কাঁদতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে রক্ত! মেঝেতে ছটফট করছে সেই নিশংস ঘাতক। আঙুল সমেত তার ডান হাতের চেটো সম্পূর্ণ উড়ে গেছে!

ইনসপেক্টর অল্পভাষী এবং সজ্জন। রিভলবার কোথা থেকে পেলাম, আমার লাইসেন্স আছে কিনা—এসব গোলমেলে প্রশ্ন আদৌ তুললেন না। অপরাধীদের চালান

করার সময় শুধু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "মশায়, দারুণ টিপ বটে আপনার! ভোজালিধরা হাতের একেবারে ঠিক চেটোটাই উড়িয়ে দিলেন?"

ফ্ল্যাট-বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দাদের অজস্র অভিনন্দনের কথা আর তুললাম না।

শরীর ঠিক নেই। অকল্পনীয় সব ঘটনার পরম্পরায় নার্ভের ওপর যথেষ্ট চাপ পড়েছে। একা-একা ঘরে বসে ভাবি, ভেবে আর কূলকিনারা পাই না, ছায়াছবির মতো ঘটনাগুলি মনের আয়নায় ফুটে ওঠে। দিনচারেক পর অনেকটা সুস্থ হয়েছি, রিভলবারটা বাক্সে ভরে নিয়ে হপ্‌কিন্‌সের ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম। ভেবেছিলাম, জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদায় ওঁরা নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত, কিন্তু ফ্ল্যাটে ঢুকে খানিকটা অবাক না হয়ে পারলাম না। বাঁধা-ছাঁদার তো কোনো লক্ষণই নেই। বারান্দার ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে খুশি-খুশি মুখে হপ্‌কিন্‌স একটা ইংরেজি পেপারব্যাক পড়ছেন। ভিতরের ঘরে বিছানায় ওঁর আট বছরের মেয়েটি শুয়ে। তাকে ঘিরে বসে আছে আরো ক'টি ছেলেমেয়ে। দিদি চা বানাতে ব্যস্ত। হাসি মুখে গল্প করছেন দুজন মহিলার সঙ্গে, অনুমান করি এঁরা প্রতিবেশিনী। কিন্তু ব্যাপার কী?

হপ্‌কিন্‌স আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "আপনার দেওয়া টাকাটা খরচা হয়নি, তেমনি ধরা আছে। কিন্তু আপনাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? ইনফ্লুয়েঞ্জা?"

প্রতিবেশীরা চলে যাওয়ার পর মিস্টার হপ্‌কিন্‌স ও তাঁর স্ত্রীকে সব খুলে বললাম। তাঁরা শুনে এমনই আশ্চর্য যে, কিছুক্ষণ বাকস্ফূর্তি হয়নি! দিদিই প্রথমে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "ওঁর পূর্বপুরুষের কথাই তাহলে অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। সত্যিই তাহলে রিভলবারটা অন্যায়কে ধ্বংস করে—অসহায়কে শক্তি দেয়।"

হপ্‌কিন্‌স বিড়বিড় করে বলছিলেন, "অদ্ভুত! অদ্ভুত!"

তবে, হপ্‌কিন্‌স বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন যুক্তিবাদী মানুষ, কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে একমনে চিন্তার পর বললেন, "আপনার কাহিনী শুনে মার যুক্তি-প্রমাণ প্রথমটায় টলে গিয়েছিল—কিন্তু এখন আপনাকে জানাই, ঘটনাটি আশ্চর্যজনক বটে কিন্তু অলৌকিক কিছু নয়।"

আমি বললাম, "তা কী করে হবে? পুরো ব্যাপারটাই অলৌকিক কিংবা বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। যেমন, আমি তো জীবনে রিভলবার ছুঁয়েই দেখিনি—চালাতে জানা তো দূরের কথা। তাহলে অব্যর্থ লক্ষ্যে খুনেটার হাতের চেটো উড়িয়ে দিলাম কেমন করে?"

হপ্‌কিন্‌স বললেন, "কচিৎ কখনও এমন ঘটনা ঘটে। বিখ্যাত শিকারীদের বইয়ে পড়েছি যে, ওস্তাদ শিকারী হয়ত অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারছেন না, সেখানে সম্পূর্ণ আনাড়ি ব্যক্তি এক গুলিতে লক্ষ্যভেদ করছে। একে শিকারের পরিভাষায় বলে 'বিগিনার'স্ লাক'।"

আমি বললাম, "আচ্ছা। তা না হয় হল। কিন্তু রিভলবারের ওই বুলেটটা এল কোথা থেকে?"

হপ্‌কিন্‌স বললেন, "এই সমস্যাটাই প্রথমে আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ ভেবে সমাধান করেছি। এই দেখুন...।"

উঠে গিয়ে হপ্‌কিন্‌স আলমারি থেকে একটা ছোট বাক্স বার করলেন। তারপর বললেন, "এটার মধ্যে দশটা কার্তুজ থাকে। কিন্তু এই দেখুন, এক...দুই...তিন মোট

নয়টা। আরেকটা তবে গেল কোথায়? ঐটেই ফায়ার হয়েছে। ব্যাপার হল এই, কিছুদিন আগে রিভলবারটা সাফ করে ক'টা বুলেট ভরেছিলাম—শখ করে আর কী! তারপর আবার তুলে রেখেছিলাম। কিন্তু গুন্‌তিতে ভুল হওয়ায় একটা কার্তুজ রিভলারের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল। খুবই বিপজ্জনক, সন্দেহ নেই, ট্রিগারে চাপ পড়লেই যে কোন বিপদ ঘটতে পারত। সৌভাগ্যক্রমে ঐ পরিত্যাক্ত বুলেটটি অত্যন্ত ভাল কাজেই ব্যবহৃত হল।"

"যাক রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। তবু একটা প্রশ্ন বাকি থাকল যে, সোমবার রাত্রে তো বাড়ি ফেরার কথা ছিল না আমার। কিন্তু অত রাত্রে ফেরার জন্য এত ব্যাকুল হলাম কেন?"

হপ্‌কিন্‌স আমার এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন। দিদি চা বানিয়ে আনলেন, চা খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করলাম, "অস্ট্রেলিয়া কবে যাচ্ছেন?" দিদি খিলখিল করে হেসে উঠলেন। হপ্‌কিন্‌স সলজ্জভাবে বলেন, "দেখুন...আমরা যাচ্ছি না মানে যাওয়ার প্রোগ্রাম-ই ক্যানসেল করেছি। এতকাল আমি শুধু ওপর থেকেই মানুষকে বিচার করেছি, তার হৃদয় দেখিনি। প্রতিবেশীরা সত্যিই আমাদের আপন ভাবেন, ভালবাসেন। ব্যাপার কী জানেন, যেদিন বিকেলে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এলাম, বাড়ি ফিরে দেখি সাংঘাতিক পরিস্থিতি। বাড়ির সামনে এক স্কুটার আমার মেয়েকে ধাক্কা দেয়। মেয়ে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় তবে কপালটা ও কনুই কাটলেও তেমন মারাত্মক কোনো আঘাত লাগেনি। আমার স্ত্রী ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত মেয়েকে দেখে তো উন্মাদ অবস্থা! আচমকা দারুণ শক পেলে যেমন ব্রেনফিবারের মতো হয়, ঠিক সেই রকম! মানুষ চিনতে পারছেন না, নিজের চুল ছিঁড়ছেন, মাথা কুটছেন।

"আমার প্রতিবেশীরা দারুণ বিপদে বুক দিয়ে পড়লো। পালা করে রাত জেগে সেবা থেকে শুরু করে বড় ডাক্তারের জন্যে এমন করতে পারে না। দুদিন দু রাত্তিরের পর আমার স্ত্রী সুস্থ হন। বলতে গেলে, ওঁদের সেবাযত্নেই ফিরে এসেছেন। আর, মেয়ে তো আগেই সুস্থ গিয়েছিল। তা দেখুন, আমি দুঃখিত, অত্যন্ত দুখঃত যে, ওঁদের আমি আগে চিনতে পারিনি! যখন, অবশেষে চিনে ফেলেছি, আর ভুল করবো না। এই তো আপনার জন ফেলে কোথায় যাব? কেন যাব? অস্ট্রেলিয়া যাওয়া তাই ক্যানসেল করে দিয়েছি।"

গভীর আনন্দে হপ্‌কিন্‌স ও আমি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম।

এবার ক্রিসমাস উৎসবে দিদির জন্য শাড়ি এবং হপ্‌কিন্‌স ও ছেলেমেয়েদের জন্য নানারকম উপহার ও কেক নিয়ে আমি উপস্থিত। ওঁরা মা-মেরির কোলে যীশুর ছবির সামনে পিয়ানো বাজিয়ে 'ক্রিসমাস ক্যারোল' গাইছিলেন। আমাকে দেখে সকলেই কী খুশি! দিদি আমার জন্য একটি চমৎকার ধুতি আর পাঞ্জাবি বানাবার আদ্দির কাপড় কিনে রেখেছিলেন মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে ও-দুটি আমাকে দিলেন।

আমার আনা উপহারগুলো দেখে হপ্‌কিন্‌স একটু আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে আমি বললাম, "আপনার বলার কিছুই নেই। দিদির জন্য ছোট ভাই সামান্য কিছু এনেছে।"

হপ্‌কিন্‌স আর কিছু বললেন না। ওঁর মুখখানি হাসিতে ভরে উঠেছে। হালকা নীল চোখের তারা চাপা আনন্দে চক্‌চক্ করছে।

গোয়েন্দা ভোম্বলদা

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে ছুঁই-ছুঁই। আমরা তখন কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়। লেখালেখি শুরু করার পর থেকে আমরা প্রায়ই কলেজ স্ট্রীটে আসি। এ-ব্যাপারে ভোম্বলদার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। কারণ, তার একটি কবিতার বই বাজারে বেরিয়েছে। আমাদের কারোরই কোন বই এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তবে খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হবে—সেই আশায়ই এত ঘন-ঘন আসা।

আজ এসেছি আমরা পাঁচজনই—ভোম্বলদা, ভুলো, টুলো, ঢোলগোবিন্দ আর আমি।

বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ঢোলগোবিন্দ বলল—ভোম্বলদা, তোমরা কফি হাউসে বোসো। আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি।

—যাচ্ছিসটা কোথায়? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—একজন প্রকাশকের কাছে।

ভোম্বলদা বলল—কফি হাউসের ওই গ্যাঞ্জাম আর বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া একেবারে অসহ্য। তাছাড়া আজকাল আগের মতন খাবারও পাওয়া যায় না। আর সেই পরিবেশও

এখন আর নেই।

—তাহলে কোথায় বসবে?

—আমরা যেখানে বসি—অর্থাৎ বসন্ত কেবিনে।

—ভাবলাম, আজকে একটু ভালো জায়গায় বোসবো। বেজার মুখে বলল ঢোলগোবিন্দ, তা-না সেই বসন্ত কেবিন। ওটাই বা কী আহামরি জায়গা! ওর অবস্থাও তো তথৈবচ।

—তবুও মন্দের ভালো! ভোম্বলদা বলল, তুই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে আয়। তারপর ভালো জায়গায় বসা যাবে।

ঢোলগোবিন্দ চলে গেল। আমরা বসন্ত কেবিনের দিকে পা বাড়ালাম।

বসন্ত কেবিনে ঢুকেই টোস্ট আর চায়ের অর্ডার দিল ভোম্বলদা। অর্ডার সব জায়গায় ভোম্বলদাই দেয়, কিন্তু পয়সা দিতে হয় আমাদের। সে-দুঃখের কাহিনী অযথা বলে আর লাভ কী! তাতে আমরাই মনে কষ্ট পাব।

টোস্ট এল টেবিলে। এমন সময় ঢোল গোবিন্দ এসেও হাজির হল। খেতে খেতেই ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার? তোর অ্যাতো দেরি হোলো কেন রে ঢোলগোবিন্দ?

ভোম্বলদার কথার কোন জবাব না দিয়ে ঢোল গোবিন্দ ভুরু নাচিয়ে এমনভাবে হাসতে লাগল যেন সে বিরাট জয় করে ফিরে এসেছে।

—একে তো এলি লেট করে, তারপর আবার হাসছিস? দাঁত খিঁচিয়ে উঠল ভোম্বলদা, তুই ভেবেছিস কী?

ঢোল গোবিন্দ স্পীকটি নট্। মুখে শুধু হাসি। ভোম্বলদা আরো রেগে গেল।

ভুলো বলল—তোর ব্যাপারটা কী বল তো ঢোল গোবিন্দ? তখন থেকে হেসেই চলেছিস।

—আছে, আছে—ব্যপার আছে। ঢোল গোবিন্দর আবার হাসি।

—আছে, আছে। কী আছে রে? ভেংচি কাটল ভোম্বলদা।

টুলোও বেশ বিরক্ত হয়ে বলল—তুই থাম্‌তো ঢোল গোবিন্দ। তোর স্বভাব কোনদিন পাল্টাবে না দেখছি। সব সময়ই তোর খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। সাধে কী আর তোর নাম শুধু গোবিন্দ থেকে ঢোলগোবিন্দ হয়েছে! ভণিতা ছেড়ে কাজের কথাটা বল।

—সে কথা শুনলে ভোম্বলদা ভীষণ রেগে যাবে।

আমি এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলাম। আর থাকতে পারলাম না। বললাম—যে কথা শুনলে ভোম্বলদা রেগে যাবে সেই কথায় তুই হেসেই চলেছিস! তোর ব্যাপারটা কী বল তো?

—আসল ব্যাপারটা হচ্ছে....ভোম্বলদার মুখের দিকে তাকালো ঢোলগোবিন্দ।

সাপের মতো ফোঁস করে উঠল ভোম্বলদা—ব্যপারটা হচ্ছে কী? চালাকি....প্রকাশকের সাথে দেখা করে এসে চালাকি শুরু করে দিলি। মনে হচ্ছে তোর বইটা যেন এক্ষুনি বাজারে বেরিয়ে পড়বে।

—সে তুমি যা-ই বলো, বইটা আমার তাড়াতাড়িই বেরিয়ে যাবে। তবে তুমি তোমার বই ছাপতে গিয়ে ভীষণ ঠকে গ্যাছো।

—অ্যাঁ। বিষম খেল ভোম্বলদা।

—সত্যি বলছি। হাসছি তো আমি সেইজন্যেই। তোমাকে ঠকিয়েছে—এ কথা তো স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

—আমি যে ঠকেছি তা তুই বুঝলি কী করে?

—প্রকাশকের কাছ থেকে কোটেশন নিয়ে। তোমার কবিতার বই পাঁচ ফর্মার—আমারও তাই। তোমার কতো খরচ হয়েছে তা তো আমাদের বলেছো। প্রকাশক যা হিসেব দিল তাতে দ্যাখা গ্যালো তোমার বইয়ের অর্ধেকেরও কম খরচে আমার বই বেরিয়ে যাবে।

—প্রকাশক নিজের পয়সায় ছাপে। খরচের হিসেব তোকে দেবে কেন? লেখক তো স্রেফ পঁচিশ কপি বই আর বিক্রি রয়্যালটি পায়।

—কথাটা ঠিক। আর এটাই নিয়ম। তবে নিয়মের বাইরেও তো অনেক ব্যাপার থাকে।

টুলো কিছুটা উত্তেজিত হয়েই জিজ্ঞেস করল—ব্যাপারটা কী, শুনি।

—আসলে দুই শ্রেণীর প্রকাশক আছে কলেজ স্ট্রীটে। তোরা একশ্রেণীর কথাই জানিস। আমি যাদের কথা বলছি তারা লেখকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বই ছাপে। বই বিক্রি করে লেখকের সব টাকা ফেরৎ দেয়। আর লেখক যতো বই চাইবে ততো বই-ই পেয়ে যাবে।

—এরকম প্রকাশকও আছে নাকি! বিস্ময় প্রকাশ করল টুলো।

—আছে, আছে। সব খোঁজ রাখতে হয়।

ভোম্বলদাকে খুবই বিমর্ষ দেখালো। তাই টুলো আর কথা বাড়াল না। কারণ, টাকা-পয়সার ব্যাপারে রীতিমতো সচেতন ভোম্বলদা। ষোলআনার জায়গায় বত্রিশআনা হিসেবী। একনম্বর কিপটে। মানে হাড়কিপটে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে ঠকাতে পারেনি। এহেন ভোম্বলদা তাই ঢোলগোবিন্দর কথায় খুবই মনমরা হয়ে পড়ল। বলল—তোর প্রকাশকটা কে রে?

আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঢোল গোবিন্দ বলল—গঙ্গা-যমুনা।

—বেড়ে নাম তো! ভোম্বলদা মনমরা অবস্থায়ও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, দুটো নদীকে এক করে ফেলেছে।

—এরকম কোন প্রকাশকের নাম তো শুনিনি। টুলো বলল, নিশ্চয়ই একেবারে আনকোরা সংস্থা।

—না-না, আনকোরা নয়। অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে গঙ্গা-যমুনা থেকে। তাছাড়া এই নামে ওঁদের একটা মাসিক পত্রিকাও আছে।

ভুলো বলল—তুই এই সব খবর কোত্থেকে পাস রে ঢোল গোবিন্দ?

ঢোলগোবিন্দ একটু হাসলো। আজ যেন ওর হাসার-ই দিন। ঠিক হল আমরা তক্ষুণি গঙ্গা-যমুনায় যাব।

সন্ধে হয়ে গেছে। রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে পা বাড়ালাম আমরা গঙ্গা-যমুনার দিকে। যেতে যেতে ভোম্বলদা বলল—কার মুখ দেখে যে ঘুম থেকে উঠেছিলাম আজকে! তবে আমি এর শেষ দেখে ছাড়বো।

গঙ্গা-যমুনায় বসে আলোচনা শুরু করলাম আমরা। বললাম, আমরাও এখান থেকে বই প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। বেশ আদর-আপ্যায়ন করলেন ভদ্রলোক। জানালেন তিনি

সরকারি চাকরি করেন। তাই স্ত্রীর নামে সবকিছু। নিজের বাড়ি-ফোন সবই আছে। আমাদের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। শেষে এ-ও জানালেন যে তাঁর একটি পুরস্কার-কমিটি আছে। ভবিষ্যতে পুরস্কারের ব্যবস্থাও তিনি করে দিতে পারবেন।

একে এতো কম টাকায় বই বের করে দেবেন, তার ওপর আবার পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করতে পারেন, তারও ওপর ওঁর পত্রিকায় আমাদের লেখা প্রকাশিত হবে—এ যে চিন্তার বাইরে। আমরা সবাই অবাক। ঢোল গোবিন্দকে বাহবা জানালাম। ব্যাটা বেশ চালু তো! তলে তলে এতো খবর রাখে! দেখলাম সত্যি ঢোল গোবিন্দর ঢোল পেটানো মিথ্যে নয়।

গঙ্গা-যমুনা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম। ভোম্বলটার মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—আমার নাম ভোম্বল ঘোষ। সারা কলকাতা চষে বেড়াই আমি। টালা টু টালিগঞ্জ, বালি টু বালিগঞ্জ। এমন কোন মিএঞা নেই যে আমাকে ঠকায়। আর শেষপর্যন্ত আমাকেই যক দিল। আমিই যক খেলাম ওই ছোড়াটার কাছে! দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

আমি বললাম—তোমার বই তো বেরিয়েছে অনেকদিন আগে। এখন আর এ-নিয়ে ঝামেলা করে লাভ কী?

—লাভ কী মানে? টাকা আদায় করে ছাড়বো।

—এতোদিন পরে কী কেউ টাকা ফেরৎ দ্যায়?

—ওর ঘাড় দেবে। ভক্তিকে কী আমি সহজে ছেড়ে দেবো!

টুলো জিজ্ঞেস করল—ভক্তিটা আবার কে?

ভোম্বলদা গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলল—ওই শালা প্রেসওলাটা—মানে প্রেসের মালিক। ওই তো বইটা ছেপেছে। আমাকে যক মারার ফল হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাছাধন। এবার বুঝবে ভোম্বল ঘোষ কী জিনিস!

পরের দিন। বেলা তখন সাতটা। ভোম্বলদা আমার বাড়িতে এসে হাজির। সঙ্গে ঢোলগোবিন্দ।

কী ব্যাপার ভোম্বলদা? আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা দুজনে কোথাও যাচ্ছো নাকি?

—হ্যাঁ। তুইও আমাদের সাথে যাবি।

—কোথায়?

—ভক্তির প্রেসে।

—এই সাতসকালে!

—হ্যাঁ। এই সাতসকালে গিয়েই ব্যাটাকে ধরবো। ওতো প্রেসেই থাকে। দেরি করে গেলে বেরিয়ে পড়তে পারে। জানিস হুলো, সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি।

—যা হবার হয়ে গেছে। কেন তুই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা খারাপ কোরছো ভোম্বলদা?

—বলিস কী রে! এটা সামান্য ব্যাপার? তুই চটপট তৈরি হয়ে নে। দ্যাখ না কী করি আমি আজ ওকে। আভি তো খেল শুরু হোগা। সবে তো শুরু। বুঝলাম ভক্তির কপালে দুঃখ আছে।

ভক্তির প্রেস। বেলা আটটা নাগাদ আমরা তিনজনেই এসে হাজির। ভক্তি তো এতো

সকালে আমাদের দেখে অবাক।

—কী ব্যাপার ভোম্বলদা? ভক্তি জিজ্ঞেস করল, কোনো আর্জেন্ট কাজ আছে নাকি?

—কাজ নেই, কথা আছে।

—কথা পরে শুনবো। আগে চা-টা খান।

—না, খেতে আমি আসিনি। গম্ভীর হয়ে বলল ভোম্বলদা, তুমি আগে কথা শোন।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল—বলুন তাহলে।

ভোম্বলদা বলল—তুমি তো ভালো করেই জানো যে তোমাকে আমি নিজের ছোট ভাইয়ের মতন স্নেহ করতাম।

—নিশ্চয়ই। আমিও তো আপনাকে নিজের বড়ভাইয়ের মতনই ভক্তি করি।

—ভক্তি-টক্তি তুমি কর না। নামেই তুমি ভক্তি, কাজে নও।

—একি কথা বলছেন আপনি ভোম্বলদা?

—ঠিকই বলছি। যে যাকে ভক্তি করে তাকে কী সে ঠকায়?

—তার মানে আপনি আমাকে বলতে চাইছেন আপনাকে আমি ঠকিয়েছি।

—আলবাৎ। সাপের মতো ফোঁস করে উঠল ভোম্বলদা, তুমি কী মনে কর আমি ক-অক্ষর গোমাংস? বই ছাপার ব্যাপারে কিছুই বুঝি না?

—আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ব্যাপারটা খুলেই বলুন না।

—তবে শোন। তোমার সাথে আমার বহুদিনের পরিচয়। আর সেইজন্যেই তোমাকে আমার কবিতার বইটা ছাপতে দিয়েছিলাম। তুমি বলেছিলে খুব কম খরচে আমার বইটা করে দেবে। কথাটা তাই হয়েছিল তো?

—হ্যাঁ। আমি বাজার থেকে অনেক কম রেটে আপনার কাজ করে দিয়েছি।

—মিথ্যে কথা। তুমি অনেক বেশি টাকা আমার কাছ থেকে নিয়েছো।

—যদি প্রমাণ করতে পারি তুমি নিয়েছো, তাহলে.....

—সব টাকা ফেরৎ দেব।

—ঠিক আছে। কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল ভোম্বলদা।

প্রেস থেকে বেরিয়ে ভোম্বলদা বলল—ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে রে হুলো।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমি বললাম, তা না ভক্তির এই চ্যালেঞ্জের সাহস আসে কোত্থেকে? ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

ঢোলগোবিন্দ বলল—এতে সন্দেহের কী আছে? ব্যাপারটা তো জলের মতন পরিষ্কার। গঙ্গা-যমুনা তো ওই টাকায় বই বের করে দেবে বলেছে।

আমি বললাম—চকচক করলেই সোনা হয় না ঢোলগোবিন্দ।

আমাদের দুজনের কথার মাঝখানে হঠাৎ ভোম্বলদা বলে উঠল—তোরা চুপ কর। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। চল্ কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় আগে যাই।

—তারপর? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—তারপরই তো হবে আসল খেলা।

ট্রামে চেপে আমরা পৌঁছলাম কলেজ স্ট্রীটে। ভোম্বলদা তার প্ল্যানটা আমাদের

দুজনকে বুঝিয়ে দিল। আমরা অবাক। এ ভোম্বলদা তো সে ভোম্বলদা নয়। এ যেন অন্য ভোম্বলদা—রীতিমতো এক পাকা গোয়েন্দা।

—ভোম্বলদার প্ল্যানমতো প্রথমে আমরা পা বাড়ালাম কাগজের দোকানের দিকে। বড় বড় পা ফেলে ভোম্বলদা আমাদের থেকে বেশ খানিকটা আগে আগে চলছে। যেতে যেতে ঢোলগোবিন্দ আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—জানিস হুলো, ভোম্বলদা রেগুলার শার্লক হোমস পড়ে। এবার তো ওর ডিটেক্‌টিভ গল্পের বই বেরুবে।

আমিও ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম—আশ্চর্য! ভোম্বলদা তো কোনদিন এ-কথা বলেনি আমাদের। তুই জানলি কী করে?

ঢোল গোবিন্দ বলল—তুই আবার এ-কথা ভোম্বলদাকে বলিস না যেন। দিনকয়েক আগে হঠাৎ একদিন আমি ভোম্বলদার বাড়িতে যাই। গিয়ে দেখি ভোম্বলদা লিখছে—আর পাশে একগাদা শার্লক হোমস গোয়েন্দা কাহিনী আছে যে কল্পনার দরকার হয় না। আর ভোম্বলদা বাস্তব কাহিনী নিয়েই লিখবে।

কাগজের দোকানের কাছে আসতেই ভোম্বলদা পেছন ফিরল। আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম।

কয়েকটা দোকান থেকে আমরা কাগজের দাম জেনে নিলাম। তারপর ছুটলাম প্রেসের দিকে। সেখান থেকেও কোটেশন নিলাম। বাইন্ডিং কস্ট্‌ জানার জন্যে গেলাম বাইন্ডারের কাছে। একেবারে শেষে গেলাম ব্লকমেকারের কাছে। ব্লকের দাম জেনে আমরা হিসেবে বসলাম।

কিন্তু একি! খরচ যে গঙ্গা-যমুনার কোটেশনের ডবল-এর বেশি। এমন কি ভক্তির চেয়েও কিছুটা বেশি। তবুও ভক্তিরটা কাছাকাছি।

বেজায় মুখে ঢোলগোবিন্দ বললো—নিশ্চয়ই এর মধ্যে রহস্য আছে। তোমার প্ল্যানমতো কাজ হলে মনে হয় সব রহস্য বেরিয়ে যাবে ভোম্বলদা।

—তাহলে চল্‌ এবার গঙ্গা-যমুনায়।

গঙ্গা-যমুনায় পৌঁছে তার প্রকাশিত বইগুলি দেখতে চাইল ভোম্বলদা। কী যেন মনোযোগ দিয়ে দেখল। পরে আসব বলে বেরিয়ে এলাম আমরা সেখান থেকে।

এবার আবার ভক্তির প্রেস। প্রেসে ঢুকেই ভোম্বলদা ভক্তিকে জড়িয়ে ধরে বলল—তুমি নির্দোষ। কিন্তু একটা জিনিষ যে তোমাকে জানাতে হবে ভক্তি।

—বলুন ভোম্বলদা।

—গঙ্গা-যমুনা কী করে অতো সস্তায় বই বের করে?

ভোম্বলদার প্রশ্নে অবাক হলাম আমরা। ভক্তি কী করে জানবে গঙ্গা-যমুনার কথা। এতো অদ্ভুত গোয়েন্দাগিরি ভোম্বলদার!

ভক্তি বলল—আমি কী করে বলবো?

—তুমিই বলতে পারবে ভক্তি। বেশ গোয়েন্দা ঢং-এ ভোম্বলদা বলল, সেইজন্যেই আমার এখানে ছুটে আসা।

ভক্তি কেমন যেন আমতা-আমতা করছে দেখে ঢোলগোবিন্দ আর আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

WWW.PATHAGAR.NET

ভোম্বলদা আবার বলল—তুমিই পারো এই রহস্য ফাঁস করতে।

ভক্তি বলল—ব্যবসার তো একটা নীতি আছে ভোম্বলদা! পার্টির গোপন ব্যাপার কী ফাঁস করা উচিত?

—সাধারণত উচিত নয়। কিন্তু তখনি উচিত যখন সেটা দশজনের ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা আমার তাই মনে হচ্ছে এখন।

—ঠিকই ধরেছেন। আর এইজন্যেই আমি ব্যাপারটা ফাঁস করছি। সত্যিই গঙ্গা-যমুনা বহুলোককে এইভাবে ঠকিয়ে চলেছে। আর এই নোংরামির জন্যেই ওদের কাজ আমি আর করি না।

ঢোলগোবিন্দ আর আমি অবাক। গোয়েন্দাগিরিতে ভোম্বলদার তো বেশ কেরামতি আছে। ব্যাপারটা ঠিক ধরে ফেলেছে তো!

ভক্তি আসল রহস্য ফাঁস করল। লেখকদের কাছ থেকে এগারোশো কপি বই ছাপার টাকা নেয় গঙ্গা-যমুনা। ছাপে বড়জোর দেড়শো থেকে দুশো কপি। ব্যস, আসল কারসাজি এখানে। সেইজন্যেই রেটের বাইরে অনেক কমে কোটেশন দেয়।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—সেটা কী করে সম্ভব? লেখক যখন বইয়ের হিসেব চাইবে তখন কী হবে?

—ওরা খুব ভালো করেই জানে যে নতুন লেখকদের বই তেমন বিক্রি হয় না। ভক্তি বলল, লেখককে পঞ্চাশ থেকে একশোখানা বই দিলেই কাজ হাসিল। তাই তখন লেখকের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

ভোম্বলদা বলল—এই ধরনেরই কিছু একটা আমি সন্দেহ করছিলাম। তবুও একটা কথা আছে ভক্তি! ওরা যে বোললো তিন বছর পর বই বেচে সব টাকা ফেরৎ দিয়ে দেবে?

—ভোম্বলদা, আপনি একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে ওরা কত বড়ো ধূর্ত। কজনের ধৈর্য আছে যে তিন বছর ধরে ওদের পেছন-পেছন ঘুরবে? তাছাড়া বই বিক্রি না হলে লেখকের গরজ আপনা-আপনিই কমে যায়। ওরা এই সাইকোলজিটাকেই কাজে লাগায়।

—থ্যাঙ্ক য়্যু ভক্তি, থ্যাঙ্ক য়্যু। আনন্দে উচ্ছ্বাসে বলে উঠল ভোম্বলদা, তুমি আজ আমাদের দারুণ উপকার করলে।

ঢোলগোবিন্দ আর আমি ভোম্বলদাকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি ভক্তিকে ধরার ক্লু পেলে কী ভাবে? জানলে কী করে যে ভক্তি, গঙ্গা-যমুনার কাজ করতো?

হাসতে হাসতে ভোম্বলদা বলল—গঙ্গা-যমুনায় গিয়ে ওদের বইয়ে প্রিন্টারের নাম যখন দেখেছিলাম তখনি ভক্তির নাম দেখে ফেলি। কী বুঝলি?

আমি বললাম—বুঝলাম তুমি শার্লক হোমস হতে চলেছো।

ভোম্বলদা বলল—এই ঢোলগোবিন্দ, গঙ্গা-যমুনার হাত থেকে জোর বেঁচে গেছিস। যা পঞ্চাশ টাকার মিষ্টি নিয়ে আয়।

বেজার মুখে ঢোলগোবিন্দ মিষ্টি আনতে গেল।

ভোম্বলদা ভক্তিকে বলল—সত্যিই তোমার নামের সঙ্গে কাজের মিল আছে। তুমি দেখে নিও—আমি গঙ্গা-যমুনাকে সহজে ছেড়ে দেবো না। এই চিটিংবাজির ফল ওকে পেতেই হবে।

মিষ্টি আসতেই ভক্তিকে বেশি করে মিষ্টি খাওয়ালো ভোম্বলদা।

papai